রোকেয়া রচনাবলী

রোকেয়া-রচনাবলী

আবদুল কাদির সম্পাদিত

রোকেয়া-রচনাবলী

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ
২০০৬-এর সম্পাদনা পরিষদ

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সেলিনা হোসেন
মুহম্মদ শামসুল আলম
মাজেদা সাবের
মুহম্মদ নূরুল হুদা

বাংলা একাডেমি ঢাকা

বাএ ৫৪৭৪

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৮০/ডিসেম্বর ১৯৭৩। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৯১/জুন ১৯৮৪। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : চৈত্র ১৩৯৯/মার্চ ১৯৯৩। নতুন সংস্করণ : ফাল্গুন ১৪০৫/মার্চ ১৯৯৯। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ : পৌষ ১৪১৩/ডিসেম্বর ২০০৬। প্রথম পুনর্মুদ্রণ (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ) : পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৪২২/ডিসেম্বর ২০১৫। প্রকাশক : ড. জালাল আহমেদ, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা। প্রচ্ছদ : মামুন কায়সার। মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০ কপি। মূল্য : ২৫০.০০ টাকা।

Abdul Quadir (ed.), ROKEYA RACHANABALI [Complete Works of Begum Rokeya Sakhawat Hossain], First Published : December 1973. First Reprint : June 1984. Second Reprint : March 1993. New Edition : March 1999. Enlarged and Revised Edition : December 2006. First Reprint (Enlarged and Revised Edition) : Reprint Sub-Division, December 2015. Published by Dr. Jalal Ahmed, Director (in-charge), Sales, Marketing and Reprint Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. Price : Taka 250.00 Only.

ISBN 984-07-5483-1

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

দীর্ঘদিন ধরে রোকেয়া রচনাবলী অমুদ্রিত ছিল। পাঠকদের চাহিদা সত্ত্বেও রচনাবলী মুদ্রণ করা সম্ভব হয়নি একটি প্রামাণ্য পাঠ তৈরির কারণে।

বেগম রোকেয়ার প্রকৃত নাম রোকেয়া খাতুন হলেও পরবর্তীকালে মিসেস আর. এস. হোসেন ও বেগম রোকেয়া নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। রচনাবলীর নামকরণে তাঁর পরিচিত নামই ব্যবহৃত হয়েছে।

বেগম রোকেয়া নারী-শিক্ষা ও নারী অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় পুরুষ শাসিত সমাজ ও নারীর অধিকার সম্পর্কে এমন সচেতন চেতনার পরিচয় অন্য কোনো নারী সাহিত্যিকের রচনায় লক্ষ্য করা যায় না। নারী জাগরণে তাঁর এই ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

বাংলা একাডেমী ১৯৭৩ সালে কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় প্রথম **রোকেয়া-রচনাবলী** প্রকাশ করে। কবি-গবেষক আবদুল কাদিরের মৃত্যুর পরে নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর দ্বারা সম্পাদিত হয়ে **রোকেয়া-রচনাবলী** পুনঃপ্রকাশিত হয় ১৯৯৯ সালে। বর্তমান সংস্করণটি প্রস্তুত করা হয়েছে ঐ সংস্করণের ভিত্তিতেই। এই সংস্করণে নতুন কিছু তথ্য-উপাত্ত সংযোজিত হয়েছে।

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন এই প্রামাণিক **রোকেয়া-রচনাবলী**-র সম্পাদক-মণ্ডলীকে এবং তাঁদের সহযোগীদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

ফাল্গুন ১৪১২
ফেব্রুয়ারি ২০০৬

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকা

বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার আয়োজনে, বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায়, সমাজ হিতৈষণার অব্যাহত প্রয়াসে রোকেয়া (১৮৮০–১৯৩২) স্ব–সমাজের জাগরণের অগ্রদূতরূপে পরিগণিত। ক্রমে তাঁর সাধনার ফসল ছড়িয়ে পড়েছিল জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে। এভাবে তিনি হয়ে ওঠেন নিরঙ্কুশ মানবতা ও মনুষ্যত্বের কল্যাণ কামনায় নিবেদিত প্রাণ এক মহীয়সী। সমাজের কুসংস্কার বিদূরণে, নিবিড় বিজ্ঞান মনস্কতায় ও প্রগাঢ় ধর্মানুরাগে তিনি দীপ্ত। রোকেয়ার সাহিত্যসাধনাও বিশিষ্টতায় সুচিহ্নিত।

রোকেয়ার সাহিত্যকর্ম পরিমাণে বিপুল নয় কিন্তু বক্তব্যের অভিনবত্বে, যুক্তির অকাট্যতায় ও প্রকাশের দার্ঢ্যে তা অত্যুজ্জ্বল। পাঁচটি গ্রন্থের লেখক তিনি। তিনি যাপন করেছেন ৫২ বছরের এক নাতিদীর্ঘ জীবন।

রোকেয়ার নিজের লেখালেখির তুলনায় রোকেয়াকে নিয়ে লেখালেখির পরিমাণ অনেক বেশি। এ–ধারা অব্যাহত। উচ্চতর গবেষণায় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে 'রোকেয়া রচনাবলী' অন্তর্ভুক্ত। এর ব্যাপকতর অধ্যয়নের সূত্রে রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্যকর্ম বিষয়ে নতুন তথ্যের উদ্ভাসন হচ্ছে, অপনোদন হচ্ছে অনেক বিভ্রান্তির।

রোকেয়া–চর্চার গুরুত্বপূর্ণ উৎস রোকেয়া রচনাবলী। আনন্দের সঙ্গে স্মরণযোগ্য, 'রোকেয়া–রচনাবলী' সম্পাদনা ও প্রকাশের অগ্রণী ভূমিকা স্বাধীন বাংলাদেশের। বিশিষ্ট সাহিত্যসমালোচক, কবি আবদুল কাদিরের প্রাজ্ঞ সম্পাদনায়, বাংলা একাডেমী থেকে 'রচনাবলী' প্রথম প্রকাশিত হয়—অগ্রহায়ণ ১৩৮০ (ডিসেম্বর, ১৯৭৩)। 'রোকেয়া–রচনাবলী'র পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয় বাংলা একাডেমী থেকেই, যথাক্রমে ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে।

বাংলা একাডেমীর অব্যাহত আগ্রহে 'রোকেয়া রচনাবলী'র নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে। কিছু দুষ্প্রাপ্য রচনার সন্নিবেশে ঋদ্ধ হয়েছিল ঐ সংস্করণ। আশাতীত স্বল্প সময়ে তা নিঃশেষ হয়ে গেলে একাডেমী কর্তৃপক্ষ তৎপর হন নতুন সংস্করণের (১৯৯৯) পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ (২০০৪) প্রকাশে।

এবারের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণে সংকলিত হয়েছে রোকেয়ার কিছু স্মরণীয় সাহিত্যকর্ম। বিশেষ করে, তাঁর অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'অলঙ্কার না Badge of Slavery'র দুর্লভ প্রথম পাঠ ও কবিতা 'আমি ও মন' এবং 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা একটা চিঠি।

রোকেয়ার নিজের, পরিবারের ও স্বজনদের কিছু আলোকচিত্র সংযোজিত হল। 'পরিশেষ' অংশ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাজে আসবে, আশা করি। 'রোকেয়া রচনাবলী'র পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ পাঠকমহলে সমাদৃত হলে বাংলা একাডেমীর আয়োজন ও সম্পাদনার পরিষদের অভিনিবেশ সার্থক হবে।

২৫শে অগ্রহায়ণ ১৪১১ — **সম্পাদনা পরিষদ**

৯ই ডিসেম্বর ২০০৪

নতুন সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

বাঙালি-মুসলিম নারীজাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) ৬৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 'রোকেয়া রচনাবলী'র সংশোধিত ও সংযোজিত নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

'রোকেয়া রচনাবলী'-র সংশোধিত ও সংযোজিত নতুন সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে এই রচনাবলীর প্রথম সম্পাদক আবদুল কাদিরের নাম আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। কেননা আবদুল কাদির সংকলিত ও সম্পাদিত রচনাবলীর মধ্য দিয়েই মূলত রোকেয়া-চর্চার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিলো।

নতুন সংস্করণে বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধ, রস-রচনা, কবিতা, চিঠিপত্র ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় শতাধিক পৃষ্ঠার নতুন রচনা সংযোজিত হলো। এই কৃতিত্ব দেশ-বিদেশে রোকেয়া-চর্চাকারী গবেষক ও বর্তমান সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলীর। আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান রচনাবলী রোকেয়ার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নতুনতর মাত্রা যোগ করবে।

গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ফাল্গুন ১৪০৫
মার্চ ১৯৯৯

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

বেগম রোকেয়া বা রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন নামে যিনি বহুলপরিচিত, তিনি লিখতেন 'মিসেস আর. এস. হোসেন' নামে, এই নামে তাঁর বইগুলিও বেরিয়েছিল। তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল অনতিদীর্ঘ, ১৮৮০–১৯৩২, মাত্রই ৫২/৫৩ বছর। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও নিতান্তই অল্প, মাত্র পাঁচটি : 'মতিচূর' (প্রথম খণ্ড, ১৯০৪), 'Sultana's Dream' (১৯০৮), 'মতিচূর' (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯২২), 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) এবং 'অবরোধ-বাসিনী' (১৯৩১)। সাহিত্যকর্মের বাইরে তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি কাজ—১৯০৯ সালে 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা আর ১৯১৬ সালে 'আনজুমানে-খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে একটি সংগঠনের স্থাপনা। বাংলা ও ইংরেজি রচনা, স্কুল প্রতিষ্ঠা, নারীসংগঠন প্রতিষ্ঠা—বেগম রোকেয়ার এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য ছিল নারীর জাগরণ, পুরুষের সমান নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা।

বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমদিকে রোকেয়ার যখন উত্থান, তখনো বাঙালি-মুসলমান নারী ছিল অন্ধকারে, বাঙালি-মুসলমান সমাজই ছিল অন্ধকারে। সদ্য তখন ভোর হয়ে আসছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে শুরু হয়েছিল বাঙালি-মুসলমানের বহুবিলম্বিত জাগরণ। সেই জাগরণের মধ্যে রোকেয়া নারীকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রোকেয়া ছিলেন উন্মুক্ত মনের মানুষ। ফলে বাঙালি-মুসলমান নারীর মধ্যেই তিনি আবদ্ধ থাকেননি, তিনি দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত নারীর জাগরণ আকাঙ্ক্ষা করেছেন। আবার বাঙালি-মুসলমান নারী শুধু নয়—সমগ্রভাবে বাঙালি-মুসলমানের জাগরণই তিনি চেয়েছেন শেষ পর্যন্ত। সব-মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, রোকেয়া চেয়েছেন মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। রোকেয়ার এই আকাঙ্ক্ষা কেবল স্বপ্ন মাত্র ছিল না, তা ছিল ভূমিস্পর্শী অভিযান—রোকেয়ার তাবৎ লেখালেখি, স্কুল প্রতিষ্ঠা, সংগঠন তৈরি সবই তার সাক্ষ্য দেবে।

জীবৎকালে বেগম রোকেয়ার ছিল সম্মানিত সামাজিক ও সাহিত্যিক ভূমিকা। ১৯৩২ সালে তাঁর অকালমৃত্যুর পরেও বাঙালি তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছে—অনুষ্ঠান করে, নিবেদিত কবিতা লিখে, জীবনী লিখে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বেগম রোকেয়া যে আলোড়ন জাগিয়েছিলেন শতাব্দীর শেষেও তার তরঙ্গের ওঠানামা প্রত্যক্ষ করছি আমরা।

বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত স্কুল আজো—সময়ের নিয়মে একটু ভিন্নভাবে হয়তো—চলছে ; তাঁর স্থাপিত সংগঠনটি অনেকদিন আগে নির্বাপিত ;—কিন্তু সময়কে পরাজিত

করেছে বেগম রোকেয়ার রচনাবলী। বেশ কিছু লুপ্ত রচনার পুনরুদ্ধার সত্ত্বেও বেগম রোকেয়ার সমগ্র রচনা একটি খণ্ডেই এঁটে যাচ্ছে—অর্থাৎ তা পরিমাণে বিপুল নয়, কিন্তু অনেক দশক পেরিয়েও তার ভিতরে জ্বলজ্বল করছে ভাবনার সজীবতা। আজো সজীব ও সবীজ এই রচনাগুচ্ছ তাই আর-একবার গ্রন্থিত করবার প্রয়োজন হল।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো বেগম রোকেয়ার সমগ্র রচনার একত্রিত প্রকাশ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কবি আবদুল কাদিরের (১৯০৫-৮৩) সুযোগ্য সম্পাদনায় 'রোকেয়া রচনাবলী' বাংলা একাডেমী থেকে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭৩ সালে। এই সংস্করণটি পুনর্মুদ্রিত হয় দু-বার : ১৯৮৪ সালে একবার, তারপর ১৯৯৩ সালে।

ইতোমধ্যে বেগম রোকেয়ার জন্মশতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। রোকেয়া-চর্চা কখনোই থেমে থাকেনি একেবারে। কিন্তু গত দুই-তিন দশকে আমরা দেখছি বেগম রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে গভীর আগ্রহ ও সন্ধিৎসা জেগে উঠেছে। এরই ফলে তাঁর বেশ কিছু লেখা পুরনো পাণ্ডুলিপি ও পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধার করা গেছে। 'রোকেয়া রচনাবলী'-তে তাই এবার পাঠক তাঁর অনেক নতুন লেখার সন্ধান পাবেন।

আক্ষরিকভাবে নতুন নয়—প্রাপ্ত বিক্ষিপ্ত রচনার একত্রগ্রন্থন। বাংলা একাডেমী থেকেই বেরিয়েছিল ১৯৬৫ সালে মোশফেকা মাহমুদের 'পত্রে রোকেয়া পরিচিতি'। আর ছাপা হয়নি সে-বই। ঐ গ্রন্থে সংকলিত চিঠিপত্রের সঙ্গে শামসুননাহার মাহমুদের 'রোকেয়া জীবনী' (১৯৩৭) গ্রন্থধৃত পত্রগুলি, গোলাম মুরশিদ সংকলিত পত্রগুলি, এবং আরো দুএকটি পত্র কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হলো। ইয়াসিন সাহেবকে লেখা মূল পত্রগুলি সংগ্রহ করেছেন অধ্যাপিকা মাজেদা সাবের।

আগে সংকলিত হয়নি এমন বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ এবার যুক্ত করা সম্ভব হলো। লায়লা জামান সংকলিত ও সম্পাদিত 'দি মুসলমান পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ' (১৯৯৪) এবং অভিজিৎ সেন-সম্পাদিত 'অগ্রন্থিত রোকেয়া' (১৯৯৮) আমাদের সহায়ক হয়েছে।

'রোকেয়া রচনাবলী'র আদি সম্পাদক কবি আবদুল কাদিরের মূল বিন্যাস অনাহত রেখেই সাজানো হয়েছে বইটি। পরিশিষ্ট-অংশ নতুনভাবে সজ্জিত করা হয়েছে।

সম্পাদনা পরিষদ

ফাল্গুন ১৪০৫
মার্চ ১৯৯৯

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বইয়ের পুনর্মুদ্রণের কাজটি ইতিপূর্বে বিভিন্ন বিভাগ থেকে করা হতো। এর কোন প্রয়োজন বা চাহিদাভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না।

বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন উপবিভাগ সরাসরি বইপত্র বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে একাডেমী প্রকাশিত কোন্ বই বেশী পাঠকনন্দিত, কোন্ বই ছাত্রসমাজের কাছে বিশেষভাবে আদৃত সে সম্পর্কে সমধিক ওয়াকিফহাল থাকায়, পুনর্মুদ্রণের কাজটি বিওবি উপবিভাগের দায়িত্বে সম্পাদিত হলে কাজের সমন্বয় সাধন, প্রকাশনার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্রেতা সাধারণের চাহিদা মোতাবেক দ্রুত বাজারজাতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাকার বিষয় ত্বরান্বিত হবে বিবেচনা করে কার্যনির্বাহী পরিষদ বিওবি'র আওতায় 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প' নামে একটি 'কোষ' গঠন করে।

নবগঠিত পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প বিগত অর্থবছরে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যভুক্ত গ্রন্থ ব্যতীতও পাঠকনন্দিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারই ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ। যাঁদের জন্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো তাঁদের উপকারে আসলে বাংলা একাডেমী শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করবে।

চৈত্র ১৩৯৯
মার্চ ১৯৯৩

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রসঙ্গ-কথা

'রোকেয়া রচনাবলী'-র দ্বিতীয় মুদ্রণ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। খুব অল্প সময়ে এর প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হয়। নানা প্রতিকূলতার কারণে দ্রুত দ্বিতীয় মুদ্রণ করা সম্ভব হয়নি। 'রোকেয়া রচনাবলী' পাঠক-সমাজে সমাদৃত হয়েছে শুধু রচনার প্রাঞ্জলতা বা প্রসাদগুণের কারণেই নয়, তাঁর সাহিত্য সময়ের চাইতে অগ্রগামী বিবেচিত হয়েছিল বলেই। তিনি যে সময়ে এবং পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নিজ চেষ্টায় এবং অসাধারণ নিষ্ঠায় তাকে অতিক্রম করেছিলেন। সেই ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং সাধনা আজকের দিনে আমাদের প্রেরণার উৎস।

আশা করবো রোকেয়া রচনাবলীর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রথম সংস্করণের মতোই পাঠকের সমাদর পাবে।

আষাঢ় ১৩৯১
জুন ১৯৮৪

মনজুরে মওলা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রসঙ্গ-কথা

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্যসাধারণ নাম। দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত বেগম আর. এস. হোসেন বাংলার অধঃপতিতা নারী সমাজকে মুক্তির সত্য-সুন্দর পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে ত্যাগের একটি উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর এই আত্মত্যাগ কেবল সমাজসেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না — বরং তাঁর চেতনার বিমূর্ত প্রকাশ আমরা দেখতে পাই সাহিত্য-সাধনার মধ্যেও। চিন্তার গভীরতায় এবং সৃষ্টির প্রসারতায় তাঁর প্রতিটি রচনা আমাদের জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। এদিক থেকে তাঁর সমগ্র রচনার নব মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে তাই 'রোকেয়া রচনাবলী' প্রকাশের প্রচেষ্টা আশা করি সুধীমহলে প্রশংসিত হবে। রচনাবলীর সংকলক-সম্পাদক কবি আবদুল কাদিরের নিরলস প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। 'রোকেয়া রচনাবলী'র বহুল প্রচার আমাদের একান্ত কাম্য।

বাংলা একাডেমী
১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০

মযহারুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সূচিপত্র

মতিচূর (প্রথম খণ্ড) ১-৫৪

পিপাসা [মহরম] ৫ স্ত্রী জাতির অবনতি ১১ নিরীহ বাঙ্গালী ২২ অর্দ্ধাঙ্গী ২৫ সুগৃহিণী ৩২ বোরকা ৪১ গৃহ ৪৬

মতিচূর (দ্বিতীয় খণ্ড) ৫৫-১৮৪

নূর-ইসলাম ৬১ সৌরজগৎ ৭৯ সুলতানার স্বপ্ন ১০২ ডেলিশিয়া-হত্যা ১১৭ জ্ঞানফল ১৩৬ নারী-সৃষ্টি ১৪২ নার্স নেলী ১৪৫ শিশু-পালন ১৫৭ মুক্তিফল ১৬২ সৃষ্টি-তত্ত্ব ১৮০

অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ১৮৫-২৫৮

কূপমণ্ডুকের হিমালয় দর্শন ১৮৭ রসনা-পূজা ১৯০ ঈদ-সম্মিলন ১৯৫ নারী-পূজা ১৯৬ আশা-জ্যোতিঃ ২০৪ মোসলমান কন্যার পুস্তক-সমালোচনা ২০৭ দজ্জাল ২০৯ সিসেম-ফাঁক ২১২ চাষার দুস্কু ২১৩ এণ্ডি শিল্প ২১৭ কাটা মুণ্ডু কথা কয় ২২৩ রাঙ ও সোনা ২২৪ বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি ২২৫ লুকানো রতন ২৩১ রানী ভিখারিনী ২৩৪ উন্নতির পথে ২৩৬ বেগম তরঙ্গীর সহিত সাক্ষাৎ ২৩৮ সুবেহ্ সাদেক ২৪১ ৭০০ স্কুলের দেশে ২৪৩ ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম ২৪৬ হজ্বের ময়দানে ২৫০ বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল ২৫২ গুলিস্তাঁ ২৫৪ কৌতুক-কণা ২৫৫ নারীর অধিকার ২৫৭

পদ্মরাগ ২৫৯-৩৭৮

অবরোধ-বাসিনী ৩৭৯-৪১৪

ছোটগল্প ও রস-রচনা ৪১৫-৪৫২

ভ্রাতা ও ভগ্নী ৪১৭ প্রেম-রহস্য ৪২৯ তিন কুঁড়ে ৪৩৪ পরী-ঢিবি ৪৩৭ বলিগর্ত্ত ৪৪০ পঁয়ত্রিশ মণ খানা ৪৪৪ বিয়ে-পাগলা বুড়ো ৪৪৭

অগ্রন্থিত কবিতা ৪৫৩-৪৭৪

বাসিফুল ৪৫৫ শশধর ৪৫৬ প্রভাতের শশী ৪৫৮ পরিতৃপ্তি ৪৫৯ নলিনী ও কুমুদ ৪৬০ স্বার্থপরতা ৪৬২ কাঞ্চনজঙ্ঘা ৪৬৩ কাঞ্চনজঙ্ঘা ৪৬৪ প্রবাসী রবিন ও তাহার জন্মভূমি ৪৬৬ আমি ও মন ৪৬৮ সওগাত ৪৭২ আপীল ৪৭২ নিরুপম বীর ৪৭৪

Sultana's Dream ৪৭৫-৪৮৮

প্রবন্ধ ৪৮৯-৪৯৬

God Gives Man Robs ৪৯১ Educational Ideals for the Modern Indian Girls ৪৯২

পত্রাবলী ৪৯৭-৫৪০

পরিশেষ ৫৪১-৬১৫

তথ্যপঞ্জি ৫৪৩ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার তালিকা ৫৫৪ প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও রচনা-পরিচয় ৫৬১ প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন ৫৯০ বেগম রোকেয়ার সাহিত্যকৃতি : আবদুল কাদির ৬০১ অলঙ্কার না Badge of slavery ৬০৫ ভূমিকা ৬১৫

গ্রন্থসমালোচনা ৬১৬-৬৩০

চিত্রাবলী ৬৩১-৬৪২

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

জন্ম : ১৮৮০ □ মৃত্যু : ১৯৩২

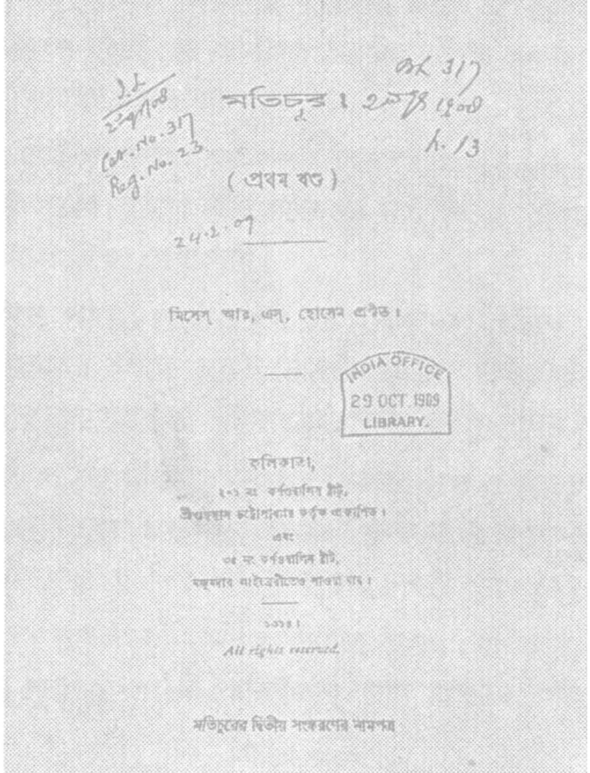

মতিচূর।

(প্রথম খণ্ড)

মিসেস্ আর, এস্, হোসেন প্রণীত।

INDIA OFFICE
29 OCT 1909
LIBRARY.

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।
এবং
৩৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
মজুমদার লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

১৩১৪।

All rights reserved.

মতিচূরের দ্বিতীয় সংস্করণের নামপত্র

ম তি চূ র (প্রথম খণ্ড)

নিবেদন

মতিচূরের কোন কোন পাঠকের সমালোচনায় জানা যায় যে তাঁহারা মনে করেন, মতিচূরের ভাব ও ভাষা অন্যান্য খ্যাতনামা গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন পুস্তকের সহিত মতিচূরের সাদৃশ্য দর্শনে পাঠকদের ওরূপ প্রতীতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

অপরের ভাব কিম্বা ভাষা স্বায়ত্ত করিতে যে সাহস ও নিপুণতার প্রয়োজন, তাহা আমার নাই; সুতরাং তাদৃশ্য চেষ্টা আমার পক্ষে অসম্ভব। (কালীপ্রসন্নবাবুর "ভ্রান্তিবিনোদ" আমি অদ্যাপি দেখি নাই এবং বঙ্কিমবাবুর সমুদায় গ্রন্থ পাঠের সুযোগও প্রাপ্ত হই নাই। যদি অপর কোন গ্রন্থের সহিত মতিচূরের সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ দৈব ঘটনা।)

আমিও কোন উর্দ্দু মাসিক পত্রিকায় কতিপয় প্রবন্ধ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি—উক্ত প্রবন্ধাবলীর অনেক অংশ মতিচূরের অবিকল অনুবাদ বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু আমার বিশ্বাস সে প্রবন্ধসমূহের লেখিকাগণ বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞা।

ইংরাজ মহিলা মেরী করেলীর "ডেলিশিয়া হত্যা" (The murder of Delicia) উপন্যাস-খানি মতিচূর রচনার পূর্ব্বে আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, অথচ তাহার অংশবিশেষের ভাবের সহিত মতিচূরের ভাবের ঐক্য দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কেন এরূপ হয়? বঙ্গদেশ, পঞ্জাব, ডেকান (হায়দরাবাদ), বোম্বাই, ইংলন্ড—সর্ব্বত্র হইতে একই ভাবের উচ্ছ্বাস উত্থিত হয় কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, ইহার কারণ সম্ভবতঃ ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অবলাবৃন্দের আধ্যাত্মিক একতা!

কতিপয় সহৃদয় পাঠক মতিচূরে লিখিত ইংরাজী শব্দ ও পদের বাঙ্গালা অর্থ না লেখার ক্রটী প্রদর্শন করিয়াছেন। এবার যথাসম্ভব ইংরাজী শব্দসমূহের মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল। যাঁহারা মতিচূরে যে কোন ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি।

মতিচূরে আর যে সকল ক্রটী আছে, তাহার কারণ লেখিকার বিদ্যা বুদ্ধির দৈন্য এবং বহুদর্শিতার অভাব। গুণগ্রাহী পাঠক পাঠিকাগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

বিনীতা

গ্রন্থকর্ত্রী

বিজ্ঞাপন

মতিচূরের প্রবন্ধসমূহ পূর্ব্বে "নবপ্রভা", "মহিলা" ও "নবনূর" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এবার প্রবন্ধগুলি সংশোধিত ও অনেক স্থলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

পিপাসা

(মহরম।)

কা'ল বলেছিলে প্রিয় ! আমারে বিদায়
দিবে, কিন্তু নিলে আজ আপনি বিদায় !

*

দুঃখ শুধু এই—ছেড়ে গেলে অভাগায়
ডুবাইয়া চির তরে চির পিপাসায় !
যখন যেদিকে চাই, কেবলি দেখিতে পাই,—
"পিপাসা, পিপাসা" লেখা জ্বলন্ত ভাষায়।
শ্রবণে কে যেন ঐ "পিপাসা" বাজায়।

প্রাণটা সত্যই নিদারুণ তৃষানলে জ্বলিতেছে। এ জ্বালার শেষ নাই, বিরাম নাই, এ জ্বালা অনন্ত। এ তাপদগ্ধ প্রাণ যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকে নিজের হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়।* পোড়া চক্ষে আর কিছুই দেখি না। পুষ্পময়ী শস্যশ্যামলা ধরণীর আনন্দময়ী মূর্ত্তি আমি দেখি না। বিশ্ব জগতের মনোরম সৌন্দর্য্য আমি দেখি না। আমি কি দেখি, শুনিবে? যদি হৃদয়ের ফটোগ্রাফ্ তোলা যাইত, যদি চিত্রকরের তুলিতে হৃদয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিবার শক্তি থাকিত,—তবে দেখাইতে পারিতাম, এ হৃদয় কেমন ! কিন্তু সে উপায় নাই।

ঐ যে মহরমের নিশান, তাজিয়া প্রভৃতি দেখা যায়,—ঢাকঢোল বাজে, লোকে ছুটাছুটি করে, ইহাই কি মহরম? ইহাতে কেবল খেলা, চর্ম্মচক্ষে দেখিবার তামাসা। ইহাকে কে বলে মহরম? মহরম তবে কি? কি জানি, ঠিক উত্তর দিতে পারিলাম না। কথাটা ভাবিতেই পারি না,—ওকথা মনে উদয় হইলেই আমি কেমন হইয়া যাই,—চক্ষে অন্ধকার দেখি, মাথা ঘুরিতে থাকে ! সুতরাং বলিতে পারি না—মহরম কি !

আচ্ছা তাহাই হউক, ঐ নিশান তাজিয়া লইয়া খেলাই হউক ; কিন্তু ঐ দৃশ্য কি একটা পুরাতন শোকস্মৃতি জাগাইয়া দেয় না? বায়ু-হিল্লোলে নিশানের কাপড় আন্দোলিত হইলে,

তাহাতে কি স্পষ্ট লেখা দেখা যায় না—"পিপাসা, পিপাসা"? উহাতে কি একটা হৃদয়-বিদারক শোকস্মৃতি জাগিয়া উঠে না? সকল মানুষই মরে বটে—কিন্তু এমন মরণ কাহার হয়?[১]

একদিন স্বপ্নে দেখিলাম—স্বপ্নে মাত্র যেন সেই কারবালায় গিয়াছি। ভীষণ মরুভূমি তপ্ত বালুকা; চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে; সমীরণ হায় হায় বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন কাহাকে খুঁজিতেছে! আমি কেবল শুনিতে পাইলাম—"পিপাসা, পিপাসা"! বালুকা কণায় অঙ্কিত যেন "পিপাসা, পিপাসা"! চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিলাম, সব শূন্য, তাহার ভিতর "পিপাসা" মূর্ত্তিমতী হইয়া ভাসিতেছে!

সে দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর—তথা হইতে দূরে চলিলাম। এখানে যাহা দেখিলাম, তাহা আরও ভীষণ, আরও হৃদয়-বিদারক! দেখিলাম—মরুভূমি শোণিত-রঞ্জিত![২] রক্ত-প্রবাহ বহিতে

---

১. একদা জয়নাল আবদীন (হোসেনের পুত্র) জনৈক কসাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছাগল জবেহ্ করিতে আনিয়াছ, উহাকে কিছু খাওয়াইয়াছ?" কসাই উত্তর করিল, "হ্যাঁ, ইহাকে এখনই প্রচুর জলপান করাইয়া আনিলাম!" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি ছাগলটাকে প্রচুর জলপানে তৃপ্ত করিয়া জবেহ্ করিতে আনিয়াছ; আর শিমর আমার পিতাকে তিন দিন পর্য্যন্ত জলাভাবে পিপাসায় দগ্ধ করিয়া জবেহ্ করিয়াছে!!"
কারবালার যুদ্ধের সময় জয়নাল রোগে ভুগিতেছিলেন বলিয়া শহীদ (সমরশায়ী) হন নাই।

২ ধর্ম্মগুরু মহাত্মা মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পর, ক্রমান্বয়ে আবুবকর সিদ্দিক, ওমর খেতাব ও ওস্মান গনি "খলিফা" হইলেন। চতুর্থবারে আলী খলিফা হইবেন, কি মোয়াবীয়া খলিফা হইবেন, এই বিষয়ে মতভেদ হয়। একদল বলিল, "মোয়াবীয়া হইবেন," একদল বলে, "আলী মোহাম্মদের (দঃ) জামাতা, তিনি সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী"। এইরূপে বিবাদের সূত্রপাত হয়।
অতঃপর মোয়াবীয়ার পুত্র এজিদ, আলীর পুত্র হাসান ও হোসেনের সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। এজিদ মহাত্মা হাসানকে কৌশলে বিষ পান করাইয়া হত্যা করে। ইহার এক বৎসর পরে মহাত্মা হোসেনকে ডাকিয়া (নিমন্ত্রণ করিয়া) কারবালায় লইয়া গিয়া যুদ্ধে বধ করে।
কেবল যুদ্ধ নহে—এজিদের দলবল ইউফ্রেতীজ নদী ঘিরিয়া রহিল; হোসেনের পক্ষের কোন লোককে নদীর জল লইতে দেয় নাই। পানীয় জলের অভাবেই তাঁহারা আধমরা হইয়াছিলেন। পরে যুদ্ধের নামে একই দিন হোসেন আত্মীয়স্বজনসহ নিহত হইলেন। এ কথায় মতভেদ আছে; কেহ বলেন, তিন দিন যুদ্ধ হয়, কেহ বলেন একই দিন যুদ্ধ করিয়া সকলে সমরশায়ী হইয়াছেন। নদীর জল হইতে হোসেনকে বঞ্চিত করিয়া এজিদ অশেষ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়াছে।
অষ্টাদশ বর্ষীয় নবীন যুবক কাসেম (হাসানের পুত্র) মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রে হোসেনের কন্যা সকিনাকে বিবাহ করেন! কারবালা যখন সকিনাকে নববধূ বেশে দেখিল, তাহার কয় ঘণ্টা পরেই তাঁহাকে নববিধবা বেশে দেখিয়াছিল! যেদিন বিবাহ, সেই দিনই বৈধব্য! হায় কারবালা! এ দৃশ্য দেখার চেয়ে অন্ধ কেন হও নাই? পুরুষগণ ত যুদ্ধ করিতেছিলেন, আর ললনাগণ কি করিতেছিলেন?—একজনের জন্য শোক করিতেছিলেন, আর একটির সমরশায়ী হওয়া সংবাদ পাইলেন!—কাসেমের জন্য কাঁদিতেছিলেন, আলী আকবরের মৃতদেহ পাইলেন! শোকোচ্ছ্বাস কাসেমকে ছাড়িয়া আকবরের দিকে ধাবিত হইল,—আকবরের মাথা কোলে লইয়া কাঁদিতেছিলেন, শিশু আস্গরকে শর-বিদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন! এক মাতৃ-হৃদয়—আকবরকে কোল হইতে নামাইয়া আস্গরকে কোলে লইল—কত সহ্য হয়? পুত্রশোকে আকুলা আছেন,— কিছুক্ষণ পরে সর্ব্বস্বধন হোসেনের ছিন্ন মস্তক (শত্রু উপহার পাঠাইল) পাইলেন. তাই দেখিতেছেন, ইতোমধ্যে (হোসেনের কন্যা) বালিকা ফাতেমা পিতার মাথা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল, শহরবানু তাহার জন্য সান্ত্বনার উপায় খুঁজিতেই ছিলেন—ফাতেমার শ্বাসরোধ হইল! ক্ষুধায়

পারে নাই—যেমন রক্তপাত হইয়াছে, অমনি পিপাসু মরুভূমি তাহা শুষিয়া লইয়াছে! সেই শোণিত-রেখায় লেখা—"পিপাসা, পিপাসা"!

নবীন যুবক আলী আকবর (হোসেনের পুত্র) যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পিতার নিকট পিপাসা জানাইতে আসিয়া কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন—"আল্‌-আৎশ! আল্‌-আৎশ!!" (পিপাসা, পিপাসা!) ঐ দেখ, মহাত্মা হোসেন স্বীয় রসনা পুত্রকে চুষিতে দিলেন, যদি ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র তৃপ্তি হয়! কিন্তু তৃপ্তি হইবে কি,—সে রসনা যে শুষ্ক—নিতান্ত শুষ্ক! যেন দিক দিগন্তর হইতে শব্দ আসিল,—"পিপাসা পিপাসা"!

মহাত্মা হোসেন শিশুপুত্র আলী আস্‌গরকে কোলে লইয়া জল প্রার্থনা করিতেছেন! তাঁহার কথা কে শুনে? তিনি দীন নয়নে আকাশপানে চাহিলেন,—আকাশ মেঘশূন্য নির্ম্মল,— নিতান্তই নির্ম্মল! তিনি নিজের কষ্ট,—জল পিপাসা অম্লান বদনে সহিতেছেন। পরিজনকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়াছেন। সকিনা প্রভৃতি বালিকারা জল চাহে না—তাহারা

পিপাসায় কাতরা বালিকা কত সহিবে? হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিল! শহরবানু এখন সকিনার অশ্রু মুছাইবেন, না ফাতেমাকে কোলে লইবেন?

আহা! এত যে কেহই সহিতে পারিবে না! আমার শোকসন্তপ্তা পুত্র-শোকাতুরা ভগিনীগণ তোমরা একবার শহরবানু ও জয়নবের শোকরাশির দিকে দৃষ্টিপাত কর। তোমরা একজনের শোকেই বিহ্বল হও —দশদিক অন্ধকার দেখ! আর এ যে শোকসমূহ! আঘাতের উপর আঘাত। তোমরা এক সময় এক জনের বিরহে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পার, তাঁহাদের সে অবসর ছিল না! এক জয়নব কি করিবেন বল, নিজের পুত্রের জন্য কাঁদিবেন, না প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রদের দিকে চাহিবেন, না সব ছাড়িয়া ভ্রাতা হোসেনের ক্ষত ললাটখানি অশ্রুধারায় ধুইবেন? সেখানে অশ্রু ব্যতীত আর জল ত ছিল না!

বীরহৃদয়! একবার হোসেনের বীরতা সহিষ্ণুতা দেখ! ঐ দেখ, তিনি নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া—আর কোন যোদ্ধা নাই, সকলে সমরশায়ী, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি একা। তিনি কোন মতে পথ পরিষ্কার করিয়া নদী পর্য্যন্ত গিয়াছেন। ঐ দেখ অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিলেন, বুঝি পান করেন; না, পান ত করিলেন না!—যে জলের জন্য আস্‌গর তাঁহারই কোলে প্রাণ হারাইয়াছে, আকবর তাঁহার রসনা পর্য্যন্ত চুষিয়াছেন—সেই জল তিনি পান করিবেন? না,—তিনি জল তুলিয়া দেখিলেন, ইচ্ছা করিলে পান করিতে পারেন। কিন্তু তাহা না করিয়া নদীর জল নদীতেই নিক্ষেপ করিলেন! বীরের উপযুক্ত কাজ!!

*

মহরমের সময় সুন্নি-সম্প্রদায় শিয়াদলে আমোদের জন্য যোগ দেয় না। একথা যে বলে, তাহার ভুল, -শোচনীয় ভুল। আলী ও তদীয় বংশধরগণ উভয় সম্প্রদায়েরই মান্য ও আদরণীয়। তাঁহাদের শোচনীয় মৃত্যু স্মরণ সময়ে কোন্ প্রাণে সুন্নিগণ আমোদ করিবে? আমোদে করে বালকদল, সহৃদয় সুন্নিদল মহরমকে উৎসব বলে না।

শিয়াদের বাহ্য আড়ম্বর সুন্নিগণ ভাল মনে করেন না। বক্ষে করাঘাত করিলে বা শোক-বস্ত্র পরিধান করিলেই যে শোক করা হইল, সুন্নিদের এরূপ বিশ্বাস নহে। মতভেদের কথা এই যে, শিয়াগণ হজরতা আয়ষা—ফাতেমার বিমাতা সিংহাসন আলীকে না দিয়া মোয়াবীয়াকে দিয়াছেন বলিয়া আয়ষাকে নিন্দা করে। আমরা আয়ষার (আলীর সৎশাশুড়ী হওয়া ব্যতীত আর) কোন দোষ দেখি না। চতুর্থ খলিফা কে হইবেন, ধর্ম্মগুরু মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার নাম স্পষ্ট না বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। সে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি মোয়াবীয়া কিম্বা আলী তাঁহারা উভয়ে একই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাই মতভেদ হইল। কেহ বলিল "চতুর্থ খলিফা মোয়াবীয়া," কেহ বলিল "আলী"।

আয়ষা হিংসা করিয়া বলেন নাই, সিংহাসন মোয়াবীয়া পাইবেন। তিনি ঐ অনুমানের কথাই বলিয়াছিলেন মাত্র। সুন্নিগণ মাননীয়া আয়ষার নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না। শিয়া সুন্নিতে এইটুকু কথার মতভেদ। এই বিষয় লইয়াই দলাদলি।

বুঝে, জল দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আস্‌গর বুঝে না—সে দুগ্ধপোষ্য শিশু, নিতান্ত অজ্ঞান। অনাহারে জলাভাবে মাতার স্তন্য শুকাইয়া গিয়াছে— শিশু পিপাসায় কাতর।

শহরবানু (হোসেনের স্ত্রী) অনেক যন্ত্রণা নীরবে সহিয়াছেন— আজ আস্‌গরের যাতনা তাঁহার অসহ্য ! তিনি অনেক বিনয় করিয়া হোসেনের কোলে শিশুকে দিয়া জল প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, —"আর কেহ জল চাহে না ; কেবল এই শিশুকে একটু জল পান করাইয়া আন। শক্র যেন ইহাকে নিজ হাতে জল পান করায়,—জলপাত্রটা যেন তোমার হাতে নাই দেয় ! !"

মহাত্মা হোসেন স্ত্রীর কাতরতা এবং শিশুর দুরবস্থা দেখিয়া জল প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাতরস্বরে বলিলেন, "আমি বিদেশী পথিক, তোমাদের অতিথি, আমার প্রতি যত ইচ্ছা অত্যাচার কর, সহিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ শিশু তোমাদের নিকট কোন দোষে দোষী নহে। পিপাসায় ইহার প্রাণ ওষ্ঠাগত—একবিন্দু জল দাও ! ইহাতে তোমাদের দয়াধর্ম্মের কিছুমাত্র অপব্যয় হইবে না !" শক্রগণ কহিল, "বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, —শীঘ্র কিছু দিয়া বিদায় কর।"

বিপক্ষ হইতে শিশুর প্রতি জলের পরিবর্ত্তে তীর বৃষ্টি হইল ! !

"পিয়াস লাগিয়া জলদে সাধিনু
বজর পড়িয়া গেল।"

উপযুক্ত অতিথি-অভ্যর্থনা বটে ! হোসেন শর-বিদ্ধ আস্‌গরকে তাহার জননীর কোলে দিয়া বলিলেন, "আস্‌গর চিরদিনের জন্য তৃপ্ত হইয়াছে ! আর জল জল বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদাইবে না ! আর বলিবে না—'পিপাসা, পিপাসা' ! এই শেষ !"

*

শহরবানু কি দেখিতেছেন? কোলে পিপাসু শর-বিদ্ধ আস্‌গর, সম্মুখে রুধিরাক্ত কলেবর "শহীদ" (সমরশায়ী) আকবর ! অমন চাঁদ কোলে লইয়া ধরণী গরবিণী হইয়াছিল— যে আকবর ক্ষতবিক্ষত হইয়া, পিপাসায় কাতর হইয়া মৃত্যুকালে এক বিন্দু জল পায় নাই ! শোণিত-ধারায় যেন লেখা আছে "পিপাসা, পিপাসা" ! শহীদের মুদ্রিত নয়ন দুটি নীরবেই বলে যেন "পিপাসা, পিপাসা" ! ! দৃশ্য ত এইরূপ মর্ম্মভেদী তাহাতে আবার দর্শক জননী !— আহা ! !

যে ফুল ফুটিত প্রাতে,—নিশীথেই ছিন্ন হ'ল,
শিশিরের পরিবর্ত্তে রুধিরে আপ্লুত হ'ল !

আরও দেখিলাম,—মহাত্মা হোসেন সমরশায়ী। সমরক্ষেত্রে কেবলই পিপাসী শহীদগণ পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের শুষ্ক কণ্ঠ যেন অস্ফুট ভাষায় বলিতেছে "পিপাসা, পিপাসা" ! জয়নব (হোসেনের ভগিনী) মুক্ত কেশে পাগলিনী প্রায় ভ্রাতার নিকট বিদায় চাহিতেছেন। ডাকিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতেছেন,— "ভাই ! তোমাকে মরুভূমে ফেলিয়া যাইতেছি ! আসিয়াছিলাম তোমার সঙ্গে,—যাইতেছি তোমাকে ছাড়িয়া ! আসিয়াছিলাম অনেক রত্নে

বিভূষিত হইয়া—যাইতেছি শূন্য হৃদয়ে! তবে এখন শেষ বিদায় দাও! একটি কথা কও, তবে যাই! একটিবার চক্ষু মেলিয়া দেখ—আমাদের দুরবস্থা দেখ, তবে যাই!" জয়নবের দুঃখে সমীরণ হায় হায় বলিল,—দূর দূরান্তরে ঐ হায় হায় শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল!

*

এখন আর স্বপ্ন নাই—আমি জাগিয়া উঠিয়াছি। দূরে শৃগালের কর্কশ শব্দে শুনিলাম— "পিপাসা, পিপাসা"! একি, আমি পাগল হইলাম নাকি? কেবল "পিপাসা" দেখি কেন। কেবল "পিপাসা" শুনি কেন?

আমার প্রিয়তমের সমাধিস্থানে যাইলাম। বনপথ দিয়া যাইতে শুনিলাম, তরুলতা বলে "পিপাসা, পিপাসা"! পত্রের মর্ম্মর শব্দে শুনিলাম "পিপাসা, পিপাসা"! প্রিয়তমের গোর হইতে শব্দ আসিতেছিল—"পিপাসা, পিপাসা"! ইহা অতি অসহ্য! প্রিয়তম মৃত্যুকালে জল পায় নাই—চিকিৎসকের নিষেধ ছিল। সুতরাং পিপাসী মরিয়াছে।

আহা! এমন ডাক্তারী কে রচনা করিয়াছেন? রোগীর প্রতি (রোগ বিশেষে) জল-নিষেধ ব্যবস্থা কোন্ হৃদয়হীন পাষাণের বিধান? যখন রোগীকে বাঁচাইতে না পার, তখন প্রাণ ভরিয়া পিপাসা মিটাইয়া জল পান করিতে দিও। সে সময় ডাক্তারের উপদেশ শুনিও না। নচেৎ আমারই মত আজীবন পিপাসায় দগ্ধ হইবে।

কোন রোগী মৃত্যুর পূর্ব্বদিন বলিয়াছিল, "বাবাজান! তোমারই সোরাহির জল দাও।" রোগী জানে, তাহার পিতার সোরাহির জল অবশ্যই শীতল হইবে। পিতা তাহার আসন্নকাল জানিয়া স্বহস্তে সোরাহি আনিয়া দিলেন। অন্যান্য মিত্ররূপী শত্রুগণ তাহাকে প্রচুর জল সাধ মিটাইয়া পান করিতে দেয় নাই। ঐ রোগীর আত্মা কি আজ পর্য্যন্ত কারবালার শহীদদের মত "পিপাসা, পিপাসা" বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় না? না; স্বর্গসুখে পিপাসা নাই! পিপাসা—যে বাঁচিয়া থাকে,—তাহারই! অনন্ত শান্তি নিদ্রায় যে নিদ্রিত হইয়াছে, পিপাসা তাহার নহে! পিপাসা—যে পোড়া স্মৃতি লইয়া জাগিয়া থাকে,—তাহারই!!

কিন্তু কি বলিতে কি বলিতেছি,—আমার হৃদয়ানন্দ মৃত্যুর পূর্ব্বদিন গোপনে জননীর নিকট জল চাহিয়াছিল। ডাক্তারের নিষেধ ছিল বলিয়া কেহ তাহাকে জল দিত না। জননী ভয়ে ভয়ে অল্প জল দিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে সে তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর ও অধীর হইয়াছিল— হায়! না জানি সে কেমন পিপাসা!

হৃদয়ানন্দ জানিত, আমি তাহাকে জল দিব না। আমি চিকিৎসকের অন্ধ আজ্ঞাবহ দাস, তাহাকে জল দিব না। তাই সে আমার উপস্থিত থাকা সময় জল চাহিতে সাহস করে নাই! কি মহতী সহিষ্ণুতা! জলের পরিবর্ত্তে চা চাহিল। শীতল জলের পিপাসায় গরম চা!! চা তখনই প্রস্তুত হইয়া আসিল। যে ব্যক্তি চা পান করাইতেছিল, সে চা'র পেয়ালার কড়া ধরিতে পারিতেছিল না—পেয়ালা এত তপ্ত ছিল। আর সেই পিপাসী সে পেয়ালাটি দুই হস্তে (যেন কত আদরের সহিত জড়াইয়া) ধরিয়া চা পান করিতে লাগিল!! আহা! না জানি সে কেমন পিপাসা!! অনলরচিত পিপাসা!! কিম্বা গরলরচিত পিপাসা!!!

সে সময় হয় ত তাহার শরীরে অনুভব শক্তি ছিল না,—নচেৎ অত গরম পেয়ালা ও কোমল হস্তে সহিবে কেন? আট বৎসরের শিশু—ননীর পুতুল, তাহার হাতে গরম পেয়ালা !—আর সেই তপ্ত চা—স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে নিশ্চয় গলায় ফোস্কা হইত ! আর ঐ মাখন-গঠিত কচি হাত দুটি জ্বলিয়া গলিয়া যাইত ! ! সেই চা তাহার শেষ পথ্য—আর কিছু খায় নাই।

আক্ষেপ এই যে, জল কেন দিলাম না। রোগ সারিবার আশায় জল দিতাম না।—রোগ যদি না সারিল, তবে জল কেন দিলাম না? এই জন্যই ত রাত্রি দিন শুনি,—"পিপাসা, পিপাসা" ! ঐ জন্যই ত এ নরকযন্ত্রণা ভোগ করি। আর সেই গরম চা'র পেয়ালা চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়, হৃদয়ে আঘাত করে, প্রাণ দগ্ধ করে ! চক্ষু মুদ্রিত করিলে দেখি—অন্ধকারে জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে লেখা—"পিপাসা, পিপাসা" !

নিশীথ সময়ে গৃহছাদে উঠিলাম। আকাশমণ্ডল পরিষ্কার ছিল কোটী কোটী তারকা ও চন্দ্র হীরক প্রভায় জ্বলিতেছিল। আমার পোড়া চক্ষে দেখিলাম—ঐ তারকা-অক্ষরে লেখা—"পিপাসা, পিপাসা" ! আমি নিজের পিপাসা লইয়া ব্যস্ত, তাহাতে আবার বিশ্বচরাচর পিপাসা দেখায়—পিপাসা শুনায় ! বোধ হয় নিজের পিপাসার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই মাত্র,—আর কেহ পিপাসী নহে। অথবা এ বিশ্বজগৎ সত্যই পিপাসু !

কুসুমকাননে আমি কি দেখিতে পাই? কুসুম হেলিয়া দুলিয়া বলে "পিপাসা, পিপাসা" লতায় পাতায় লেখা—"পিপাসা, পিপাসা" ! কুসুমের মনোমোহিনী মৃদু হাসি আমি দেখি না। আমি দেখি, কুমুদের সুধাংশু-পিপাসা।

বিহগ-কূজনে আমি কি শুনিতে পাই? ঐ "পিপাসা, পিপাসা" ! ঐ একই শব্দ নানাসুরে নানারাগে শুনি,—প্রভাতে ভৈরবী, নিশীথে বেহাগ—কিন্তু কথা একই। চাতক পিপাসায় কাতর হইয়া ডাকে—"ফটিক জল" ! কোকিল ডাকিয়া উঠে "কুহু" ঐ কুহুস্বরে শত প্রাণের বেদনা ও হৃদয়ের পিপাসা ঝরে ! এ কি, সকলে আমাকে পিপাসার ভাষা শুনায় কেন? আহা ! আমি কোথায় যাই? কোথায় যাইলে "পিপাসা" শুনিব না?

চল হৃদয়, তবে নদী তীরে যাই,—সেইখানে হয় ত "পিপাসা" নাই। কিন্তু ঐ শুন ! স্নিগ্ধসলিলা গঙ্গা কুলকুল স্বরে গাহিতেছে। "পিপাসা, পিপাসা" আপন মনে গাহিয়া বহিয়া যাইতেছে ! একি তুমি স্বয়ং জল, তোমার আবার পিপাসা কেমন? উত্তর পাইলাম, "সাগর-পিপাসা"। আহা ! তাই ত, সংসারে তবে সকলেই পিপাসু? হইতে পারে, সাগরের—যাহার চরণে, জাহ্নবি ! তুমি আপনার প্রাণ ঢালিতে যাইতেছে, তাহার পিপাসা নাই। তবে দেখা যাউক।

একদিন সিন্ধুতটে সিক্ত বালুকার উপর বসিয়া সাগরের তরঙ্গ গণনা করিতেছিলাম। ঊর্ম্মিমালা কি যেন যাতনায়, কি যেন বেদনায় ছটফট করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া আছাড়িয়া পড়িতেছিল। এ অস্থিরতা, এ আকুলতা কিসের জন্য? সবিস্ময়ে সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলাম :

তব ওই সচঞ্চল লহরীমালায়
কিসের বেদনা লেখা?—পিপাসা জানায় !

পিপাসা নিবৃত্ত হয় সলিল-কৃপায়,
বল হে জলধি ! তব পিপাসা কোথায় ?

আবার তাহার গভীর গর্জ্জনে শুনিলাম, “পিপাসা, পিপাসা” ! হায় ! এই পোড়া পিপাসার জ্বালায় আমি দেশান্তরে পলাইয়া আসিলাম, এখানেও ঐ নিষ্ঠুর কথাই শুনিতে পাই। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম—ঐ তরঙ্গে তরঙ্গে আর পিপাসা দেখিতে ইচ্ছা ছিল না। সমুদ্র আবার গম্ভীর গর্জ্জন করিল। এবারও তাহার ভাষা বুঝিলাম,—স্পষ্ট শুনিলাম,—“পিপাসা, পিপাসা” ! !

“পিপাসা পিপাসা”—মূর্খ মানব ! জান না এ কিসের পিপাসা ? কোথায় শুনিয়াছ সাগরের পিপাসা নাই ? এ হৃদয়ের দুর্দ্দান্ত পিপাসা কেমন করিয়া দেখাইব ? আমার হৃদয় যত গভীর, পিপাসাও তত প্রবল ! এ সংসারে কাহার পিপাসা নাই ? পিপাসা পিপাসা—এইটুকু বুঝিতে পার না ? ধনীর ধন-পিপাসা, মানীর মান-পিপাসা, সংসারীর সংসার-পিপাসা। নলিনীর তপন-পিপাসা, চকোরীর চন্দ্রিকা-পিপাসা ! অনলেরও তীব্র পিপাসা আছে ! আহা ! এই মোটা কথা বুঝ না ? পিপাসা না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিত কি লক্ষ্য করিয়া ? আমার হৃদয়ে অনন্ত প্রণয়-পিপাসা,—যতদিন আছি, পিপাসাও থাকিবে ! প্রেমিকের প্রেম-পিপাসা,—প্রকৃতির ঈশ্বর-পিপাসা ! এইটুকু কি বুঝিতে পার না ? * * * ”

তাই বটে, এত দিনে বুঝিলাম, আমার হৃদয় কেন সদা হু হু করে, কেন সদা কাতর হয়। এ হৃদয়ের পিপাসা তুচ্ছ বারি পিপাসা নহে। ইহা অনন্ত প্রেম-পিপাসা। ঈশ্বর একমাত্র বাঞ্ছনীয়, আর সকলে পিপাসী—ঐ বাঞ্ছনীয় প্রেমময়ের প্রেম-পিপাসী ! !

আমি তবে বাতুল নহি। আমি যে পিপাসা দেখি, তাহা সত্য— কল্পিত নহে ! আমি যে পিপাসা শুনি, তাহাও সত্য—কল্পনা নহে ! ঈশ্বর প্রেম, এ বিশ্বজগৎ প্রেম-পিপাসু।

স্ত্রীজাতির অবনতি

পাঠিকাগণ ! আপনারা কি কোন দিন আপনাদের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন ? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমরা কি ? দাসী ! পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি ? না। আমরা দাসী কেন ?—কারণ আছে।[১]

আদিমকালের ইতিহাস কেহই জানে না বটে ; তবু মনে হয় যে পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোন অজ্ঞাত

---

১. কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে, নারী নরের অধীন থাকিবে, ইহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত—তিনি প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তাহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত নারীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এস্থলে আমরা ধর্ম্মগ্রন্থের কোন মতামত লইয়া আলোচনা করিব না-কেবল সাধারণের সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাই বলিব। অর্থাৎ স্বকীয় মত ব্যক্ত করিতেছি মাত্র।

কারণ বশতঃ মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানাবিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্ম্মিণী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।

আমাদের এ বিশ্বব্যাপী অধঃপতনের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি? সম্ভবতঃ সুযোগের অভাব ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতি সুবিধা না পাইয়া সংসারের সকল প্রকার কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছে। এবং ইহাদিগকে অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য দেখিয়া পুরুষজাতি ইহাদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল! ক্রমে পুরুষ পক্ষ হইতে যতই বেশী সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল, স্ত্রী-পক্ষ ততই অধিকতর অকর্ম্মণ্য হইতে লাগিল। এদেশের ভিক্ষুদের সহিত আমাদের বেশ তুলনা হইতে পারে। একদিকে ধনাঢ্য দানবীরগণ ধর্ম্মোদ্দেশ্যে যতই দান করিতেছেন, অন্যদিকে ততই অধম ভিক্ষুসংখ্যা বাড়িতেছে! ক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অলসদের একটা উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর তাহারা ভিক্ষা গ্রহণ করাটা লজ্জাজনক বোধ করে না।

ঐরূপ আমাদের আত্মাদর লোপ পাওয়ায় আমরাও অনুগ্রহ গ্রহণে আর সঙ্কোচ বোধ করি না। সুতরাং আমরা আলস্যের,—প্রকারান্তরে পুরুষের—দাসী হইয়াছি। ক্রমশঃ আমাদের মন পর্য্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে। এবং আমরা বহু কাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে আমাদের স্বাবলম্বন, সাহস প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলি অনুশীলন অভাবে বারবার অঙ্কুরে বিনাশ হওয়ায় এখন আর বোধ হয় অঙ্কুরিতও হয় না। কাজেই পুরুষজাতি বলিতে সুবিধা পাইয়াছেন :

"The five worst maladies that afflict the female mind are : indocility, discontent, slander, jealousy and silliness... such is the stupidity of her character, that it is incumbent on her, in every particular, to distrust herself and to obey her husband." (Japan, the Land of the Rising Sun)

(ভাবার্থ—স্ত্রীজাতীর অন্তঃকরণের পাঁচটি দুরারোগ্য ব্যাধি এই—[কোন বিষয় শিক্ষার] অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা এবং মূর্খতা। . . . নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক বিষয়ে নিজেকে অবিশ্বাস করিয়া স্বামীর আদেশ পালন করে)।

তারপর কেহ বলেন "অতিরঞ্জন ও মিথ্যা বচন রমণী-জিহ্বার অলঙ্কার!" আমাদিগকে কেহ "নাকেস-উল্-আকেল" এবং কেহ "যুক্তিজ্ঞানহীন" (unreasonable) বলিয়া থাকেন। আমাদের ঐ সকল দোষ আছে বলিয়া তাঁহারা আমাদিগকে হেয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। একটা উদাহরণ দেখুন। এদেশে জামাতা খুব আদরণীয়—এমনকি ডাইনীও জামাই ভালবাসে। তবু "ঘরজামাইয়ের" সেরূপ আদর হয় না। তাই দেখা যায়, আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্ঞান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থ্যটুকুও থাকিল না, তখন কাজেই তাঁহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে হইতে ক্রমে আমাদের "স্বামী" হইয়া উঠিলেন![২] আর আমরা ক্রমশঃ তাঁহাদের গৃহপালিত পশু পক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান্ সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি!

---

২. "Although the Japanese wife is considered only the *first servant of her husband,* she is usually addressed in the house as the honorable mistress" "acquaintance with European

সভ্যতা ও সমাজবন্ধনের সৃষ্টি হইলে পর সামাজিক নিয়মগুলি অবশ্য সমাজপতিদের মনোমত হইল! ইহাও স্বাভাবিক। "জোর যার মুলুক তার"। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অবনতির জন্য কে দোষী?

আর এই যে আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি—এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ! এখন ইহা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন (originally badges of slavery) ছিল।[৩] তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দীগণ পায় লৌহনির্ম্মিত বেড়ী পরে, আমরা (আদরের জিনিষ বলিয়া) স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ "মল" পরি। উহাদের হাতকড়ী লৌহ-নির্ম্মিত, আমাদের হাতকড়ী স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্ম্মিত চুড়ি! বলা বাহুল্য, লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না! কুকুরের গলে

---

customs has awakened among the more educated classes in Japan a desire to raise the position of women." (Japan.)

ভাবার্থ —(যদিও জাপানে স্ত্রীকে স্বামীর প্রধানা সেবিকা মনে করা হয় কিন্তু সচরাচর তাহাকে গৃহস্থিত অপর সকলে মাননীয়া গৃহিণী বলিয়া ডাকে। যাহা হউক আশা ও সুখের বিষয় এই যে এখন ইউরোপীয় রীতি নীতির সহিত পরিচিত শিক্ষিত সমাজে ক্রমশঃ রমণীর অবস্থা উন্নত করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতেছে।

"দাসী" শব্দে অনেক শ্রীমতী আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, "স্বামী" শব্দের অর্থ কি? দানকর্ত্তাকে "দাতা" বলিলে যেমন গ্রহণ কর্ত্তাকে "গ্রহীতা" বলিতেই হয়, সেইরূপ একজনকে "স্বামী, প্রভু, ঈশ্বর" বলিলে অপরকে "দাসী" না বলিয়া আর কি বলিতে পারেন? যদি বলেন স্ত্রী পতি-প্রেম-পাশে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার সেবিকা হইয়াছেন, তবে ওরূপ সেবাব্রত গ্রহণে অবশ্য কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু পুরুষও কি ঐরূপ পারিবারিক প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতিপালনরূপ সেবাব্রত গ্রহণ করেন নাই? দরিদ্রতম মজুরটিও সমস্ত দিন অনশনে পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় দুই এক আনা পয়সা পারিশ্রমিক পাইলে বাজারে গিয়া প্রথমে নিজের উদর-সেবার জন্য দুই পয়সার মুড়ি মুড়কীর শ্রাদ্ধ করে না। বরং তদ্দ্বারা চাউল ডাউল কিনিয়া পত্নীকে আনিয়া দেয়। পত্নীটি রন্ধনের পর "স্বামী"কে যে "একমুঠা—আধপেটা" অন্নদান করে, পতি বেচারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়। কি চমৎকার আত্মত্যাগ! সমাজ তবু বিবাহিত পুরুষকে "প্রেম-দাস" না বলিয়া স্বামী বলে কেন?

হাঁ, আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়িল; যে সকল দেবী স্ত্রীকে "দাসী" বলায় আপত্তি করেন এবং কথায় কথায় সীতা সাবিত্রীর দোহাই দেন তাঁহারা কি জানেন না যে, হিন্দুসমাজেই এমন এক (বা ততোধিক) শ্রেণীর কুলীন আছেন, যাঁহারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন? যাহাকে অর্থ দ্বারা "ক্রয়" করা হয়, তাহাকে "ক্রীতদাসী" ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন? এস্থলে বরদিগের পাশবিক্রয়ের কথা কেহ উল্লেখ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সাধারণে "বর বিক্রয় হয়" এরূপ বলেন না। বিশেষতঃ বরের পাশই বিক্রয় হয়, স্বয়ং বর বিক্রীত হন না। কিন্তু কন্যা বিক্রয়ের কথায় এ যুক্তি খাটে না; কারণ অষ্টম হইতে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার এমন বিশেষ কোন গুণ বা "পাশ" থাকে না, যাহা বিক্রয় হইতে পারে। সুতরাং বালিকা স্বয়ং বিক্রীতা হয়!! একদা কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণীর সহিত আলাপ প্রসঙ্গে ঐ কথা উঠায়, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "কেন ওঁদের সমকক্ষ কুলীন কি পাওয়া যায় না যে মেয়ে কিনতে হয়?" তদুত্তরে মহিলাটি বলিয়াছিলেন, "পাওয়া যাবে না কেন? ওদের ঐ কেনা ব্যাচাই নিয়ম। এ যেমন ওর বোন কিনে বিয়ে ক'রলে, আবার এর বোনকে আর একজনে কিনে নিয়ে বিয়ে ক'রবে।"

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম বা বিশেষ কোন দোষের উল্লেখ করিবার আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কুতার্কিকদিগের কুতর্ক নিবারণের নিমিত্ত এইরূপ **ক্রীতদাসী ওরফে দেবীর** প্রমাণ দিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য আমরা নিজেই দুঃখিত। কিন্তু কর্ত্তব্য অবশ্য পালনীয়।

৩. পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক শম্স্-উল্-ওলামা (জাকাউল্লা সাহেব) বলেন "**নথ নাকেল্** এর (নাকাদড়ীর)ই রূপান্তর!"

যে গলাবন্ধ (dogcollar) দেখি, উহারই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্ম্মিত হইয়াছে! অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণ-শৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি "হার পরিয়াছি"। গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাকাদড়ী" পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে "নোলক" পরাইয়াছেন!! ঐ নোলক হইতেছে "স্বামী"র অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন! অতএব দেখিলেন ভগিনি! আপনাদের ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আবার মজা দেখুন, যাঁহার শরীরে দাসত্বের নিদর্শন যত অধিক, তিনি সমাজে ততোধিক মান্যা গণ্যা!

এই অলঙ্কারের জন্য ললনাকুলের কত আগ্রহ! যেন জীবনের সুখ সমৃদ্ধি উহারই উপর নির্ভর করে! তাই দরিদ্রা কামিনীগণ স্বর্ণরৌপ্যের হাতকড়ী না পাইয়া কাচের চুড়ি পরিয়া দাসী-জীবন সার্থক করে। যে (বিধবা) চুড়ি পরিতে অধিকারিণী নহে, তাহার মত হতভাগিনী যেন এ জগতে আর নাই! অভ্যাসের কি অপার মহিমা! দাসত্বে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া দাসত্বসূচক গহনাও ভাল লাগে। অহিফেন তিক্ত হইলেও আফিংচির অতি প্রিয় সামগ্রী। মাদক দ্রব্যে যতই সর্ব্বনাশ হউক না কেন, মাতাল তাহা ছাড়িতে চাহে না। সেইরূপ আমরা অঙ্গে দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিয়াও আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করি—গর্ব্বে স্ফীতা হই!

অলঙ্কার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে কোন কোন ভগ্নী আমাকে পুরুষপক্ষেরই গুপ্তচর মনে করিতে পারেন। অর্থাৎ ভাবিবেন যে, আমি পুরুষদের টাকা স্বর্ণকারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য হয়ত এরূপ কৌশলে ভগ্নীদিগকে অলঙ্কারে বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহা নয়, আমি আপনাদের জন্যই দু'কথা বলিতে চাই। যদি অলঙ্কারের উদ্দেশ্য পুরুষদের টাকার শ্রাদ্ধ করাই হয়, তবে টাকার শ্রাদ্ধ করিবার অনেক উপায় আছে। দুই একটি উপায় বলিয়া দিতেছি।

আপনার ঐ জড়োয়া চিকটা বাড়ীর আদুরে কুকুরটির কণ্ঠে পরাইবেন। আপনি যখন শকটারোহণে বেড়াইতে যান, তখন সেই শকটবাহী অশ্বের গলে আপনার বহুমূল্য হার পরাইতে পারেন! বালা ও চুড়িগুলি বসিবার ঘরের পর্দ্দার কড়া (drawing room-এর curtain ring) রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবেই "স্বামী" নামধারী নরবরের টাকার বেশ শ্রাদ্ধ হইবে!! অলঙ্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য্য দেখান বই ত নয়। ঐরূপে ঐশ্বর্য্য দেখাইবেন। নিজের শরীরের দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিবেন কেন? উক্ত প্রকারে গহনার সদ্ব্যবহার করিলে প্রথম প্রথম লোকে আপনাকে পাগল বলিবে, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিলেই চলিবে।[৪] এ পোড়া সংসারে কোন্ ভাল কাজটা বিনা ক্লেশে সম্পাদিত হইয়াছে? "পৃথিবীর গতি আছে" এই কথা বলাতে মহাত্মা গ্যালিলিও (Galileo)কে বাতুলাগারে যাইতে হইয়াছিল। কোন্ সাধুলোকটি অনায়াসে নিজ বক্তব্য বলিতে পারিয়াছেন? তাই বলি, সমাজের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। এ জগতে ভাল কথা বা ভাল কাজের বর্ত্তমানে আদর হয় না।

---

৪. অলঙ্কার পরা ও উক্তরূপে টাকার শ্রাদ্ধ করা একই কথা। কিন্তু আশা করা যায় যে উক্ত প্রকারে টাকার শ্রাদ্ধ না করিয়া টাকার সদ্ব্যয় করাই অনেকে ন্যায়সঙ্গত মনে করিবেন।

বাস্তবিক অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি অলঙ্কারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্ব্বলতা নহে? পুরুষেরা ইহা পরাজয়ের নিদর্শন ভাবেন। তাঁহারা কোন বিষয় তর্ক করিতে গেলে বলেন, "আমার কথা প্রমাণিত করিতে না পারিলে আমি চুড়ি পরিব"! কবিবর সা'দী পুরুষদের উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছেন, "আয় মরদাঁ বকুশিদ, জামা-এ-জানাঁ ন পুষিদ্"! অর্থাৎ "হে বীরগণ! (জয়ী হইতে) চেষ্টা কর, রমণীর পোষাক পরিও না।" আমাদের পোষাক পরিলে তাহাদের অপমান হয়! দেখা যাউক সে পোষাকটা কি,—কাপড় ত তাঁহাদের ও আমাদের প্রায় একই প্রকার। একখণ্ড ধূতি ও একখণ্ড সাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কিছুমাত্র তারতম্য আছে কি? যে দেশে পুরুষ পা-জামা পরে, সে দেশে নারীও পা-জামা পরে। "Ladies's jacket" শুনা যায়, "Gentlemen's jacket" ও শুনিতে পাই! তবে "জামা-এ-জানাঁ" বলিলে কাপড় না বুঝাইয়া সম্ভবতঃ রমণীসুলভ দুর্ব্বলতা বুঝায়।

পুরুষজাতি বলেন যে, তাঁহারা আমাদিগকে "বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া" রাখিয়াছেন, এবং এরূপ সোহাগ আমরা সংসারে পাইব না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাই সোহাগে গলিয়া—ঢলিয়া বহিয়া যাইতেছি! ফলতঃ তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয়-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান-সূর্য্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ক্রমশঃ মরিতেছি। তাঁহারা আরও বলেন, "তাহাদের সুখের সামগ্রী, আমরা মাথায় বহিয়া আনিয়া দিব—আমরা থাকিতে তাহারা দুঃখ সহ্য করিবে কেন?" আমরা ঐ শ্রেণীর বক্তাকে তাঁহাদের অনুগ্রহপূর্ণ উক্তির জন্য ধন্যবাদ দিই; কিন্তু ভ্রাতঃ! পোড়া সংসারটা কেবল কবির সুখময়ী কল্পনা নহে—ইহা জটিল কুটিল কঠোর সংসার! সত্য বস্তু—কবিতা নহে :

"কাব্য উপন্যাস নহে—এ মম জীবন,
নাট্যশালা নহে—ইহা প্রকৃত ভবন"—

তাই যা কিছু মুষ্কিল!! নতুবা আপনাদের কৃপায় আমাদের কোন অভাব হইত না। বঙ্গবালা আপনাদের কল্পিত বর্ণনা অনুসারে "ক্ষীণাঙ্গী, কোমলাঙ্গী, অবলা, ভয়-বিহ্বলা—" ইত্যাদি হইতে হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম শরীর (Aerial body) প্রাপ্ত হইয়া বাষ্পরূপে অনায়াসে আকাশে বিলীন হইতে পারিতেন!! কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তদ্রূপ সুখের নহে; তাই এখন মিনতি করিয়া বলিতে চাই :

"অনুগ্রহ করে এই কর, অনুগ্রহ কর না মোদের।"

বাস্তবিক অত্যধিক যত্নে অনেক বস্তু নষ্ট হয়। যে কাপড় বহু যত্নে বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা উইএর ভোগ্য হয়। কবি বেশ বলিয়াছেন।

"কেন নিবে গেল বাতি?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে,
জাগিয়া বাসর রাতি,
তাই নিবে গেল বাতি।"

সুতরাং দেখা যায়, তাঁহাদের অধিক যত্নই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ।

বিপৎসঙ্কুল সংসার হইতে সর্ব্বদা সুরক্ষিতা আছি বলিয়া আমরা সাহস, ভরসা, বল একেবারে হারাইয়াছি। আত্মনির্ভর ছাড়িয়া স্বামীদের নিতান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য হইতে সামান্যতর বিপদে পড়িলে আমরা গৃহকোণে লুকাইয়া গগনভেদী আর্ত্তনাদে রোদন করিয়া থাকি ! ! ভ্রাতৃমহোদয়গণ আবার আমাদের "নাকি কান্নার" কথা তুলিয়া কেমন বিদ্রূপ করেন, তাহা কে না জানে? আর সে বিদ্রূপ আমরা নীরবে সহ্য করি। আমরা কেমন শোচনীয়রূপে ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, তাহা ভাবিলে ঘৃণায় লজ্জায় মৃতপ্রায় হই।[৫]

ব্যাঘ্র ভল্লুক ত দূরে থাকুক, আরসুলা জলৌকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গ দেখিয়া আমরা ভীতিবিহ্বলা হই ! এমনকি অনেকে মূর্চ্ছিতা হন ! একটি ৯/১০ বৎসরের বালক বোতলে আবদ্ধ একটি জলৌকা লইয়া বাড়ীশুদ্ধ স্ত্রীলোকদের ভীতি উৎপাদন করিয়া আমোদ ভোগ করে। অবলাগণ চীৎকার করিয়া দৌড়িতে থাকেন, আর বালকটি সহাস্যে বোতল হস্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এমন তামাসা আপনারা দেখেন নাই কি? আমি দেখিয়াছি— আর সে কথা ভাবিয়া ঘৃণায় লজ্জায় মরমে মরিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, সে সময় বরং

---

৫. সেদিন (গত ৯ই এপ্রিলের) একখানা উর্দ্দু কাগজে দেখিলাম :— তুরস্কের স্ত্রীলোকেরা সুলতান-সমীপে আবেদন করিয়াছেন যে, "চারি প্রাচীরের ভিতর থাকা ব্যতীত আমাদের আর কোন কাজ নাই। আমাদিগকে অন্ততঃ এ পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া হউক, যাহার সাহায্যে যুদ্ধের সময় আমরা আপন আপন বাটী এবং নগর পুরুষদের মত বন্দুক কামান দ্বারা রক্ষা করিতে পারি। তাঁহারা ঐ আবেদনে নিম্নলিখিত উপকারগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন :

(১) প্রধান উপকার এই যে নগরাদি রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি সৈন্য নিযুক্ত থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সংখ্যা কম হওয়ায় যে ক্ষতি হয়, তাহা আর হইবে না। (যেহেতু "অবলা"গণ নগর রক্ষা করিবেন !)

(২) সন্তানসন্ততিবর্গ শৈশব হইতেই যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত হইবে। পিতা মাতা উভয়ে সেপাহী হইলে শিশুগণ ভীরু, কাপুরুষ হইবে না।

(৩) তাঁহারা বিশেষ এক নমুনার উর্দ্দি (Uniform) প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে চক্ষু ও নাসিকা ব্যতীত মুখের অবশিষ্ট অংশ এবং সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ আবৃত থাকিবে।

(৪) অবরোধপ্রথার সম্মান রক্ষার্থে এই স্থির হইয়াছে যে, অন্ততঃ তিন বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক পরিবারের সৈনিক পুরুষেরা আপন আপন আত্মীয় রমণীদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিবেন। অতঃপর যুদ্ধশিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলাগণ যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য ঘরে ঘরে দেখা দিবেন। উক্ত মহিলাগণ ইহাও লিখিয়াছেন যে, "আমরা উর্দ্দির (Uniform এর) খরচের জন্য গবর্ণমেন্টকে কষ্ট দিব না। কেবল বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সরকার হইতে পাইতে আশা করি।" দেখা যাউক, সুলতান মহোদয় এ দরখাস্তের কি উত্তর দেন।

উপরোক্ত সংবাদ সত্য কি না, সেজন্য সেই পত্রিকাখানি দায়ী। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তুরস্ক-রমণীদের ওরূপ আকাঙ্ক্ষা হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। ইতিহাসে শুনা যায়, পূর্ব্বে তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন। একটা যেমন তেমন "মুসলমানী পুঁথি"র পাতা উল্টাইলেও আমরা দেখিতে পাই— (যুদ্ধ করিতে যাইয়া)—

"জয়গুণ নামে বাদশাহ্জাদী কয়েদ হইল যদি,
আর যত আরব্য সওয়ার" ইত্যাদি।

বলি, এদেশের যে সমাজপতিগণ "লেডীকেরাণী" হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে চমকাইয়া উঠেন (shocked হন)—যাঁহারা অবলার হস্তে পুতুল সাজান ও ফুলের মালা গাঁথা ব্যতীত আর কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যের ভার দেওয়ার কল্পনাই করিতে পারেন না, তাঁহারা ঐ লেডীযোদ্ধা হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে কি করিবেন? মূর্চ্ছা যাইবেন না ত?

আমোদ বোধ করিয়াছিলাম ; কিন্তু এখন সে কথা ভাবিলে শোণিত উত্তপ্ত হয়। হায় ! আমরা শারীরিক বল, মানসিক সাহস, সব কাহার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি? আর এই দারুণ শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিবার শক্তিও আমাদের নাই।

ভীরুতার চিত্র ত দেখাইলাম, এখন শারীরিক দুর্ব্বলতার চিত্র দেখাইব। আমরা এমন জড় "অচেতন পদার্থ" হইয়া গিয়াছি যে, তাঁহাদের গৃহসজ্জা (drawing room-এর ornament) বই আর কিছুই নহি। পাঠিকা ! আপনি কখন বেহারের কোন ধনী মুসলমান ঘরের বউ-ঝী নামধেয় জড়পদার্থ দেখিয়াছেন কি? একটি বধূবেগম সাহেবার প্রতিকৃতি দেখাই। ইঁহাকে কোন প্রসিদ্ধ যাদুঘরে (museum-এ) বসাইয়া রাখিলে রমণীজাতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইত। একটা অন্ধকার কক্ষে দুইটি মাত্র দ্বার আছে, তাহার একটি রুদ্ধ এবং একটি মুক্ত থাকে। সুতরাং সেখানে (পর্দার অনুরোধে?) বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যরশ্মির প্রবেশ নিষেধ। ঐ কুঠরীতে পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে যে রক্তবর্ণ বানাত মণ্ডিত তক্তপোষ আছে, তাহার উপর বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা, তাম্বুলরাগে রঞ্জিতাধরা, প্রসন্নাননা যে জড় পুত্তলিকা দেখিতেছেন, উহাই দুল্‌হিন্‌বেগম (অর্থাৎ বেগমের পুত্রবধূ)। ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে ১০২৪০ টাকার অলঙ্কার! শরীরের কোন্ অংশে কত ভরি সোণা বিরাজমান, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

১। মাথায় (সিঁথির অলঙ্কার) অর্দ্ধ সের (৪০ ভরি)।
২। কর্ণে কিঞ্চিৎ অধিক এক পোয়া (২৫ ভরি)।
৩। কণ্ঠে দেড় সের (১২০ তোলা) !
৪। সুকোমল বাহুলতায় প্রায় দুই সের (১৫০ ভরি)।
৫। কটিদেশে প্রায় তিন পোয়া (৬৫ ভরি)।
৬। চরণযুগলে ঠিক তিন সের (২৪০ ভরি) স্বর্ণের বোঝা ! !

বেগমের নাকে যে নথ দুলিতেছে, উহার ব্যাস সার্দ্ধ চারি ইঞ্চি ![১] পরিহিত পা-জামা বেচারা সল্‌মা চুমকির কারুকার্য্য ও বিবিধ প্রকারের জরির (গোটা পাট্টার) ভারে অবনত ! আর পা-জামা ও দোপাট্টার (চাদরের) ভারে বেচারী বধূ ক্লান্ত !

ঐরূপ আট সের স্বর্ণের বোঝা লইয়া নড়াচড়া অসম্ভব, সুতরাং হতভাগী বধূবেগম জড়পদার্থ না হইয়া কি করিবেন? সর্ব্বদাই তাঁহার মাথা ধরে ; ইহার কারণ ত্রিবিধ—(১) সুচিক্কণ পাটী বসাইয়া কষিয়া কেশবিন্যাস, (২) বেণী ও সিঁথির উপর অলঙ্কারের বোঝা, (৩) অর্দ্ধেক মাথায় আটা সংযোগে আফ্‌শাঁ (রৌপ্যচূর্ণ) ও চুম্‌কি বসান হইয়াছে ; ভ্রূযুগ চুম্‌কি দ্বারা আচ্ছাদিত। এবং কপালে রাঙ্গের বিচিত্র বর্ণের চাঁদ ও তারা আটা সংযোগে বসান হইয়াছে। শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড়।

এই প্রকার জড়পিণ্ড হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম না করায় বেগমের স্বাস্থ্য একেবারে মাটী হয়। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে তাঁহার চরণদ্বয় শ্রান্ত ক্লান্ত ও ব্যথিত হয়। বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য। অজীর্ণ ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ

১ কোন কোন নথের ব্যাস ছয় ইঞ্চি এবং পরিধি ন্যূনাধিক ১৯ ইঞ্চি হয় ! ওজন এক ছটাক ! !

তাঁহার চিরসহচর। শরীরে স্ফূর্ত্তি না থাকিলে মনেও স্ফূর্ত্তি থাকে না। সুতরাং ইঁহাদের মন এবং মস্তিষ্ক উভয়ই চিররোগী। এমন স্বাস্থ্য লইয়া চিররোগী জীবন বহন করা কেমন কষ্টকর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ঐ চিত্র দেখিলে কি মনে হয়? আমরা নিজের ও অপরের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা করিলে যে শিক্ষালাভ করি, ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ। সময় সময় আমরা পাখী শাখী হইতে যে সদুপদেশ ও জ্ঞানলাভ করি, তাহা পুঁথিগত বিদ্যার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।একটি আতার পতন দর্শনে মহাত্মা নিউটন যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান তৎকালীন কোন পুস্তকে ছিল না। ঐ বধূবেগমের অবস্থা চিন্তা করিতে গিয়া আমি আমাদের সামাজিক অবস্থার এই চিত্র আঁকিতে সক্ষম হইলাম! যাহা হউক, আমি উক্ত বধূবেগমের জন্য বড় দুঃখিত হইলাম, ভাবিলাম, "অভাগীর ইহলোক পরলোক—উভয়ই নষ্ট।" যদি ঈশ্বর হিসাব নিকাশ লয়েন যে, "তোমার মন, মস্তিষ্ক, চক্ষু প্রভৃতির কি সদ্ব্যবহার করিয়াছ?" তাহার উত্তরে বেগম কি বলিবেন? আমি তখন সেই বাড়ীর একটি মেয়েকে বলিলাম, "তুমি যে হস্তপদদ্বারা কোন পরিশ্রম কর না, এজন্য খোদার নিকট কি জওবাবদিহি (explanation) দিবে?" সে বলিল, "আপ্‌কা কহ্‌না ঠিক হ্যায়"—এবং সে যে সময় নষ্ট করে না, সতত চলা-ফেরা করে, আমাকে ইহাও জানাইল। আমি পুনরায় বলিলাম, "শুধু ঘুরা ফেরা করিলেই ব্যায়াম হয় না। তুমি প্রতিদিন অন্ততঃ আধঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি করিও।" দৌড়াদৌড়ি কথাটার উত্তরে হাসির একটা গর্‌রা উঠিল। আমি কিন্তু ব্যথিত হইলাম, ভাবিলাম, "উল্টা বুঝ্‌লি রাম!" কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার শক্তিটুকুও ইহাদের নাই। আমাদের উন্নতির আশা বহুদূরে—ভরসা কেবল পতিতপাবন।

আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন—কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণ রূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য্য নহে। তাই একটু আশার আলোক দীপ্তি পাইতে না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে তাঁহারা "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলেই "শিক্ষার কুফলের" একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ "শিক্ষার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে "স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার"!

আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকরী লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকরী গ্রহণ অসম্ভব সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

ফাঁকা তর্কের অনুরোধে আবার কোন নেটীভ খ্রীষ্টিয়ান হয়ত মনে করিবেন যে রমণীর জ্ঞান-পিপাসাই মানবজাতির অধঃপাতের কারণ! যেহেতু শাস্ত্রে (Genesis-এ) দেখা যায়,

আদিমাতা হাভা (Eve) জ্ঞানবৃক্ষের ফলভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এবং আদম উভয়েই স্বর্গচ্যুত হইয়াছেন ![৭]

যাহা হউক "শিক্ষা"র অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের "অন্ধ-অনুকরণ" নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা।স ঐগুণের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত পদ, চক্ষু, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত, দ্বারা সৎকার্য্য করি, চক্ষুদ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (বা observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করি, এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি—তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল "পাশ করা বিদ্যা"কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না। দর্শনশক্তির বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিতেছি :

যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি, কর্দ্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে (বিজ্ঞানের) শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে আমরা কেবল মাটি, বালি, কঁয়লার কালি ও জলমিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ্ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন। যথা—বালুকা বিশ্লেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ (opal) ; কর্দ্দম পৃথক করিলে চিনে বাসন প্রস্তুত করণোপযোগী মৃত্তিকা, অথবা নীলকান্তমণি ; পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক ! এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার ! দেখিলেন, ভগিনী ! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দ্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা মাণিক দেখে ! আমরা যে এহেন চক্ষুকে চির-অন্ধ করিয়া রাখি, এজন্য খোদার নিকট কি উত্তর দিব ?

মনে করুন আপনার দাসীকে আপনি একটা সম্মার্জ্জনী দিয়া বলিলেন, "যা, আমার অমুক বাড়ী পরিষ্কার রাখিস্।" দাসী সম্মার্জ্জনীটা আপনার দান মনে করিয়া অতি যত্নে জরির ওয়াড়ে ঢাকিয়া উচ্চস্থানে তুলিয়া রাখিল—কোন কালে ব্যবহার করিল না। এদিকে আপনার বাড়ী ক্রমে আবর্জ্জনাপূর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইল ! অতঃপর আপনি যখন দাসীর কার্য্যের হিসাব লইবেন, তখন বাড়ীর দুরবস্থা দেখিয়া আপনার মনে কি হইবে ? শতমুখী ব্যবহার করিয়া বাড়ী পরিষ্কার রাখিলে আপনি খুসী হইবেন, না তাহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে সন্তুষ্ট হইবেন ?

বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে—এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

আমাদের উচিত যে স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি "ভরসা কেবল পতিতপাবন" কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন যে নিজে নিজের

---

৭. পরন্তু ইউরোপীয় খৃষ্টানদের বিশ্বাস যে Eve অভিশপ্তা হইয়াছিলেন, সত্য ; কিন্তু যীশুখৃষ্ট আসিয়া নারীজাতিকে সে অভিশাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন "Through woman came curse and sin ; and through women came blessing and salvation also." (ভাবার্থ— নারীর দোষে জগতে অভিশাপ ও পাপ আসিয়াছে এবং নারীর কল্যাণেই আশীর্ব্বাদ এবং মুক্তিও আসিয়াছে)। পুরুষ খ্রীষ্টের পিতা হয় নাই, কিন্তু রমণী যীশুখ্রীষ্টের মাতৃপদ প্রাপ্তে গৌরবান্বিতা হইয়াছেন।

সাহায্য করে, ("God helps those that help themselves")। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে পুরুষের উপার্জ্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয় স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জ্জিত ধনভোগে বাধ্য হয়। এবং সেইজন্য তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্য্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পতি পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্ম্মণ্য পুরুষেরাই "স্বামী" থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জ্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন, তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন! এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না।[৮] ইহার কারণ এই যে বহুকাল হইতে নারীহৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই— এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় না! তাই বলিতে চাই :

"অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি!"

প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি ; সমাজ মহা গোলযোগ বাধাইবে জানি ; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল"এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি![৯] (এবং ভগিনীদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি!) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি ত কোন ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে ("but nevertheless it (Earth) does move")!! আমদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। এস্থলে পার্সী নারীদের একটি উদাহরণ দিতেছি। নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি এক খণ্ড উর্দ্দু সংবাদপত্র হইতে অনূদিত হইল :

এই পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে পার্সী মহিলাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিলাতী সভ্যতা, যাহা তাঁহারা এখন লাভ করিয়াছেন, পূর্ব্বে ইহার নাম মাত্র জানিতেন না। মুসলমানদের ন্যায় তাঁহারাও পর্দায় (অর্থাৎ অন্তঃপুরে) থাকিতেন। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ছত্র ব্যবহারে অধিকারিণী ছিলেন না। প্রখর রবির উত্তাপ সহিতে না পারিলে জুতাই ছত্ররূপে ব্যবহার করিতেন!! গাড়ীর ভিতর বসিলেও তাহাতে পর্দা থাকিত। অন্যের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পাইতেন না। কিন্তু আজিকালি পার্সী মহিলাগণ পর্দা ছাড়িয়াছেন! খোলা গাড়ীতে বেড়াইয়া থাকেন। অন্যান্য পুরুষের সহিত আলাপ করেন। নিজেরা ব্যবসায় (দোকানদারী) করেন। প্রথমে যখন কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাদের স্ত্রীকে (পর্দার) বাহির করিয়াছিলেন, তখন চারিদিকে ভীষণ কলরব উঠিয়াছিল। ধবলকেশ বুদ্ধিমানগণ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর ধ্বংসকাল উপস্থিত হইল"!

---

৮. বঙ্গীয় কোন কোন সমাজের স্ত্রীলোক যে স্বাধীনতার দাবী করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে— ফাঁকা আওয়াজ মাত্র।

৯. সমাজের সমঝদার (reasonable) পুরুষেরা প্রাণদণ্ডের বিধান নাও দিতে পারেন, কিন্তু "unreasonable" অবলাসরলাগণ ; (যাঁহারা যুক্তি তর্কের ধার ধারেন না, তাঁহারা) শতমুখী ও আঁইস বঁটীর ব্যবস্থা নিশ্চয় দিবেন, জানি!!

কই পৃথিবী ত ধ্বংস হয় নাই। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও,—সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমতঃ সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক। এবং আমরা যে গোলামজাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষতা[১০] লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডীকেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীমাজিষ্ট্রেট, লেডীব্যারিষ্টার, লেডীজজ — সবই হইব ! পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে "রাণী" করিয়া ফেলিব ! ! উপার্জ্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী"র গৃহকার্য্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?[১১]

আমরা যদি রাজকীয় কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জ্জন করুক। কার্য্যক্ষেত্রেও পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশী, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ করিলে মাসে ২ বেতন পায়, ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোকে ১ পায়। চাকরের খোরাকী মাসিক ৩ আর চাকরাণীর খোরাকী ২ । অবশ্য কখন কখন স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিক বেশী পাইতেও দেখা যায়।

---

১০. আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেৎ কিসের সহিত এ উন্নতির তুলনা দিব? পুরুষদের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ। একটা পরিবারের পুত্র ও কন্যায় যে প্রকার সমকক্ষতা থাকা উচিত, আমরা তাহাই চাই। যেহেতু পুরুষ সমাজের পুত্র, আমরা সমাজের কন্যা ! আমরা ইহা বলি না যে "কুমারের মাথায় যেমন উষ্ণীষ দিয়াছেন, কুমারীর মাথায়ও তাহাই দিবেন !" বরং এই বলি, কুমারের মস্তক শিরস্ত্রাণে সাজাইতে যতখানি যত্ন ও ব্যয় করা হয়, কুমারীর মাথা ঢাকিবার ওড়নাখানা প্রস্তুতের নিমিত্তও ততখানি যত্ন ব্যয় করা হউক।"

১১. কিন্তু আমাদিগকে তাহা করিতে হইবে কেন? কৃষক প্রজা থাকিতে জমীদার কাঁধে লাঙ্গল লইবেন কেন? শুধু রাজার চাকরী ছাড়া আর কিছু উচ্চদরের কার্য্য কি আমরা করিতে পারি না? কেরাণী ইত্যাদির কথা কেবল উদাহরণ স্বরূপ বলা হইল। যেমন স্বর্গের বর্ণনায় বলিতে হয়—সেখানে শীত নাই,--গ্রীষ্ম নাই, কেবল চিরবসন্ত বিরাজমান থাকে। স্বর্গোদ্যানে মরকত লতিকায় হীরক-প্রসূন ফোটে ! ! তাই আমাদের উচ্চ আশা বুঝাইবার নিমিত্ত লেডীভাইস্‌রয় হইবার কথা না বলিলে কিসের সহিত আমাদের সে উচ্চদরের কার্য্যের উপমা দিব?

আবার ইহাও বলি, লেডীকেরাণী হওয়ার কথা কেবল বঙ্গদেশে যেমন shocking বোধ হয়, সেরূপ অন্যত্র বোধ হয় না। আমেরিকায় লেডীকেরাণী বা লেডীব্যারিষ্টার প্রভৃতি বিরল নহে। এবং এমন একদিনও ছিল, যখন অন্যান্য দেশের মুসলমানসমাজে "স্ত্রীকবি, স্ত্রীদার্শনিক, স্ত্রীঐতিহাসিক, স্ত্রীবৈজ্ঞানিক, স্ত্রীবক্তা, স্ত্রীচিকিৎসক, স্ত্রীরাজনীতিবিদ্" প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিল না। কেবল বঙ্গীয় মোস্‌লেমসমাজে ওরূপ রমণীরত্ন নাই।

যদি বল, আমরা দুর্ব্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্ব্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না!

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্দ্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা—উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে—সর্ব্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমতঃ উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন—আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন! তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন! এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী সহকর্ম্মিণী সহধর্ম্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্ম্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

ভরসা করি আমাদের সুযোগ্যা ভগ্নীগণ এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন। আন্দোলন না করিলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

নিরীহ বাঙ্গালী

আমরা দুর্ব্বল নিরীহ বাঙ্গালী। এই বাঙ্গালী শব্দে কেমন সুমধুর তরল কোমল ভাব প্রকাশ হয়। আহা! এই অমিয়াসিক্ত বাঙ্গালী কোন্ বিধাতা গড়িয়াছিলেন? কুসুমের সৌকুমার্য্য, চন্দ্রের চন্দ্রিকা, মধুর মাধুরী, যূথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলের তরলতা—এক কথায় বিশ্বজগতের সমুদয় সৌন্দর্য্য এবং স্নিগ্ধতা লইয়া বাঙ্গালী গঠিত হইয়াছে! আমাদের নামটি যেমন শ্রুতিমধুর তদ্রূপ আমাদের সমুদয় ক্রিয়াকলাপও সহজ ও সরল।

আমরা মূর্ত্তিমতী কবিতা—যদি ভারতবর্ষকে ইংরাজী ধরনের একটি অট্টালিকা মনে করেন, তবে বঙ্গদেশ তাহার বৈঠকখানা (drawing room) এবং বাঙ্গালী তাহাতে সাজসজ্জা (drawing room suit)! যদি ভারতবর্ষকে একটা সরোবর মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহাতে পদ্মিনী! যদি ভারতবর্ষকে একখানা উপন্যাস মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহার নায়িকা! ভারতের পুরুষসমাজে বাঙ্গালী পুরুষিকা!![১] অতএব আমরা মূর্ত্তিমান্ কাব্য।

---

১. "নায়িকা" বলিয়া আমি ব্যাকরণের নিয়মভঙ্গ করি নাই। কারণ অনেকে বাঙ্গালী পুরুষকে "বেচারী" বলে। উর্দ্দু ভাষায় পুরুষকে "বেচারা" ও স্ত্রীলোককে "বেচারী" বলে। যদি আমরা "বেচারী" হইতে পারি, তবে "পদ্মিনী", "নায়িকা" ও পুরুষিকা" হইলে দোষ কি?

আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি,—পুঁইশাকের ডাঁটা, সজিনা ও পুঁটি মৎস্যের ঝোল—অতিশয় সরস। আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি—ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, ছানা, নবনীত, ক্ষীর, সর, সন্দেশ ও রসগোল্লা—অতিশয় সুস্বাদু। আমাদের দেশের প্রধান ফল, আম্র ও কাঁঠাল—রসাল এবং মধুর। অতএব আমাদের খাদ্যসামগ্রী ত্রিগুণাত্মক—সরস, সুস্বাদু, মধুর।

খাদ্যের গুণ অনুসারে শরীরের পুষ্টি হয়। তাই সজিনা যেমন বীজবহুল, আমাদের দেহে তেমনই ভুঁড়িটি স্থূল। নবনীতে কোমলতা অধিক, তাই আমাদের স্বভাবের ভীরুতা অধিক। শারীরিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন ; এখন পোষাক পরিচ্ছদের কথা বলি।

আমাদের বর অঙ্গ যেমন তৈলসিক্ত নবনিগঠিত সুকোমল, পরিধেয়ও তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম শিমলার ধুতি ও চাদর। ইহাতে বায়ুসঞ্চলনের (Ventilation–এর) কোন বাধা বিঘ্ন হয় না ! আমরা সময় সময় সভ্যতার অনুরোধে কোট শার্ট ব্যবহার করি বটে, কারণ পুরুষমানুষের সবই সহ্য হয়। কিন্তু আমাদের অর্দ্ধাঙ্গী—হেমাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গিগণ তদনুকরণে ইংরাজললনাদের নির্লজ্জ পরিচ্ছদ (শেমিজ জ্যাকেট) ব্যবহার করেন না। তাঁহারা অতিশয় সুকুমারী ললিতা লজ্জাবতী লতিকা, তাই অতি মসৃণ ও সূক্ষ্ম "হাওয়ার সাড়ী" পরেন ! বাঙ্গালীর সকল বস্তুই সুন্দর, স্বচ্ছ ও সহজলব্ধ।

বাঙ্গালীর গুণের কথা লিখিতে হইলে অনন্ত মসী, কাগজ ও অক্লান্ত লেখকের আবশ্যক। তবে সংক্ষেপে দুই চারিটা গুণের বর্ণনা করি।

ধনবৃদ্ধির দুই উপায়, বাণিজ্য ও কৃষি। বাণিজ্য আমাদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা (আরব্যোপন্যাসের) সিন্দবাদের ন্যায় বাণিজ্যপোত অনিশ্চিত ফললাভের আশায় অনন্ত অপার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া নৈরাশ্যের ঝঞ্ঝাবাতে ওতপ্রোত হই না। আমরা ইহাকে (বাণিজ্য) সহজ ও স্বল্পায়াসসাধ্য করিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ বাণিজ্য ব্যবসায়ে যে কঠিন পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বর্জ্জন করিয়াছি। এই জন্য আমাদের দোকানে প্রয়োজনীয় জিনিষ নাই, শুধু বিলাসদ্রব্য—নানাবিধ কেশতৈল ও নানাপ্রকার রোগবর্দ্ধক ঔষধ এবং রাঙা পিত্তলের অলঙ্কার, নকল হীরার আংটী, বোতাম ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে। ঈদৃশ ব্যবসায়ে কায়িক পরিশ্রম নাই। আমরা খাঁটী সোণা রূপা বা হীরা জওয়াহেরাৎ রাখি না, কারণ টাকার অভাব। বিশেষতঃ আজি কালি কোন্ জিনিষটার নকল না হয়?

যখনই কেহ একটু যত্ন পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক "দীর্ঘকেশী" তৈল প্রস্তুত করেন, অমনই আমরা তদনুকরণে "হ্রস্বকেশী" তৈল আবিষ্কার করি। যদি কেহ "কৃষ্ণকেশী" তৈল বিক্রয় করেন, তবে আমরা "শুভ্রকেশী" বাহির করি। "কুন্তলীনের" সঙ্গে "কেশলীন" বিক্রয় হয়। বাজারে "মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী" ঔষধ আছে, "মস্তিষ্ক উষ্ণকারী" দ্রব্যও আছে। এক কথায় বলি, যত প্রকারের নকল ও নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতে পারে, সবই আছে। আমরা ধান্য তণ্ডুলের ব্যবসায় করি না, কারণ তাহাতে পরিশ্রম আবশ্যক।

আমাদের অন্যতম ব্যবসায়—পাশ বিক্রয়। এই পাশ বিক্রেতার নাম "বর" এবং ক্রেতাকে "শ্বশুর" বলে। এক একটি পাশের মূল্য কত জান? "অর্দ্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকুমারী"। এম, এ, পাশ অমূল্যরত্ন, ইহা যে সে-ক্রেতার ক্রেয় নহে। নিতান্ত সস্তা দরে বিক্রয় হইলে, মূল্য—এক রাজকুমারী এবং সমুদয় রাজত্ব। আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী কিনা তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি, সশরীরে পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা Old fool শ্বশুরের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা সহজ !

এখন কৃষিকার্য্যের কথা বলি। কৃষি দ্বারা অন্নবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কৃষিবিভাগের কার্য্য (Agriculture) করা অপেক্ষা মস্তিষ্ক উর্ব্বর (Brain culture) করা সহজ। অর্থাৎ কর্কশ উর্ব্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া ধান্য উৎপাদন করা অপেক্ষা মুখস্থ বিদ্যার জোরে অর্থ উৎপাদন করা সহজ। এবং কৃষিকার্য্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করা অপেক্ষা কেবল M.R.A.C. পাশ করা সহজ ! আইনচর্চ্চা করা অপেক্ষা কৃষি বিষয়ে জ্ঞানচর্চ্চা করা কঠিন। অথবা রৌদ্রের সময় ছত্র হস্তে কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা অপেক্ষা টানাপাখার তলে আরাম কেদারায় বসিয়া দুর্ভিক্ষ সমাচার (Famine Report) পাঠ করা সহজ। তাই আমরা অন্নোৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া অর্থ উৎপাদনে সচেষ্ট আছি। আমাদের অর্থের অভাব নাই, সুতরাং অন্নকষ্টও হইবে না ! দরিদ্র হতভাগা সব অন্নাভাবে মরে মরুক, তা'তে আমাদের কি ?

আমরা আরও অনেক প্রকার সহজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। যথা :

(১) রাজ্য স্থাপন করা অপেক্ষা "রাজা" উপাধি লাভ সহজ।

(২) শিল্পকার্য্যে পারদর্শী হওয়া অপেক্ষা B. Sc. ও D. Sc. পাশ করা সহজ।

(৩) অল্প বিস্তর অর্থব্যয়ে দেশে কোন মহৎ কার্য্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করা অপেক্ষা "খাঁ বাহাদুর" বা "রায় বাহাদুর" উপাধিলাভের জন্য অর্থ ব্যয় করা সহজ।

(৪) প্রতিবেশী দরিদ্রদের শোক দুঃখে ব্যথিত হওয়া অপেক্ষা বিদেশীয় বড় লোকদের মৃত্যুদুঃখে "শোক সভার" সভ্য হওয়া সহজ।

(৫) দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা আমেরিকার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা সহজ।

(৬) স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হওয়া অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ঔষধ ও ডাক্তারের হস্তে জীবন সমর্পণ করা সহজ।

(৭) স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্বারা মুখশ্রীর প্রফুল্লতা ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করা (অর্থাৎ healthy & cheerful হওয়া) অপেক্ষা (শুষ্কগণ্ডে !) কালিডোর, মিল্ক অভ রোজ ও ভিনোলিয়া পাউডার (Kalydore, milk of rose ও Vinolia powder) মাখিয়া সুন্দর হইতে চেষ্টা করা সহজ।

(৮) কাহারও নিকট প্রহারলাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহু বলে প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা মানহানির মোকদ্দমা করা সহজ ইত্যাদি।

তারপর আমরা মূর্ত্তিমান আলস্য—আমাদের গৃহিণীগণ এ বিষয়ে অগ্রণী। কেহ কেহ শ্রীমতীদিগকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু বলি, আমরা যদি রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে না পারি, তবে আমাদের অর্দ্ধাঙ্গীগণ কিরূপে অগ্নির উত্তাপ সহিবেন ? আমরা কোমলাঙ্গ—তাঁহারা কোমলাঙ্গী ; আমরা পাঠক, তাঁহারা পাঠিকা ; আমরা লেখক, তাঁহারা লেখিকা। অতএব আমরা পাচক না হইলে তাঁহারা পাচিকা হইবেন কেন ? সুতরাং যে লক্ষ্মীছাড়া দিব্যাঙ্গনাদিগকে রন্ধন করিতে বলে, তাহার ত্রিবিধ দণ্ড হওয়া উচিত। যথা তাহাকে (১) তুষানলে দগ্ধ কর, অতঃপর (২) জবেহ্ কর, তারপর (৩) ফাঁসী দাও ! !

আমরা সকলেই কবি—আমাদের কাব্যে বীররস অপেক্ষা করুণরস বেশী। আমাদের এখানে লেখক অপেক্ষা লেখিকার সংখ্যা বেশী। তাই কবিতার স্রোতে বিনা কারণে অশ্রুপ্রবাহ বেশী বহিয়া থাকে। আমরা পদ্য লিখিতে বসিলে কোন্ বিষয়টা বাদ দিই? "ভগ্ন শূর্প", "জীর্ণ কাঁথা", "পুরাতন চটীজুতা"— কিছুই পরিত্যজ্য নহে। আমরা আবার কত নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছি ; যথা—"অতি শুভ্রনীলাম্বর", "সাশ্রুসজলনয়ন" ইত্যাদি। শ্রীমতীদের করুণ বিলাপ-প্রলাপপূর্ণ পদ্যের "অশ্রুজলের" বন্যায় বঙ্গদেশ ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে! সুতরাং দেখিতেছেন, আমরা সকলেই কবি।

আর আত্মপ্রশংসা কত করিব? এখন উপসংহার করি।[২]

অৰ্দ্ধাঙ্গী

কোন রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে রোগের অবস্থা জানা আবশ্যক। তাই অবলাজাতির উন্নতির পথ আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে তাহাদের অবনতির চিত্র দেখাইতে হয়। আমি "স্ত্রীজাতির অবনতি" শীর্ষক প্রবন্ধে ভগিনিদিগকে জানাইয়াছি যে, আমাদের একটা রোগ আছে—দাসত্ব। সে রোগের কারণ এবং অবস্থা কতক পরিমাণে ইতঃপূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, সেই রোগ হওয়ায় আমাদের সামাজিক অবস্থা কেমন বিকৃত হইয়াছে। ঔষধ পথ্যের বিধান স্থানান্তরে দেওয়া হইবে।

এইখানে গোঁড়া পর্দাপ্রিয় ভগ্নীদের অবগতির জন্য দু একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ করি। আমি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই। কেহ যদি আমার "স্ত্রীজাতির অবনতি" প্রবন্ধে পর্দাবিদ্বেষ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য দেখিতে না পান, তবে আমাকে মনে করিতে হইবে আমি নিজের মনোভাব উত্তমরূপে ব্যক্ত করিতে পারি নাই, অথবা তিনি প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই।

সে প্রবন্ধে প্রায় সমগ্র নারীজাতির উল্লেখ আছে। সকল সমাজের মহিলাগণই কি অবরোধে বন্দিনী থাকেন? অথবা তাঁহারা পর্দানশীন নহেন বলিয়া কি আমি তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ উন্নত বলিয়াছি? আমি মানসিক দাসত্বের (enslaved মনের) আলোচনা করিয়াছি।

কোন একটা নূতন কাজ করিতে গেলে সমাজ প্রথমতঃ গোলযোগ উপস্থিত করে এবং পরে সেই নূতন চালচলন সহিয়া লয়, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ পার্সী মহিলাদের পরিবর্ত্তিত অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্বে তাঁহারা ছত্রব্যবহারেরও অধিকারিণী ছিলেন না, তারপর তাঁহাদের বাড়াবাড়িটা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, তবু ত পৃথিবী ধ্বংস হয় নাই। এখন পার্সী মহিলাদের পর্দামোচন হইয়াছে সত্য, কিন্তু মানসিক দাসত্ব মোচন হইয়াছে কি? অবশ্যই হয় নাই। আর ঐ যে পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের স্বকীয় বুদ্ধিবিবেচনার ত কোন

২. গত ১৩১০ সালে "নিরীহ বাঙ্গালী" লিখিত হইয়াছে। সুখের বিষয় বর্ত্তমান সালে আর বাঙ্গালী "পুরুষিকা" নহেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমন শুভ পরিবর্ত্তন হইবে, ইহা কে জানিত? জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন আমরা সাহসী বাঙ্গালী।

পরিচয় পাওয়া যায় না। পার্সী পুরুষগণ কেবল অন্ধভাবে বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া স্ত্রীদিগকে পর্দার বাহিরে আনিয়াছেন। ইহাতে অবলাদের জীবনীশক্তির ত কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না—তাঁহারা যে জড়পদার্থ, সেই জড়পদার্থই আছেন। পুরুষ যখন তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে রাখিতেন, তাঁহারা তখন সেইখানে থাকিতেন। আবার পুরুষ যখন তাঁহাদের "নাকের দড়ী" ধরিয়া টানিয়া তাঁহাদিগকে মাঠে বাহির করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা পর্দার বাহির হইয়াছেন! ইহাতে রমণীকুলের বাহাদুরী কি? ঐরূপ পর্দা-বিরোধ কখনই প্রশংসনীয় নহে।

কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন লোকে তাঁহাকে বাতুল বলে নাই কি? নারী আপন স্বত্ব-স্বামিত্ব বুঝিয়া আপনাকে নরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে চাহে, ইহাও বাতুলতা বই আর কি?

পুরুষগণ স্ত্রীজাতির প্রতি যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারি না। লোকে কালী, শীতলা প্রভৃতি রাক্ষস-প্রকৃতির দেবীকে ভয় করে, পূজা করে, সত্য। কিন্তু সেইরূপ বাঘিনী, নাগিনী, সিংহী প্রভৃতি "দেবী"ও কি ভয় ও পূজা লাভ করে না? তবেই দেখা যায় পূজাটা কে পাইতেছেন,—রমণী কালী, না রাক্ষসী নৃমুণ্ডমালিনী?

নারীকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুলোকে সীতা দেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন। সীতা অবশ্যই পর্দানশীন ছিলেন না। তিনি রামচন্দ্রের অর্দ্ধাঙ্গী, রাণী, প্রণয়িনী এবং সহচরী। আর রামচন্দ্র প্রেমিক, ধার্ম্মিক—সবই। কিন্তু রাম সীতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, একটি পুতুলের সঙ্গে কোন বালকের যে সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ। বালক ইচ্ছা করিলে পুতুলকে প্রাণপণে ভালবাসিতে পারে; পুতুল হারাইলে বিরহে অধীর হইতে পারে; পুতুলের ভাবনায় অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতে পারে; পুতুলটা যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল, তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারে; হারান পুতুল ফিরিয়া পাইলে আহলাদে আটখানা হইতে পারে; আবার বিনা কারণে রাগ করিয়াও পুতুলটা কাদায় ফেলিয়া দিতে পারে,—কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারে না, কারণ হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ! বালক তাহার পুতুল স্বেচ্ছায় অনলে উৎসর্গ করিতে পারে, পুতুল পুড়িয়া গেল দেখিয়া ভূমে লুটাইয়া ধূলি-ধূসরিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারে!!

রামচন্দ্র "স্বামিত্বের" ষোল আনা পরিচয় দিয়াছেন!! আর সীতা? —কেবল প্রভু রামের সহিত বনযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারও ইচ্ছা প্রকাশের শক্তি আছে। রাম বেচারা অবোধ বালক, সীতার অনুভব শক্তি আছে, ইহা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই, কেন না, বুঝিয়া কার্য্য করিতে গেলে স্বামিত্বটা পূর্ণমাত্রায় খাটান যাইত না;—সীতার অমন পবিত্র হৃদয়খানি অবিশ্বাসের পদাঘাতে দলিত ও চূর্ণ করিতে পারা যাইত না!

আচ্ছা, দেশ কালের নিয়মানুসারে কবির ভাষায় স্বর মিলাইয়া না হয় মানিয়া লই যে, আমরা স্বামীর দাসী নহি— অর্দ্ধাঙ্গী। আমরা তাঁহাদের গৃহে গৃহিণী, মরণে (না হয়, অন্ততঃ তাঁহাদের চাকুরী উপলক্ষে যথা তথা) অনুগামিনী, সুখ দুঃখে সমভাগিনী, ছায়াতুল্যা সহচরী ইত্যাদি।

কিন্তু কলিযুগে আমাদের ন্যায় অর্দ্ধাঙ্গী লইয়া পুরুষগণ কিরূপ বিকলাঙ্গ হইয়াছেন, তাহা কি কেহ একটু চিন্তাচক্ষে দেখিয়াছেন? আক্ষেপের (অথবা "প্রভু"দের সৌভাগ্যের) বিষয় যে, আমি চিত্রকর নহি—নতুবা এই নারীরূপ অর্দ্ধাঙ্গ লইয়া তাঁহাদের কেমন অপরূপ মূর্ত্তি হইয়াছে, তাহা আঁকিয়া দেখাইতাম।

শুক্লকেশ বুদ্ধিমানগণ বলেন যে, আমাদের সাংসারিক জীবনটা দ্বিচক্র শকটের ন্যায়—ঐ শকটের এক চক্র পতি, অপরটি পত্নী। তাই ইংরাজী ভাষায় কথায় কথায় স্ত্রীকে অংশিণী ("partner") উত্তমার্দ্ধ ("better half") ইত্যাদি বলে। জীবনের কর্ত্তব্য অতি গুরুতর, সহজ নহে :

"সুকঠিন গার্হস্থ্য ব্যাপার
সুশৃঙ্খলে কে পারে চালাতে?
রাজ্যশাসনের রীতি নীতি
সূক্ষ্মভাবে রয়েছে ইহাতে।"

বোধ হয় এই গার্হস্থ্য ব্যাপারটাকে মস্তকস্বরূপ কল্পনা করিয়া শাস্ত্রকারগণ পতি ও পত্নীকে তাহার অঙ্গস্বরূপ বলিয়াছেন। তবে দেখা যাউক বর্ত্তমান যুগে সমাজের মূর্ত্তিটি কেমন।

মনে করুন কোন স্থানে পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ দর্পণ আছে, যাহাতে আপনি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে পারেন। আপনার দক্ষিণাঙ্গভাগ পুরুষ এবং বামাঙ্গভাগ স্ত্রী। এই দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখুন :

আপনার দক্ষিণ বাহু দীর্ঘ (ত্রিশ ইঞ্চি) এবং স্থূল, বামবাহু দৈর্ঘ্যে চব্বিশ ইঞ্চি এবং ক্ষীণ। দক্ষিণ চরণ দৈর্ঘ্যে ১২ ইঞ্চি, বাম চরণ অতিশয় ক্ষুদ্র। দক্ষিণ স্কন্ধ উচ্চতায় পাঁচ ফিট, বাম স্কন্ধ উচ্চতায় চারি ফিট! (তবেই মাথাটা সোজা থাকিতে পারে না, বাম দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে! কিন্তু আবার দক্ষিণ কর্ণভারে বিপরীত দিকেও একটু ঝুঁকিয়াছে!) দক্ষিণ কর্ণ হস্তিকর্ণের ন্যায় বৃহৎ, বাম কর্ণ রাসভকর্ণের ন্যায় দীর্ঘ! দেখুন!—ভাল করিয়া দেখুন, আপনার মূর্ত্তিটা কেমন!! যদি এ মূর্ত্তিটা অনেকের মনোমত না হয়, তবে দ্বিচক্র শকটের গতি দেখাই। যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না; সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

সমাজের বিধি ব্যবস্থা আমাদিগকে তাহাদের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়াছে; তাঁহাদের সুখ দুঃখ এক প্রকার, আমাদের সুখ দুঃখ অন্য প্রকার। এস্থলে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নবদম্পতীর প্রেমালাপ" কবিতার দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম—

"বর। কেন সখি কোণে কাঁদিছ বসিয়া?
"কনে। পুষি মেনিটিরে ফেলিয়া এসেছি ঘরে।

*

"বর। কি করিছ বনে কুঞ্জভবনে?
"কনে। খেতেছি বসিয়া টোপা কুল।

*

"বর। জগৎ ছানিয়া, কি দিব আনিয়া জীবন করি ক্ষয়?

তোমা তরে সখি, বল করিব কি?

"কনে। আরো কুল পাড় গোটা ছয়।

*

"বর। বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে?

"কনে। দেব পুতুলের বিয়ে!"

সুতরাং দেখা যায় কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না, যাহাতে সে স্বামীর ছায়াতুল্যা সহচরী হইতে পারে। প্রভুদের বিদ্যার গতির সীমা নাই, স্ত্রীদের বিদ্যার দৌড় সচরাচর "বোধোদয়" পর্য্যন্ত!

স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন! স্বামী যখন কল্পনা–সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহনক্ষত্রমালা বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্য্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন। বলি জ্যোতির্ব্বেত্তা মহাশয়, আপনার পার্শ্বে আপনার সহধর্ম্মিণী কই? বোধ হয়, গৃহিণী যদি আপনার সঙ্গে সূর্য্যমণ্ডলে যান, তবে তথায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে উত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া যাইবেন! তবে সেখানে গৃহিণীর না যাওয়াই ভাল!!

অনেক বলেন, স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্ব্ব্য, চোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই চারি খানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশী আবশ্যক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে আবশ্যক আছে, যেহেতু মাতার দোষ গুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এইজন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ, এ, বি, এ, পাশ হয় বটে; কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে! তাহাদের বিদ্যাপরীক্ষায় এ কথার সত্যতার উপলব্ধি হইতে পারে।[১]

---

১. "দাসী" পত্রিকা হইতে কতকগুলি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না :–

প্রশ্ন। When was Cromwell born (ক্রমওয়েলের জন্ম কখন হইয়াছিল)?

উত্তর। In the year 1649 when he was fourteen years old (১৬৪৯ সালে যখন তিনি চৌদ্দ বৎসরের ছিলেন)।

প্রশ্ন। Describe his continental policy (তাঁহার রাষ্ট্রীয় নীতি বর্ণনা কর)।

উত্তর। He was honest and truthful and he had nine children (তিনি সাধু প্রকৃতি এবং সত্যবাদী ছিলেন এবং তাঁহার নয়জন সন্তানসন্ততি ছিল)।

প্রশ্ন। What is the adjective of ass (গর্দ্দভের বিশেষণ কি)?

উত্তর। Assansole (আসানসোল)।

প্রশ্ন। Who was Chandra Gupta (চন্দ্রগুপ্ত কে)?

আমার জনৈক বন্ধু তাঁহার ছাত্রকে উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিঙ্‌নির্ণয়ের কথা (cardinal points) বুঝাইতেছিলেন। শেষে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "যদি তোমার দক্ষিণ হস্ত পশ্চিমে এবং বাম হস্ত পূর্ব্বে থাকে, তবে তোমার মুখ কোন্ দিকে হইবে?" উত্তর পাইলেন "আমার পশ্চাৎ দিকে!"

যাঁহারা কন্যার ব্যায়াম করা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা দৌহিত্রকে হৃষ্টপুষ্ট "পাহলওয়ান" দেখিতে চাহেন কি না? তাঁহাদের দৌহিত্র ঘুষিটা খাইয়া থাপড়টা মারিতে পারে, এরূপ ইচ্ছা করেন কি না? যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তবে বোধ হয়, তাঁহারা সুকুমারী গোলাপ-লতিকায় কাঁঠাল ফলাইতে চাহেন!! আর যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে দৌহিত্রও বলিষ্ঠ না হয়, বরং পয়জার পেটা হইয়া নত মস্তকে উচ্চৈঃস্বরে বলে, "মাৎ মারো! চোট্ লাগ্‌তা হায়!!" এবং পয়জার লাভ শেষ হইলে দূরে গিয়া প্রহারকর্ত্তাকে শাসাইয়া বলে যে, "কায় মার্‌তা থা? হাম নালিশ করেগা!" তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে আমার বক্তব্য বুঝাইতে অক্ষম।

খ্রীষ্টিয়ানসমাজে যদিও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে, তবু রমণী আপন স্বত্ব ষোল আনা ভোগ করিতে পায় না। তাহাদের মন দাসত্ব হইতে মুক্তি পায় না। স্বামী ও স্ত্রী কতক পরিমাণে জীবনের পথে পাশাপাশি চলিয়া থাকেন বটে; কিন্তু প্রত্যেক উত্তমার্দ্ধই (Better half) তাঁহার অংশীর (partner-এর) জীবনে আপন জীবন মিলাইয়া তন্ময়ী হইয়া যান না। স্বামী যখন ঋণজালে জড়িত হইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া মরমে মরিতেছেন, স্ত্রী তখন একটা নূতন টুপীর (bonnet-এর) চিন্তা করিতেছেন! কারণ তাঁহাকে কেবল মূর্ত্তিমতী কবিতা হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—তাই তিনি মনোরমা কবিতা সাজিয়া থাকিতে চাহেন। ঋণদায়রূপ গদ্য (prosaic) অবস্থা তিনি বুঝিতে অক্ষম।

এখন মুসলমানসমাজে প্রবেশ করা যাউক। মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের "অর্দ্ধেক", অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্য। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা "আড়াই জন" হই! আপনারা "মুহম্মদীয় আইনে" দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিম্বা জমীদারী পরিদর্শন করিতে যান, তবে দেখিবেন কার্য্যতঃ কন্যার ভাগে শূন্য (o) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে।

আমি এখন অপার্থিব সম্পত্তির কথা বলিব। পিতার স্নেহ, যত্ন ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি। এখানেও পক্ষপাতিতার মাত্রা বেশী। ঐ যত্ন, স্নেহ, হিতৈষিতার অর্দ্ধেকই আমরা পাই কই? যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারি জন শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তিনি কন্যার জন্য দুই জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন কি? যেখানে পুত্র তিনটা (বি,এ, পর্য্যন্ত) পাশ করে, সেখানে কন্যা দেড়টা পাশ (এন্ট্রান্স পাশ ও এফ, এ, ফেল্) করে কি? পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা

উত্তর। Chandra Gupta was the granddaughter of Asoka (চন্দ্রগুপ্ত অশোকের দৌহিত্রী)।
"পরীক্ষারহস্য। 'কলা ঝলসাইতে লাগিল' ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছিল। একজন ছাত্র লিখিয়াছেন, 'roasted some plantations' ? আর একজন লিখিয়াছেন, 'roasted some plantagenets' ; অপর একজন লিখিয়াছেন, 'roasted some plaintiffs' কেহ মনে করিবেন না যে, ইহা কল্পিত উত্তর। সত্য সত্যই এরূপ উত্তর পাওয়া গিয়াছে।"

করা যায় না, বালিকাদের বিদ্যালয় সংখ্যায় পাওয়াই যায় না! যে স্থলে ভ্রাতা "শমস্-উল্-ওলামা"[২] সেস্থলে ভগিনী "নজম্-উল্-ওলামা" হইয়াছেন কি? তাঁহাদের অন্তঃপুর গগনে অসংখ্য "নজমন্নেসা" "শম্সন্নেসা" শোভা পাইতেছেন বটে। কিন্তু আমরা সাহিত্য-গগনে "নজম্-উল্-ওলামা" দেখিতে চাই!

আমাদের জন্য এদেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এইরূপ— প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কোরাণ শরীফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে টীয়াপাখীর মত আবৃত্তি কর। কোন পিতার হিতৈষণার মাত্রা বৃদ্ধি হইলে, তিনি দুহিতাকে "হাফেজা" করিতে চেষ্টা করেন। সমুদয় কোরাণখানি যাঁহার কণ্ঠস্থ থাকে, তিনিই "হাফেজ।" আমাদের আরবী শিক্ষা ঐ পর্য্যন্ত! পারস্য এবং উর্দ্দু শিখিতে হইলে, প্রথমেই "করিমা ববখশা এবর্ হালেমা" এবং একেবারে (উর্দ্দু) "বানাতন্ নাশ্" পড়!৩ একে আকার ইকার নাই, তাতে আবার আর কোন সহজপাঠ্য পুস্তক পূর্ব্বে পড়া হয় নাই সুতরাং পাঠের গতি দ্রুতগামী হয় না। অনেকের ঐ কয়খানি পুস্তক পাঠ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই কন্যা-জীবন শেষ হয়। বিবাহ হইলে বালিকা ভাবে, "যাহা হোক, পড়া হইতে রক্ষা পাওয়া গেল!" কোন কোন বালিকা রন্ধন ও সূচীকর্ম্মে সুনিপুণা হয়। বঙ্গদেশেও বালিকাদিগকে রীতিমত বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেহ কেহ উর্দ্দু পড়িতে শিখে, কিন্তু কলম ধরিতে শিখে না। ইহাদের উন্নতির চরম সীমা সল্মা চুমকির কারুকার্য্য, উলের জুতা মোজা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা পর্য্যন্ত।

যদি ধর্ম্মগুরু মোহাম্মদ (দঃ) আপনাদের হিসাব নিকাশ লয়েন যে, "তোমরা কন্যার প্রতি কিরূপ ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ?" তবে আপনারা কি বলিবেন?

পয়গম্বরদের ইতিহাসে শুনা যায়, জগতে যখনই মানুষ বেশী অত্যাচার অনাচার করিয়াছে, তখনই এক-একজন পয়গম্বর আসিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছেন। আরবে স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক অত্যাচার হইতেছিল ; আরববাসিগণ কন্যাহত্যা করিতেছিল, তখন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কন্যাকুলের রক্ষকস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কেবল বিবিধ ব্যবস্থা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, স্বয়ং কন্যা পালন করিয়া আদর্শ

---

২. "শমস্-উল্-ওলামা", পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। ঐ শব্দগুলির অনুবাদ এইরূপ হয়—শম্সল, sun ; ওলামা, ("আলম" শব্দের বহুবচন) learned men. এইরূপ নজম্-উল্-ওলামা অর্থে the star of the learned men (or women!) বুঝিতে হইবে।

৩. এইখানে একটি দশম বর্ষের বালিকার গল্প মনে পড়িল। পল্লীগ্রামে অনেকের বাড়ী ধান ভানিবার জন্য "ভানানী" নিযুক্ত হয়। সেই বালিকা "বানাতন্ নাশ" পড়িতে যাইয়া হোসেন-আরার মেজাজের বর্ণনাটা হৃদয়ঙ্গম করা অপেক্ষা ভানানীদের ধানভানা কাজটা সহজ মনে করিত। তাই সুযোগ পাইলেই সে ঢেঁকিশালে গিয়া দুই এক সের ধান্যের শ্রাদ্ধ করিত! সে ধান্য হইতে তণ্ডুল পরিষ্কার পাওয়া যাইত না—তাহা "Whole meal" ময়দার ন্যায় ধান্য-তুঁষ-তণ্ডুল মিশ্রিত এক প্রকার অদ্ভুত সামগ্রী হইত। যে রোগীদের জন্য হোলমিল ময়দার ব্যবস্থা দেওয়া হয়, তাঁহাদের জন্য উক্ত হোল-মিল-তণ্ডুলচূর্ণ অবশ্যই উপকারী খাদ্য, সন্দেহ নাই!!

দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ফাতেমাময় করিয়া দেখাইয়াছেন— কন্যা কিরূপ আদরণীয়া। সে আদর, সে স্নেহ জগতে অতুল।

আহা ! তিনি নাই বলিয়া আমাদের এ দুর্দ্দশা। তবে আইস ভগিনীগণ ! আমরা সকলে সমস্বরে বলি :

"করিমা ববখ্‌শা এবর্‌ হালেমা !" করিম (ঈশ্বর) অবশ্যই কৃপা করিবেন। যেহেতু "সাধনায় সিদ্ধি।" আমরা "করিমের" অনুগ্রহলাভের জন্য যত্ন করিলে অবশ্যই তাঁহার করুণা লাভ করিব। আমরা ঈশ্বর ও মাতার নিকট ভ্রাতাদের "অর্দ্ধেক" নহি। তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ত হইত—পুত্র যেখানে দশ মাস স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে পাঁচ মাস ! পুত্রের জন্য যতখানি দুগ্ধ আমদানী হয়, কন্যার জন্য তাহার অর্দ্ধেক ! সেরূপ ত নিয়ম নাই ! আমরা জননীর স্নেহ মমতা ভ্রাতার সমানই ভোগ করি। মাতৃহৃদয়ে পক্ষপাতিতা নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব, ঈশ্বর পক্ষপাতী ? তিনি কি মাতা অপেক্ষা অধিক করুণাময় নহেন ?

আমি এবার রন্ধন ও সূচীকার্য্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আবার যেন কেহ মনে না করেন যে আমি সূচীকর্ম্ম ও রন্ধনশিক্ষার বিরোধী। জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু অন্নবস্ত্র ; সুতরাং রন্ধন ও সেলাই অবশ্য শিক্ষণীয়। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনটাকে শুধু রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে।

স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ "প্রভু" হইতে পারে না। কারণ জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোন না কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে, যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। তরুলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্য-প্রার্থী, মেঘও সেইরূপ তরুর সাহায্য চায়। জল বৃদ্ধির নিমিত্ত নদী বর্ষার সাহায্য পায়, মেঘ আবার নদীর নিকট ঋণী। তবে তরঙ্গিনী কাদম্বিনীর "স্বামী", না কাদম্বিনী তরঙ্গিণীর "স্বামী" ? এ স্বাভাবিক নিয়মের কথা ছাড়িয়া কেবল সামাজিক নিয়মে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা তাহাই দেখি।

কেহ সূত্রধর, কেহ তন্তুবায় ইত্যাদি। একজন ব্যারিষ্টার ডাক্তারের সাহায্য-প্রার্থী, আবার ডাক্তারও ব্যারিষ্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিষ্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিষ্টার ডাক্তারের স্বামী ? যদি ইঁহাদের কেহ কাহাকে "স্বামী" বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে শ্রীমতীগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমান্‌দিগকে "স্বামী" ভাবিবেন কেন ?

আমরা উত্তমার্দ্ধ (better halves) তাঁহারা নিকৃষ্টার্দ্ধ (worse halves), আমরা অর্দ্ধাঙ্গী, তাঁহারা অর্দ্ধাঙ্গ। অবলার হাতেও সমাজের জীবন মরণের কাটি আছে, যেহেতু "না জাগিলে সব ভারত-ললনা" এ ভারত আর জাগিতে পারিবে না। প্রভুদের ভীরুতা কিম্বা তেজস্বিতা জননীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে কেবল শারীরিক বলের দোহাই দিয়া অদূরদর্শী ভ্রাতৃমহোদয়গণ যেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী না করেন !

আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা ও অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না ? আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করি, এবং

নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করি। অনেক সময় "হাজার হোক্ ব্যাটা ছেলে!" বলিয়া ব্যাটা ছেলেদের দোষ ক্ষমা করিয়া অন্যায় প্রশংসা করি। এই ত ভুল।[৪]

আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহাদের ধর্ম্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না। মানসিক উন্নতি করিতে হইলে হিন্দুকে হিন্দুত্ব বা খ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টানী ছাড়িতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। আমরা যে কেবল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অবনত হইয়াছি, তাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই।

অনেকে হয়ত ভয় পাইয়াছেন যে, বোধ হয় একটা পত্নীবিদ্রোহের আয়োজন করা হইতেছে। অথবা ললনাগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষকে রাজকীয় কার্য্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিয়া সেই পদগুলি অধিকার করিবেন—শামলা, চোগা, আইন কানুনের পাঁজি পুঁথি লুঠিয়া লইবেন! অথবা সদলবলে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কৃষকগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের শস্যক্ষেত্র দখল করিবেন, হাল গরু কাড়িয়া লইবেন, তবে তাঁহাদের অভয় দিয়া বলিতে হইবে—নিশ্চিন্ত থাকুন।

পুরুষগণ আমাদিগকে সুশিক্ষা হইতে পশ্চাৎপদ রাখিয়াছেন বলিয়া আমরা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছি। ভারতে ভিক্ষু ও ধনবান—এই দুই দল লোক অলস; এবং ভদ্রমহিলার দল কর্ত্তব্য অপেক্ষা অল্প কাজ করে। আমাদের আরাম-প্রিয়তা খুব বাড়িয়াছে। আমাদের হস্ত, পদ, মন, চক্ষু ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করা হয় না। দশজন রমণীরত্ন একত্র হইলে ইহার উহার--বিশেষতঃ আপন আপন অর্দ্ধাঙ্গের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করিয়া বাক্‌পটুতা দেখায়। আবশ্যক হইলে কোন্দলও চলে।

আশা করি এখন "স্বামী" স্থলে "অর্দ্ধাঙ্গ" শব্দ প্রচলিত হইবে।

সুগৃহিণী

ইতঃপূর্ব্বে আমি "স্ত্রীজাতির অবনতি" প্রবন্ধে আমাদের প্রকৃত অবস্থার চিত্র দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি কিন্তু সত্য কথা সর্ব্বদাই কিঞ্চিৎ শ্রুতিকটু বলিয়া অনেকে উহা পছন্দ করেন নাই।[১] অতঃপর "অর্দ্ধাঙ্গী" প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, নারী ও নর উভয়ে একই বস্তুর অঙ্গবিশেষ। যেমন একজনের দুইটি হাত কিংবা কোন শকটের দুইটি চক্র,

---

৪ এস্থলে জনৈক নারীহিতৈষী মহাত্মার উর্দ্দু গাথা মনে পড়িল। তিনি (১৯০৫ খৃষ্টাব্দের কোন মাসিক পত্রিকায়) লিখিয়াছেন, "জগতে তোমাদের নিন্দাগীতি এত দূর উচ্চরাগে গাওয়া গিয়াছে যে শেষে তোমরা ও জগতের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাবিলে যে 'আমরা বাস্তবিক বিদ্যালাভের উপযুক্ত নহি।' সুতরাং মূর্খতার কুফল ভোগের নিমিত্ত তোমরা নত মস্তকে প্রস্তুত হইলে।"
কি চমৎকার সত্য কথা!! জগদীশ্বর উক্ত কবিকে দীর্ঘজীবী করুন!

১. কেহ আবার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া সগর্ব্বে বলিয়াছেন "ভারতে হিন্দুর আরাধ্য দেবতা নারী, তাঁহারা নারীরই উপাসক।" বেশ! বলি হিন্দুর আরাধ্য দেবতা কোন্ জিনিষটি নহে? পূজনীয় বস্তু বলিতে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্ ইহার কোন্ পদার্থটিকে বাদ দেওয়া যায়? হনুমান এবং গোজাতিও কি উপাস্য দেবতা নহে? তাই বলিয়া কি ঐ সকল পশুকে তাঁহাদের "উপাসক মানুষ" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে?

সুতরাং উভয়ে সমতুল্য, অথবা উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। একচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিকে লোকে কাণা বলে।

যাহা হউক আধ্যাত্মিক সমকক্ষতার ভাষা যদি স্ত্রীলোকেরা না বুঝেন, তবে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চভাবের কথায় কাজ নাই। আজি আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? বোধ হয় আপনারা সমস্বরে বলিবেন :

"সুগৃহিণী হওয়া"

বেশ কথা। আশা করি আপনারা সকলেই সুগৃহিণী হইতে ইচ্ছা করেন, এবং সুগৃহিণী হইতে হইলে যে যে গুণের আবশ্যক, তাহা শিক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আপনাদের অনেকেই প্রকৃত সুগৃহিণী হইতে পারেন নাই। কারণ আমাদের বিশেয জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা আমরা লাভ করিতে পারি না। সমাজ আমাদের উচ্চশিক্ষা লাভ করা অনাবশ্যক মনে করেন। পুরুষ বিদ্যালাভ করেন অন্নউপার্জ্জনের আশায়, আমরা বিদ্যালাভ করিব কিসের আশায়? অনেকের মতে আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োজন নাই। যেহেতু আমাদিগকে অন্নচিন্তা করিতে হয় না, সম্পত্তি রক্ষার্থে মোকদ্দমা করিতে হয় না, চাকরীলাভের জন্য সার্টিফিকেট ভিক্ষা করিতে হয় না, "নবাব" "রাজা" উপাধিলাভের জন্য শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের খোসামোদ করিতে হয় না, কিংবা কোন সময়ে দেশরক্ষার্থ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে না। তবে আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ (অথবা *Mental* culture) করিব কিসের জন্য? আমি বলি, সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্তই সুশিক্ষা (*Mental* culture) আবশ্যক।

এই যে গৃহিণীদের ঘরকন্নার দৈনিক কার্য্যগুলি, ইহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্যও ত বিশেষ জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন। চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই সমাজের হর্ত্রী কর্ত্রী ও বিধাত্রী, তাঁহারাই সমাজের গৃহলক্ষ্মী, ভগিনী এবং জননী।

ঘরকন্নার কাজগুলি প্রধানতঃ এই :

(ক) গৃহ এবং গৃহসামগ্রী পরিষ্কার ও সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখা।
(খ) পরিমিত ব্যয়ে সুচারুরূপে গৃহস্থালী সম্পন্ন করা।
(গ) রন্ধন ও পরিবেশন।
(ঘ) সূচিকর্ম্ম।
(ঙ) পরিজনদিগকে যত্ন করা।
(চ) সন্তানপালন করা।

এখন দেখা যাউক ঐ কার্য্যগুলি এদেশে কিরূপ হইয়া থাকে এবং কিরূপ হওয়া উচিত। আমরা ধনবান্ এবং নিঃস্বদিগকে ছাড়িয়া মধ্যম অবস্থার লোকের কথা বলিব।

গৃহখানা পরিষ্কার ও অল্পব্যয়ে সুন্দর রূপে সাজাইয়া রাখিতে হইলে বুদ্ধির দরকার। প্রথমে গৃহনির্ম্মাণের সময়ই গৃহিণীকে স্বীয় সলিকা (taste) দেখাইতে হইবে[১] কোথায় একটি

---

১. উর্দ্দু ভাষায় "সলিকা" manner, taste নিপুণতা যোগ্যতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সলিকা শব্দের ন্যায় মেয়েলী ভাষায় "কাজের ছিরি" কথা চলিত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে সলিকার সমুদয় ভাব প্রকাশ হয় না। তাই সুবিধার নিমিত্ত এ শব্দটাকে বাঙ্গালায় প্রবেশ করাইতে চাই। "আরজী" "তহবিল" "মাহসুল"

বাগান হইবে, কোন স্থানে রন্ধনশালা হইবে ইত্যাদি তাঁহারই পসন্দ অনুসারে হওয়া চাই ভাড়াটে বাড়ী হইলে তাহার কোন্ কামরা কিরূপে ব্যবহৃত হইবে, সে বিষয়ে সলিকা চাই। যেহেতু তিনি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কিন্তু বলি, কয় জন গৃহিণীর এ জ্ঞান আছে? আমরা এমন গৃহিণী যে গৃহব্যাপারই বুঝি না ! আমাদের বিস্‌মেল্লায়ই গলৎ ! !

গৃহনির্ম্মাণের পর গৃহসামগ্রী চাই। তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া রাখার জন্যও সলিকা চাই। কোথায় কোন্ জিনিষটা থাকিলে মানায় ভাল, কোথায় কি মানায় না, এ সব বুঝিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। একটা মেয়েলী প্রবাদ আছে, "সেই ধান সেই চাউল গিন্নী গুণে আউল ঝাউল" (এলোমেলো)। ভাঁড়ার ঘরে সচরাচর দেখা যায়, মাকড়সার জাল চাঁদোয়ারূপে শোভা পাইতেছে ! তেঁতুলে তণ্ডুলে বেশ মেশামিশী হইয়া আছে, কোথাও ধ'নের সহিত মৌরী মিশিয়াছে। চিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে এক ঘণ্টা সময় লাগে। চারি দিক্ বন্ধ থাকে বলিয়া ভাঁড়ার ঘরের দ্বার খোলা মাত্র বদ্ধ বায়ুর এক প্রকার দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। অভ্যাসের কৃপায় এ দুর্গন্ধ গিন্নিদের অপ্রিয় বোধ হয় না।

অনেক শ্রীমতী পানসাজিতে বসিয়া যাঁতির খোঁজ করেন ; যাঁতি পাওয়া গেলে দেখেন পানগুলি ধোওয়া হয় নাই। পানের ডিবে কোন ছেলে কোথায় রাখে তার ঠিক নাই ! কখন বা খয়ের ও চূণের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পান থাকে ঘটিতে, সুপারী থাকে একটা সাজিতে, খয়ের হয়ত থাকে কাপড়ের বাক্সে ! অবশ্য "সাহেবে সলিকা" গণ এরূপ করেন না। তাঁহাদের পানের সমস্ত জিনিষ যথাস্থানে সুসজ্জিত থাকে।

কেহ বা চা'র পাত্র (tea-pot) মৎস্যাধাররূপে ব্যবহার করেন, ময়দা চালিবার চালনীতে পটল, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি কুটিয়া রাখা হয় ! পিতলের বাটীতে তেঁতুলের আচার থাকে ! পূর্ব্বে মুসলমানেরা "মোকাবা" (পাত্র বিশেষ, যাহাতে চুল বাঁধিবার সরঞ্জাম থাকে) রাখিতেন, আজি কালি অনেকে toilet table রাখেন। ইঁহাদের "মোকাবায়" কিংবা টেবিলের উপর চিরুণী তৈল (toilet সামগ্রী) ছাড়া আরও অনেক জিনিষ থাকে, যাহার সহিত কেশবিন্যাস সামগ্রীর (toilet–এর) কোন সম্পর্ক নাই।

পরিমিত ব্যয় করা গৃহিণীর একটা প্রধান গুণ। হতভাগা পুরুষেরা টাকা উপার্জ্জন করিতে কিরূপ শ্রম ও যত্ন করেন, কতখানি মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া এক একটী পয়সার মূল্য (পারিশ্রমিক) দিয়া থাকেন, অনেক গৃহিণী তাহা একটু চিন্তা করিয়াও দেখেন না। উপার্জ্জন না করিলে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিবেন, যথাসাধ্য কটুকাটব্য বলিবেন, কিন্তু একটু সহানুভূতি করেন কই? ঐ শ্রমার্জ্জিত টাকাগুলি কন্যার বিবাহে বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে কেবল সাধ (আমোদ) আহ্লাদে ব্যয় করিবেন, অথবা অলঙ্কার গড়াইতে ঐ টাকা দ্বারা স্বর্ণকারের উদর-পূর্ত্তি করিবেন। স্বামী বেচারা এক সময় চাকরীর আশায় সার্টিফিকেট কুড়াইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, বহু আয়াসে সামান্য বেতনের চাকরী প্রাপ্ত হইয়া প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া যে টাকা কয়টি পত্নীর হাতে আনিয়া দেন, তাহার অধিকাংশ মল ও নূপুরের

(মাশুল) ইত্যাদি শব্দ বহুকাল হইতে বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে। "সলিকা"ও চলুক। "সাহেবে সলিকা" অর্থে যাহার সলিকা আছে (person of taste) বুঝায়।

বেশে তাঁহার কন্যাদের চরণ বেড়িয়া রুণু ঝুনু রবে কাঁদিতে থাকে। হায় বালিকা! তোমার চরণশোভন সেই মল গড়াইতে তোমার পিতার হৃদয়ের কতখানি রক্ত শোষিত হইয়াছে তাহা তুমি বুঝ না।

স্বামীর আয় অনুসারে ব্যয় করাই অর্থের সদ্ব্যবহার। ইউরোপীয় মহিলাদের কথার মূল্য বেশী, তাই একজন কাউন্টেসের (Countess) উক্তি উদ্ধৃত করা গেল :

"The first point necessary to consider in the arrangement and ordering of a lady's household, is that everything should be on a scale exactly proportionate to her husband's income."

(ভাবার্থ—বাড়ী ঘর সাজাইবার সময় গৃহিণী সর্ব্বপ্রথমে এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন যে তাঁহার গৃহস্থালীর যাবতীয় সামগ্রী যেন তাঁহার স্বামীর আয় অনুসারে প্রস্তুত হয়। তাঁহার গৃহসজ্জা দেখিয়া যেন তাঁহার স্বামীর আর্থিক অবস্থা ঠিক অনুমান করা যাইতে পারে)।

সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে আমরা টাকার সদ্ব্যবহার শিখিব কিরূপে? গৃহিণীরা যে স্বামীকে ভালবাসেন না, আমি ইহা বলিতেছি না। তাঁহারা স্বামীকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন, কিন্তু বুদ্ধি না থাকাবশতঃ প্রকৃত সহানুভূতি করিতে পারেন না। কবিবর সাদী বুদ্ধিহীন বন্ধু অপেক্ষা বুদ্ধিমান শত্রুকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। বাস্তবিক স্ত্রীদের অন্ধপ্রেমে অনেক সময় পুরুষদের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট সাধিত হয়।

কেহ আবার পরিমিত ব্যয় করিতে যাইয়া একেবারে কৃপণ হইয়া পড়েন, ইহাও উচিত নহে।

গৃহিণীর রন্ধন শিক্ষা করা উচিত, এ কথা কে অস্বীকার করেন? একটা প্রবাদ আছে যে স্ত্রীদের রান্না তাঁহাদের স্বামীর রুচি অনুসারে হয়। গৃহিণী যে খাদ্য প্রস্তুত করেন ; তাহার উপর পরিবারস্থ সকলের জীবনধারণ নির্ভর করে। মূর্খ রাঁধুনীরা প্রায়ই "কালাই"[৩] রহিত তাম্রপাত্রে দধি মিশ্রিত করিয়া যে কোর্ম্মা প্রস্তুত করে, তাহা বিষ ভিন্ন আর কিছু নহে ; মুসলমানেরা প্রায়ই অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া থাকেন, তাহার কারণ খাদ্যের দোষ ছাড়া আর কি হইতে পারে? এ সম্বন্ধেও সেই কাউন্টেসের (countess) উক্তি শুনুন,–

"Bad food, ill-cooked food, monotonous food, insufficient food, injure the physique and ruin the temper. No lady should turn to the more tempting occupations or amusements of the day till she had gone into every detail of the family commissariat and assured herself that it is as good as her purse, her cook, and the season can make it."

(ভাবার্থ—কোন মহিলাই প্রথমে স্বীয় পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের আহারের সুবন্দোবস্ত এবং রন্ধনশালা পরিদর্শন না করিয়া যেন অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ না করেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থানুসারে খাদ্যসামগ্রী যথাসাধ্য সুরুচিকর হইয়া থাকে কি না এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ষড় ঋতুর পরিবর্ত্তনের সহিত আহার্য্য বস্তুরও পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। ভোজ্য

---

৩. "কালাই" শব্দের বাঙ্গালা কি হইবে? ইংরাজীতে "Tinning" বলে।

দ্রব্য যথাবিধি রন্ধন না হইলে কিম্বা সর্ব্বদা একই প্রকার খাদ্য এবং অখাদ্য ভোজন করিলে শরীর দুর্ব্বল এবং নানা রোগের আধার হইয়া পড়ে)।

সুতরাং রন্ধনপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণীর ডাক্তারী ও (Chemistry) রসায়ন বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক। কোন্ খাদ্যের কি গুণ, কোন্ বস্তু কত সময়ে পরিপাক হয়, কোন্ ব্যক্তির নিমিত্ত কিরূপ আহার্য্য প্রয়োজন, এসব বিষয়ে গৃহিণীর জ্ঞান চাই। যদি আহারই যথাবিধি না হয়, তবে শরীরের পুষ্টি হইবে কিসের দ্বারা? অযোগ্য ধাত্রীর হস্তে কেহ সন্তান পালনের ভার দেয় না, তদ্রূপ অযোগ্যা রাঁধুনীর হাতে খাদ্য দ্রব্যের ভার দেওয়া কি কর্ত্তব্য? রন্ধনশালার চতুর্দ্দিকে কাদা হইলে সেই স্থান হইতে সতত দূষিত বাষ্প উঠিতে থাকে; বাড়ীর লোকেরা দুগ্ধ এবং অন্যান্য খাদ্যের সহিত ঐ বাষ্প আত্মসাৎ করে। কেবল আহারের স্থান পরিষ্কৃত হইলেই চলিবে না; যে স্থানে আহার করা হয় সে জায়গার বায়ু (Atmosphere) পর্য্যন্ত যাহাতে পরিষ্কৃত থাকে, গৃহিণী সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

অনেকে শাকসব্জী খাইতে ভালবাসেন। বাজারের তরকারী অপেক্ষা গৃহজাত তরকারী অবশ্য ভাল হয়। গৃহিণী প্রায়ই শিম, লাউ, শশা, কুষ্মাণ্ড স্বহস্তে বপন করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা উদ্যান প্রস্তুত প্রণালী (Horticulture) অবগত থাকেন, তবে ঐ লাউ কুমড়ার কি সমধিক উন্নতি হইবে না? অন্ততঃ কোন্ স্থানের মাটী কিরূপ, কোথায় শশা ভাল ফলিবে, কোথায় লঙ্কা ভাল হইবে, গৃহিণীর এ জ্ঞানটুকু ত থাকা চাই।

অনেকেই ছাগল, কুক্কুট, হংস, পারাবত ইত্যাদি পালন করেন, কিন্তু সেই সকল জন্তু পালন করিবার রীতি অনেকেই জানেন না। উহাদের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র স্থান না থাকায় উহারা বাড়ীর মধ্যেই ঘুরিয়া চরিয়া বেড়ায়। কাজেই বাড়ীখানাকে পশুশালা বা পশুপক্ষীদের "ময়লার ঘর" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাতে এই জন্তুগুলি রুগ্ন না হইয়া হৃষ্টপুষ্ট থাকে এবং গৃহ নোঙ্গরা করিতে না পারে, তৎপ্রতি গৃহিণীর দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। উহাদের বাসস্থানও পরিষ্কৃত এবং হাওয়াদার (airy) হওয়া উচিত। নচেৎ রুগ্ন পশুপক্ষীর মাংস খাওয়ায় অনিষ্ট বই উপকার নাই। তবেই দেখা যায়, এক রন্ধন শিক্ষা করিতে যাইয়া আমাদিগকে উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়ন ও উত্তাপ তত্ত্ব (Horticulture, Chemistry ও Theory of heat) শিখিতে হয়!!

অন্নের পরই বস্ত্র—না, মানুষ বস্ত্রকে অন্ন অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় মনে করে। শীত গ্রীষ্মানুযায়ী বস্ত্র প্রস্তুত কিংবা সেলাই করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে তাঁহারা চরখা কাটিয়া সূতা প্রস্তুত করিতেন। এখন কল কারখানার অনুগ্রহে কাপড় সুলভ হইয়াছে বটে, কিন্তু নিজ taste (পসন্দ) অনুসারে সেলাই করিতে-হয়। এ জন্যও সুশিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। আপনারা হয়ত মনে করিবেন যে, আমার সব কথাই সৃষ্টিছাড়া। এত কাল হইতে নিরক্ষর দরজীরা ভালই সেলাই করিয়া আসিতেছে, সেলাইয়ের সঙ্গে সুশিক্ষার সম্বন্ধ কি? সেলাইয়ে সহিত পড়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু আনুষঙ্গিক (indirect) সম্বন্ধ আছে। পড়িতে (বিশেষতঃ ইংরাজী) না জানিলে সেলাইয়ের কল (sewing machine–এর) ব্যবস্থাপত্র পাঠ করা যায় না। ব্যবস্থা না বুঝিলে মেশিন্ (machine) দ্বারা ভাল সেলাই করা যায় না। কেবল হাতে সেলাই করিলে লেখা পড়া শিখিতে হয় না, সত্য। কিন্তু হাতের

সেলাইয়ের সহিত মেশিনএর সেলাইয়ের তুলনা করিয়া দেখিবেন ত কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? তাহা ছাড়া মেশিন দ্বারা অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে অধিক সেলাই হয়। অতএব মেশিন চালনা শিক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। এতদ্ব্যতীত ক্যান্‌ভাস (Canvas) এর জুতা, পশমের মোজা, শাল প্রভৃতি কে না ব্যবহার করিতে চাহেন? এই প্রকারের সূচিকার্য্য ইংরাজী (knitting ও Crochet সম্বন্ধীয়) ব্যবস্থাপত্রের সাহায্য ব্যতীত সুচারুরূপে হয় না। ঐ ব্যবস্থাপুস্তকপাঠে শিক্ষয়িত্রীর বিনা সাহায্যে সূচিকর্ম্মে সুনিপুণা হওয়া যায়; কাপড়ের ছাঁট কাট সবই উৎকৃষ্ট হয়। কাপড়ের কাট ছাঁটের জন্যও ত বুদ্ধির দরকার। কাপড়, পশম, জুতা ইত্যাদির পরিমাণ জানা থাকিলে, একজোড়া মোজার জন্য তিন জোড়ার পশম কিনিয়া অনর্থক অপব্যয় করিতেও হয় না।

পরিবারভুক্ত লোকদের সেবা যত্ন করা গৃহিণীর অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্যেকের সুখ সুবিধার নিমিত্ত নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ করা রমণীজীবনের ধর্ম্ম। এ কার্য্যের জন্যও সুশিক্ষা (training) চাই। সচরাচর গৃহিণীরা পরিজনকে সুখ দিবেন ত দূরের কথা, তাঁহাদের সহিত ছোট ছোট বিষয় লইয়া কোঁদল কলহে সময় কাটাইয়া থাকেন। শাশুড়ীর নিন্দা ননদিনীর নিকট, আবার ননদের কুৎসা মাতার নিকট করেন, এইভাবে দিন যায়।

কেহ পীড়িত হইলে তাহার যথোচিত সেবা করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য, রোগীর সেবা অতি গুরুতর কার্য্য। যথারীতি শুশ্রূষা-প্রণালী (nursing) অবগত না হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ রোগী ঔষধ পথ্যের অভাব না হইলেও শুশ্রূষার অভাবে মারা যায়। অনেক স্থানে নিরক্ষর সেবিকা রোগীকে মালিশের ঔষধ খাওয়াইয়া দেয়। কেহ বা অসাবধানতাবশতঃ বিষাক্ত ঔষধ যেখানে সেখানে রাখে, তাহাতে অবোধ শিশুরা সেই ঔষধ খাইয়া ফেলে। এইরূপ ভ্রমের জন্য চিরজীবন অনুতাপে দগ্ধ হইতে হয়। কেহ বা রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া পথ্য দান করে, কেহ অত্যধিক স্নেহবশতঃ তিন চারি বারের ঔষধ একবারে সেবন করায়। এরূপ ঘটনা এদেশে বিরল নহে। ডাক্তারী বিষয়ে সেবিকার উপযুক্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক, একথা কেহ অস্বীকার করেন কি? ডাক্তারী না জানিয়া শুশ্রূষা করিতে যাওয়া যা, আর স্বর্ণকারের কাজ শিখিয়া চর্ম্মকারের কাজ করিতে যাওয়াও তাই!

কিন্তু ডাক্তারী জান বা না জান, রোগীর সেবা সকলকেই করিতে হয়। এমন দুহিতা কে আছেন, যিনি অশ্রুধারায় জননীর পদ প্রক্ষালন করিতে করিতে ভাবেন না যে "এত যত্ন পরিশ্রম সব ব্যর্থ হ'ল; আমার নিজের পরমায়ুঃ দিয়াও যদি মাকে বাঁচাইতে পারিতাম।" এমন ভগিনী কে আছেন, যিনি পীড়িত ভ্রাতার পার্শ্বে বসিয়া অনাহারে দিন যাপন করেন না? এমন পত্নী কে, যিনি স্বামীর পীড়ার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া নিজে আধমরা হন না? এমন জননী কে আছেন, যিনি জীবনে কখনও পীড়িত শিশু কোলে লইয়া অনিদ্রায় রজনী যাপন করেন নাই? যিনি কখনও এরূপ রোগীর সেবা করেন নাই, তিনি প্রেম শিখেন নাই। না কাঁদিলে প্রেম শিক্ষা হয় না।

বিপদের সময় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রক্ষা করা অতি আবশ্যক। এই গুণটা অমাদের অনেকেরই নাই। আমরা কেবল হায়! হায়! করিয়া কাঁদিতে জানি! বোধ হয় আশ থাকে যে, অবলার চক্ষের জল দেখিয়া শমনদেব সদয় হইবেন! অনেক সময় দেখা যায় রোগী এ

দিকে পিপাসায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, সেবিকা ওদিকে বিলাপ করিয়া (নানা ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়া) কাঁদিতেছেন! হায় সেবিকে, এ সময় রোগীর মুখে কি একটু দুধ দেওয়ার দরকার ছিল না? এ সময়টুকু যে দুধ না খাওয়াইয়া রোদনে অপব্যয়িত হইল, ইহার ফলে রোগীর অবস্থা বেশী মন্দ হইল।

এ স্থলে একটি পতিপ্রাণা গৃহিণীর কথা মনে পড়িল। একদা রাত্রিতে তাঁহার স্বামীদেবের বুকে ব্যথা হইয়াছিল; সেজন্য তিনি দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ছিলেন। পরদিন প্রভাতে কবিরাজ আসিয়া বলেন, "এখন অবস্থা মন্দ, রাত্রেই বুকে একটুকু সর্ষের তৈল মালিশ করিলে এরূপ হইত না।" গৃহিণী অনিদ্রায় নিশি যাপন করিলেন, একটু তৈলমর্দ্দন করিলেন না। কারণ এ জ্ঞানটুকু তাঁহার ছিল না। ঐ অজ্ঞানতার ফলে ত্রিবিধ অনিষ্ট সাধিত হইল, (১) স্বামীর স্বাস্থ্য বেশী খারাপ হইল; (২) নিজে অনর্থক রাত্রিজাগরণে অসুস্থ হইলেন; (৩) চিকিৎসকের জন্য টাকার অপব্যয় হইল। কারণ রাত্রে তৈল মাখিলেই ব্যথা সরিয়া যাইত, চিকিৎসক ডাকিবার প্রয়োজন হইত না।

এখন যদি আমি বলি যে, গৃহিণীদের জন্য একটা "জেনানা মেডিকেল কলেজ" চাই, তবে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

সন্তানপালন।—ইহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। সন্তানপালনের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানের শিক্ষা হইয়া থাকে। একজন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, "মাতা হইবার পূর্ব্বেই সন্তানপালন শিক্ষা করা উচিত। মাতৃকর্ত্তব্য অবগত না হইয়া যেন কেহ মাতা না হন।" যে বেচারীকে ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমে মাতা, ছাব্বিশ বৎসর বয়সে মাতামহী এবং চল্লিশ বৎসরে প্রমাতামহী হইতে হয়, সে মাতৃজীবনের কর্ত্তব্য কখন শিখিবে?

শিশু মাতার রোগ, দোষ, গুণ, সংস্কার সকল বিষয়েরই উত্তরাধিকারী হয়। ইতিহাসে যত মহৎ লোকের নাম শুনা যায়, তাঁহারা প্রায় সকলেই সুমাতার পুত্র ছিলেন। অবশ্য অনেক স্থলে সুমাতার কুপুত্র অথবা কুমাতারও সুপুত্র হয়। বিশেষ কোন কারণে ওরূপ হয়। স্বভাবতঃ দেখা যায় আতার গাছে আতাই ফলে, জাম ফলে না। শিশু স্বভাবতঃ মাতাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে, তাঁহার কথা সহজে বিশ্বাস করে। মাতার প্রতিকার্য্য, প্রতিকথা শিশু অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রতি ফোঁটা দুগ্ধের সহিত মাতার মনোগত ভাব শিশুর মনে প্রবেশ করে। কবি কি চমৎকার ভাষায় বলিতেছেন:

"—দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীরগুণগাথা বিক্রমকাহিনী,
বীরগর্ব্বে তার নাচুক ধমনী।"

তাই বটে, বীরাঙ্গনাই বীর-জননী হয়! মাতা ইচ্ছা করিলে শিশু-হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া তাহাকে তেজস্বী, সাহসী, বীর, ধীর সবই করিতে পারেন। অনেক মাতা শিশুকে মিথ্যা বলিতে ও সত্য গোপন করিতে শিক্ষা দেয়, ভবিষ্যতে সেই পুত্রগণ ঠগ, জুয়াচোর হয়। অযোগ্য মাতা কারণে অকারণে প্রহার করিয়া শিশুর হৃদয় নিস্তেজ (spirit low) করে, ভবিষ্যতে তাহারা শ্বেতাঙ্গের অর্দ্ধচন্দ্র ও সবুট পদাঘাত নীরবে—অক্লেশে সহ্য

করে। কোন মজুরের পৃষ্ঠে জনৈক গৌরাঙ্গ নূতন পাদুকা ভাঙ্গিয়া ভগ্ন জুতার মূল্য আদায় না করায় সেই কুলী "নৌতুন জুতা দিয়া মারলো—দামভী লইল না" বলিয়া সাহেবের প্রশংসা করিয়াছিল ! বলা বাহুল্য যে, অনেক "ভদ্রলোকের" অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া থাকে !

অতএব সন্তানপালনের নিমিত্ত বিদ্যা বুদ্ধি চাই, যেহেতু মাতাই আমাদের প্রথম, প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী। হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পুত্র লাভ করিতে হইলে প্রথমে মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে।

কেবল কাজ লইয়াই ১৬/১৭ ঘন্টা সময় কাটান কষ্টকর। মাঝে মাঝে বিশ্রামও চাই। সেই অবসর সময়টুকু পরনিন্দায়, বৃথা কোঁদলে কিংবা তাস খেলায় না কাটাইয়া নির্দ্দোষ আমোদে কাটাইলে ভাল হয় না কি? সে জন্য চিত্র ও সঙ্গীত শিক্ষা করা উচিত। যিনি এ বিষয়ে পারদর্শিনী হইতে চাহেন, তাঁহাকেও বর্ণমালার সহিত পরিচয় করিতে হইবে। চিত্রের বর্ণ, তুলির বর্ণনা, সঙ্গীতের স্বরলিপি সবই পুস্তকে আবদ্ধ। অথবা সুপাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নে কিংবা কবিতা প্রভৃতি রচনায় অবসর সময় যাপন করা শ্রেয়ঃ।

প্রতিবেশীর প্রতি গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও এক্ষেত্রে দুই চারি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। অতিথি সৎকার ও প্রতিবেশীর প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্য এক কালে আরব জাতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, আবরীয় কোন ভদ্রলোকের আবাসে ইঁদুরের বড় উৎপাত ছিল। তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে বিড়াল পুষিতে উপদেশ দেওয়ায় তিনি বলিলেন যে বিড়ালের ভয়ে ইঁদুরগুলি তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া তাঁহার প্রতিবেশীদিগকে উৎপীড়ন করিবে, এই আশঙ্কায় তিনি বিড়াল পোষেন না !

আর আমরা শুধু নিজের সুখ সুবিধার চিন্তায় ব্যস্ত থাকি, অপরের অসুবিধার বিষয় আমাদের মনে উদয়ই হয় না। বরং কাহারও বিপদের দ্বারা আমাদের কিছু লাভ হইতে পারে কি না, সেই কথাই পূর্ব্বে মনে উদয় হয় ! কেহ দুঃসময়ে কোন জিনিষ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ক্রেতা ভাবেন এই সুযোগে জিনিষটি বেশ সুলভ পাওয়া যাইবে ! ঈদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে দৃষ্টি রাখা শিক্ষিত সমাজের শোভা পায় না। অথবা এক জনে হয়ত ক্ষণিক ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার ভাল চাকরাণীটাকে বিদায় দিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ অপর একজন গৃহিণী সেই বিতাড়িতা চাকরাণীকে হাত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আদর্শ গৃহিণী সে স্থলে সেই পরিচারিকাকে পুনরায় তাহার প্রভুর বাড়ী নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইবেন। প্রতিবেশিনীর বিপদকে নিজের বিপদ বলিয়া মনে করা উচিত।

আর প্রতিবেশীর পরিধি বৃহৎ হওয়া চাই—অর্থাৎ প্রতিবেশী বলিলে যেন কেবল আমাদের দ্বারস্থিত গৃহস্থ না বুঝায়। বঙ্গদেশের প্রতিবেশী বলিতে পাঞ্জাব, অযোধ্যা, উড়িষ্যা—এসবই যেন বুঝায়। হইতে পারে পাঞ্জাবের একদল ভদ্রলোক কোন কারখানায় কাজ করেন; সেই কারখানার কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহারা বিশেষ কোন অভাবের বিষয় জানাইতে বারম্বার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ায় ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ ধর্ম্মঘটকে যেন উড়িষ্যা বা মাদ্রাজের লোকে নিজেদের কার্য্য প্রাপ্তির সুযোগ ভাবিয়া আহ্লাদিত না হন। সুগৃহিণী আপন পতি পুত্রকে তাদৃশ ধর্ম্মঘট স্থলে কার্য্য গ্রহণে বাধা দিবেন। আর স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিম্বা পারসী বা খ্রীষ্টিয়ান অথবা বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী, মাড়ওয়ারী বা পঞ্জাবী নহি—আমরা **ভারতবাসী**। আমরা সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসী তারপর মুসলমান, শিখ

বা আর কিছু। সুগৃহিণী এই সত্য আপন পরিবার মধ্যে প্রচার করিবেন। তাহার ফলে তাঁহার পরিবার হইতে ক্ষুদ্র স্বার্থ, হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি ক্রমে তিরোহিত হইবে এবং তাঁহার গৃহ দেবভবন সদৃশ ও পরিজন দেবতুল্য হইবে। এমন ভারতমহিলা কে, যিনি আপন ভবনকে আদর্শ দেবালয় করিতে না চাহিবেন?

দরিদ্রা প্রতিবেশিনীদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করাও আমাদের অন্যতম কর্ত্তব্য। তাহাদের সূচিশিল্প এবং চরকায় প্রস্তুত সূত্রের বস্ত্রাদি উচিত মূল্যে ক্রয় করিলে তাহাদের পরম উপকার করা হয়। এইরূপে এবং আরও অনেক প্রকারে তাহাদের সাহায্য করা যাইতে পারে ; বিস্তারিত বলা বাহুল্য মাত্র।

আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বালক বালিকাদিগকে ভৃত্যের প্রতি সদয় ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সচরাচর দেখা যায়, বড় ঘরের বালকেরা ভারী দাম্ভিক হয়, তাহারা চাকরকে নিতান্ত নগণ্য কি যেন কি মনে করে। বেতনভোগী হইলেই ভৃত্যবর্গ যে মানুষ এবং তাহাদেরও স্বীয় পদানুসারে মান অপমান জ্ঞান আছে, সুকুমারমতি শিশুদিগকে একথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। অনেক গৃহিণী নিজের পুত্রকন্যার দোষ বুঝেন না, তাঁহারা চাকরকেই অযথা শাসন করেন। ওরূপে শিশুকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়।

উর্দ্দু "বানাতননাশ" গ্রন্থে বর্ণিত নবাবনন্দিনী হোসনে-আরা অন্যায় আদরে এমন দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহার দৌরাত্ম্যে দাসী, পাচিকা প্রভৃতি সেবিকাবৃন্দ ত্রাহি ত্রাহি করিত ![৪] যাহাতে বালিকারা বিনয়ী এবং শিষ্ট শান্ত হয়, এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

---

৪. হোসেন-আরার বাল-সুলভ ঔদ্ধত্যের বর্ণনা বেশ আমোদপ্রদ। পাঠিকাদিগকে একটু নমুনা উপহার দিই : হোসেন-আরা, পিতা মাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী—কাহাকেই ভয় করিত না। সমস্ত বাড়ি সে মাথায় তুলিয়া রাখিত ! একদিন তাহার বড় মাসী শাহজামানী বেগম তাহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন। পরিচারিকার দল হয় ত ভাবিল, ছোট বেগমের (হোসেন-আরার মাতার) নিকট অভিযোগে বিশেষ কোন ফল হয় না; বড় বেগম নবাগতা, ইহাঁকে দেখিয়া হোসেন-আরার চপলতা কিঞ্চিৎ দমিয়া যাইবে। শাহজামানী বেগম শিবিকা হইতে অবতরণ করিবা মাত্র ক্রমান্বয়ে দুই চারি অভিযোগ উপস্থিত হইল।
নরগেস কাঁদিয়া আসিয়া বলিল, "দেখুন, ছোট সাহেবজাদী (হোসেন-আরা) এমন পাথর ছুড়িয়া মারিয়াছেন ভাগ্যক্রমে আমার চক্ষু নষ্ট হয় নাই।"
সোসন আসিয়া বলিল, "দেখুন, ছোট সাহেবজাদী আমায় বলিলেন, 'দেখি সোসন তোর জিহ্বা,' যেই আমি জিহ্বা বাহির করিলাম অমনি তিনি আমার চিবুকে এমন জোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে আমার সমস্ত দাঁত রসনায় বিদ্ধ হইয়াছিল।"
গোলাপ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "হায় ! আমার কাণ রক্তাক্ত করিয়া দিলেন !"
রন্ধনশালা হইতে পাচিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "এই দেখুন ছোট সাহেবজাদী তরকারির হাঁড়িতে মুঠা ভরিয়া ছাই দিতেছেন !"
ঐ সব শুনিয়া বড় বেগম ডাকিলেন, "হোস্‌না ! এখানে আইস !" হোসনা তৎক্ষণাৎ আসিল ত ; কিন্তু আসিয়া, মাসীকে নমস্কার করিবে ত দূরের কথা,— হাতে ছাই পায় কাদা—এই অবস্থায় সে হঠাৎ মাসীর গলা জড়াইয়া ধরিল। তিনি সাদরে বলিলেন, "হোস্‌না ! তুমি বড় দুষ্ট হইয়াছ।
হোস্‌না তখন উপস্থিত দাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই সম্বেল পেত্নী বুঝি কোন কথা আপনাকে লাগাইয়াছে?" এই বলিয়াই সে মাসীর ক্রোড় হইতে লাফাইয়া উঠিয়া নির্দ্দোষ সম্বেলের কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহার আরম্ভ করিল ! "আঁ ! ও কি কর ! কি কর !" বলিয়া বড় বেগম বারম্বার নিষেধ করিলেন, কিন্তু সে কিছুই শুনিল না।

পরিশেষে বলি প্রেমিক হও, ধার্ম্মিক হও বা নাস্তিক হও, যাই হইতে চাও, তাহাতেই মানসিক উন্নতির (mental culture-এর) প্রয়োজন। প্রেমিক হইতে গেলে নির্ভর ন্যায়পরতা, মাশুকের[৫] নিমিত্ত আত্মবিসর্জ্জন ইত্যাদি শিক্ষণীয়। নতুবা নির্ব্বোধ বন্ধু হইলে কাহারই উপকার করিতে পারিবে না। ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন, কারণ "কে বে-ইল্‌মে না তওয়াঁ খোদারা শেনাখ্‌ত"। অর্থাৎ জ্ঞান না হইলে ঈশ্বরকে চেনা যায় না! অন্যত্র প্রবাদ আছে "মূর্খের উপাসনা ও বিদ্বানের শয়নাবস্থা সমান"। অতএব দেখা যায় যে, রমণীর জন্য আজ পর্য্যন্ত যে সব কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে, তাহা সাধন করিতেও বুদ্ধির প্রয়োজন। অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত পুরুষদের যেমন মানসিক শিক্ষা (mental culture) আবশ্যক, গৃহস্থালীর জন্য গৃহিণীদেরও তদ্রূপ মানসিক শিক্ষা (mental culture) প্রয়োজনীয়।

ইতর শ্রেণীর লোকদের মত যেমন-তেমন ভাবে গৃহস্থালী করিলেও সংসার চলে বটে, কিন্তু সেরূপ গৃহিণীকে সুগৃহিণী বলা যায় না ; এবং ঐ সব ডোম চামারের পুত্রগণ যে কালে "বিদ্যাসাগর" "বিদ্যাভূষণ" বা "তর্কালঙ্কার" হইবে এরূপ আশাও বোধ হয় কেহ করেন না।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। এখন সাধনাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করা আপনাদের কর্ত্তব্য। যদি সুগৃহিণী হওয়া আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে স্ত্রীলোকের জন্য সুশিক্ষার আয়োজন করিবেন।

বোরকা

আমি অনেক বার শুনিয়াছি যে আমাদের "জঘন্য অবরোধ প্রথা"ই নাকি আমাদের উন্নতির অন্তরায়। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ভগ্নীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে "বোরকা" ছাড়িতে বলেন। বলি, উন্নতি জিনিষটা কি? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাই হয় তবে কি বুঝিব যে জেলেনী, চামারনী, ডুমুনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে?

আমাদের ত বিশ্বাস যে অবরোধের সহিত উন্নতির বেশী বিরোধ নাই। উন্নতির জন্য অবশ্য উচ্চশিক্ষা চাই। কেহ কেহ বলেন যে ঐ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে হইলে এফ,এ, বি,এ, পরীক্ষার জন্য পর্দা ছাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (University Hall-এ) উপস্থিত হইতে হইবে। এ যুক্তি মন্দ নহে! কেন? আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় (University) হওয়া এবং পরীক্ষক স্ত্রীলোক হওয়া কি অসম্ভব? যতদিন এইরূপ বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন আমাদের পাশকরা বিদ্যা না হইলেও চলিবে।

অবরোধ-প্রথা স্বাভাবিক নহে—নৈতিক। কেননা পশুদের মধ্যে এ নিয়ম নাই। মনুষ্য ক্রমে সভ্য হইয়া অনেক অস্বাভাবিক কাজ করিতে শিখিয়াছে। যথা—পদব্রজে ভ্রমণ করা

পরে হোসেন-আরা জেনানা মক্‌তবে (পাঠশালায়) প্রেরিত হইয়া সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা লেখক মহোদয় দেখাইয়াছেন যে অমন অবাধ্য অনম্য বালিকাও শিক্ষার গুণে ভাল হয়।
আমাদের বিশ্বাস সুশিক্ষা স্পর্শমণি যাহাকে স্পর্শ করে সেই সুবর্ণ হয়।

৫ "মাশুক"—যাহাকে ভালবাসা যায় ; beloved object.

স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষে সুবিধার জন্য গাড়ী, পাল্কী প্রভৃতি নানাপ্রকার যানবাহন প্রস্তুত করিয়াছে। সাঁতার দিয়া জলাশয় পার হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষে নানাবিধ জলযান প্রস্তুত করিয়াছে। —তাহার সাহায্যে সাঁতার না জানিলেও অনায়াসে সমুদ্র পার হওয়া যায়। ঐরূপ মানুষের "অস্বাভাবিক" সভ্যতার ফলেই অন্তঃপুরের সৃষ্টি।

পৃথিবীর অসভ্য জাতীরা অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। ইতিহাসে জানা যায়, পূর্ব্বে অসভ্য ব্রিটনেরা অর্দ্ধনগ্ন থাকিত। ঐ অর্দ্ধনগ্ন অবস্থার পূর্ব্বে গায় রঙ মাখিত ! ক্রমে সভ্য হইয়া তাহারা পোষাক ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে।

এখন সভ্যতাভিমানিনী (Civilized) ইউরোপীয়া এবং ব্রাহ্মসমাজের ভগ্নীগণ মুখ ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া হাটে মাঠে বাহির হন। আর অন্যান্য দেশের মুসলমানেরা (ঘরের বাহির হইবার সময়) মহিলাদের মুখের উপর আরও একখণ্ড বস্ত্রাবরণ (বোরকা) দিয়া ঐ অঙ্গাবরণকে সম্পূর্ণ উন্নত (perfect) করিয়াছেন। যাঁহারা বোরকা ব্যবহার করেন না, তাঁহারা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকেন।

কেহ কেহ বোরকা ভারী বলিয়া আপত্তি করেন। কিন্তু তুলনায় দেখা গিয়াছে ইংরাজ মহিলাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্যাট অপেক্ষা আমাদের বোরকা অধিক ভারী নহে।

পর্দা অর্থে ত আমরা বুঝি গোপন করা বা হওয়া, শরীর ঢাকা ইত্যাদি—কেবল অন্তঃপুরের চারি-প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভালমতে শরীর আবৃত না করাকেই "বে-পর্দা" বলি। যাঁহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সম্মুখে অর্দ্ধ-নগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভালমতে পোষাক পরিয়া মাঠে বাজারে বাহির হন, তাঁহাদের পর্দা বেশী রক্ষা পায়।

বর্ত্তমান যুগে ইউরোপীয়া ভগ্নীগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন ; তাঁহাদের পর্দা নাই কে বলে ? তাঁহাদের শয়নকক্ষে, এমনকি বসিবার ঘরেও কেহ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেন না। এ প্রথা কি দোষণীয় ? অবশ্য নহে। কিন্তু এদেশের যে ভগ্নীরা বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাঁহাদের না আছে ইউরোপীয়াদের মত শয়নকক্ষের স্বাতন্ত্র্য (bedroom privacy) না আছে আমাদের মত বোরকা !

কেহ বলিয়াছেন যে "সুন্দর দেহকে বোরকা জাতীয় এক কদর্য্য ঘোমটা দিয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া এক কিম্ভূত কিমাকার জীব সাজা যে কি হাস্যকর ব্যাপার যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন"—ইত্যাদি। তাহা ঠিক ! কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে রেলওয়ে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাই ইচ্ছা করেন না যে তাঁহার প্রতি দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐরূপ কুৎসিত জীব সাজিয়া দর্শকের ঘৃণা উদ্রেক করিলে কোন ক্ষতি নাই। বরং কুলকামিনীগণ মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া সাধারণ দর্শকমণ্ডলীকে আকর্ষণ করাই দোষণীয় মনে করিবেন।

ইংরাজী আদব কায়দা (etiquette)ও আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে ভদ্রমহিলাগণ আড়ম্বররহিত (simple) পোষাক ব্যবহার করিবেন—বিশেষতঃ পদব্রজে ভ্রমণ কালে চাকচিক্যময় বা জাঁকজমক-বিশিষ্ট কিছু ব্যবহার করা তাঁহাদের উচিত নহে।[১]

১. ঐ উপদেশে আমরা কোরাণ শরীফের অষ্টাদশ "পারার" "সুরা নূরের" একটি উক্তির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। যথা—"বিশ্বাসী স্ত্রীলোকদিগকে বল, তাহারা যেন দৃষ্টি সতত নীচের দিকে রাখে (অর্থাৎ চঞ্চল

নিমন্ত্রণ ইত্যাদি রক্ষা করিতে যাইলে মহিলাগণ সচরাচর উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকেন। গাড়ী হইতে নামিবার সময় ঐ পরিচ্ছদ রূপ আভরণ কোচম্যান্ দ্বারবান প্রভৃতির দৃষ্টি হইতে গোপন করিবার জন্য একটা সাদাসিধা (simple) বোরকার আবশ্যক হয়। রেলওয়ে ভ্রমণ কালে সাধারণের দৃষ্টি (public gaze) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘোমটা কিম্বা বোরকার দরকার হয়।

সময় সময় ইউরোপীয়া ভগ্নীগণও বলিয়া থাকেন, "আপনি কেন পর্দা ছাড়েন না (Why don't you break off purdah) ?" কি জ্বালা ! মানুষে নাকি পর্দা ছাড়িতে পারে ? ইঁহাদের মতে পর্দা-অর্থে কেবল অন্তঃপুরে থাকা বুঝায়। নচেৎ তাঁহারা যদি বুঝিতেন যে তাঁহারা নিজেও পর্দার (অর্থাৎ privacyর) হাত এড়াইতে পারেন না, তবে ওরূপ বলিতেন না। যদিও তাঁহাদের পোষাকেও সম্পূর্ণ পর্দা রক্ষা হয় না, বিশেষতঃ সান্ধ্য-পরিধেয় (evening dress) ত নিতান্তই আপত্তিজনক। তবু তাহা বহু কামিনীর একহারা মিহি সাড়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তারপর অন্তঃপুর ত্যাগের কথা—অন্তঃপুর ছাড়িলে যে কি উন্নতি হয়, তাহা আমরা ত বুঝি না। প্রকারান্তরে উক্ত স্বাধীনা রমণীদেরও ত শয়নকক্ষরূপ অন্তঃপুর আছে।

মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই সকল সভ্যজাতিদেরই কোন না কোন রূপ অবরোধ প্রথা আছে। এই অবরোধ-প্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে ? এমন পবিত্র অবরোধ-প্রথাকে যিনি "জঘন্য" বলেন, তাঁহার কথার ভাব আমরা বুঝিতে অক্ষম।

সভ্যতা (civilization)-ই জগতে পর্দা বৃদ্ধি করিতেছে ! যেমন পূর্ব্বে লোকে চিঠিপত্র কেবল ভাঁজ করিয়া পাঠাইত, এখন সভ্য (civilized) লোকে চিঠির উপর লেফাফার আবরণ দেন। চাষারা ভাতের থালা ঢাকে না ; অপেক্ষাকৃত সভ্য লোকে খাদ্য সামগ্রীর তিন চারি পাত্র একখানা বড় থালায় (tray-তে) রাখিয়া উপরে একটা "খানপোষ" বা "সরপোষ" ঢাকা দেন ; যাঁহারা আরও বেশী সভ্য তাঁহাদের খাদ্য বস্তুর প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র আবরণ থাকে। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন টেবিলের আবরণ, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়—ইত্যাদি !

আজিকালি যে সকল ভগ্নী নগ্নপদে বেড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদেরই আত্মীয়া সুশিক্ষিতা (enligthtened) ভগ্নীগণ আবার সভ্যতার পরিচায়ক মোজা জুতার ভিতর পদযুগল আবৃত করেন। ক্রমে হাত ঢাকিবার জন্য দস্তানার সৃষ্টি হইয়াছে। তবেই দেখা যায়—সভ্যতার (civilization-এর) সহিত অবরোধ-প্রথার বিরোধ নাই।

তবে সকল নিয়মেরই একটা সীমা আছে। এদেশে আমাদের অবরোধ-প্রথাটা বেশী কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন অবিবাহিতা বালিকাগণ স্ত্রীলোকের সহিতও পর্দা করিতে বাধ্য থাকেন ! কখন কোন প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে নবম বর্ষীয়া বালিকা প্রাঙ্গণে বাহির হয় না। এই ভাবে সর্ব্বদা গৃহকোণে বন্দিনী থাকায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সুশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। যেহেতু খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়া আত্মীয়া ব্যতীত তাহারা অন্য কাহাকেও দেখিতে পায় না, তবে শিখিবে কাহার নিকট ? নববধূদের

নয়নে ইতস্ততঃ না দেখে !) এবং তাহারা যেন আভরণ (বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত) অন্য লোককে না দেখায়।"

অন্যায় পর্দাও উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বিবাহের পর প্রথম দুই চারি মাস কেবল "জড় পুত্তলিকা" সাজিয়া থাকিতে বাধ্য হন! ঐরূপ কৃত্রিম অন্ধ ও বোবা হইয়া থাকায় কেমন অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা যে সশরীরে ভোগ করে, সেই জানে!! কথিত আছে, কোন সময় একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের নববধূর পৃষ্ঠে ঘটনাক্রমে বৃশ্চিক দংশন করে—তিনি সে যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন! তৃতীয় দিবস "চৌথী"র স্নানের সময় অন্য স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পৃষ্ঠের ক্ষত দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিল! আজি কালি বৃদ্ধাগণ খুব প্রশংসার সহিত ঐ বধূটির উপমা দিয়া থাকেন! বোধ হয় বৃশ্চিকটা খুব বিষাক্ত ছিল না!

যাহা হউক ঐ সকল কৃত্রিম পর্দা কম (moderate) করিতে হইবে। অনেক পরিবারে মহিলাগণ ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব ব্যতীত অপর কাহারও বাটী যাতায়াত করেন না। ইহাতে পাঁচ রকমের স্ত্রীলোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহারা একেবারে কূপমণ্ডুক হইয়া থাকেন। অন্তঃপুরিকাদের পরস্পর দেখা শুনা বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুরুষেরা যেমন সকল শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, আমাদেরও তদ্রূপ করা উচিত। অবশ্য যাঁহাদিগকে আমরা ভদ্র-শিষ্ট বলিয়া জানি, কেবল তাঁহাদের সঙ্গে মিশিব,—তাঁহারা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বিনী (য়িহুদী, নাসারা, বুৎপরস্ত বা যা'ই) হউন, ক্ষতি নাই। এই যে "গয়ের মজহব" বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের সহিত পর্দা করা হয়, ইহা ছাড়িতে হইবে। আমাদের ধর্ম্ম ত ভঙ্গপ্রবণ নহে, তবে অন্য ধর্ম্মাবলম্বিনী স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হইলে ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ কি?

আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন (ওরফে বোরকা) সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শৈলবিহারে বাহির হইলেও বোরকা সঙ্গে থাকিতে পারে। বোরকা পরিয়া চলাফেরায় কোন অসুবিধা হয় না। তবে সে জন্য সামান্য রকমের একটু অভ্যাস (practice) চাই; বিনা অভ্যাসে কোন কাজটা হয়?

সচরাচর বোরকার আকৃতি অত্যন্ত মোটা (coarse) হইয়া থাকে। ইহাকে কিছু সুদর্শন (fine) করিতে হইবে। জুতা কাপড় প্রভৃতি যেমন ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ বোরকারও উন্নতি প্রার্থনীয়। যে বেচারা (বোরকা) সুদূর আরব হইতে এদেশে আসিয়াছে, তাহাকে হঠাৎ নির্ব্বাসিত করিলেই কি আমরা উন্নতির সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উঠিব?

সম্প্রতি আমরা যে এমন নিস্তেজ, সঙ্কীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধে থাকার জন্য হয় নাই—শিক্ষার অভাবে হইয়াছে। সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলি এমন সঙ্কুচিত হইয়াছে। ললনাকুলের ভীরুতা ক্রমে বালকদের হৃদয়ে সংক্রামিত হইতেছে। পঞ্চম বর্ষীয় বালক যখন দেখে যে তাহার মাতা পতঙ্গ দর্শনে মূর্চ্ছিতা হন, তখন কি সে ভাবে না যে পতঙ্গ বাস্তবিকই কোন ভয়ানক বস্তু?

এইখানে বলিয়া রাখি যে কীট পতঙ্গ দেখিয়া মূর্চ্ছা যাওয়ার দোষে কেবল আমরা দোষী নহি। সুসভ্যা ইংরাজ রমণীও এ অপবাদ হইতে মুক্তি পান না। "গালিভরের ভ্রমণ" নামক পুস্তকে ("Gullivers' Travels"-এ) দেখা যায়, যখন ডাক্তার গালিভর "ব্রবডিঙ্গন্যাগ" (Brobdingnag)-দের দেশে গিয়া শস্যক্ষেত্রে সভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন একজন ব্রবডিঙ্গন্যাগ তাঁহাকে হাতে তুলিয়া লইয়া আপন স্ত্রীকে দেখাইতে গেল! ইংরাজ-ললনা যেমন কীট পতঙ্গ বা মাকড়সা দেখিয়া ভীত হন, ব্রবডিঙ্গন্যাগ রমণীও তদ্রূপ ডাক্তার

গালিভরকে দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল!! কারণ দীর্ঘকায়া ব্রবডিঙ্গনব্যাগ রমণী ডাক্তারকে একটি ক্ষুদ্র কীট-বিশেষ মনে করিয়াছিল!! তাই বলি পর্দা ছাড়িলেও পতঙ্গ-ভীতি দূর হয় না!

পতঙ্গ-ভীতি দূর করিবার জন্য প্রকৃত সুশিক্ষা চাই—যাহাতে মস্তিষ্ক ও মন উন্নত (brain ও mind cultured) হয়। আমরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে সমাজও উন্নত হইবে না। যতদিন আমরা আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্য্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদিগকে সকলপ্রকার জ্ঞানচর্চ্চা করিতে হইবে।

শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন। এখন দূরদর্শী ভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। তাই তাঁহারা জাগিয়া উঠিতে ও উঠাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। আমি ইতঃপূর্ব্বেও বলিয়াছি যে "নর ও নারী উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।" এখনও তাহাই বলি। এবং আবশ্যক হইলে ঐ কথা শতবার বলিব।

এখন ভ্রাতাদের সমীপে নিবেদন এই—তাঁহারা যে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কন্যাকে জড় স্বর্ণ মুক্তার অলঙ্কারে সজ্জিত করেন, ঐ টাকা দ্বারা তাহাদিগকে জ্ঞান-ভূষণে অলঙ্কৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। একখানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ হয়, দশখানা অলঙ্কার পরিলে তাহার শতাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না। অতএব শরীর-শোভন অলঙ্কার ছাড়িয়া জ্ঞান-ভূষণ লাভের জন্য ললনাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ অমূল্য অলঙ্কার :

"চোরে নাহি নিতে পারে করিয়া হরণ,
জ্ঞাতি নাহি নিতে পারে করিয়া বণ্টন,
দান কৈলে ক্ষয় নাহি হয় কদাচন,
এ কারণে বলে লোকে বিদ্যা মহাধন।"

আমি আরো দুই চারি পংক্তি বাড়াইয়া বলি :

অনলে না পারে ইহা করিতে দহন,
সলিলে না পারে ইহা করিতে মগন,
অনন্ত অক্ষয় ইহা অমূল্য রতন,—
এই ভূষা সঙ্গে থাকে যাবত জীবন!

তাই বলি অলঙ্কারের টাকা দ্বারা "জেনানা স্কুলের" আয়োজন করা হউক। কিন্তু ভগ্নীগণ যে স্কুল লাভের জন্য সহজে গহনা ত্যাগ করিবেন, এরূপ ভরসা হয় না। দুঃখের কথা কি বলিব, —আমার ভগ্নীদিগকে বোধ হয় এক প্রকার গৃহ-সামগ্রীর মধ্যে গণনা করা হয়! তাই টেবিলটা যেমন ফুল পাতা দিয়া সাজান হয়; জানালার পর্দাটা যেমন ফুলের মালা, পুঁতির মালা বা তদ্রূপ অন্য কিছু দ্বারা সাজান হয়, সেইরূপ গৃহিণী আপন পুত্র-বধূটিকেও একরাশি অলঙ্কার দ্বারা সাজান আবশ্যক বোধ করিয়া থাকেন! সময় সময় ভ্রাতাগণ

আমাদিগকে "সোণা-রূপা রাখিবার স্তম্ভ (stand) বিশেষ" বলিয়া বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন না! কিন্তু "চোরা না শুনে ধরম কাহিনী"!

যাহা হউক, পর্দা কিন্তু শিক্ষার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়ায় নাই। এখন আমাদের শিক্ষয়িত্রীর অভাব আছে। এই অভাবটি পূরণ হইলে এবং স্বতন্ত্র স্কুল কলেজ হইলে যথাবিধি পর্দা রক্ষা করিয়াও উচ্চশিক্ষা লাভ হইতে পারে। প্রয়োজনীয় পর্দা কম করিয়া কোন মুসলমানই বোধ হয় শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন না।[২]

আশা করি, এখন আমাদের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তা ভগ্নীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে বোরকা জিনিষটা মোটের উপর মন্দ নহে।

গৃহ

গৃহ বলিলে একটা আরাম বিরামের শান্তি-নিকেতন বুঝায়— যেখানে দিবাশেষে গৃহী কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। গৃহ গৃহীকে রৌদ্র বৃষ্টি হিম হইতে রক্ষা করে। পশু পক্ষীদেরও গৃহ আছে। তাহারাও স্ব স্ব গৃহে আপনাকে নিরাপদ মনে করে। ইংরাজ কবি মনের আবেগে গাহিয়াছেন :

"Home, sweet home ;
There is no place like home.
Sweet sweet home."

পিপাসা না থাকিলে জল যেমন উপাদেয় বোধ হয় না, সম্ভবতঃ সেইরূপ গৃহ ছাড়িয়া কতকদিন বিদেশে না থাকিলে গৃহসুখ মিষ্ট বোধ হয় না। বিরহ না হইলে মিলনে সুখ নাই। পুরুষেরা যদিও সর্ব্বদা বিদেশে যায় না, তবু সমস্ত দিন বাহিরে সংসারক্ষেত্রে থাকিয়া অপরাহ্ণে গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য উৎসুক হয়—বাড়ী আসিলে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

আবাস বিশ্লেষণ করিলে দুই অংশ দেখা যায়—এক অংশ আশ্রয়স্থান, অপরাংশ পারিবারিক জীবন (অর্থাৎ Home)। গৃহরচনা স্বাভাবিক ; বিহগ বিহগী পরস্পরে মিলিয়া নীড় নির্ম্মাণ করে, শৃগালেরও বাসযোগ্য গর্ত্ত প্রস্তুত হয়। ঐ নিলয় ও গর্ত্তকে আলয় বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত "গৃহ" নয়। সে যাহা হউক,—পশুদের "গৃহ" আছে কি না এস্থলে তাহা আলোচ্য নয়।

---

২. এই সন্দর্ভটি লিখিত হইবার পর বর্ত্তমান ছোটলাট Sir Andrew Fraserএর "The purdah of ignorance" শীর্ষক বক্তৃতার অংশবিশেষ দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি বলিয়াছেন—"Let the efforts of educationists be first directed to the instruction of our girls *within the purdah,* and let woeman begin to exercise her chastening influence on society in spite of the system of seclusion, which only time can modify and violent efforts to shake which can only arouse opposition to female education, instead of doing any immediate practical good in the direction, of emancipation of women." (গত ৮ই মার্চ্চের "Telegraph" সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত হইল।)
আমাদের মতের সহিত ছোটলাট বাহাদুরের মতের কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়!

এখন আমাদের গৃহ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, অধিকাংশ ভারত নারী গৃহসুখে বঞ্চিতা। যাহারা অপরের অধীনে থাকে, অভিভাবকের বাটীকে আপন ভবন মনে করিতে যাহাদের অধিকার নাই, গৃহ তাহাদের নিকট কারাগার তুল্য বোধ হয়। পারিবারিক জীবনে যে সুখী নহে, যে নিজেকে পরিবারের একজন গণ্য (member) বলিয়া মনে করিতে সাহসী নহে, তাহার নিকট গৃহ শান্তি-নিকেতন বোধ হইতে পারে না। কুমারী, সধবা, বিধবা—সকল শ্রেণীর অবলার অবস্থাই শোচনীয়। প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি অন্তঃপুরের একটু একটু নমুনা দিতেছি। এরূপে অন্তঃপুরের পর্দা উঠাইয়া ভিতরের দৃশ্য দেখাইলে আমার ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করি—নালীঘায় অস্ত্র চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন! ইহাতে রোগীর অতীব যন্ত্রণা হইলেও তাহা রোগীর সহ্য করা উচিত। উপরের চর্ম্মাবরণ খানিকটা না কাটিলে ভিতরের ক্ষত দেখাইব কিরূপে? তাই ভ্রাতাদের নিকট অন্তঃপুরের কোন কোন অংশের পর্দা তুলিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমি ইহা বলি না, যে আমাদের সমাজের গুণ মোটেই নাই। গুণ অনেক আছে, দোষও বিস্তর আছে। মনে করুন, একজনের এক হাত ভাল আছে, অন্য হাতে নালীঘা হইয়াছে। এক হাত ভাল আছে বলিয়া কি অন্য হাতের চিকিৎসা করা উচিত নহে? চিকিৎসা করিতে হইলে রোগের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক।

অদ্য আমরা সমাজ-অঙ্গের ক্ষত স্থলের আলোচনা করিব। সমাজের সুস্থ অংশ নিশ্চিন্ত থাকুক। আমাদের সমাজে অনেক সুখী পরিবার আছেন, তাঁহাদের বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে—তাঁহারা সুখে শান্তিতে ঘুমাইতে থাকুন। আসুন পাঠিকা! আমরা লৌহপ্রাচীর-বেষ্টিত অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষগুলি পরিদর্শন করি।

১। বলিয়াছি ত কখন বিদেশে না গেলে গৃহ-আগমন সুখ অনুভব করা যায় না। আমরা একবার (বেহারে) জামালপুরের নিকটবর্ত্তী কোন সহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে আমাদের জনৈক বন্ধুর বাড়ী আছে। সে বাটীর পুরুষের সহিত আমাদের আত্মীয় পুরুষদের বন্ধুত্ব আছে বলিয়া শরাফত[১] উকিলের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে আমাদের আগ্রহ হয়। দেখিলাম, মহিলাকয়টি অতিশয় শান্ত শিষ্ট মিষ্টভাষিণী, যদিও কূপমণ্ডূক! তাঁহারা আমাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। সেখানে শরাফতের পত্নী হসিনা, ভগ্নী জমিলা, জমিলার কন্যা ও পুত্রবধূ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর জমিলাকে যখন আমাদের বাসায় যাইতে অনুরোধ করিলাম, তখন তিনি বলিলেন যে তাঁহারা কোন কালে বাড়ীর বাহির হন না, ইহাই তাঁহাদের বংশগৌরব! কখনও ঘোড়ার গাড়ী বা অন্য কোন যানবাহনে আরোহণ করেন নাই। শিবিকা-আরোহণের কথায় "হাঁ" কি "না" বলিয়াছিলেন, তাহা আমার ঠিক মনে নাই! আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "তবে আপনারা বিবাহ করিয়া শ্বশুরবাড়ী যান কিরূপে? আপনার ভ্রাতৃবধূ আসিলেন কি করিয়া?" জমিলা উত্তর দিলেন, "ইনি আমাদের আত্মীয়-কন্যা—এ পাড়ায় কেবল আমাদেরই গোষ্ঠীর বাড়ী পাশাপাশি দেখিবে।" এই বলিয়া তিনি আমাকে অন্য একটা ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এই আমার কন্যার বাড়ী; এখন আমার বাড়ী চল।" তিনি আমাকে একটা অপ্রশস্ত গলির (ইহার একদিকে ঘরবাড়ী, অন্যদিকে উচ্চ প্রাচীর) ভিতর

---

১. এ প্রবন্ধে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নামগুলি কল্পিত। বর্ণনার সুবিধার নিমিত্ত এরূপ নাম দেওয়া হইল।

দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার সকলগুলি কক্ষ দেখাইলেন। কক্ষগুলি "অসূর্য্যম্পশ্য" বলিয়া বোধ হইল। অতঃপর একটি দ্বার খুলিলে দেখিলাম অপরদিকে হসিনার পুত্রবধূ আছে!—জমিলা বলিলেন, "দেখিলে, এই দ্বারের ওপার্শ্বে আমার ভাইএর বাড়ী, এপার্শ্বে আমার বাড়ী। ও কক্ষে বধূ থাকেন বলিয়া এ দ্বারটি বন্ধ রাখি। আমাদের সওয়ারীর দরকার হয় না কেন, তাহা এখন বুঝিলে?" ঐরূপে সকল বাড়ীই প্রদক্ষিণ করা যায়। সমস্ত মহাল্লাটা পর্য্যটন করা আমার অভিপ্রেত না থাকায় আমরা গৃহতুল্য বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। জমিলা বলিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই মক্কা শরীফ যাইবেন,—এ পাপদেশে তাঁহার আর থাকিবার ইচ্ছা নাই! আমরা আশা করি, তিনি মক্কা শরীফ হইতে ফিরিয়া আসিলে গৃহ-আগমন সুখটা অনুভব করিবেন।

পাঠিকা কি মনে করেন যে হসিনা বা জমিলা গৃহে আছেন? অবশ্য না; কেবল চারি প্রাচীরের ভিতর থাকিলেই গৃহে থাকা হয় না। এদেশে বাসরঘরকে "কোহ্‌বর" বলে, কিন্তু "কবর" বলা উচিত!! বাড়ীখানা ত শরাফতের, সেখানে যেমন এক পাল ছাগল আছে, হংস কুক্কুট আছে, সেইরূপ একদল স্ত্রীলোকও আছেন! অথবা স্ত্রীলোকদের "বন্দিনী" বলা যাইতে পারে! যেহেতু তাঁহাদের পারিবারিক জীবন নাই! আপনার নিজের বাড়ীর কথা মনে করুন! তাহা হইলে হসিনার অবস্থা বুঝিবেন।

২। অনেক পরিবারের গৃহিণীদের সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে—"বাহার মিয়া হফ্‌ত্‌ হাজারী, ঘরমেঁ বিবি কাহাৎ কি মারী।" অর্থাৎ, বাহিরে ত যথেষ্ট জাঁকজমক—যেন স্বামী সাতহাজার সেনার অধিনায়ক; আর অন্তঃপুরে গৃহিণী দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতা!! বাহিরে বৈঠকখানা আছে, আস্তাবল আছে—অনেক কিছু আছে, আর ভিতরে গৃহিণীর নমাজের উপযুক্ত স্থান নাই!

৩। এখন আমরা অন্তঃপুরের ক্ষতস্থল দেখাইব। সাধারণতঃ পরিবারের প্রধান পুরুষটি মনে করেন গৃহখানা কেবল "আমার বাটী"—পরিবারস্থ অন্যান্য লোকেরা তাঁহার আশ্রিতা।[২] মালদহে কয়েকবার আমরা একজনের বাটীতে যাতায়াত করিয়াছি। গৃহস্বামী কলিমের স্ত্রীকে আমরা কখনও প্রফুল্লমুখী দেখি নাই। তাঁহার ম্লান মুখখানি নীরবে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি আকর্ষণ করিত। ইহার কারণ এই—কয় বৎসর অতীত হইল, কলিম স্বীয় ভায়রাভাইয়ের সহিত বিবাদ করিয়াছেন; তাহার ফলে কলিমের পত্নী স্বীয় ভগ্নীর সহিত দেখা করিতে পান না! তিনি এতটুকু ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন না, "আমার ভগ্নী আমার নিকট অবশ্য আসিবেন।" হায়! বাটী যে কলিমের! তিনি যাহাকে ইচ্ছা আসিতে দিবেন, যাহাকে ইচ্ছা আসিতে দিবেন না! আবার ওদিকে ও বাটীখানা সলিমের! সেখানে কলিমের পত্নীর প্রবেশ নিষেধ!

বলা বাহুল্য কলিমের স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র বা অলঙ্কারের অভাব নাই। বলি, অলঙ্কার কি পিতৃমাতৃহীনা অবলার একমাত্র ভগ্নীর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভুলাইতে পারে? শুনিলাম, তিনি

---

২. কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ কোন ঘটনা আমাদের লক্ষ্য নহে। এদিক ওদিককার সত্য ঘটনাসমূহ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একটা সাধারণ চিত্র অঙ্কিত হইল মাত্র। ইহাতে কোন নদীর একধারে নবমুকুলিত আম্রকানন, অন্য তীরে (আমেরিকার) নায়েগারা ফল্‌স্‌এর তটস্থিত নীহারাবৃত পত্রহীন তরুরাজি দেখিয়া কেহ চিত্রকরকে আনাড়ী মনে করিবেন না,—যেহেতু নদী, আম্রকানন, তুষারাবৃত তরু—এ সবই সত্য।

সপত্নী-কণ্টক হইতেও বিমুক্ত নহেন! এরূপ অবস্থায় তাঁহার নিকট গৃহ কি শান্তিনিকেতন (sweet home) বলিয়া বোধ হয়? তিনি কি নিভৃতে নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন না, "আমার মত হতভাগী নিরাশ্রয়া আর নাই।"

৪। একস্থলে দুই ভ্রাতায় কলহ হইল—মনে করুন, বড় ভাইটির নাম "হাম", ছোট ভাইটির নাম "সাম"। ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া হাম স্বীয় কন্যাকে বলিলেন, "হামিদা! তুমি যতদিন আমার বাটীতে আছ, ততদিন জোবেদাকে (সামের কন্যা) পত্র লিখিতে পাইবে না।" পিতৃ-আদেশ অবশ্যই শিরোধার্য্য। কিন্তু হামিদা আশৈশব যে পিতৃব্যতনয়াকে ভালবাসিয়াছে, তাহাকে হঠাৎ ভুলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সহজ নহে। যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।—যে দুইটি বালিকার শৈশবের ধূলাখেলার স্মৃতি উভয়ের জীবনে বিজড়িত রহিয়াছে—দূরে থাকিয়াও যাহারা পত্রসূত্রে একত্র গ্রথিতা ছিল, আজ সেই একবৃন্তের কুসুম দুইটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া হাম গৃহস্বামিত্বের পরিচয় দিলেন! দুইটি অসহায়া অক্ষমা বালিকার কোমল হৃদয় দলিত ও চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া গৃহস্বামী স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন!! বলা বাহুল্য, জোবেদাও হামিদাকে পত্র লিখিতে অক্ষম! যদি তাহারা কোন প্রকারে পরস্পরকে চিঠি পাঠায়—তবে হামিদার পত্র সাম আটক (intercept) করেন, জোবেদার পত্র হামের কবলে পড়িয়া মারা যায়!! বালিকাদ্বয়ের রুদ্ধ-অশ্রু, হৃদয়বিদারী দীর্ঘনিশ্বাস যবনিকার অন্তরালেই বিলীন হয়! শুনা যায়, আইন অনুসারে ১৮ (কিম্বা ২২) বর্ষীয়া কন্যার চিঠিপত্র আটক (intercept) করিতে পিতা অধিকারী নহেন। সে আইন কিন্তু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পায় না! কবি বেশ বলিয়াছেন :

> "তোমরা বসিয়া থাক ধরা প্রান্তভাগে,
> শুধু ভালবাস। জান না বাহিরে বিশ্বে
> গরজে সংসার"—

তাইত ; আইন আছে, থাকুক, তাহাতে হামিদা বা জোবেদার লাভ কি? ঐরূপ কত পত্র দেবর ভাসুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ (intercepted) হয়, কে তাহার সংখ্যা করে? বিধবা ভ্রাতৃবধূটি স্বীয় ভ্রাতা ভগিনীর চিঠিপত্র লইয়া কোনমতে কালক্ষেপ করেন—যদি আশ্রয়দাতা দেবরটি বিরক্ত হন, তবে আর তাঁহার ভ্রাতা ভগ্নীর পত্র পাইবার উপায় নাই! অসহায়া অন্তঃপুরিকাদিগকে ঈশ্বর ব্যতীত আর কে সাহায্য করিবে?

৫। আমরা রমাসুন্দরীকে অনেকদিন হইতে জানি। তিনি বিধবা ; সন্তান সন্ততিও নাই। তাঁহার স্বামীর প্রভূত সম্পত্তি আছে, দুই চারিটি পাকা বাড়ীও আছে। তাঁহার দেবর এখন সে সকল সম্পত্তির অধীশ্বর। দেবরটি কিন্তু রমাকে একমুঠা অন্ন এবং আশ্রয়দানেও কুণ্ঠিত। আমরা বলিলাম, "ইনি হয়ত দেবর-পত্নীর সহিত কোঁদল করেন।" এ কথার উত্তরে একজন (যিনি রমাকে ১৪/১৫ বৎসর হইতে জানেন) বলিলেন, "রমা সব করিতে জানে, কেবল কোঁদল জানে না। রমা বেশ জানে, কি করিয়া পরকে আপন করিতে হয় ; কেবল আপনাকে পর করিতে জানে না।"

"এতগুণ সত্ত্বেও দেবরের বাড়ী থাকিতে পান না কেন?"

"কপালের দোষ!"

হায় অসহায়া অবলা! তোমরা নিজের দোষকে "কপালের" দোষ বল বটে, কিন্তু ভুগিবার বেলা তোমরাই স্বকীয় কর্ম্মফল ভুগিতে থাক! তোমাদের দোষ মূর্খতা, অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি। রমাসুন্দরী বলিলেন, "বেঁচে থাকতে বাধ্য ব'লে বেঁচে আছি; খেতে হয় ব'লে খাই—আমাদের সেই সহমরণপ্রথাই বেশ ছিল! গবর্ণমেন্ট সহমরণ-প্রথা তুলে দিয়ে বিধবার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করেছেন!" ঈশ্বর কি রমার কথাগুলি শুনিতে পান না? তিনি কেমন দয়াময়?

৬। আমরা একটি রাজবাটী দেখিতে গিয়াছিলাম। অবশ্য রাজার অনুপস্থিতি সময় যাওয়া হইয়াছিল। তিনি উপাধিপ্রাপ্ত রাজা—রাজ্যের বার্ষিক আয় প্রায় ৫০০০০০ টাকা।

বাড়ীখানি কবি-বর্ণিত অমরাবতীর ন্যায় মনোহর। বৈঠকখানা বিবিধ মূল্যবান সাজসজ্জায় ঝলমল করিতেছে; এদিকে সেদিকে ৫/৭ খানা রজত-আসন শূন্য হৃদয়ে রাজাকে আহ্বান করিতেছে! এক কোণ হইতে রবির একটু ক্ষীণরশ্মি একটি দর্পণে পড়িয়াছিল; তাহার প্রতিরশ্মি চারিদিকে বেল্লুরের ঝাড়ে প্রতিভাত হইয়া এক অভিনব আলোকরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছে! এক কক্ষে রাজার রৌপ্যনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কখানা মশারী ও শয্যায় পরিশোভিত হইয়া প্রবাসী রাজার অপেক্ষা করিতেছে। পাঠিকা হয়ত বলিবেন, "খাটখানা রাণী ব্যবহার করেন না কেন?" তাহা হইলে সমাগত লোকেরাও লক্ষ টাকার পর্য্যঙ্কখানা দেখিতে পাইত না যে! বহির্ব্বাটী পরিদর্শন করিয়া আমরা রাণীর মহলে গেলাম।

রাণীর ঘর কয়খানাতেও টেবিল, টিপাই, চেয়ার ইত্যাদি সাজসজ্জা আছে। কিন্তু তাহার উপর ধূলার স্তর পড়িয়াছে। রাজা কোন কালে এসব কক্ষে পদার্পণ করেন বলিয়া বোধ হইল না। রাণীর শয্যাপার্শ্বে কয়েকখানা বাঙ্গালা পুস্তক এলোমেলোভাবে ছড়ান রহিয়াছে।

রাণীকে দেখিয়া আমি হতাশ হইলাম। কারণ বৈঠকখানা দেখিয়া আমি রাণীর যেরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিলাম, এ মূর্ত্তি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি পরমা সুন্দরী (১৬/১৭ বৎসরের) বালিকা—পরিধানে সামান্য লালপেড়ে বিলাতি ধুতি; অলঙ্কার বলিতে হাতে তিন তিন গাছি বেল্লুরের চুড়ি, মাথায় রুক্ষ কেশের জটা—অনুমান পনের দিন হইতে তৈলের সহিত চুলগুলির সাক্ষাৎ হয় নাই, মুখখানি এমনই করুণ ভাবে পূর্ণ যে রাণীকে মূর্ত্তিমতী "বিষাদ" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকের মতে চক্ষু মনের দর্পণ স্বরূপ। রাণীর নয়ন দু'টিতে কি কি হৃদয়বিদারক ভাব ছিল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম।

রাজা সর্ব্বদা বিদেশে,—বেশীর ভাগে কলিকাতায় থাকেন। সেখানে তাঁহার অপ্সরা, বিদ্যাধরীর অভাব হয় না, এখানে রাণী বেচারী চিরবিরহিণী!! বাড়ীতে দাস দাসী, ঠাকুর দেবতা, পুরোহিত ইত্যাদি সবই আছে; আনন্দ কোলাহলও যথেষ্ট আছে, কেবল রাণীর হৃদয়ে আনন্দ নাই! গৃহখানা তাঁহার নিকট কারাগার স্বরূপ বোধ হইতেছে। রাণী যেন একদল দাসীসহ নির্জ্জন কারাবাসদণ্ডভোগ করিতেছেন!! আমাদের সঙ্গী একটি মহিলা জনান্তিকে বলিলেন, "এমন চমৎকার বাড়ী, আর ঘরে এমন পরী যাঁর, তিনি কি সুখে বিদেশে থাকেন!"

রাণী বাঙ্গালা বেশ জানেন; তিনি কেবল বই পড়িয়া দুর্ব্বহ সময় কাটান। তিনি—মিতভাষিণী, বেশী কিছু বলিলেন না, কিন্তু যে দুই একটি কথা বলিলেন, তাহা অতি চমৎকার। আমাদের একটি বর্ষীয়সী সঙ্গিনী বলিলেন, "তুমি রাজার রাণী, তোমার এ বেশ কেন? এস আমি চুল বেঁধে দিই।" রাণী উত্তর দিলেন, "জানি না কি পাপে রাণী হয়েছি!" ঠিক কথা! অথচ লোকে এই রাণীর পদ কেমন বাঞ্ছনীয় বোধ করে!

অন্তঃপুরের ঐ সকল ক্ষতকে নালীঘা না বলিয়া আর কি বলিব? এ রোগের কি ঔষধ নাই? বিধবা ত সহমরণ-আকাঙ্ক্ষা করে; সধবা কি করিবে?

৭। "মহম্মদীয় আইন" অনুসারে আমরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হই—"আমাদের বাড়ী"ও হয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়,—বাড়ীর প্রকৃত কর্ত্তা স্বামী, পুত্র, জামাতা, দেবর ইত্যাদি হ'ন। তাঁহাদের অভাবে বড় আমলা বা নায়েবটি বাড়ীর মালিক! গৃহকর্ত্রীটি ঐ নায়েবের ক্রীড়াপুতুল মাত্র। নায়েব কর্ত্রীকে যাহা বুঝায়, অবোধ নিরক্ষর কর্ত্রী তাহাই বুঝেন।

গৃহকর্ত্রী মোহ্সেনা স্বীয় জামাতার সহিত কলহ করিয়া দুই এক দিনের জন্য কোন দূর সম্পর্কীয় দেবর কাসেমের বাড়ী যান। এ বাড়ীখানা মোহ্সেনার পৈতৃক সম্পত্তি—সুতরাং ইহা তাঁহার একান্ত "আপন" বস্তু। কর্ত্রীর একমাত্র দুহিতাও মারা গিয়াছেন; তবু তিনি জামাতাকে (দুই চারিজন দৌহিত্রী ইত্যাদি সহ) বাড়ীতে রাখিয়াছেন। এরূপ স্থলে জামাতা জামালকে শাশুড়ীর আশ্রিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু তামাসা দেখুন, মোহসেনা গৃহে ফিরিয়া আসিলে, দ্বারবান তাঁহাকে জানাইল, এ বাড়ীতে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ! তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন—"কি? আমার বাড়ীতে আমারই প্রবেশ নিষেধ? পর্দা কর, আমি (শিবিকা হইতে) নামিব।"

দ্বারবান—পর্দা করিতে পারি না, মালিকের হুকুম নাই।

কর্ত্রী—কে তোর মালিক? একমাত্র মালিক ত আমি!

দ্বারবান—বে-আদবী মাফ হউক; হুজুর কি আমাকে তাঁহার পয়জার হইতে রক্ষা করিতে পারেন? হুজুর ত পর্দায় থাকেন, আমরা জামাল মিয়াঁকেই জানি। আপনি মালিক, তাহা ত দুনিয়া জানে;—কিন্তু আমার প্রতি দয়া করিয়া আপনি ফিরিয়া যান। আপনি এখানে নামিলে গোলামের উপর জুলুম হবে। হুজুরেরও অপমান হওয়ার সম্ভাবনা।

যাহা হউক, হুজুর ফিরিয়া গেলেন!! তিনি কাসেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কি কোন আইন নাই, যাহার দ্বারা আমার বাড়ী আমি দখল করিতে পারি?" কাসেম বলিলেন, "আছে। আপনি নালিশ করুন, আমরা সাহায্য করিব।" ওদিকে জামাল এই নালিশের বিষয় জানিতে পারিয়া কাসেমের নিকট আসিলেন। সবিনয়ে মিষ্ট ভাষায় কাসেমকে বুঝাইলেন, "আজ আপনি যদি আমার শাশুড়ীর সাহায্য করেন, তবে ত অন্তঃপুরিকাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যদি কখন আপনার এরূপ বিপদ ঘটে তবে কেহ আপনার পরিবারের স্ত্রীলোকদের সাহায্য করিবে, আপনি কি তাহা পসন্দ করিবেন? ভাবিয়া দেখুন, এরূপ হওয়া কি ভাল? মিছামিছি শত্রুতা পাতাইবেন কেন?"

কাসেম অন্তঃপুরে আসিয়া মোহ্সেনাকে বুঝাইলেন যে, মামলা মোকদ্দমায় অনেক হেঙ্গাম; ওসব গোলমাল না করাই ভাল! অভাগিনী ক্রোধে, অভিমানে নীরবে দগ্ধ হইতে থাকিলেন!!

ঐরূপ আরও কত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। খদিজা প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, তাঁহার স্বামী হাশেম দরিদ্র কিন্তু কুলীন বিদ্বান। হাশেম ছলে কৌশলে সমস্ত জমিজমা আত্মসাৎ করিয়া লইলেন; খদিজার হাতে এক পয়সা নাই। খদিজার পৈত্রিক বাড়ীতে বসিয়াই হাশেম আর দুই তিনটা বিবাহ (?) করিয়া তাঁহাকে সতিনী জ্বালায় দগ্ধ

করিতে লাগিলেন ! এরূপ না করিলে আর ক্ষমতাশালী পুরুষের বাহাদুরী কি? ইহাতে যদি খদিজা সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করেন, তবে প্রবীণা মহিলাগণ তাঁহার হৃদয়ে স্বামীভক্তির অভাব দেখিয়া নিন্দা করেন, কেহ দুই একটা জীর্ণ পুঁথি (মসলামসায়েলের বঙ্গানুবাদ) দেখাইয়া বলেন, "স্বামী মাথা কাটিলে "আহ্' বলিতে নাই !" কেহ সুরযোগে আবৃত্তি করিলেন:

"নারীর মোর্সেদ[৩] স্বামী সের্তাজ[৪] জানিবে
মোর্সেদের সম নারী পতিকে ভজিবে !"

যাহা হউক খদিজার দুঃখে সহানুভূতি করিবে, এমন লোকটি পর্য্যন্ত নাই! ইহাকে নরকযন্ত্রণা ভিন্ন আর কি বলিব? কোন মৌলভী বক্তৃতা (ওয়াজ) করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোকে বেশী গুণা (দোষ) করে; হযরত মেয়ারাজ গিয়া দেখিয়াছেন নরকে বেশীর ভাগে স্ত্রীলোক শাস্তি পাইতেছে।" আমরা কিন্তু এই পৃথিবীতেই দেখিতেছি—কুলকামিনীরা অসহ্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন !

৮। পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ হইতে কন্যাকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত কি কি জঘন্য উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহা কে না জানে? কোন ভ্রাতা তাহা মুখ ফুটিয়া বলেন না—বলিলে অবলাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে যে![৫] সুতরাং সে শোচনীয় কথা আমাদিগকেই বলিতে হইতেছে। কোন স্থলে আফিংখোর, গাঁজাখোর, নিরক্ষর, চিররোগী বৃদ্ধ—যে মোকদ্দমা করিয়া জমিদারীর অংশ বাহির করিতে অক্ষম এইরূপ লোককে কন্যাদান করা হয়! অথবা ভগ্নীর দ্বারা বিবাহের পূর্ব্বেই লা-দাবী লিখাইয়া লওয়া হয় কিম্বা ভগ্নীদিগকে চিরকুমারী রাখা হয়; এবং ভ্রাতৃবধূ ননদদিগকে দাসীর মত ভাবেন! আর যদি কোন পরিবারে পুত্র মোটেই না থাকে, কেবল ডজন, অর্দ্ধ ডজন কন্যাই থাকে,—তবে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ভাগ্যবান স্বামীটি অবশিষ্ট শ্যালিকা কয়টিকে চিরকুমারী রাখিতে চেষ্টা করেন! ইহাই সমাজের নালীঘা!! হায় পিতা মোহাম্মদ (দঃ)! তুমি আমাদের উপকারের নিমিত্ত পিতৃসম্পত্তিতে অধিকারিণী করিয়াছ, কিন্তু তোমার সুচতুর শিষ্যগণ নানা উপায়ে কুলবালাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে!! আহা! "মহম্মদীয় আইন" পুস্তকের মসি-রেখারূপে পুস্তকেই আবদ্ধ থাকে। টাকা যার, ক্ষমতা যার, আইন তাহারই। আইন আমাদের ন্যায় নিরক্ষর অবলাদের নহে!

৯। নববিধবা সৌদামিনী দুই পুত্র ও এক কন্যাসহ ভ্রাতার আলয়ে আশ্রয় লইয়াছেন। ৯/১০ মাস পরে তাঁহার (১৫ ও ১২ বৎসরের) পুত্র দুইটি দশ দিনের ভিতর মারা যায়। সৌদামিনীর নিকট ১০০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ ছিল।

যে সময় বিধবা সৌদামিনী পুত্রশোকে পাগলপ্রায় ছিলেন, সেই সুযোগে (অর্থাৎ বালকদ্বয়ের মৃত্যুর একমাস পরেই) ভ্রাতা নগেন্দ্র ঐ টাকাগুলি তাঁহারই নামে গচ্ছিত রাখিতে ভগ্নীকে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, "স্ত্রীলোকের নামে টাকা জমা থাক্‌লে গোলমাল হ'তে

---

৩. মোর্সেদ—গুরু।

৪. সের্তাজ—(সের—তাজ) মাথার মুকুট, অর্থাৎ মুকুটতুল্য শ্রদ্ধাস্পদ।

৫. স্ত্রীলোকদের দুঃখকাহিনীপূর্ণ একটি প্রবন্ধ কোন উর্দ্দু সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছিল। সম্পাদক তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই—লিখিলেন যে, এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করিলে সাধারণ পুরুষসমাজ চটিবেন! সুখের বিষয়, বাঙ্গালা কাগজগুলির যথেষ্ট সৎসাহস আছে, তাই রক্ষা! নচেৎ আমাদের দুঃখের কান্না কাঁদিবার উপায়ও থাকিত না!

পারে। আমি ত আর তোমার পর নই।" ভগ্নীর মাথা ঠিক ছিল না, নগেন্দ্র যাহা লিখাইলেন তিনি তাহাই লিখিলেন। ভাবিলেন, "অমন চাঁদ যদি গিয়াছে, তবে আর পোড়ার টাকা থেকে কি হবে? প্রতিভার বিয়ে ত নগেন্দ্র দিবেই। আমি এখন ম'লে বাঁচি।" নগেন্দ্র ক্রমে দুই তিনটা কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইলেন। কিন্তু প্রতিভার বিবাহের জন্য মোটেই ভাবেন না। তাহার বয়স ১২ বৎসর হইলে সৌদামিনী তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি যত তাড়া করেন, নগেন্দ্র ততই বলেন, "বর পাওয়া যায় না!"

প্রতিভা ১৫ বৎসরের হইল—বিবাহ হইল না। ১০০০০ টাকা দিয়া বর পাওয়া যায় না, একথা কি পাঠিকা বিশ্বাস করেন? প্রতিবেশিনীরা নিন্দা করে, অভিশাপ দেয়, "ছি ছি কেমন মামা!" বলে, তাহাতে নগেন্দ্রের কি ক্ষতি হয়! পল্লীগ্রামের নিন্দা অপবাদ চতুপার্শ্বস্থিত শস্যক্ষেত্রেই বিলীন হয়। প্রকাণ্ড পাটক্ষেত্রে বড় বড় শূকর লুক্কায়িত থাকিতে পারে, আর ঐ নিন্দাটুকু লুকাইতে পারিবে না?

এখন সৌদামিনী দেখিলেন তাঁহার স্বামীর কষ্টে উপার্জ্জিত টাকা দ্বারা নগেন্দ্রের অবস্থা ভাল হইল, কন্যাদের বিবাহ হইল—কেবল তাঁহারই একমাত্র প্রতিভা কুমারী রহিল!!

ভগ্নী মানকুমারী বলিয়াছেন :

"কাঁদ তোরা অভাগিনী। আমিও কাঁদিব,
আর কিছু নাহি পারি, ক' ফোঁটা নয়ন বারি
ভগিনী! তোদেরি তরে বিজনে ঢালিব;
যখন দেখিব চেয়ে অনূঢ়া "প্রাচীনা মেয়ে"
কপালে যোটেনি বিয়ে—তখনি কাঁদিব,
যখন দেখিব বালা সহিছে সতিনি জ্বালা
তখনি নয়ন জলে বুক ভাসাইব;
সধবা বিধবা প্রায় পরান্ন মাগিয়া খায়—
দেখিলে কাঁদিয়া তার যমেরে ডাকিব,
এ তুচ্ছ এ হীন প্রাণ দিতে পারি বলিদান—
তোদেরি কল্যাণে বোন্! কিন্তু কি করিব?
কাঁদিতে শকতি আছে, কাঁদিয়া মরিব।"

আমি কি[illegible]তার সহিত একমত হইয়া কাঁদি[illegible] সুরে সুর মিলাইতে পারি[illegible] আমার ভগ্নীটি [illegible] সবখানি শক্তি কেবল "[illegible] মরিতে" ব্যয় করিলে[illegible] ঐরূপ বিজনে অশ্রু [illegible]লিয়া ঢালিয়াই ত আমরা এম[illegible]লা হইয়া পড়িয়াছি।

আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভ্রাতা ভগ্নীগণ হয়ত মনে করিবেন যে আমি কেবল ভ্রাতৃবৃন্দকে নরাকারে পিশাচরূপে অঙ্কিত করিবার জন্যই কলম ধরিয়াছি। তাহা নয়। আমি ত কোথাও ভ্রাতাদের প্রতি কটু শব্দ ব্যবহার করি নাই—কাহাকেও পাপিষ্ঠ, পিশাচ, নিষ্ঠুর বলিয়াছি কি? কেবল রমণীহৃদয়ের ক্ষত দেখাইয়াছি। ঐ যে কথায় বলে, "বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়", এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে—ভগ্নীর দুঃখ বর্ণনা করিতে ভ্রাতৃনিন্দা হইয়া পড়িয়াছে।

সুখের বিষয় আমাদের অনেক ভ্রাতা এরূপ আছেন, যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে যথেষ্ট শান্তিতে গৃহসুখে রাখেন। কিন্তু দুঃখের সহিত আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে অনেক ভ্রাতা আপন আপন বাটীতে অন্যায় স্বামীত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন।

এখন বোধ হয় সুযোগ্য ভ্রাতৃগণ বুঝিবেন যে "এত বড় সংসারে আমরা নিরাশ্রয়া" বলিয়া আমি ভুল করি নাই—ঐ কথার প্রতিবর্ণ সত্য। আমরা যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, অভিভাবকের বাটীতে থাকি। প্রভুদের বাটী যে আমাদিগকে সর্ব্বদাই রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম হইতে রক্ষা করে, তাহা নহে। তবু :

যখন আমাদের চালের উপর খড় থাকে না, দরিদ্রের জীর্ণতম কুটীরের শেষ চালখানা ঝঞ্ঝানিলে উড়িয়া যায়,—টুপ-টাপ বৃষ্টিধারায় আমরা সমস্ত রাত্রি ভিজিতে থাকি,—চপলা-চমকে নয়নে ধাঁধা লাগে,—বজ্রনাদে মেদিনী কাঁপে, এবং আমাদের বুক কাঁপে,—প্রতি মুহূর্ত্তে ভাবি, বুঝি বজ্রপাতে মারা যাই—তখনও আমরা অভিভাবকের বাটীতেই থাকি !

যখন আমরা রাজকন্যা, রাজবধূরূপে প্রাসাদে থাকি, তখনও প্রভু-গৃহে থাকি। আবার যখন ঐ প্রাসাদতুল্য ত্রিতল অট্টালিকা ভূমিকম্পে চূর্ণ হয়,—সোপান অতিক্রম করিয়া অবতরণ কালে আমাদের মাথা ভাঙ্গে, হাত পা ভাঙ্গে—রক্তাক্ত কলেবরে হতজ্ঞান প্রায় অবস্থায় গোশালায় গিয়া আশ্রয় লই,—তখনও অভিভাবকের বাটীতে থাকি ! !

অথবা গৃহস্থের বৌ-ঝী রূপে প্রকাণ্ড আটচালায় বাস করিলেও প্রভুর আলয়ে থাকি ; আর যখন চৈত্র মাসে ঘোর অমানিশীথে প্রভুর বাটীতে দুষ্টলোক কর্ত্তৃক লঙ্কাকাণ্ডের অভিনয় হয়,—সব জিনিষপত্রসহ ঘরগুলি দাউদাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে,—আমরা একবসনে প্রাণটি হাতে করিয়া কোনমতে দৌড়াইয়া গিয়া দূরস্থিত একটা কুলগাছতলে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকি,—তখনও অভিভাবকের বাটীতে থাকি ! ! ! (জানি না, কবরের ভিতরও অভিভাবকের বাটীতে থাকা হয় কি না ! !)

ইংরাজিতে Home বলিলে যাহা বুঝায়, "গৃহ" শব্দ দ্বারা আমি তাহাই বুঝাইতে চাই। উপরে যে রাণী, রমা, হামিদা, জোবেদা প্রভৃতির অবস্থা বলা হইয়াছে, তাঁহারা কি গৃহসুখ ভোগ করিতেছেন? শারীরিক আরাম ও মানসিক শান্তিনিকেতন যাহা, তাহাই গৃহ। বিধবা হইলে স্বামীগৃহ একরূপ বাসের অযোগ্য হয় ; হতভাগিনী তখন পিতা, ভ্রাতার শরণাপন্ন হয় কিন্তু তাহাতে তাহার যে দশা হয়, সৌদামিনী-চিত্রে বর্ণিত হইয়াছে। একটা হিন্দি প্রবাদ আছে :

"ঘর কি জ্বলি বনমেঁ গেয়ী—বনমেঁ লাগি আগ
বন বেচারা কেয়া করে,—করমমেঁ লাগি আগ !"

অর্থাৎ "গৃহে দগ্ধ হইয়া বনে গেলাম, বনে লাগিল আগুন ; বন বেচারা কি করিবে, (আমার) কপালেই লাগিয়াছে আগুন !"

তাই বলি, গৃহ বলিতে আমাদেরই একটি পর্ণকুটীর নাই। প্রাণি-জগতে কোন জন্তুই আমাদের মত নিরাশ্রয়া নহে। সকলেরই গৃহ আছে—নাই কেবল আমাদের।[৬]

---

৬. আমাদের যে সকল ভগ্নী গৃহসুখভোগ করেন, এ সন্দর্ভটি তাঁহাদের জন্য লিখা হয় নাই—ইহা গৃহহীনাদের জন্য।

মতিচুর।

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মিসিস্ আর, এস্, হোসেন প্রণীত।

RARE

কলিকাতা
৮৬এ, লোয়ার সার্কিউলার রোড।
১৩২৮

All rights reserved.

ম তি চূ র (২য় খণ্ড)

উৎসর্গ-পত্র

আপাজান !

আমি শৈশবে তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ণপরিচয় পড়িতে শিখি। অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দ্দু ও পারসী পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাঙ্গালা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাঙ্গালা পড়ার অনুকূলে ছিলে। আমার বিবাহের পর তুমিই আশঙ্কা করিয়াছিলে যে আমি বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিয়া যাইব। চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুরে থাকিয়া, বঙ্গভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবার একটি লোক না পাইয়াও যে বঙ্গভাষা ভুলি নাই, তাহা কেবল তোমারই আশীর্ব্বাদে। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া ১১ বৎসর যাবত এই উর্দ্দু স্কুল পরিচালনা করিতেছি ; এখানেও সকলেই—পরিচারিকা, ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি সকলেই উর্দ্দুভাষিণী। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত উর্দ্দু ভাষাতেই কথা কহিতে হয়। আবার বলি, এতখানি অত্যাচারেও যে বঙ্গভাষা ভুলিয়া যাই নাই, তাহা বোধ হয় কেবল তোমারই আশীর্ব্বাদের কল্যাণে ! স্নেহ ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থখানি তোমার করকমলে সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করিলে ধন্য হইব। এ পুস্তকে তোমার বড় সাধের “ডেলিশিয়া হত্যা”ও দেওয়া হইয়াছে।

নিবেদন

মতিচূরের প্রথমখণ্ড পাঠক ও পাঠিকা সমাজে অতিশয় আদৃত হওয়ায় এবং পাঠক পাঠিকাদের অনুরোধে দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশ করা গেল। প্রথমখণ্ডে যে সকল দোষ ছিল, তাহা যথাসাধ্য সংশোধন করা গিয়াছে। আর যে সকল ত্রুটি আছে, তাহার কারণ লেখিকার বিদ্যা বুদ্ধির দৈন্য এবং বহুদর্শিতার অভাব। গুণগ্রাহী পাঠক পাঠিকাগণ এবারও তাহা মার্জ্জনা করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

বিনীতা

গ্রন্থকর্ত্রী

বিজ্ঞাপন

দ্বিতীয়খণ্ড মতিচূরের রচনাসমূহ পূর্ব্বে "নবনূর", "ভারত-মহিলা," "আল এসলাম," "সওগাত" এবং "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় অতি সাদরে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখালেখির বিরুদ্ধে পাঠক পাঠিকা সমাজের কোন উচ্চবাচ্চ শ্রুতিগোচর হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না।

এবার কোন কোন রচনা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। "ডেলিশিয়া হত্যা" ইংরাজী হইতে এবং "নূর-ইসলাম" উর্দ্দু হইতে অনূদিত হইয়াছে। "নারী সৃষ্টি"ও ইংরাজীর আংশিক অনুবাদ। "সুলতানার স্বপ্ন" পূর্ব্বে ইংরাজীতে রচিত হইয়াছিল। ইংরাজী অনভিজ্ঞা পাঠিকা ভগিনীদের আগ্রহাতিশয্যে উহার বাঙ্গালা করা গিয়াছে। "মুক্তিফল" বিগত ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস ভঙ্গের পর রচিত হইয়াছিল ; এবার কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধন করা গিয়াছে।

নূর-ইসলাম

মিসিস এনি বেশান্তের "ইসলাম" শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করিলে বাস্তবিক মোহিত হইতে হয়। "ইসলাম" শব্দের সমভিব্যাহারে মিসিস বেশান্তের নাম শুনিয়া আপনারা কেহ ভীত হইবেন না। প্রথমে আমারও আশঙ্কা হইয়াছিল যে, তিনি হয়ত তাঁহার 'থিয়োসফী' ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে গিয়া আমাদের একমাত্র সম্বল ইসলামের উপর, খানিকটা হাত সাফ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমার সে ভ্রান্তি দূর হইল। হাত সাফ করা ত অতি দূরে—ইহার প্রতি পত্র—প্রতি ছত্র সুপক্ক আঙ্গুরের ন্যায় অতি মিষ্ট ভক্তিরসে পরিপূর্ণ! তিনি নূর-ইসলাম (বা ইসলাম-জ্যোতির) এমন উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যে তাহার তুলনা হয় না। —এমনকি প্রিয় বঙ্গভাষায় ইহার মর্ম্মোদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

তবে কথা এই যে, অনুবাদ করিবার মত ক্ষমতা ও বিদ্যাবুদ্ধি সকলের থাকে না — বিশেষতঃ আমার ন্যায় লোকের তাদৃশ চেষ্টা! তাহাতে আবার আমি বহু চেষ্টা করিয়াও মিসিস এনি বেশান্তের মূল ইংরাজী বক্তৃতা-পুস্তিকাখানি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমাকে উহার উর্দ্দু অনুবাদের উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। অনুবাদক মহোদয় অতি উচ্চ (সুফিধর্ম্ম ভাবপূর্ণ) ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন!

সুতরাং আমি যদি ঐ অনুবাদের অনুবাদ করিতে গিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, নিজের ভাব ব্যক্ত এবং বিকৃত ভাষা ব্যবহার করিয়া ফেলি, সে ত্রুটি মার্জ্জনীয় বলিয়া ভরসা করি।

আর একটি কথা,—মিসিস এনি বেশান্ত যেমন হজরতের নাম উল্লেখ করিতে অত্যধিক সম্মানের ভাষা ব্যবহার না করিয়া, ভক্তের সরল ভাবপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, অনুবাদক মোঃ হাসেনউদ্দিন সাহেবও তদ্রূপ করিয়াছে ; যথা "আব ওহ মহম্মদ সিরফ্ মহম্মদ হি না রহা বাল্‌কে ওহ পয়গম্বরে আরব হুয়া" ইত্যাদি। ভাব ও ভাষার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নষ্ট হওয়ার ভয়ে আমি অনুবাদক মহাশয়ের প্রথা অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আর দিবাকরের সমুজ্জ্বল কান্তি দেখাইবার জন্য, অন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না ; পুষ্পের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের নিমিত্ত অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় না। যাহা হউক, আশা করি, আমি আড়ম্বরপূর্ণ সম্মানসূচক শব্দের বহুল প্রয়োগ বর্জ্জন করায় দোষী হই নাই।

এখন আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন, মিসিস বেশান্ত কি বলিতেছেন :

ভদ্র মহোদয়গণ!

প্রত্যেক দেশের জাতীয় উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও নৈতিক উন্নতির যাবতীয় কারণ সমূহের মধ্যে প্রধান কারণ হইতেছে — ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি কিম্বা সভ্যতা লাভ করিতে পারে না। সে দেশের সমুদয় অধিবাসী একই ধর্ম্মবলম্বী, যে দেশে সকলে একই ভাবে একই ঈশ্বরের পূজা করে — তাঁহাকে সকলে একই নামে ডাকে এবং প্রত্যেকে ব্যক্তির মনোভাব একই সূত্রে গ্রথিত থাকে, সে দেশ অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার মতে যে দেশে এক ঈশ্বরকে লোকে বিভিন্ন নামে

ডাকে ; একই ঈশ্বরের উপাসনা বিবিধ প্রণালীতে হয় ; একই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট লোকে বিভিন্ন ভাষায় প্রার্থনা করে, তথাপি সকলে ইহাই মনে করে যে, আমরা সকলে একই গন্তব্যস্থানে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়াছি, এবং এইরূপ পার্থক্যের মধ্যে একতা থাকে ; যদি কোন দেশের ঐ অবস্থা হইত, (কিন্তু অদ্যাপি এমন কোন ভাগ্যবতী দেশের বিষয় জানা যায় নাই।) — আমার মতে সে দেশ নিশ্চয়ই ধর্ম্মে প্রধান হইত।

অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন ধর্ম্ম এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাসী লোক আছে, কিন্তু ভারতবর্ষ এই আদর্শের অদ্বিতীয় দেশ—ইহার তুলনা এ ভারত নিজেই। এদেশে এত স্বতন্ত্র ধর্ম্ম এবং এত পৃথক বিশ্বাসের লোক বাস করে যে, মনে হয় যেন ভারতবর্ষে সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম-মত-সমূহের প্রদর্শনী-ক্ষেত্র। এবং এই দেশই সেই স্থান, যেখানে পরস্পরের একতা, মিত্রতা এবং সহানুভূতির মধ্যে ধর্ম্মের সেই আদর্শ—যাহাকে আমি ইতঃপূর্ব্বে বাঞ্ছনীয় বলিয়াছি—পাওয়া যাইতে পারে।

আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি আপনাদিগকে চারিটি প্রধান ধর্ম্মের, অর্থাৎ বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়, হিন্দু এবং অনল-পূজার বিষয়ে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের, অর্থাৎ ইসলাম, জৈনমত, এবং শিখধর্ম্মের আলোচনা রহিয়া গিয়াছিল। এই তিন ধর্ম্ম—যাহা ভারতবর্ষের প্রধান সাতটী ধর্ম্মের অন্তর্গত—ইহাদের পরস্পরে এত অনৈক্য দেখা যায় যে, ইহারা একে অপরের রক্ত-পিপাসু হইয়া উঠে এবং দুইজনের মনের মিলনের পক্ষে এই ধর্ম্ম-পার্থক্য এক বিষম অন্তরায় হইয়া আছে।

আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, ভারতবর্ষ হেন দেশে যদি সকলে চক্ষু হইতে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আবরণ উন্মোচন করিয়া ন্যায়চক্ষে দৃষ্টিপাত করতঃ চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে "আমরা প্রকৃতপক্ষে একই প্রভুর উপাসনা বিভিন্ন প্রণালীতে করিতেছি—একই প্রভুকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ও ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকিতেছি।"

["পুরাও পুরাও মনস্কাম,—
কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
জগতের ভাষাহীন ভাষা?"—
ড. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
"সকলে তাঁরেই ডাকে,
আমি যাঁরে ডাকি,—
রাঙ্গা রবি নিয়া বুকে   ঊষা ডাকে সোণামুখে
গোধূলি বালিকা ডাক
শ্যাম ছটা মাখি।"—
মানকুমারী দেবী।]

আর, একই স্থান হইতে আমরা আসিয়াছি এবং সেইখানে পুনরায় যাইতেছি। ইহার ফল এই হইবে যে, একে অপরের সহিত নিতান্ত আন্তরিক ও প্রকৃত ভ্রাতৃভাবে মিশিতে পারিবে। একের দুঃখে অপরে দুঃখিত হইবে—সমুদয় ভারতবাসী একই জাতি বলিয়া পরিগণিত

সমান অধিকার প্রাপ্ত হইবে। অধিকন্তু জগতের বড় বড় শক্তিপুঞ্জ ভারতসন্তানকে একজাতি বলিয়া স্বীকার করিবে। যখন হিন্দু মুসলমানে, পারসী-খ্রীষ্টানে, জৈন-য়ীহুদীতে এবং বৌদ্ধ-শিখে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আলিঙ্গন হইবে, তখন আমি মনে করিব যে, ধর্ম্মের জয় এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পবিত্র নাম শান্তিপ্রদ হইয়াছে।

অদ্য আমি ইসলাম-সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব এবং আগামী কল্য ও পরশ্ব অবশিষ্ট দুই ধর্ম্ম সম্বন্ধে, এবং অনন্তর সমুদয় ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম-সারতত্ত্ব অর্থাৎ সেই থিয়োসফী (ব্রহ্মজ্ঞান বা "এলমে-এলাহী") সম্বন্ধে আলোচনা করিব, যাহাতে প্রত্যেক ধর্ম্মবিশ্বাসের সারভাগ আছে এবং যাহা সকলের উপর একই প্রকার অধিকার রাখে—যাহাকে কোন বিশেষ ব্যক্তি তাহার নিজস্ব বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বলিতে পারে না ; বরং তদ্বিপরীত যে কোন ধর্ম্মবিশ্বাসের অধিকারী বলিতে পারে যে, ইহাই আমারও ধর্ম্ম। অদ্য সমিতির সম্মাৎসরিক অধিবেশন দিনে আমার এই প্রার্থনা যে, বিশ্ব-সংসারের সমুদয় ধর্ম্মগুরুদের পবিত্র-আত্মা আমাদের ও আমাদের কার্য্যকলাপের প্রতি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদপূর্ণ দৃষ্টিপাত করুন—যেন তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী একজন অপরকে ভাল বাসিতে পারেন। আমীন !

ইসলাম

কোন ধর্ম্ম পরীক্ষা করিতে হইলে, আমাদিগকে চারিটি বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। সর্ব্বপ্রথম সেই ধর্ম্মের উৎপত্তির ইতিহাস, যাহার প্রভাব তাহাতে (সেই ধর্ম্মে) লুক্কায়িত থাকে। দ্বিতীয়, তাহার প্রকাশ্য বা বাহ্যিক মত অথবা শাখা পল্লব, যাহার সহিত সাধারণে সম্পর্ক রাখে। তৃতীয়, ধর্ম্মের দর্শন, যাহা বিদ্বান এবং সুশিক্ষিত লোকদের জন্য। চতুর্থ, ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য, যাহাতে সাধারণতঃ মানবের আপন অহং বা অস্তিত্বজ্ঞানের ভাণ্ডারের সহিত মিশিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রকাশ পায়। আমি এই কষ্টিপাথরে ইসলামকে পরীক্ষা করিয়া আপনাদিগকে দেখাইতে চাই যে, সর্ব্বপ্রথমে আরব ও শামদেশের অবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া দেখুন, সে দেশের কি দশা ছিল।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন সমস্ত আরব, শাম ও আজমদেশে অসভ্যতার ঘোর অন্ধকারে কুসংস্কারের প্রবল ঝঞ্ঝানিল বহিতেছিল ; যুদ্ধকলহ ও পরস্পরের রক্তারক্তি এক দলকে অন্য দল হইতে পৃথক করিতেছিল ; হিংসা দ্বেষ প্রবল ছিল যে, একই বিষয়ের ঝগড়া কয় পুরুষ পর্য্যন্ত চলিত ;[১] যথা এক ব্যক্তি কোন বিষয় লইয়া অন্য একজনের সহিত বিবাদ করিল, অনন্তর শত বৎসর পরে একের পৌত্র অপরের পৌত্রকে শুধু এই অজুহাতে হত্যা করিত যে, "ইহার পিতামহ আমার পিতামহের শত্রু ছিল !" ইহা সেই আরব দেশ—সেখানে কেবল এই কথায় যুদ্ধ আরম্ভ হইত যে, "তোমার উষ্ট্র আমার উষ্ট্রকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল কেন ?" বাস, এই সামান্য কারণে রক্তনদী প্রবাহিত হইত—শবরাশি স্তূপীকৃত

---

১. আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সভ্যযুগেও বঙ্গীয় মুসলমানদের ঘরে ঐরূপ বংশানুক্রমে চিরস্থায়ী বিবাদ দেখা যায়। এইজন্য আমরা কলিকাতা হাইকোর্টে "Hereditary enemy" শব্দ শুনিতে পাই। আহা ! কবে আমাদের প্রতি খোদাতালার রহমৎ হইবে !

হইত ! এ সেই আরব দেশ—যেখানে নিষ্ঠুর পিতা, মাতার ক্রোড় হইতে শিশু কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া আসিত। আর হত ভাগিনী নিরুপায় মাতা আপন স্বাভাবিক মাতৃস্নেহপূর্ণহৃদয়ের অসহ্য বেদনা লইয়া মরমে মরিয়া থাকিত। স্ত্রীলোক হওয়ার দরুণ পাষণ্ড স্বামীর ঐ নির্ম্মম অত্যাচারে আপত্তি করিতে পারে, এতটুকু ক্ষমতাও তাহার ছিল না। কাহাকেও জামাতা বলিতে না হয়, এইজন্য কন্যা হত্যা করা হইত। ইহা সেই দেশ, যেখানে ঘৃণিত পৌত্তলিকতা বিরাজমান ছিল—ঘরে ঘরে নতুন দেবতা ; এক ঠাকুর আবার অন্য ঠাকুরের প্রাণের শত্রু ! প্রতিমার সম্মুখে নরবলিদান' ত নিত্য ক্রীড়া ছিল ; যেখানে মানবজাতির প্রতি স্নেহ মমতার পরিবর্ত্তে বিলাসিতা ও আত্মপরায়ণতা পূর্ণ মাত্রায় রাজত্ব করিত। যে কোন প্রবল ব্যক্তি আপন দুর্ব্বল প্রতিবেশীকে বিনা কারণে কিম্বা অতি সামান্য কারণে হত্যা করিয়া ফেলিত ; তাহার ঐ দুষ্ক্রিয়ায় বাধা দিবার লোক' ত দূরে থাকুক, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবারও কেহ ছিল না।

তদানীন্তন আরবে বিলাসিতার ও অন্যান্য "মকারাদি" কুক্রিয়ার অন্ত ছিল না ; এক স্বামী ভেড়া ছাগল প্রভৃতি পশুর ন্যায় অসংখ্য ভার্য্যা গ্রহণ করিত ; আর এই বিষয়ে গৌরব করা হইত যে অমুক ধনী ব্যক্তি এত অসংখ্য স্ত্রীর স্বামী। ঈশ্বরের সৃষ্টি—স্ত্রীজাতি এমন জঘন্য দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল যে, তাহারা নিতান্ত অসহায় গৃহপালিত পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিত। মোটের উপর এমন কোন নিকৃষ্ট পাপ ও জঘন্য দোষ নাই, যাহা তৎকালীন আরবে না ছিল।

সেই স্বার্থ, অত্যাচার ও আত্মপরতার পূতিগন্ধময় জলবায়ু পরিবেষ্টিত এক কোরেশগৃহে একটি শিশু (সে পবিত্র শিশুরত্নের উদ্দেশে সহস্র দরুদ !) জন্মগ্রহণ করিলেন, যাঁহার পিতা তাঁহার জন্মের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর তিনিও সেইরূপ পিতা ছিলেন, যিনি তদীয় পিতৃকর্ত্তৃক কোন প্রতিমার সম্মুখে নরবলিরূপে আনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ দেবালয়ের সেবিকার কৃপায়—সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।[২] এই শিশু এমন একটি হতভাগিনী দুঃখিনী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ইনি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই বিধবা হইয়াছিলেন, —আর দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কয়েক মাস পরেই এ অবোধ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া স্বামীর অনুগমন করেন। ইহার ফলে এই পিতৃমাতৃহীন শিশু কিছুদিন স্বীয় পিতামহ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার পিতামহও কয়েক বৎসর পরে দেহত্যাগ করিলেন। তখন সেই অসহায় বালক বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত, স্বীয় পিতৃব্য আবু তালেবের আশ্রয়ে রহিলেন। ইহা ত অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, এইরূপ বিপদগ্রস্ত পিতৃমাতৃহীন সহায়সম্পদশূন্য একটি অজ্ঞান বালক যে শিক্ষাদীক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত

---

২ হজরতের পিতামহ আবদুল মুত্তালিব যে স্বীয় পুত্র হজরত আবদুল্লাকে প্রস্তরমূর্ত্তির নিকট বলিদান করিতে গিয়াছিলেন, এ কথার সত্যতায় আমার একটু দ্বিধা বোধ হয়। আলেম ফাজেলগণ দয়া করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিলে বিশেষ বাধিত হইব। বাঙ্গালা "আমির হামজা" পুঁথিতে দেখিয়াছি, —
(হজরত আবদুল মুত্তালিবের অন্য পুত্র হজরত আমির হামজা পিতাকে বলিলেন)—
"কাফেরে খাজানা দিবে মোছলমান হৈয়া।
আমি এয়ছা বেটা তবে কিসের লাগিয়া৷৷"
(এ ঘটনাটা সত্য)

থাকিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। বাস্তবিক কার্য্যতঃও তাহাই হইয়াছিল। শিক্ষা, বা অধ্যয়ন বলিতে একটি অক্ষরের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় হয় নাই, নীতি বা আচার নিয়মের অনুশাসনের বাতাস পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তথাপি তাঁহার শৈশবকাল, অতি পবিত্র জীবনের উচ্চ আদর্শ ছিল। তাঁহার নির্ম্মল জীবনে মানবের বাঞ্ছনীয় যাবতীয় সদ্‌গুণরাজি—যথা, দয়া, সৌজন্য, প্রেম, ধৈর্য্য, নম্রতা, বিনয়, শান্তিপ্রিয়তা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি স্বভাবতঃ বিরাজমান ছিল। তিনি নানা গুণে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বাল্যজীবন অতিক্রম করিয়া তিনি কৈশোরে উপনীত হইলেন। এখন জীবিকা-অর্জ্জনের নিমিত্ত তিনি আপন কোন বিধবা আত্মীয়ার গৃহে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। উক্ত বিধবা খদিজা বিবি তাঁহাকে পণ্যদ্রব্যসহ বাণিজ্য উপলক্ষে শামদেশে প্রেরণ করিতেন। এই বিষয়কর্ম্মে খজিদাবিবি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার এই নূতন কর্ম্মচারী অতিশয় ধর্ম্মভীরু, ন্যায়পরায়ণ, মিতব্যয়ী এবং অতি বিশ্বাসী। অতঃপর তিনি ইহার সহিত পরিণীতা হন।

ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এই নবীন যুবক যাঁহার নাম মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লাম) ছিল, সে সময়ে পয়গম্বর হন নাই। আর তাঁহার পত্নী হজরত খদিজাও তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুবর্ত্তিনী ছিলেন না ; তিনি স্বয়ং অল্পবয়স্ক তরুণ এবং তাঁহার জায়া তদপেক্ষা দ্বিগুণ বয়োজেষ্ঠা ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর তাঁহারা এমন সুখের দাম্পত্য জীবন ভোগ করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে তেমন মধুর দাম্পত্যজীবনের উচ্চ আদর্শ আর কেহ দেখাইতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ—আর তেমনই ভাবে তাঁহাদের বিবাহ জীবনের পূর্ণ ২৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার পর হজরত খদিজার মৃত্যু হইল। অতঃপর পয়গম্বর সাহেবের স্বভাব চরিত্র ও কার্য্যকলাপ সর্ব্বদাই অতি প্রশংসনীয় ছিল। যখন তিনি মক্কার সঙ্কীর্ণ গলিকুচাতে যাতায়াত করিতেন, সে সময় তত্রত্য ক্রীড়ারত অবোধ শিশুগণ তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিত, আর তিনি সততই তাহাদের সহিত স্নেহসিক্ত মিষ্টভাষায় কথা বলিতেন, তাহাদের মস্তকে হস্তামর্শন করিতেন। কেহ কখনও শুনে নাই যে, তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা বিপদগ্রস্তের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন ; বিধবা ও পিতৃহীন শিশুদের সান্ত্বনা ও প্রবোধ দান তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। প্রতিবেশিবর্গ তাঁহাকে "আমীন" (বিশ্বস্ত) বলিয়া ডাকিত। "আমীন" শব্দের অর্থ বিশ্বাসভাজন—এমন উচ্চ ভাবপূর্ণ উপাধি কেবল শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিই বিশ্ব জগতের নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন। এখন আপনারা একটু চিন্তা করিয়া দেখুন ত ; যে ব্যক্তির বাহ্যিক জীবন জগতের পক্ষে এমন উপকারী এবং সুখ শান্তিপ্রদ ছিল, তাঁহার আভ্যন্তরীণ জীবন কেমন হইতে পারে। অহো ! (সত্য তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত) তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতার বন্যাস্রোতের তাড়না তাঁহাকে বনে বনে ও জনপ্রাণিশূন্য মরুভূমে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। তিনি কতবার দিবানিশি অনশনে অনিদ্রায় বিপৎসঙ্কুল পর্ব্বতকন্দরে বাস করিতেন। তিনি যে ভাবে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ঈশ্বর-অনুসন্ধান করিতেন, তাহা বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ভাষা দুর্লভ ; অথবা ইহার মর্ম্ম কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, যাঁহারা একাগ্রচিত্তে খোদার পথে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

ক্রমে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) এই প্রকার ধ্যান-আরাধনা এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে — অতি দূরে—ঘোর অরণ্যে চলিয়া যাইতেন ; দুর্গম ও

ভয়ঙ্কর গিরিগুহায় মাসাধিককাল পর্য্যন্ত বাস করিতেন—সেখানে শুধু সিজদায় (নতশিরে) পড়িয়া অনবরত রোদন ও বিলাপ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কাজ ছিল না। এমনকি তিনি অন্যূন পঞ্চদশ বর্ষ এই ভাবে যাপন করিলেন—অবশেষে সেই শুভ মুহূর্ত্ত আসিল, যখন দৈববাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "উঠ! খোদায় পাকের (পবিত্র ঈশ্বরের) নাম উচ্চারণ কর!" কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না, সে শব্দ কাহার; অথবা ঐ আকাশবাণী বাস্তবিকই বিশ্বাসযোগ্য দৈববাণী কি না? কারণ তিনি বেশ জানিতেন যে, তিনি নিরক্ষর লোক ছিলেন। তাঁহার সন্দেহ হইত যে, ইহা হয়ত তাঁহার ভ্রম বা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র—কিম্বা তাঁহার অহংজ্ঞান তাঁহাকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত ঐরূপ করিতেছে; এবং সম্ভবতঃ ইহা সেই দৈববাণী নহে, যাহা স্বয়ং খোদাতালার নিকট হইতে পয়গম্বরগণ শুনিতে পাইতেন, যাহাকে "এলহাম" কিম্বা "অহি" বলে।

অবশেষে আর একবার যখন তিনি ঈশ্বর-চিন্তায় অত্যন্ত আকুল ছিলেন, সহসা তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব এক অলৌকিক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, আর সেই আলোকরাশির মধ্যে একটা জ্যোতিষ্মান মূর্ত্তি দেখা দিয়া বলিলেন, "যাও, সত্য নাম উচ্চারণ কর।" একবার সাহসে ভর করিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কাহাকে ডাকিব?" ইহার উত্তরে স্বর্গদূত তাঁহাকে ঈশ্বরের একত্ব, ফেরেশ্‌তাদের রহস্য, পৃথিবীর সৃষ্টি এবং মানবজাতির অস্তিত্ব বিষয়ে শিক্ষাদান করিলেন এবং তাঁহাকে সেই দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর কর্ম্মভারের (পয়গম্বরীর) কথাও বলিলেন, যে জন্য তাঁহার জন্ম হইয়াছে। অর্থাৎ দেবদূত বলিয়া দিলেন যে, তাহাকে বিশ্ব জগতের ধর্ম্মপথ প্রদর্শক এবং উপদেষ্টার কার্য্যভার সমর্পণ করা হইয়াছে।

এদিকে দেবদূত অদৃশ্য হইলেন, ওদিকে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যিনি এখন হইতে আরব দেশের পয়গম্বর নামে অভিহিত হইবেন, অত্যন্ত অস্থির ও ভীতি বিহ্বল চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। পতিপ্রাণা সতী হজরত খাদিজা উপযুক্ত শুশ্রূষা সহকারে তাঁহার তাদৃশ বিহ্বলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে পয়গম্বর সাহেব আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় ইহা আমার মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ।" ইহাতে পতিপরায়ণা সাধ্বী রমণী অতিশয় সান্ত্বনাপূর্ণ মধুর বচনে তাঁহার নিস্তেজ হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়া বলিলেন, "না, না, তুমি সত্যবাদী—বিশ্বাসী—"আমীন"; প্রতিজ্ঞা পালনে যত্নবান; পিতৃহীনের প্রতি স্নেহ বর্ষণ কর; দরিদ্র, আতুর ও বিধবার প্রতি দয়া করিয়া থাক—এমন লোককে বিশ্বপাতা কখনই অকালে নষ্ট করিবেন না। প্রভু খোদাতালা কখনও বিশ্বাসী ভক্তদিগকে প্রবঞ্চনা করেন না। উঠ, এখন সেই দৈববাণী—প্রকৃত সত্য দৈববাণীর প্রত্যাদেশ অনুসারে কার্য্য কর।"

সেই পুণ্যবতী মহিলা, যিনি সর্ব্ব প্রথমে পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন,—এমনই সঞ্জীবনীসুধা পূর্ণ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন যে তিনি—যিনি নিজের দুর্ব্বলতায় জড়ীভূত ও নিরুদ্যম হইয়া সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়া বসিয়া ছিলেন,[৩] এখন পূর্ণ সাহসে ও উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে, একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন! আর সে মোহাম্মদ কেবল মোহাম্মদ মাত্রই রহিলেন না —বরং প্রবল প্রতাপশালী পয়গম্বর হইয়া গেলেন। তিনি একটা

৩. ইহা মিসিস বেশান্তের অতিশয়োক্তি। (আল-এসলাম সম্পাদক)

অসভ্য, অরাজক দেশকে শান্তিপূর্ণ এবং একটা জনপ্রাণীবিরল নগণ্য উপদ্বীপকে এক মহা সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী ইউরোপে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোক লইয়া গেলেন, এই দুইটী বস্তু সেখানে প্রায় ছিলই না। তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ পৃথিবীতে বড় বড় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থান করিলেন। তাঁহারা সমবিশ্বাসীগণ এমন নিষ্ঠার সহিত এলাহীর ধ্যান ও স্মরণে নিমগ্ন হইলেন যে, তাহার আদর্শ অন্য কোন ধর্ম্মে পাওয়া সম্ভবপর কি না সন্দেহ। কারণ আপনারা একটু চিন্তা করিলে এবং ন্যায়চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন যে, অন্য কোন ধর্ম্ম এমন নাই, যাহাতে এমন অকপটহৃদয় সত্যবিশ্বাসী লোক পাওয়া যায়। এই প্রাণ বিশ্বাস তাহারা (মুসলমানেরা) আরবদের পয়গম্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

যদি বেন সাহেবের কথামত ইহাই সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় যে, সাধারণ আচার ব্যবহার হইতে ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনারা ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবং ভাবিয়া দেখুন, তাঁহার (হজরতের) বাক্যসমূহ তাঁহার শিষ্যবর্গের হৃদয়ে কেমন স্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। মুসলমানেরা আরবের পয়গম্বর হইতে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস এমন সুদৃঢ় যে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ স্থান পায় না।

একজন মুসলমান—যদ্যপি এমন কোন স্থানে এমন কতকগুলি লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, যাহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ছুরিকায় খণ্ড খণ্ড করে এবং তাহার পয়গম্বরের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে—নমাজে মস্তক অবনত করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না।[৪]

আপনারা আরও একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন, পয়গম্বরের সুপারিশের (শাফা'আতের) প্রতি তাহাদের বিশ্বাস কেমন অটল যে, তাহারা মৃত্যুভয় একেবারে জয় করিয়া ফেলিয়াছে। আফ্রিকার দরবেশবৃন্দের সৎসাহসের তুলনা কেহ আমাকে দেখাইতে পারেন কি? —যাঁহারা ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু তোপ-কামানের সম্মুখে স্থিরভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবার জন্য এমনই আনন্দের সহিত অগ্রসর হইতেন, যেন বরযাত্রিরূপে কোন বিবাহ সভায় যাইতেছেন! এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের দলের কয়েক ব্যক্তি শত্রুসেনা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না পারিতেন, সে পর্য্যন্ত দলে দলে কামানে ধ্বংস হইতেন। সে কোন্ উদ্দীপনা ছিল, যাহা তাঁহাদিগকে এমন ভীষণ মৃত্যুমুখে লইয়া যাইত? তাহা কেবল পয়গম্বরের—কোরআনের মহিমা, এবং ইসলামপ্রেম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, (তাঁহাদের) এই ভক্তি পৃথিবীতে ভবিষ্যতেও অটল রহিবে, বরং বর্ত্তমান যুগ অপেক্ষা ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিবে। (আমীন।)

ভদ্র মহোদয়গণ! এখন আমি আরবীয় পয়গম্বরের সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি প্রমাণ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। তাহা এই যে—পয়গম্বরের "নবুয়তে" সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাঁহার সহধর্ম্মিনী—যিনি তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের সমুদয় রহস্য অবগত ছিলেন, আর তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ আত্মীয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার আশৈশব জীবনের স্বভাব-চরিত্র সমুদয় উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এই যদি আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে, পয়গম্বরের সত্যপরায়ণতা সম্বন্ধে অতি জ্বলন্ত প্রমাণ পাইবেন। আপনারা নিজেরাই

৪. মিসিস এনি বেশান্তের বর্ণিত মুসলমান কি আমরাই? ছি! ছি! ধিক্ আমাদের! আমরা মুসলমান নামের কলঙ্ক। বঙ্গদেশে দড়ি ও কলসী একেবারে নাই কি?

বেশ জানেন যে, কোন বিজ্ঞ বক্তৃতানিপুণ ব্যক্তি কোন সভা সমিতিতে গিয়া বেশ ঝাড়া দুই ঘন্টা উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রভাবে শ্রোতৃবর্গকে মোহিত ও চমৎকৃত করিয়া স্বমতে তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারে—যেহেতু সে সময় লোকে তাহাকে কেবল বক্তৃতা-মঞ্চেই দেখে ; তাহার আভ্যন্তরীণ জীবনের অবস্থা কিছু জানে না। কিন্তু ইহা বড় কঠিন, এমনকি অসম্ভব যে নিজের স্ত্রী, কন্যা জামাতা প্রভৃতি অতি নিকটবর্ত্তী আত্মীয়গণ তাহার সত্যতার সাক্ষ্য দান করে—যদি সে ব্যক্তি বাস্তবিক তদ্রূপ নির্ম্মল ও সত্যপর না হয়। আমাদের মতে ইহারই নাম "পয়গম্বরী" এবং সত্য বলিতে কি এমন বিশ্বব্যাপী জয়লাভ হজরত মসিহের (যীশুর) ভাগ্যেও ঘটে নাই।[৫]

আরবীয় পয়গম্বরের সমুদয় আত্মীয়বান্ধবদের মধ্যে কেবল তাঁহার পিতৃব্য আবু তালেবই (?) এমন ছিলেন, যিনি কেবল নিজের একগুঁয়ে গোঁড়ামীর জন্য তাঁহার ধর্ম্মমতে (প্রকাশ্যে) বিশ্বাস করেন নাই। তিনি সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশের দলপতি ছিলেন বলিয়া আপন পুরাতন পৈতৃক ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেওয়া নিজের জন্য মানহানিকর বোধ করিতেন ; নতুবা তাঁহার কার্য্যকলাপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত যে, তিনি পয়গম্বরের ধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ তিনি রাসুলোল্লাহকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন, "হে পিতৃব্যপ্রাণ ! তুমি অসঙ্কোচে আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে থাক ; আমার জীবদ্দশায় কাহার সাধ্য যে, তোমার দিকে কটাক্ষপাত করে?" একদিন আবু তালেব স্বীয় পুত্র হজরত আলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর ধর্ম্ম বিশ্বাস কি? আর তুই মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে কি মনে করিস?" হজরত আলী অত্যন্ত সম্মান অথচ উৎসাহের সহিত উত্তর করিলেন, "পিতৃদেব ! আমি একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহকেই পূজনীয় মনে করি, এবং মোহাম্মদকে আল্লাহ্তালার প্রকৃত প্রেরিত বলিয়া মানি। আর এই জন্য পয়গম্বরের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইব না!"

ঈদৃশ উত্তর শ্রবণে পিতার অসন্তুষ্টি হইবারই সম্ভাবনা ছিল ; কিন্তু তাহা তো হইল না! বরং তিনি বলিলেন, "পিতৃ-প্রাণ-পুত্তলি ! আমি তোমাকে অতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ ও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অনুমতি দিতেছি। যেহেতু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি তোমাকে সুপথ ছাড়া কুপথে পরিচালিত করিবেন না।"

নবুয়তের (পয়গম্বরী প্রাপ্তির) তিন বৎসর পর্যন্ত পয়গম্বর সাহেব নীরবে, বিনা আড়ম্বরে আপন মিশনের কার্য্য করিতেছিলেন। সে সময় তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা মাত্র ৩০ জন ছিল। অতঃপর তিনি প্রথমে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে আল্লাহ্তালার একত্বের বিষয় অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং নরবলিদান, বিলাসিতা ও সুরাপান যে অতি কদর্য্য, তাহাও বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ

---

৫. অল্পদিন হইল—মুসলমান গ্রন্থকারগণ ইংরাজী ভাষায় এসলাম-সম্বন্ধে পুস্তক পুস্তিকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে ইউরোপে এসলাম সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাতব্যই খ্রীষ্টান মিশনের এজেন্সী হইতে সংগ্রহ করা হইত—কাজেই অজ্ঞ ইউরোপ এসলামের নামে একেবারে শিহরিয়া উঠিত। এই অল্পদিনের চেষ্টায় কিরূপ ফল হইয়াছে, এই বক্তৃতা হইতেই তাহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। লর্ড হেডলি, খাজা কামালুদ্দিন, মিঃ এহয়া-উন-নাস্‌র পর্কিনসন প্রভৃতি মুসলমান লেখকগণের চেষ্টায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের কিরূপ মত পরিবর্ত্তন হইতেছে, "Islamic Review'' পত্র পাঠ করিলে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে। আল-এসলাম—সম্পাদক।

বক্তৃতার গুণে অনেকের হৃদয়ে বিশ্বাসের জ্যোতি প্রদীপ্ত হইল এবং তাঁহার শিষ্য সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবন্ধকতা–বহ্নিও পয়গম্বর সাহেবের বিরুদ্ধে দেশময় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বিরোধী দলের হস্তে পয়গম্বর সাহেব যত প্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও নিগ্রহ ভোগ করেন, সাধারণ মানব তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না।

বিধর্ম্মী শত্রুগণ পয়গম্বর সাহেবের ভক্ত, বিশ্বাসী লোককে যখন যেখানে দেখিতে পাইত, তন্মুহূর্ত্তেই হত্যা করিত। কাহারও প্রতি অমানুষিক নির্যাতন করিত। কাহাকে বা হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া মরুভূমিতে উত্তপ্ত বালুকার উপরে শয়ান করাইয়া তাঁহার বক্ষের উপর প্রস্তর চাপা দিয়া বলিত, "তুই মোহাম্মদ ও তাহার আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর!" কিন্তু এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও তাঁহারা মোহাম্মদের কলেমা পড়িতে পড়িতে অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতেন!

একদা কোন দুরাত্মা জনৈক মুসলমানকে ধরিয়া তাঁহার দেহ হইতে খণ্ড খণ্ড মাংস কাটিয়া ফেলিতেছিল, আর বলিতেছিল, "এ তুই যদি নিজের পুত্র পরিবারের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ঘরে থাকিতিস, আর তোর স্থলে তোর মোহাম্মদ এইরূপ ছিন্নদেহে ভূমে লুটাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিত তবেই বেশ ভাল হইত!" কিন্তু সেই সত্য ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান মৃত্যু পর্যন্ত এই একই উত্তর দিতেছিলেন, "আমার গৃহ, পুত্র কলত্র—সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সমুদয় হজরৎ রসুলের পদতলে উৎসর্গ হউক। আমার সম্মুখে যেন তাঁহার চরণ কমলে একটি কন্টকও বিদ্ধ না হয়।"[৬]

অবশেষে বিরোধী শত্রুগণ পয়গম্বর সাহেব ও তদীয় শিষ্যবর্গকে এত অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল যে, তাঁহারা শেষে রসুলের ইঙ্গিতে দেশান্তরে গিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। পয়গম্বর সাহেবের একদল অনুবর্ত্তী যখন শত্রু–তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া হাবশ (আবিসিনীয়া) দেশে গেলেন, তখন শত্রুগণও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সে দেশে উপস্থিত হইল, এবং তত্রত্য খ্রীষ্টান রাজাকে অনুরোধ করিল যে, মুসলমানদিগকে উহাদের হস্তে সমর্পণ করা হউক। রাজা তখন হতভাগ্য প্রবাসীদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "রাজন্‌! আমরা অজ্ঞতা ও মূর্খতার সমুদ্রে নিমগ্ন ছিলাম, আমরা ঘৃণিত পৌত্তলিক ছিলাম; আমাদের জীবন দুর্দ্দান্ত পশুপ্রকৃতি নরপিশাচের ন্যায় নীচ ও জঘন্য ছিল; নরহত্যা আমাদের দৈনন্দিন ক্রীড়া ছিল; আমরা জ্ঞানান্ধ, ঈশ্বরদ্রোহী ও ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত ছিলাম; পরস্পরের প্রতি স্নেহপ্রীতি বা মনুষ্যত্বের নামগন্ধ আমাদের মধ্যে ছিল না; অতিথি সেবা কিম্বা প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম; আমরা 'জোর যার মুলুক তার' ব্যতীত অন্য বিধিনিয়ম জানিতাম না। আমাদের এই ঘোর দুরবস্থার সময় আল্লাহ্‌তালা আমাদের মধ্যে এমন একজন মানুষ সৃষ্টি করিলেন—যাঁহার সত্যতা, সাধুতা এবং সরলতার উজ্জ্বল চিত্র আমাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে; সেই ব্যক্তি আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, 'আল্লাহ্‌ এক, সর্ব্ব কলঙ্ক হইতে পবিত্র, কেবল তাঁহারই উপাসনা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য; আমাদিগকে সত্য অবলম্বন এবং মিথ্যা বর্জ্জন করিতে হইবে; প্রতিজ্ঞা পালনে বিশ্বজগতের প্রাণিবৃন্দের প্রতি স্নেহ মমতা প্রদর্শনে, প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনে যেন বিমুখ না হই; যেন স্ত্রীজাতির প্রতি সদ্ব্যবহার করি,

---

৬. মিসিস বেশান্ত এখানে দুইটী ঘটনা ভ্রমক্রমে এক বর্ণনার ভিতর ফেলিয়াছেন। অমুসলমানের পক্ষে এইরূপ ভ্রম মার্জ্জনীয় (আল এসলাম—সম্পাদক)

পিতৃহীনের সম্পত্তি আত্মসাৎ না করি ; নিয়মমত দৈনিক উপাসনা ও উপবাস (রোজা) ব্রত পালনে অবহেলা না করি।' রাজন্! আমরা এই ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখি এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি।"

ভদ্র মহোদয়গণ! পয়গম্বর সাহেবের শিষ্যবর্গের বিশ্বাস এবং ধর্ম্মমত এমনই উচ্চ ছিল যে, তাঁহারা প্রাণ হেন প্রিয় বস্তু করতলে লইয়া বেড়াইতেন! আমি আরবীয় পয়গম্বরের সত্যতা ও অকপট হৃদয়ের প্রমাণ স্বরূপ আর একটি বিষয় আপনাদের শ্রবণগোচর করিতেছি।

একদা পয়গম্বর সাহেব আরবের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় একজন অন্ধ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "হে খোদার রসুল! আমাকে পথ দেখাইয়া দাও, আমি সত্য পথ লাভ করিবার আশায় আসিয়াছি।" পয়গম্বর সাহেব বাক্যালাপে অন্যমনস্ক থাকাবশতঃ তাহার উক্তি শ্রবণ করেন নাই। সে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, "হে রসুলোল্লাহ্! আমার কথা শুন, ধর্ম্মপথ দেখাও!" তদুত্তরে তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত তাহাকে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু ইহাতে সে অন্ধ ক্ষুণ্নচিত্তে চলিয়া গেল। পর দিবস পয়গম্বরের প্রতি যে "অহি" (দৈবাদেশ) আসিয়াছিল; যাহা অদ্যাপি কোরআনে লিপিবদ্ধ আছে এবং চিরকাল থাকিবে, তাহার মর্ম্ম এই :

"রসুলের নিকট এক অন্ধ আসিল, কিন্তু সে (রসুল) অবজ্ঞা করিল ও তাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না। তুমি কি করিয়া জান যে, সে পাপমুক্ত হইবে না, উপদেশ গ্রহণ করিবে না এবং সেই উপদেশ সে উপকৃত হইবে না? যে ব্যক্তি ধনী, তাহার সহিতই তুমি সসম্ভ্রম সম্ভাষণ করিতেছ, যদ্যপি সে বিশ্বাসী (ইমানদার) না হইত, তজ্জন্য তুমি অপরাধী হইতে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বয়ং সরল হৃদয়ে সত্য ও মুক্তির অন্বেষণে আসিল, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে না। (ভবিষ্যতে যেন আর কখনও এরূপ না হয়)।"

ঐ দৈবাদেশ পয়গম্বর সাহেবের মনে অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়াছিল। তদবধি যখনই তিনি উক্ত অন্ধকে দেখিতেন, তখনই বলিতেন, ইহার আগমন শুভ। যেহেতু ইহারই উপলক্ষে আল্লাহ্ আমাকে শাসন করিয়াছেন। পয়গম্বর সাহেব উক্ত অন্ধকে অত্যন্ত আদর যত্ন করিতেন এবং দুইবার তাহাকে মদিনায় কোন উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফল কথা এই যে, পয়গম্বর সাহেব কেবল অপরকেই উপদেশ দিতেন না, বরং নিজের আত্মাকে উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রস্তুত রাখিতেন।

সচরাচর যেরূপ প্রত্যেক পয়গম্বরের সহিত হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ আরবীয় পয়গম্বরের বিরুদ্ধেও সাধারণের বৈরিতারূপ ঝঞ্ঝানিল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ধর্ম্ম সংক্রান্ত শত্রুতা সাধনের নিমিত্ত পয়গম্বর সাহেব ও তদীয় শিষ্যমণ্ডলীর বিরুদ্ধে নূতন বিপদের সূত্রপাত হইতে লাগিল! অবশেষে অবস্থা এমন ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল যে পয়গম্বর সাহেব সমুদয় মুসলমানকে আপন আপন প্রাণ লইয়া যত্রতত্র পলায়ন করিতে অনুমতি দিলেন। তখন হজরতের নিকট মাত্র একজন ব্যতীত আর কেহই রহিল না। কিন্তু পয়গম্বর সাহেব স্বীয় কর্ত্তব্য তেমনই নির্ভীক চিত্তে পালন করিতে থাকিলেন। এই সঙ্কট সময়ে তাঁহার অরিকুল তাঁহার প্রাণ বিনাশের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেব আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন, "হে পিতৃব্য-প্রাণ! কথা

শন, অমূল্য প্রাণ এমন অবহেলায় হারাইস না। আরবের রক্ত পিপাসু খঞ্জরসমূহ তোরই জন্য শাণিত হইতেছে ! তুই নিবৃত্ত হ’, তোর বক্তৃতা বন্ধ কর।”

তাঁহার কথায় পয়গম্বর সাহেব অতি সাহসের সহিত যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিবার উপযুক্ত বটে। তিনি বলিলেন :

“পিতৃব্যদেব ! আমি নিরুপায়। আমি ত, কিছুই করি না, কে যেন আমার দ্বারা করাইতেছে। যদি বিধর্ম্মীগণ আমাকে এক হস্তে সূর্য্য অপর হস্তে চন্দ্র দান করিয়া বলে, ‘তুমি আপন কার্য্য পরিত্যাগ কর,’ তবু নিশ্চয় জানিবেন, আমি এ কার্য্য হইতে বিরত হইব না—যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সেরূপ ইচ্ছা না হয়। অথবা আমি আমার এই সাধনার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিব। তবে যদি আপনি নিজের জন্য ভয় করেন ত’ বলুন, আমি এই মুহূর্ত্তে আপনাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাই—আমার আল্লাহ্ আমার সঙ্গে থাকিবেন।” এই বলিয়া পয়গম্বর সাহেব সাশ্রুনয়নে গমনোদ্যত হইলেন।

কিন্তু পিতৃব্যের স্নেহের উৎস উথলিয়া উঠিল, তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন, “প্রাণাধিক ! আমি তোকে কিছুতেই ছাড়িব না। তোর অরিকুল হইতে তোকে রক্ষা করিব। তুই নির্ভয়ে আপন কাজ কর।”

কিন্তু ভদ্র মহোদয়গণ ! আরবীয় পয়গম্বরের এই স্নেহময় পিতৃব্য আর অধিক দিন তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারেন নাই। সেই ঘোর দুর্দ্দিনে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। আর এই বৎসরই তাঁহার পতিপ্রাণা বণিতা খদিজা বিবিও প্রেম-পাশ ছিন্ন করিয়া অনন্ত ধামে প্রস্থান করিলেন। এই সময় বাস্তবিক পয়গম্বর সাহেবের পক্ষে অতি কঠোর শোক ও বিপদাকীর্ণ পরীক্ষার সময় ছিল ! রসুলের শত্রুপক্ষ এই সময় প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। (আহা ! বিপদ কখনও একা আইসে না)।

ক্রমে অবস্থা এমন ভয়ানক হইল যে, পয়গম্বর সাহেব মক্কা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন হজরত আলী এবং আবুবকর সিদ্দীক—মাত্র এই দুইজন ব্যতীত, তাঁহার নিকট আর কেহই ছিল না। তমোময়ী নিশীথে পয়গম্বর সাহেব ত আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া মদিনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এদিকে হজরত আলী তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন, যাহাতে শত্রুগণ নিশ্চিন্ত থাকে। মোহাম্মদ সাহেবের অরাতিকুল যথাকালে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তথায় উপস্থিত হইল ; বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিল, একি ! এ ত মোহাম্মদ (দঃ) নহেন ! এ যে আলী শয়ান রহিয়াছেন ! উহারা তাঁহাকে কিছু না বলিয়া পয়গম্বর সাহেবের মস্তক আনয়নের নিমিত্ত বহুমূল্য পুরস্কার ঘোষণা করিল।

পয়গম্বর সাহেব যৎকালে একমাত্র সঙ্গী আবুবকর সিদ্দীক সহ গমন করিতেছিলেন, তখন আবুবকর অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে কহিলেন, “হে হজরত ! আমরা ত মাত্র দুইজন !” তিনি উত্তর করিলেন, “না ! না ! আমরা তিন জন—ইহাদের একজন অতিশয় প্রতাপশালী—সমুদয় বিশ্বজগৎ এক দিকে, আর তিনি একা এক দিকে।” আবুবকর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, “হজরত ! সে তৃতীয় জন দ্বারা আপনি কাহাকে বুঝাইতে চাহেন ?” উত্তর হইল, “সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত সঙ্গে আছেন।” এ কথায় আবুবকর নিশ্চিন্ত হইলেন।

পয়গম্বর সাহেব মদিনা নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি আশাতীত যত্ন ও সমাদরে গৃহীত হইলেন। শত শত সমাজ-নেতা অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইতে আসিলেন, এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। হজরতের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনুচরবর্গও ক্রমে ক্রমে মদিনায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পয়গম্বরের বিপক্ষগণ সেখানেও তাঁহাকে নিশ্চিন্ত মনে তিষ্ঠিতে দিল না। তাহারা এবার সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া পয়গম্বর সাহেবকে আক্রমণ করিল। তখন পয়গম্বর সাহেবও কেবল আত্মরক্ষা কল্পে স্বীয় ক্ষুদ্র যোদ্ধৃদল লইয়া বাহিরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলেন :

"জগৎপাতা ! তুমি সমস্তই দেখিতেছ, এবং সবিশেষ অবগত আছ। অদ্য যদি আমার ক্ষুদ্র সেনাদল বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে তোমার সত্য নাম প্রচার করিবার লোক আর কেহ থাকিবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তুমি সত্যের সহায় হইবে।"

অবশেষে এই প্রথম রক্ত প্রবাহিনী যুদ্ধ—যাহা বদরের যুদ্ধ নামে বিখ্যাত হইয়া গেল। ওদিকে ত সহস্র সহস্র যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল, এদিকে একশত বীরও ক্ষয় হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কার্য্যতঃ ইহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছিল যে, মুসলমানদের পক্ষে কোন অদৃশ্য শক্তি যুদ্ধ করিতেছিল, তাই স্বল্প সময়ের মধ্যেই মোসলেমগণ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। পয়গম্বর সাহেবের জীবনে এই প্রথম রক্তপাত—যাহা তিনি অনন্যোপায় হইয়া করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নতুবা তিনি এমন দয়ার্দ্রহৃদয় ও বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন যে, দুর্দ্ধর্ষ লোকেরা তাঁহাকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিত। এইরূপে কয়েকবার আরবের মোসলেম-বিদ্বেষিগণ মহা সমারোহে যুদ্ধায়োজন লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে, এবং পয়গম্বর সাহেব শুধু আত্মরক্ষা—শিষ্যমণ্ডলীর প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। পরন্ত সর্ব্বদা সত্য ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার সঙ্গে থাকায় বিজয়ের উপর বিজয় লাভ করিতে থাকিলেন। এবং অযাচিত প্রভুত্ব লাভ করিলেন। এমনকি তিনি স্বাধীন রাজার ন্যায় সমগ্র আরব উপদ্বীপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এই সময় পয়গম্বরের অতীত ও বর্ত্তমান জীবনে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইল। পূর্ব্বে লোকে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিলে তিনি তাহার প্রতিশোধ না লইয়া তাহাদের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করিতেন। এখন তিনি সৈন্য সেনানী ও যথাবিধি সমরায়োজন রাখিতে বাধ্য হইলেন—যাহা একজন সম্রাটকে করিতে হয়। এবং অপরাধীকে শাস্তিদান করিতেও হইত। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি অতি উচ্চ আদর্শের দয়া ও ন্যায় বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

পয়গম্বর সাহেবের জন্মের পূর্ব্বের অর্থাৎ যে সময়কে আরবীয় মুসলমানদের মূর্খতার যুগ বলা হয়, যুদ্ধে ধৃত বন্দীগণের প্রতি এমন নৃশংস নির্য্যাতন করা হইত যে, তাহার তুলনা নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বর জাতির মধ্যেও পাওয়া কঠিন। কিন্তু পয়গম্বর সাহেবের সময়ে যুদ্ধে ধৃত বন্দীদিগের প্রতি যেরূপ সদয়, সুভদ্র ব্যবহার করা হইত, তাহার আদর্শ অদ্যাপি কোন অতি সভ্য দেশ ও সমাজে পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ। একদা রণযাত্রাকালে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে এক দল বন্দী ছিল। খাদ্য সামগ্রীতে (রসদে) আটা অল্প ছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল ; তচ্ছ্রবনে রসুলোল্লাহ আদেশ দিলেন যে, বন্দীদিগকে রুটী দান করা হউক, আর স্বাধীনেরা খর্জ্জূর ভক্ষণ করুক। (কি মহত্ত্ব !)

আর এক বারের ঘটনা এই যে, যুদ্ধ জয়ের পর, লুণ্ঠিত দ্রব্য যখন বণ্টন করা হইল, তখন পয়গম্বর সাহেব স্বীয় নিকটবর্ত্তী প্রিয় সহচরবৃন্দকে ভাগ লইতে দিলেন না। ইহাতে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন। পয়গম্বর সাহেব তাহা অবগত হইয়া, সহচরদের ডাকিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! তোমরা জান, পূর্ব্বে তোমরা কিরূপ বিপন্ন ছিলে, আল্লাহ্ তোমাদের বিপন্মুক্ত করিয়াছেন ; তোমরা একে অপরের রক্ত পিপাসু ছিলে, প্রভু তোমাদিগকে এখন ভ্রাতৃপ্রেম দান করিয়াছেন ; তোমরা কোফরের (অধর্ম্মের) অন্ধকারে কারারুদ্ধ ছিলে, তিনি বিশ্বাসের নির্ম্মল জ্যোতিতে তোমাদের মন আলোকিত করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল অনুগ্রহপুরস্কার কি তোমার প্রাপ্ত হও নাই?" তাঁহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ আমাদের অবস্থা বাস্তবিক এইরূপই ছিল, এবং এখন যে সুখ সম্পদ ভোগ করিতেছি, আল্লাহ্তালারই অনুগ্রহে এবং আপনার দয়ায় আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে।" তিনি উহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "না, না ; বল যে কেবল খোদার অনুকম্পা ছিল। আর যদি তোমরা এইরূপ বলিতে ত' আমিও সাক্ষ্য দিতাম। আমার সম্বন্ধে তোমরা ইহা বলিতে পার যে, তুমি এখানে পলায়ন করিয়া আসিয়াছ, আমরা তোমায় আশ্রয় দিয়াছি ; তুমি দুঃখচিন্তা ভারাক্রান্ত ছিলে, আমরা তোমায় সান্ত্বনা দিয়াছি।" (এ কথায় তাঁহারা কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহাদিগকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া) পুনরায় পয়গম্বর সাহেব বলিলেন, "হে প্রিয় সহচরবৃন্দ! লুণ্ঠিত দ্রব্যের বিনিময়ে কি তোমরা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর না? খোদার কসম! খোদার সমস্ত রাজ্য বিপক্ষে দাঁড়াইলেও মোহাম্মদ আপন সহচরদের পক্ষে থাকিবে, যেহেতু তাঁহারা বিনা স্বার্থে—শুধু ঈশ্বরোদ্দেশে কষ্ট স্বীকার করিতেছেন।"

পয়গম্বর সাহেবের এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার সুফল এমন হইল যে, উক্ত সহচরগণ—যাঁহারা মরিতে মারিতে নির্ভীক, শৌর্য্য বীর্য্যে সিংহ-তুল্য জাতি ছিলেন, এক্ষণে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "হে রসুলোল্লাহ্! আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

আমার হিন্দু ভ্রাতৃগণ! আপনারা বাস্তবিক আরবীয় পয়গম্বরের অবস্থা কিছুমাত্র অবগত নহেন। আপনারা এ অলৌকিক ঐশিক শক্তি দেখিতে সক্ষম নহেন, যাহা তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্যকে কষ্ট স্বীকার ত তুচ্ছ—মৃত্যুর সম্মুখীন করিয়াছে ; যাহা কোটী কোটী লোকের অন্তরে ঈশ্বর প্রেম অঙ্কিত করিয়াছে আপনারা আরবীয় পয়গম্বরের নিরহঙ্কার ভাব ও আত্মত্যাগের বিষয় একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন ত! তিনি অনুবর্ত্তিগণকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে তাঁহাকে যেন কেহ দেবতা কিম্বা অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান না করে। তিনি বারম্বার বলিয়াছেন, "আমি তোমাদেরই মত মানুষ, এইমাত্র প্রভেদ যে, আমি তাঁহার (খোদার) দূত, তাঁহার সংবাদ তোমাদিগকে পৌঁছাই।" পয়গম্বর সাহেবের নিরভিমান ও সরলতার প্রমাণ এতদপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে। যে সময় তিনি রাজাধিরাজ সম্রাট ছিলেন, তখন স্বহস্তে আপন জীর্ণবস্ত্রে চীর সংলগ্ন করিতেন—ছিন্ন পাদুকা স্বহস্তে সেলাই করিতেন! তাঁহার শান্ত স্বভাব সম্বন্ধে তদীয় ভৃত্য আনাস বলিয়াছেন, "আমি দশ বৎসর তাঁহার নিকট ছিলাম, তিনি কদাচ অপ্রিয় বচন কহিবেন দূরে থাকুক, আমাকে 'তুই' পর্য্যন্ত বলেন নাই।" (হাদীস শরীফে তুই শব্দের উল্লেখ নাই), ভ্রাতৃগণ! এমনই আড়ম্বরশূন্য

জীবন ছিল সেই সম্রাটের, যিনি ইচ্ছা করিলে পরিচর্য্যার জন্য সহস্রাধিক দাস দাসী রাখিতে পারিতেন!

আরবীয় পয়গম্বর যে 'মিশনের' জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সমাধা করিলে পর সেই (দারুণ) সময় আসিল, যখন একদিন (মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে) রোগক্লিষ্ট অবস্থায় তিনি বহু কষ্টে নমাজের নিমিত্ত মসজিদে আনীত হইলেন। (নমাজ শেষ হইলে) তিনি আপন পীড়িত ক্ষীণ কণ্ঠ যথাশক্তি উচ্চ করিয়া বলিলেন, "হে মুসলমানগণ! তোমরা সাধারণে ঘোষণা করিয়া দাও, যদি আমি এ জীবনে কাহারও প্রতি অত্যাচার অবিচার করিয়া থাকি, তবে সে অদ্য আমা হইতে প্রতিশোধ লউক, পরলোকের জন্য যেন স্থগিত না রাখে। যদি কাহারও কিছু প্রাপ্য থাকে, সে ঋণ শোধের নিমিত্ত আমার ঘরদ্বার তাহাকে সমর্পণ করিতেছি। অদ্য আমি সকল প্রকার জবাবদিহির জন্য উপস্থিত আছি।"

একজন বলিল, হজরতের নিকট তাহার ত্রিশ 'দেরেম' পাওনা আছে, তাহা রসুলোল্লাহ তম্মুহূর্ত্তে শোধ করিলেন।[৭] এই তাঁহার মসজিদে শেষ আগমন। অতঃপর ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুন আরবীয় পয়গম্বর নশ্বর মৃন্ময় দেহত্যাগ করিলেন, যাহাতে অতি উচ্চ অনন্তধামে গিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন। এই জীবন অতি উচ্চ, পবিত্র বিস্ময়কর এবং বাস্তবিক খোদার পয়গম্বরেরই যোগ্য ছিল। (অবশ্য, সাধারণ মানবের জীবন এরূপ হওয়া অসম্ভব)।

ভদ্র মহোদয়গণ! এখন আমি আপনাদিগকে আরবীয় পয়গম্বরের প্রতি যেসব অন্যায় দোষারোপ করা হয়, তাহার বিষয় বলিতেছি। অনভিজ্ঞতা ও ন্যায়ান্যায় জ্ঞানাভাবে, অথবা শুধু কুসংস্কারবশতঃ রসুলের প্রতি ঐসব দোষারোপ করা হইয়া থাকে। তাঁহার একতম দোষ

---

৭. মিসিস এনি বেশান্ত এ স্থলে "আক্কাসের তাজিয়ানার" বিষয় উল্লেখ করেন নাই; আমার মনে হয় এজন্য "প্রতিশোধ" বিষয়টি অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। সে তাজিয়ানার কথা এই:
কোন এক দিন হজরত কোন কারণে 'আক্কাস নামে এক ব্যক্তিকে এক ঘা কোড়া মারিয়াছিলেন। অদ্য সেই আক্কাস মসজিদে আসিয়া সেই কোড়ার প্রতিশোধ পাইবার দাবী করিল, তখন রসুল, তাহার হস্তে কশাঘাত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন! ইহা দেখিয়া উপস্থিত সহচরবৃন্দ ও আত্মীয়বান্ধবগণ অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত ও উদ্বিগ্ন হইলেন; যেহেতু হজরত এমন পীড়িত অবস্থায় কোড়ার আঘাত কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহারা অনুনয় বিনয় করিয়া আক্কাসকে নিবৃত্ত হইতে, অথবা রসুলের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের গাত্রে একাধিক কোড়া মারিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আক্কাস তাঁহাদের কোন কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন তাঁহারা অতিশয় অধীর হইয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, — নিষ্ঠুর আক্কাস করে কি! হায় হায়, রসুল হত্যা করিবে! হজরত কিন্তু অবিচলিত চিত্তে আক্কাসকে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত প্রতিশোধ লইতে ইঙ্গিত করিলেন। সে বলিল, "হজরত! আমি নগ্ন পৃষ্ঠে আপনার কোড়ার আঘাত পাইয়াছিলাম।" এতচ্ছ্রবণে রসুলে করিম তৎক্ষণাৎ গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া নগ্নদেহে কশাঘাত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন!!
বলি, আজ পর্য্যন্ত জগতে কেহ ঐরূপ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছে কি? আমার বিশ্বাস রসুলকে গাত্র বস্ত্র মোচন করিতে দেখিয়া স্বর্গদূত (ফেরেশ্‌তা) পর্যন্ত কম্পিত হইয়াছিলেন! এরূপ মাহাত্ম্য আরও কোন মহাপুরুষ দেখাইতে পারিয়াছেন কি?
আক্কাস অবশ্য রসুলকে কোড়া মারিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল না, তাহার উদ্দেশ্য ছিল হজরতের পবিত্র পৃষ্ঠ চুম্বন করা। সে উদ্দেশ্য সফল হইল—ক্রন্দনের রোলের মধ্যে ভক্তির জয় জয়কার ঘোষিত হইল।
—লেখিকা।

এই বলা হয় যে, তিনি জীবনের শেষভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ৯জন মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি বিবাহ করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু আপনারা কি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, সেই ব্যক্তি, যিনি ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কোন প্রকার "মকারাদি" কু অবগত ছিলেন না, পরে নিজের অপেক্ষা অনেক অধিক বয়স্কা একটি বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহারই সহিত অতি সুখে জীবনের ২৬টি বৎসর যাপন করিলেন ; তিনি শেষ বয়সে, যখন মানুষের জীবনীশক্তি নির্ব্বাপিত প্রায় হয়, শুধু আত্মসুখের জন্যই যে কতকগুলি বিবাহ করিবেন, তাহা কি সম্ভব? যদি ন্যায় বিচারের সহিত বিবেচনা করেন, তবে আপনারা বেশ জানিতে পারিবেন—সে বিবাহের উদ্দেশ্য কি ছিল। প্রথমে দেখিতে হইবে, তাঁহারা (হজরতের পত্নিগণ) কোন শ্রেণীর কুলবালা ছিলেন ; আর কেনই বা তাঁহাদের রসুলের প্রয়োজন ছিল। —কতিপয় নারী এরূপ ছিলেন যে তাঁহাদের বিবাহের ফলে রসুলের পক্ষে 'নূর–ইসলাম' প্রচারের সুবিধা হইল। আর কয়েকজন এরূপ ছিলেন যে, বিবাহ ব্যতীত তাঁহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অন্য কোন উপায় ছিল না।

আরবীয় পয়গম্বরের প্রতি আর একটি দোষারোপ এই করা হয় যে, তিনি রক্তপাতের প্রশ্রয় দিতেন এবং কারণে অকারণে কাফের হত্যা করিতে আদেশ দিতেন। এখন এ সম্বন্ধে আপনারা আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। যখন আইনের দুই দফা প্রায় একই প্রকার হয় অর্থাৎ একটি কোন সর্ত্তের অধীন এবং অপরটি সর্ত্তবিহীন তখন সর্ত্তহীন ধারাও সর্ব্বদা সর্ত্তাধীন ধারা বলিয়াই মানিতে হয়। মুসলমানদের শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বদা এ বিষয়ের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এবং কোরআনের বচনসমূহেও একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যথা একস্থলে বলা হইয়াছে, "কাফেরকে হত্যা কর," এবং অপর স্থলে বলা হইয়াছে, "হত্যা কর, যদি তাহারা তোমাদের ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা দেয়।" এখন আমি আপনাদিগকে সেই মূলবচনসমূহের—যাহা রসুলের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে, শাব্দিক অনুবাদ শুনাইতেছি। আমি নিজের ভাষায় বলিব না, কারণ যদি আপনারা মনে করেন যে আমি তাঁহাদের (মুসলমানদের) ধর্ম্মপ্রচার করিতেছি। তবে শ্রবণ করুন :

"যদি তাহারা তোমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয়, তবে যাহা হইয়া গিয়াছে, ক্ষমা করা যাউক। কিন্তু যদি তাহারা তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের নিমিত্ত যেরূপ শাস্তি দেওয়া গিয়াছে সেইরূপ শাস্তি ভোগ করিবে। এজন্য উহাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্য্যন্ত উহারা পৌত্তলিকতা রক্ষার নিমিত্ত তোমাদের বিরুদ্ধাচরণে নিবৃত্ত না হয় এবং অদ্বিতীয় খোদার ধর্ম্মকে অমান্য করে, যুদ্ধ করিতে থাকে। আর যদি তাহারা মানে তবে নিশ্চয় জানিও আল্লাহ তাহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু যদি তাহারা সত্যধর্ম্মের বিরোধী হয় তবে আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হইবেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অভিভাবক এবং সাহায্যকর্ত্তা।"

আর একটি বিষয়, যাহা পয়গম্বরকে উপদেশ দানের নিমিত্ত কোরআনে অবতীর্ণ হইয়াছে, আপনাদের শ্রবণগোচর করিতেছি :

"মনুষ্যদিগকে নম্র মৃদু ভাষায় যুক্তি সহকারে উপদেশ দিয়া আল্লাহতালার ধর্ম্মপথে আহ্বান কর ; তাহাদের সহিত অতিশয় ধৈর্য্য, ও গাম্ভীর্য্যের সহিত সদয়ভাবে তর্ক কর, কেন না উহাদের কে সত্য পথ ভুলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে এবং কে সত্যপথে আছে তাহা আল্লাহ্

সবিশেষ অবগত আছেন। যদি তুমি প্রতিশোধ লও তবে লক্ষ্য রাখিও যে তাহা তোমার প্রতি যে অত্যাচার অনাচার হইয়াছে (ন্যায় বিচার অনুসারে) তাহার সমান হয় ; আর যদি তুমি প্রতিশোধ না লইয়া সহ্য কর তবে সাবের (সহিষ্ণু) ব্যক্তির পক্ষে আরও ভাল কথা। সুতরাং ভাল হয় যদি শত্রুদের প্রপীড়ন ধীরতার সহিত সহ্য কর। কিন্তু স্মরণ রাখিও তোমার কার্য্যকলাপ তবেই সফল হইবে, যখন তাহার সহিত আল্লাহ্‌তালার অনুগ্রহ মিশ্রিত থাকিবে। কাফেরদের ব্যবহারে দুঃখিত হইও না, এবং উহাদের চাতুরী শঠতায়ও ব্যতিব্যস্ত হইও না, কারণ আল্লাহ্ তাহাদের সাহায্য করেন—যাহারা সাধু ও ন্যায়পরায়ণ হয় এবং তাহাকে ভয় করে।"

আর একটী উপদেশ শ্রবণ করুন ; —"ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যাপারে কাহারও প্রতি অত্যাচার করিও না ; যদি সে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে তবে বুঝিও আল্লাহ্ তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আর যদি ধর্ম্ম স্বীকার না করে তবে আর কি করা—তোমার কাজ ত কেবল উপদেশ দান ও প্রচার করাই ছিল।"

আরও শ্রবণ করুন, —পয়গম্বর সাহেব কাফেরের কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "কাফের তাহারাই যাহারা ন্যায় বিচারের বিপরীত কার্য্য করে, পাপী কেবল তাহারাই যাহারা ইসলাম ধর্ম্মের বাহিরে।" ইহাতে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইসলাম ধর্ম্মের বৃত্তি (. . .) তত সঙ্কীর্ণ নহে যে কেবল পয়গম্বর সাহেবের শিষ্যবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

আর একস্থলে (প্রত্যাদেশ) আসিয়াছে যে "যদি তাহারা তোমাদের বিরোধী হইয়া যায় কিন্তু তোমাদের সহিত যুদ্ধ কলহ না করে আর তোমাদের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করে তবে তাহাদিগকে হত্যা করা কিম্বা তাহাদের বশীভূত করিতে চেষ্টা করা ঈশ্বরাদেশের বিরুদ্ধে।"

উপস্থিত মহোদয়গণ আপনারা কি বলিতে পারেন যে ইহা ন্যায় বিচারের কথা হইবে যে আমরা পয়গম্বর সাহেবের তাদৃশ মিলনপ্রয়াসী শান্তিসূচক বচনসমূহের প্রতি—যাহা সেরূপ যুদ্ধ কলহ এবং অত্যাচারের যুগে বলা হইয়াছিল, একটু মনোযোগ না করি, আর কেবল ঐ সকল বচন, যাহা তিনি কোন এক ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইবার সময় উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, সেগুলিকে ধরিয়া লই? আর আমার মতে যে কোন সেনাপতি এরূপ স্থলে থাকিতেন, তিনি এতদপেক্ষা অধিক যোগ্যতার কাজ আর কি করিতেন?

বেশ, এখন আপনারা সেই শান্তিপ্রিয়তা শিক্ষার আর একটি দৃষ্টান্ত, যাহা পয়গম্বর সাহেবের স্বকীয় ব্যবহারে দেখা যায়, একটু সমালোচনা করিয়া দেখুন ত অত্যাচার এমন কোন ছিল না, যাহা পয়গম্বরের প্রতি করা হয় নাই,—আর তিনি তাহা ক্ষমা না করিয়াছেন ; কোন নির্য্যাতন এমন হয় নাই যাহা তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত না ছিলেন। হে ভ্রাতৃগণ ! কোন ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে তাঁহাকে ঠিক সেইভাবে দেখুন যে অবস্থায় তিনি বাস্তবিক থাকেন, কুসংস্কারের চশমা পরিয়া দেখিবেন না।

প্রত্যেক ধর্ম্মেই কিছু না কিছু দোষ জন্মিয়াই থাকে ; সমস্ত সাধু প্রকৃতি লোকের কার্য্যকলাপে কোন না কোন দোষ থাকেই, বিধর্ম্মী এবং মূর্খ শিষ্য একে আর বুঝিয়া থাকে। কোন ধর্ম্ম দেখিতে হইলে সেই ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং নিষ্ঠাবান

ব্যক্তিকে দেখা উচিত ; তাহা না করিয়া কোন নরাধমকে দেখিয়া তাহাকেই দৃষ্টান্ত বলিয়া ধারণা করা অন্যায়। তবেই আমরা একে অপরকে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতে শিখিব এবং বন্য অসভ্যদের মত একে অপরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব না।

আমার দুঃখ হইতেছে যে সময়াভাবে আমি ইসলামের শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না। যদিও সে বিষয়টিও আপনাদের ভাল লাগিত কিন্তু তাহা তত প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া আমি এস্থলে সে বিষয় পরিত্যাগ করিলাম।

প্রত্যেক ধর্ম্মেই বাহ্যিক অবস্থার পরে দর্শন থাকে। যদি এ সময় ইসলামের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা তাহার স্বল্পতা দেখিতেছি, (তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই) কারণ, আমরা যখন সেই সময়ে—যখন ইসলামের জ্যোঃতি আরম্ভ হইয়াছিল, দৃষ্টিপাত করি তাহার গুণ ব্যাখ্যার উপযুক্ত ভাষা ও শব্দ পাই না।

এখন আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, আরবীয় পয়গম্বর তের শত (১৩০০) বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন ; — "বিদ্যা শিক্ষা কর ; যে বিদ্যা শিক্ষা করে সে নির্ম্মল চরিত্র হয় ; যে বিদ্যার চর্চা করে সে ঈশ্বরের স্তব করে ; যে বিদ্যা অন্বেষণ করে সে উপাসনা (এবাদত) করে ; যে উহা শিক্ষা দেয় সেও উপাসনা করে ; বিদ্যাই মানবকে ভাল ও মন্দ (সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ) জ্ঞান শিক্ষা দান করে, শিক্ষাই সুপথ প্রদর্শন করে ; শিক্ষাই নির্জ্জনে নির্ব্বাসনে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করে ; বনবাসে সান্ত্বনা প্রদান করে ; বিদ্যা আমাদিগকে উন্নতি মার্গে লইয়া যায় এবং দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে। বন্ধু সভায় বিদ্যা আমাদের অলঙ্কারস্বরূপ ; শত্রু সম্মুখে অস্ত্রস্বরূপ।[৮] বিদ্যার দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার বিপন্ন দাস পুণ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়।"

পয়গম্বর সাহেবের নিম্নোক্ত বচনসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমি ভক্তিপ্রেমে অভিভূত হইয়া পড়ি। তিনি বলিয়াছেন, "বিদ্বানের (লিখিবার) মসী শহীদ (ধর্ম্মার্থ সমরশায়ী)—দের রক্তাপেক্ষাও অধিক মূল্যবান।" ভ্রাতৃগণ ! বিদ্যার গৌরব বর্ণনা এতদপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে?

হজরত আলী যিনি পয়গম্বর সাহেবের প্রিয় জামাতা ছিলেন, আর যাঁহার সম্বন্ধে পয়গম্বর সাহেব বলিয়াছেন যে "আলী ইসলামে বিদ্যা জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ।" মুসলমানদের মধ্যে হজরত আলীই প্রথমে এল্‌মে-এলাহী প্রচার আরম্ভ করেন। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হজরত আলীর যে সকল বক্তৃতা আছে তাহা পাঠের উপযুক্ত। তিনি যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ও (যুদ্ধক্ষেত্রে) ধর্ম্ম বক্তৃতা (খোতবা) পাঠ করিতেন।

বিদ্যার প্রশংসা বিষয়ে আলীর রচনাবলী হইতে কয়েকটি আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

---

৮. সুশিক্ষার কল্যাণে শত্রু জয় করা যায় একথা ধ্রুব সত্য। ঐ কারণেই বোধ হয় নারী বিদ্বেষী মহাশয়গণ স্ত্রী শিক্ষায় আপত্তি করেন। যেহেতু তাহা হইলে স্ত্রীলোকের হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়! শুনিয়াছি, করটীয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার মরহুমা জমবরদন্নেসা খানম সাহেবা নাকি বলিয়াছেন, "এখন মরদের হাতে কলম ; একবার জানানার হাতে কলম দিয়া দেখ।" ইংরেজী প্রবচন বলে "Pen is mightier than sword" —লেখিকা

"অন্তর আলোকিত করিবার জন্য সুশিক্ষা উজ্জ্বল রত্ন ; সত্য তাহার (বিদ্যার) লক্ষ্য ; ঈশ্বরতত্ত্ব (এলহাম) তাহার পথ প্রদর্শক ; বুদ্ধি (সুবোধ?) তাহাকে গ্রহণ করে ; মানবের ভাষায় বিদ্যায় যথোচিত প্রশংসা হইতে পারে না।"

ওদিকে মুসলমানেরা দেশসংক্রান্ত কর্ত্তব্যসাধনে মগ্ন ছিলেন, এদিকে হজরত আলীর শিষ্যবর্গ শিক্ষা বিস্তার করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা যেখানেই যাইতেন শিক্ষার মশাল সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তাহার ফলে এই হইল যে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইসলামের শিশুদের হস্তেও শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রদীপ দেওয়া হইয়াছিল। যেখানে তাঁহারা দেশ জয় করিতেন, সেইখানেই পাঠশালা ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ কাহেরা, বাগদাদ, হিসপানিয়া এবং কার্ডাভার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রদর্শন করিতেছি।[৯]

ইংলণ্ডের লোকদিগকে মুসলমানরাই তাহাদের বিস্মৃত বিদ্যার বর্ণমালার পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, ভারতবর্ষের অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পুস্তকের অনুবাদ করাইয়াছেন ; রসায়ন এবং অঙ্কশাস্ত্রের পুস্তকাবলী রচনা করিয়াছেন।

জনৈক পোপ (দ্বিতীয় মিস্‌লউটিয়র) যিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অতি উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ও গুরু ছিলেন, তিনি মুসলমানদেরই কার্ডাভা মাদ্রাসায় অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণে লোকে তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া জনসমাজে অপদস্থ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে "শয়তানের বাচ্চা" বলিয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় সে সময় ইউরোপের খ্রীষ্টীয় বিভাগ কেমন ঘোর মূর্খতায় তমসাচ্ছন্ন ছিল, আর কেবল ইসলামের অনুবর্ত্তিগণই তাঁহাদিগকে (ইউরোপীয়-দিগকে) জ্ঞানের আলোকরশ্মি দেখাইতেছিলেন।

মুসলমানেরা শিল্প এবং আবিষ্কারেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। অনুবীক্ষণ যন্ত্র তাঁহারাই নির্ম্মাণ করেন ; পৃথিবীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ তাঁহারাই স্থির করেন। গ্রীকদের নিকট হইতে তাঁহারা অঙ্কবিদ্যালাভ করেন ; সঙ্গীত ও কৃষিবিদ্যাকে তাঁহারা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই পর্য্যন্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, বরং ধর্ম্মের দর্শন তত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া "ফানাফিল্লাহ"র গূঢ় তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন ! তাঁহারা প্রচার করিলেন যে আল্লাহ অদ্বিতীয় এবং সমুদয় মানবজাতি এক জাতীয় (মানবের মধ্যে জাতিভেদ নাই)। আর এই বিধান তাঁহারা অতি মনোরম ভাষায় বুঝাইয়াছেন।

হে হিন্দু ভ্রাতৃগণ ! আপনারা যদি ঐ শাস্ত্রবিধানসমূহের বিষয় চিন্তা করেন ত আপনারা উহাকে প্রকৃত (আসল) বেদান্তস্বরূপ পাইবেন ; মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। অদ্য যদি আমার মুসলমান ভ্রাতৃগণ নিজেদের ঐ সকল জগন্মান্য পূর্ব্বপুরুষদের রচিত শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তকাবলী আধুনিক প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া লয়েন এবং সর্ব্বসাধারণে ঐ শিক্ষা প্রচার করেন তবে আমার

---

৯. আমাদের সদাশয় বৃটিশ প্রভুরা দাবী করেন যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন বলিয়াই আমরা (বর্ব্বরেরা) শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি। আর আমরাও নত মস্তকে স্বীকার করিয়া বলি যে, ইয়ে হয় আহলে মগরেবকে বরকৎ কদমকী" (ইহা পশ্চিম দেশবাসিদিগের শ্রীচরণের প্রসাদ)। কিন্তু মিসিস বেশান্ত ত বলেন যে শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে মুসলমানেরাই ইউরোপের শিক্ষা গুরু।

দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহারা ইসলামী দর্শনকে সমস্ত জগতের শীর্ষস্থানে তুলিতে সক্ষম হইবেন। আর ইসলামের আবালবৃদ্ধবনিতা—(কচি কচি শিশুগণ) ও ইসলামী দর্শন কণ্ঠস্থ করিতে পারিবে। (যেমন হিন্দুগণ এখন আপন বেদান্ত প্রচারে মনোযোগী হইয়াছেন)। আপনারা ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে তাঁহারা ইসলামের প্রকৃত গৌরব সৃষ্টি জগৎকে দেখাইবার জন্য কিরূপে ধর্ম্মের সেবা করিয়াছেন।

হজরত মোহাম্মদ, হজরত ঈসা, হযরত, মুসা, মহর্ষি বুদ্ধদেব—সকলে একই অট্টালিকায় আছেন। তাঁহারা এক জাতি হইতে অন্য জাতিকে ভিন্ন মনে করেন না। আর আমরা যে তাঁহাদের সামান্য শিষ্য, তাঁহাদের শিশু সন্তান—আমাদের উচিত যে তাঁহাদের বিশ্বপ্রেমের সারতত্ত্ব লাভ করি। প্রেম দ্বারাই তাঁহারা আমাদের নিকটবর্ত্তী হন। পয়গম্বর মোহাম্মদ সাহেব স্বেচ্ছায় স্বীয় শিষ্যের নিকটবর্ত্তী হন না, যে পর্য্যন্ত শিষ্য মনের কঠোরতা দূর না করে এবং তাহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার না হয়।

হে আমার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ ! পয়গম্বর সাহেব যেমন আপনাদের সেইরূপ আমাদেরও আপন। যত পয়গম্বর মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলের উপরই আমাদের দাবী (হক) আছে। আমরা তাঁহাদিগকে ভালবাসি, তাঁহাদের সম্মান করি এবং তাঁহাদের সম্মুখে অতি নম্রভাবে ভক্তি সহকারে মস্তক অবনত করি।

খোদার নিকট এই প্রার্থনা করি যে তিনি সকলেরই আল্লাহ ; —তিনি আমাদিগকে এইরূপ বুঝিবার শক্তি দান করুন যে তাঁহার নামের জন্য যেন আমরা পরস্পরে ঝগড়া না করি—। আমাদের শিশুসুলভ দুর্ব্বল অধরে যে নামই উচ্চারিত হউক না কেন—কিন্তু তিনিই ত অদ্বিতীয় এবং সকলেরই উদ্দেশ্য (উপাস্য) একমাত্র তিনিই।[১০]

সৌরজগৎ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কারসিয়ঙ্গ পর্ব্বতের একটি দ্বিতল গৃহে অপরাহ্ণে গওহর আলী স্ত্রী ও কন্যাদলে পরিবেষ্টিত হইয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়াছেন। তাঁহার নয়টি কন্যা যে ভাবে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়াছে, তাহা দেখিয়া স্বতঃই এ পরিবারটিকে সুখী ও সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বকনিষ্ঠা দুহিতা মাসুমা তাহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠা সহোদরা কওসরের ক্রোড়ে এবং অবশিষ্ট শিশুগুলি পিতামাতার দুই পার্শ্বে ছোট ছোট পাদপীঠে বসিয়াছে।

এইরূপে ভাগ্যবান গহওর আলী তারকাবেষ্টিত সুধাংশুর ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

---

১০. এই সকল বিষয়ের সহিত আমাদের মতানৈক্য নাই। মিসিস এনি বেশান্ত মহোদয়া থিওসোফীর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রচারক ও শিক্ষাগুরু। তিনি নিজের শিক্ষা ও ধর্ম্মের দিক দিয়া এসলামের সমালোচনা

কওসর পিতামহের অতি আদরের পৌত্রী। তিনি সাধ করিয়া ইহার নাম 'কওসর' রাখিয়াছেন। কওসর শব্দের অর্থ স্বর্গীয় জলাশয়, যেমন মন্দাকিনী।[১১]

যে কক্ষে তাঁহারা উপবেশন করিয়াছেন, সেটি কতক মুসলমানী ও কতক ইংরাজী ধরণে সজ্জিত ; নবাবী ও বিলাতী ধরণের সংমিশ্রণে ঘরখানি মানাইয়াছে বেশ। ত্রিপদীর (টিপায়ের) উপর একটি ট্রেতে কিছু জলখাবার এবং চা-দুগ্ধ ইত্যাদি যেন কাহার অপেক্ষায় রাখা হইয়াছে।

গওহর আলীর হস্তে একখানি পুস্তক ; তিনি তাহা পাঠ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেছেন। তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় ছিল, বায়ু। বায়ুর শৈত্য, উষ্ণতা, লঘুত্ব, গুরুত্ব ; বায়ুতে কয় প্রকার গ্যাস আছে ; কিরূপে বায়ু ক্রমান্বয়ে বাষ্প, মেঘ, সলিল, এবং শীতল তুষারে পরিণত হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রোতৃবর্গ বেশ মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিতেছে ; কেবল সপ্তমা দুহিতা সুরেয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন দ্বারা পিতার ধৈর্য্যগুণ পরীক্ষা করিতেছে! কখনও ছবি দেখিবার জন্য পিতার হস্ত হইতে পুস্তক কাড়িয়া লইতেছে।! পিতা কিন্তু ইহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং আমোদ বোধ করিয়া হাসিতেছেন।

গৃহিনী নূরজাহাঁ একবার ঐ ট্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ভাই এখনও আসিলেন না ; চা ত ঠাণ্ডা হইতে চলিল।"

গওহর। তোমার ভাই হয়ত পথে লেপ্‌চাদরের সঙ্গে খেলা করিতেছেন !

বালিকা রাবেয়া বলিল, "আমরা তাঁহাকে দ্বিতীয় বেঞ্চের নিকট অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। এইটুকু পথ তিনি এখনও আসিতে পারিলেন না ?"

সুরেয়া। বাব্বা ! বেন্ কি অল্প পথ ? আমি ত হাঁটিতে না পরিয়া আয়ার কোলে চড়িয়া আসিলাম।

রাবেয়া ? ঈশ্ ! আমি এক দৌড়ে দ্বিতীয় বেঞ্চ হইতে এখানে আসিতে পারি।

করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সব কথার সহিত আমাদের মতের মিল থাকিতে পারে না। এসলামের প্রকৃতস্বরূপ এখনও বহুস্থলে অপ্রকাশিত রহিয়াছে। আমরা যদি যথাযথভাবে ঐ স্বরূপটা জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি, তাহা হইলে প্রত্যেক ন্যায়দর্শী ও সত্যানুসন্ধিৎসু হৃদয়ই তাহার নিকট আত্মদান করিতে বাধ্য হইবে।

আল্লার প্রেরিত সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারক যাহারা মানবজাতির কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, মুসলমান মাত্রেরই মান্য ও নমস্য। তাহাদিগের উপর বিশ্বাস না করিলে কেহ মুসলমানই হইতে পারে না। আর আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল পয়গম্বরের নামোল্লেখ হইয়াছে, তাহা বাদে আরও অনেক পয়গম্বর আছেন, যাঁহাদের নাম হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে জ্ঞাত করা হয় নাই। অধিকন্তু প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতির নিকট প্রেরিত পুরুষগণ আসিয়াছেন ও স্বর্গের বাণী শুনাইয়াছেন, এই সমস্ত কথা প্রত্যেকটিই কোরআন শরীফের স্পষ্ট আয়াৎ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা মিসিস মহোদয়ার মন্তব্যের পূর্ণ সমর্থন করিতেছি। (আল এসলাম-সম্পাদক)।

১১. বালিকাদের নাম ও বয়স জানিয়া রাখিলে পাঠিকার বেশ সুবিধা হইবে। কওসরের ১৮, আখতরের ১৬, বদরের ১৪, রাবেয়ার ১২, মুশতরীর ১০, জোহরার ৮, সুরেয়ার ৬, নয়িমার ৪, এবং মাসুমার বয়স ২ বৎসর।

গওহরও কন্যাদের কথোপকথনে যোগ দিয়া বলিলেন, "আগে এক দৌড় আসিতে পারিয়া দেখাও, পরে বড়াই করিও। কোন কাজ করিতে পারার পূর্ব্বে 'পারি' বলা উচিত নহে !"

কওসর। এখান হইতে দ্বিতীয় বেঞ্চ প্রায় দুই মাইল হইবে, না আব্বা?

গও। কিছু বেশী হইবে। যাহা হউক, রাবু যখন বলিয়াছে, তখন তাহাকে অন্ততঃ একবার একদৌড়ে সে পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে !

আখতর। রাবু একদৌড়ে যাইবে, না পথে বিশ্রাম করিবে, তাহা জানিবার উপায় কি? গও। (বিস্ফারিত নেত্রে) জানিবার উপায়? রাবু যতদূর পর্য্যন্ত গিয়া ক্লান্তি বোধ করিবে, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পরাজয় স্বীকার করিবে। সে নিজেই বলিবে, সে কতদূর গিয়াছিল। আমার কন্যা কি মিথ্যা বলিবে?

রাবু। (সোৎসাহে) না আব্বা ! আমি মিথ্যা বলিনা—বলিবও না।

আখ্। আমি বেশ জানি, তুমি মিথ্যা বলনা ; তবে যদি মিথ্যা বাহাদুরির লোভে একটি ছোট মিথ্যা বলিয়া ফেলিতে !

রাবু। (সগর্ব্বে) মিথ্যা বলার পূর্ব্বে মরিয়া যাওয়া ভাল !

গও। ঠিক ! তোমরা কেহ একটি মিথ্যা বলিলে আমার মর্ম্মে বড়ই ব্যথা লাগিবে। আশা করি, তোমরা কেহ আমাকে কখন এরূপ কষ্ট দিবে না।

কতিপয় বালিকা সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"আমরা মিথ্যা না,—আমরা কষ্ট না," অথবা কি বলিল ঠিক শুনা গেল না !

এমন সময় সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। কওসর ও মাসুমা ব্যতীত অপর বালিকা কয়টি "মাম্মা আসিলেন" বলিয়া পলায়ন তৎপরা হইল। গওহর নয়িমাকে ধরিয়া বলিলেন, "সেজন্য পলাইস কেন মা?"

নয়িমা। ও বাব্বা ! আমি না—মাম্মা ! (অর্থাৎ আমি থাকিব না—মাম্মা বকিবেন)।

ইতঃমধ্যে জাফর আলী গৃহে প্রবেশ করিলেন। পলায়মানা বালিকাদের দেখিয়া গওহরকে সহাস্যে বলিলেন, "Solar system (সৌরজগৎ)–টা ভাঙ্গিয়া গেল কেন?"[১২]

গও। তুমি 'ধূমকেতু আসিলে যে !

নূরজাহাঁ ভ্রাতার নিমিত্ত চা প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইয়া গওহরকে বলিলেন, "তুমি একটু সর, ভাইকে অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিতে দাও।"

জাফর। না আমি অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিব না। যে ক্লান্ত হইয়াছি, আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মসিক্ত হইয়াছে। আমি এইখানেই বসি।

কওসর জলখাবারের ট্রেটা আনিয়া জাফরের সম্মুখে রাখিল, এবং তাঁহার ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখিয়া স্বীয় বসনাঞ্চলে মুছিয়া দিল।

---

১২. পুরুষদের কথোপকথনে দুই একটি ইংরাজী শব্দের ব্যবহার পাঠিকারা ক্ষমা করিবেন। ব্রাকেটের ভিতর শব্দগুলির অনুবাদ দেওয়া গেল।

জাফর এক পেয়ালা চা শেষ করিয়া ভগিনীর হস্তে পেয়ালা দিয়া বলিলেন, "নূরু ! আর এক পেয়ালা চা দে !"

গও। তোমার ভুল হইল। পেয়ালাটি লইবার জন্য তাঁহাকে এতদূর আসিতে হইল, ইহা অন্যায় ! তুমি উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে পেয়ালা দিতে পারিতে !

নূরজাহাঁ অধোমুখে মৃদুহাস্য করিলেন। কওসরের খুব জোরে হাসি পাইল বলিয়া সে প্রস্থান করিল, এবং মাতার সাহায্যের নিমিত্ত বদরকে তথায় পাঠাইয়া দিল।

জাফ। দেখ ভাই ! তোমার সাহেবীটা আমার সহ্য হয় না। তুমিই কি একমাত্র বিলাত ফেরতা ?

গও। না, তুমিও বিলাত ফেরতা ! তোমার গালি শুনিয়া আমোদ হয়, সেইজন্য সাহেবীভূতের দোহাই দিই ! সে যাহা হউক, তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন ? পথে পাহাড়ীদের সহিত গল্প করিতেছিলে না কি ?

জাফ। ভুটিয়াদের সহিত গল্প করিব কি, উহাদের ভাষাই বুঝি না ; যে ছাই "কান্‌ছু যানছু" বলে !

বদর তাহার পাহাড়ী ভাষায় অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বলিল, "যান্‌ছু মানে যাওয়া"। নূরজাহাঁ তাহাকে বলিলেন, "ইহাদের গল্পে যোগ দিয়া তোমার কাজ নাই মা ! যাও তুমি কওসরের নিকট।"

গও। তবে কেন বিলম্ব হইল ?

জাফ্। প্রথম বেঞ্চে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। তথা হইতে সমস্ত কারসিয়ঙ্গ সহরটা ত বেশ দেখা যায়। বাজার ষ্টেশন, কিছুই বাদ পড়ে না।

নূরজাহাঁ। হাঁ, ঐখানে বসিলে ধরাখানা সরা তুল্য বোধ হয় !

গও। আর যেদিন ইঁহারা পদব্রজে "চিম্‌নী সাইড"[১৩] পর্য্যন্ত আরোহণ ও তথা হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেদিন ইঁহাদের যে আনন্দ হইয়াছিল !—সম্ভবতঃ পোর্ট আর্থার এবং বালটিক ফ্লীট জয় করিয়াও জাপানীদের তত উল্লাস হয় নাই ! !

নূর। জাপানীরা তত উল্লসিত হইবে কি রূপে ? তাহাদের কার্য্য এখনও যে শেষ হয় নাই ! আর আমরা ত পদব্রজে ১২ মাইল ভ্রমণের পরে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াছিলাম !

জাফ। এখন বাকী আছে শ্রীমতীদের বেলুন আরোহণ করা !

গও। সময়ে তাহাও বাকী থাকিবে না !

জাফ। তুমি সপরিবারে ইংল্যাণ্ড যাইবে কবে ?

গও। যখন সুবিধা হইবে !

জাফ। হুঁ—কন্যাগুলি অক্‌স্‌ফোর্ড বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হইবে ! সাধে কি তোমাদের সৌরজগৎ বলি। তোমার দুহিতা কয়টি গ্রহ, আর তুমি সূর্য্য !

---

১৩. চিম্‌নী সাইড, স্থান বিশেষ ; তথায় চায়ের কারখানায় এক প্রকাণ্ড চিম্‌নী নির্ম্মিত হইয়াছিল। সাধারণের বিশ্বাস সেই চিম্‌নীর নিকটবর্ত্তী স্থানই কারসিয়ঙ্গের সর্ব্বোচ্চ স্থান।

উহাদের নামও ত এক একটি তারকার নাম—মুশ্‌তরী, জোহরা, সুরেয়া![১৪] তবে কেবল মঙ্গল, বুধ, শনি এ নামগুলি বাধ দেওয়া হইয়াছে কেন?

নূর। ভাই! তোমরা নিজেরা ঝগড়া করিতে বসিয়া মেয়েদের নাম লইয়া বিদ্রূপ কর কেন? আর এ নাম ত আমরা রাখি নাই, স্বয়ং কর্ত্তা রাখিয়াছেন। তাঁহার পৌত্রীদের নাম, তিনি যেরূপ ইচ্ছা রাখিবেন, তাহাতে আমাদের কিছু বলিবার অধিকার কি?

জাফরকে আরও অধিক ক্ষেপাইবার জন্য গওহর বলিলেন, "কেবল ইংলণ্ড কেন, আমেরিকা যাইবারও ইচ্ছা আছে,—কওসর 'নায়েগারা ফলস্' দেখিতে চাহে।"

জাফ। তোমার এ সাধ অপূর্ণ থাকিবে। কওসরকে আর 'নায়েগারা' প্রপাত দেখাইতে হইবে না।

গও। কেন?

জাফ। আগামী বৎসর সে তোমার ক্ষমতার বাহির হইবে।

গও। আমার হাতের বাহির হইলেই বা কি, জামাতাসহ যাইব।

জাফ। জামাতা তোমারই মত কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ হইলে ত?

গও। তুমি তাঁহাকে অধিক জান, না আমি?

জাফ। আমি সিদ্দিককে যতদূর জানি, তাহাতে আশা রাখি, তিনি তোমার মত forward (অগ্রগামী) নহেন।

গও। আমিও আশা রাখি তিনি তোমার মত backward (পশ্চাদ্‌গামী) নহেন! তিনি নিশ্চয়ই কওসরকে নায়েগারা প্রপাত দেখাইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"মাম্মা আব্বার সহিত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন, চল আমরা শুনি গিয়া," এই বলিয়া বদর আখ্‌তরকে টানিতে লাগিল।

আখ্‌তর। আমরা সেখানে গেলে মাম্মা গর্জ্জন ছাড়িয়া গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিবেন!

বদর। আমরা তাঁহার সম্মুখে যাইব না—পার্শ্বের ঘরে লুকাইয়া শুনিব।

কওসর। ছি বদু! লুকাইয়া কিছু শুনা উচিত নহে; সাবধান!

বদর। (ব্যগ্রভাবে) তবে আমি যে দুই একটি কথা শুনিয়া ফেলিয়াছি, তাহার উপায় কি?

কও! যাহা হইবার হইয়াছে। আর কখন এরূপ দোষ করিও না।

আখ্‌। মাসুমা ত ঘুমাইয়াছে; যাও নয়িমু! তুমিও ঘুমাও গিয়া।

---

১৪. অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র ও কৃত্তিকা নক্ষত্র।

নয়িমা। না, আমি ধুম্‌না।—[১৫]

আখ্। তবে আমি আর তোমার কোলে রাখিব না!

কও। চল এখন আমরা পড়াশুনা করি গিয়া। যাও ত বোন মুশ্‌তরী, তুমি দেখিয়া আইস, আমাদের পড়িবার ঘরে অগ্নিকুণ্ডে কয়লা, আগুন—সব ঠিক আছে কি না।

জোহ্‌রা। আমরা ডাউহিল স্কুলে পড়িতে গেলে খুব ছুটী পাইব, না?

আখ্। আরে! আগে যা ত ডাউহিল স্কুলে, তারপর ছুটী লইস!

বদর। আগে পাগলা ঝোরার[১৬] জলে ভাল করিয়া মুখখানা ধো!

রাবু। কেন আপা! আমাদের স্কুলে যাওয়া হইবে না কেন? তোমরাই তিনজনে যাইবে না—তোমরা বড় হইয়াছ। আমরা কেন যাইব না?

কও। ওরে, মাম্মা যাইতে দিলে হয়!

রাবু। মাম্মাটা ভাললোক নহেন,—তাঁহার চক্ষু দেখিলে আমার যে ভয় হয়! এখন তিনি আসিয়াছেন, কেবল আমাদের স্কুলে যাওয়ায় বাধা দিতে!

সুরেয়া। আমি ত স্কুলে যাইবই—

জোহ্। হাঁ, তুই একাই যাইবি—তুই বড় সোহাগের মেয়ে কি না!

বদ। রাবু! তোরা পাগলা ঝোরার সুশীতল নির্ম্মল জলে বেশ ভাল করিয়া মুখ ধুইস! আমরা তিনজন টেক্‌নিকাল স্কুলে ভর্ত্তি হইব।

রাবু। তোমাদের মাম্মা বাধা দিবেন না?

কও। বাধা দিয়াছিলেন; এখন রাজী হইয়াছেন।

জোহ্। আপা! সেখানে কেবল 'নান' আছে, "নানা' নাই?

বদ। না, সে স্কুলে 'নানা' নাই—কেবল একদল 'নানী' আছেন!

এখানে 'নানা' অর্থে নান্ শব্দের পুংলিঙ্গ বুঝিতে হইবে। দুষ্ট বালিকারা সেন্ট হেলেন্'স টেক্‌নিকাল স্কুলের নান্‌দিগকে "নানী" বলে! তা তাহাদের সাত খুন মাফ! এই স্কুলে বালিকাদিগকে রন্ধন, সূচিকর্ম্ম ও নানাপ্রকার বুনন গাঁথন (যাবতীয় ফ্যান্সী ওয়ার্ক) শিক্ষা দেওয়া হয়।

জোহ্‌রা সাদরে আখ্‌তরের হাত ধরিয়া বলিল, "আপা! তুমি আমার পুতুলের জন্য খুব সুন্দর শাল তৈয়ার করিয়া দিও?"

সুরেয়া কওসরের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিল, "আর তুমি অনেক মিঠাই তৈয়ার করিও।"

রাবু। হাঁ, তাহা হইলে তুমি খুব মিঠাই খাও! (সকলের হাস্য)।

মুশ্‌তরী আসিয়া জানাইল পাঠগৃহে সব প্রস্তুত। অতঃপর সকলে সেই কক্ষে গেল।

---

১৫. তিন চারি বৎসরের শিশুরা প্রায় কবর্গ স্থলে তবর্গ উচ্চারণ করে। গল্পের স্বাভাবিক ভাব রক্ষার্থে আমরাও নয়িমার ভাষায় তবর্গ ব্যবহার করিলাম।

১৬. পাগলা ঝোরা কারসিয়ঙ্গের বৃহত্তম ঝরণা।

কওসর শিক্ষয়িত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া গম্ভীরভাবে সকলকে সম্বোধন করতঃ বলিল, "আব্বা যে সন্ধ্যার সময় আমাদিগকে বায়ুর বিষয় বলিলেন, তাহার কোন্ কথা তোমরা কে বুঝিতে পার নাই? যে না বুঝিয়া থাক, আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি বুঝাইয়া বলি।"

মুশ্। আব্বা হাওয়ার কথা বলিয়াছেন। ইন্দ্রধনুর বিষয় ত কিছু বলেন নাই। আমি কালি তাঁহাকে ইন্দ্রধনুর কথা জিজ্ঞাসা করিব।

জোহ্। আমি আব্বাকে বলিব, আমায় একটা ইন্দ্রধনু আনিয়া দিতে।

সুরে। আমি ইন্দ্রধনু লইব।

বয়োজ্যেষ্ঠারা হাসিল। মুশ্‌তরী বলিল, "ওরে, ইন্দ্রধনু কি ধরা যায়?"

রাবু। ইন্দ্রধনু ধরা যায় না সত্য,—কিন্তু যে উপায়ে বায়ু ধরিয়া কাচের নলে বন্ধ করা যায়, পরীক্ষা করা যায়, সেইরূপে ইন্দ্রধনুকে ধরাও অসম্ভব নহে।

কও। এ অকাট্য যুক্তি! (সকলের হাস্য)।

রাবু। কেন, মন্দটা কি বলিলাম?

আখ্। না রাবু! কিছু মন্দ বল নাই। টেলিফোন, গ্রামোফোন—ফনোগ্রাফ ইত্যাদিতে মানুষের কণ্ঠস্বর ধরা গিয়াছে ও ধরা যায়, তবে ইন্দ্রধনু ধরা আর শক্তটা কি?

আবার হাসির গর্‌রা উঠিল।

কও। চুপ! চুপ!! মাম্মা শুনিলে বলিবেন, "এইরূপে বুঝি পড়া হইতেছে।"

মুশ্। (কষ্টে হাস্য সম্বরণ) আব্বা ত আমরা হাসিলে কিছু বলেন না?

রাবু। না, বরং তিনিও হাসেন।

বদ। তোরা আর এক কথা শুনিয়াছিস? জাহেদ ভাই ও হুরন বুবুকে মাম্মা প্রহার করিয়া থাকেন!

জোহ্। সত্য নাকি? বাবা! তবে আর আমি মাম্মার বাড়ী যাইব না। যখন নিজের ছেলে মেয়েকে মারেন, তখন আমাদের ত আরও মারিবেন।

সুরে। আব্বা ত আমাদের কখনও মারেন না।

রাবু। আমাদের আব্বা ভাল, মাও ভাল, কেবল ম্যাম্মাটি ভাল নহেন!

বদ। দাঁড়া! আমি মাম্মাকে বলিয়া দিব!

আখ্! রাবু তাঁহার মুখের উপর বলিতে ভয় করে কবে?

কওসর। বাস্! এখন চুপ কর!

বদ। বায়ুর বিষয় ভালরূপ বুঝিলাম কি না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন কর না, বড় আপা?

কও। আমি কাল দিনের বেলায় মেঘমালা দেখিয়া ও দেখাইয়া প্রশ্ন করিব। তোমরা এখন আমাকে প্রশ্ন করিয়া ভাল করিয়া বুঝিয়া লও।

রাবু। আমি কাল পোটাশিয়াম জলে ফেলিয়া তামাসা দেখিব।

মুশ্। পোটাশিয়াম জলে ফেলিলে কি তামাসা হইবে?

বদ। কেন তোমার মনে নাই?—উহা জলে ফেলিবামাত্র আগুন জ্বলিয়া উঠিবে

মুশ্। হাঁ, মনে পড়িল। আমি খেলা করিব, সোডিয়াম ও গরমজল লইয়া।

নয়িমা। (নিদ্রাবেশে চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে) আল আমি? আমি তি খেলিব?

আখ্ (সহাস্যে) তোমার এখন 'খেলিয়া' কাজ নাই! চল, তোমায় শয্যায় রাখিয়া আসি।

রাবু। মুশ্তরী! তোমার আগুন অপেক্ষা আমরা আগুনের রঙ বেশী সুন্দর হইবে!

মুশ্। কেন? সোডিয়াম গরম জলে ফেলিলে বেশী সন্দুর হলদে রঙের আগুন বাহির হইবে?

কও। তোমরা ঝগড়া ছাড়া আর কিছু জান না? রাবুই বড় দুষ্ট—ওই ঝগড়া আরম্ভ করে!

রাবু। ক্ষমা কর, বড় আপা! এখন কাজের কথা বলি। আমরা যে কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়ায় তুষার দেখি, উহাও কি পূর্ব্ব অবস্থায় বায়ু ছিল?

কও? হাঁ; এবং এখন আবার উপযুক্ত উত্তাপে বাষ্পীভূত হইতে পারে।

রাবু। তবে সূর্য্যোত্তাপে গলিয়া যায় না কেন?

কও। গলে বইকি? এ বরফ অল্প উত্তাপে স্থানভ্রষ্ট হইয়া নদীর মত বহিয়া যায়; তাহাকে ইংরাজীতে "গ্লেসিয়ার" বলে। আব্বা উহার নাম দিয়াছেন "নীহারনদী"।

রাবু। বাঃ। বরফের নদী ত বড় সুন্দর দেখাইবে! চল আমরা একদিন কাঞ্চনজঙ্ঘার নিকট গিয়া নীহারনদী দেখিয়া আসি।

বদ। বটে? কাঞ্চনজঙ্ঘা বুঝি খুব নিকট?

রাবু। নিকট না হউক, আমরা কি পথ চলিতে ভয় করি? একদিন চিম্‌নী সাইডে উঠিয়াছিলাম—তাহা কি অল্প পথ ছিল? পাঁচ ছয় মাইল আরোহণ ও অবতরণ কি সামান্য ব্যাপার? আবার সেদিন ডাউহিল ও ঈগেলস্ ক্রেগের সন্ধিস্থলে নামিয়াছিলাম।

বদ। ডাউহিলের সন্ধিস্থলে অবতরণ করিয়া কেমন ক্লান্ত হইয়াছিলে, মনে নাই?

কও। রাবু ত বলিয়াছিল, আমি আর হাঁটিতে পারি না; আমাকে ফেলিয়া যাও! আমায় ভল্লুকে খায় খাইবে!

রাবু। ডাণ্ডিটা[১৭] সময়ে না পাওয়া গেলে আসিতেই পারিতাম না।

কও। আব্বাই ডাণ্ডির বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, অর্দ্ধপথে বদু ও রাবুর বীরত্ব প্রকাশ পাইবে!

বদ। আমি ত ভাই রাবুর মত অহঙ্কার করি না যে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্য্যন্ত পদব্রজে যাইতে পারিব, একদৌড়ে দ্বিতীয় বেঞ্চ অতিক্রম করিব। হাঁ, ভাল কথা! আমি যে সেই ঈগেলস ক্রেগের সন্ধিস্থলের বিজন অরণ্য হইতে ফুল আনিয়াছিলাম, তাহা কোথায় রাখিয়াছি? মনে ত পড়ে না।

---

১৭. ডাণ্ডি, বাহন বিশেষ; ইহা শিবিকার ন্যায় মানুষের স্কন্ধে বাহিত হয়।

কও। ফুলগুলি বনে ফিরিয়া গিয়া থাকিবে!

বদ। তবে তুমি তুলিয়া রাখিয়াছ! আর ভাবনা নাই।

কও। তোমার ফুল কিরূপ ছিল? আমার সংগৃহীত কুসুমরাজি হইতে তাহা বাছিয়া লইতে পার?

বদ্। বেশ পারি,—সে ফুল্ বকুল ফুলের মত ; গন্ধ ও আকৃতি বকুলের, কেবল বর্ণ পীত।

রাবু। আর কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর যে ক্রেপের ওড়নার মত পাতলা মেঘের গাঢ়গোলাপী বেগুনী চাদর দেখিতে পাই, তাহা কোথা হইতে আইসে?

কও। সূর্য্যের উত্তাপে ঐ জমাট তুষার হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাই মেঘের ওড়না রূপে কাঞ্চনের চূড়া বেষ্টন করিয়া থাকে।

আখ্। আমি ভাবিয়াছিলাম, কাঞ্চনের ওড়নাগুলি বানারস হইতে আইসে!

সুরেয়া ধীরে ধীরে কওসরের নিকট আসিয়া বলিল, "বড় আপা! আমাকে ইন্দ্রধনু দিবে না?"

কও। (সুরেয়ার মুখ চুম্বন করিয়া) আমি কাল তোমায় ইন্দ্রধনু দিব।

বদ। সে কি! তুমি ইন্দ্রধনু ধরিবে কেমন করিয়া?

কও। ঝাড়ের কলমে (ত্রিকোণ কাচ খণ্ডে) ইন্দ্রধনু দেখা যায় তা জানিস না?

বদ। তবে ত ইন্দ্রধনু ধরিয়া দেওয়া বড় সহজ! হা হা!

আখ্। বড় আপা যে "কল্পতরু"! তিনি দিতে না পারেন কি?

কও। "কল্পতরু নহে",—"কল্পলতা" বলিতে পার!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নে নূরজাহাঁ চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া জাফর ও গওহরের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

মাতার অঞ্চল ধরিয়া মুশ্‌তরী বলিল, "কেন মা, আজি এখন কেন আমরা বেড়াইতে বাহির হইব না?"

নূরজাহাঁ। সকালে তোদের মাম্মা ভিক্‌টোরীয়া স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন, এখন তিনি বিশ্রাম করিবেন। তাঁহাকে একা রাখিয়া আমরা কিরূপে যাইব?

জোহ্‌রা। কেন? মাম্মা একা থাকিতে ভয় করিবেন না কি? তুমি না যাও, আমরা আব্বার সঙ্গে যাইব!

কর্ত্তা সে কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র মুশ্‌তরী ও জোহ্‌রা তাহাদের দরখাস্ত পেশ করিল। গওহর বলিলেন, "বেশ চল্,—অধিক দূর যাইব না, কেবল ঈগেল্‌স ক্রেগে গিয়া ফিরিয়া আসি।"

জোহ্। না, আব্বা! ঈগেল্‌স্ ক্রেগ্ না! সে দিকে বড় জোঁক।

মুশ্। না, ও জোঁকের ক্ষেত্রে গিয়া কাজ নাই।

গও। ছি! তোরা জোঁক দেখিয়া ভয় করিস? (জাফরের পদ শব্দ শুনিয়া) আচ্ছা চুপ কর! তোদের মাম্মাকেও লইয়া যাইব। তাঁহাকে অগ্রে যাইতে বলিয়া আমরা পশ্চাতে থাকিব।

জোহ্। (আনন্দে করতালি দিয়া) সে বেশ হইবে! পথে জোঁক থাকিলে পূর্ব্বে তাঁহাকে ধরিবে।

মুশ্। চুপ চুপ! মাম্মা!—

ইতঃমধ্যে জাফর আসিয়া চায়ের টেবলে যোগদান করিলেন।

গও। ভাই! আজ আর একটু বেড়াইবে না?

জাফ। না, আমার পা বড় ব্যথা করিতেছে।

গও। তবু আজ একটু না হাঁটিলে কাল তুমি একেবারে খোঁড়া হইয়া যাইবে। বেশী নহে—চল এই ঈগেল্স্ ক্রেগ্ পর্য্যন্ত।

জাফ। আমি যে বুট পরিতে পারিব না।

গও। বুট পরিবার দরকার কি, শ্লিপর লইয়াই চল না? সে ত প্রস্তরসঙ্কুল পথে নহে; ঘাসের উপর চলিবে।

রাবু। (জনান্তিকে) শ্লিপর পরিয়া গেলে জোঁক ধরিবার পক্ষে সুবিধা হইবে! (বালিকাদের হাস্য)।

জাফ। (বালিকাদের প্রতি) ছি! হাসিস কেন? তোরা বড় বে-আদব। কেন নূরু, তুই কি একটা ধমক দিতেও পারিস না?

নূর। দোষ বুঝাইয়া না দিলে ওরা ধমক মানে না।

গও। বিনাদোষে বিনাকারণে ধমক মানিবেই না কেন? হাসিলে দোষ কি?

জাফ। বাস্! গওহর, তুমিই মেয়েদের মাথায় তুলিয়াছ।

গও। আচ্ছা, এখন তোমার যাওয়া ঠিক হইল ত?

জাফ। না—পথ কি বড় ঢালু? উপরে উঠিতে হইবে, না, নীচে যাইতে হইবে?

গও। পথ ত একটু ঢালু হইবেই—এখানে সমতল স্থান কোথা পাইবে?

জাফ। তবে আমি যাইব না—এ প্রকাণ্ড শরীর লইয়া গড়াইতে চাই না!

গও! ছি! তুমি পাথুরে পথকে ভয় কর, ঢালুপথে গড়াইতে চাও না,—ইহা তোমার womanishness (স্ত্রীভাব)।!

নূর। "womanish" শব্দে আমি আপত্তি করি! 'ভীরুতা' 'কাপুরুষতা' বল না কেন?

জাফ। পিপীলিকার পক্ষ হইলে শূন্যে উড়ে। স্ত্রীলোকে শিক্ষা পাইলে পুরুষদের কথার প্রতিবাদ করে,—সমালোচনা করে। তুমি কি গওহরকে ভাষা শিক্ষা দিবে?

গও। স্ত্রীলোকেরা আমাদের অনুপযুক্ত কথার প্রতিবাদ করেন, আমাদের গল্পের অংশ গ্রহণ করেন, ইহা ত অতি সুখের বিষয়।

জাফ। তুমি এখন মূর্খ!—তোমারই পক্ষপাতিত্ব করিয়া নূরুকে ধমক দিলাম, আর তুমি উল্টা আমারই কথার প্রতিবাদ কর?

গও। প্রবলের পক্ষ সমর্থনের আবশ্যকতা নাই। তুমি তোমার ভগিনীর পক্ষপাতিতা করিবে, ইহাই স্বাভাবিক এবং সমুচিত।

নূর। ভাই আমার মত বা পক্ষ সমর্থন করিবেন কেন? আমি বেচারী তাঁহার কি কাজে লাগি?—আমি কি তাঁহাকে মোকদ্দমায় সৎ পরামর্শ দিতে পারি? আমি কি তাঁহার জমীদারী দাঙ্গার সময় পাঁচ সাত জন লাঠিয়াল পাঠাইয়া সাহায্য করিতে পারি?

গওহর হাসিলেন। জাফর অন্য কথা তুলিলেন ;—

"সত্যই নূরু এবার আমার সঙ্গে যাইবে না? আমি ভাবিয়াছিলাম, আগামী বৎসর যাইতে পারিবে না, তখন কওসরুর বিবাহের ধূমধামে ব্যস্ত থাকিবে। এবার যাইবে না কেন? তুমি গুরুজী এই শিক্ষা দিয়াছ না কি?"

আবার প্রবলবেগে হাসি পাওয়ায় বালিকাদল পলায়ন করিল।

গও। দোহাই তোমার! আমি কিছু শিক্ষা দিই নাই। উনি ত প্রতি বৎসর তীর্থদর্শনের ন্যায় তোমার সহিত পিত্রালয়ে যাইতেন। এবার কেন যাইতে অনিচ্ছুক, উহাকেই জিজ্ঞাসা কর।

জাফ। বল নূরু! কেন যাইবে না?

নূর। আমি রাবুদের ডাউহিল স্কুলে ভর্ত্তি করিবার চেষ্টায় আছি।

স্কুল শব্দ শুনিবামাত্র জাফর বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিলেন,—"কি বলিলে? স্কুলে মেয়ে ভর্ত্তি করিবে? এখনও ভারত হইতে মুসলমানের নাম বিলুপ্ত হয় নাই—এখনও মুসলমানসমাজ ধ্বংস হয় নাই! এখনই মেয়েরা স্কুলে পড়িবে? এ প্রথম অভিশাপ আমারই ভাগিনেয়ীদের উপর? প্রথম অধঃপতন আমাদেরই?"

গও। তুমি ভালরূপে কথাটা না শুনিয়াই বিলাপ আরম্ভ করিলে? ডাউহিল স্কুলে কেবল বালিকারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। সেখানে সাত আট জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা আছেন। তথায় পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। তাদৃশ বিদ্যালয়ে কন্যা পাঠাইলে দোষ কি?

নূর। সে স্কুলে পুরুষ মোটেই নাই। মেথরাণী ও আয়াই স্কুল গৃহের যাবতীয় কার্য্য করে। কেবল বাবুর্চ্চি ও খানসামা পুরুষ। পাচকের সঙ্গে স্কুলগৃহের কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল রন্ধনশালা হইতে খানা বহিয়া আনে দুই তিনজন চাকর। প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সহিত আমি কথা ঠিক করিয়াছি যে ঐ খাদ্যদ্রব্য বহিবার জন্য যদি আমি উপযুক্ত চাকরাণী দিতে পারি, তবে তিনি তাহাদিগকেই নিযুক্ত করিয়া পুরুষ কয়টিকে বরখাস্ত করিবেন। উক্ত শিক্ষয়িত্রীটি অতিশয় ভদ্রলোক—তিনি আমাদের পর্দার সম্মান করিয়া থাকেন। সমস্ত স্কুলটি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম,—কোথাও একটিও চাকর ছিল না।

জাফ। তোমরা বল—আমি শুনি! আর ঐ স্কুলের পার্শ্বেই যে বালকদের স্কুল। ছুটীর সময় বালক বালিকারা একত্রে খেলা করিবে—

গও। বালক স্কুল হইতে বালিকা স্কুলের ব্যবধান এক মাইলেরও অধিক ; এমত স্থলে তাহারা একত্রে খেলিবে কিরূপে?

জাফ। যদি তোমার চক্ষে কোন পীড়া না হইয়া থাকে তবে ষ্টেশনের নিকট দাঁড়াইলেও দেখিবে,— উভয় স্কুলের চূড়া পাশাপাশি।

নূরজাহাঁ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। গওহর সহাস্যে বলিলেন, "তোমার অভিজ্ঞতার বলিহারি যাই! আজি তুমি ভিক্টোরিয়া স্কুল পরিদর্শন করিয়া এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছ?"

জাফ। আমি স্কুলের ভিতর যাই নাই।

গও। (সবিস্ময়ে) তবে সকালে তিন ঘন্টা তুমি কোথায় ছিলে?

জাফ। তৃতীয় বেঞ্চে কতকক্ষণ বসিয়াছিলাম। তারপর স্কুল সীমানায় প্রবেশ করিয়া দেখি, পথ আর ফুরায় না। একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, স্কুল পৌঁছিতে আরও ১৫ Turn (পেচ) বাকী। (অর্থাৎ পথ ত সোজা নহে, আঁকাবাঁকা ; তাই আরও ১৫ বার ঘুরিলে স্কুল পাওয়া যাইবে)। তখন আমি ভাবিলাম, আজি আর পথ শেষ হইবে না, তাই ফিরিয়া আসিলাম।

নূরজাহাঁ আবার হাসিলেন। আর গওহর বলিলেন, "বাস্! মোল্লার দৌড় মস্জিদ পর্য্যন্ত! তুমি প্রায় স্কুলের দ্বারদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ, ভিক্টোরিয়া স্কুলই দেখ নাই, অথচ ডাউহিল স্কুল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ! তুমি কি জান বালিকা বিদ্যালয় কোথায়? স্কুলগৃহের যে যুগল চূড়া দেখা যায়, উহা এক ভিক্টোরিয়া স্কুলেরই। স্কুলটি কি তুমি সামান্য গ্রাম্য পাঠশালা মনে করিয়াছ? উহা এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা,—এবং উহা অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বালকদের ক্রীড়া প্রাঙ্গণই ত প্রায় পাঁচ বিঘা জমী!"

নূর। এবং ডাউহিল স্কুল উহা অপেক্ষাও প্রকাণ্ড। একটি কক্ষে পঞ্চাশটি বালিকার শয্যা দেখিলাম ; এবং প্রত্যেক পর্য্যঙ্ক অপর পর্য্যঙ্ক হইতে দুই হাত ব্যবধানে। এখন আন্দাজ কর ত কক্ষটা কত বড়?স

জাফ। অতবড় ঘর এ প্রস্তরসঙ্কুল দেশে নির্ম্মাণ করা কি সহজ না সম্ভব?

নূর। সহজ না হউক সম্ভব ত। বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে ত। প্রথমে একটা টেনিস কোর্ট দেখিয়া আমার চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছিল। কতগুলি কঠিন প্রস্তরের মস্তক চূর্ণ করিয়া ঐ সমতল প্রাঙ্গণখানি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। কেবল প্রস্তর ভাঙ্গিতে হয় নাই, স্থানবিশেষে জোড়া দিয়া ভরাটও করিতে হইয়াছে। অতখানি স্থান যে একেবারে গর্ত্তশূন্য ছিল, তাহা হইতে পারে না। একদিকে মহাশিল্পীর পর্ব্বত-রচনা কৌশল, অপরদিকে তাঁহারই প্রদত্ত মানববুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ—উভয়ের মিশামিশি বড় চমৎকার বোধ হয়।

গও। ভাই! তুমি দিনকতক এখানে থাক, তাহা হইলে তুমিও কবি হইতে পারিবে! কবিত্ব-জ্ঞান-রহিত অবলার মরুতুল্য হৃদয়েও যখন কবিত্ব-কুসুম ফুটিয়াছে—

জাফ। আমি নূরুর অপেক্ষা কম Prosaic (অকবি) নাহি! আমরা উভয় ভ্রাতা ভগিনীই পাসিক্ক prosaic!

গও। কিন্তু এখানকার জলবায়ু এমন যে—

"বারেক দর্শন পেলে চিরমূক কথা কয়!
... মহামূর্খ কবি হয়!"

জাফ। কিন্তু তাহাতে লাভ কি? কবিত্বটা মস্তিষ্কের রোগবিশেষ! আমাদের কুলকামিনীরা পাহাড়ে ময়দানে বেড়াইয়া কবি হয়, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

গও। তবে কি বাঞ্ছনীয়?

জাফ। বাঞ্ছনীয় এই,—তাহারা সুচারুরূপে গৃহস্থালী করে, রাঁধে, বাড়ে, খাওয়ায়, খায়, নিয়মিতরূপে রোজা-নমাজ প্রতিপালন করে।

গও। নমাজ কাহার উদ্দেশে?

জাফ। (আরক্তলোচনে) কাহার উদ্দেশে?—খোদাতালার উদ্দেশে!

গও। বেশ ভাই ঠিক বলিয়াছ। তুমি অবশ্যই জান, একটা পারস্য বয়েৎ আছে—"চিত্র দেখিয়া চিত্রকরকে স্মরণ কর।" আর ইনি এখনই মহাশিল্পী বলিয়া কাহার প্রশংসা করিলে?

জাফ। মহাশিল্পী ত ঈশ্বরকে বলা হইয়াছে।

গও। তবে কবিত্ব ধর্ম্মের বিরোধী হইল কিসে? ঈশ্বরের সৃষ্টি যতই অধিক দেখা যায়, ততই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির বৃদ্ধি হয়। চক্ষু কর্ণ, যথাবিধি খাটাইয়া সৃষ্টি-জগতের পরিচয় না লইলে স্রষ্টাকে ভালমতে চিনিবে কিরূপে? পর্ব্বতচূড়ায় দাঁড়াইলে আপনা হইতেই হৃদয়ে ভক্তি-প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হয়,—তখন অজ্ঞাতে হৃদয়-তন্ত্রে বাজিয়া উঠে—

"সেই অদ্বিতীয় কবি আঁকিয়া এমন ছবি—
আপনি অদৃশ্য হ'য়ে আছেন কোথায়?"

জাফ। আমি ভালমতে বাঙ্গালা বুঝি না।

গও। তবে বল—"জমীচমন্ গুল্—"[১৮]

জাফ (বাধা দিয়া) রাখ এখন তোমার কবিতা! কন্যাগুলি নিশ্চয় স্কুলে যাইবে?

গও। নিশ্চয়! কওসর, আখ্তর ও বদুর স্কুলে পড়িবার সময় গত হইয়াছে, সেজন্য বড় আক্ষেপ হয়।

জাফ। তবে নূরজাহাঁকেও ভর্ত্তি কর!

গও। আমার আপত্তি নাই! ইনি ত বলেন যে "শিং কাটাইয়া বাছুর দলে মিশিতে ইচ্ছা হয়"।

জাফ। (সহোদরার প্রতি) মিশিলেই পার! তোমারও একান্ত ইচ্ছা নাকি শ্রীমতীদের খ্রীষ্টান করা?

---

১৮. অর্থাৎ "ধরণী কানন ফুল"—বাকী অংশ ত উচ্চারিতই হয় নাই।

নূর। মেয়েরা খ্রীষ্টান হইবে কেন? আমি অহঙ্কারের সহিত বলি,—আমার মেয়েরা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে পারে না ইহারা খাঁটি সোনা—অনলে সলিলে ধ্বংস হইবে না।

গও। আমিও সাহঙ্কারে বলি, তোমার স্ত্রীর বিশ্বাস (ইমান) টলিতে পারে, কিন্তু আমার স্ত্রীর বিশ্বাস অটল!

জাফ। আমার স্ত্রী বিশ্বাস অস্থায়ী হইল কিসে?

গও। যেহেতু তিনি আপন ধর্ম্মের কোন তত্ত্বই অবগত নহেন। কেবল টিয়া পাখীর মত নমাজ পড়েন, কোন শব্দের অর্থ বুঝেন না। তাঁহাকে যদি তুমি স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধা না রাখ তবে একবার কোন মিশনরী মেমের সহিত দেখা হইলেই তিনি মনে করিবেন, "বাঃ! যিশুর কি মহিমা!" সুতরাং সাবধান! যদি পার ত লৌহসিন্দুকে বন্ধ রাখিও।

জাফ। আর নূরু বুঝি নমাজে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থ জানে?

গও। জানেন কিনা পরীক্ষা কর! তুমি কি মনে কর এই কুড়ি বৎসরের বিবাহিত জীবনেও আমি আমার অর্দ্ধাঙ্গীকে আমার ছায়াতুল্যা সহচরী করিয়া তুলিতে পারি নাই?

জাফ। তবে দেখ নূরু যে স্কুলে পড়ে নাই সে জন্য কি আটকাইয়াছে? তবে মেয়েগুলার মাথা খাও কেন?

গও। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রেলপথে ভ্রমণ করেন নাই, টেলিগ্রাফে সংবাদ পাঠান নাই, সেজন্য তাঁহাদের কিছু আটকাইয়াছিল কি? তবে আমরা টেলিগ্রাম পাঠাই কেন, রেলগাড়ীতে উঠি কেন?

জাফ। আমাদের ত ওসব আবশ্যক হয়।

গও। যাহা আমাদের জন্য আবশ্যক, তাহা আমাদের মহিলাদের জন্যও প্রয়োজন। তাঁহারা আমাদের আবশ্যক-অনুযায়ী বস্তুই ত যোগাইয়া থাকেন। গ্রাম্য চাষার স্ত্রীরা জরির কাজ জানে না, আচার মোরব্বা প্রস্তুত করিতে জানে না, কারণ চাষাদের তাহা আবশ্যক হয় না। ইউরোপীয়া কামিনীরা পান সাজিতে জানে না, কারণ ইউরোপীয় পুরুষদের তাহা আবশ্যক হয় না। আবার আমাদের কুলবালারা চাষা স্ত্রীদের মত ধান ঝাড়িতে জানেন না, যেহেতু আমাদের তা প্রয়োজন হয় না। ক্রমে আমরা কারি, কাট্‌লেট, পুডিং খাইতে শিখিতেছি আমাদের গৃহিণীরাও তাহা রাঁধিতে শিখিতেছেন। আমাদের ছাড়া তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কই? এবং তাঁহাদের ছাড়া আমাদেরও নিরপেক্ষ অস্তিত্ব কই? স্কুল কলেজের শিক্ষা যেমন আমাদের আবশ্যক, তদ্রূপ তাঁহাদেরও প্রয়োজন। তোমার পারিবারিক জীবন অপেক্ষা আমার গার্হস্থ্য জীবন অধিক সুখের, ইহা তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে? তোমার সমস্ত সুখ দুঃখ তোমার স্ত্রী কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

ফাজ। তাহা না পারুন; কিন্তু তিনি আমার মতের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন না। আমি যদি দিনকে রাত্রি বলি, তিনিও বলেন,—"হাঁ, দিব্য জ্যোৎস্না!" আবার যদি আমি অমাবস্যা রাত্রিকে দিন বলি, তিনিও বলিবেন,—"হ্যাঁ, রৌদ্র বড় প্রখর।"

গও। সাবাস! (সকলের হাস্য)

জাফ। তা' না ত কি! স্বামীস্ত্রীর মত এক না হইলে দিবানিশি রুশ-জাপান যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হয়।

গও। কিন্তু স্বামীস্ত্রীর মত এক হইল কই? তুমি যেরূপ বলিলে তাহাতে কেবল তোমারই মত প্রকাশ পায়, তাঁহার ত মতামত জানাই যায় না। তিনি কদাচ নিজ মত ব্যক্ত করেন না এবার যখন কোন পশুশালায় যাইবে অনুগ্রহ করিয়া পশুগুলির সমক্ষে কোনো বিশেষ মত প্রকাশ করিও, আর পশুগুলি উত্তর না দিলে বা মাথা নাড়িলে বুঝিয়া লইও, পশুগণ তোমার সহিত একমত হইয়াছে!

জাফ। শুন, আর একটি কাজের কথা বলি; আগামী বৎসর ত কওসরের বিবাহ, এখন তাহাকে লইয়া তোমরা পাহাড় পর্ব্বতে বেড়াও, বরপক্ষীয় লোকেরা শুনিলে কি বলিবে?

নূর। বরপক্ষের ইহাতে আপত্তি নাই, জানি।

গও। বর ত শিমলাতেই কাজ করেন। আর স্বামীর সহিত স্ত্রী বেড়াইবে, পিতার সহিত কন্যা বেড়াইবে, তাহাতে অন্য লোকের আপত্তি করিবার অধিকার আছে কি?

জাফ। বেশ, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন! বরটিও তোমাদের মনোমত পাইয়াছ। তাহা হইলে দেখিতেছি আমার নির্ব্বাচিত পাত্রের সহিত আখ্‌তরের বিবাহ দিবে না।

গও। না কওসরের ভাবী দেবরের সহিত আখতরের বিবাহ হইবে।

জাফ। তবে উভয় কন্যার বিবাহ একই সঙ্গে দাও না কেন?

গও। তাহা হইলে ভালই হইত কিন্তু সে ছেলেটি এখন বিলাতে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত টুঙ্গ নামক স্থানে একটি ঝরণার ধারে কয়েক ব্যক্তি বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা, সে বলিল,—"মেজ আপা! দেখ ত এই ঝরণা কোথায় হইতে আসিয়া ভীমবেগে আবার কোথায় চলিয়াছে! তুমি বলিতে পার শেষে কোথায় গিয়াছে?"

আখ্‌তর। না, রাবু! আমি ত জানি না শেষে কোথায় গিয়াছে। আসিয়াছে ঐ পাহাড়ের পাষাণ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া।

রাবু। সামান্য জলধারা পাষাণ বিদীর্ণ করিল কিরূপে? তাহা কি সম্ভব?

কওসর। ঐ জলধারা কেবল পাষাণ বিদীর্ণ করিয়াছে, তাহাই নহে; কত প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড উহার চরণতলে গড়াইতে গড়াইতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বালুকাকণায় পরিণত হইয়াছে।

প্রকাণ্ড প্রস্তর বালুকায় পরিণত হওয়ার কথাটা রাবু সহজে ধারণা করিতে না পারিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য আব্বা?"

গওহর কথা কহিবার পূর্ব্বে জাফর বলিলেন, "হাঁ সত্য। তোরা যেমন পিতৃক্রোড়ে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিস, ঐ নির্ঝরগুলি সেইরূপ পাষাণময় পিতৃবক্ষে নৃত্য করিতেছে—পিতা তবু অটল! হিমাদ্রিও ঠিক গওহরেরই মত সহিষ্ণু! আর শোন্, ষ্টিমার হইতে যে বিশালকায়া জাহ্নবী দেখিয়াছিস, এইরূপ কোন একটি শিশু নির্ঝরই তাহার উৎস।"

রাবু। (আনন্দ ও উৎসাহের সহিত) তবে মাম্মা ! বলুন ত ইহার কোন্‌টা গঙ্গার উৎস ?

জাফ।. গঙ্গার উৎস এখানে নাই।

কও। কি ভাবিতেছ আখ্‌তর ?

আখ্‌। ভাবিতেছি,—এই ক্ষীণাঙ্গী ঝরণাগুলি হিমালয়ের হৃদয়ে কেমন গভীর হইতে গভীরতম প্রণালী কাটিয়া কলকলস্বরে স্রষ্টার স্তবগান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে ! বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—আলস্য ঔদাস্য নাই—অনন্ত অবারিত গতিতে চলিয়াছে !

রাবু। মেজ আপা ! আমিও একটি নদীর উৎস আবিষ্কার করিলাম !

আখ্‌। বটে ?

কও। কি আবিষ্কার করিয়াছিস বল ত ?

রাবু। কারসিয়ঙ্গের পাগলা ঝোরাই পাগলা নদীর উৎস !

আখ্‌। দূর পাগলি !

বদর। রাবু কিন্তু কথাটা একেবারে অসঙ্গত বলে নাই,—ত্রিস্রোতা নদী ত এই দার্জ্জিলিঙ্গের আশপাশেই—

কও। ধন্য তোমাদের গবেষণা ! বদু ত বেশ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে !

বদু। যদি গবেষণায় ভুল হইয়া থাকে, তবে ওকথা থাক ; আর এক মজার কথা বলি,—বেশ খেয়াল করিয়া দেখ ত, পাহাড়ের বুকের ভিতর দিয়া রেলপথ কেমন আঁকিয়াবাঁকিয়া গিয়াছে—একদিকে সুউচ্চ পর্ব্বত, অন্যদিকে নিম্নস্থিত অনুচ্চ পাহাড়ের স্তূপ—একটির পর অপরটি ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত দেখায় ! ইহাকে পর্ব্বত-তরঙ্গ বলিলে কেমন হয় ?

কও।.বেশ ভাল হয়। সমুদ্রের ঢেউয়ের কথা তোমার মনে আছে বোন ?

বদু। না দিদি ! মনে ত পড়ে না।

রাবু। মাম্মা ! আমি ঐ ঝরণার জল স্পর্শ করি গিয়া ?

জাফ। যাবি কিরূপে ? অবতরণের পথ যে দুর্গম।

রাবু। আপনি অনুমতি দিন,—আমি যেমন করিয়া পারি, যাইব। সেজ আপা ! তুমিও আসিবে ?

বদু। না, তুমি একাই যাও।

জাফর অনুমতি দিলেন। রাবু অতি কষ্টে অগ্রসর হইল ; শেষে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর তাহার গতিরোধ করিল। সেটি অতিক্রম না করিলে জলস্পর্শ করা হইবে না। উপর হইতে কওসর শাসাইল, "দেখিস কাপড় ভিজে না যেন।" প্রায় হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে রাবু সে প্রস্তর অতিক্রম করিল ! শীতল জল অঞ্জলি ভরিয়া লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

তদ্দর্শনে বদুর একটু হিংসা হইল। সে রেলিং-এর ধারে দাঁড়াইয়া বলিল,—'কিলো রাবু ! স্বর্গে পঁহুছিয়াছিস্‌ যে ? তোর আনন্দের সীমা নাই ! তুই তবে থাক ঐখানে,—আমরা চলিলাম !"

নূরজাহাঁও ডাকিলেন, "আয় মা ! বেলা যায়।" সকলে আরও কতকদূর অগ্রসর হইলেন। ইঁহারা টুঙ্গ হইতে পদব্রজে কারসিয়ঙ্গ চলিয়াছেন।

পথে দুই তিনজন পাহাড়ী তাহাদিগকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিয়া একদিকে দাঁড়াইল। 'ওহর জাফরকে বলিলেন, "দেখিলে ভাই ইহাদের শিভাল্‌রী (অবলার প্রতি সম্মান ᐟ.দর্শন)?"

জাফ। ইহা উহাদের অভ্যাস, অনেকে সময় স্ত্রীলোকেরাও আমাকে সুপথ ছড়িয়া দিয়া পথিপার্শ্বে দাঁড়ায়।

নূর। যেহেতু তাহারা "নীচেকা আদমি"কে দুর্ব্বল মনে করে।

জাফ। আমি কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট দুর্ব্বলতার স্বীকার করি না।

গও। যে সবল তাহার নিকট দুর্ব্বলতা স্বীকার করায় দোষ কি?

জাফ। যাহাই হউক, স্ত্রীলোককে আমি কায়িক বলের শ্রেষ্ঠতা দিব না!

গও। কেন দিবে না? "Give the devil even his due" (শয়তানকেও তাহার প্রাপ্য স্বত্ব দান কর)।

জাফ। কিন্তু আমি রমণীকে তাহার প্রাপ্য স্বত্ব দিতে অক্ষম!

গও। তবে একবার শর্টকাট পথে কোন পাহাড়িনীর সহিত race (বাজী) দৌড়িতে চেষ্টা কর দেখি!

জাফ। শর্টকাটে? তাহা মানুষের অগম্য!

নূর। তবে ঐ দুর্গম পথে যাহারা পৃষ্ঠে দুই মণ বোঝা সহ অবলীলাক্রমে আরোহণ ও অবরোহণ করে, তাহাদের নিকট দুর্ব্বল বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ কর কেন?

এস্থলে পার্ব্বত্য শর্টকাট পথের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। প্রস্তর সঙ্কুল গড়ানিয়া খাড়া সংক্ষিপ্ত পথকে short cut বলে। শর্টকাট পথ বড়ই দুর্গম ; কোথাও উচ্চ প্রস্তর, কোথাও গর্ত্ত, কোথাও এমন ঢালু যে পা রাখা যায় না। পাথর কাটিয়া ভাঙ্গিয়া অশ্বাদি, গাড়ী ও ("নীচেকা") মানুষের জন্য গবর্ণমেন্ট যে অপেক্ষাকৃত সমতল, কিন্তু ক্রমোচ্চ সুগম পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; তাহাকে স্থানীয় ভাষায় "সরকারী সটক" বলে। ঐ সরকারী সটকগুলি অনেক দূর আঁকিয়াবাঁকিয়া যায়। সচরাচর গুর্খা ও ভুটিয়াগণ সরকারী ঘুরাও পথে না চলিয়া শর্টকাটে যাতায়াত করে। কারণ যেখানে শর্টকাটে পাঁচ মিনিটে যাওয়া যায়, সেইখানে সরকারী সটক দিয়া গেলে প্রায় ২০/২৫ মিনিট লাগে এবং সাতবার ঘুরিতে হয়।

নূরজাহাঁ পুনরায় বলিলেন, "এই অশিক্ষিত পাহাড়ীদের শিভাল্‌রী অবশ্য অবশ্য প্রশংসনীয়।"

গও। উহাদের নিকট আমাদের ভদ্রতা শিক্ষা করা উচিত। আমরা বৃথা ভদ্রতা ও সভ্যতার বড়াই করি।

নূর। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছ, ভাই? পাহাড়ী বা ভূটিয়া স্ত্রী পুরুষ—কেহই ভিক্ষা করে না।

জাফ। তাহাদের ভিক্ষার প্রয়োজন হয় না বলিয়া।

গও। প্রয়োজন না হওয়াও ত প্রশংসনীয়।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় তাঁহারা পথ-ক্লান্তি ভুলিতেছিলেন। কারসিয়ঙ্গ ষ্টেশনের নিকটে আসিয়া কওসর বলিল,—"কি রাবু! বড় ক্লান্ত না কি?"

রাবু। না, মোটেই না।

জাফ। আরও এক মাইল যাইতে হইবে, জানিস?

ক্রমে তাঁহারা একটা বেঞ্চের নিকট আসিলেন। তথায় কয়েকজন গুর্খা বসিয়াছিল, তাহারা ইহাঁদিগকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিল। নূরজাহাঁ বলিলেন, "একটু বসা যাউক"।

জাফ। না, চল আর বেশী দূর নাই।

বদু। হাঁ মাম্মা! বসুন না! ঐ দেখুন আকাশে আগুন!

জাফর পশ্চিমে চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই আকাশে আগুন লাগিয়াছে। সবই যেন অগ্নিময়!

আখ্। দেখ আপা! কাঞ্চনজঙ্ঘায়ও আগুন লাগিয়াছে!

জাফ। বাস্তবিক বড় চমৎকার দৃশ্য ত! এখান হইতেও কাঞ্চনজঙ্ঘার দুইতিনটি শৃঙ্গ দেখা যায়। অস্তমানরবির সোণালী কিরণে সত্যই সে কাঞ্চনকান্তি লাভ করিয়াছে। বোধ হয় যেন দিনমণি পশ্চিম গগনে আত্মগোপন করিতে যাইতেছে—আর সুকুমার মেঘগুলি তাহার পশ্চাতে ছুটিয়াছে! প্রদোষে এমন শোভা হয়, পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই। ওদিকে অলকমালা রাঙ্গাকিরণে স্নান করিয়া স্বর্ণবর্ণ লাভ করিতেছে! মৃদুমন্দ সমীরণ যেন তাহাদের সহিত লুকাচুরি খেলিবার ছলে মেঘমালাকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে।

গও। সালাম ভাই! তুমিই ত বল কবিত্ব মস্তিষ্কের রোগ বিশেষ!

জাফ। তুমি বলিয়াছ যে এখানকার জলবায়ুতে ঐ রোগটা আছে! পূর্ব্ববঙ্গের জলবায়ুতে ম্যালেরিয়া, হিমালয়ের জলবায়ুতে কবিত্ব।

গও। কেবল কবিত্ব নহে, বৈরাগ্য—যোগশিক্ষা ইত্যাদিও! এইখানে বসিয়া স্রষ্টার লীলাখেলা দেখ—তোমার সান্ধ্য-উপাসনার ফল প্রাপ্ত হইবে! এখানে নিজের ক্ষুদ্রত্ব বেশ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়।

নূর। বলিতে কি, অভ্যাসমত উপাসনায় এমন ভাবের আবেগ, ভক্তির উচ্ছ্বাস থাকে না।

গও। আর আমরা যে সামাজিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীলোকদের এমন উপাসনা—অর্থাৎ স্রষ্টার সৃষ্টিবৈচিত্র্য দর্শন হইতে বঞ্চিত রাখি, ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট কি উত্তর দিব? যে চক্ষুর কার্য্য দর্শন করা, তাহাকে চিরঅন্ধ করিয়া রাখি—ধিক্ আমাদের সভ্যতায়! ইনি না কি এখানে আসিবার পূর্ব্বে কখনও ঊষার প্রথম আলোক ও সূর্য্যোদয় দেখেন নাই।

জাফ। সম্ভবত: আমিও দেখি নাই—সেজন্য আমি ত একবারও বিলাপ করি না!

গও। কিন্তু তুমি মাঠে বাহির হইলেই দেখিতে পাইতে; তোমার গতি ত অবারিত। আর মনে রাখিও, যথাসাধ্য জ্ঞানোন্মেষ ধর্ম্মেরই এক অঙ্গ।

জাফ। জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে লোক নাস্তিক হয়, এইজন্য কুলললনাবৃন্দকে জ্ঞান হইতে দূরে রাখা আবশ্যক।

গও। যত অভিশাপ কুলবালার উপর ! ইহা তোমার বিষম ভ্রম ; জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের বিরোধ নাই। বরং জ্ঞান ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ।

আরও অনেক কথা হইল। এদিকে বালিকার দলও নীরব ছিল না। আখ্‌তর মৃদুস্বরে বলিল, "দেখ আপা ! ওদিকে দূরে উচ্চ গিরিচূড়ে চায়ের শ্যামল ক্ষেত্রগুলি সান্ধ্য রবিকিরণের তরল স্বর্ণবর্ণে স্নান করিয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছে ! আবার কেমন ধীরে ধীরে ঈষৎ ধূমল বর্ণের বাষ্পরূপী ওড়নায় নিজ নিজ স্বর্ণকায় আবৃত করিতেছে !"

কও। ঠিক বলিয়াছ, বোন ! আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। সৃষ্টিকর্ত্তার কি অপার মহিমা ! তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের বলিহারি যাই !

বদু। চল এখন বাসায় যাই !

আখ্‌। যাওয়ার জন্য এত ব্যস্ততা কেন, দিদি ?

বদু। আর এখানে থাকিয়া কি দেখিবে ? ঐ দেখ ক্রমে সন্ধ্যা সমাগমে বুঝি শীতবোধ হওয়ায় চা-বাগানগুলি অন্ধকার লেপে শরীর ঢাকিতেছে ! আর ত কিছুই দেখা যায় না !

কও। চা-বাগানের শীতবোধ হউক না হউক, বদুর শীতবোধ হইতেছে ! কারণ বদু ভ্রমক্রমে শাল আনে নাই।

সকলে বাসা অভিমুখে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর গওহর আলী দুহিতাদিগের পাঠগৃহে বসিয়া তাহাদিগকে পড়াইতেছেন। পাঠ শেষ হইলে তিনি অর্দ্ধঘন্টাকাল তাহাদের সহিত গল্প করেন। গল্পচ্ছলে তিনি তাহাদিগকে কখন ঐতিহাসিক কখন ভৌগোলিক বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। অদ্য তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় সৌরজগৎ।

মুশ্‌তরী। ভাল কথা, আব্বা ! মাম্মা কেন আমাদিগকে সৌর-চক্র বলেন ? আমরাও কি আকাশে ঘুরি ?

গও। তিনি বিদ্রূপ করিয়া আমাদের সৌরজগৎ বলেন। কিন্তু আইস আমরা ঐ বিদ্রূপ হইতে একটা ভাল অর্থ বাহির করিয়া লই।

কও। জান না ? আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনার ভিতরও অনেক সময় মূল্যবান বস্তু লুক্কায়িত থাকে।

গও। হ্যাঁ, অদ্য আমরা ঐ বিদ্রূপ-আবর্জ্জনা হইতে একটা মূল্যবান জিনিষ বাহির করিতে চেষ্টা করি। কওসর ! তুমি চেষ্টা করিবে, মা ?

কও। আপনিই চেষ্টা করুন।

গওহর আরম্ভ করিলেন, "বলিয়াছি ত প্রত্যেক গ্রহই নিয়মমত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করা যেমন গ্রহগণের কর্ত্তব্য, তদ্রূপ তাহাদিগকে আলোক প্রদান ও

তাঁহাদের প্রত্যেকটিকে যথাবিধি আকর্ষণ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘোরা সূর্য্যের কর্ত্তব্য। এই সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকে আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিতেছে। কাহারও কর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটি হইলে সমষ্টির বিশৃঙ্খলা ঘটে।

"মনে কর প্রত্যেক লোকের গৃহই একটি সৌরজগৎ এবং গৃহস্থের আত্মীয়স্বজনেরা ঐ সৌরপরিবারের এক একটি গ্রহ। গ্রহদের কর্ত্তব্য গৃহস্থের অবস্থানুসারে তাহারই মনোনীত পথে চলা এবং গৃহস্থেরও কর্ত্তব্য পরিবারস্থ লোকদিগকে স্নেহরশ্মিদ্বারা আকর্ষণ করা, তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখা—এমনকি (দারিদ্র্যবশতঃ) খাদ্যের অপ্রতুলতা হইলে, প্রথমে শিশুদের, অতঃপর আশ্রিত পোষ্যবর্গকে আহার করাইয়া সর্ব্বশেষে তাহার ভোজন করা উচিত। যদি এই পরিবারের একটি লোকও স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করে, তবে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া পরিবারটি নানা প্রকার অশান্তি ভোগ করিবে।

"যেমন কোন গ্রহ যদি আপন কক্ষকে অতিক্রম করিয়া দূরে যায় তবে সূর্য্যের আকর্ষণ বিমুক্ত হইলে, সে অন্য কোন গ্রহের সহিত টক্কর খাইয়া নিজে চূর্ণ হইবে এবং অপর গ্রহকেও বিদপগ্রস্ত করিবে। সুতরাং যাহার যে কক্ষ, তাহাকে সেই কক্ষে থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যবর্ত্মে চলিতে হইবে।"

ঠিক এই সময় জাফর আসিয়া বলিলেন, "সালাম ভাই! পথে আসিয়াছ। আমিও ত তাহাই বলি, যাহার জন্য যে সীমা নির্দিষ্ট আছে, সে তাহা অতিক্রম করিলে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। সমাজরূপ সৌরজগৎ স্ত্রীরূপ গ্রহদের জন্য যে সীমা নির্দিষ্ট করিয়াছে সে সীমা উল্লঙ্ঘন করা স্ত্রীলোকদের উচিত নহে।"

গও। মাফ কর ভাই! আমাকে আগে আমার বক্তব্য বলিতে দাও। তুমি আসন গ্রহণ কর।

আখ্‌তর। (জনান্তিকে কওসরকে) মাম্মা কথা বলিবার ভঙ্গীও জানেন না! "সমাজরূপ সৌরজগৎ" আর "স্ত্রীরূপ গ্রহ" বলা হইল!

কও। তাই ত! সমাজটা নিজে সৌরজগৎ হইলে গ্রহদের সীমা নির্দিষ্ট করিবার অধিকার কি? ঈশ্বর স্বয়ং সকলের সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। আচ্ছা এখন উহাঁদের কথা শুনি।

জাফর আসন গ্রহণ করিলে পর বালিকারাও আসন গ্রহণ করিল। জাফরকে দেখিয়া ইহারা সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়াছিল।

গওহর বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "কেবল অবলারা সীমা অতিক্রম করিলে বিশৃঙ্খলা ঘটে ইহাই নহে, পুরুষেরাও স্বীয় কক্ষ লঙ্ঘন করিলে বিশৃঙ্খলা ঘটে।"

জাফ। পুরুষদের গন্তব্যপথ ত সীমাবদ্ধ নহে—তাহাদের আর কক্ষচ্যুত হওয়া কি?

গও। পুরুষেরাও স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। তাহাদেরও কর্ত্তব্য আছে। তুমি কি স্ত্রীপুত্রকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া কোথাও যাইতে পারে?

জাফ। না।

গও। তবে কিরূপে বল, তোমার পথ সীমাবদ্ধ নহে?

জাফ। তবু আমার যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে।

গও। কর্ত্তব্যে অবহেলা করিবার ক্ষমতা নাই।

মুশ। আব্বা! আমরা ত সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য করি, কিন্তু নয়ীমু ও মাসুমা ৫ কিছু করে না?

রাবু। তাহারা এত ছোট যে তাহাদের কর্ত্তব্য কিছুই নাই।

গও। তাহাদেরও কর্ত্তব্য আছে বই কি? নয়ীমুর কর্ত্তব্য যথানিয়মে আহার নিদ্রা পালন করা ও খেলা করা। মাসুমার কর্ত্তব্য খাওয়া, নিদ্রা যাওয়া, হাসা এবং দৌড়াইতে শিখা।

রাবু। ঈশ! ভারী ত কর্ত্তব্য! উহারা ও কাজ না করিলে আমাদের এখানে এমনকি বিশৃঙ্খলা ঘটিবে?

কও। উহারা এখনও তোমাদের মত দুষ্টামী শিখে নাই; তাই উহারা যথানিয়মে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করে। যদি মাসুমা না হাসে বা নয়ীমা না খায় তবে বুঝিতে হইবে তাহাদের অসুখ হইয়াছে। তখন তাহাদের শুশ্রূষার জন্য আমাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে।

গও। তাহাদের চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত থাকিলে আমাদের দৈনিক কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে কি না?

রাবু। হাঁ—বুঝিলাম!

গও। আর এক কথা মনোযোগের সহিত শুন। আমি বলিয়াছি, গ্রহমালা স্ব স্ব কক্ষে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণ কার্য্যে গ্রহদের সাদৃশ্য ও একতা আছে—অর্থাৎ সকলেই ঘুরে, এই হইল সাদৃশ্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল গ্রহই একই সঙ্গে উঠে, একই সঙ্গে বসে তাহা নহে! (জাফরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) তাহাদের আবার 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতা আছে। জাফর ভাই যে বলেন, সৌরপরিবারের অবলারূপ গ্রহদের 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতা নাই, ইহা তাঁহার ভ্রম।

জাফ। ভ্রম নহে—ঠিক কথা। অবলাকে কোন প্রকার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। তুমি হয়ত মাদ্রাজের Christian Tract Society-র প্রকাশিত Indian Reform সম্বন্ধীয় পুস্তিকাসমূহ হইতে এ স্বাধীনতার ভাব গ্রহণ করিয়াছ! খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ যাহা বলেন, তোমার নিকট তাহা অভ্রান্ত সত্যরূপেই পরিগণিত হইয়াছে।

গও। আমি আজি পর্য্যন্ত উক্ত পুস্তিকার একখানিও পাঠ করি নাই। খৃষ্টানদের নিকট কিছু শিখিতে যাইব কেন? ঈশ্বর কি আমাকে বুদ্ধি দেন নাই? আর আমি ত এই কারসিয়ঙ্গ শৈলে আছি, এই সময় তুমি আমার বাড়ী অনুসন্ধান কর গিয়া, যদি আমার বাড়ীতে 'Christian Tract Society-র প্রকাশিত পুস্তিকা" একখানিও দেখিতে পাও, তবে আমি তোমাকে হাজার (১০০০) টাকা দিব!

জাফ। হাজার টাকার বাজী?

গও। হাঁ-লাগাও বাজী—এক হাজার নূতন টাকা! আর যদি পুস্তিকা না পাও তবে তুমি দিবে ১০০০ টাকা!

জাফ। না, বাজী এইরূপ হউক যে হারজিত—উভয় অবস্থাতেই তুমি টাকা দিবে? হা! হা-হা!

গও। বাস! ঐখানেই বীরত্বের অবসান!

এই সময় নূরজাহাঁ আসিয়া কওসরের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

বদর। আব্বা, গ্রহদের "ব্যক্তিগত" স্বাধীনতা কেমন?

গও। যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে বুধের প্রায় তিন মাস, শুক্রের আট মাস, বৃহস্পতির ১২ বৎসর এবং শনির ৩০ বৎসর লাগে। ইহাই তাহাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য বা স্বাধীনতা। শনিগ্রহকে কেহ আরক্তনেত্রে আদেশ করিতে পারে না যে "তোমাকেও বুধের মত ৩ মাসেই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে হইবে" ! এবং এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বৈষম্য আছে ; তাহা তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না।

কও। আর অত কথা এককালে বলাও ত সম্ভব নহে।

গও। হাঁ, সম্ভবও নহে। এইরূপ মানবের সৌরপরিবারেরও পরস্পরের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য আছে এবং কতকগুলি বৈসাদৃশ্যও আছে।

জাফ। যথা গওহর আলীর সহিত আমার চক্ষুকর্ণের similarity (সাদৃশ্য) আছে এবং মতামতের dissimilarity (বৈসাদৃশ্য) আছে ! (সকলের হাস্য।)

কও। তরুলতার গঠন প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করিলেও আমরা বৈষম্য ও সাদৃশ্য পাশাপাশি বিদ্যমান দেখিতে পাই।

বদু ! সেদিন তোমাকে নানাজাতীয় fern-এর (ঢেকি গুল্মের) সাধারণ আকৃতিগত সাদৃশ্য এবং পত্রগত সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখাইয়াছিলাম মনে আছে ত?

বদু। হাঁ ঠিক এক রকমের দুইটি পাতা বাহির করিতে পারি নাই।

গও। তাই ত। জাফর ভাই যেমন মনে করেন সংসারে তিনি ছাড়া আর কেহ—বিশেষতঃ স্ত্রীলোক কথা কহিবে না ! তিনি ব্যতীত আর কেহ স্কুলে পড়িবে না ইত্যাদি ইত্যাদি, ইহা প্রকৃতির নিয়ম নহে।

জাফ। আমি কি লোককে কথা বলিতেও নিষেধ করি ?

গও। নিষেধ কর না বটে, কিন্তু তুমি এমনভাবে বলা আরম্ভ কর যে আর কাহারও কথা কহিবার সুবিধা হয় না। ইনি তোমাকে তিন দিন কন্যাদের বালিকা স্কুলে পড়িবার কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তুমি একদিনও ধৈর্য্যের সহিত শুন নাই। তুমি যে ভাবে মহিলাদের কথায় বাধা দিয়া নিজের বাগ্মিতা প্রকাশ কর, তাহা তোমার ন্যায় বিলাত ফেরতার পক্ষে কদাচ শোভনীয় নহে।

জাফ।. আমি অধিক কথা বলি, তোমরাও বল না কেন ?

গও। আমরা অত বকিতে পারি কই? আমি দুইশত টাকা পুরস্কার দিব, যদি কেহ তোমাকে বাগযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে।

নূর। কেবল বাগযুদ্ধ নহে—বাগডাকাতিও বটে !

জাফ। নূরু ! তুইও বিপক্ষে গেলি ?

নূর। না, ভাই ! ক্ষমা কর,—আমি ত এখন কিছু বলি নাই।

গও। ঠিক,—বাগ্মিতা, বাক্‌চাতুর্য্য, বাক্‌চৌর্য্য, বাগডাকাতি এবং বাগযুদ্ধে যে ব্যক্তি আমার জাফর দাদাকে পরাস্ত করিবে, সে ২০০ টাকা পুরস্কার পাইবে।

নূর। সভয়ে আর একটি কথা বলি,—ভাই দুই ঘণ্টা ধরিয়া কথা বলেন, কিন্তু কি যে বলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য !

গও। কেবল বকেন—লক্ষ্য ছাড়িয়া দিয়া কখন দক্ষিণে, কখন বামে, কখন সম্মুখে, কখন পশ্চাতে—নানাস্থানে ঘুরেন ! কিন্তু বকেন ! অপরের বক্তব্য শুনেন না, কেবল নিজে বকেন ! যাহা হউক, ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে। জাফর দিনকে রাত্রি বলিলে যে তাঁহার বাড়ীর সকলকেই "দিব্য জ্যোৎস্না" বলিতে হইবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। অবলাদেরও চক্ষুকর্ণ আছে, চিন্তাশক্তি আছে, উক্ত শক্তিগুলির অনুশীলন যথানিয়মে হওয়া উচিত। তাহাদের বাক্‌শক্তি কেবল আমাদের শিখান বুলি উচ্চারণ করিবার জন্য নহে।

জাফ। উঠ এখন ; আজি যথেষ্ট বকিলে !

গও। আর দুই এক কথা বলিতে দাও—তোমার কথা নহে। সৌরচক্রের গ্রহমালা যেমন সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া আপন কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, তদ্রূপ আমাদেরও উচিত যে সত্য—অর্থাৎ ঈশ্বরে লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহার উপর অটল বিশ্বাস সহকারে নির্ভর করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পথে চলি। যে কোন অবস্থায় সত্য ত্যাগ করা উচিত নহে—সত্যভ্রষ্ট হইলেই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সত্যরূপ কেন্দ্রে ধ্রুব লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কও। আমরা সকলেই সৌরপরিবারের এক একটি ক্ষুদ্র তারা, পরমেশ্বর আমাদের সূর্য্য।

গও। ঠিক। এবং যাহারা উক্ত সৌরপরিবারের ন্যায় সুখে জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।

কও। পরস্পরে একতা থাকাও একান্ত আবশ্যক।

গও। হাঁ, —কিন্তু এই ঐক্য যেন সত্যের উপর স্থাপিত হয়। একতার মূলে একটা মহৎ গুণ থাকা আবশ্যক।

জাফ। আমি বলি, একতার ভিত্তি ন্যায় বা প্রেম হইলে আরও ভাল হয়।

গও। ন্যায়পরায়ণতা এবং প্রেমও সদ্‌গুণ বটে, কিন্তু উহাদের মাত্রাধিক্যে আবার অনিষ্টের সম্ভাবনা। যেমন সময় সময় কঠোর ন্যায় কোমল প্রেমের বিরোধী হয় ; আবার প্রেমের আধিক্য ন্যায়কে দলিত করে। বিচারক অত্যন্ত দয়ালু হইলে চলে না, আবার ন্যায় বিচারে প্রকৃত প্রমাণ অভাবে অনেক সময় নির্দ্দোষীর দণ্ড হয়। সত্যের কিন্তু অপর পৃষ্ঠা নাই—উহা স্বচ্ছ সুনির্ম্মল। এই জন্য বলি,–একতার ভিত্তি সত্য হউক।

জাফ। বেশ ! নমাজের সময় হইল,—চল এখন তোমার কক্ষে !

গও। চল ! নমাজে কিন্তু তুমি ইমাম হইবে।

জাফ। না, তুমি ত আমার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার কর না, —সুতরাং তুমি ইমাম হইবে।

গও। তবে মনে রাখিও,—সকল বিষয়ে আমি নেতা, তুমি অনুবর্ত্তী।

জাফ। না, তাহা হইবে না !

গও। তবে 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতা অবলম্বন কর।

জাফ। তথাস্তু ! তুমি তোমার কক্ষে উপাসনা কর,—আমি আমার কক্ষে।

জাফর ও গওহর চলিয়া গেলে পর বদর বলিল, "মাম্মা আমাদিগকে সৌরজগৎ বলিয়া বিদ্রূপ না করিলে এত কথা জানিতে পারিতাম না।"

আখ্। ঠিক ! অদ্য আব্বা আমাদের জন্য কয়লা হইতে কোহেনূর বাহির করিয়াছেন।

কও। মনে রাখিও—আমরা সকলে সৌরপরিবারের তারা !

সুলতানার স্বপ্ন[১]

একদা আমার শয়নকক্ষে আরাম কেদারায় বসিয়া ভারতললনার জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলাম,— আমাদের দ্বারা কি দেশের কোন ভাল কাজ হইতে পারে না?—এই সব ভাবিতেছিলাম। সে সময় মেঘমুক্ত আকাশে শারদীয় পূর্ণিমার শশধর পূর্ণগৌরবে শোভমান ছিল; কোটীলক্ষ তারকা শশীকে বেষ্টন করিয়া হীরক-প্রভায় দেদীপ্যমান ছিল। মুক্ত বাতায়ন হইতে কৌমুদীস্নাত উদ্যানটী স্পষ্টই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এক একবার মৃদুস্নিগ্ধ সমীরণ শেফালিসৌরভ বহিয়া আনিয়া ঘরখানি আমোদিত করিয়া দিতেছিল। দেখিলাম, সুধাকরের পূর্ণ কান্তি, কুসুমের সুমিষ্ট সৌরভ, সমীরণের সুমন্দ হিল্লোল, রজতচন্দ্রিকা — ইহারা সকলে মিলিয়া আমার সাধের উদ্যানে এক অনির্ব্বচনীয় স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছ। তদ্দর্শনে আমি আনন্দে আত্মহারা ইলাম,—যেন জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম! ঠিক বলিতে পারি না আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কি না; —কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, আমার বিশ্বাস আমি জাগ্রত ছিলাম।

সহসা আমার পার্শ্বে একটি ইউরোপীয়া রমণীকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি কি প্রকারে আসিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাকে আমার পরিচিতা 'ভগিনী সারা' (Sister Sara) বলিয়া বোধ হইল। ভগিনী সারা "সুপ্রভাত" বলিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন! আমি মনে মনে হাসিলাম,—এমন শুভ্র জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনীতে তিনি বলিলেন, "সুপ্রভাত!" তাঁহার দৃষ্টিশক্তি কেমন? যাহা হউক, প্রকাশ্যে আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম,—

"আপনি কেমন আছেন?"

"আমি ভাল আছি, ধন্যবাদ,। আপনি একবার আমাদের বাগানে বেড়াইতে আসিবেন কি?"

আমি মুক্তবাতায়ন হইতে আবার পূর্ণিমা-চন্দ্রের প্রতি চাহিলাম,—ভাবিলাম, এসময় যাইতে আপত্তি কি? চাকরেরা এখন গভীর নিদ্রামগ্ন; এই অবসরে ভগিনী সারার সমভিব্যাহারে বেড়াইয়া বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করা যাইবে।

দার্জ্জিলিং অবস্থানকালে আমি সর্ব্বদাই ভগিনী সারার সহিত ভ্রমণ করিতাম। কত দিন উদ্ভিদকাননে (বোটানিকাল গার্ডেনে) বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়ে লতাপাতা সম্বন্ধে—ফুলের লিঙ্গ নির্ণয় সম্বন্ধে কত তর্ক-বিতর্ক করিয়াছি, সে সব কথা মনে পড়িল। ভগিনী সারা সম্ভবতঃ আমাকে তদ্রূপ কোন উদ্যানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিয়াছেন; আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার সহিত বাহির হইলাম।

ভ্রমণকালে দেখি কি—এত সে জ্যোৎস্নাময়ী রজনী নহে!—এযে দিব্য প্রভাত! নগরের লোকেরা জাগিয়া উঠিয়াছে, রাজপথে লোকে লোকারণ্য! কি বিপদ! আমি দিনের বেলায় এভাবে পথে বেড়াইতেছি! ইহা ভাবিয়া লজ্জায় জড়সড় হইলাম—যদিও পথে একজনও পুরুষ দেখিতে পাই নাই।

---

১. বর্ত্তমান লেখিকার "Sultanas Dream" গত ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে "Indian Ladies' Magazine"- এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

পথিকা স্ত্রীলোকেরা আমার দিকে চাহিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিল। আমি তাহাদের ভাষা না বুঝিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম, যে তাহাদের উপহাসের লক্ষ্য বেচারী আমিই। সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"উহারা কি বলিতেছে?"

উত্তর পাইলাম,—"উহারা বলে, যে আপনি অনেকটা পুরুষ ভাবাপন্ন।"

"পুরুষভাবাপন্ন। ইহার মানে কি?"

"ইহার অর্থ এই, যে আপনাকে পুরুষের মত ভীরু ও লজ্জানম্র দেখায়!"

"পুরুষের মত লজ্জানম্র!" এমন ঠাট্টা! এরূপ উপহাস ত কখন শুনি নাই! ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, আমার সঙ্গিনী সে দার্জ্জিলিংবাসিনী ভগিনী সারা নহেন,—ইহাঁকে আর কখনও দেখি নাই! ওহো! আমি কেমন বোকা—একজন অপরিচিতার সহিত হঠাৎ চলিয়া আসিলাম! কেমন একটু বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ও ঈষৎ কম্পিত হইল। তাঁহার হাত ধরিয়া চলিতেছিলাম কি না, তিনি আমার হস্তকম্পন অনুভব করিয়া সস্নেহে বলিলেন,—

"আপনার কি হইয়াছে? আপনি কাঁপিতেছেন যে!"

এরূপে ধরা পড়ায় আমি লজ্জিত হইলাম। ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "আমার কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছে; আমরা পর্দানশীন স্ত্রীলোক, আমাদের বিনা অবগুণ্ঠনে বাহির হইবার অভ্যাস নাই।"

"আপনার ভয় নাই—এখানে আপনি কোন পুরুষের সম্মুখে পড়িবেন না। এ দেশের নাম 'নারীস্থান'[১৮] এখানে স্বয়ং পুণ্য নারীবেশে রাজত্ব করেন।"

ক্রমে নগরের দৃশ্যাবলী দেখিয়া আমি অন্যমনস্ক হইলাম। বাস্তবিক পথের উভয় পার্শ্বস্থিত দৃশ্য অতিশয় রমণীয় ছিল। সুনীল অম্বর দর্শনে মনে হইল যেন ইতিপূর্ব্বে আর কখন এত পরিষ্কার আকাশ দেখি নাই! একটী তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর দেখিয়া ভ্রম হইল, যেন হরিৎ মখ্‌মলের গালিচা পাতা রহিয়াছে। ভ্রমণ কালে আমার বোধ হইতেছিল, যেন কোমল মস্‌নদের উপর বেড়াইতেছি,—ভূমির দিকে দৃক্‌পাত করিয়া দেখি, পথটি শৈবাল ও বিবিধ পুষ্পে আবৃত! আমি তখন সানন্দে বলিয়া উঠিলাম, "আহা! কি সুন্দর!"

ভগিনী সারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ সব পছন্দ করেন কি?" (আমি তাঁহাকে 'ভগিনী সারা'ই বলিতে থাকিলাম, এবং তিনিও আমার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন।)

"হাঁ এসব দেখিতে বড়ই চমৎকার। কিন্তু আমি এ সুকুমার কুসুমস্তবক পদদলিত করিতে চাই না।"

"সে জন্য ভাবিবেন না, প্রিয় সুলতানা! আপনার পদস্পর্শে এ ফুলের কোন ক্ষতি হইবে না। এগুলি বিশেষ এক জাতীয় ফুল, ইহা রাজপথেই রোপণ করা হয়।"

দুইধারে পুষ্পচূড়াধারী পাদপশ্রেণী সহাস্যে শাখা দোলাইয়া দোলাইয়া যেন আমার অভ্যর্থনা করিতেছিল। দূরাগত কেতকী-সৌরভে দিক্ পরিপূরিত ছিল। সে সৌন্দর্য্য ভাষায়

---

১৮. "পরীস্থান" শব্দের অনুকরণে "নারীস্থান" বলা হইল। ইংরাজীতে "লেডীল্যাণ্ড" বলা গিয়াছে।

ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য—আমি মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলাম, "সমস্ত নগরখানি একটি কুঞ্জ ভবনের মত দেখায়! যেন ইহা প্রকৃতি–রাণীর লীলাকানন! আপনাদের উদ্যানরচনা–নৈপুণ্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়।"

"ভারতবাসী ইচ্ছা করিলে কলিকাতাকে ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিতে পারেন!"

"তাঁহাদিগকে অনেক গুরুতর কার্য্য করিতে হয়, তাঁহারা কেবল উপবনের উন্নতিকল্পে অধিক সময় ব্যয় করা অনাবশ্যক মনে করিবেন।"

"ইহা ছাড়া তাঁহারা আর কি বলিতে পারেন? জানেন ত অলসেরা অতিশয় বাক্‌পটু হয়!"

আমার বড় আশ্চর্যবোধ হইতেছিল, সে দেশের পুরুষেরা কোথায় থাকে? রাজপথে শতাধিক ললনা দেখিলাম, কিন্তু পুরুষ বলিতে একটি বালক পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না। শেষে কৌতূহল গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পুরুষেরা কোথায়?"

উত্তর পাইলাম, "যেখানে তাহাদের থাকা উচিত সেইখানে, অর্থাৎ তাহাদের উপযুক্ত স্থানে।"

ভাবিলাম, তাহাদের "উপযুক্ত স্থান" আবার কোথায়, আকাশে না পাতালে? পুনরায় বলিলাম, "মাফ করিবেন, আপনার কথা ভালমতে বুঝিতে পারিলাম না। তাহাদের 'উপযুক্ত স্থানের' অর্থ কি?"

"ওহো! আমার কি ভ্রম!—আপনি আমাদের নিয়ম আচার জ্ঞাত নহেন, একথা আমার মনেই ছিল না। এ দেশে পুরুষজাতি গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ থাকে।"

"কি! যেমন আমরা অন্তঃপুরে থাকি, সেইরূপ তাঁহারাও থাকেন না কি?"

"হাঁ, ঠিক তদ্রূপই।"

"বাঃ! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!" বলিয়া আমি উচ্চহাস্য করিলাম। ভগিনী সারাও হাসিলেন! আমি প্রাণে বড় আরাম পাইলাম; — পৃথিবীতে অন্ততঃ এমন একটি দেশও আছে, যেখানে পুরুষজাতি অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকে! ইহা ভাবিয়া অনেকটা সান্ত্বনা অনুভব করা গেল!

তিনি বলিলেন, "ইহা কেমন অন্যায়, যে নিরীহ রমণী অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকে, আর পুরুষেরা মুক্ত স্বাধীনতা ভোগ করে। কি বলেন, সুলতানা, আপনি ইহা অন্যায় মনে করেন না?"

আমি আজন্ম অন্তঃপুরবাসিনী, আমি এ প্রথাকে অন্যায় মনে করিব কিরূপে? প্রকাশ্যে বলিলাম,—"অন্যায় কিসের? রমণী স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা, তাহাদের পক্ষে অন্তঃপুরের বাহিরে থাকা নিরাপদ নহে।"

"হাঁ, নিরাপদ নহে ততদিন,— যতদিন পুরুষজাতি বাহিরে থাকে! তা কোন বন্য জন্তু কোন একটা গ্রামে আসিয়া পড়িলেও ত সে গ্রামখানি নিরাপদ থাকে না। কি বলেন?"

"তাহা ঠিক; হিংস্রজন্তুটা ধরা না পড়া পর্য্যন্ত গ্রামটি নিরাপদ হইতে পারে না।"

"মনে করুন, কতকগুলি পাগল যদি বাতুলাশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়ে, আর তাহারা অশ্ব, গবাদি—এমন কি ভাল মানুষের প্রতিও নানা প্রকার উপদ্রব উৎপীড়ন আরম্ভ করে, তবে ভারতবর্ষের লোকে কি করিবে?"

"তবে তাহারা পাগলগুলিকে ধরিয়া পুনরায় বাতুলাগারে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইবে।"

"বেশ! বুদ্ধিমান লোককে বাতুলালয়ে আবদ্ধ রাখিয়া দেশের সমস্ত পাগলকে মুক্তি দেওয়াটা বোধ হয় আপনি ন্যায়সঙ্গত মনে করেন না?"

"অবশ্যই না! শান্তশিষ্ট লোককে বন্দী করিয়া পাগলকে মুক্তি দিবে কে?"

"কিন্তু কার্য্যতঃ আপনাদের দেশে আমরা ইহাই দেখিতে পাই! পুরুষেরা—যাহারা নানা প্রকার দুষ্টামী করে, বা অন্ততঃ করিতে সক্ষম, তাহারা দিব্য স্বাধীনতা ভোগ করে, আর নিরীহ কোমলাঙ্গী অবলারা বন্দিনী থাকে! অশিক্ষিত অমার্জ্জিতরুচি পুরুষেরা বিনা শৃঙ্খলে থাকিবার উপযুক্ত নহে। আপনারা কিরূপে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন?"

"জানেন, ভগিনী সারা! সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোন হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু,—তাহারা সমুদয় সুখ সুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুর রূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছে! উড়িতে শিখিবার পূর্ব্বেই আমাদের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়—তদ্ব্যতীত সামাজিক রীতিনীতির কত শত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়াইয়া আছে।"

"তাই ত! আমার বলিতে ইচ্ছা হয়,—'দোষ কার, বন্দী হয় কে!' কিন্তু বলি, আপনারা ওসব নিগড় পরেন কেন?"

"না পরিয়া করি কি? 'জোর যার মুলুক তার'; যাহার বল বেশী, সেই স্বামিত্ব করিবে—ইহা অনিবার্য্য।"

"কেবল শারীরিক বল বেশী হইলেই কেহ প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সিংহ কি বলে বিক্রমে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? তাই বলিয়া কি কেশরী মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করিবে? আপনাদের কর্ত্তব্যের ক্রটী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনারা সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া একাধারে নিজের প্রতি অত্যাচার এবং স্বদেশের অনিষ্ট দুই-ই করিয়াছেন। আপনাদের কল্যাণে সমাজ আরও উন্নত হইত—আপনাদের সাহায্য অভাবে সমাজ অর্দ্ধেক শক্তি হারাইয়া দুর্ব্বল ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে।"

"শুনুন ভগিনী সারা! যদি আমরাই সংসারের সমুদয় কার্য্য করি, তবে পুরুষেরা কি করিবে?"

"তাহারা কিছুই করিবে না,—তাহারা কোন ভাল কাজের উপযুক্ত নহে। তাহাদিগকে ধরিয়া অন্তঃপুরে বন্দী করিয়া রাখুন।"

"কিন্তু ক্ষমতাশালী নরবরদিগকে চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী করা কি সম্ভব, না সহজ ব্যাপার? আর তাহা যদিই সাধিত হয়, তবে দেশের যাবতীয় কার্য্য–যথা রাজকার্য্য, বাণিজ্য ইত্যাদি—সকল কাজই অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে যে!"

এবার ভগিনী সারা কিছু উত্তর দিলেন না; সম্ভবতঃ আমার ন্যায় অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অবলার সহিত তর্ক করা তিনি অনাবশ্যক মনে করিলেন!

ক্রমে আমরা ভগিনী সারার গৃহতোরণে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, বাড়ীখানি একটি বৃহৎ হৃদয়াকৃতি উদ্যানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এ ভাবটি কি চমৎকার!—ধরিত্রী জননীর হৃদয়ে মানবের বাসভবন! বাড়ী বলিতে, একটি টীনের বাঙ্গালা মাত্র, কিন্তু সৌন্দর্য্যে ও নৈপুণ্যে ইহার নিকট আমাদের দেশের বড় বড় রাজপ্রাসাদ পরাজিত! সাজ সজ্জা কেমন নয়নাভিরাম ছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে—তাহা কেবল দেখিবার জিনিস!

আমরা উভয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম। তিনি সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন; একটি খঞ্চিপোষে রেশমের কাজ করা হইতেছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও সেলাই জানি কি না। আমি বলিলাম,—

"আমরা অন্তঃপুরে থাকি, সেলাই ব্যতীত অন্য কাজ জানি না।"

"কিন্তু এদেশের অন্তঃপুরবাসীদের হাতে আমরা কারচোবের কাজ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না!" এই বলিয়া তিনি হাসিলেন; "পুরুষদের এতখানি সহিষ্ণুতা কই, যে তাহারা ধৈর্য্যের সহিত ছুঁচে সুতা পরাইবে?"

তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "তবে কি কারচোবের কাজগুলি সব আপনিই করিয়াছেন?" তাঁহার ঘরে বিবিধ ত্রিপদীর উপর নানা প্রকার সলমা চুমকির কারুকার্য্যখচিত বস্ত্রাবরণ ছিল।

তিনি বলিলেন, "হাঁ, এ সব আমারই স্বহস্ত প্রস্তুত।"

"আপনি কিরূপে সময় পান? আপনাকে ত আফিসের কাজও করিতে হয়, না? কি বলেন?"

"হাঁ। তা আমি সমস্ত দিন রসায়নাগারে আবদ্ধ থাকি না। আমি দুই ঘণ্টায় দৈনিক কর্ত্তব্য শেষ করি।"

"দুই ঘণ্টায়! আপনি একি বলেন?—দুই ঘণ্টায় আপনার কার্য্য শেষ হয়! আমাদের দেশে রাজকর্মচারীগণ—যেমন মাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, জজ প্রভৃতি প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন।"

"আমি ভারতের রাজপুরুষদের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়াছি। আপনি কি মনে করেন, যে তাঁহারা সাত আট ঘণ্টাকাল অনবরত কাজ করেন?"

"নিশ্চয়! বরং এতদপেক্ষা অধিক পরিশ্রমই করেন।"

"না প্রিয় সুলতানা! ইহা আপনার ভ্রম! তাঁহারা অলসভাবে বেত্রাসনে বসিয়া ধূমপানে সময় অতিবাহিত করেন! কেহ আবার আফিসে থাকিয়া ক্রমাগত দুই তিনটি চুরুট ধ্বংস করেন। তাঁহারা মুখে যত বলেন, কার্য্যতঃ তত করেন না। রাজপুরুষেরা যদি কিছু করেন ত তাহা এই, যে কেবল তাঁহাদের নিম্নতম কর্ম্মচারীদের ছিদ্রান্বেষণ! মনে করুন একটি চুরুট ভস্মীভূত হইতে অর্দ্ধঘণ্টা সময় লাগে, আর কেহ দৈনিক ১২টি চুরুট ধ্বংস করেন, তবে সে ভদ্রলোকটি প্রতিদিন ধূমপানে মাত্র ছয় ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন!"

তাই ত! অথচ ভ্রাতৃমহোদয়গণ জীবিকা অর্জ্জন করেন, এই অহঙ্কারেই বাঁচেন না! ভগিনী সারার সহিত বিবিধ প্রসঙ্গ হইল। শুনিলাম, তাঁহাদের নারীস্থান কখনও মহামারী রোগে

আক্রান্ত হয় না। আর তাঁহারা আমাদের ন্যায় হুলধর মশার দংশনেও অধীর হন না! বিশেষ একটি কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম,—নারীস্থানে নাকি কাহারও অকাল-মৃত্যু হয় না। তবে বিশেষ কোন দুর্ঘটনা হইলে লোকে অপ্রাপ্ত বয়সে মরে, সে স্বতন্ত্র কথা। ভগিনী সারা আবার হিন্দুস্থানের অসংখ্য শিশুর মৃত্যু সংবাদে অবাক হইলেন। তাঁহার মতে যেন এই ঘটনা সর্ব্বাপেক্ষা অসম্ভব! তিনি বলিলেন, যে প্রদীপ সবে মাত্র তৈল সলিতা যোগে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কেন (তৈল বর্ত্তমানে) নির্ব্বাপিত হইবে? যে নব কিশলয় সবে মাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছে, সে কেন পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে ঝরিবে!

ভারতের প্লেগ সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল; তিনি বলিলেন, "প্লেগ টেলেগ কিছুই নহে—কেবল দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকেরা নানা রোগের আধার হইয়া পড়ে। একটু অনুধাবন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গ্রাম অপেক্ষা নগরে প্লেগ বেশী,—নগরের ধনী অপেক্ষা নির্ধনের ঘরে প্লেগ বেশী হয়, এবং প্লেগে দরিদ্র পুরুষ অপেক্ষা দরিদ্র রমণী অধিক মারা যায়। সুতরাং বেশ বুঝা যায়, প্লেগের মূল কোথায়—মূল কারণ ঐ অন্নাভাব। আমাদের এখানে প্লেগ বা ম্যালেরিয়া আসুক ত দেখি!"

তাই ত, ধনধান্যপূর্ণা নারীস্থানে ম্যালেরিয়া কিম্বা প্লেগের অত্যাচার হইবে কেন? প্লীহা-স্ফীত উদর ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট বাঙ্গালায় দরিদ্রদিগের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম।

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহাদের রন্ধনশালা দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। অবশ্য যথাবিধি পর্দা করিয়া যাওয়া হইয়াছিল! একি রন্ধন-গৃহ, না নন্দন-কানন? রন্ধনশালার চতুর্দ্দিকে মনোরম সবজী বাগান এবং নানাপ্রকার তরিতরকারীর লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। ঘরের ভিতর ধূম বা ইন্ধনের কোন চিহ্ন নাই,—মেজেখানি অমল ধবল মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত; মুক্ত বাতায়নগুলি সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পদামে সুসজ্জিত! আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"আপনারা রাঁধেন কিরূপে? কোথাও ত অগ্নি জ্বালিবার স্থান দেখিতেছি না?"

তিনি বলিলেন, "সূর্য্যোত্তাপে রান্না হয়।" অতঃপর কি প্রকারে সৌরকর একটা নলের ভিতর দিয়া আইসে, সেই নলটা তিনি আমাকে দেখাইলেন। কেবল ইহাই নহে; তিনি তৎক্ষণাৎ এক পাত্র ব্যঞ্জন (যাহা পূর্ব্ব হইতে তথায় রন্ধনের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল) রাঁধিয়া আমাকে সেই অদ্ভুত রন্ধন প্রণালী দেখাইলেন।

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা সৌরোত্তাপ সংগ্রহ করেন কি প্রকারে?"

ভগিনী বলিলেন, "কিরূপে সৌরকর আমাদের করায়ত্ত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস শুনিবেন? ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের বর্ত্তমান মহারাণী সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তখন তিনি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা ছিলেন। তিনি নামতঃ রাণী ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রধান মন্ত্রী রাজ্যশাসন করিতেন।

"মহারাণী বাল্যকাল হইতেই বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে ভালবাসিতেন। সাধারণ রাজকন্যাদের ন্যায় তিনি বৃথা সময় যাপন করিতেন না। একদিন তাঁহার খেয়াল হইল, যে তাঁহার রাজ্যের সমুদয় স্ত্রীলোকই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হউক। মহারাণীর খেয়াল,—সে খেয়াল

তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল! অচিরে গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে অসংখ্য বালিকা স্কুল স্থাপিত হইল। এমন কি পল্লীগ্রামেও উচ্চশিক্ষার অমিয়-স্রোত প্রবাহিত হইল। শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল, এবং বাল্যবিবাহ-প্রথাও রহিত হইল। একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কোন কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না—এই আইন হইল। আর এক কথা, এই পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে আমরাও আপনাদের মত কঠোর অবরোধে বন্দিনী থাকিতাম।"

"এখন কিন্তু বিপরীত অবস্থা!" এই বলিয়া আমি হাসিলাম।

"কিন্তু স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান ত সেই প্রকারই আছে! কতকদিন তাঁহারা বাহিরে, আমরা ঘরে ছিলাম; এখন তাঁহারা ঘরে, আমরা বাহিরে আছি! পরিবর্ত্তন প্রকৃতিরই নিয়ম! কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইল; তথায় বালকদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।"

"আমাদের পৃষ্ঠপোষিকা স্বয়ং মহারাণী,—আর কি কোন অভাব থাকিতে পারে? অবলাগণ অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে বিজ্ঞান আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই সময় রাজধানীর একতর বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা-প্রিন্সিপাল একটি অভিনব বেলুন নির্ম্মাণ করিলেন; এই বেলুনে কতকগুলি নল সংযোগ করা হইল। বেলুনটি শূন্যে মেঘের উপর স্থান করা গেল,—বায়ুর আর্দ্রতা ঐ বেলুনে সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল,—এইরূপে জলধরকে ফাঁকি দিয়া তাঁহারা বৃষ্টিজল করায়ত্ত করিলেন! বিদ্যালয়ের লোকেরা সর্ব্বদা ঐ বেলুনের সাহায্যে জল গ্রহণ করিত কি না, তাই আর মেঘমালায় আকাশ আচ্ছন্ন হইতে পারিত না। এই অদ্ভুত উপায়ে বুদ্ধিমতী লেডী প্রিন্সিপাল প্রাকৃতিক ঝড় বৃষ্টি নিবারণ করিলেন।"

"বটে? তাই আপনাদের এখানে পথে কর্দ্দম দেখিলাম না!" কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না,—নলের ভিতর বায়ুর আর্দ্রতা কিরূপে আবদ্ধ থাকিতে পারে; আর ঐরূপে বায়ু হইতে জল সংগ্রহ করাই বা কিরূপে সম্ভব? তিনি আমাকে ইহা বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমার যে বুদ্ধি!—তাহাতে আবার বিজ্ঞান রসায়নের সঙ্গে আমাদের (অর্থাৎ মোসলেম ললনাদের) কোন পুরুষে পরিচয় নাই! সুতরাং ভগিনী সারার ব্যাখ্যা কোন মতেই আমার বোধগম্য হইল না। যাহা হউক তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন :—

"দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই জলধর-বেলুন দর্শনে অতীব বিস্মিত হইল,—অতিহিংসায়[১৯] তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইল। প্রিন্সিপাল মনস্থ করিলেন, যে এমন কিছু অসাধারণ বস্তু সৃষ্টি করা চাই, যাহাতে কাদম্বিনী-বিজয়ী বিদ্যালয়কে পরাভূত করা যায়! তাঁহারা অল্পকাল মধ্যে একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন, তদ্দ্বারা সূর্য্যোত্তাপ সংগ্রহ করা যায়। কেবল ইহাই নহে,—তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে ঐ উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে এবং ইচ্ছামত যথা তথা বিতরণ করিতে পারেন।"

"যৎকালে এদেশের রমণীবৃন্দ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন, পুরুষেরা তখন সৈনিক বিভাগের বলবৃদ্ধির চেষ্টায় ছিলেন। যখন নরবীরগণ শুনিতে পাইলেন যে

১৯. হিংসা বৃত্তিটা কি বাস্তবিক বড় দোষনীয়? কিন্তু হিংসা না থাকিলে প্রতিদ্বন্দিতার ইচ্ছা হয় কই? এই হিংসাই ত মানবকে উন্নতির দিকে আকর্ষণ করে। তবে দেশকাল ভেদে ঈর্ষায় পতন হয়, সত্য। তা যে কোন মনোবৃত্তির মাত্রাধিক্যেই অনিষ্ট হয়; সকল বিষয়েরই সীমা আছে।

জেনানা বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয় বায়ু হইতে জলগ্রহণ করিতে এবং সূর্য্যোত্তাপ সংগ্রহ করিতে পারে, তাঁহারা তাচ্ছিল্যের ভাবে হাসিলেন। এমন কি তাঁহারা বিদ্যালয়ের সমুদয় কার্য্যপ্রণালীকে 'স্বপ্ন–কল্পনা' বলিয়া উপহাস করিতেও বিরত হন নাই।"

আমি বলিলাম, "আপনাদের কার্য্যকলাপ বাস্তবিক অত্যন্ত বিস্ময়কর! কিন্তু এখন বলুন দেখি, আপনারা পুরুষদের কি প্রকারে অন্তঃপুরে বন্দী করিলেন? কোনরূপ ফাঁদ পাতিয়াছিলেন না কি?"

ভগিনী বলিলেন, "না।"

"তাঁহারা যে নিজে ধরা দিবেন ইহাও ত সম্ভব নয়। মুক্ত স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বেচ্ছায় চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী হইবে কোন্ পাগল? তবে অবশ্যই পুরুষেরা কোনরূপে আপনাদের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিলেন।"

"হাঁ, তাই বটে!"

'কে প্রথমে পুরুষ প্রবরদের পরাভূত করিল,—সম্ভবতঃ কতিপয় নারীযোদ্ধা?"

"না, এদেশের পুরুষদল বাহুবলে পরাস্ত হয় নাই।"

"হাঁ,ইহা অসম্ভবও বটে, কারণ পুরুষের বাহু নারীর বাহু অপেক্ষা দুর্ব্বল নহে। তবে?"

"মস্তিষ্ক বলে।"

"তাহাদের মস্তিষ্কও ত রমণীর তুলনায় বৃহত্তর ও গুরুতর। না?— কি বলেন?"

"মস্তিষ্ক গুরুতর হইলেই কি? হস্তীর মস্তিষ্কও ত মানবের তুলনায় বৃহৎ এবং ভারী, তবু ত মানুষ হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে!"

"ঠিক ত! কিন্তু কি প্রকারে কর্ত্তারা বন্দী হইলেন, এ কথা জানিবার জন্য আমি বড় উৎসুক হইয়াছি। শীঘ্র বলুন—আর বিলম্ব সহে না!"

"স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক পুরুষের অপেক্ষা ক্ষিপ্রকারী, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। পুরুষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে অনেক ভাবে—অনেক যুক্তি তর্কের সাহায্যে বিষয়টি বোধগম্য করে। কিন্তু রমণী বিনা চিন্তায় হঠাৎ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যাহা হউক, দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারীগণ আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদিকে 'স্বপ্ন–কল্পনা' বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, তখন কতিপয় ছাত্রী তদুত্তরে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডী প্রিন্সিপালদ্বয় বাধা দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, যে তোমরা বাক্যে উত্তর না দিয়া সুযোগ পাইলে কার্য্য দ্বারা উত্তর দিও। ঈশ্বর কৃপায় এই উত্তর দিবার সুযোগের জন্য ছাত্রীদিগকে অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই।"

"ভারী আশ্চর্য্য!" আমি অতি আনন্দে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া করতালি দিয়া বলিলাম, "এখন দাম্ভিক ভদ্রলোকেরা অন্তঃপুরে বসিয়া 'স্বপ্ন–কল্পনায়' বিভোর রহিয়াছেন!"

ভগিনী সারা বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—

"কিছুদিন পরে কয়েকজন বিদেশী লোক এদেশে আসিয়া আশ্রয় লইল। তাহারা কোন প্রকার রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ছিল। তাহাদের রাজা ন্যায়সঙ্গত সুশাসন বা সুবিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না, —তিনি কেবল স্বামীত্ব ও অপ্রতিহত বিক্রম প্রকাশে তৎপর

ছিলেন। তিনি আমাদের সহৃদয়া মহারাণীকে ঐ আসামী ধরিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহারাণীত দয়া প্রতিমা জননীর জাতি—সুতরাং তিনি তাঁহার আশ্রিত হতভাগ্যদিগকে ক্রুদ্ধ রাজার শোণিত-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য ধরিয়া দিলেন না। প্রবল ক্ষমতাশালী রাজা ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

"আমাদের রণসজ্জাও প্রস্তুত ছিল, সৈন্য সেনানীগণও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা বীরোচিত উৎসাহে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। তুমুল সংগ্রাম বাঁধিল—রক্ত গঙ্গায় দেশ ডুবিয়া গেল ! প্রতিদিন যোদ্ধাগণ অম্লাণ বদনে পতঙ্গপ্রায় সমরানলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে লাগিল।

"কিন্তু শত্রুপক্ষ অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহাদের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। আমাদের সেনাদল প্রাণপণে কেশরীবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে লাগিল, এবং শত্রুগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইল।

"কেবল বেতনভোগী সেনা কেন, দেশের ইতর ভদ্র—সকল লোকই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এমন কি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ হইতে ষোড়শবর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত সমরশায়ী হইতে চলিল। কতিপয় প্রধান সেনাপতি নিহত হইলেন ; অসংখ্য সেনা প্রাণ হারাইল ; অবশিষ্ট যোদ্ধাগণ বিতাড়িত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হইল। শত্রু এখন রাজধানী হইতে মাত্র ১২/১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত—আর দুই চারি দিবসের যুদ্ধের পরেই তাহারা রাজধানী আক্রমণ করিবে।

"এই সঙ্কট সময়ে সম্রাজ্ঞী জনকতক বুদ্ধিমতী মহিলাকে লইয়া সভা আহবান করিলেন। এখন কি করা কর্ত্তব্য ইহাই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল।

"কেহ প্রস্তাব করিলেন যে, রীতিমত যুদ্ধ করিতে যাইবেন ; অন্য দল বলিলেন যে, ইহা অসম্ভব—কারণ একে ত অবলারা সমরনৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ, তাহাতে আবার কৃপাণ, তোষাদান, বন্দুক ধারণেও অক্ষমা ; তৃতীয় দল বলিলেন, যে যুদ্ধনৈপুণ্য দূরে থাকুক—রমণীর শারীরিক দুর্ব্বলতাই প্রধান অন্তরায়।

"মহারাণী বলিলেন, 'যদি আপনারা বাহুবলে দেশ রক্ষা করিতে না পারেন, তবে মস্তিষ্ক বলে দেশ রক্ষার চেষ্টা করুন।'

"সকলে নিরুত্তর ; সভাস্থল নীরব। মহারাণী মৌনভঙ্গ করিয়া পুনরায় বলিলেন, 'যদি দেশ ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিব।"

"এইবার দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডী প্রিন্সিপাল (যিনি সৌরকর করায়ত্ত করিয়াছেন) উত্তর দিলেন। তিনি এতক্ষণ নীরবে চিন্তা করতিছিলেন—এখন অতি ধীরে গম্ভীরভাবে বলিলেন যে, বিজয় লাভের আশা ভরসা ত নাই,—শত্রু প্রায় গৃহতোরণে। তবে তিনি একটি সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন—যদি এই উপায়ে শত্রু পরাজিত হয়, তবে ত সুখের বিষয়। এই উপায় ইতিপূর্ব্বে আর কেহ অবলম্বন করে নাই—তিনিই প্রথমে এই উপায়ে শত্রু জয়ের চেষ্টা করিবেন। এই তাঁহার শেষ চেষ্টা—যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া না যায় তবে অবশ্য সকলে আত্মহত্যা করিবেন। উপস্থিত মহিলাবৃন্দ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহারা কিছুতেই দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিবেন না। সেই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে মহারাণীর সভাগৃহ অবলাকণ্ঠের প্রতিজ্ঞা-ধ্বনিতে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইল। প্রতিধ্বনি ততোধিক উল্লাসের স্বরে বলিল,

'আত্মহত্যা করিব!' সে যেন ততোধিক তেজোব্যঞ্জক স্বরে বলিল, 'বিদেশীয় অধীনতা স্বীকার করিব না!'

"সম্রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন, এবং লেডী প্রিন্সিপালকে তাঁহার নূতন উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন।

"লেডী প্রিন্সিপাল পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, 'আমরা যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে পুরুষদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা উচিত। আমি পর্দ্দার অনুরোধে এই প্রার্থনা করি।' মহারাণী উত্তর করিলেন, 'অবশ্য! তাহা ত হইবেই।'

"পর দিন মহারাণীর আদেশপত্রে দেশের পুরুষদিগকে জ্ঞাপন করা হইল যে, অবলারা যুদ্ধযাত্রা করিবেন, সে জন্য সমস্ত নগরে পর্দ্দা হওয়া উচিত। সুতরাং স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার অনুরোধে পুরুষদের অন্তঃপুরে থাকিতে হইবে।

"অবলার যুদ্ধযাত্রার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকেরা প্রথমে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না; পরে ভাবিলেন, 'মন্দ কি?' তাঁহারা আহত এবং অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত ছিলেন—যুদ্ধে আর রুচি ছিল না, কাজেই মহারাণীর এই আদেশকে তাঁহারা ঈশ্বর-প্রেরিত শুভ আশীর্ব্বাদ মনে করিলেন। মহারাণীকে ভক্তিসহকারে নমস্কার করিয়া তাঁহারা বিনা বাক্যব্যয়ে অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন! তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দেশরক্ষার কোন আশা নাই—মরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দেশের ভক্তিমতী কন্যাগণ সমরচ্ছলে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের এ অন্তিম বাসনায় বাধা দেওয়ার প্রয়োজন কি? শেষটা কি হয় দেখিয়া দেশভক্ত সম্ভ্রান্ত পুরুষগণও আত্মহত্যা করিবেন।

"অতঃপর লেডী প্রিন্সিপাল দুই সহস্র ছাত্রী সমভিব্যাহারে সমর প্রাঙ্গণাভিমুখে যাত্রা করিলেন—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "দেশের পুরুষদিগকে ত পর্দ্দার অনুরোধে জেনানায় বন্দী করিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে পর্দ্দার আয়োজন করিলেন কিরূপে? উচ্চ প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া গুলিবর্ষণ করিয়াছিলেন না কি?"

"না ভাই! বন্দুক-গুলি ত নারী যোদ্ধাদের সঙ্গে ছিল না,—অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা থাকিলে আর বিদ্যালয়ের ছাত্রীর প্রয়োজন ছিল কি? আর শত্রুর বিরুদ্ধে পর্দ্দার বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যক ছিল না—যেহেতু তাহারা অনেক দূরে ছিল; বিশেষতঃ তাহারা আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই অক্ষম ছিল।"

আমি রঙ্গ করিয়া বলিলাম,—"হয়ত রণভূমে মূর্ত্তিমতী সৌদামিনীদের প্রভা দর্শনে তাহাদের নয়ন ঝলসিয়া গিয়াছিল—"

"তাহাদের নয়ন ঝলসিয়াছিল সত্য, কিন্তু সৌদামিনীর প্রভায় নয়,– স্বয়ং তপনের প্রখর কিরণে!"

"বটে? কি প্রকারে? আর আপনারা বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করিলেন কিরূপে?"

"যোদ্ধাদের সঙ্গে সেই সূর্য্যোত্তাপ-সংগ্রহের যন্ত্র ছিল মাত্র। আপনি কখনও ষ্টীমারের সার্চলাইট (Search light) দেখিয়াছেন কি?"

"দেখিয়াছি।"

"তবে মনে করুন, আমাদের সঙ্গে অন্যূন দ্বিসহস্র সার্চলাইট ছিল,—অবশ্য সে যন্ত্রগুলি ঠিক সার্চলাইটের মত নয়, তবে অনেকটা সাদৃশ্য আছে ; কেবল আপনাকে বুঝাইবার জন্য তাহাকে 'সার্চলাইট' বলিতেছি। ষ্টীমারের সার্চলাইটে উত্তাপের প্রাখর্য্য থাকে না, কিন্তু আমাদের সার্চলাইটে ভয়ানক উত্তাপ ছিল। ছাত্রীগণ যখন সেই সার্চলাইটের কেন্দ্রীভূত উত্তাপ-রশ্মি শত্রুর দিকে পরিচালিত করিলেন,—তখন তাহারা হয় ত ভাবিয়াছিল, একি ব্যাপার ! শত সহস্র সূর্য্য মর্ত্তে অবতীর্ণ ! সে উগ্র উত্তাপ ও আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুগণ দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিল ! নারীর হস্তে একটি লোকেরও মৃত্যু হয় নাই—একবিন্দু নরশোণিতেও বসুন্ধরা কলঙ্কিত হয় নাই—অথচ শত্রু পরাজিত হইল ! তাহারা প্রস্থান করিলে পর তাহাদের সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সূর্য্যকিরণে দগ্ধ করা গেল।"

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলাম, "যদি বারুদ দগ্ধকালে ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া আপনাদের কোন অনিষ্ট হইত।"

"আমাদের অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না, কারণ বারুদ ছিল বহুদূরে। আমরা রাজধানীতে থাকিয়াই সার্চলাইটের তীব্র উত্তাপ প্রেরণ করিয়াছিলাম। তবু অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য জলধর বেলুন সঙ্গে রাখা হইয়াছিল।

তদবধি আর কোন প্রতিবেশী রাজা মহারাজা আমাদের দেশ আক্রমণ করিতে আইসেন নাই।"

"তার পর পুরুষ-প্রবরেরা অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে চেষ্টা করেন নাই কি ?"

"হাঁ, তাঁহারা মুক্তি পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতিপয় পুলিশ কমিশনার ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মে মহারাণীসমীপে আবেদন করিয়াছিলেন, যে যুদ্ধে অকৃতকার্য্য হওয়ার দোষে সমর-বিভাগের কর্ম্মচারীগণই দোষী, সেজন্য তাঁহাদিগকে বন্দী করা ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে ; কিন্তু অপর রাজপুরুষেরা ত কদাচ কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন নাই, তবে তাঁহারা অন্তঃপুর-কারাগারে বন্দী থাকিবেন কেন ? তাঁহাদের পুনরায় স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হউক।"

"মহারাণী তাঁহাদিগকে জানাইলেন, যে যদি আবার কখনও রাজকার্য্যে তাঁহাদের সহায়তার আবশ্যক হয় তবে তাঁহাদিগকে যথাবিধি কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা যেখানে আছেন, সেইখানে থাকুন।

আমরা এই প্রথাকে 'জোনানা' না বলিয়া 'মর্দ্দানা' বলি।"

আমি বলিলাম, "বেশ ত ! কিন্তু এক কথা,—পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি ত 'মর্দ্দানায়' আছেন, আর চুরি ডাকাতির তদন্ত এবং হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অত্যাচার অনাচারের বিচার করে কে ?"

"যদবধি 'মর্দ্দানা' প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তদবধি এদেশে কোন প্রকার পাপ কিম্বা অপরাধ হয় নাই ; সেই জন্য আসামী গ্রেফতারের নিমিত্ত আর পুলিশের প্রয়োজন হয় না,—ফৌজদারী মোকদ্দমার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটেরও আবশ্যক নাই।"

"তাই ত, আপনারা স্বয়ং শয়তানকেই[২০] শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, আর দেশে শয়তানী[২১] থাকিবে কিরূপে! যদি কোন স্ত্রীলোক কখনও কোন বে-আইনী কাজ করে, তবে তাহাকে সংশোধন করা আপনাদের পক্ষে কঠিন নয়। যাঁহারা বিনা রক্তপাতে যুদ্ধজয় করিতে পারেন,— অপরাধ ও অপরাধীকে তাড়াইতে তাঁহাদের কতক্ষণ লাগিবে?"

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় সুলতানা! আপনি এইখানে আরও কিছুক্ষণ বসিবেন, না আমার বসিবার ঘরে চলিবেন?"

আমি সহাস্যে বলিলাম, "আপনার রান্নাঘরটি রাণীর বসিবার ঘর অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়! কিন্তু কর্ত্তাদের কাজ বন্ধ করিয়া এখানে আমাদের বসা অন্যায়; আমি তাঁহাদের বে-দখল করিয়াছি বলিয়া হয় ত তাঁহারা আমাকে গালি দিতেছেন!"

আমি ভগিনী সারার বসিবার ঘরে যাইবার সময় ইতস্ততঃ উদ্যানের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম,—"আমার বন্ধুবান্ধবেরা ভারী আশ্চর্য্য হইবেন, যখন আমি দেশে গিয়া নারীস্থানের কথা বলিব,—নন্দনকাননতুল্য নারীস্থানে নারীর পূর্ণ আধিপত্য, যৎকালে পুরুষেরা মর্দ্দানায় থাকিয়া রন্ধন করেন, শিশুদের খেলা দেন,—এক কথায় যাবতীয় গৃহকার্য্য করেন! আর রন্ধন প্রণালী এমন সহজ ও চমৎকার, যে রন্ধনটা অত্যন্ত আমোদজনক ব্যাপার! ভারতে যে সকল বেগম খানম প্রমুখ বড় ঘরের গৃহিণীরা রন্ধনশালার ত্রিসীমায় যাইতে চাহেন না, তাঁহারা এমন কেন্দ্রীভূত সৌরকর পাইলে আর রন্ধনকার্য্য আপত্তি করিতেন না!"

"ভারতের লোকেরা একটু চেষ্টা করিলেই সূর্য্যোত্তাপ লাভের উপায় করিতে পারেন। বিশেষ এক খণ্ড কাচ (Convex glass) দ্বারা যেমন রবিকর একত্রিত করিয়া কাগজাদি দগ্ধ করা যায়, সেইরূপ কাচ বিশিষ্ট যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে অধিক বুদ্ধি ও টাকা ব্যয় হইবে না।"

"জানেন ভগিনী সারা! ভারতবাসীর বুদ্ধি সুপথে চালিত হয় না—জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। আমাদের সব কার্য্যের সমাপ্তি বক্তৃতায়—সিদ্ধি করতালি লাভে! কোন দেশ আপনা হইতে উন্নত হয় না, তাহাকে উন্নত করিতে হয়। নারীস্থানে কখনও স্বর্ণবৃষ্টি হয় নাই,—কিম্বা জোয়ারের জলেও মণিমুক্তা ভাসিয়া আইসে নাই?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "না।"

"তবেই দেখুন, ত্রিশ বৎসরে আপনারা একটা নগণ্য দেশকে সুসভ্য করিলেন,—না, প্রকৃতপক্ষে দশ বৎসরেই আপনারা এদেশকে স্বর্গতুল্য পূণ্যভূমিতে পরিণত করিতে পারিলেন। আর আমরা একটি সুসভ্য রত্নগর্ভা দেশকে ক্রমে উন্নত করিব দূরের কথা,—বরং ক্রমশঃ তাহাকে দীনতমা শ্মশানে পরিণত করিতে বসিয়াছি!"

"পুরুষের কার্য্যে ও রমণীর কার্য্যে এই প্রভেদ। আমি যে বলিয়াছিলাম, পুরুষেরা কোন ভাল কাজ সুচারুরূপে করিবার উপযুক্ত নয়, আপনি বোধ হয় এতক্ষণে সে কথাটা বুঝিতে পারিলেন?"

---

২০. পুরুষ জাতিকে।
২১. পাপ।

"হাঁ, এখন বুঝিলাম, নারী যাহা দশ বৎসরে করিতে পারে, পুরুষ তাহা শত শত বর্ষেও করিতে অক্ষম! আচ্ছা ভগিনী সারা, আপনারা ভূমিকর্ষণাদি কঠিন কার্য্য করেন কিরূপে?"

"আমরা বিদ্যুৎ-সাহায্যে চাষ করিয়া থাকি। চপলা আমাদের অনেক কাজ করিয়া দেয়,—ভারী বোঝা উত্তোলন ও বহনের কার্য্যও সে-ই করে। আমাদের বায়ু-শকটও তদ্দ্বারা চালিত হয়। দেখিতেছেন, এদেশে রেল-বর্ত্ম বা পাকা বাঁধা সড়ক নাই, কেবল পদব্রজে ভ্রমণের পথ আছে।"

"সেই জন্য এখানে রেলওয়ে দুর্ঘটনার ভয় নাই—রাজপথেও লোকে শকট-চক্রে পেষিত হয় না। যে সব পথ আছে, তাহা ত কুসুম-শয্যা বিশেষ! বলি, আপনারা কখন কখন অনাবৃষ্টিজনিত ক্লেশ ভোগ করেন কি?"

"দশ এগার বৎসর হইতে এখানে অনাবৃষ্টিতে কষ্ট পাইতে হয় না। আপনি ঐ যে বৃহৎ বেলুন এবং তাহাতে সংলগ্ন নল দেখিতে পাইতেছেন, —উহা দ্বারা আমরা যত ইচ্ছা বারিবর্ষণ করিতে পারি। আবশ্যক মত সমস্ত শস্যক্ষেত্রে জলসেচ করা হয়। আবার জলপ্লাবনেও আমরা ঈশ্বরকৃপায় কষ্টভোগ করি না। ঝঞ্ঝাবাত এবং বজ্রপাতেরও উপদ্রব নাই।"

"তবে ত এদেশ বড় সুখের স্থান। আহা মরি! ইহার নাম 'সুখস্থান' হয় নাই কেন? আপনারা ভারতবাসীর ন্যায় ঝগড়া কলহ করেন কি? এখানে কেহ গৃহবিবাদে-সর্ব্বস্বান্ত হয় কি?"

"না ভগিনী! আমাদের কোঁদল করিবার অবসর কই? আমরা সকলেই সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত থাকি—প্রকৃতির ভাণ্ডার অন্বেষণ করিয়া নানা প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা আহরণের চেষ্টায় থাকি। অলসেরা কলহ করিতে সময় পায়—আমাদের সময় নাই। আমাদের গুণবতী মহারাণীর সাধ,—সমস্ত দেশটাকে একটি উদ্যানে পরিণত করিবেন!"

"রাণীর এ আকাঙ্ক্ষা অতি চমৎকার! আপনাদের প্রধান খাদ্য কি?"

"ফল।"

"ভাল কথা, আপনারই ত সব কাজ করেন, তবে পুরুষেরা কি করেন?"

"বড় বড় কলকারখানায় যন্ত্রাদি পরিচালিত করেন; খাতা-পত্র রাখেন,—এক কথায় বলি, তাঁহারা যাবতীয় কঠিন পরিশ্রম অর্থাৎ যে কার্য্যে কায়িক বলের প্রয়োজন, সেই সব কার্য্য করেন।"

"আমি হাসিয়া বলিলাম,—"ওঃ! তাঁহারা কেরাণী ও মুটে মজুরের কাজ করিয়া থাকেন!"

"কিন্তু কেরাণী ও শ্রমজীবী বলিতে ঠিক যাহা বুঝায় এদেশের ভদ্রলোকেরা তাহা নহেন। তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, সুশিক্ষায় আমাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন। আমরা শ্রম বণ্টন করিয়া লইয়াছি —তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম করেন, আমরা মস্তিষ্কচালনা করি। আমরা যে সকল যন্ত্রের উদ্ভাবনা বা সৃষ্টি কল্পনা করি, তাঁহারা তাহা নির্ম্মাণ করেন। নরনারী উভয়ে একই সমাজ-দেহের বিভিন্ন অঙ্গ,— পুরুষ শরীর, রমণী মন!"

"তা বেশ! কিন্তু ভারতবাসী পুরুষেরা একথা শুনিলে খড়গহস্ত হইবেন! তাঁহাদের মতে তাঁহারা একাই এক সহস্র—'তনমন' সব তাঁহারা নিজেই! আমরা তাঁহাদের 'ছাই

ফেলিবার জন্য ভাঙ্গাকুলা' মাত্র ! আপনাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আপনারা গ্রীষ্মকালে বাড়ীঘর ঠাণ্ডা রাখেন কিরূপে? আমরা ত বৃষ্টিধারাকে স্বর্গের অমিয়ধারা মনে করি।"

"আমাদেরও সুস্নিগ্ধ বৃষ্টিধারার অভাব হয় না। তবে আমরা পিপাসী চাতকের ন্যায় জলধরের কৃপা প্রার্থনা করি না ; এখানে কাদম্বিনী আমাদের সেবিকা—সে আমাদের ইচ্ছানুসারে শীতল ফোয়ারায় ধরণী সিক্ত করিয়া দেয়। আবার শীতকালে সূর্য্যোত্তাপে গৃহগুলি ঈষৎ উত্তপ্ত রাখা হয়।"

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহার স্নানাগার দেখাইলেন। এ কক্ষের ছাদটা বাক্সের ডালার মত ! ছাদ তুলিয়া ফেলিয়া ইচ্ছামত বৃষ্টিজলে স্নান করা যায় ! প্রত্যেকর গৃহপ্রাঙ্গণে বেলুনের ন্যায় বৃহৎ জলাধার আছে,—আদি বেলুনের সহিত ঐ জলাধারগুলির যোগ আছে। আমি মুগ্ধভাবে বলিলাম, "আপনারা ধন্য ! স্বয়ং প্রকৃতি আপনাদের সেবাদাসী আর চাই কি ! পার্থিব সম্পদে ত আপনারা অতিশয় ধনী ; আপনাদের ধর্ম্মবিধান কিরূপ—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"আমাদের ধর্ম প্রেম ও সত্য। আমরা পরস্পরকে ভালবাসিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য এবং প্রাণান্তেও সত্য ত্যাগ করিতে পারি না। যদি কালে ভদ্রে কেহ মিথ্যা বলে—"

"তবে তাহার প্রাণদণ্ড হয়?"

"না, প্রাণদণ্ড হয় না। আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিজগতের জীব হত্যায়—বিশেষতঃ মানব হত্যায় আমোদ বোধ করি না। কাহারও প্রাণনাশ করিতে অপর প্রাণীর কি অধিকার? অপরাধীকে নির্ব্বাসিত করা হয় এবং তাহাকে এদেশে কিছুতেই পুনঃপ্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।"

"কোন মিথ্যাবাদীকে কখনও ক্ষমা করা হয় না কি?"

"যদি কেহ অকপট হৃদয়ে অনুতপ্ত হয়, তাহাকে ক্ষমা করা যায়।"

"এ নিয়ম অতি উত্তম। এখানে যেন ধর্ম্মই রাজত্ব করিতেছে। ভাল, একবার মহারাণীকে দেখিতে পাইব কি? যিনি করুণাপ্রতিমা, নানা গুণের আধার, তাঁহাকে দেখিলেও পূণ্য হয়।"

"বেশ চলুন !" এই বলিয়া ভগিনী সারা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক খণ্ড তক্তায় দুইখানি আসন স্ক্রু দ্বারা আঁটা হইল ; পরে তিনি কতিপয় গোলা আনিলেন, গোলা কয়টি দেখিতে বেশ চক্‌চকে ছিল ; কোন্ ধাতুতে গঠিত তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, আমার মনে হইল উৎকৃষ্ট রৌপ্য-নির্ম্মিত বলিয়া। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ওজন কত। আমি জীবনে কখনও ওজন হই নাই, কাজেই নিজের গুরুত্ব আমার জানা ছিল না ; ভগিনী বলিলেন,—"আসুন তবে আপনাকে ওজন করি। ওজনটা জানা প্রয়োজন।"

আমি ভাবিলাম, একি ব্যাপার ! যাহা হউক ওজনে আমি এক মণ ষোল সের হইলাম। শুনিলাম তিনি আটত্রিশ সের মাত্র ! তবে ভগিনী সারার অপেক্ষা আর কোন গুণে না হউক, আমি গুরুত্বে বেশী ত !

তার পর দেখিলাম ঐ চক্‌চকে গোলার ছোট বড় দুইটি গোলা এই তক্তায় সংযোগ করা হইল। আমি প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, সে গোলা হাইড্রোজেন পূর্ণ। তাহারই সাহায্যে আমরা

শূন্যে উত্থিত হইব। বিভিন্ন ওজনের বস্তু উত্তোলনের নিমিত্ত ছোট বড় বিবিধ ওজনের হাইড্রোজেন গোলা ব্যবহৃত হয়। এখন বুঝিলাম, এই জন্য আমার ওজন অবগত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। অতঃপর এই অপরূপ বায়ুযানে দুইটী পাখার মত ফলা সংযুক্ত হইল, শুনিলাম ইহা বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা উভয়ে আসনে উপবেশন করিলে পর তিনি ঐ পাখার কল টিপিলেন। প্রথমে আমাদের 'তখ্‌তে রওয়াঁ' খানি[২২] ধীরে ধীরে ৭/৮ হাত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, তার পর বায়ুভরে উড়িয়া চলিল! আমি ভাবিলাম, এমন জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত দেশের অধীশ্বরীকে দেখিতে যাইতেছি, যদি আমার কথাবার্ত্তায় তিনি আমাকে নিতান্ত মূর্খ ভাবেন—এবং সেই সঙ্গে আমাদের সাধের হিন্দুস্থানকে 'মূর্খস্থান' মনে করেন? কিন্তু অধিক ভাবিবার সময় ছিল না,—সবে তখ্‌তে রওয়াঁ শূন্যে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে আর অমনই দেখি, আমরা চপলা-গতিতে রাজধানীতে উপনীত! সেই বায়ুযানে বসিয়াই দেখিতে পাইলাম, সখী –সহচরী পরিবেষ্টিতা মহারাণী তাঁহার চার বৎসর বয়স্কা কন্যার হাত ধরিয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত রাজধানী যেন একটি বিরাট কুসুমকুঞ্জ বিশেষ! তাহার সৌন্দর্য্যের তুলনা এ জগতে নাই!

মহারাণী দূর হইতে ভগিনী সারাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "বা! আপনি এখানে!" ভগিনী সারা রাণীকে অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে তখ্‌তে রওয়াঁ অবনত করিলে আমরা অবতরণ করিলাম।

আমি যথাবিধি মহারাণীর সহিত পরিচিতা হইলাম। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইলাম। আমার যে আশঙ্কা ছিল, তিনি আমাকে কি যেন মনে করিবেন, এখন সে ভয় দূর হইল। তাঁহার সহিত রাজনীতি সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গ হইল। বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, যে অবাধ বাণিজ্যে তাঁহার আপত্তি নাই; "কিন্তু যে সকল দেশে রমণীবৃন্দ অন্তঃপুরে থাকে অথবা যে সব দেশে নারী কেবল বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া পুত্তলিকাবৎ জীবন বহন করে,— দেশের কোন কাজ করে না, তাহারা বাণির্জ্যের নিমিত্ত নারীস্থানে আসিতে বা আমাদের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতে অক্ষম। এই কারণে অন্য দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিতে পারে না। পুরুষেরা নৈতিক জীবনে অনেকটা হীন বলিয়া আমরা তাহাদের সহিত কোন প্রকার কারবার করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা অপরের জমী-জমার প্রতি লোভ করিয়া দুই দশ বিঘা ভূমির জন্য রক্তপাত করি না; অথবা এক খণ্ড হীরকের জন্যও যুদ্ধ করি না,— যদ্যপি তাহা কোহেনূর অপেক্ষা শত গুণ শ্রেষ্ঠ হয়; কিম্বা কাহারও ময়ূর-সিংহাসন দর্শনেও হিংসা করি না। আমরা অতল জ্ঞানসাগরে ডুবিয়া রত্ন আহরণ করি। প্রকৃতি মানবের জন্য তাহার অক্ষয় ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, আমরা তাহাই ভোগ করি। তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।"

মহারাণীর নিকট বিদায় লইয়া আমি সেই সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে গেলাম, এবং কতিপয় কলকারখানা, রসায়নাগার এবং মানমন্দিরও দেখিলাম।

---

২২ ইংরাজিতে '*Travelling throne*' বলা যাইতে পারে।

উপরোক্ত দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ পরিদর্শনের পর আমরা পুনরায় সেই বায়ুযানে আরোহণ করিলাম। কিন্তু যেই আমাদের তখ্‌তে রওয়াঁ খানি ঈষৎ হেলিয়া উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, আমি কি জানি কিরূপে আসনচ্যুত হইলাম,—সেই পতনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। চক্ষু খুলিয়া দেখি, আমি তখনও সেই আরাম কেদারায় উপবিষ্টা !

ডেলিশিয়া-হত্যা।[১]

"হত্যা" শব্দ শুনিয়া পাঠিকা ভগিনী ভয় পাইবেন না যে ইহা সত্যই ছোরা তরবারী বা বন্দুক পিস্তল দ্বারা রক্তারক্তি বিশিষ্ট হত্যাকাণ্ড ! প্রসিদ্ধা গ্রন্থকর্ত্রী মিস মেরী করেলী "ডেলিশিয়া হত্যা" নামক এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। ডেলিশিয়া কাহিনীর সহিত আমাদের নারী সমাজের এমন চমৎকার সাদৃশ্য আছে যে গ্রন্থখানি পাঠকালে অবাক হইয়া বলিতে ইচ্ছা করে—

"এ পোড়া ভারত অন্তঃপুরের কথা
জানিল কি ছলে মেরি করেলী।"

অদ্য আমরা ইংলন্ডের সামাজিক অবস্থার সহিত আমাদের সমাজের দুরবস্থার তুলনা করিয়া দেখিব, অবলা পীড়নে কোন সমাজ কিরূপ সিদ্ধহস্ত।

ইংরাজ রমণীর জীবন কিরূপ? আমরা মনে করি, তাহারা স্বাধীন, বিদুষী, পুরুষের সমকক্ষা, সমাজে আদৃতা,—তাঁহাদের আরও কত কি সুখ সৌভাগ্যের চাকচিক্যময় মূর্তি মানস-নয়নে দেখি। কিন্তু একবার তাহাদের গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পাইলে বুঝি সব ফাঁকা। দূরের ঢোল শুনিতে শ্রুতিমধুর। সভ্যতা ও স্বাধীনতার লালনভূমি লন্ডন নগরীতে শত শত "ডেলিশিয়া বধকাব্য" নিত্য অভিনীত হয়। হায় ! রমণী পৃথিবীর সর্বত্রই অবলা ! !

সংবাদপত্রসমূহে কোন বিখ্যাত ইংরাজ-দম্পতীর প্রতিকৃতি দেখিলে আমাদের মনে হয়,—লর্ড অমুক ত বেশ প্রতিপত্তিশালী, জগতের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগান, কিন্তু লেডি অমুকের বুকখানি চিরিয়া দেখিলে জানিতে পারিতাম তাহাতে সুখ কতখানি !

গ্রন্থকর্ত্রী মেরী করেলী স্বয়ং অবলা, তাই ডেলিশিয়ার মর্ম্মবেদনা অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন। এবং অবলা পাঠিকারাই সম্যকরূপে "ডেলিশিয়া বধের" মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। এই চমৎকার উপন্যাসের অবিকল অনুবাদ করা সহজ ব্যাপার নহে, তবু উহার গল্পাংশের অনুবাদ পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

---

১. প্রকৃত উচ্চারণ "ডিলিশিয়া" কিন্তু বঙ্গভাষায় "ডেলিশিয়া" শ্রুতিমধুর বোধহয় বলিয়া আমরা "ডেলিশিয়া" লিখিলাম।

গ্রন্থকর্ত্রী উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, সামাজিক সত্য ঘটনা অবলম্বনে তিনি "ডেলিশিয়া' চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অনেক সত্য ঘটনা আমাদেরও জানা আছে, আমরা ভারতের সেই প্রপীড়িতা অবলাদের একটি নমুনা (representative) চরিত্রের নাম রাখিলাম "মজলুমা"। "ডেলিশিয়া"র প্রতিচ্ছত্রে প্রতিবর্ণে যেন "মজলুমা"রই চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"মজলুমা" চিত্রটি ডেলিশিয়া চিত্রের পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়া দেখাইব—ইংলন্ডের নারী সমাজের সহিত ভারত-ললনা সমাজের কি চমৎকার সাদৃশ্য। আর কোথায় কি প্রকার পার্থক্য আছে, তাহাও দেখা যাইবে।

ডেলিশিয়া স্বাধীনা, রাজার জাতি এবং অন্তঃপুর বন্দিনী নহেন, আর মজলুমা পরাধীনা, প্রজার জাতি এবং কঠোর অবরোধে বন্দিনী, কিন্তু উভয়ের অবস্থাগত পার্থক্য কতটুকু? অধিক নয়,—উভয়ে অবলা! উভয়ই সমাজের অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িতা। কিন্তু ডেলিশিয়া বিদুষী এবং মজলুমা নিরক্ষর—এই একটা ভারী পার্থক্য আছে। সুশিক্ষিতা ডেলিশিয়া জীবন সমর প্রাঙ্গণে অমিততেজা বীরার ন্যায় (স্বামীরূপ) গুপ্তঘাতকের শরাঘাতে নিহতা হয়, যৎকালে অশিক্ষিতা মজলুমা নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় অত্যাচারী স্বামীর পদতলে মর্দ্দিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করে। তেজস্বিনী ডেলিশিয়া পিস্তল হস্তে স্বামীকে স্পষ্ট বলিলেন, "তুমি আমার নিকট আর একপদ অগ্রসর হইলে আমি তোমাকে গুলী করিব"। অভাগিনী মজলুমা সেরূপ কথা বলিবেন দূরে থাকুক—তিনি বরং অত্যাচারীর পদপ্রান্তে লুকাইয়া নাকি কান্না ধরিবেন—বলিবেন, "প্রভো। দাসীর কি অপরাধ হইয়াছে?" অথবা "দাসীর প্রতি সদয় হও।" শেষে অশ্রুধারায় শ্রীচরণ যুগল ধুইতে বসিয়া পুনঃ পুনঃ পদাঘাত লাভ করিবেন—ডেলিশিয়া ও মজলুমায় এই প্রভেদ।

ডেলিশিয়ার আত্মমর্যাদ্যাজ্ঞান আছে, মজলুমার তাহা নাই। নির্যাতিত প্রপীড়িত হইলেও ডেলিশিয়ায় কেমন একপ্রকার মহীয়ান গরীয়ান ভাব আছে অত্যাচারী কর্ত্তৃক তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইতেছে কিন্তু অবনত হইতেছে না। তিনি গর্ব্বোন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া মরিবেন, কিন্তু নতশিরে যুক্ত করে প্রাণভিক্ষা চাহিবেন না! এই মহান ভাবটা যেন মজলুমার নাই। ইহার কারণ এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার অভাব। মজলুমা ভূমিষ্ঠা হইয়াই শুনিতে পায়, "তুই জন্মেছিস গোলাম; চিরকাল থাকবি গোলাম।" সুতরাং তাহার আত্মা পর্য্যন্ত গোলাম হইয়া গিয়াছে। সে আর নিজের মূল্য জানে না—পুরুষ আত্মীয়দের কর্ত্তৃক বারম্বার পদদলিত হইলেও সে তাহাদের পদ-লেহনে বিরত হয় না। স্বাধীনা ডেলিশিয়ায় ও পরাধীনা মজলুমায় এই প্রভেদ।

এ দেশের গ্রন্থাকারেরা নারীচরিত্রকে নানা গুণ ভূষায় সজ্জিত করেন বটে; বেশীর ভাগে অবলা হৃদয়ের সহিষ্ণুতা বর্ণনা করা হয় (কারণ রমণী পাষাণ প্রায় সহিষ্ণু না হইলে তাহার প্রতি অত্যাচারের সুবিধা হইত না যে!) কিন্তু এ সব পুস্তকে নায়িকার আত্ম-গরিমার অস্তিত্ব দেখা যায় না!

এখন ডেলিশিয়া কাহিনীর গল্পাংশ অনুবাদ করা যাউক :

ডেলিশিয়া বাল্যকাল হইতে সাহিত্য চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। যখন তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর ছিল। তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনাবলী পাঠক সমাজে যথেষ্ট আদৃত হইত। এইরূপে প্রতিভাশালিনী ডেলিশিয়া বেশ সুখ্যাতি লাভ করিলেন, এবং পুস্তক বিক্রয়ের ফলে যথেষ্ট অর্থলাভও করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে

তাঁহার অনেক শত্রুরও সৃষ্টি হইল। দেশের অপর লেখকবৃন্দ হিংসায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মতে পুস্তক রচনা কেবল পুরুষের কার্য্য। রমণীগণ কেবল নানা প্রকার বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া বিলাস পঙ্কে নিমজ্জিতা থাকিবে ! আর যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তবে যে নারীর বয়স নাই, রূপ নাই—যে অতি বিশ্রী কদাকার কুৎসিতা, সেই লেখনী ধারণ করুক ! ডেলিশিয়ার ন্যায় নিরুপমা রূপসী কিশোরী তাঁহাদের যশোপ্রভা ম্লান করিবে, ইহা যে একেবারে অসহ্য !

সাতাইশ বৎসর বয়ঃক্রমে ডেলিশিয়ার বিবাহ হয়। এ দীর্ঘ দশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিভাশালিনী, অর্থশালিনী, সৌন্দর্যের রাণী ডেলিশিয়া যে অবিবাহিতা ছিলেন, তাহার কারণ প্রধানতঃ এই যে সাধারণ পুরুষ সমাজ তাঁহাকে কেমন এক প্রকার ভয়, ভক্তি ও স্থলবিশেষে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। নিজের বেশভূষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসিনী, সতত পুস্তক রচনায় নিযুক্তা রমণীকে বিবাহ করিয়া দাম্পত্য জীবনে সুখী হইতে পারিবেন, এরূপ ভরসা হয় ত কেহ করিতে পারেন নাই। (আমাদের দেশে ত "পুস্তক লেখিকা" নাই বলিলেই হয়, তবু "পুস্তক পাঠিকাকে"ও "নভেল পাণি" জ্ঞানে অনেকে বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত হন?)

মিষ্টার উইলফ্রেড কারলীঅন উচ্চবংশ জাত সুপুরুষ ছিলেন। তিনি পিতার ইচ্ছায় সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। 'ছিল' বলিতে মিঃ কারলীঅনের ছিল ছয় ফীট দীর্ঘাকৃতি, সৌম্যমূর্ত্তি আর বনিয়াদী বংশ মর্য্যাদা। আয় এত অল্প যে তাহা ধর্ত্তব্য নহে। মিঃ কারলীঅন দেখিলেন, ডেলিশিয়া শিকার মন্দ নহে। একে ত তিনি আভরণহীনা গোলাপ মুকুল ; দ্বিতীয়তঃ বিপুল অর্থশালিনী। অবশেষে একদিন ডেলিশিয়ার জন্য সেই শুভ মুহূর্ত্ত আসিল—যে মুহূর্ত্ত মানবজীবনে (? না, নারী জীবনে) মাত্র একবার আইসে ; যাহা ভগ্ন তরঙ্গের বাষ্পকণার মত ক্ষণস্থায়ী,—যাহা আকাশে উল্কার ন্যায় প্রতিভাত হয়—চাহিয়া দেখিতে না দেখিতে চির অন্তর্হিত হয় ! ডেলিশিয়ার জীবনে সেই স্মরণীয় মুহূর্ত্ত আসিল। সেদিন ডেলিশিয়া কোন বড় লোকের গৃহে নৈশ ভোজে অতিথি ছিলেন ; মিঃ কারলীঅনও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

"ডেলিশিয়া !" মিঃ কারলীঅন ডেলিশিয়ার হস্ত ধারণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ডেলিশিয়া, আমি তোমায় ভালবাসি !"

*

ডেলিশিয়ার বিবাহের দিন গীর্জ্জার বাহিরে অনেক লোক সমবেত হইয়াছিল—একপক্ষে যুদ্ধদেবতা অপর পক্ষে সাহিত্যের দেবী—এ বিবাহকে কার্ত্তিক এবং সরস্বতীর মিলন বলা যাইতে পারে—এ নব দম্পতিকে দেখাই চাই। জনতায় অনেকে যে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ ডেলিশিয়া প্রাপ্ত হইলেন।

সচরাচর বলা হয়, "বর কন্যাকে বিবাহ করিল," কিন্তু এক্ষেত্রে বলিতে হইবে,—কন্যা বরকে বিবাহ করিলেন। কারণ ডেলিশিয়াই মিঃ কার্‌লীঅনের অন্ন বস্ত্র ইত্যাদি যোগাইবার ভার লইলেন ! মজলুমার বেলায় আবার এরূপ বলা খাটে না, সেস্থলে বলিতে হইবে,—"জমীদারি ধন দৌলতসহ দাসী স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন !" ফল কথা, ডেলিশিয়া মধুমক্ষিকার ন্যায় মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন আর তাঁহার স্বামী নিষ্কর্ম্মা (Drone) মক্ষীর ন্যায় মধু ভোগ করিতে লাগিলেন !

বিবাহের দিন অলঙ্কার বলিতে ডেলিশিয়া এক গুচ্ছ সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পমাত্র পরিয়াছিলেন ! ইহাতে রমণীমণ্ডলী বিস্মিত হইলেন। নবপরিণীতা ডেলিশিয়ার গায় গহনা নাই ! কি আশ্চর্য্য ! ওমা ! ঠিক যেন আমাদেরই নারী সমাজ ! ৫/৭ জন প্রবীণা নবীনা একত্র হইলে, তাঁহারা কেবল অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচার করেন ! যেই কোন নবধৃতা নববধূ আইসে, উপস্থিত রমণীবৃন্দ অমনি তাহার নাক কান ও গলদেশের খানাতল্লাসী আরম্ভ করে—কোথায় কি গহনা আছে। কর্ণাভরণ দেখিবার জন্য বেচারীর কান লইয়া যত টানাটানি হয়, তাহা বর্ণনাতীত ! ভারত বধূর ন্যায় ডেলিশিয়ার কান ধরিয়া টানাটানি হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার কর্ণকুহর (শ্রবণশক্তি) লইয়া মুখরাগণ যথেষ্ট টানাটানির প্রয়াস পাইয়াছিলেন !

প্রৌঢ়া মহিলা সমাজ আন্দোলন আলোচনা করিতে লাগিলেন যে বেচারা কারলীঅন এমন সুশ্রী সুপুরুষ—তিনি বিবাহ করিলেন একটা "স্ত্রী গ্রন্থকর্ত্রী"কে (female authoress) !

পক্ষান্তরে মিঃ কারলীঅন বন্ধু মহলে ডেলিশিয়া সম্বন্ধে বলিতেন, "তিনি স্বাভাবিক গোলাপফুল—কৃত্রিম রঙ, কলপ, পরচুলা (যাহা স্ত্রী কয়েদীদের মাথা হইতে কাটিয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়), এসেন্স পাউডার—এ সকল কিছুরই ধার ধারেন না।" তচ্ছ্রবনে জনৈক বন্ধু বলিলেন, "ভাগ্যবান কুকুর (lucky dog)! তুমি এমন পুরস্কারের যোগ্য নহ।"

"সম্ভবতঃ নহি ; কিন্তু—" বলিয়া মিঃ কারলীঅন বন্ধুর দিকে মধুর দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই চাহনীতেই তাঁহার কথার বাকী অংশ সমাপ্ত হইল। তিনি তাঁহার ঐ সুন্দর কটাক্ষ বাণেই ত ডেলিশিয়াকে বিদ্ধ করিয়াছেন ! বন্ধুগণ আমোদ করিয়া তাঁহাকে "বিউটি কারলীঅন" ("Beauty Carlyon") বলিয়া ডাকিতেন।

ডেলিশিয়ার বিবাহ জীবনের প্রায় তিন বৎসর একরূপ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তিনি সামাজিক আমোদ উৎসবে বড় একটা যোগদান করিতেন না ; অধিকাংশ সময় সাহিত্য সেবায় যাপন করিতেন। লেখকেরা নির্জ্জনতাই ভালবাসে। যে আধ্যাত্মিক ভাবের আস্বাদ পাইয়াছে, সে বহির্জ্জগতের অন্তঃসারহীন আমোদ আহ্লাদে বৃথা সময় নষ্ট করিতে চাহে না। উইলফ্রেড কার্‌লীঅন্ কিন্তু 'বল' নৃত্য প্রভৃতি যাবতীয় অসার আমোদ বড় ভালবাসিতেন ! তিনি প্রায় প্রতিদিনই দুই তিনটা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন।

এই সময় ডেলিশিয়ার সুখের বাসায় এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নি আসিয়া পড়িল। তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না ! অগ্নিকণা তাঁহার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে দাহক্রিয়া আরম্ভ করিল !

দুই একজন পরিচিত লোক তাঁহাকে ঐ অগ্নির বিষয় জানাইতে চেষ্টা করিলেন, ডেলিশিয়া তাহা শুনিলেন না। তিনি ভাবিলেন, "লোকগুলা অনর্থক আমাদের দাম্পত্য-জীবনে অশান্তি আনিতে চায়। পরনিন্দা করিয়া উহারা কি সুখ পায়?" তিনি সময়ে সাবধান হইলে হয়ত অভিনয় এতদূর গড়াইত না। স্বামীকে সংশোধন করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু স্বামীর প্রতি অন্ধ অনুরাগবশতঃ তিনি তাঁহাকে সন্দেহ করিতে পারিলেন না।"

মিঃ কার্‌লীঅন্ একদিন বলিলেন, "সাহিত্য-সেবিকা মহিলারা কোনরূপ উপাধিপ্রাপ্ত হয় না, ইহা বড় অন্যায় এবং দুঃখের বিষয়।... যাহা হউক, ডেলিশিয়া, আমি তোমাকে একটি উপাধি দিতেছি—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় এখন আমি পৈত্রিক লর্ড উপাধির উত্তরাধিকারী হইয়াছি।"

ডেলিশিয়া ফাঁকা উপাধি প্রাপ্তিতে হাসিয়া ফেলিলেন। বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন,—

"প্রভো ! আমি আপনার দীনতমা সেবিকা !"

লেডী শব্দ কি ডেলিশিয়ার সম্মান বৃদ্ধি করিবে? তিনি লেখিকারূপে যে যশোলাভ করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এ লেডী পদবী কি? অমন কত লেডী জগতে অপরিচিত অবস্থায় মরে বাঁচে, তাহার ইয়ত্তা নাই ; কিন্তু "গ্রন্থকর্ত্রী ডেলিশিয়া" নামটি অমর থাকিবে।

আর একদিন লর্ড কার্‌লীঅন্ বলিলেন, "আমি মনে করি, সেই প্রাচীনকাল ভাল ছিল।"

"বটে? যখন পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধা রাখিত—যেমন গবাদি পশুকে খোঁয়াড়ে রাখা হয়*—এবং তাহাদের বিবেচনায় যতটুকু খাদ্য রমণীদের পাওয়া উচিত মনে করিত, তাহাই তাহাদের দিত—আর নারীগণ অবাধ্য হইলে তাহাদের প্রহার করিত? হইতে পারে, সে কাল সুখের ছিল, কিন্তু আমি তাহার পক্ষপাতী নহি। আমি জগতের ক্রমোন্নতি দেখিতে চাই—আমি চাই সভ্যতা—যাহাতে নারী ও পুরুষ সুশিক্ষা লাভ করে।"

*

কার্‌লীঅন্ বলিলেন, "আমার মতে উন্নতি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। আমি ইহার গতি মন্দ হওয়ার পক্ষে ভোট দিতে চাই।"*

পরশ্রীকাতর লোকেরা কাহারও সুখ সুখ্যাতি সহ্য করিতে পারে না। ডেলিশিয়ার দাম্পত্য-জীবন মোটের উপর অত্যন্ত সুখের ছিল—তিনি কেবল একবার একটি শিশুর মৃত্যুশোক পাইয়াছিলেন, এ শোঁক ত পাবক—ইহাতে হৃদয় পবিত্র হয়। জননী হৃদয়ের ঐ জ্বালাটুকু ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোন অশান্তি বা দুঃখ ছিল না। সাহিত্য-জগতেও তিনি বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এতখানি সুখ হিংসুকের সহ্য হইবে কেন? তাঁহারা ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টায় ছিল। ডেলিশিয়া সংসার চিনিতেন, তাই সতর্কতাবশতঃ লোকনিন্দায় কর্ণপাত করিতেন না। তিনি নিন্দুকের মিথ্যা নিন্দা এড়াইতে গিয়া বন্ধুর কথায়ও কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার ন্যায় সতী লক্ষ্মীর স্বামী পথভ্রষ্ট হইতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। আহা ! তাঁহার কি সরল বিশ্বাস ছিল !

তাঁহার জনৈক বন্ধু মিঃ পল ভাল্‌ডিস্ নানা ইঙ্গিতে ডেলিশিয়াকে সতর্ক করিতে চাহিলেন, তাহাতে ডেলিশিয়া চটিলেন ! মিঃ ভাল্‌ডিস্ ডেলিশিয়ার প্রিয় কুকুর স্পার্টানের গায় সাদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "লেডী কারলীঅন্, আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু বলিতে এখন কেবল একজন আছে।"

---

* মিস করেলী সম্ভবতঃ কখনও ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই, তাই তিনি চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধা রমণীদের অবস্থাকে "অতীতকালের" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আমরা অন্তঃপুরকে "খোঁয়াড়" বলিয়া স্বীকার করি না। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? — **Fact is fact!!**

* সময়ের গতি যে কাহারও ভোটের অপেক্ষা করে না, তাই রক্ষা। ইংলিশম্যানের যখন এই মত, তবে আর ভারতবাসীর নিকট কি আশা করিব?

ডেলিশিয়া উত্তর করিলেন, "আপনি স্পার্টানের কথা বলেন, না আপনার নিজের?"

ভাল্‌ডিস্ বলিলেন, "স্পার্টানের কথা বলি!"

ক্রমে কথা প্রসঙ্গে যখন মিঃ ভাল্‌ডিস্ বলিলেন, লর্ড কার্‌লীঅন নগণ্য—কিছুই নহেন, তখন ডেলিশিয়া বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ মিঃ ভাল্‌ডিস্‌কে বিদায় দিলেন। তাই ত, পতিপ্রাণা সতী কি পতিনিন্দা সহিতে পারেন?

ডেলিশিয়ার ব্যবহারটা যেন স্পার্টানের পছন্দ হইল না—সে তাঁহার মুখ দেখিতে লাগিল। সে চাহনির অর্থ এই—"তুমি মিঃ ভাল্‌ডিস্‌কে তাড়াইয়া দিলে কেন? তিনি আমার পরম বন্ধু।" ডেলিশিয়া কুকুরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "স্পার্টান! তিনি আমাদের প্রভুর নিন্দা করিতেছিলেন যে। তাঁহাকে আর আমরা নিকটে আসিতে দিব না।" স্পার্টান কিন্তু কর্ত্রীর এ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইল না।

যাহাদের কবিতা, রচনা প্রভৃতি ডেলিশিয়ার গ্রন্থের ন্যায় আদৃত হইত না, তাহারা হিংসায় দগ্ধ হইতে লাগিল। "বোহেমিয়ান" ক্লাবে ৮/১০ জন ভদ্রলোক একত্র হইলে তাঁহাদের অধিকাংশ লোক ডেলিশিয়ানিন্দা করিয়া হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিতেন। একজন কবি বলিলেন,—"স্ত্রীলোকে এমন লিখিতে পারিবে কেন,—অধিকাংশ পুস্তক তাঁহার স্বামী লিখিয়া দেন।" মিঃ ভাল্‌ডিস্ বলিলেন,—"মিথ্যা কথা! তাঁহার স্বামী আপনারই মত মস্ত গাধা!"

"আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিলেন মিষ্টার ভাল্‌ডিস্! আর আমাকে গাধা বলিতেও ছাড়েন নাই!"

ভাল্‌ডিস্ বলিলেন, "হাঁ! আমি লর্ড কারলীঅনের স্বহস্ত-লিখিত পত্র দেখিয়াছি; তিনি প্রতি শব্দে বানান ভুল করেন, প্রতি ছত্রে ব্যাকরণের মুণ্ডপাত করেন। আপনি যদি মনে করেন যে এই বিদ্যা লইয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর পুস্তক লিখেন, তবে আপনি অবশ্যই গাধা! কিন্তু আপনি বাস্তবিক তাহা মনে করেন না, কেবল একজন মহিলার যশোপ্রভা দর্শনে হিংসা-দগ্ধ হইয়া এমন কথা বলেন।"

কতক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডার পর কবি বলিলেন, "জানেন মিঃ ভাল্‌ডিস্ লেখনীর ধার অসির অপেক্ষা তীক্ষ্ণ!"

ভাল্‌ডিস্ তুচ্ছভাবে হাসিয়া বলিলেন, "ওহো! বুঝিলাম, আপনি অর্দ্ধপেনী মূল্যের সংবাদপত্রে আমাকে গালি দিবেন।"

*

একদা ডেলিশিয়া তাঁহার প্রভুর জন্য অনেকগুলি জিনিস ক্রয় করিতে দোকানে গিয়াছেন। লর্ডের ফরমাইশ ছাড়া আরও বিশেষ কোন বস্তু ক্রয় করিবারও ইচ্ছা ছিল। তাঁহাদের বিবাহের বার্ষিক উৎসব হইবে, সেই শুভ দিনে তিনি লর্ড কার্‌লীঅন্‌কে কিছু উপহার দিবেন। প্রেম ত অশরীরী, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য জড়বস্তুর অবলম্বনই চাই। পতিব্রতা সতী তাঁহার অকৃত্রিম পতি-ভক্তি একটি অঙ্গুরীয় বা একসেট বোতামের আকারে স্বামীকে উপহার দিবেন। এ দোকান সে দোকান ঘুরিয়া একস্থানে জানালার বাহির হইতে একযোড়া বোতাম দেখিয়া ডেলিশিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

বোতাম ক্রয়ের নির্ম্মিত্ত ডেলিশিয়া সেই দোকানে প্রবেশ করিলেন। মণিকার তাঁহাকে ধনবতী ভাবিয়া সযত্নে অনেক মণিমুক্তার অলঙ্কার দেখাইতে আরম্ভ করিল। ডেলিশিয়ামাত্র সেই বোতাম পছন্দ করিলেন, আর কিছু ক্রয় করিলেন না।

এত অল্প বিক্রয়ের পর জহুরী ক্রেতাকে সহজে নিষ্কৃতি দিবে কেন? সে বহুমূল্য রত্নভাণ্ডার খুলিয়া তাঁহাকে দেখাইতে লাগিল। তন্মধ্যে হীরকখচিত একটি কপোতাকৃতি 'যুগ্নু'[১৯] বড় সুন্দর ছিল। কপোতের চঞ্চুপুটে একটি স্বর্ণলিপি এবং সেই স্বর্ণপত্রে একটি শ্লোক (মটো) পদ্মরাগে খচিত ছিল। ডেলিশিয়া সেইটি হাতে লইয়া বলিলেন, "এ যুগ্নুটি ত বড় চমৎকার! ইহাতে কবিত্ব ও শিল্প নৈপুণ্য দুইই আছে।

"হাঁ, কিন্তু এটি বিক্রয় হইবে না। ইহা লর্ড কার্‌লীঅনের বিশেষ ফরমাইশ অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে।"

ডেলিশিয়া ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। এবার হয়ত বিবাহের বার্ষিক উৎসবের দিন লর্ড কার্‌লীঅন্ ডেলিশিয়াকে এই যুগ্নু উপহার দিবেন ; তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মণিকার যুগ্নুটি ডিব্বা হইতে বাহির করিয়া সূর্য্য কিরণে ধরিল—যাহাতে মণিগুলি বেশ ঝলমল করে! সে ডেলিশিয়াকে চিনিত না। বেশ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল—

"এ কপোতের জন্য লর্ড কার্‌লীঅন্‌কে পাঁচশত পাউণ্ডের কিছু বেশি (প্রায় ৮০০০ টাকা) দিতে হইবে। তা ভদ্রলোকে যখন কোন মহিলা বিশেষকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, তখন এরূপ ব্যয়বাহুল্যে কুণ্ঠিত হন না। এক্ষেত্রে সে মহিলাটি যে কার্‌লীঅনের পত্নী নহেন, তাহা অবশ্যই আপনি বুঝিতে পারেন।"

ডেলিশিয়া বলিলেন, "আমি সেরূপ কিছু মনে করিব কেন? আমি ত বুঝি ইহাই স্বাভাবিক যে কোন ভদ্রলোক তাঁহার সহধর্ম্মিনীকে উপহার দিবার জন্য এরূপ যুগ্নু নির্ম্মাণ করাইবেন।"

জহুরী বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "বটে? কিন্তু ফলতঃ আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে যখনই কোন ভদ্রলোক কোন বিশেষ ফরমাইশ দেন, সে বস্তু কখনই তাঁহার ধর্ম্মপত্নীর হাতে পড়ে না। আমরা সর্ব্বদাই ইহাতে দুঃখিত হই, যে আমাদের অতি যত্নে প্রস্তুত অলঙ্কারসমূহ মহিলারা প্রাপ্ত হন না। . . . নচেৎ এই বহুমূল্য হীরককপোতটি কেন লেডী কার্‌লীঅনের নিকট না যাইয়া নর্ত্তকী লা-মেরিনার নিকট যাইতেছে?"

অ্যাঁ! মণিকার এ কি বলিল? ডেলিশিয়ার মাথা ঘুরিয়া গেল!

শেষে জহুরী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি লেডী কারলীঅনের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন কি? তিনি সাহিত্য-জগতে 'ডেলিশিয়া ভাহান' নামে পরিচিতা।"

ডেলিশিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ—মনে হয়, পড়িয়াছি।"

---

১৯. আমাদের দেশে পাচনরি বা সাতনরি মুক্তামালার মধ্যস্থলে যে জড়াও "ধুক্‌ধুকি" থাকে, তাহাকে Pendant বলা যাইতে পারে, কিন্তু pendant বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাকে বেহার অঞ্চলে "যুগ্নু" বলে। বঙ্গদেশে কেবল "ধুক্‌ধুকি" নিজে কোন অলঙ্কার নয় ; বেহারে কিন্তু "যুগ্নু" নিজেই একটি অলঙ্কার। এইজন্য আমরা "যুগ্নু" শব্দ ব্যবহার করিলাম।

জহুরী। তা বেশ। তিনি বাস্তবিক অতি যশস্বিনী রমণী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার স্বামী তাঁহার বিষয় একটুও ভাবেন না। . . . শুনিতে পাই লর্ড কার্‌লীঅন্ যে টাকার এমন অপব্যয় করেন, তাহা তাঁহার পত্নীর ; তাঁহার নিজের এক পয়সাও নাই। যদি এ কথা সত্য হয় তবে কি লজ্জার বিষয় ! অবশ্য লেডী কার্‌লীঅন্ না জানিয়াই মেরিনার অলঙ্কারের মূল্য দিয়া থাকেন ! . . . তবে আপনি এই বোতাম জোড়া লইবেন ত ?

ডেলিশিয়া। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। এগুলি ভদ্রলোককে উপহার দিবার উপযুক্ত।

জহুরী। ঠিক। ইহার কারুকার্য্যে প্রগল্‌ভতা মোটেই নাই, অথচ সৌন্দর্য্য আছে। ইহা ভদ্রলোকের উপযুক্ত, সন্দেহ নাই, কিন্তু (ঈষৎ হাস্য) 'ভদ্রলোক' ক্রমেই বিরল হইতেছেন !

ডেলিশিয়া স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে মণিকারের প্রমুখাৎ অনেক কথাই শুনিলেন। যে কথা তিনি বন্ধুবান্ধবকে বলিতে দিতেন না, —মণিকার সেই কথা অতি নিষ্ঠুরভাবে শুনাইয়া তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিল !

এই চিত্র বঙ্গ-ললনার কেমন বোধ হয়? ইহা কি দর্পণের ন্যায় মজলুমার মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত করে না? মজলুমার কণ্ঠ হইতে কণ্ঠহার মোচন করিয়া কোন বিলাসিনীকে না পরাইলে আর পুরুষপ্রবরের বাহাদুরী কি ?

বাড়ী ফিরিয়া ডেলিশিয়া তাঁহার স্বামীর টেলিগ্রাম পাইলেন—"ডিনারের সময় ফিরিব না ; আমার জন্য অপেক্ষা করিও না।"

ক্রোধে ক্ষোভে জর্জ্জরিতা ডেলিশিয়া স্বীয় পাঠাগারের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন ; সঙ্গে কেবল স্পার্টান ছিল। তাহাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,—"স্পার্টান, মনে হয় আমি যেন বিষ খাইয়াছি—"

স্পার্টান সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল,—তাহার সেই নির্ব্বাক দৃষ্টি যেন বলিতেছিল, "তুমি মানুষকে বিশ্বাস কর কেন? কুকুরজাতি পুরুষাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য !"

স্পার্টান ডেলিশিয়ার ভালবাসার যতখানি প্রতিদান দিতেছিল, লর্ড কার্‌লীঅন্ ততটুকুও দিতে পারিলেন না ! ডেলিশিয়া নানা চিন্তা করিতেছিলেন,—তাঁহার কঠোর শ্রমার্জ্জিত টাকাগুলি লা—মেরিনাকে অলঙ্কার পরাইতে ব্যয়িত হইবে, ইহা কি ন্যায়সঙ্গত ?

ডেলিশিয়ার টাকায় ও মজলুমার টাকায় প্রভেদ আছে। মজলুমার যে টাকা অত্যাচারী কর্ত্তৃক অপব্যবহৃত হয়, সে টাকা মজলুমার স্ব-উপার্জ্জিত নহে,—তাহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত —অর্থাৎ পুরুষেরই উপার্জ্জিত। একজন পুরুষের সঞ্চিত ধন অপর পুরুষে ধ্বংস করে, ইহা বরং সহ্য হয়। কিন্তু ডেলিশিয়ার স্ব-উপার্জ্জিত টাকায় অপব্যবহার অসহ্য—এরূপ কাপুরুষতা ক্ষমাযোগ্য নহে। এ বিষয়ে মজলুমার তুলনায় ডেলিশিয়ার অবস্থা অধিক শোচনীয়। অথচ ইংরাজ সমাজ সভ্যতার দাবী করে ! ইহাই কি সভ্যতা ! ইহাই কি শিভালরী ?

ডেলিশিয়া বলিলেন, "আমার একটি প্রতিমা স্বর্ণবেদিতে স্থাপিত ছিল, —অদ্য তাহা বেদিভ্রষ্ট হইয়াছে ; মূর্ত্তিটা এখনও ভাঙ্গিয়া যায় নাই কেবল ভূমিতলে পড়িয়া আছে।"

মূর্ত্তির পতনের সহিত ডেলিশিয়ার প্রেমের মৃত্যু হইল। অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস,—ভাবিতে হৃদয় দ্বিধা হয়—কোথায় সে বিবাহের সাম্বৎসরিক উৎসব, কোথায় এ প্রেমের সমাধি !

লর্ড কার্‌লীঅন্ প্রায় ১টায় রাত্রিতে বাড়ী ফিরিলেন। প্রায় সব কক্ষই অন্ধকার দেখিয়া ভারী বিরক্ত হইলেন। ডেলিশিয়ার অত্যধিক আদর যত্নে তিনি 'আদুরে' হইয়া উঠিয়াছিলেন ! এ সামান্য অবহেলায় তাঁহার মানহানি হইল যে ! প্রতি রাত্রি তাঁহার অপেক্ষায় আলো জ্বালিয়া রাখা হইত , অদ্য অন্ধকার কেন ? তিনি নিজেই টেলিগ্রামে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সে কথা ভুলিয়া গেলেন ! না, তাঁহার ভাবটা এই—আমি নিষেধ করিলেও ডেলিশিয়ার অপেক্ষা করা উচিত ছিল !

তিনি ডেলিশিয়ার শয়নকক্ষের দ্বারে আঘাত করিয়া সাড়া শব্দ না পাওয়ায়ও বিরক্ত হইলেন ! এত শীঘ্র ডেলিশিয়া ঘুমাইয়াছেন ? তিনি সর্ব্বদাই প্রভুর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন,—অদ্য এ অনাদর কেন ?

তিনি অধীরভাবে পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত করায় স্পার্টান বিরক্তির সহিত উঠিয়া বলিল— "গোঁ— ! সে কর্ত্রীর শয়নকক্ষের বহির্দ্বারে শয়ন করিয়াছিল। তাহার বাক্‌শক্তি থাকিলে বোধ হয় সে স্পষ্টই বলিত, "পাজি ! তুমি এখানে কেন ? কর্ত্রী ঘুমাইতেছেন, তাঁহাকে বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। যাও তুমি জাহান্নামে !" স্পার্টানের সেই অব্যক্ত গোঙানিতে সত্যই কার্‌লীঅন্ যেন অপমান বোধ করিলেন ! তিনি কুকুরকে ধমক দিয়া আপন কক্ষে চলিয়া গেলেন।

অদ্য তাঁহার মনটা খারাপ ছিল,—তিনি জুয়াখেলায় অনেক টাকা (ডেলিশিয়ার টাকা) হারিয়াছেন ; লা-মেরিনাও ভাল ব্যবহার করে নাই।[২০] এখন ডেলিশিয়ার দু'টি মধুমাখা কথা শুনিলে প্রাণটা শীতল হইত ; তা ডেলিশিয়ার যে গাঢ়নিদ্রা— !

পরদিন প্রভাতে ডেলিশিয়া অশ্বারোহণে বেড়াইয়া আসিলেন। গৃহে ফিরিয়া শুনিলেন, লর্ড তখনও নিদ্রিত। প্রাতঃকালীন মুক্ত বায়ুসেবনে তাঁহার মন প্রফুল্ল হইয়াছিল ; এখন মনে হইল, বণ্ডষ্ট্রীটে মণিকারের নিকট যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা দুঃস্বপ্নমাত্র ! প্রিয়জনের বিরুদ্ধে কোন অপ্রিয় কথা সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না—লোকে যথাসাধ্য আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়া সুখী থাকে ! ডেলিশিয়া রমণী বই ত নহেন !

লর্ড সম্মুখে আসিবামাত্র ডেলিশিয়া সস্মিতবদনে অভিবাদন করিলেন, "উইল ! তুমি এতক্ষণে উঠিলে ? গতরাত্রে অনেক বিলম্বে আসিয়াছিলে, না ?"

লর্ড কিন্তু এ কথায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তাঁহার মনে হইল,—অদ্য ডেলিশিয়ায় কি যেন নাই ! কেন ? লর্ড সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, কেন ? ডেলিশিয়া অতি সাবধানে দূরে দূরে থাকিতেছেন, কেন ? ডেলিশিয়ার মৃদুহাস্যটুকুতে যেন প্রাণ নাই ! যদিও তাঁহার ব্যবহারের কোন ক্রটী ধরা যাইতে পারে না, তবু ডেলিশিয়ার ভাবটা যেন প্রাণহীন বোধ হয়। ...

---

২০. লা-মেরিনা মাতাল হইলে তাহার প্রণয়ীদিগকে বোতল ছুড়িয়া মারিয়া থাকে। অদ্য লর্ড কারলীঅন্ তাহার মাতলামির আস্বাদ পাইয়া আসিয়াছেন !"

লর্ড বলিলেন, "ডেলিশিয়া! তোমার নূতন পুস্তকের কোন কোন অংশ বড়ই আপত্তিজনক হইয়াছে। গত রাত্রিতে একজন আমাকে এই কথা বলিতেছিল! ... ।"

ডেলিশিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সে? আমার রচনার অংশবিশেষ হয়ত তাহার কোন ক্ষতস্থান স্পর্শ করিয়াছে!"

কার্‌লীঅন্। তিনি ফিট্‌জ্‌হাফ তাঁহাকে তুমি জান। তিনি বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার ভগিনীদিগকে কিছুতেই তোমার পুস্তক পাঠ করিতে দিবেন না। তাঁহার কথা আমার বড় বিরক্তিকর বোধ হইয়াছিল।

মিঃ কার্‌লীঅন্ কথিত ফিট্‌জহাফ্-এর কথাগুলি কি আমাদের সমাজের উক্তিরই প্রতিধ্বনি নহে? যে সকল পত্রিকায় উদারতাসূচক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়, সেসব কাগজ অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিতে পায় না। কেবল বঙ্গে নহে, সুদূর পশ্চিম দেশেরও কোন পত্রিকা (যাহা অবলাদের জন্য প্রচারিত হইয়াছে এবং যাহার অধিকাংশ প্রবন্ধই মহিলা-রচিত) অনেক পাঠক তাঁহাদের আত্মীয়া মহিলাদের দৃষ্টিগোচর হইতে দেন না! ক্ষমতা পুরুষের হাতে কিনা! ডেলিশিয়া উত্তরে কি বলিতেছেন, তাহাও মনোযোগপূর্ব্বক শুনুন,—

" তুমি ত আমার পুস্তক পাঠ করিয়াছ; কাপ্তেন ফিট্‌জ্‌হাফ যে বিষয়ে আপত্তি করেন, সেরূপ কোন কথা কি তুমি সে পুস্তকে দেখিয়াছ?"

লর্ড। এখন আমার ঠিক মনে হয় না।

কাপ্তেন ফিট্‌জ্‌হাফ অনেক দিন সমাজের প্রকাশ্যে নিন্দাপাত্র ছিলেন; তাঁহার কলঙ্কের কথা ডেলিশিয়া তুলিলেন! এবং তাঁহার ভগিনীরাও সাধ্বী নহেন। এই কাপ্তেন আবার ডেলিশিয়ার গ্রন্থের নিন্দা করেন! "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!"

*

ডেলিশিয়ার নূতন পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ ৮০০০ পাউণ্ডের অর্দ্ধেক লর্ডের নামে জমা করা হইয়াছে। ডেলিশিয়া যত টাকা প্রাপ্ত হইতেন, তাহার অর্দ্ধেক স্বামীকে দিতেন।

সেইদিন অপরাহ্ণে মিসিস্ ক্যাবেন্‌ডিশ্ ডেলিশিয়ার সহিত দেখা করিতে আসিয়া তাঁহাকে নৈশভোজনের এবং ভোজনান্তে সঙ্গীতালয়ে যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। ইনি ডেলিশিয়াকে বাল্যকাল হইতে জানেন এবং তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। ডেলিশিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করিলেন। যেহেতু ব্যথিতহৃদয়ে নির্জ্জনে দুশ্চিন্তার ভারবহন করা নিতান্ত অসহ্য। ভাবিলেন, এই ছলে কতক্ষণ স্নেহময় বন্ধুদের সংশ্রবে আত্মাবিস্মৃত হইয়া থাকা যাইবে।

অদ্য শহরে বিজ্ঞাপনের ভারী ধূমধাম,—"প্রজাপতির জন্ম—লা মেরিনা (অভিনেত্রী)!" লা-মেরিনাকে দেখিবার জন্য হয়ত ডেলিশিয়ার একটু কৌতূহলও ছিল,—যাহার জন্য তাঁহার সুখ-গৃহ দগ্ধ হইতে চলিল, —যে তাঁহার ধ্বংসের কারণ, তাহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

যথাসময় ডেলিশিয়া মিষ্টার ও মিসিস্ কাবেনডিশ-এর সহিত সঙ্গীতালয়ে (অপেরা হাউসে) উপস্থিত হইলেন। "এম্পায়ার" অদ্য লোকে লোকারণ্য। লর্ড কার্‌লীঅন্‌ও আসিয়াছেন।

প্রজাপতির জন্ম হইল—এখন লা-মেরিনা প্রজাপতিরূপে নৃত্য করিতেছিল। ডেলিশিয়া দেখিলেন, লা—মেরিনার বক্ষস্থলে সেই কপোত—যাহা তিনি পূর্ব্ব দিন বণ্ডষ্ট্রীটে মণিকারের দোকানে দেখিয়াছিলেন! সেই হীরক-কপোত,—কপোতের চঞ্চুপুটে সেই পদ্মরাগে লিখিত শ্লোক বিশিষ্ট সুবর্ণলিপি! আর সন্দেহের স্থল কই? আর মণিকারের কথায় অবিশ্বাস করা যায় কিরূপে? সেই আলোকমালা—পরিশোভিত—রঙ্গালয় সহসা ডেলিশিয়ার চক্ষে ঘোর অন্ধকার বোধ হইল! অকস্মাৎ দারুণ শীতে যেন তাঁহার হস্তপদ অসাড় হইল!

ডেলিশিয়াকে বিবর্ণা দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্টা মিসিস্ ক্যাবেন্‌ডিশ ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন,—

"একি ডেলিশিয়া! তোমার কি অসুখ হইয়াছে? (মিঃ ক্যাবেন্‌ডিশের প্রতি) রবার্ট! তুমি ইহাকে একটু বাতাসে লইয়া যাও,—ইনি যেন মূর্চ্ছা যাইবেন।"

মর্ম্মাহতা ডেলিশিয়া! আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আমি এখনই ভাল হইব—চিন্তা নাই। বোধ হয় এ কামরার গরম আমার সহ্য হইতেছে না। আমার জন্য আপনারা ব্যস্ত হইবেন না।"

হায় ডেলিশিয়া! তুমি কক্ষের উষ্ণতায় বিচলিত হইতেছ, না অন্তর্দাহের উত্তাপে?

"এম্পায়ার" হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে ডেলিশিয়া লর্ড কার্‌লীঅন্‌কে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি ভৃত্য রব্‌সন্‌কে দিয়া বলিলেন যেন লর্ড বাড়ী আসিবামাত্রই তাঁহাকে পত্রখানি দেওয়া হয়।

অতঃপর শয়নকক্ষে গিয়া ডেলিশিয়া পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এমিলি, আমি সমুদ্রতীরে যাইব। জিনিষপত্র ঠিক কর যেন আমরা আগামীকল্য দশটার সময় ব্রোডষ্টেয়ার্স যাইতে পারি। স্পার্টানকে সঙ্গে লইব।"

এমিলি তাঁহার চুলের বেণী খুলিতেছিল—তিনি (আন্তরিক ব্যাকুলতায় অস্থির ভাবে) হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমিলি সবিস্ময়ে বলিল, "ও লেডী! আপনার কি হইল?"

"না কিছু নয়" বলিয়া ডেলিশিয়া মৃদু হাসিতে চেষ্টা করিলেন।..." না এমিলি! ভয় নাই; আমি অসুস্থ নই—কেবল শ্রান্ত হইয়াছি। তুমি যাও, আমি একা থাকিলে ভাল হইব। দেখিও, তুমি সমুদ্র উপকূলে যাত্রার জন্য সময়ে প্রস্তুত হইবে।"

ডেলিশিয়া "এম্পায়ারে" যে দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা সহজে পরিপাক করা মজলুমারও সাধ্যাতীত—যদিও ভারত রমণী ধৈর্য্যগুণে অতুলনীয়া। আর স্বাধীনা ডেলিশিয়ার পক্ষে ত ইহা বজ্রাঘাত তুল্য।

ডেলিশিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না-নতজানু হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "ও প্রভো! এতদিনে বুঝিলাম আমি কি হারাইয়াছি। প্রেম আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া স্বপ্নের ন্যায় অদৃশ্য হইল—চির অন্তর্হিত হইল! আহা! 'আছে' বলিতে রহিল কেবল যশোরূপ কন্টক মুকুট!"

হায় ! মজলুমার ন্যায় ডেলিশিয়াও নির্জ্জনে রোদন করিলেন ! ইহা অশ্রু, না ভগ্ন হৃদয়ের শোণিত ধারা ?

"আমি তাঁহাকে বড় ভালবাসিতাম—তাঁহাকে উপাস্য মূর্ত্তি মনে করিতাম। আমার পাপের (পৌত্তলিকতার) যথেষ্ট শাস্তি হইল !"

৪

"আহা প্রেম ! —প্রেম কি কোমল আহা ! কঠোরস্পর্শে ইহা চিরতরে চূর্ণ হয় ! উচ্চ আকাঙ্ক্ষা একবার নষ্ট হইলে আবার জাগিয়া উঠে—কিন্তু প্রেম !—ইহা 'এলো' ফুলের মত—শত বৎসরে একবার মুকুলিত হয় ! এ জীবন লইয়া এখন আমি কি করি ?"

কি আর করিবে ?—মৃত্যু-সাগরে বিসর্জ্জন দাও ! তুমি নিজের প্রেমজ্যোতিতে তোমার লর্ডকে জ্যোতির্ম্ময় দেখিতে ! কারলীঅন বাস্তবিক জ্যোতির্ম্ময় ছিলেন না। যে নিজে আলোকে থাকে, সে অন্ধকারের কিছু দেখিতে পায় না।

আহা ! ডেলিশিয়া কি ভুল করিয়াছেন ! তিনি স্বামীকে কেমন অনিন্দ্য দেবতা মনে করিতেন ! তাঁহাকে কেমন অকপট হৃদয়ে বিশ্বাস করিতেন। যে মোহিনী—মূর্ত্তিটিকে ডেলিশিয়া অমূল্য ভক্তি-রত্ন-খচিত হৃদয় সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ঈশ্বর তাঁহারই নয়ন-সমক্ষে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ! ডেলিশিয়া ! তুমি সে পুতুলের ভগ্ন খণ্ডগুলি কুড়াইয়া তুলিও না।...

পৌত্তলিকেরা যখন মৃন্ময়ী প্রতিমা পূজা করে, তখন তাহাদের বিশ্বাস থাকে যে ইহাতে দেবতা অবতীর্ণা আছেন,—পূজাশেষে যখন মনে করে, দেবতা স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন, তখন প্রতিমাটি বিসর্জ্জন দেয়। কেবল মাটিজ্ঞানে কে পুতুল পূজা করে ? ভক্ত যদি জানিতে পায় যে প্রতিমায় দেবতার পরিবর্ত্তে ভূত পিশাচ আবির্ভূত ছিল, তবে ? তবে আর কি পূজা করিতে পারে ? কেবল তাহাই নহে, দেবতা ভ্রমে পিশাচের পূজা করা হইয়াছে, এ চিন্তা—এ লজ্জা অসহ্য !

ডেলিশিয়া কি ভয়ানক প্রতারিতা হইয়াছেন-প্রেমিক স্বামীজ্ঞানে বিশ্বাসঘাতক পিশাচের পূজা করিয়াছেন ! কাঞ্চন ভ্রমে কর্দ্দমের আদর করিয়াছেন ! এতদিন ভ্রমবশতঃ ডেলিশিয়া শূন্যে যে সুখের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া শান্তিতে বাস করিতেছিলেন, অদ্য সে প্রাসাদ চূর্ণ হইয়াছে ; মর্ম্মাহতা ডেলিশিয়া সেই চূর্ণ প্রাসাদের আবর্জ্জনা ও ধূলিরাশিতে বিলুণ্ঠিতা !

ভক্তিভাজন ভক্তির উপযুক্ত নহেন, নরাকারে পিশাচ—এই আবিষ্কারে ভক্ত-হৃদয়ে যে বজ্রাঘাত হয়, তাহা ভুক্তভোগী হতাশ ভক্ত ভিন্ন আর কে বুঝিবে ? সেরূপ হতাশের বৃশ্চিকদংশন যে সশরীরে ভোগ করিয়াছে, সেই জানে সে জ্বালা কেমন তীব্র ! স্বপ্নরাজ্যে কল্পিত লতাপত্র পুষ্পাবৃত পথে অন্ধভক্ত নিশ্চিন্তমনে চলিতেছিল, সহসা কে তাহাকে জাগ্রত করিয়া বলিয়া দিল, ঐ কুসুমাবৃত স্থানে গভীর গর্ত্ত আছে, আর একপদ অগ্রসর হইলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। হায় ! সে জাগরণ কি কষ্টকর ! জাগিবার পূর্ব্বেই ভক্ত মরিল না কেন ? হায় সত্য ! এমন সত্য কে জানিতে চাহিয়াছিল ? এ সত্য জানিবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইল না কেন ? যাঁহাকে ষোল আনা বিশ্বাস করা গিয়াছিল, তিনি এককড়া বিশ্বাসেরও উপযুক্ত নহেন,

নরদেবতাজ্ঞানে যাঁহার চরণে এতদিন ভক্তি কুসুমাঞ্জলি দান করা গিয়াছিল, তিনি নরপশু—এ আবিষ্কার ভক্তের অসহ্য।

হায়! এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রতারিতা হওয়া গিয়াছিল! ঈশ! কি যন্ত্রণা। ডেলিশিয়া, তুমি যে দেবতার আরাধনা করিতে, তিনি সৈনিক বিভাগের "গার্ডস্ আফিসার ও ভদ্রলোক" মাত্র-–আর কিছুই নহেন!

অবিশ্বাসীকে পশু বলিলেও ঠিক হয় না। কোন্ পশু তেমন নীচ? সিংহ শার্দ্দূল বলিলে 'বীর' বলিয়া প্রশংসা করা হয়; কুকুর বলিলে অতি কৃতজ্ঞ, অতি বিশ্বস্ত বন্ধু বলা হয়; অশ্ব? সেও অপেক্ষাকৃত ভাল; গর্দ্দভ? সে বোকা কিন্তু হিংস্র প্রকৃতির নয়; মহিষ, গণ্ডার, শূকর—না, মানুষের তুলনায় কোন জন্তুই নিকৃষ্ট নয়! কোন পশুই ভক্তহৃদয় পদ দলিত করে না!

অবশ্য অবলাহৃদয় দগ্ধ হইল বা চূর্ণ হইল, তাহাতে কর্ত্তাদের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; প্রপীড়িতার নীরব যন্ত্রণার তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ক্ষমতাশালী পুরুষের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু বলি অকপট ভক্তির কি কিছু মূল্য নাই? সেই অমর-বাঞ্ছিত দুর্লভ ভক্তি হারাইয়া—বেদীভ্রষ্ট হইয়া প্রভুরা কি বড় সুখে থাকেন? মজলুমা অত্যাচারীর অন্নবস্ত্র বন্ধ করিতে পারে না, সত্য, অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারে না সত্য, কিন্তু অন্ধ ভক্তি ফিরাইয়া লইতে পারে ত? মানসদেবতাকে ঘৃণা না করিলেও দয়ার পাত্র জ্ঞান করিতে পারে ত? অবলার কৃপাপাত্র হওয়া কি সবলের পক্ষে বড় গৌরবের বিষয়?

ডেলিশিয়া অব্যক্ত যাতনায় পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যেন উচ্চারিত হইতেছিল,—

"বড় ভাল বাসিতাম, বড় ভক্তি করিতাম,
ভাল প্রতিদান নাথ! পাইলাম তার!"

আবেগের উচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে রোরুদ্যমানা ডেলিশিয়া তন্দ্রাভিভূতা হইলেন।

মজলুমা! ডেলিশিয়ার বিলাপ কি আপনারই হৃদয়বিদারী বিলাপের প্রতিধ্বনি নয়? ডেলিশিয়ার দগ্ধ প্রাণের হা হুতাশ কি আপনারই হুতাশ প্রাণের হা হুতাশের অনুরূপ নয়? প্রভেদ এই যে ডেলিশিয়ার স্বামীর অত্যাচারকে চুরি বলা যাইতে পারে, আর মজলুমার স্বামীর অত্যাচার ডাকাতি!

লর্ড কার্‌লীঅন আইনের বিষয় অবগত ছিলেন—তিনি জানিতেন, আইন তাঁহারই অনুকূলে!—নারীহন্তা ভদ্রলোকের জন্য কোন দণ্ড নাই! ডেলিশিয়া যদি 'তালাক' প্রাপ্তির জন্য নালিশ করেন?—তিনি কি 'তালাক' পাইবেন? না। কারণ তিনি লর্ডের নিষ্ঠুরতা প্রমাণ করিতে পারে না; অমন একটা কেন এক ডজন মেরিনার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা আইনের চক্ষে অত্যাচার নয়। সহধর্ম্মিনীর অর্জ্জিত টাকা মেরিনার জন্য অপব্যয় করাও আইনমতে দোষ নয়! তালাক লইতে হইলে ডেলিশিয়াকে প্রমাণিত করিতে হইবে, স্বামী বিশ্বাসঘাতক এবং দুই বৎসরের অধিককাল হইতে তিনি ইহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতেছেন; ডেলিশিয়া ইহা প্রমাণিত করিতে পারিবেন না! "ডেলিশিয়া আমা হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না" এই

কথা (আইনের এই ধারা) স্মরণ করিয়া কার্‌লীঅন্ অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। হায়রে আইন! পুরুষ—রচিত আইন—পুরুষের সুবিধার নিমিত্তই ইহার সৃষ্টি! অবলাহৃদয় দলন করা—তাহার জীবন মাটী করা—তাহাকে জীবন্তে হত্যা করা আইনানুসারে অত্যাচার নয়!

ব্রোডষ্টেয়ার্সে আসিয়া ডেলিশিয়াও সামাজিক বিধি ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। কাহাকে শারীরিক কষ্ট দিলে, খুন জখম করিলে, অপরাধীর শাস্তি আছে; কিন্তু রমণী-হৃদয় বিদীর্ণ করিলে, শতধা করিলে রমণী-প্রেমের জীবন্ত সমাধি করিলে, কোন দণ্ড নাই!

"তাই বলি," ডেলিশিয়া ভাবিলেন, "তিনি যদি আমাকে প্রহার করেন কিম্বা আমাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়েন—তবেই আমি তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারি,—নচেৎ না!"

অপরাহ্লে সমুদ্রতীরে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে ডেলিশিয়া তাঁহার ভগ্ন পুতুলের চিন্তা করিতেছিলেন। প্রতিমা বেদীভ্রষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু বেদীতে তাঁহার স্থিতিচিহ্ন এখনও বর্তমান!—ফুল ঝরিয়া যায় কিন্তু বৃন্তস্থলে তাহার অবস্থিতির চিহ্ন বিদ্যমান থাকে! সব যায়—কেবল স্মৃতি-যন্ত্রণা থাকে! অনিবার অশ্রুস্রোত বাধা মানিতেছিল না—ডেলিশিয়ার নয়নদ্বয় বাষ্পাচ্ছন্ন হওয়ায় তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না,—গগন, সৈকত, সাগরের বীচিমালা—এইসব কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। এমন সময় স্পার্টান সানন্দে ডাকিয়া উঠিল, এবং কে একজন বলিল—

"লেডী কার্‌লীঅন্, আপনার সঙ্গে দুই চারিটি কথা বলিতে পারি কি?"

ডেলিশিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে মিঃ পল ভাল্‌ডিস্।

যেদিন ডেলিশিয়া ব্রোডষ্টেয়ার্সে আইসেন, তাহার পূর্ব্বদিন "অনেস্‌টি" নামক সংবাদপত্রে এক ব্যক্তি ডেলিশিয়ার অতি জঘন্য মিথ্যানিন্দা লিখিয়াছিল। পল্ ভাল্‌ডিস্ সে লেখককে যথেষ্ট কশাঘাত করিয়াছেন। তিনি ডেলিশিয়াকে এই শুভ সংবাদ শুনাইতে আসিয়াছেন।

অন্যমনস্ক থাকাবশতঃ ডেলিশিয়া প্রথমে তাহা বুঝিতেই পারিতেছিলেন না। পরে সহাস্যে বলিলেন, সংবাদপত্রের মতে যিনি একাধারে দ্বিতীয় শেক্সপিয়ার ও মিল্টন,—ওহো! সেই ব্যক্তিকে আপনি প্রহার করিয়াছেন!"

ভাল্‌ডিস্ বলিলেন, "লেডী কার্‌লীঅন্, আপনাকে বড় বিমর্ষ দেখায়।"

ডেলিশিয়া উত্তর করিলেন, "আপনার অনুমান ঠিক। আমি বড়ই বিষণ্ণ—আমি আমার স্বামীর প্রেম হারাইয়াছি।"

"তবে আপনি সবই শুনিয়াছেন?"

"কি! কেবল আমি ব্যতীত সহরের সকলেই একথা জানে নাকি? ...

"বলুন ত ইহা কি সম্ভব যে লর্ড কার্‌লীঅন্ এমনই আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন যে, তিনি প্রকাশ্যে লা-মেরিনার সহিত দেখা করিতে সঙ্কুচিত নহেন; এইরূপে তাঁহার পত্নীকে সমাজের বিদ্রূপ ও দয়ার পাত্রী করিয়াছেন?"

এদেশে ত স্বামীর অধঃপতনের জন্য স্ত্রীকে লজ্জিত হইতে দেখা যায় না, বরং স্ত্রীর সামান্য পদস্খলনে স্বামীর লজ্জা হয়। ইংলণ্ডে স্বামীর পতনে স্ত্রীও অপমান বোধ করেন। এদেশে ও সে দেশে এ এক প্রভেদ।

ভাল্‌ডিস্ উত্তর করিলেন, "লেডী কার্‌লীঅন্, আপনার বন্ধুরা আপনাকে সতর্ক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। যখন আমি ইঙ্গিতে বলিয়াছিলাম যে আপনার বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত, সেদিন আপনি আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য, সেরূপ করা আপনার অন্যায় হইয়াছিল, আমি এরূপ বলি না। আপনি পতিপ্রাণা সতীর উপযুক্ত কাজই করিয়াছিলেন। এখন আপনি সবই জানিতে পারিয়াছেন—"

"এখন আমি জানিতে পারিয়াছি ; কিন্তু জানিয়া ফল কি? আমি কি করিতে পারি? স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে অবলার কোন উপায় নাই। আমি প্রহার চিহ্ন দেখাইতে পারি না,—তাঁহার কোন দুর্ব্ব্যবহার প্রমাণিত করিতে পারি না! আইন বলিবে, 'ফিরে যাও বোকা মেয়ে! তোমার স্বামী যাহাই করুক না কেন, তিনি যদি তোমার সহিত শিষ্ট ব্যবহার করেন, তবে তুমি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না!' ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এ উক্তি ইংরাজ ললনার!—কি বুক ভাঙ্গা কথা! যে অনলে মজলুমা দগ্ধ হন, সেই অনল ডেলিশিয়াকেও দগ্ধ করে!

ডেলিশিয়া আবেগভরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "পল ভাল্‌ডিস্! আপনি থিয়েটারে আবেগের অভিনয় করিতে পারেন,[২১] দুঃখের স্বরূপ অনুকরণ করিতে পারেন ; কিন্তু আপনি কোন কালে অবলার ভগ্ন হৃদয়ের অসহ্য মূক যন্ত্রণার ভয়াবহ গভীরতা অনুভব করিতে পারিয়াছেন কি? না! আমরা বিশ্বাস, আপনার অতি সুন্দর কল্পনাশক্তিও ততদূর পৌছিতে পারে না! আপনি জানেন, আমি কেন সহসা এখানে —এই সাগরতীরে আসিয়াছি?—আমি জানি, আমার যন্ত্রণা দুর্ব্বহ হইলে এই শান্তশিষ্ট সমুদ্র আমাকে তাহার অতল বক্ষে স্থান দিতে আপত্তি করিবে না! কিন্তু না, আমি ডুবিব না! কিন্তু আপনি জানেন? আপনি অনুমান করিতে পারেন, কেন আমি অদ্য আমার স্বামীর সহিত দেখা না করিবার অভিপ্রায়ে এখানে চলিয়া আসিয়াছি? ... আমার আশঙ্কা ছিল, দেখা হইলে আমি তাঁহাকে হত্যা করিতাম!"

ডেলিশিয়া নিভৃতে চিন্তা করিতেছেন, এখন কি করা কর্ত্তব্য? পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া নিত্য নূতন জ্ঞানার্জ্জন করিবেন ; অথবা অবিশ্রান্ত ভ্রমণে যদি শরীর অবসন্ন হয়, তবে স্কটলণ্ডের হাইল্যান্ডস্থিত নির্জ্জন প্রদেশে অথবা আয়র্লণ্ডের মনোরম উপত্যকায় একটি বাড়ীতে থাকিয়া সাহিত্য-চর্চ্চায় জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিবেন।

তাহাতে সমাজ ভালমন্দ বলিবে যে? "লেডী কার্‌লীঅনের নির্জ্জনবাসের কারণ কি? হয়ত তাঁহার কোন মন্দ অভিপ্রায় আছে!"

তাই ত! যতদিন আত্মীয়স্বজনের অত্যাচার সহ্য করিয়া তাঁহাদের পদলেহন করিতে পার, ততদিন তুমি ভাল। যদি তুমি আত্ম-গরিমা প্রকাশ কর, আপন সম্পত্তি রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া উকিল মোক্তারের সহিত পরামর্শ কর, স্বাধীনতার ভাব দেখাও, আত্মীয়দের

---

২১. মিঃ পল ভালডিল্ থিয়েটারের একজন বিখ্যাত অভিনেতা।

সহিত বনে না বলিয়া স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাক,—তবে কি আর রক্ষা? তবে সমাজের মতে তুমি অধঃপাতে গিয়াছ! ডেলিশিয়া ঠিকই বলিয়াছেন, "এ জীবন লইয়া এখন আমি কি করি?" বিধবা হইলে সমাজের গঞ্জনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পূর্ব্বে ভারতললনা মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া আত্ম-ঘাতিনী হইত। ডেলিশিয়াকেও জীবনভার লইয়া বেশীদিন ভাবিতে হয় নাই—তিনি শীঘ্রই মৃত্যুর শান্তিক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন!

যে দিন "এম্পায়ারে" লা-মেরিনার কক্ষে কার্‌লীঅন্ প্রদত্ত প্রেম-চিহ্ন দেখিয়া আসিলেন, সেই দিনই ডেলিশিয়ার প্রকৃত মৃত্যু হয়—অর্থাৎ তাহার হৃদয়ের মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুও প্রেমের মৃত্যু একই কথা। জীবনমৃতা ডেলিশিয়া তবু যে দেহভার বহন করিতেছেন, তাহা কেবল জীবনের এক গুরুতর কর্ত্তব্যপালন বাকী আছে বলিয়া।

ডেলিশিয়া ১৫ দিন পরে ব্রোডষ্টেয়ার্স হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভৃত্য রব্‌সনের প্রমুখাৎ স্বামীর অনেক কলঙ্ক কথাই শুনিলেন। ক্রোধে লজ্জায় ডেলিশিয়ার দেহলতা কম্পিত হইল—তাঁহার নিজের ভৃত্যও তাহাকে দয়ার পাত্রী ভাবিল! রব্‌সনের কথার ভাবে করুণা ছিল! সমবেদনা ছিল!!

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের জন্য ডেলিশিয়া শয়নকক্ষে গেলেন। দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় উপাধানের প্রতি চাহিয়া ডেলিশিয়া ভাবিলেন, 'আমার এই উপাধানে লা—মেরিনার মস্তক ন্যস্ত হইয়াছিল?' শয্যার নিকট যাইতে না যাইতেই তাঁহার মনে হইল যেন একটি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল—সেই যন্ত্রণায় ডেলিশিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। তাঁহার পতনের শব্দ শুনিতে পাইয়া এমিলি দৌড়িয়া আসিল। . . . ডেলিশিয়া চক্ষু মেলিলে, দেখিলেন, এমিলি তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যস্ত। . . .

গৃহে লর্ডের সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বেই ডেলিশিয়াকে সন্ধ্যায় লেডী ডেক্সটারের নিমন্ত্রণে যাইতে হয়। তথায় স্বকর্ণে স্বামীর মুখে তাঁহার নিন্দা শুনিতে পাইলেন. অবশ্য ডেলিশিয়াকে না দেখিয়াই তিনি নিন্দা করিতেছিলেন! তাঁহার কথা শেষ হইলে ডেলিশিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কঠোর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিলেন! মুহূর্ত্ত পরে তিনি নীরবে সরিয়া গেলেন। লেডী ব্রানসুইথ (ইঁহারই সঙ্গে কার্‌লীঅন আলাপ করিতেছিলেন) সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি কে?"

কার্‌লীঅন্ কিঞ্চিৎ ভীতভাবে বলিলেন, "উনি ডেলিশিয়া—আমার স্ত্রী।" লেডী ব্রানসুইথ বলিয়া উঠিলেন, "তিনি ! সেই সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা। আমার ধারণা ছিল না যে তিনি এমন সুন্দরী। তিনি সেসব কথা অবশ্যই শুনিয়াছেন।"

সে রাত্রি লর্ড কার্‌লীঅন্ গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র রব্‌সন্ তাঁহাকে জানাইল যে কর্ত্রী তাঁহার জন্য পাঠাগারে অপেক্ষা করিতেছেন।

ডেলিশিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লর্ডের যেন হৃতকম্প হইল। দ্বারের পর্দার নিকট দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া তিনি কক্ষে বেশ করিলেন! (যেন রাণীর সম্মুখে খুনী আসামী—বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে!)

লর্ড আরম্ভ করিলেন, "ডেলিশিয়া আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি—"

ক্রোধে ডেলিশিয়ার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফূলিঙ্গ বহির্গত হইতেছিল, তিনি মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "থাম, আর মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন নাই! এখন আমি তোমার নিজমূর্ত্তি

দেখিয়াছি—তোমার সে মুখোস খসিয়া পড়িয়াছে ; মুখোসটা আর তুলিয়া লওয়ার চেষ্টা বৃথা !”

প্রভু স্তম্ভিত হইলেন, একটু হাসিতে বৃথা চেষ্টা করিলেন।

ডেলিশিয়া তাঁহার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আজি রাত্রে তুমি আমার নিন্দা করিয়াছ। ...”

“আমি তোমাকে বলি নাই,” লর্ড আত্মরক্ষার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন, “আমি বলিয়াছি, প্রায় সকল বিদুষী নারীই রমণীসুলভ কোমলভাব হারাইয়া থাকে।”

“ক্ষমা কর,” ডেলিশিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, “তুমি বলিয়াছ, স্ত্রীলোকেরা—যাঁহারা পুস্তক লিখেন যেমন আমার স্ত্রী ; ঠিক এই কথাগুলি বলিয়াছ। . . . যৎকালে আমি পরম আরাধ্য দেবতাজ্ঞানে তোমার উপাসনা করিতেছিলাম, তুমি আমাকে প্রতারণা করিতেছিলে ! তুমি এইরূপে আমাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করিলে !”

কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদের পর ডেলিশিয়া বলিলেন, “আমার বক্তব্য এই—এখন হইতে আমরা স্বতন্ত্র থাকিব। কারণ . . . আমি অভিনেত্রীদের অলঙ্কারের ব্যয়ভার বহন করিতে চাই না। আর তোমার বদান্যতা—অর্থাৎ লেডী ব্রান্‌সুইথের ‘বিল’ শোধ করার ইচ্ছাও আমি অনুমোদন করি না।”

শেষে কার্‌লীঅন্ বলিলেন “ডেলিশিয়া ! তুমি কি প্রলাপ বকিতেছ। তুমি বাস্তবিক স্বতন্ত্রবাসের ইচ্ছা কর না? আমাকে ছাড়িয়া তুমি কি করিবে?

“আমি জীবিত থাকিব ! অথবা মরিব, সে জন্য ভাবি না !”

লর্ড ভাবিলেন, এখন বোধ হয় ডেলিশিয়ার রাগ কম হইয়াছে। তাই তাঁহার দিকে একটু অগ্রসর হইলেন।

ডেলিশিয়া ক্ষিপ্ত হস্তে পিস্তল তুলিয়া বলিলেন, “সাবধান ! আমার নিকট আসিও না !—”

লর্ড একটু হাসিলেন, “তুমি পাগল হইয়াছ ডেলিশিয়া? পিস্তলটা রাখ ; বোধ হয় ওটা ভরা নয়। তবু তোমার হাতে পিস্তল ভাল দেখায় না।”

“না, ভাল ত দেখায় না ; কিন্তু পিস্তলটা ভরা ! তোমার আসিবার পূর্ব্বেই আমি এটা ভরিয়া রাখিয়াছি। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি আর একপদ অগ্রসর হও—আমি তোমাকে গুলি করিব !”

ডেলিশিয়া শেষ বিদায়ের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, “বিদায় উইল ! আমি তোমাকে বড় ভালবাসিতাম। কিছুদিন পূর্ব্বে তুমি হৃদয়সর্ব্বস্ব ছিলে ; —সেই প্রেম, যাহা অকস্মাৎ চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে—মরিয়া গিয়াছে, তাহারই খাতিরে এখন আমরা শান্তির সহিত বিদায় লই।”

কিন্তু লর্ড ডেলিশিয়ার হস্ত স্পর্শ করিলেন না ; তিনি এত শীঘ্র বিদায় লইবেন না। তিনি নিজ বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন !

ডেলিশিয়া আর কিছু না বলিয়া লিখিতে বসিলেন।

“তুমি শুনিতেছ?” লর্ড পুনরায় বলিলেন, “আমি বিদায় গ্রহণ করিব না।”

ডেলিশিয়া নিরুত্তর। তিনি নিজে স্থিরা ছিলেন, কেবল তাঁহার লেখনী নড়িতেছিল।

লর্ড কার্‌লীঅন্ বলিলেন, "গবর্ণমেন্ট স্ত্রীলোকের বেশী স্বাধীনতায় বাধা দিয়া ভালই করেন। যদি তোমাদের ইচ্ছামত সব অধিকার তোমরা পাইতে তবে তোমাদের অত্যাচারের সীমা থাকিত না। রমণীর উচিত নম্র শান্ত হওয়া ; যদি সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা ধনবতী হয়, তবে সে টাকা তাহাদের স্বামীদের উপকারের জন্য ব্যয় করা উচিত। ইহাই সৃষ্টি জগতের স্বাভাবিক নিয়ম,—রমণী পুরুষের সেবিকারূপে সৃষ্ট হইয়াছে—যখন সে তাহা (দাসী) হইতে চায় না, তখনই গোলমাল হয়।"

বাহবা! যদি ইংলণ্ড-নিবাসীর এই উক্তি, তবে আর আমরা গোটাকতক ইংলণ্ড প্রত্যাগত লোকের সঙ্কীর্ণচিত্ততা দেখিয়া আশ্চর্য্য হই কেন? যাঁহারা বিলাতী বিদ্যালাভের নিমিত্ত সে দেশে যান, তাঁহারা দুই চারিটা "কার্‌লীঅন্" এর সংশ্রবে পড়িয়া বিষাক্ত হন, ইহা অসম্ভব নহে। তাই ত গবর্ণমেন্ট কেন স্ত্রীলোকগুলিকে কামানে উড়াইয়া দেন না? অতগুলি গোলাগুলি কামান বন্দুক আছে কিসের জন্য? অথবা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমুদয় অবলাকে একটা বারুদের ঘরে বন্ধ করিয়া বারুদে আগুন দিলে সব আপদ চুকিয়া যায়! তাহা হইলে আর "ডেলিশিয়া ট্রাজেডী" বা "মজলুমা-বধ-কাহিনী" লিখিবার জন্য কেহ জীবিত থাকিবে না!![২২]

সুখের বিষয়, ইংলন্ডে "কার্‌লীঅন্"-এর সংখ্যা (দুই এক শতের) অধিক নহে। যেখানে কার্‌লীঅন্ হেন নীচাশয় কাপুরুষ আছেন, সেখানে মিঃ ক্যাবেনডিশ ও পল্‌ভাল্‌ডিসের ন্যায় মহানুভব লোকও আছেন। মোটের উপর সহৃদয় পুরুষই বেশী। এবং আমাদের দেশেও (অধিক না হইলেও) অল্পসংখ্যক মহাশয় পুরুষ আছেন। বিশাল কণ্টক-অরণ্যে যে মুষ্টিমেয় ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ডেলিশিয়া তবু কিছু না বলিয়া পূর্ব্ববৎ লিখিতে থাকিলেন।

পরিশেষে লর্ড বলিলেন, "আমি এখন শয়ন করিতে যাই; শুভরাত্রি, ডেলিশিয়া!"

এবার ডেলিশিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুভরাত্রি!

এই তাঁহাদের শেষ বিদায়! এই শেষ দেখা! কার্‌লীঅন্ চলিয়া যাইবামাত্র ডেলিশিয়া উঠিয়া কপাট বন্ধ করিলেন।

যতক্ষণ জ্বর থাকে, ততক্ষণ জ্বরের উত্তেজনায় রোগী একরূপ সবল থাকে; যেদিন জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যায়, সেদিন রোগী হঠাৎ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

যতক্ষণ লর্ড কার্‌লীঅন্ উপস্থিত ছিলেন, ক্রোধ খেদের উত্তেজনা ছিল, ততক্ষণ ডেলিশিয়ার হৃদয় সবল ছিল ; কারলীঅন চলিয়া গেলে পর ডেলিশিয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন—ক্রমে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল,—তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন।

পরদিন ডেলিশিয়ার উত্থানশক্তি ছিল না, তিনি ভগ্নহৃদয়, ভগ্নশরীর লইয়া সমস্ত দিন শয়নকক্ষেই থাকিলেন। সেইদিন প্রান্তে কার্‌লীঅন্ প্যারিস যাত্রা করিলেন। তিনি যাত্রাকালে ডেলিশিয়াকে ছোট একখানি পত্র লিখিয়া গেলেন। মধ্যাহ্ন ডাকে একরাশি পত্র আসিয়াছিল, সে পত্রগুলি পাঠকালে ডেলিশিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—

---

২২. 'Murder of Delicia' র ২৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে— Edward Fitzgerald wrote of one of England's greatest poets thus :--'Mrs Barrett Browning is dead. Thank God we shall have no more "Aurora Leighs!' It is the usual manner assumed by men who have neither the brain nor the feeling to write an Aurora Leigh' themselves."

"তাহারা (পত্র-লেখকেরা) জানে না যে আমি মরিয়াছি!"

ডেলিশিয়া-চরিত্রে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, —সমাজ এবং আইন তাহার প্রতিকূলে থাকা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাসঘাতক স্বামীর কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন। ইহাতে তাঁহার নৈতিক সাহসের প্রশংসা করিতে হয়! তাঁহার পবিত্র হৃদয় কত উচ্চ!—তাঁহার মনোভাব কি মহান্—যে ব্যক্তি লা-মেরিনাকে ভালবাসেন, তাঁহার ভালবাসায় ডেলিশিয়ার প্রয়োজন নাই! তিনি স্বামীকে একথা স্পষ্টই বলিয়াছেন,— "তোমার যে হস্ত লা-মেরিনাকে স্পর্শ করিয়াছে, সে কলুষিত হস্ত আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না!"

কেহ বলিতে পারেন যে ডেলিশিয়ার অর্থবল ছিল বলিয়া তিনি স্বামী হইতে পৃথক হইতে পারিলেন; স্বামীর অন্নাশ্রিতা হইলে ওরূপ করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমরা তেজস্বিনী ডেলিশিয়ার যে আত্ম-সম্মানজ্ঞানের পরিচয় পাই, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে তিনি একেবারে কপর্দ্দকশূন্য হইলেও পৃথক হইতেন। তিনি লর্ড কারলীঅন-এর প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কোন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হইতেন, কিম্বা কাহারও বাড়ীতে গবর্ণেস হইতেন অথবা কোন আতুরাশ্রমে অতি সামান্য বেতনে সেবিকা হইতেন। স্বামীকে তাড়াইয়া দিয়া তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, জীবনের সে কয়টা দিন যাপনের জন্য ডেলিশিয়া উপার্জ্জনের কোন পথ নিশ্চয়ই খুঁজিয়া লইতেন। ইচ্ছা অতি প্রবল থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না।

ডেলিশিয়ার এই ভাব—এই মৃত্যু সমাজের পক্ষে অতীব কল্যাণকর। সমাজ সংস্কার করিতে হইলে কতিপয় মজলুমাকে ডেলিশিয়ার ন্যায় 'সমরশায়িনী' হইতে হইবে। তা সাধুদের আত্মোৎসর্গ বিনে এ জগতে কখন কোন্ ভাল কাজটি হইয়াছে![২৩]

ঐরূপ উচ্চভাব ও সুমার্জ্জিত রুচি লাভ করিতে হইলে সুশিক্ষার প্রয়োজন। কবে মজলুমা ডেলিশিয়ার মত বীরনারী হইতে পারিবেন?

মৃত্যুর পূর্ব্বে ডেলিশিয়া উইল করিলেন, যেন তাঁহার স্বামী আজীবন মাসিক তিন শত টাকা (বার্ষিক ২৫০ শত পাউণ্ড) বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকা দীন দুঃখীদের দান করা হইল। এবং ভবিষ্যতে তাঁহার পুস্তক বিক্রয়ের টাকাও অনাথ আতুরদিগকে দান করা হইবে।

লর্ড কার্লীঅন্ প্যারিসে থাকিতেই ডেলিশিয়ার মৃত্যু হইল। তিনি হৃদরোগে (হৃৎপিণ্ড সহসা স্তম্ভিত হওয়ায়) মারা গিয়াছেন।

ডেলিশিয়া-হত্যা কাহিনীর এই শেষ কি দারুণ নৈরাশ্য! হতাশ-পীড়নেই ডেলিশিয়ার জীবন রবি মধ্যাহ্নে অস্ত গেল,—পূর্ণ বিকাশের সময় কুসুম শুকাইয়া গেল!

এইরূপ কত মজলুমা ভগ্নহৃদয়ে আমাদের দেশে অন্তঃপুরের নিভৃত কোণে নিহতা হন, কে তাহার সন্ধান লয়? সে তাপ-দগ্ধা অভাগিনীদের উদয় বিলয় কোন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে না!

দাম্পত্যজীবনের অবস্থা যাহাই হউক, ডেলিশিয়া সামাজিক জীবনেও সুখী ছিলেন না। ডেলিশিয়া সমাজে যথেষ্ট আদর প্রাপ্ত হন নাই কেন? যেহেতু তিনি নিজে ভাললোক ছিলেন! যেহেতু তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকা ছিলেন; সাহিত্যক্ষেত্রে যশোবিজয়ে লেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। স্ত্রীলোকের এতটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা?—ইহা সমাজের অসহ্য! শেষে

---

২৩. উপক্রমণিকায় ঐ ভাবের কথা আছে।

সান্ত্বনা লাভের জন্য সমাজ বলিত, 'অধিকাংশ রচনা কার্‌লীঅন্ লিখেন।' লেখার সুখ্যাতিটা নিতান্ত না দিলে নয়—তবে তাহা ডেলিশিয়াকে না দিয়া কারলীঅনকে দেওয়া যাউক !

ডেলিশিয়ার জন্য অকপট হৃদয়ে শোক করিল কে? —স্পার্টান। কুকুর স্পার্টানের বাক্‌শক্তি থাকিলে সে বলিত,—"যদি সত্য, বিশ্বস্ততা এবং বিশুদ্ধ ভক্তি সদ্‌গুণ হয়, তবে কুকুর পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; যদি স্বার্থপরতা, ধূর্ত্ততা ও কপটাচারকে সদ্‌গুণ বলা যায়, তবে অবশ্য পুরুষ জাতি কুকুরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ !"

একথার উত্তরে আমাদের বঙ্গীয় ভ্রাতৃসমাজ কি বলিতে চান? এ উক্তি একজন ইংরাজ মহিলার ! তাঁহাকে কি বলা এ দেশী কর্ত্তাদের ক্ষমতাতীত ! কিছু বলিলেও ইহাদের কণ্ঠস্বর সাত সমুদ্র পার হইয়া লেখিকার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিবে না। তবে আর কি করিবেন ভ্রাতৃগণ ! নীরবে রোদন করুন !

পাঠিকা ! এ দীর্ঘ উপন্যাস পাঠে আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছেন জানি, কিন্তু তবু আপনাকে "ডেলিশিয়া হত্যা"র শেষ উক্তিটি না শুনাইয়া ছুটী দিতে পারি না ! শেষ কথার ভাবার্থ এই —

পৃথিবীর রাজা মহারাজার নিকট ন্যায় বিচার প্রাপ্তির আশা নাই। তবে একদিন স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বপতি সুবিচার করিবেন,—তখন তিনি সতীসাধ্বী অবলার প্রতিবিন্দু অশ্রুর জন্য, রমণীর নীরব যন্ত্রণার প্রত্যেকটি দীর্ঘ নিশ্বাসের জন্য অত্যাচারীকে শাস্তি দিবেন। আমাদের এই একমাত্র ভরসা —এই আশায় বিশ্বাস করিয়া আমরা ধৈর্য্য ধারণ করিব—নতুবা (যদি ঐ বিচারের আশা না থাকে তবে) মনে করিতে হয়, ঈশ্বর নিজেই এবং জগৎ তাঁহার নরক।[২৪]

কথা কয়টি বড় নৈরাশ্যে বুক ভাঙ্গিয়া উচ্চারিত হইয়াছে ! আহা !

জ্ঞানফল[২৫]

(রূপকথা)

আদম ও হাভা পূর্ব্বে ইডেন উদ্যানে থাকিতেন। তাঁহারা প্রভু পরমেশ্বরের অতিথিরূপে পরম সুখে স্বর্গে ছিলেন ; তাঁহাদের কোন অভাব ছিল না। পরমেশ্বর আদম দম্পতিকে কেবল একটি বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

একদা হাভা স্বর্গোদ্যানের সুকুমার জাফরান মণ্ডিত পথে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নিষিদ্ধ তরুর ছায়াতলে আসিয়া পড়িলেন। তিনি মুগ্ধনেত্রে কাননের সৌন্দর্য্য অবলোকন

---

২৪. শেষ উক্তিটি এমনই মর্ম্মস্পর্শী যে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পরিলাম না,—"Not a tear, not a heart throb of one pure woman wronged shall escape the eyes of Eternal justice, or fail to bring punishment upon the wrong doer! This we may believe--this we must believe,--else God Himself would be a demon and the world His Hell!"

২৫. এস্থলে কোরাণ-শরিফ বা বাইবেলের বর্ণিত ঘটনার অনুসরণ করা হয় নাই।

করিতে লাগিলেন। শাখাস্থিত বিহগের মধুর কাকলি শুনিতে শুনিতে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া সেই বৃক্ষের কয়েকটি ফল চয়ন করতঃ একটি ভক্ষণ করিলেন।

ফল ভক্ষণ করিবামাত্র হাভার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা যদিও রাজ-অতিথিরূপে রাজভোগে আছেন, তথাপি তাঁহার প্রকৃতি অবস্থা এই যে তাঁহার বড়-অঙ্গে একখানি চীর পর্য্যন্ত নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ আজানুলম্বিত কেশদামে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলেন। কেমন এক প্রকার অভিনব মর্ম্মবেদনায় তাঁহার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হইল।

এই সময় তথায় আদম গিয়া উপস্থিত হইলেন। হাভা তাঁহাকে স্বীয় হস্তস্থিত ফল খাইতে অনুরোধ করিলেন। পত্নীর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানফল ভক্ষণে আদমেরও জ্ঞানোদয় হইল। তখন তিনি নিজের দৈন্যদশা হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করিতে লাগিলেন।—এই কি স্বর্গ? প্রেমহীন, কর্ম্মহীন অলসজীবন,—ইহাই স্বর্গসুখ? আরও বুঝিলেন, তিনি রাজবন্দী — এই ইডেন কাননের সীমানার বাহিরে পদার্পণ করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই! তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যের ইষ্টক এবং (শুরকি মসলার স্থলে) প্রবাল ও মুক্তাচূর্ণ নির্ম্মিত সুরম্য প্রাসাদে থাকেন, অথচ "আপন" বলিতে এক কড়ার জিনিষ তাঁহার নাই,—এমনকি পরিধানের এক খণ্ড বস্ত্র পর্য্যন্ত নাই! এ কেমন রাজভোগ? এখন অজ্ঞতারূপ স্বর্গ সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল,—জ্ঞানের জাগ্রত অবস্থা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতে লাগিল! সুতরাং মোহ ও শান্তির স্থলে চেতনা ও অশান্তি দেখা দিল! তিনি হাভাকে বলিলেন,"এতদিন আমরা কি মোহে ভুলিয়াছিলাম! আমাদের এই অবস্থায় কত সুখী ছিলাম!"

হাভা উত্তর দিলেন, "তাই ত! এই যে সৌন্দর্য্যের লীলা ভূমি,—সুগন্ধি জাফরাণ কুসুমশয্যা যাহাতে দূর্ব্বারূপে বিরাজমান; এই যে হীরক-প্রসূন ভূষিতা ললিতা বল্লরী; এই যে মরকত-কিশলয়-শোভিত তরুরাজি-শীর্ষে পদ্মরাগ ফুল, —ইহারা নয়ন রঞ্জন করে বটে কিন্তু ইহাতে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে কই? 'কওসর' জলাশয়ের মকরন্দপ্রতিম অমিয়া বারি তৃষ্ণা নাশ করে বটে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের পিপাসা মিটে কই? এসব স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যে আমাদের কি প্রয়োজন?" কোন এক অজ্ঞাত পরিবর্তন লাভের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইলেন।

পরমেশ্বর উদ্যান-ভ্রমণে আসিয়া দেখিলেন, আদম দম্পতি তাঁহাকে দেখিয়া বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে ডাকিলেন, কিন্তু তাঁহারা ক্ষোভে, অভিমানে, লজ্জায় বিভুসমীপে যাইতে পারিলেন না। সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর সকলই অবগত ছিলেন, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোরা স্বাধীনতা চাহিস? যা তবে দূর হ! পৃথিবীতে গিয়া দেখ স্বাধীনতায় কত সুখ!"

আদম-দম্পতি সেই দিন পতিত হইয়া পৃথিবীতে আসিলেন। এখানে তাঁহারা অভাব-স্বাচ্ছন্দ্য, শোক-হর্ষ রোগ-আরোগ্য, দুঃখ-সুখ প্রভৃতি বিবিধ আলো-আঁধারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃত দাম্পত্যজীবন লাভ করিলেন! হাভা কন্যাদিগকে অধিক ভালবাসিতেন; তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, কন্যাকুল দীর্ঘায়ু হইবে; সুখে শান্তিতে গৃহে অবস্থিতি করিবে; প্রেমের অক্ষয় ভাণ্ডার তাহাদের হৃদয়ে সঞ্চিত থাকিবে।

আদম আবার পুত্রদিগকে অধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি তাদৃশ প্রবল না থাকায় তিনি তনয়দিগকে বিশেষ কোন বর দান করেন নাই।

জননী হাভার আশীর্ব্বাদ মতে তাঁহার দুহিতানিচয় জন্মে এক গুণ, বাড়ে দ্বিগুণ, দীর্ঘায়ুঃ হয় চতুর্গুণ ! আর আদমের প্রিয় তনয় জন্মে এক গুণ, অতি সোহাগে প্রতিপালিত হয় বলিয়া রোগ ভোগ করে দ্বিগুণ, মরে চতুর্গুণ ! স্বাভাবিক মৃত্যু না হইলে তাহারা যুদ্ধচ্ছলে পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরে ! একদল কারাগারে পচে, অবশিষ্ট নানা ক্লেশ ভোগ করে !

স্বর্গচ্যুতা হাভা তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট যে জ্ঞানফলটি পৃথিবীতে ফেলিয়া দিলেন, তাহার বীজে ধরণীর পূর্ব্বাংশে এক বিশাল মহীরুহ জন্মিল। সময়ে শাখাটি ফুল ফলে পরিপূর্ণ হইল ; কিন্তু সে দেশের লোকে তৎকালে ইহার যথেষ্ট আদর করিতে জানিত না। তরুতলে রাশি রাশি সুপক্ব ফল পড়িয়া থাকিত, শৃগাল ও কাক তদ্দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিত। অবশিষ্ট ফল নিকটবর্ত্তী শান্তানদীর বেলায় পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল ; কতক গড়াইয়া নদীগর্ভে পড়িল !

জ্ঞানফলের রসমিশ্রিত নদীজল যথাকালে বিরাট সাগরে গিয়া মিশিতেছিল। বিরাট সাগরের পরপারে পরীস্থান।

পরীস্থানের নরনারী দেখিতে অতি সুন্দর ; কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্য ব্যতীত বড়াই করিবার উপযুক্ত আর বিশেষ কিছু তাহাদের ছিল না। সে দেশে কেবল মাকালের বন ; উপযুক্ত খাদ্য–সামগ্রীর একান্ত অভাব। জিনগণ[২৬] নানা কৌশলে অতি যত্ন পরিশ্রমেও কর্ক্কশ অনুর্ব্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া উপযুক্ত ফললাভ করিতে পারিত না। পরীগণ অমরাবতী তুল্য বিলাসভবনে বাস করে, নানা প্রকার বিলাস–সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত থাকে ; তাহাদের ঐশ্বর্য্যও প্রচুর, তথাপি তাহারা জঠরানলের জ্বালায় ক্লেশ পায় !–বিধাতার লীলা এমনই চমৎকার !

একবার কতিপয় জিন অবগাহন কালে ক্ষুধার তাড়নে আকুল হইয়া বিরাট সাগরের লবণাম্বু খানিকটা গলাধঃকরণ করিল। জলপান করিবামাত্র তাহাদের অজ্ঞতারূপ আবরণ অপসারিত হইল। এতকাল তাহারা যে অন্নচিন্তারূপ জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে নাই, এখন সে মীমাংসা সহজেই হইয়া গেল। জ্ঞানের দিব্য চক্ষে তাহারা পথ দেখিতে পাইল।

সেইদিন উক্ত জিনগণ মনস্থ করিল, তাহারা নানা দেশে গিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় করিবে। অতঃপর তাহারা মাকাল ফলে জাহাজ বোঝাই করিয়া বাণিজ্য–ব্যপদেশে যাত্রা করিল। জিনদের জাহাজখানি নানাস্থান ঘুরিয়া বিরাট সাগরের উপকূলে কনক দ্বীপের এক বন্দরে উপনীত হইল ! কনক দ্বীপে একজাতি সুবর্ণকায় মানবের বসতি ছিল।

কনক দ্বীপের সমৃদ্ধিশালী নগর দেখিয়া জিন বণিকের চক্ষু স্থির হইল। তাহাদের ধারণা ছিল, যে তাহাদের দেশের মত ঐশ্বর্য্যশালী দেশ আর নাই—তাহারা 'ধুলামুঠা ধরিলে সোণামুঠা' হয় ! কিন্তু কনকদ্বীপের ভূমি রত্নগর্ভা ! এখানে নানা জাতি সুস্বাদু ফলের গাছ আছে, তন্মধ্যে আম্রকানন প্রধান। এখানকার সুসভ্য ঋষিপ্রকৃতি লোকেরা প্রধানতঃ ফল ভক্ষণে জীবনধারণ করে। জিন বণিক মনে করিল, কোনরূপে একবার ইহাদিগকে ভুলাইতে পারিলে হয়। তখন তাহারা কনকদ্বীপবাসীদের নিকট হইতে মাকাল বিনিময়ে কতকগুলি সোণামুখী, আঁধারমাণিক প্রভৃতি আম্র হইল। এইরূপে প্রতি বৎসর মাকাল বোঝাই জাহাজ লইয়া আসিত আর আম্রপূর্ণ জাহাজ লইয়া যাইত। ক্রমে বাণিজ্য বেশ পাকিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কনক দ্বীপে আম্রফলের দুর্ভিক্ষ হইতে লাগিল।

---

২৬. জিন–নর। পরী–নারী।

পরবৎসর বণিকেরা বিপণিতে আম্রের অভাব দেখিয়া চিন্তিত হইল। তাহারা নগর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে আম্রের সন্ধানে বেড়াইতে লাগিল। গ্রামে গিয়া তাহারা দেখিল, হৈমন্তিক ক্ষেত্র সমূহ সুবর্ণ ধান্যে পরিপূর্ণ! কৃষককুল রাশি রাশি ধান্য লইয়া মনের আনন্দে গৃহে গমন করিতেছে। তদ্দর্শনে জিনেরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল,—"ইহারা ক্ষুধার যন্ত্রণা জানে না!" অতঃপর কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বণিক কৃষকের নিকট মাকাল বিনিময়ে ধান্য প্রার্থনা করিল। কৃষক তাহার ভাষা বুঝিল না ; অপিচ ছোট ছোট হৃষ্টপুষ্ট বালক বালিকার দল সবিস্ময়ে জিনদের পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল ; তাহারা কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে জিনদের সুন্দর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল! বণিক মনে মনে ভাবিল, "একি রঙ্গ! আমরা এই কৃষক শিশুদের তামাসার বিষয় হইলাম দেখি!"

যাহা হউক, কোন প্রকারে কৃষককে বণিকেরা নিজেদের মনোভাব জ্ঞাপন করিল। কৃষক প্রথমে মাকালের পরিবর্ত্তে ধান্য দান করিতে অস্বীকৃত হইল ; কিন্তু তাহার পুত্র বলিল, "আহা! দাও ; ওরা ক্ষুধার্ত্ত। আমাদের এত ধান আছে![২৭]

জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত পরীস্থানে প্রতি বৎসর বাণিজ্যতরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখন আর খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতা নাই, সুতরাং পরীদিগের আর কোন প্রকার ক্লেশ নাই। তাহারা মনের সাধে ঐন্দ্রজালিক রথারোহণে সময় সময় কনক দ্বীপে ভ্রমণ করিতে আসিত। তাহাদের সহিত কনকদ্বীপবাসিনী ললনাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হইল। ফলে তাহারা পরীদের বেশভূষার অনুকরণ প্রয়াসী হইতে লাগিল! বাকী রহিল কেবল পরীর পাখা দুইটির অনুকরণ!

পূর্ব্বে দুই একখানি জাহাজ বৎসরে একবার মাত্র মাকালের আমদানি হইত ; পরে অসংখ্য তরীপূর্ণ মাকাল বৎসরে তিন চারিবার কনক দ্বীপে আসিতে লাগিল। আর রাশি রাশি ধান্য পরীস্থানে রপ্তানী হইতে চলিল। মাকালের মায়া এমনই যে কৃষক আর কিছুতেই আত্মসংযম করিতে পারিতেছিল না। আর কৃষক সম্বৎসরের জন্য ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখে না ; ক্রমে এমন হইল, অদ্য যে ধান্য ক্ষেত্র হইতে কর্ত্তন করিয়া আনে, কল্য তাহা মাকাল বিনিময়ে বিক্রয় করে। সুতরাং কনক দ্বীপে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী আসিয়া ঘর বাঁধিল।

এই মাকাল বাণিজ্যের সময় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। বিরাট সাগরতীরে একটি অপরূপ পেয়ারা গাছ হইয়াছিল। জ্ঞানফলের রসমিশ্রিত জল দ্বারা পুষ্ট হওয়ায় ঐ পেয়ারা ফল কিছু কিছু জ্ঞানফলের গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। জিন পরীগণ ঐ পেয়ারা নিজেদের জন্য সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিত। কিন্তু একদিন বণিকেরা যৎকালে জাহাজে মাকাল তুলিতেছিল, সেই সময়ে দৈবাৎ তরু-চূড়া হইতে গোটাকত পেয়ারা জাহাজে পড়িল। সেই পেয়ারা মাকালের সহিত কনক দ্বীপে আনীত ও বিক্রীত হইল।

কনকদ্বীপবাসী দুই চারি জন ভাগ্যবান ব্যক্তি পরীস্থান হইতে আনীত পেয়ারা ভক্ষণ করিয়া তাহার বীজ ফেলিয়া দিলেন। সেই বীজে কনকদ্বীপেও পেয়ারা গাছ হইল। ক্রমে শতাধিক বৎসর অতীত হইল।

---

২৭. আহারে!—'নিজ অন্নপর কর পণ্যে দিলে
পরিবর্ত্ত ধনে দুর্ভিক্ষ নিলে!"

পেয়ারা ফলের কল্যাণে কতিপয় কনকদ্বীপবাসী ভদ্রলোক এখন ভ্রান্তিস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলেন ! দীর্ঘ কালের,—শত শত বৎসরের মোহনিদ্রার পর এ কি তীব্র জাগরণ ! অন্ধ চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া ঘোর অন্ধকারে পড়িলেন ! ! তাঁহারা বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, জিনগণ এক মাকাল ফলের পরিবর্ত্তে দেশের সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে ; এখন জলৌকার ন্যায় তাঁহাদের বুকের অবশিষ্ট রক্ত শোষণ করিতেছে ! কনকের দৈন্য দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় শতধা হইতে লাগিল।

আর সে আম্র কানন নাই ; কোন স্বাদু ফলগাছেই আর ফল নাই ; ক্ষেত্রে স্বর্ণ শস্য নাই ; রত্নগর্ভা ধরণী ধূলিগর্ভা হইয়া পড়িয়াছে। ঘরে ঘরে "হা অন্ন ! হা অন্ন !" আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। পূর্ব্বের মত কৃষকের আর কান্তিপুষ্টি নাই, তাহার দেহ কঙ্কালসার, পরিধানে শতগ্রন্থি চীর ! কনকদ্বীপবাসীর আর কিছুই নাই ; আছে কেবল মাকাল আর মাকাল ! নগরে রাজপথের দ্বিধারে পণ্য-বীথিকায় মাকাল ; গ্রামে হাটে বাজারে মাকাল, গ্রাম্য মুদির দোকানে মাকাল,—সমুদয় দেশ মাকালে আচ্ছন্ন ! এখন উপায় ?

কনকদ্বীপবাসী শাপে বর প্রাপ্ত হইয়াছে, মাকালের সহিত জ্ঞানপেয়ারা লাভ করিয়াছে, সুতরাং উপায় ভাবিতে আর বিলম্ব হইবে না। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল, আর মাকাল গ্রহণ করিবে না। আবালবৃদ্ধবনিতা,—সকলে এক যোগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল , তাহারা আর মাকালের মায়ায় ভুলিবে না। তাহারা এখন যে নব উৎসাহ, প্রবল শক্তি লাভ করিয়াছে,—মাকালে নাকাল না হইলে এত শীঘ্র তাহা লাভে সমর্থ হইত না। এ জন্য তাহারা কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে জিনদিগকে শতবার ধন্যবাদ দিল।

এদিকে যথানিয়মে জিন সওদাগর পূর্ব্ব অভ্যাস মত জাহাজ বোঝাই মাকাল লইয়া বন্দরে পৌছিল। কিন্তু এবার আর মাকাল বিক্রয় হইল না। যখন কিছুতেই বণিকেরা বেসাতির কূল কিনারা করিতে পারিল না, এবং ভারে ভারে নয়নরঞ্জন মাকাল পচিয়া নষ্ট হইতে লাগিল, তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া পরীস্থানে এই দুঃসংবাদ প্রেরণ করিল !

পরীস্থানে বণিক সভায় এ বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল,—আন্দোলন—প্রলয়ে বিরাট সাগরের সুগভীর শান্ত জল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইল ! পরিশেষে জনৈক গলিতদন্ত পলিতকেশ বৃদ্ধ বলিলেন, "অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কনকদ্বীপবাসী কেন মাকালে বিরাগী হইল।"

বণিকদল কনকদ্বীপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, নানা প্রকার জনরব শুনিয়া অবগত হইল যে, যাঁহারা পেয়ারার আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই মাকালের বিরোধী। সওদাগর এই সন্দেশ মায়াবলে এক নিমেষেই পরীস্থানে প্রেরণ করিল। সেই দিনই বণিকনেতা আদেশ দিলেন, "কনকের পেয়ারা তরু সমূলে উৎপাটন কর।"

পুনরায় বণিকেরা মায়া সন্দেশবহ দ্বারা তাহাদের নেতাকে জ্ঞাপন করিল, "অত বড় মহীরুহ সমূলে উৎপাটন করা অসম্ভব। অতএব কি আদেশ ?" বণিকনেতা তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিলেন, "উহার মূল ছেদন কর !"

পেয়ারা তরুর মূলে শত শত শাণিত কুঠারের আঘাত পড়িতে লাগিল। তদ্দর্শনে কনক দ্বীপবাসী প্রথমে ত অবাক হইল, পরে বুঝিল, ব্যাপারখানা কি ! তাহারা প্রথমতঃ অনুনয় বিনয় দ্বারা জিন বণিককে বৃক্ষচ্ছেদনে বাধা দিল, —পরে সওদাগরের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া

সরোদনে নিষেধ করিল। কিন্তু জিনেরা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। তখন কনকদ্বীপে ভয়ানক হৈ চৈ পড়িয়া গেল, শান্তিপূর্ণ দেশটির দিকে দিকে অশান্তি–অনল জ্বলিয়া উঠিল ! জিন তবু নাছোড়বান্দা ! তাহারা বরং সুবর্ণকায়দিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল :

"ঈশ্বর যখন জ্ঞানফল মানবের পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং এই ফল গ্রহণদোষেই আদিমাতা স্বর্গবিচ্যুতা হইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয় জানিও এ ফল মানবের অতীব অনিষ্টকারী। অতএব তোমাদের পরম উপকারের জন্যই আমরা এত পরিশ্রম করিয়া এ গাছ কাটিতেছি।"

দেশের লোকেরা যথেষ্ট জ্ঞান বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর ফাঁকা তর্কে ভুলিবার পাত্র নয় ! তাহারা বলিল, "তবে তোমরা ও ফল খাও কেন? আগে পরীস্থানের পেয়ারাগাছ কাট গিয়া, পরে আমাদের গাছ কাটিও। আর আদি জননী যখন ঐ ফল বিনিময়ে স্বর্গ –সুখ তুচ্ছ করিয়াছেন, তখন ও ফলের মূল্য কত, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্বর্গ হইতে আনীত ফল মর্ত্ত্যে অবশ্য অবশ্য অতি যত্নে রক্ষণীয়।" কিন্তু সে কথা শুনে কে?—এ যে আঁতে ঘা !

বৃক্ষ কর্ত্তন উপলক্ষে কনকে কিছুকাল খুব বাক্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। এই সময় কোন অশীতিপর পণ্ডিত বলিলেন, "এ বিকৃত পেয়ারা গাছের জন্য তোমরা বৃথা কলহ কর কেন? ইহা ত সে আদি জ্ঞানফলের রূপান্তরিত ফল মাত্র। তোমরা হাভা কর্ত্তৃক রোপিত সেই আদি বৃক্ষের অনুসন্ধান কর। শাস্ত্র পাঠে জানা যায়, তাহা পৃথিবীর পূর্ব্বাংশে আছে। চল, আমরা তাহারই সন্ধানে যাই।" বৃদ্ধের কথামতে সকলে বর্ত্তমান ছাড়িয়া অতীতের সন্ধানে চলিল ! বৃদ্ধ পণ্ডিত কিন্তু তাহাদের সঙ্গে গেলেন না,—তিনি উপদেশ দান করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন।

অনেক দিনের পর্য্যটনে বহু নদ, নদী, জনপদ, পর্ব্বত, প্রান্তর এবং অরণ্য অতিক্রম করিয়া কনকবাসীরা যথাস্থানে একটি সুবৃহৎ মৃত তরু সন্নিকটে উপস্থিত হইল। অনেক শাস্ত্র দেখিয়া, বহু কিম্বদন্তী শুনিয়া তাহারা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে এই শুষ্ক তরুই আদি জ্ঞানবৃক্ষ। তখন মর্ম্মান্তিক ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশে তাহাদের বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতে লাগিল ! তাহারা এত পরিশ্রম করিয়া, দীর্ঘ প্রবাসে আহার নিদ্রা তুচ্ছ করিয়া, এত কষ্ট সহিয়া এদেশে আসিল এই মৃত তরুর জন্য? স্থানীয় লোকেরা বলিল, প্রায় দ্বিশতাধিক বৎসর হইল গাছটি মরিয়াছে। জনৈক আগন্তুক তদুত্তরে বলিল, "তবু ভাল, তোমরা যে অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাকে ইন্ধনরূপে অনলে উৎসর্গ কর নাই, তাই রক্ষা !"

এখন কি করা যায়? কি উপায়ে জ্ঞানবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হইবে? কেহ বলিল, প্রাণপণে জল সেচন কর, কেহ বলিল, অশ্রুসেক কর ; কেহ বলিল, হৃদয়ের শোণিত দান কর,ইত্যাকার নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে লাগিল। এমনকি দুই একজন মানবের প্রাণবিনিময়ে যদি তরুবর সঞ্জীবিত হয়, তবে তাহারা তাহাতেও কুণ্ঠিত নয়।

সকলে শুষ্ক তরুর নানা প্রকার যত্ন করিতে লাগিল, —অশ্রুধারা রক্তধারা—কিছুই দিতে কুণ্ঠিত হইল না ! কিন্তু মৃত কবে সঞ্জীবিত হয়? সমুদয় চেষ্টা পরিশ্রম ব্যর্থ হইল দেখিয়া তাহারা মর্ম্মাহত হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল। রোদনে ক্লান্ত হইয়া এক ব্যক্তি তরুমূলে শয়ন করিয়াছিলেন ; তিনি তন্দ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন কোন সন্ন্যাসী বলিতেছেন :–

"বৎস ! ক্রন্দনে কোন ফল হইবে না। দুই একটি কেন, দুই লক্ষ নরবলি দান করিলেও জ্ঞানবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হইবে না। দুই শত বৎসর হইল এই দেশের অদূরদর্শী স্বার্থপর পণ্ডিত

মূর্খেরা ললনাদিগকে জ্ঞানফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করে ; কালক্রমে ঐ নিষেধ সামাজিক বিধানরূপে পরিগণিত হইল এবং পুরুষেরা এ ফল নিজেদের জন্য একচেটিয়া করিয়া লইল। রমণীবৃন্দ এ ফলের চয়ন ও ভক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এ গাছের সেবা শুশ্রূষায় বিমুখ হইল। কালে নারীর কোমল হস্তের সেবা-যত্নে বঞ্চিত হওয়ায় জ্ঞানবৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে। যাও, তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও ; এখন সেই পেয়ারার বীজ বপন কর গিয়া। জিনগণ যে গাছ কাটিতে চাহে, কাটুক ; তোমরা তাহাদের বাধা না দিয়া গোপনে বীজ সঞ্চয় করিয়া রাখিও। এখন তোমরা নরনারী উভয়ে মিলিয়া নব রোপিত পেয়ারা চারার যত্ন করিও, তাহা হইলে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে। সাবধান! আর কন্যাজাতিকে পেয়ারায় বঞ্চিত করিও না! নারীর আনীত জ্ঞানফলে নারীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে, একথা অবশ্য স্মরণ রাখিবে!" নিদ্রাভঙ্গে তিনি এই স্বপ্নবৃত্তান্ত সঙ্গীদিগকে বলিলেন ; তাহারা ইহা শুনিয়া সকলে একবাক্যে বলিল, চল তবে ফিরিয়া যাই। জনৈক উদারহৃদয় ভদ্রলোক বলিলেন, "তাই ত,পুরুষেরা নদী পার হইয়া কুমীরকে কলা দেখাইয়াছিল,—নারীর আহৃত জ্ঞানে নারীকেই বঞ্চিত করিয়াছিল,—তাহার ফল হাতে হাতে!"

কনক দ্বীপের উদ্যমশীল বালকেরা উদ্যানের এক কোণে খানিকটা স্থান পরিষ্কার ও চিহ্নিত করিল, পরে বালিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আইস ভগিনি! তোমরাও যোগদান কর ; আমরা কোদালি দ্বারা ভূমি প্রস্তুত করি, তোমরা স্বহস্তে বীজ বপন কর! আজি কি শুভদিন, এখন হইতে আমাদের নিজের গাছ হইবে।" বিস্ময়স্তম্ভিত জিনেরা নীরবে দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিল, কনকবাসীর এ শুভকার্য্যে তাহারা বাধা দিতে পারিলনা। নব উৎসাহে অণুপ্রাণিত কনকবাসীদের এ মহৎ কার্য্যে—জিন দূরে থাকুক,—দৈত্যও এখন বাধা দিতে অক্ষম!

অতঃপর কনক দ্বীপ পুনরায় দ্বিগুণ ত্রিগুণ ধনধান্যে পূর্ণ হইল ; অধিবাসীগণ পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তাহারা আর কোন প্রকার ইন্দ্রজালে ভুলিবার পাত্র নয়! কারণ এখন ললনাগণ জ্ঞান কাননের অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছেন।

'কনকের রূপ কথা' অমৃত সমান,
মৃত ব্যক্তি যদি শুনে পায় প্রাণদান!

নারী-সৃষ্টি

(পৌরাণিক উপাখ্যান)

[কিছুদিন হইল কোন ইংরাজী সংবাদপত্রে নারী-সৃজন সম্বন্ধে একটী চমৎকার কৌতুকপূর্ণ গল্প পাঠ করিয়াছিলাম। আমার ভগিনিদিগকে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি, আমি স্কুলের ছাত্রীর ন্যায় শাব্দিক অনুবাদ করিব না—কেবল মূল বিষয়ের মর্ম্মোদ্ধার করিব। সুতরাং কেহ মূলের সহিত অনুবাদের বৈষম্য দেখিয়া হতাশ বা বিরক্ত হইবেন না।]

কর্ণেল ইঙ্গারসোল (Ingersoll) "মুসার ভ্রম" শীর্ষক বক্তৃতা দানকালে নারী-সৃজন বিষয়ক পুরাকালের একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি তদ্দ্বারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেন যে বাইবেলের নারী-সৃষ্টির ইতিহাস অপেক্ষা ঐ প্রাচ্য গল্পের ভাব কত উচ্চ এবং কত উদার। কিন্তু জানি না, তিনি নিম্নলিখিত হিন্দুর পৌরাণিক আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলে ইহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতেন কি না।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই প্রাচীন পুস্তকখানি অল্প দিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনৈক ইংরাজ লেখক মিঃ বেন (Mr. Bain) ইহা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। অতঃপর উহা "চিকাগো টাইম্‌স্ হেরাল্ড" ("Chicago Times Herald") পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়। গল্পটি এই প্রকার :

আদিকালে যখন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা আদি কিছুই ছিল না— ছিল কেবল ঘোর অন্ধকার। ত্বস্তি নামক হিন্দু দেবতা এই বিশ্ব জগৎ সৃজন করিলেন। সর্ব্বশেষে যখন রমণীসৃষ্টির পালা, তখন বিশ্বস্রষ্টা ত্বস্তি দেখিলেন যে তিনি পুরুষ সৃজন কালেই সমুদয় মাল মসলা ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন। আর ঘন কিম্বা শক্ত কোন বস্তুই অবশিষ্ট নাই। ত্বস্তিদের নৈরাশ্যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন।

ধ্যান ভঙ্গের পর ত্বস্তি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পদার্থের সার সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন , যথা : পূর্ণচন্দ্রের গোলত্ব ; সর্পের বক্র গতি ; লতিকার তরুশাখা অবলম্বন ; তৃণের মৃদু কম্পন ; গোলাপ লতার ক্ষীণতা ; কুসুমের সৌকুমার্য্য ; কিশলয়ের লঘুত্ব ; হরিণের কটাক্ষ ; সূর্য্যরশ্মির ঔজ্জ্বল্য ; কুয়াসার অশ্রু ; সমীরণের চাঞ্চল্য ; শশকের ভীরুতা ; ময়ূরের বৃথা গর্ব্ব ; তালচঞ্চু পক্ষীর পাখার কোমলতা ; হীরকের কাঠিন্য ; মধুর স্নিগ্ধ স্বাদ ; ব্যাঘ্রের নিষ্ঠুরতা ; অনলের উত্তাপ ; তুষারের শৈত্য ; ঘুঘুর ললিত স্বর ; নীলকণ্ঠের কিচির মিচির—

ঐ পর্য্যন্ত অনুবাদ লিখিবার পর অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হওয়ায় আমি কলম হাতে লইয়াই টেবিলে ন্যস্ত বামহাতে মাথা রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। জানি না, আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কি না। সহসা আমার কক্ষটা অতিশয় আলোকিত হইয়া উঠিল—বোধ হইল যেন ঘরের ভিতর দুই চারিটি সূর্য্য উদয় হইয়াছে! সম্মুখে চাহিয়া দেখি, আলোক স্তম্ভের ন্যায় অতি উজ্জ্বল একটী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। সেদিকে দেখিতে আমার নয়নদ্বয় ঝলসিয়া গেল। আমি তখনই চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। আমার সম্মুখস্থিত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিটী বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শুন বৎসে! আমি বিশ্বস্রষ্টা ত্বস্তি। তুমি আমার নারী-সৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিতেছ দেখিয়া সুখী হইলাম। আমি সর্ব্বশুদ্ধ তেত্রিশটি উপাদানে নারী রচনা করিয়াছি। ইংরাজ লিপিকর মিঃ বেন এই উপকথা সংস্কৃত হইতে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিবার সময় ভ্রম ক্রমে ১২টি উপকরণের নাম লিপিবদ্ধ করেন নাই। অদ্য আমি সেই ভ্রম সংশোধন করিতে আসিয়াছি। কেন না পৌরাণিক ইতিহাসে কোন প্রকার ভুলভ্রান্তি থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। আমি সেই দ্বাদশ বস্তুর নাম বলিয়া যাই, তুমি লিখ।" আমি মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় বিহ্বলচিত্তে কলমটা কালিতে ডুবাইয়া লইয়া অলসভাবে লিখিতে লাগিলাম :

"তেঁতুলের অম্লত্ব ; লবণের লাবণ্য ; মরিচের ঝাল ; ইক্ষু দণ্ডের মিষ্টতা"—ভ্রম হইতেছে ভাবিয়া আমি থামিলাম, ক্ষণকাল পরে সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলাম, "মহাত্মন্! এ যে চাটনীর মসলা—"

ত্বস্তি স্মিতমুখে অথচ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "আমি যাহা বলি, নির্ব্বিবাদে লিখিয়া যাও !" আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া যন্ত্রচালিতার ন্যায় লিখিলাম :

"কুইনাইনের তিক্ততা ; যুক্তি-জ্ঞানহীনতার কূটতর্ক ; কলহপ্রিয়তার মুখরতা ; দার্শনিকের অন্যমনস্কতা ; রাজনৈতিকের ভ্রান্তি ; পাষাণের সহিষ্ণুতা ; সলিলের তারল্য এবং নিদ্রার মোহ।"

পাঠিকা ভগিনী হয়ত বড্ড রাগ করিয়াছেন, গল্পের তালভঙ্গ এবং রসভঙ্গ হইল দেখিয়া। তা কি করি, বলুন দেখি। পরের লেখা অনুবাদ করিতে গেলে নিজের স্বাধীনতা খাটান যায় না। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে কল্পনা বেচারীকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে হয়। যাক, এখন পুনরায় অনুবাদ চলুক। না, আমি আবার গোড়া হইতে বলি—অনুবাদ ও দৈববাণী একত্রে মিশাইয়া বলি।—

ধ্যানভঙ্গের পর ত্বস্তি চক্ষু মর্দ্দন করিয়া দাঁড়াইলেন এবং কতিপয় বিশেষ বিশেষ পদার্থের সারভাগ সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন, যথা : (১) পূর্ণচন্দ্রের গোলত্ব (২) সর্পের বক্রগতি (৩) লতিকার তরুশাখা অবলম্বন (৪) তৃণদলের মৃদু কম্পন (৫) গোলাপ লতার ক্ষীণতা (৬) কুসুমের সৌকুমার্য্য (৭) কিশলয়ের লঘুত্ব (৮) হরিণের কটাক্ষ (৯) সূর্য্যরশ্মির ঔজ্জ্বল্য (১০) কুয়াসার অশ্রু (১১) সমীরণের চাঞ্চল্য (১২) শশকের ভীরুতা (১৩) ময়ূরের বৃথা গর্ব্ব (১৪) তালচঞ্চু পক্ষীর পালকের কোমলতা (১৫) হীরকের কাঠিন্য (১৬) মধুর স্নিগ্ধ স্বাদ (১৭) ব্যাঘ্রের নিষ্ঠুরতা (১৮) অনলের উত্তাপ (১৯) তুষারের শৈত্য (২০) ঘুঘুর কাকলী (২১) নীলকণ্ঠের কিচিরমিচির গান (২২) তেঁতুলের অম্লত্ব (২৩) লবণের লাবণ্য (২৪) মরিচের ঝাল (২৫) ইক্ষুরসের মিষ্টতা (২৬) কুইনাইনের তিক্ততা (২৭) যুক্তিজ্ঞানহীনতার কূটতর্ক (২৮) কলহপ্রিয়তার মুখরতা (২৯) দার্শনিকের অন্যমনস্কতা (৩০) রাজনৈতিকের ভ্রান্তি (৩১) পাষাণের সহিষ্ণুতা (৩২) সলিলের তারল্য (৩৩) নিদ্রার মোহ।

ত্বস্তিদেব উপরোক্ত তেত্রিশ উপাদান একত্র মিশ্রিত করিয়া (Egg beater দ্বারা উত্তমরূপে ফেঁটিয়া !) ললনা রচনা করিলেন। বলা বাহুল্য রমণী সৃজন করিতে সৃষ্টিকর্ত্তাকে অত্যধিক বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে অনেকে গবেষণা, অনেকে চিন্তা, গভীর ধ্যান ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। লোকে যে জিনিষটী প্রস্তুত করিতে অধিক মাথা ঘামায় তাহা নিশ্চয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া করিয়া হাত পাকিলে পর সর্ব্বশেষে যাহা প্রস্তুত করা হয় তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। সুতরাং রমণী যে সৃষ্টি-জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতেই পারে না ! অতঃপর ত্বস্তি সেই অতি যত্নে নির্ম্মিতা অঙ্গনা পুরুষকে উপহার দিলেন।[২৮] অষ্ট দিবস পরে পুরুষ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল :

"হে প্রভো ! আপনি যে জীবটী আমাকে উপঢৌকন দিয়াছেন, সে ত আমার জীবন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে যে অবিরত বক-বক, কচর-কচর করে ; সে আমাকে এক তিল অবকাশ দেয় না ; সে যে বিনা কারণে বিলাপ করে ; এক কথায় সে যারপরনাই মন্দ।" ত্বস্তি অবলোকে ফিরাইয়া লইলেন।

অষ্টাহ অতীত হইলে পর পুরুষ পুনর্ব্বার দেবতা-সমীপে উপনীত হইয়া বলিল-"হে দেব ! আপনার প্রদত্ত জীবটীকে প্রত্যাখ্যান করা অবধি আমার জীবন অতিশয় নির্জ্জন ও

২৮. উপহারটা যেন বানরের গলায় মতিহার !

নীরস হইয়া পড়িয়াছে। আমরা স্মরণ হয়, সে কি সুন্দর ! আমরা সম্মুখে নাচিত, গায়িত, খেলিত ! মনে পড়ে তাহার সেই কটাক্ষ—মরি মরি ! সে কেমন করিয়া আড় নয়নে আমার দিকে চাহিত ! সে আমার খেলার সহচরী ছিল ; আমার জীবন–সঙ্গিনী ছিল ! তাহার বিরহ আমার অসহ্য !" ত্বস্তি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকে পুনরায় সে রমণী প্রদান করিলেন।[২৯]

চতুর্থ দিবসে আবার ত্বস্তিদেব দেখিলেন যে পুরুষ বনিতাসমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট আসিতেছে। ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পুরুষ বলিল, "দেব ! আমায় ক্ষমা করুন ; আমি ঠিক বুঝিতে পারি না, নারী আমার আনন্দের কারণ, না, বিরক্তির কারণ। তাহাকে লইয়া আমার সুখশান্তি অপেক্ষা কষ্টের ভাগই অধিক। অতএব প্রভো ! আপনি কৃপাবশতঃ আমাকে ইহা হইতে মুক্তিদান করুন।"

এবার দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যাও তোমার যাহা ইচ্ছা কর গিয়া !" পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল,"এ যে আমার কালস্বরূপ, ইহার সহিত জীবন যাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যে কিছুতেই ইহার সঙ্গে থাকিতে পারি না !" ত্বস্তি উত্তর দিলেন, "তুমি ত ইহাকে ছাড়িয়াও থাকিতে পার না !"

পুরুষ নিরুপায় হইয়া মনের দুঃখে খেদ করিতে লাগিল, "কি আপদ ! আমি রমণীকে (এ ভূতের বোঝা ?) রাখিতেও চাহি না, ফেলিতেও পারি না ! !"

তদবধি নারী অভিশাপরূপে পুরুষের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে ! ! !

নার্স নেলী

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

১

আমার ছোট ননদ খুকী তিন বৎসর যাবৎ রোগে ভুগিতেছেন। অবশেষে ডাক্তারের পরামর্শে বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত লক্ষ্ণৌ আসিয়াছেন। তাঁহার যত্ন করিবার জন্য আমিও সঙ্গে আসিয়াছি। আল্লাহ্ রাখে, আমাদের কাফেলায় অনেক লোক, খুকীর স্বামী পুত্র প্রভৃতি সকলেই ছিল।

আমাদের জনৈক বন্ধু হেমবাবুও লক্ষ্ণৌতে ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বিমলা দেবী পীড়িত হইয়া জানানা হাসপাতালে আছেন শুনিয়া, আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। তিনি শয্যাশায়িনী ছিলেন। তাঁহার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দেয় নার্স ; তাঁহার বাহুর ক্ষতস্থলে পটি বাঁধে নার্স। এক কথায়, তাঁহার সমুদয় কার্য্য নার্সগণই করে। আমি প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তথায় ছিলাম, ততক্ষণে বিভিন্ন কার্য্যের জন্য গোটা পাঁচ নার্সকে আসিতে যাইতে দেখিলাম। কিন্তু রক্ত পূয পূর্ণ বালতি লইয়া গেল যে নার্সটি, তাহার চেহারাটা আমার চক্ষে যেন কেমন বোধ হইল।

আমি একদিন অন্তর একদিন হেমবাবুর স্ত্রীকে দেখিতে যাইতাম। সত্য কথা বলিতে কি, বিমলাকে দেখিবার আগ্রহ তত ছিল না ; তাঁহার সেই জীর্ণ শীর্ণ রুগ্নকায়া মলিনবদনা—

---

২৯. নারীও যেন প্রাণমনহীন, বুদ্ধিবিবেকহীন একটা কাঠের পুতুল বিশেষ—পুরুষ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও সে নিজেকে অপমানিতা বোধ করে নাই, আবার ফিরাইয়া লইতে আসিলেও গৌরব অনুভব করে নাই। ত্বস্তিদেব অবশ্যই জানিতেন, এইরূপ নির্ব্বাক "কাঠের পুতুল" গৃহিণীই পুরুষের বাঞ্ছনীয়া !

বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি নার্সটিকেই দেখিতে যাইতাম। তাহার সেই যেন চিরপরিচিত মুখখানি ; অথবা চিনি-চিনি-চিনিতে পারি না মুখখানি আমার কেমন যেন লাগিত। একদিন বিমলা বলিলেন, "হাঁ ভাই, তুমি নার্স নেলীর দিকে অমন করে চেয়ে থাক কেন? "আমি মনোভাব গোপন করিয়া বলিলাম, "ওর ঐ শুক্‌নো মুখখানা দেখে বড় মায়া লাগে।"

বিমলা। হ্যাঁ, ওর বড় দুক্ষু, আমারও বড্ড মায়া করে। কিন্তু উপায় কি? ওকে দু'চার আনা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবার যো নেই। ছ'টাকা মাইনে পায়—খেয়েই পেট ভরে না। প্রথম প্রথম আমি নার্স নেলীকে সিকিটা আধুলিটা দিতুম, কিন্তু পরে জানতে পাল্লুম, সিস্‌টার রিভা সব কেড়ে নিয়ে হাসপাতালের যত চাকর আছে, সব্বাইকে ভাগ করে দেন— হয়ত নেলীর ভাগেও একটা পয়সা কখনও পড়ে। সিস্‌টার রিভার কি অন্যায় দেখ দেখি! যত নোংরা কাজ, সব নেলী করে, অথচ সে একটু ভাল খাবার খেতে পায় না।

আমি। নেলী কি জাতে মেথর?

বিমলা। না, বাঙ্গালী খ্রীষ্টান। শুনেছি, এককালে সেও গেরস্তঘরের বউ ঝী ছিল। পাদ্রীমাগীরা ফুস্‌লিয়ে খ্রীষ্টান করে ওকে ঘরের বার করেছে। তার আগেকার নাম বদলে নেলী নাম রাখা হয়েছে। নেলী বাংলা জানে বলে তাকে আমাদের, অর্থাৎ বাঙ্গালী রোগিণীদের সেবায় রাখা হয়েছে।

মুসলমান মেয়েদের কোয়ার্টারে নেলীকে মোটেই যেতে দেয় না, ভয়, পাছে কেউ তাকে মুসলমান করে ফেলে। আর এক কথা শুনেছ, নেলী নাকি দিব্বি কোরাণ পড়তে পারে।

নেলী কোরাণ শরীফ পাঠ করিতে পারে, শুনিয়া আমার মনে আরও কেমন খট্‌কা লাগিল। না জানি সে কোন মুসলমান কুলে কালী দিয়া পতিতা হইয়াছে। হায়! কোরাণ শরীফের এই অবমাননা! খ্রীষ্টান নেলী—মেথরাণী নেলী—যে হস্তে ঘৃণিত রক্ত পূযপরিপূর্ণ বালতি পরিষ্কার করে, সেই হস্তে কোরাণ শরীফ স্পর্শ করে! কার্য্যতঃ নেলী এখানে মেথরের কাজ করে, কিন্তু হাসপাতালের কর্ত্রীগণ তাহাকে নার্সনেলী বলিয়া ডাকেন।

বিমলাকে দেখিবার ছলে হাসপাতালে যাইতাম বটে, কিন্তু একদিনও নেলীর সঙ্গে দু'টি কথা বলিবার সুবিধা পাইতাম না। নেলীও কাজের ছলে আমাদের নিকট যখন তখন আসিত—অথবা দূর হইতে তাহার সুন্দর ডাগর চক্ষু দু'টি আমার দিকেই ন্যস্ত রাখিত। হঠাৎ আমি দেখিতে পাইলে চক্ষু অবনত করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইত। এখন আমার ফিকির হইল, কিরূপে নেলীর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। কালে ভদ্রে সুযোগ পাইয়া নেলীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে কেবল দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। যাহা হউক নেলীকে আমাদের নিকটে পাইবার এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল।

খুকীর অস্ত্র চিকিৎসা করাই স্থির হইল। কিন্তু আমি ত কিছুতেই খুকীকে হাসপাতালে যাইতে দিব না। এজন্য দুলা মিয়াঁর (খুকীর স্বামীর) সঙ্গে আমার অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হইল—তিনি আমাকে হাসপাতালের উপকারিতা বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন ; সমুদয় ন্যায়শাস্ত্র আবৃত্তি করিলেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ হেমবাবুর স্ত্রীর নজীর পেশ করিলেন। কিন্তু হাসপাতাল একবার আমার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাতে আমার প্রাণ পর্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছে। আমার সে দগ্ধ ক্ষত এখনও আরোগ্য হয় নাই। দুলা মিয়াঁকে আর সেসব কথা খুলিয়া বলিলাম না। শেষে আমারই জয় হইল ; "ধন্য স্ত্রীলোকের কুসংস্কার!" বলিয়া দুলা মিয়াঁ অস্ত্র (যুক্তি অস্ত্র) ত্যাগ করিলেন! বাসাতেই অস্ত্র হইবে, ঠিক হইল।

যথাসময় হাসপাতালের বড় ডাক্তার মিস ফলী তাঁহার দলবলসহ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই তিনটা নার্সও ছিল। আমরা সকলে বাঙ্গালী, "হিন্দী কা চিন্দি" বুঝি না, তাই আমাদের ভাষা বুঝাইতে নার্স নেলীকে আসিতে হইয়াছিল। কার্য্যশেষে সকলে চলিয়া গেলেন। কেবল রোগিণীর শুশ্রূষার জন্য দুই জন সেবিকা, নেলী এবং লিজী রহিল।

পরদিন যথাসময় সকলের স্নান আহার এবং খুকীকে ঔষধ পথ্য খাওয়ান শেষ হইলে পর আমি অবসর ও সুযোগ পাইয়া নির্জ্জনে নেলীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "নার্স, তোমার বাড়ী কোথা?" তদুত্তরে সে আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িল—বহু কষ্টে উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া বলিল, "বুবুজান! আমাকে চিনিতে পারেন নাই?"

অ্যাঁ! আমার মাথা ঘুরিয়া গেল! আমি মেজেতে বসিয়া পড়িলাম। হাঁ, চিনিলাম ত! অহো! কি নিষ্ঠুর সত্য—কি দারুণ সত্য আবিষ্কার করিলাম!...নেলী তাহার দুর্দ্দশার দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করিল। ইতিহাসের প্রত্যেকটি অক্ষর অশ্রুবিধৌত ছিল।

২

...পুর গ্রামে আমার পিত্রালয়। পিতামহের মৃত্যুর পর আমার পিতা ও পিতৃব্য পৈতৃক সম্পত্তি সমভাগে ভাগ করিয়া লইলেন। পিতৃব্যের সংসারে (চাকর, চাকরাণী ব্যতীত) মাত্র তিনটি প্রাণী, তিনি তাঁহার ভার্য্যা এবং তাঁহাদের একমাত্র কন্যা নয়ীমা। পিতার সংসারে আমরা পাঁচ ভাই ভগিনীসহ মোট সাত জন। তবু শুনিতাম, চাচাজানের হাতে টাকা নাই। তাঁহার অনেক দেনা আছে, ইত্যাদি।

আমাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল—আমরা পরম সুখে খাইয়া পরিয়া গা-ভরা গহনায় সাজিয়া থাকিতাম! আমাদের এ নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত বাড়ীর তুলনা কোথায়? সাড়ে তিনশত বিঘা লা-খেরাজ জমীর মাঝখানে কেবল আমাদের এই সুবৃহৎ বাটী। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘোর বন, তাহাতে বাঘ, শূকর, শৃগাল—সবই আছে। আমাদের এখানে ঘড়ী নাই, সে জন্য আমাদের কোন কাজ আটকায় না। প্রভাতে আমরা ঘুঘু, "বউ কথা কও", "ও খুকি, ও খুকি", "চোক গেল" প্রভৃতি পাখীর ভৈরবী আলাপে শয্যা ত্যাগ করি। সন্ধ্যাকালে শৃগালের "হুয়া হুয়া ক্যা হুয়া" শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারি, মগরেবের নামাজের সময় হইয়াছে। রাত্রিকালে কুরুয়া পাখীর "কা আক্ কা আক্ কু" ডাক শুনিয়া বুঝিতে পারি, এখন রাত্রি তিনটা। আমাদের শৈশব জীবন পল্লী-গ্রামের নিবিড় অরণ্যে পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছে।

কিছুকাল পরে চাচিজান একমাত্র তিন বৎসরের কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করিলেন। চাচাজান্ চক্ষে আঁধার দেখিতে লাগিলেন। কন্যার প্রতিপালনই তাঁহার প্রধান সমস্যা। আমার মাতা তাঁহাকে আশ্বাস বাক্যে বলিলেন, "তুমি অত ভাবছ কেন? নয়ীমার মা মরেছেন, আমি ত মরি নাই। যে কোলে আমার তিন মেয়ে, জোবেদা, হামিদা, আবেদা মানুষ হয়েছে, সে কোলে কি নয়ীমার জায়গা হবে না?" পিতৃব্য যেন অকূল সাগরে ডুবিতে ডুবিতে কূল পাইলেন। পরদিন তিনি নয়ীমাকে পাঁচজন দাসীসহ আমাদের বাড়ীতে রাখিয়া গেলেন।

নয়ীমা আমাদের সব ভাই বোনের চেয়ে ছোট বলিয়া আমরা তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতাম। আমার পিতা মাতা তাহাকে আমাদের সকলের চেয়ে অধিক ভালবাসিতেন। এইরূপে নয়ীমা রাজকুমারীর মত স্নেহ যত্নে বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল।

পল্লীগ্রামে আমরা উচ্চশিক্ষার ধার ধারিতাম না। সামান্য পড়ালেখা, যাহা আমরা জানিতাম, তাহা নয়ীমাও শিক্ষা করিল। শিকা গাঁথা, কেশী প্রস্তুত করা, সুপারীর ফুল সুপারী কাটা, নারিকেলের চিড়া, জীরা কাটা, সুজনী সেলাই ইত্যাদি যাহা কিছু শিক্ষণীয় ছিল, নয়ীমা সে সমস্তই ক্রমে শিখিয়াছিল। আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মতে মেয়েমানুষের পড়ালেখা শেখার মত অকেজো জিনিস যেন পৃথিবীতে আর নাই।

সাত বৎসর হইতে নয়ীমা আমাদের সঙ্গে আছে। চাচাজানও পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি আপন ভাগের সম্পত্তি সব অপব্যয়ে উড়াইয়া দিয়াছেন ; কেবল নয়ীমার মাতার অলঙ্কারগুলি নষ্ট করেন নাই, তাহা আমার পিতাকে দিয়াছেন।

কিছুদিন হইল আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জামাল আহমদ সাহেব প্রায় আট দশ বৎসর পরে বিদেশ হইতে ট্রান্সফার হইয়া এবং ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পদলাভ করিয়া বাড়ী আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য আমি শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছি ; এবং আরও কতিপয় আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়াছেন। এ সময় আমাদের বাড়ীটা লোকের ভীড়ে বেশ গম্‌গম্‌ করিতেছিল।

একদিন আমরা চারি ভগিনীতে গল্প গুজব করিতেছিলাম এমন সময় ভাইজান তথায় আসিলেন। তিনি আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা লেখাপড়ার চর্চ্চা কর না, এমন আঁধার মন নিয়ে কি করে থাক? হাঁ নয়ীমা ! তুমি কিছু পড়াশুনা কর না?" নয়ীমা উত্তর দিল, "আমি কোরাণ শরীফ খতম করেছি। এখন বড় আপার নিকটে কোরাণ শরীফের তর্জ্জমা আর রাহেনাজাৎ পড়ি।" ভাইজান হাসিয়া বলিলেন, "বাস্‌ এই ! আর কিছু পড় না, একটু বাঙ্গালা, একটু ইংরেজী?"

আমি আমার (১৮ বৎসর বয়সের) জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "ভাইজান ! আপনি বাংলা, ইংরাজী অনেক পড়ে বিলাত গিয়ে, শেষে এতদিন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, না, কালেক্টর হয়েছেন। নয়ীমা ইংরাজী পড়ে কি হবে? কোন্‌ জেলায় কালেক্টরী করতে যাবে?"

ভাই। নয়ীমা ভাল লেখাপড়া শিখলে কালেক্টরের স্ত্রী হতে পারবে। ভাল বর পাবে ; ভাল ঘরে বিয়ে হবে।

আমরা সকলে খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। আমি তখনই ভাইজানের সৃষ্টিছাড়া কথা মাতাকে গিয়া জানাইলাম। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "ভাইজান বলেন, লেখাপড়া শিখলে নয়ীমা কালেক্টরের বউ হবে!" মাতা আমার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "হুঁ—আচ্ছা, তাই হ'বে।"

৩

আমাদের বাড়ীময় ভারী ধূম পড়িয়া গিয়াছে—ভাইজানের সঙ্গে নয়ীমার বিবাহ। আমাদের আনন্দের সীমা নাই— আমাদের খেলার পুতুল নয়ীমা এখন আমাদের বড় ভাবীজান হইবে ! আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠা ভগিনী আবেদার ভারী রাগ, সে কিছুতেই নয়ীমার পা ছুঁইয়া সালাম করিবে না, কারণ নয়ীমা তাহার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। সকলে আবেদাকে ঐ কথা লইয়া ক্ষেপাইয়া পাগল করিয়া তুলিল ! এদিকে ভাইজানও যারপর নাই বিরক্ত,— ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছেন। তিনি বিলাত ফেরা, বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী—তিনি কি একটা দশ

বৎসরের বালিকা বিবাহ করিয়া দেশ হাসাইবেন? তিনি বঙ্গের সভ্য সমাজে কিরূপে মুখ দেখাইবেন? তিনি আমাকেই সব দোষ দেন যে "জোবেদাই সব নষ্টের গোড়া! আমি সেদিন তাচ্ছিল্য ভাবে কি একটা কথা বলেছি, তাই ও গিয়ে মাকে লাগিয়েছে। তারপর এই মহাবিভ্রাট!"

ভাইজান রাগ করুন, আর যাহাই করুন, তাঁহার একটা মস্ত গুণ এই যে তিনি পিতামাতা এবং অপর আত্মীয়-স্বজনের কথার অবাধ্য ছিলেন না। মাতার দু'টি মিষ্ট কথা, পিতার উপদেশ তাঁহাকে সহজেই সম্মত করিয়া ফেলিল। মা বলিলেন, এই পিতৃ মাতৃহীনা বালিকাকে তিনি বড় যত্নে মানুষ করিয়াছেন, তাহাকে পরের ঘরে যাইতে দিবেন না, ইত্যাদি। ভাইজান আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। নিরীহ সুবোধ বালকটির মত বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইলেন!

আমাদের দূরসম্পর্কীয়া এক ভাবী সাহেবা ভাইজানকে শুনাইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি লো, বিলাতফেরা সাহেবকে মেহদী উবটন লাগান হবে না?" ভাইজান রুদ্ধ ক্রোধে বলিলেন, "যা আপনার মরজী! আমি উবটন বা তার চেয়ে জঘন্য কিছু মাখলে যদি আপনি সন্তুষ্ট হন, তবে আমার আপত্তি নাই। আমি ত নীরবে মাথা পেতে দিয়েছি—যত ইচ্ছা অত্যাচার করুন!"

আমি তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে মেহদী বাটিয়া আনিয়া তাঁহার দুই হাত ভরিয়া লাগাইয়া দিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল না, ভাইয়ের হাতে অধিকক্ষণ মেহদী রাখা, কিন্তু আমি কার্য্যান্তরে গিয়া সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বেচারা ভাইজান তখনও হাত দুইটি ইজি চেয়ারের দুই বাহুতে রাখিয়া উদাসীনভাবে বসিয়া আছেন। আমি তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাঁহার হাত ধুইতে বসিলাম। লাল টকটকে হাত দেখিয়া ভাইজান ত রাগিয়া অস্থির! তিনি অনেক বিদ্যালাভ করিয়াছেন, এবং উদ্ভিদ তত্ত্ব (Botany) পাঠ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মেহদীর মাহাত্ম্য জানিতেন না! তিনি আমার হাত হইতে সবেগে হাত ছাড়াইয়া লইয়া তখনই স্বীয় স্নানাগারে গিয়া অনেকটা সাবান ও স্পঞ্জের সদ্ব্যবহার করিলেন। কিন্তু মেহদী ত নাছার বান্দা!

৪

... নগরের জানানা হাসপাতালে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা দুই মাস হইতে আছেন। তাঁহার ছয় মাসের শিশু পুত্র জাফরও সঙ্গে আছে। এখানে তাঁহার আদর যত্নের সীমা নাই। হাসপাতালের বড় ছোট লেডী ডাক্তার ও সেবিকাগণ পালাক্রমে সর্ব্বদা তাঁহার সেবায় নিযুক্তা থাকে। এক কথায়, তিনি এখানে রাজভোগে আছেন। তাঁহার স্বামী ও দেবর প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিতে আসতেন। তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা জমীলাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার শ্বশ্রূ মহোদয়াও সময় সময় তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। রোগিনী আমার ভ্রাতৃবধূ নয়ীমা।

আমার মাতা নয়ীমাকে হাসপাতালে পাঠাইতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু ক্রমে যখন তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন অগত্যা ভাইজান মাকে বলিলেন, "মা! আমি এ পর্য্যন্ত কদাচ তোমার কথার অবাধ্য হই নাই; এখন একজনের জীবন-মরণ হাসপাতালের চিকিৎসার উপর নির্ভর করিতেছে, এ সময় আর বাধা দিও না। আজ তোমার কথা রাখিতে

পারিব না।" ভাইজান এই এক দিন মাতৃ উপদেশ লঙ্ঘন করার জন্য আজীবন অনুতাপ করিয়াছেন।

অপর কক্ষে কতিপয় মিশনরী রমণী গল্প ও হাস্য পরিহাস করিতেছেন। একজন বলিলেন, "এই বার দেখিব। পোড়া সমালোচকেরা আর বলিতে পারিবে না যে আমরা কেবল দুর্ভিক্ষ পীড়িত অন্নক্লিষ্ট পথের কাঙ্গাল ধরিয়া কনভার্ট করি!"

দ্বিতীয়া রমণী। এমন শিকার পাইলে কলিকাতার বিশপ বাহাদুরও কৃতার্থ হইতেন!

তৃতীয়া। ঈশ্! ভারী ত তোমাদের বাহাদুরী—একটা ১৯ বৎসরের বালিকা (হোক না সে দুই ছেলের মা, আমি তাকে বালিকাই বলি) ভুলাইয়া খ্রীষ্টান করা কোন বড় শক্ত কথা!

১মা। শক্ত কথা না হউক, কিন্তু...কাঁপিয়া উঠিবে—এমনকি সমুদয় বঙ্গদেশ তোলপাড় হইবে। একজন কালেক্টরের স্ত্রীকে হাত করা কি সহজ ব্যাপার?

২য়া। সন্ধ্যা হইল, এখন চল নয়ীমা বিবির কামরায় আজ আমি ভজন গাহিব। তিনি আরও একমাস হাসপাতালে থাকিবেন। সুতরাং আমাদের যথেষ্ট সময় আছে।

দুই চারিজন মিশনরী ললনা সর্ব্বদা নয়ীমার নিকট আসা যাওয়া করিতেন। রোগী দেখা এবং রোগীর সেবাই তাঁহাদের পরম ধর্ম্ম। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ অমায়িক ভালবাসায় নয়ীমা মোহিত হইয়াছেন! তাঁহারা সন্ধ্যার সময় ভজন গাহিয়া যীশুর অপার মহিমা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে অনন্ত নরক হইতে রক্ষা পাইবার পথ প্রদর্শন করিতেন। নয়ীমা নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস কিছুই জানেন না—তাঁহার নির্ম্মল অন্তরে যীশু মহিমার গভীর রেখা অঙ্কিত হইল। তিনি ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর কলুষিত হইতে আরম্ভ করিল। যে কখনও আলোক দেখে নাই, তাঁহার নিকট জোনাকীর আলোই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোধ হয়। নয়ীমার দশাও সেইরূপ।

৫

তিন মাস পরে নয়ীমা—না, আমার ভাবীজান হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এখন তাঁহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তিনি আর সে প্রিয়ভাষিণী মধুরহাসিনী নয়ীমা নহেন। তিনি কাহারও সহিত ভাল মুখে কথা কহেন না। ইহাতে সকলে ভাবিলেন যে দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া তাঁহার মেজাজ খিট্‌খিটে হইয়াছে। ভাইজান তাঁহাকে মাতার সহিত দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, পল্লীগ্রামের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে নয়ীমার চিত্ত স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। তিনি হাসপাতালের সঙ্গিনীদের অদ্যাপি ভুলিতে পারেন নাই; জঙ্গলা বাতাস আর তাঁহার ভাল লাগে না।

নয়ীমা একদিন শাশুড়ীর নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিলেন যে তাঁহাকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় নাই কেন? তাঁহাদের কিসের অভাব ছিল, কি বাধা ছিল? তিনি অবাক হইয়া বধূর মুখ দেখিতে লাগিলেন। পরে সহাস্যে বলিলেন, "পাগলের মেয়ে বলে কি?"

নয়ীমা। বলি, আমার মাথা আর মুণ্ডু! আমাকে একটা আস্ত জানোয়ার করে রেখেছেন। এক অক্ষর পড়ালেখা শিখান নাই যে, আজ ভদ্রসমাজে বসবার উপর্যুক্ত হতেম। উনি আমায় লেখাপড়া শেখাতে বললেন, আপনি তা শুনে সাত তাড়াতাড়ি আমায় বিয়ের পাশে বাঁধলেন!

মা। তুমি ত বাছা এমন মুখরা ছিলে না ! এসব কথা তুমি কোথায় শিখলে ? তোমায় তিন বছর বয়স থেকে মানুষ করলুম। এত যত্নের ধন তুমি—তোমাকে পরের হাতে না দিয়ে নিজের ঘরে রেখেছি। তারই নাম কি বেঁধে ফেলা ?

না। মুর্খ লোকেরা শিক্ষা মর্ম্ম কি বুঝবে ? তাই আপনারা সেটা আবশ্যক বোধ করেন নি। বুঝেছিলেন কেবল বিয়ে।

মা। বাছা ! এখন নিজের মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে, এলে বিয়ে (এল,এ,বি,এ,) পাশ করিয়ে কেমন মেম সাহেব সাজাও দেখব ! আমি পড়ালেখা শেখা মন্দ বলছি না ; কিন্তু আমরা পাড়াগাঁয়ে থেকে সুবিধা করতে পারিনি। মেয়েদের জন্য স্কুল নেই, মক্তব নেই, পাঠশালা নেই। ঘরে পড়াবার জন্যও ভাল শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায় না। এখন তোমরা সহরে বেড়িয়ে যদি পড়া লেখার সুবিধা করতে পার, ভাল।

তাহাই হইল। দেশে স্ত্রীশিক্ষার সুবন্দোবস্ত না থাকায়—আর যদিও বা মরুভূমে ওয়েসিসের ন্যায় দুই একটি উপযুক্ত মুসলমান বালিকা বিদ্যালয় আছে, তাহাতে ত "শরীফ"গণ কন্যা পাঠাইবেন না। বিশেষতঃ মফঃস্বলবাসিগণ কি করিবেন ? সুতরাং জমিলার জন্য পালাক্রমে কতকগুলি মিশনরী রমণী নিযুক্তা হইলেন। তাঁহারা নিজের নিয়ম অনুসারে প্রথমে বাইবেল হইতে গল্প বলিয়া পরে অন্য কাজ আরম্ভ করিতেন।

ইহাতেও ভাল সুবিধা হইল না। শেষে একজন ইউরোপীয়ান গবর্নেস নিযুক্তা হইলেন। তিনি ধীরে ধীরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া একাধারে আমার ভাবীজানের সঙ্গিনী (Companion) , জমিলার শিক্ষয়িত্রী এবং এ সংসারের গৃহিণী হইলেন। এখন মিস লরেন্স এ বাড়ীতে সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি মিষ্ট কথায় বাড়ী শুদ্ধ সকলকে একরূপ ভুলাইয়া রাখিয়াছেন।

৬

বড় ধূম পড়িয়া গিয়াছে। অদ্য ... নগরের আদালত গৃহ লোকারণ্য। ... পরগণায় যত লোক ছিল— তাহারা প্রায় সকলেই উপস্থিত। ব্যাপার কি ? ব্যাপার ?—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জামাল আহম্মদের স্ত্রী মোসাম্মাৎ নয়ীমা খাতুন প্রায় ২৫,০০০৲ টাকার অলঙ্কার এবং নগদ ১৭,০০০৲ টাকা লইয়া লালকুঠি মিশন হাউসে পলাইয়া গিয়াছেন। এক মাস যাবৎ এই জটিল মোকদ্দমা চলিতেছে। উভয় পক্ষেই বড় বড় ব্যারিষ্টার নিযুক্ত আছেন। নয়ীমা পাল্কী করিয়া এজলাসে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য বিচারকের রায় প্রকাশ হইবে।

সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ উপস্থিত হইয়াছেন, এমন লোমহর্ষণ সংবাদ প্রকাশ করিলে তাঁহাদের পত্রিকা অতিশয় লোকরঞ্জন হইবে।

একদল লোক আসিয়াছে তামাসা দেখিয়া হাততালি দিতে। কেহ আসিয়াছে বিদ্রূপ ব্যঙ্গ করিতে। কেহ এই অবসরে খানিকটা স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে বক্তৃতা ঝাড়িয়া লইলেন। কেহ স্ত্রী শিক্ষার কুৎসা গাহিলেন। কেহ কাটাঘায়ে লবণের ছিটা দিয়া বিলাতফেরা মিঃ জামাল আহম্মদকে, তাঁহার কন্যা সুশিক্ষা—উচ্চশিক্ষার চরমে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মোবারকবাদ দিলেন।

কেহ বাস্তবিক দুঃখিত হইয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছেন। কেহ সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন।

কেহ কেহ আপন চিন্তায় শঙ্কিত হইয়াছেন যে এরকম হইলে ত ঘরে বউ ঝী রক্ষা করা দায় ! আজ এত বড় কালেক্‌টর সাহেবের বিবি মিশনরীদের কথায় ঘরের বাহির হইলেন, তবে আমাদের ত কথাই নাই।

নয়ীমা নিজ মুখে বলিলেন যে তিনি স্ব-ইচ্ছায় খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহত্যাগ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কারণ তাঁহার শাশুড়ী ও স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁহার বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু গৃহে যথাবিধি দীক্ষিতা হইবার সুবিধা ছিল না বলিয়া মিশন হাউসে আসিয়াছেন। তিনি কেবল ধর্ম্মের জন্য—একমাত্র যীশুর জন্য স্বামী, কন্যা, পুত্র, গৃহ—এককথায় সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বিচারক একরূপ রফা করিতে চাহিয়াছিলেন যে এখন ত দীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে তবে আপনি বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু মিস লরেন্স সাধারণতঃ অন্তঃপুরের দুর্দ্দশা এবং বিশেষতঃ নয়ীমার অন্তঃপুরের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিলেন ! তিনি দশ বৎসর যাবত বিহার ও কলিকাতার বিভিন্ন অন্তঃপুরে যাতায়াত করিয়া অন্তঃপুর রহস্য সবিশেষ অবগত হইয়াছেন।

শেষ নিষ্পত্তি এই হইল যে, টাকা ও অলঙ্কার যাহা নয়ীমা সঙ্গে আনিয়াছেন, তাহা তাঁহারই থাকিবে ; আর পুত্র ও কন্যা পিতার নিকট থাকিবে। নয়ীমা পুত্র লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই।

৭

নয়ীমা এখন লাল কুঠিতে মিশনরী রমণীদের সঙ্গে আছেন। তাঁহার আদর যত্নের সীমা নাই। মাথায় রাখিলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখিলে পিপীড়ায় খায়—এ হেন আমেদ মেম সাহেবাকে তাহারা রাখিবে কোথায়? উনিশ বৎসরের বালিকার এই ধর্ম্মানুরাগ, এ মহান আত্মত্যাগ, কম প্রশংসার বিষয়? ইনি মিশন হাউসে আদর্শ রমণী। সকলের মাথার মুকুট, কণ্ঠের মণি—এই আমেদ মেম সাহেবা ! অত্যধিক প্রশংসা ও তোষামদে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমেদ মেম সাহেবা এত পূজা পাইয়াও এমন বিমর্ষ কেন?

যীশুর জন্য যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ততক্ষণই সুখকর বোধ হইতেছিল, যতক্ষণ সোণার সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই। ক্রমে যখন মোকদ্দমার গতি কুপথে চলিল, যখন স্বামী ও সন্তানদের সহিত ইহজীবনে দেখা হওয়ার আশার শেষ স্ফুলিঙ্গটুকু নিবিয়া গেল, তখনই নয়ীমার প্রফুল্লতা তিরোহিত হইল। বিচারালয় হইতে বিজয় গর্ব্বে ফিরিবার সময় হইতেই তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পাল্কী হইতে নামিয়াই নয়ীমা মূর্চ্ছিতা হইলেন ; মিশনরী ভগিনীগণ "ভারি গরম !" বলিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। হাঁ, গরম বটে, এ যে প্রাণ পোড়ার গরমী !

জ্ঞান হওয়া মাত্র নয়ীমা তওবা করিলেন ; বারম্বার প্রাণ ভরিয়া কলেমা পড়িলেন ; আল্লাহ্‌কে ডাকিতে লাগিলেন ! কিন্তু এখন এসব বৃথা ! গভীর রজনীতে মনে করিতেন, পলাইয়া যাই—যাই স্বামীর পা জড়াইয়া ধরি গিয়া ! কিন্তু পথ যে চিনেন না। লাল কুঠি হইতে কলেক্টর সাহেবের কুঠি কত দূর? কোন দিকে? কে পথ বলিয়া দিবে? হায় হায় ! কেউ না !

শেষে নয়ীমাকে এক মুষ্টি অন্নদান করাও তাঁহাদের পক্ষে ভার বোধ হইতে লাগিল। এখানে সকলেই খাটিয়া খায়, বাড়ী বাড়ী পড়াইতে যায়, প্রচার করিতে যায়। কেবল নয়ীমা বসিয়া খাইবে কেন? শেষে তাঁহারা নয়ীমাকে হাসপাতালে নার্সগিরী করিতে দিলেন। কিন্তু এই বঙ্গদেশে তাঁহাকে রাখা নিরাপদ নহে ভাবিয়া নয়ীমাকে বহুদূরে, লক্ষ্ণৌ পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

নয়ীমা তাঁহার কোরাণ শরীফখানি সঙ্গে আনিয়াছিলেন যে অকাট্য যুক্তি দ্বারা তাহার প্রত্যেকটি আয়েৎ খণ্ডন করিয়া জগৎকে দেখাইবেন, মুসলমান ধর্ম্ম কেমন অসার ; অন্ধ বিশ্বাসীর ধর্ম্ম। তাঁহার সেসব কল্পনা যাহান্নমে গিয়াছে। এখন সেই কোরাণ শরীফখানি তাঁহার একমাত্র দুঃখের সঙ্গী! সকলে শয়ন করিলে পর গভীর নিশীথে উঠিয়া তিনি ওজু করিয়া অতি যত্নে কোরাণ শরীফ লইয়া বসেন। পাঠ করিবেন কি, দরবিগলিত অশ্রুধারায় ভিজিয়া যায় বলিয়া প্রতি পত্রে সাদা ব্লটিং কাগজ রাখিয়াছেন। অনুতাপে দগ্ধ হইলে রোদনে এত শান্তি পাওয়া যায়, সুখের ক্রোড়ে পালিতা নয়ীমা এতদিন তাহা জানিতেন না।

স্বামীর চিন্তা এখন নয়ীমার জীবনের সার হইয়াছে। পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, পতি জপমালা হইয়াছে। এয়া আল্লাহ! আর একবার —মাত্র একটিবার অভাগিনীকে স্বামীর চরণে পৌঁছাইয়া দাও! তুমি সর্ব্বশক্তিমান, সব করিতে পার! পার না কেবল এইটুকু? এখনও তওবার দ্বার রুদ্ধ হয় নাই, নয়ীমার তওবা গ্রহণ কর, প্রভু গফুরর রহিম!

লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে আসিয়া নয়ীমা নার্স নেলী হইয়াছেন। দিবা ভাগে রোগিসেবা করিতে হয়, নামাজ ও কোরাণ শরীফ পাঠের সুবিধা হয় না। সঙ্গে থাকে কেবল অনিবার অশ্রুধারা। প্রথম প্রথম অন্যান্য নার্স, এমনকি লেডী ডাক্তারেরাও তাঁহাকে নানা প্রকার আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহার দীন দুনিয়া—ইহকাল পরকাল —দুই-ই রসাতলে গিয়াছে; যে স্বয়ং সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য মেথরাণী সাজিয়াছে; যে স্বহস্তে সোনার নীড়ে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, তাহার সান্ত্বনা কোথায়? অতঃপর আর কেহ নেলীকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করে নাই।

এইরূপে সুদীর্ঘ সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। এই সাত বৎসরের সাতবার চৌরাশী মাসের দুই হাজার পাঁচশত পঞ্চান্ন দিবসের একটী দিনও নেলীর বিনা ক্রন্দনে অতিবাহিত হয় নাই। তিনি কোনমতে স্বীয় অস্থিচর্ম্মসার দেহখানিকে বহন করিয়া জীবনের দিন গণনা করিতেন, রজনীর প্রতীক্ষায় কোনরূপে দিবা অতিক্রম করিতেন। রাত্রিকালে নামাজ ও কোরাণ শরীফ পাঠের সুবিধা হইবে, তাহাই যাহা কিছু সান্ত্বনা। কিন্তু যে দিন রাত্রির কাজ (Night duty) থাকিত, সেদিন নেলীর ভাগ্যে নামাজের সুখটুকুও ঘটিত না। সোবহান্ আল্লাহ! রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়ায় অশ্রুপ্লাবনে সেজ্‌দার স্থান ভিজাইয়া দেওয়ায় এত শান্তি লাভ হয়!

নেলীর ঐরূপ কঙ্কালসার দেহখানি দেখিয়া প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারি নাই। সে যখন বলিল, "বুবুজান! আমাকে চিনিতে পারেন নাই?" তখন আর কোন সংশয় রহিল না। আমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুত প্রবাহ ছুটিয়া গেল! আমি তাই মেজেতে বসিয়া পড়িলাম। যে আমার মাতৃক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই পিতৃব্যজাতা ভগিনীকে চিনিব না? তাই ত কোরাণ শরীফ পাঠ করিতে পারে,—এমন বাঙ্গালী খ্রীষ্টান ভূ-ভারতে কয়টা আছে? কিন্তু হায়!

নন্দন কাননের পারিজাত নয়ীমাকে নরকের কীট নেলী রূপে কে দেখিতে চাহিয়াছিল? যে নয়ীমা শৈশবে পাঁচজন দাসী সহ আমাদের বাড়ী আসিয়াছিল, সে আজ পরের সেবাদাসী!

"হায়রে নিয়তি! তুমি কত খেলা খেল,
সুখের শিখরে নিয়া দুঃখ কূপে ফেল!"

৮

নেলীর ইতিহাস শ্রবণকালে আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। বারম্বার মনকে বুঝাইতেছিলাম যে নয়ীমা স্বকৃত পাপের ফল ভোগ করিতেছে—ইহা ত তাহার ন্যায্য প্রাপ্য, তাহাতে আমার দুঃখিত হইবার কারণ কি? কিন্তু নেলীর আত্মগ্লানিপূর্ণ মর্ম্মন্তুদ ভাষায় পাষাণ শতধা হইত, মানুষ কোন ছার?

নেলী আত্মকাহিনী সমাপ্ত করিয়া কিঞ্চিৎ বিরামের পর তাঁহার স্বামী ও পুত্রকন্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অতি সংক্ষেপে যথাসম্ভব সংযত ভাষায় সমস্ত অবস্থা বলিলাম। বলিলাম : যে দিন ভাইজান মোকদ্দমা হারিয়া বিচারালয় হইতে অধোমুখে গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন, তখনই "হায় নয়ীমা!" বলিয়া মাতা শয্যাগ্রহণ করিলেন। তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণাব্যঞ্জক হা-হুতাশ ও দীর্ঘনিশ্বাসের বুলি ছিল, "হায় নয়ীমা!" ভাইজান পুরুষ মানুষ, কোন প্রকার বাহ্যিক কাতরতা প্রকাশ করিতেন না; তিনি ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় নীরবে সে অপমান, লজ্জা, ক্রোধ, খেদ রুদ্ধ নিশ্বাসে সহ্য করিতে লাগিলেন।

মাস দুই পরে মা দেহত্যাগ করিলেন। ইহার অল্প দিন পরেই অভাগিনী জমিলার জ্বর হইল। পিতার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া সে তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করিত না। তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন, "দাদী আম্মা"। তাঁহাকে হারাইয়া মাতৃহীনা বালিকা একেবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

জ্বরের বিকারে জমিলা "মা" "মা" বলিয়া প্রলাপ বকিত। কাঁদিয়া বলিত "মা! তুই আবার হাসপাতালে গেলি কেন? আয় ফিরে আয়! জাফর তোর জন্য বড় কাঁদে! আয় মা! দাদী আম্মাও নাই!" জমিলা অধিক দিন কষ্ট পায় নাই; মৃত্যু তাহাকে শান্তিক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছে।

পক্ষকাল মধ্যে মাতা ও কন্যাকে হারাইয়া ভাইজান শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সহ্যগুণেরও সীমা আছে। বেচারা জাফরেরও কান্না বাড়িয়া গেল। ভাইজান তাহাকে সর্ব্বদা চ'খে চ'খে রাখিতেন; কিন্তু মাত্র এক বৎসরের শিশু মাতৃহারা হইয়া আর কত দিন সুস্থ থাকিবে? এক মাসের মধ্যে সেও ইহধাম ত্যাগ করিল।

ভাইজান অদ্যাবধি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার সোণার সংসার সম্পূর্ণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তাঁহার "আছে" বলিতে একমাত্র ভগিনী আমিই আছি। নয়ীমা! একবার মানসচক্ষে তোমার নিজ হাতে গড়া সেই গোরস্থানের প্রতি—তোমার শ্মশানবাসী স্বামীর প্রতি চাহিয়া দেখ ত!" আমার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে মূর্চ্ছিতা নয়ীমা ভূপতিত হইল।

আমি নেলীর চখে মুখে একটু জলের ছিটা দিব মনে করিতেছি, এমন সময় দুলামিঞা আমার কক্ষদ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বয়োপ্রাপ্তা কন্যা সিদ্দিকা দৌড়িয়া আসিল। তাহাদের সম্মুখে আর আমি নেলীকে স্পর্শ করিতে সাহস পাইলাম না ! সিদ্দিকা আমার হাত ধরিয়া তাহার মাতার নিকট লইয়া গেল।

৯

খোদার ফজলে খুকী আরোগ্যলাভ করিলে পরে আমরা দেশে ফিরিলাম। ফিরিবার পূর্ব্বে পশ্চিমের আরও কয়েকটি নগর, বিশেষতঃ দিল্লী, আগ্রা ও লাহোর ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। লাহোরে আনারকলির সমাধিমন্দির দর্শনে একদিকে প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট আকবরের প্রভূত ক্ষমতা, অন্যদিকে যুবরাজ সেলিমের অনাবিল প্রেম— উভয় চিত্র যেন মানসনয়নে প্রত্যক্ষ করিলাম।[১]

আগ্রায় তাজমহল দেখিয়া আরও একটি কথা মনে উদয় হইল। নারীদ্বেষী পুরুষগণ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যতই দীর্ঘ-বক্তৃতা ঝাড়ুন না কেন, সত্যের জয় অনিবার্য্য।শিক্ষা— স্ত্রীলোক ও পুরুষ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়। স্থলবিশেষে অগ্নি গৃহদাহ করে বলিয়া কি কোন গৃহস্থ অগ্নি বর্জ্জন করিতে পারে ?

তাজমহল সৌধটি জগদ্বিখ্যাত ; পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য বস্তুর অন্যতম আশ্চর্য্য। তাজমহলের নাম না জানে এমন লোক এ ধরাতলে অতি অল্প। কিন্তু ভুবনবিখ্যাত তাজমহলের অভ্যন্তরে যিনি সমাহিতা আছেন, সে মমতাজমহলকে কয় জনে চিনে ? ঐ অমন নয়নরঞ্জন মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত অনিন্দ্যসুন্দর তাজমহলও তৎগর্ভস্থা মহিষীকে চিরস্মরণীয়া করিতে পারে নাই। আর নূরজাহাঁ বেগম ? তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য কণামাত্র আয়োজন করা হয় নাই। তাঁহার নগণ্য সামান্য সমাধিমন্দির লাহোরের অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র অজ্ঞাত স্থান শাহতারায় বনাবৃত অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। অনেকে সে কবরস্থানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানে না। কিন্তু নূরজাহাঁ বেগম চিরস্মরণীয়া হইয়া আছেন। সে কি বস্তু, যাহা নূরজাহাঁকে অমর করিয়াছে? ঐ শিক্ষা। সুশিক্ষার প্রসাদে জগজ্জ্যোতিঃ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। খোদা না খাস্তা ভূমিকম্পে কিম্বা কোন প্রবল শত্রুর কামানে তাজমহল ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু নূরজাহাঁ বেগমের স্মৃতির মৃত্যু নাই !

যাক, আমার ধান ভানিতে শিবের গানে প্রয়োজন নাই। গৃহ প্রত্যাগমন করিয়াও আমি নেলীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তুলিতে পারি নাই। তিনি আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, ভাইজানকে অনুরোধ করিয়া যেন আমি তাঁহাকে বাড়ী আনাই। তিনি এখন পতিগৃহে সামান্যা চাকরাণী কিম্বা অধমতমা মেথরাণীরূপে জীবনের অবশিষ্ট সময় যাপন করিতে চাহেন। অত্যধিক রোদনে তাঁহার ক্ষয়কাশ হইয়াছে, অভাগিনী আর অধিক দিন বাঁচিবে না। পূজার ছুটিতে আমি পিতৃগৃহে—না, এখন ত পিতা নাই,—সুতরাং ভ্রাতৃগৃহে গেলাম।

---

১ যুবরাজ সেলিমের প্রণয়িনী আনারকলি সম্রাট আকবরের আদেশে জীবন্তে সমাহিতা হইয়াছেন।

একদিন ভাইজানকে একটু প্রফুল্ল দেখিয়া সেই সুযোগে তাঁহার পায়ের নিকট বসিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, "ভাইজান! তোমার পা টিপে দি?" তিনি প্রসন্নবদনে বলিলেন, "আচ্ছা। কিছু মতলব আছে নাকি?" আবার সেই সুখের শৈশব মনে পড়িল। বাল্যকালে ভাইজানের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে তাঁহার পায়ের তলা টিপিয়া দিতাম, পায়ের আঙ্গুল ধরিয়া টানিতাম। তাই আজও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু মতলব আছে নাকি? আমি বহুকষ্টে যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় আমার মতলব প্রকাশ করিলাম। নয়ীমার প্রাণপোড়া রামকাহিনী বিবৃত করিয়া বলিলাম, "অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া প্রতিপ্রাণা নয়ীমা এখন অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় পবিত্রা হইয়াছেন।" সমুদয় শ্রবণান্তে ভাইজান বলিলেন;—

"তাহা হইলে নয়ীমাকে দেখিবার আশা করিতে পারি? তাহাকে জীবনে আর একটিবার দেখিব বলিয়া আমিও এখন পর্য্যন্ত মরি নাই। আমার সব মনে আছে— এ দীর্ঘ সাড়ে সাত বৎসরে কিছুই ভুলি নাই। মনে আছে—যেদিন 'হায় নয়ীমা' বলিয়া জননী শয্যাগ্রহণ করিয়া আর উঠেন নাই! মনে আছে— জমিলা আমার বুকে মুখ লুকাইয়া তাহার মাতার জন্য কাঁদিত। আমার সম্মুখে তাহার নাম উল্লেখ করিতে সাহস পাইত না—দুঃখিনী বালিকা অব্যক্ত যন্ত্রণায় এটা ওটা ছুতা ধরিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিত! শেষে আমারই কোলে তাহার মাতা সম্বন্ধে প্রলাপ বকিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। আরও মনে আছে— জাফর, আমার অন্ধের যষ্টি জাফর, আমার জীবনের শেষ অবলম্বন জাফর যেদিন আমার বুকে মাথা রাখিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে! আমার বক্ষ না হইলে সে ঘুমাইত না— শেষ নিদ্রার সময়ও সে আমারই বুকে লুটাইয়া পড়ে!

"এতখানি লাঞ্ছনার পরেও যে বেহায়া জীবনযাপন করিতেছি, তাহা কেবল নয়ীমাকে আর একবার দেখিব বলিয়া! চাকুরি ছাড়িলে কর্ম্মহীন জীবনের স্মৃতি আমাকে পাইয়া বসিত।— অচিরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় হয়ত এতদিন মরিয়া যাইতাম। যে দিন জাফর প্রাণত্যাগ করিল, সেই দিন এই পিস্তলে গুলি পুরিয়াছিলাম, আত্মহত্যা করিব বলিয়া—"

ভাইজান বুকের পকেট হইতে একটি ছয়নলী পিস্তল বাহির করিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন। তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন :

"কিন্তু আত্মহত্যা করি নাই। এই যে স্মৃতির বৃশ্চিক দংশন সহ্য করিয়া, এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিয়া বাঁচিয়া আছি কেবল জীবনে আর একবার নয়ীমাকে দেখিবার আশায়—"

আমি কিঞ্চিৎ উৎসাহে ও আশায় ভাইজানের মুখের দিকে চাহিলাম। ভাবিলাম, বুঝি অভাগিনী নেলীর কপাল ফিরিল—বুঝি সে আবার স্বামীপদে আশ্রয় লাভ করিবে। কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি হতাশ হইলাম। তাঁহার মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর; চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে! দৃঢ়মুষ্টিতে পিস্তলটি ধরিয়া বলিলেন,—

"কোনরূপে নয়ীমাকে একবার আমার সম্মুখে আনিতে পার? তাহা হইলে তাহার সঙ্গে আমার জীবনের শেষ দেনা-পাওনা শোধ করিয়া লইব! আমার জীবনের এই শেষ আকাঙ্ক্ষা, জোবেদা! আর কিছু চাহি না। নয়ীমাকে—না, হাঁ, কি বলিলে, সে এখন 'নেলী' হইয়াছে?— বেশ, তবে সেই নেলীকে এই পিস্তলে গুলি করিয়া হত্যা করিব! একটি একটি করিয়া এই ছয় গুলি ছুড়িয়া নেলীকে হত্যা করিয়া আমি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিব!! কিন্তু না, ওঃ! তাহা ত হইবে না! নয়ীমা যে তওবা করিয়া পুনরায় মুসলমান হইয়াছে; তবে ত অবধ্য। মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে নাই।" এই বলিয়া তিনি পিস্তলটি ভূতলে রাখিলেন।

ঠিক এই সময় তাঁহার বালক ভৃত্য একটি আর্জেন্ট টেলিগ্রাম আনিয়া দিল। ভাইজান পাঠ করিলেন ;

লক্ষ্ণৌ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ লিখিয়াছেন, "কবর প্রস্তুত রাখ, নার্স নেলীর শবদেহ প্রেরিত হইল।"

শিশু-পালন[২]

উপস্থিত ভদ্রমহিলাগণ !

চোখের উপর নিত্য যে মহামারী বিশেষতঃ শিশুহত্যা দেখতে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা আবশ্যক মনে করি। ভাবিবার বিষয় :—গত বৎসর কেবল বাংলাদেশে ষোল লক্ষ, একচল্লিশ হাজার, একশত এগার জন লোক মারা গেছে—তার মধ্যে দশ বছরের কম বয়সের ছেলে মেয়ে ছয় লক্ষ, চব্বিশ হাজার, সাত শ' পঞ্চান্ন জন ছিল। ঐ সোয়া ছয় লক্ষ ছেলের মধ্যে এক বছরের কম বয়সের শিশু দুই লক্ষ আটাত্তর হাজার তিন শ' সত্তর জন ছিল। ফল কথা, সাড়ে ষোল লক্ষ লোকের তিন ভাগের একভাগ ছেলেমেয়ে ছিল। ছেলে মেয়ে নিয়েই ত ভবিষ্যৎ—তারা যদি এমন হুহু করে মরে যাবে, তবে আমাদের আর থাকবে কি? আর সব জায়গার বিষয় ছেড়ে শুধু কলিকাতায় দেখছি গত বৎসর ৬০০০ অর্থাৎ দৈনিক ১৬ জন করে আঁতুড়ে শিশু মারা গেছে। যদি যত্ন করা যেত তা হলে রোজ ১৪ জন করে ছেলে বাঁচান যে'তে পারত। ২৫ বৎসর আগে এই সহরে যত ছেলে জন্মাত তার শতকরা ৫০ জন শিশু এক বৎসরের মধ্যেই মারা যেত। ১৮৯৫ সনে শতকরা ৪৮ জন ছেলে মরেছে। তারপর সহরের জলবায়ুর কিছু উন্নতি হয়ে ১৯০০ সনে শতকরা ৪৪ জন করে মরেছে। আর গত বছর শতকরা ৩০/৪০ জন করে মরেছে। তার মধ্যে রোজ ১৪ জন করে শিশু কেবল মা ও ধাইয়ের অযত্নে বলি দেওয়া হয়েছে। অযত্নে ছেলে মারা হয়েছ, এর অর্থ এই যে পোয়াতিরা ঠিক মত যত্ন করতে জানে না। কারণ যাই হউক, এ রকম শিশু হত্যা ত সহজ নয়, এর প্রতিকার করতে হবে।

আমাদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাচ্ছে যে পুরাকালে আমাদের অতিবৃদ্ধা ঠাকু'মা, দিদিমারা যা করেছেন, সে সব ব্যবস্থা মন্দ ছিল, —তার কিছুই ভাল নয়। সেই জন্য তার উল্টো করতে হবে। একটু পরিষ্কার করে বলি, ধরুন, যেমন দিদিমার আমলে হিন্দু পোয়াতিকে ৯ দিন থেকে ২১ দিন আর মুসলমান পোয়াতিকে ৪০ দিন আঁতুড় ঘরে বন্ধ থাকতে হতো, এখন তার উল্টো করতে গিয়ে দুই দিনের পোয়াতি (প্রসূতি) মোটর গাড়ীতে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বেরোবে বা সংসারের কাজ কর্ম্মে হাত দিবে ; আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বোকা ছিলেন না ; তাঁহারা যা ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটা নিখুঁৎ ছিল, তাই তাঁরা নির্ব্বিবাদে ৯০/৯৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে গেছেন। এখন ত আমাদের "বয়স না হতে কুড়ি আগে পাকে কেশ !" দশ বছর বয়সেই চশমা পরতে হয়। মাঝখান থেকে আমরা সেই

---

২ বিগত ৬ই এপ্রিল ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা টাউন হলে স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে পঠিত হয়। সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত প্রবন্ধটি অতি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিতে বাধ্য হইলাম।

নিয়মের বাড়াবাড়ী করতে গিয়ে হিতে বিপরীত করে ফেলেছি ! আমার সুশিক্ষিতা ভগিনীগণ ! আপনারা পুরাকালের বিশেষতঃ মুসলমান নিয়মের সঙ্গে এখনকার ডাক্তারী ব্যবস্থার তুলনা করে দেখবেন।[৩] এই দেখুন না আমাদের ব্যবস্থা বলে :

(১) প্রসূতিকে যথাসম্ভব নির্জ্জন ঘরে রাখবে।

(২) ঘরের দরজার কাছে কাঠ কয়লার আগুন রাখবে।

(৩) বাহিরের যে লোক ঘরে আসিবে সে হাত পা ও কাপড় আগুনে গরম করে আসবে।

(৪) মুসলমানী মতে ৪০ দিন আর হিন্দু মতে ২১ দিন পর্য্যন্ত পোয়াতি শুয়ে বসে থাকবে, বেশী নড়াচড়া করিবে না।

(৫) আঁতুড় ঘরে অতিরিক্ত বাহুল্য জিনিষ ("অশুচ" হওয়ার ভয়েই বলুন, আর যাই বলুন) রাখবে না।

আর আধুনিক ডাক্তার কি বলেন? তিনি বলেন :

(১) রোগীর কামরায় মানুষের ভীড় বা গোলমাল হওয়া উচিত নয়। (পোয়াতিও ত রোগী বিশেষ?)

(২) কয়লার আগুন পাবক, অর্থাৎ বাতাসকে পরিষ্কার করে। (তবে সে জিনিসটা পোয়াতির ঘরে থাকিলে দোষ কি?

(৩) বাহিরের লোকের কাপড়-চোপড়ে রোগের কীটাণু থাকা সম্ভব ; আর আগুনের উত্তাপে রোগের জীবাণু মারা যায়।

(৪) ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রসূতির পেটের ভিতরের অংশ বিশেষ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং সে সময় নড়াচড়া করা উচিত নয়। এমনকি বিছানা ছেড়ে উঠতে নাই। (ছয় সপ্তাহ অর্থে বিয়াল্লিশ দিন, তবে আমাদের মুসলমানী ব্যবস্থা চল্লিশ দিন ঘরে থাকতে বলেও কি পাপ করল?)

(৫) রোগীর কামরায় অতিরিক্ত জিনিস, এমনকি বই, কাগজ ইত্যাদিও রাখা উচিত নয়। কারণ সেগুলি Infected অর্থাৎ অশুচি হয়।

---

৩. কিছুদিন হইল ডাক্তার মিস বি. এম. বোস, এম, বি মহোদয়া গ্রীয়ার পার্কে সাধারণত স্বাস্থ্য বিষয়ে বক্তৃতা দান কালে খাদ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "দেখ মেয়েরা ! তোমরা এক তরকারী দিয়ে ভাত খাবে। সাত রকম তরকারী খেলে পেটে অসুখ হয়। মনে রেখো, এক সময়ে এক তরকারীর বেশী খাবে না।" গত ১৩২৫ সালের শ্রাবণ মাসের "আল এসলাম" পত্রিকার ১৯৮ পৃষ্ঠায় "স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মোহাম্মদ (দঃ)" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিতে পাই,—"হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এত দূরদর্শী ছিলেন যে তিনি বিরুদ্ধ ভোজন এবং অতি ভোজন দোষ দূর করিবার জন্য এক তরকারী দিয়া আহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আজ যদি মানবমণ্ডলী এক তরকারী দিয়া আহার ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে উদরাময়, আমাশয়,...(প্রভৃতি) বহু সংখ্যক ব্যাধি একবারে দূরীভূত হইয়া পৃথিবীকে অর্দ্ধস্বর্গে পরিণত করিতে পারে।"

ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন : বেচারা গরীব মানুষেরা কেবল শাকভাত বা ডালভাত খায় বলে তাদের অসুখ-বিসুখ বড় লোকদের তুলনায় অনেক কম হয়। বড় লোকেরা নানা রকম চর্ব্ব্য চোর্ষ্য খেয়ে খেয়ে ব্যাধির আধার হয়ে পড়েন।

আমরা যদি এখন কাঠ কয়লার ধোঁয়া রাখি ; ঘরটা গরম রাখতে হবে বলে' সব দরজা জানালা বন্ধ করে তাকে পাতকূয়া করে' ফেলি ; কিম্বা ছাগলের ঘরে পোয়াতিকে রাখি, সে দোষ কার—আমাদের না ব্যবস্থার ?

আমাদের দেশের পোয়াতিদের প্রধান দোষ এই যে তারা পরিষ্কার বাতাসের পরিষ্কার মর্ম্ম বোঝে না। চারিদিকের দোর জানালা একেবারে বন্ধ করে রাখে। পাড়াগাঁয়ে দরমার কিম্বা চেঁচাড়ির বেড়া দেওয়া খড়ের ঘরে অমন করে দোর বন্ধ করলে তত অনিষ্ট হয় না, কারণ বেড়ার ফাঁক দিয়ে কোন রকমে ঘরে বাতাস আস্‌তে পারে। কিন্তু কলিকাতার পাকা বাড়ীতে কিম্বা মাটীর দেওয়ালের ঘরে দোর জানালা বন্ধ করলে কিছুতেই বাইরের বাতাস আসতে পারে না। এক ঘরে অনেক বেশী লোকের শোয়া উচিত নয় ; তাতে ঘরের বাতাস খারাপ হয়। শোবার ঘরে রোদের আলো যেন যেতে পারে। দিনের বেলা সব দরজা খুলে রাখা উচিত।

খাস কলিকাতায় এত শিশু নষ্ট হওয়ার আর একটী প্রধান কারণ এই যে প্রসূতির শরীর ভাল না থাকায় শিশু মায়ের দুধ পায় না। গাইয়ের দুধ আর নানা রকম ছাই মাটী খাইয়ে শিশুকে এক রকম গলা টিপে মারা হয়। কেবল শিশু রক্ষার চেষ্টা করলে কোন ফল হবে না— শিশুর মা'য়ের স্বাস্থ্যেরও যত্ন করা দরকার। একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলছেন, মায়ের কর্ত্তব্য কি, তা না জেনে শুনে কেউ যেন মা না হয়। মায়ের প্রধান কর্ত্তব্য সন্তান পালন করা, একথা অবশ্য কাউকে বলে দিতে হবে না, কারণ পশুপক্ষীও কর্ত্তব্য পালন করে থাকে। কিন্তু পশুতে ও মানুষে প্রভেদ আছে বলেই মানুষকে তার কর্ত্তব্য ঠিক করে শিখে নিতে হয়। পশুরা তাদের কাজে ভুল করে না ; আমরা মানুষ কিনা তাই আমাদের পদে পদে ভুল।

নোংরামির জন্যও অনেক আঁতুড়ে ছেলে মারা পড়ে। নাওয়া ঠিক মত হয় না ; ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে নাওয়ান হয় না। যে ছেলেরা মায়ের দুধ পায় না, তাদের জন্য যে দুধ বা ফুড তৈরি করা হয়, তার বাসনপাত্র ঠিক মত পরিষ্কার থাকে না। একবার অনেকখানি দুধ তৈরি করে ফেলে, সেই ঠাণ্ডা দুধ তিন চার বার খাওয়ান হয়। এই রকম আরও কত অত্যাচার হয়, তা আর কত বলব ! "সর্ব্ব অঙ্গেই ব্যথা, ঔষধ দিবে কোথা !"

শিশুকে রোজ একবার নাওয়াতে হবে। জলটা একটু গরম, শিশুর বগলে হাত দিলে যেমন গরম লাগে কিম্বা মায়ের কনুইতে যে গরম জল গা-সহা বোধ হয়, অতটুকু গরম হলেই হবে। শীতকালে খোলা জায়গায় বা যেখানে ঝাপ্টা বাতাস লাগে এমন জায়গায় নাওয়াবে না। নাওয়াবার আগে বেশ করে সর্ষের তেল মালিশ করে নেবে, কিন্তু এ সময় দুধ খাওয়াবে না। কোন রকম উগ্র সাবান ব্যবহার না করে বরং ডালের বেশম মাখলে চলে। স্নান শেষ হলে তাড়াতাড়ি গরম তোয়ালে কিম্বা পরিষ্কার পুরোণ কাপড়ের টুকরো দিয়ে বেশ করে শিশুর গা মুছে দিতে হবে। শরীরের কোন অংশ, যেমন কানের পীঠ, বগল, কুঁচকি যেন ভিজা না থাকে। নচেৎ ঐসব জায়গায় ঘা হবে।

নাওয়া শেষ হইলে তাড়াতাড়ি শিশুকে কাপড় পরাবে। হালকা ফ্লানেল্ কিম্বা সেই রকম কাপড় পরান চাই। কাপড় খুব ঢিলেঢালা হাওয়া চাই। উলেন টুপী আর মোজা কোন কালে পরান উচিত নয়। কাপড় খুব পরিষ্কার আর শুকনো থাকা চাই। কোন রকম ভিজে, এমনকি ঘামে ভিজা কাপড়ও গায়ে রাখিতে নাই।

তারপর শিশুর খাওয়া—এইটেই সব চেয়ে বড় কথা। এক বছর বয়স পর্য্যন্ত মায়ের দুধ সবচেয়ে ভাল ; তা যদি একান্তই না পাওয়া যায়, গাইয়ের দুধে অনেকটা জল মিশিয়ে মায়ের দুধের মত পাতলা করে খাওয়াবে। এজন্য দুধ খাওয়া শিশি (feeding bottle) ব্যবহার করা প্রশস্ত। ঝিনুকে কিংবা চামচে দিয়ে দুধটা একেবারে গলায় ঢেলে দিলে শিশুর পক্ষে সেটা হজম করা কষ্টকর হয়। মাই কিম্বা ফীডিং বোতলের বোঁটা চুষিয়া চুষিয়া খাইলে দুধের সঙ্গে শিশুর মুখের লালা কতক পরিমাণে পেটে যায়। ঐ লালায় এমন একটা গুণ আছে, যাতে দুধ কিম্বা যে কোন খাদ্য সহজে হজম হয়। ঐ রূপে জল মিশিয়ে ছাগলের কিম্বা গাধার দুধও খাওয়ান যাইতে পারে। কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত যে মানুষের বাচ্চার জন্য মানুষের দুধই সবচেয়ে ভাল খাদ্য। সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে গাই কিম্বা ছাগলের দুধ খাওয়াতে হলে তাতে মিছরি মিশিয়ে মিষ্টি করে খাওয়াবে। কারণ গাইয়ের দুধে মানুষের দুধের চেয়ে মিষ্টি কম থাকে। তিন মাসের ছেলেকে দেড় ছটাক খাঁটি দুধ, আধ ছটাক ননী, দেড় ছটাক জল আর একটু মিছরি এক সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এর সঙ্গে একটু চূণের জল মিশিয়ে দিলে আরও ভাল হয়। তা হলে ছেলের পেট ফাঁপার ভয় থাকে না। যদি দেখা যায় এতে শিশু ভাল থাকে না, অর্থাৎ মোটা তাজা হয় না তবে ননীর ভাগ কম করে দুধ মিছরির ভাগ বাড়িয়ে দিবে। বিলাতী অর্থাৎ টিনের ঘন দুধ খাওয়াতে হলে, টাট্‌কা তৈরি করে খাওয়াতে হবে। এক সঙ্গে অনেকখানি তৈরি করে তাই সাতবার খাওয়াবে না। এ দুধ এই নিয়মে তৈরি হয় ; —আধ ছটাক দুধ, আধ ছটাক ননী, এক পোয়া (কিম্বা সাড়ে চার ছটাক) জল। এর চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেকে মেলিন্স ফুড দেওয়া যেতে পারে। এতেও দুধ এবং ননী মিশিয়ে দিতে হবে। এইরূপে এলেনবেরী, ও বেঞ্জার সাহেবের তৈরি ফুড এবং হরলিক সাহেবের মলটেড মিল্ক দেওয়া যেতে পারে।[৪] ক্রমে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াবে এবং দুধ যাতে বেশী খায় সে দিকে নজর রাখবে। মনে রাখা দরকার ছেলেকে কখনও ঠাণ্ডা দুধ বা ফুড খাওয়াতে নাই।

ঘুম—শিশুকে নাওয়াবার পরেই খাওয়াবে, তারপর তাকে ঘুম পাড়াবে। দুধ খাওয়া আঁতুড়ে ছেলের জন্য প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা ; দুই বছরের ছেলের জন্য ১৪ ঘণ্টা এবং চার বছরের ছেলের জন্য ১২ ঘণ্টা ঘুমের দরকার। শিশুর মুখে চুষনি দিয়ে রাখা অভ্যাস ভাল নয়। কেউ কেউ আবার ছেলেকে শান্ত রাখবার জন্য আফিম খাওয়ায়, এ অভ্যাসও ভাল নয়। ছেলেদের

---

৪. শিশুকে হলিক্স মিল্ক ও বেনজারস ফুড প্রভৃতি কৃত্রিম দুগ্ধ খাওয়ান সম্বন্ধে একটী উর্দ্দু কবিতা মনে পড়িল, যথা :

> "তিফিল মেঁ বু আয়ে কেয়া মা বাপ কে আতওয়ার কী?
> দুধ ত ডিব্বে কা হায়, তালিম হায় সরকারী কী" ! !

অর্থাৎ বেচারা শিশু পিতা মাতার স্বভাবের গন্ধ লাভ করিবে কোথা হইতে? সে ত টিনের ডিব্বের কৃত্রিম দুধ খায়, আর শিক্ষা লাভ করে গবর্ণমেন্টের ! সত্যই ত মাতৃস্তন্য পান না করিলে শিশু মাতার স্বভাবের প্রভাব লাভ করিবে কেমন করিয়া?

> "স্তন্যদুগ্ধ যবে পিয়াও জননি,
> শুনাও সন্তানে শুনাও তখনি—"

ইত্যাদি চিরসত্য কথাও মিথ্যা হইয়া যায়।

দোলায় শোয়াবার অভ্যাস করতে নাই। দোলা দোলাতে গিয়ে মায়ের বৃথা সময় নষ্ট হয়, আবার শিশুরও শরীর মাটী হয়। ছেলের শোবার ঘরে যেন পরিষ্কার বাতাস খেলতে পারে। ঘরে বাতাস আসবে, কিন্তু ছেলের গায়ে যেন জোরে বাতাস না লাগে। ছেলেদের ঠাণ্ডা লাগবার ভয় খুব বেশী। প্রায়ই দেখা যায় শিশু ভিজা বিছানায় শুয়ে থাকে। বিশেষতঃ ঘূমের সময় যদি ভিজা বিছানায় থাকে কিম্বা ঠাণ্ডা বাতাস আদুল গায়ে লাগে, তবে বিপদের ভয়। ফ্লানেলের টুকরো দিয়ে ছেলেকে ঢেকে রাখবে। শোবার ঘরে কেরোসিনের আলো রাখতে নাই। এক কোণে সর্ষের তেলের একটা প্রদীপ রাখবে।

যদি সম্ভব হয়, শিশুকে আলাদা বিছানায় শোয়ান ভাল। তা হ'লে সে স্বাধীনভাবে নড়তে চড়তে পারবে। মায়ের সঙ্গে শুলে সে ততটা পরিষ্কার বাতাস পায় না, মায়ের নিশ্বাসের বাতাসে তার অনিষ্ট হয়। মশা মাছির উপদ্রব থেকে শিশুকে রক্ষা করবার জন্য মশারী খুব দরকার। ঘরের মেজেতে বা কোন পাত্রে জল খোলা থাকলে তাতে মশা জন্মায় ; ঘরে আবর্জ্জনা থাকলে মাছি হয়। যাতে মশা ও মাছি না জন্মাতে পারে, সে দিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখা চাই। তার ঔষধ কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। কাপড় প্রতিদিন রৌদ্রে দেওয়া চাই ; রোদ না থাক্‌লে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে হবে। কিম্বা কাঠ কয়লার আগুনে বিছানার কাপড় গরম করে নেবে ।

শিশুর সামান্য অসুখ হ'লেও যত্ন করা চাই। ছেলেদের পরিপাক, অর্থাৎ হজম ঠিক হচ্ছে কি না তা দেখতে হবে। কাঁদলেই দুধ খাওয়াবে না, বরং অন্য কোন অসুবিধা আছে কি না তার তদন্ত করতে হবে। ঔষধ ব্যবহার যথাসাধ্য কম করবে। ঔষধের অভ্যাস ভাল নয়। খুব দরকার না পড়লে ডাক্তার ডাকবে না। আর যখন ডাক্তার ডাকবে, তখন ডাক্তারের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। আমি জানি অনেক সময় গিন্নীরা ডাক্তারকে ফাঁকি দেন ; অর্থাৎ ডাক্তারের উপদেশ মানেন না। পরে ডাক্তারকে মিথ্যা কথা বলেন যে হ্যাঁ ঠিক সময় মত ঔষধ দিয়েছি ; ঐ পথ্য ছাড়া আর কিছু খায়নি। এতে অনিষ্ট কার—ডাক্তারের, না গিন্নীদের, —আপনারাই ভেবে দেখুন। নাওয়া, খাওয়া, ঘুম ঠিক নিয়ম মত হলে শিশুদের বেশী অসুখ না হওয়াই সম্ভব। পরিষ্কার বাতাস সবচেয়ে দরকারী জিনিষ। মানুষ খেতে না পেলে ১৩ দিন, জল না পেলে ৩ দিন বাঁচতে পারে, কিন্তু বাতাস না পেলে ৩ মিনিটের অধিকক্ষণ বাঁচতে পারে না। আমরা ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সর্ব্ব প্রথমে বাতাস খেতে অর্থাৎ নিশ্বাস নিতে আরম্ভ করি, আর জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে নিঃশ্বাস নেওয়া ছাড়ি। তাই বলি পরিষ্কার বাতাসটা সবচেয়ে বিশেষ দরকারী।

কেবল যে আমাদের দেশেই বেশী লোক মারা যাচ্ছে তা নয়। মানব জাতির এই যে ভয়ানক অধঃপতন—এটা প্রথমে ইংলন্ড ১৮৯৯ ও ১৯০২ সনে বুয়র যুদ্ধের সময় অনুভব করেন। সৈন্য সংগ্রহ করবার সময় ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে' যখন একে একে অনেক লোককে সেপাই হবার উপযুক্ত নয় বলে বাদ দিতে লাগলেন, তখন কর্ত্তাদের চৈতন্য হ'ল যে শিশু রক্ষার উপায় করতে হবে, নচেৎ সমস্ত দেশের লোক অধঃপাতে যেতে বসেছে।

এবারের যুদ্ধের সময় ফ্রান্স বুঝতে পারলেন যে তাঁর লোকবল কমে যাচ্ছে, তাই শুনেছি তাঁরা আইন করেছেন যে গবর্ণমেন্ট দেশের পোয়াতিদের প্রত্যেক ছেলের জন্য একটা করে বৃত্তি দিবেন, যাতে শিশুর যত্ন হয়। যে ঘরে চারিটি ছেলেমেয়ে আছে, সে স্থলে ছেলের

বাপকেও একটা আলাদা বৃত্তি দেওয়া হয়। ফল কথা, ইউরোপ মানুষ রক্ষা সম্বন্ধে সাবধান হয়েছেন, এখন আমাদের সাবধান হবার পালা।

আমার মনে হয়, এ শিশু মহামারীর আর একটা বিশেষ কারণ আমাদের দেশের বাল্যবিবাহ। ডাক্তার ভারতচন্দ্র বলেছেন, "মায়ের কর্ত্তব্য না শিখে কেউ যেন মা না হয়।" যে নিজেই ১২/১৩ বছরের বালিকা, সে আর কর্ত্তব্য শিখতে সময় পেলে কখন? উক্ত ডাক্তার মহাশয়ের মতে কুড়ি বছর বয়সের আগে মেয়ের বিবাহ দিতে নাই।

মেয়েদের শরীর যাতে ভাল থাকে, সেদিকেও নজর রাখা দরকার। বালিকা স্কুলে মেয়েদের শরীর ভাল রাখবার জন্য ব্যায়াম করার ব্যবস্থা আছে বটে, তাত কাজে পরিণত করবার যোটি নেই। কারণ ছাত্রীর মা বাপ ড্রিল করতে বারণ করেন। মেয়েরা ১২ বছর বয়স পর্য্যন্ত জড়ভরত হয়ে বসে থাকবে, তারপর তাদের বিয়ে হবে ; ফল—ছেলে বাঁচে না, কপাল মন্দ !

আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন, আজ আপ্শিষা বলছি, তা এই প্রথম বলা নয়। আমি ১৪ বছর পূর্ব্বে বলেছিলাম "যাঁরা কন্যার ব্যায়াম করা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা দৌহিত্রকে হৃষ্টপুষ্ট "পাহলওয়ান" দেখিতে চাহেন কিনা? ... যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তবে বোধ হয়, তাঁরা সুকুমারী-গোলাপ লতিকায় কাঁটাল ফলাইতে চাহেন !" ইত্যাদি। (মতিচূর প্রথম খণ্ড—৪৯ পৃষ্ঠা)। যাহা হউক, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশরক্ষার জন্য দুটি বিষয় দরকারী হয়ে পড়েছে দেখছি। প্রথম স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার ; দ্বিতীয় বাল্যবিবাহ রহিত করা। অর্থাৎ মেয়েদের বেশ করে পড়ালেখা শিখাতে হবে, যাতে তারা নিজের শরীরের যত্ন করতে শিখে ; আর অল্প বয়সের ছেলেমেয়ের বিয়ে বন্ধ করতে হবে। আপনারা ভেবে দেখেছেন, সধবা মেয়েমানুষ বেশীর ভাগ মরে কেন? কারণ তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় বলে। এখন দেখছি, শিশু রক্ষা করতে হ'লে আগে শিশুর মা'দের রক্ষা করা দরকার। ভাল ফসল পেতে হ'লে গাছে সার দেওয়া দরকার। বুঝলেন? মেয়েদেরও খাওয়া দাওয়ার একটু যত্ন করবেন। মেয়ের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ করতে হয় বলে বেচারীদের শুকিয়ে মারবেন না। তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ গৃহের গৃহিণী ; তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ বংশধরের জননী।

মুক্তিফল
(রূপকথা)

১

কাঙ্গালিনী বহুদিন হইতে পীড়িতা। তাঁহার জীবন-প্রদীপ ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিতেছে—কাঙ্গালিনী বুঝি এখন মরেন। অর্থাভাবে তাঁহার চিকিৎসা হইতে পারে না,—চিকিৎসা দূরে থাকুক, দিনান্তে একবার আহার্য্যও জোটে না ; একমাত্র জীর্ণকন্থা দারুণ শীত ও লজ্জা নিবারণের সম্বল। যিনি এক কালে ভোলাপুরের রাণী ছিলেন, তিনি অদ্য কাঙ্গালিনী !

কাঙ্গালিনী তরুতলে শ্যামল দূর্ব্বাশয়নে শায়িতা, অসংখ্য মশা মাছি তাঁহার ক্ষত অঙ্গ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতেছে, তিনি রোগে ভুগিয়া এত দুর্ব্বল হইয়াছেন যে মশা মাছিও তাড়াইতে পারেন না। তাঁহার বালক পুত্র নবীন তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছে। সে কখন

দূর্ব্বা লইয়া খেলা করে, কখন বা তাহার ক্ষুদ্র হস্তে তালবৃন্ত ব্যজন করিয়া মাছি তাড়ায়। কাঙ্গালিনী যখন অসহ্য যাতনায় অস্থির হন, মুদ্রিত নয়নে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, নবীন তখন তাহার ক্ষুদ্র বাহুদ্বারা মাতার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলে, "মা! আমি বড় হইলে তোমাকে এত এত ভাত আনিয়া দিব, তোমায় বানারসী সাড়ী পরাইব! —নবীনের বালসুলভ বাচালতায় তিনি আপন যন্ত্রণা ভুলিয়া মৃদু হাস্য করেন।

তরুশাখায় বসিয়া একটি পাখী মধুর স্বরে বলিতেছিল, —"চৌদ্দপুত—এত দুঃখ!"[৫] তাহা শুনিয়া কাঙ্গালিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "পাখীটা আমারই দুঃখগাথা গাহিতেছে! আমি শত শত পুত্রের জননী হইয়া এত কষ্ট ভোগ করিতেছি! হায়! আমার এ দুঃখ অমানিশা কি কখনও পোহাইবে?"

দর্পানন্দ নূতন বুটজুতা পায়ে মচ্ মচ্ করিয়া আসিয়া কাঙ্গালিনীকে সহাস্যে বলিলেন, "মা! আর তোমার দুঃখ দারিদ্র্য রহিবে না, আমি তোমার জন্য সোণার মল গড়াইতে দিয়াছি!" কাঙ্গালিনী অতি কষ্টে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বাবা! আগে প্রাণে বাঁচি ত! ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত"—

দর্প। (বিরক্তির সহিত) তোমার দুর্নিবার ক্ষুধার তৃপ্তি কিসে হইবে, আমি ত জানি না। বুড় মানুষেদের লইয়া বড় জ্বালাতন হইতে হয়। তুমি বীপ-টী ও এরারুট বিস্কিট খাইতে চাও না তবে খাইবে কি?

কাঙ্গালিনী। আমি গরীব মানুষ, একমুঠা মুড়ি-মুড়কি পাইলে বাঁচি।

দর্প। ওসব অসভ্য লোকের কুখাদ্য। তুমি যদি পনির, বিস্কিট, মার্মালেড ও দুধের মোরব্বা না খাও তবে উপবাসে মর। আমি আর তোমার জন্য কিছু করিতে পারিব না। দেখি তোমার জ্বর সারিয়াছে কি না, এই নাও একমাত্রা কুইনাইন খাও।

কাঙ্গালিনী। আমার রোগ কুইনাইনে সারিবার নহে।

"তবে মরিতেছ মর!" এই বলিয়া পর্দানন্দ চলিয়া গেলেন।

কাঙ্গালিনীর অন্যতম পুত্র প্রবীণ আসিয়া মাতার নিকট বসিলেন। তিনি সস্নেহে জননীর হাত ধরিয়া বলিলেন "মা! তুমি দিন দিন বড়ই রোগা হইতেছ।"

কাঙ্গালিনী দর্পানন্দের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, এখন অভিমান করিয়া বলিলেন, "সে জন্য তোর ভাবনা কেন? তোদের 'শেরি', 'শ্যাম্পেনের' অভাব না হইলেই হইল!"

প্রবীণ। বন্ধুবান্ধব সহ 'শেরি', 'শ্যাম্পেন' পান করেন তোমার ধনবানপুত্র দর্পানন্দ; সে কথা আমাকে বল কেন মা? আমি ত সুরা স্পর্শ করি না, কেবল বিস্কিট খাই। আর এ কি কথা বল মা, —তোমার জন্য আমরা ভাবি না? আমরা তোমার এতগুলি সন্তান থাকিতে তুমি অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবে?

এই সময় শাখাস্থিত পাখীটা আবার ডাকিয়া উঠিল—"চৌদ্দ পুত—এত দুঃখ"। প্রবীণ তদুত্তরে বলিলেন, "না পাখী, আর এত দুঃখ থাকিবে না—আমরা মায়ের দুঃখ দূর করিব।"

কাঙ্গালিনী। হাঁ, মরিলে ত দুঃখ দূর হয়ই—এখন আমি মরিতে প্রস্তুত।

---

৫. যেমন কতিপয় পাখীর স্বরে "চোখগেল" "বউ কথা কও" ইত্যাদি শুনা যায় সেইরূপ একটী পাখীর ডাক "চৌদ্দপুত—এত দুঃখ" এই কথার অনুরূপ।

নবীন মাতা ও ভ্রাতার কথোপকথন বুঝিতে না পারিয়া বিস্ফারিত নেত্রে মাতার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিল আর এক একবার ভ্রাতার মুখপানে চাহিতেছিল। মা মরিবেন, এই কথা শুনিবামাত্র সে উচ্চঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। কাঙ্গালিনী পুত্রকে আদর করিয়া বলিলেন, "তুই কাঁদিস না, আমি মরিব না। তোর দাদার সঙ্গে খেলা করিতে যা।"

নবীন। এই ত আমি এত বড় হইয়াছি, আর খেলা করিব না। চল দাদা, মার জন্য ওষুধ আনি গিয়া।

প্রবীণ। আমাদের সাধ্যমতে যে ঔষধ আনি তাহাতে মায়ের উপকার হয় না। মা ! তুমি কি ঔষধ খাও না ?

কাঙ্গালিনী। থাক বাবা ! আমার জন্য আর ভাবিও না। এখন আমার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় ! তোমরা দীর্ঘজীবী হও, তোমাদের বালাই লইয়া আমি মরি !

নবীন। (সজলনয়নে) তুমি মরিলে আমি বড় কাঁদিব ! মাগো ! তোমায় মরিতে দিব না।

কাঙ্গালিনী। ওরে হতভাগা ছেলে ! তোরই জন্য মরিতে পারি না। যেদিন সিংহাসনচ্যুত হইলাম, যেদিন রাজরাণীর পদ হারাইয়া কাঙ্গালিনী হইলাম, সেইদিন মরিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু তোরা অসহায় শিশু ছিলি বলিয়া মরি নাই ! তোদের এই অবস্থায় ফেলিয়া মরিতেও কষ্ট হয়। নচেৎ মরণে ভয় করি না,—এমন ঘৃণিত জীবন বহন করা অপেক্ষা শতবার মৃত্যু শ্রেয়ঃ।

নিন্দুককে সঙ্গে লইয়া দর্পানন্দ এই সময় আবার আসিয়া বলিলেন, "ঔষধ পথ্য না খাইলে মানুষ বাঁচে কি রূপে? মা ! তুমি এমন অবোধ মেয়ে কিছু বুঝ না। আমি সুবর্ণমল পরাইয়া তোমার চরণ উজ্জ্বল করিতে চাই তবু তুমি সন্তুষ্ট হও না। আবার বলি কুইনাইন খাও।"

কাঙ্গালিনী। দেখ দর্প ! আমাকে আর জ্বালাতন করিস না। আমি দীন দুঃখিনী অন্নভিখারিনী, তোমার স্বর্ণমল আমার পক্ষে উপহাস মাত্র। আর আমার রোগ ঔষধে সারিবার নহে। যাহাতে এ রোগ সারে, সে কার্য্য তোমার ন্যায় আনাড়ী পুত্রের অসাধ্য। তুমি নিজের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিও, আর চাই কি ?

নিন্দুক। যাহাতে মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়, এমন কার্য্য দর্পানন্দ কখন করে নাই, এখন সুবর্ণ বেড়ী পরাইয়া মায়ের চরণ উজ্জ্বল করিত চাহিয়াছিল, বেচারার সে সাধও অপূর্ণ রহিল ! অবশেষে কুইনাইন খাওয়াইয়া মায়ের মুখ তিক্ত করাও হইল না।

কাঙ্গালিনী। যাও নিন্দুক ! তোমার কথা শুনিলে আমার গা জ্বলে !

প্রবীণ। কি করিলে মা তোমার রোগ সারিবে, আমি প্রাণপণে সে সাধনা করিব। যদি তোমার রোগ ক্লেশ নিবারণ করিতে না পারি, ধিক আমার জীবনে ! ধিক্ আমার শিক্ষা দীক্ষায় !

নিন্দুক। বাস্ ! আর ভাবনা নাই ! প্রবীণ আমার অদ্বিতীয় বাক্‌পটু—বাক্যেই সে সিদ্ধিলাভ করিবে !

নবীন। তোমার পায়ে পড়ি, বল মা ! কি করিলে তুমি ভাল হইবে !

কাঙ্গালিনী। বলিলে লাভ কি ? তুই কি সে ঔষধ আনিতে পারিবি ?

প্রবীণ। আমি আনিতে পারিব–আমি থাকিতে তোমার চিন্তা কি মা ?

কাঙ্গালিনী। তবে শুন। বহুদিনের কথা, —জনৈক সন্ন্যাসী আমার বাড়ী অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, আমি পুত্র ও কন্যার প্রতি তুল্য ব্যবহার করি না। তিনি বিদায় লইয়া যাইবার সময় আমাকে বলিলেন, "বৎসে তুমি পুত্রকে অধিক স্নেহ কর, কন্যাকে একটুও আদর যত্ন কর না, ইহা বড় অন্যায়। পরিণামে তুমি এই অতি আদুরে পুত্রের দ্বারা কষ্ট পাইবে।" আমি ভাবিলাম, কন্যার প্রতি অধিক যত্ন প্রদর্শন করিলে লাভ কি? কন্যা কি আমার ভোলাপুর রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে? প্রকাশ্যে ব্যস্তভাবে বলিলাম, "প্রভো! আমায় শাপ দিলেন।" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি শাপ দিব কি, যে যাহা করে তাহাকে সে কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হয়। কন্টক বপণ করিয়া কেহ কুসুম চয়ন করে কি? অযোগ্য পুত্রের জননী হওয়া এবং অপত্যস্নেহে পক্ষপাতিতা করিবার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে।" আমি পুনরায় তাঁহার পদযুগল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত দিনে আমার শাপাবসান হইবে?" তদুত্তরে সন্ন্যাসী বলিলেন, "কৈলাস শিখরে মুক্তিফলের গাছ আছে; যেদিন কেহ তোমাকে সেই গাছের ফল আনিয়া খাওয়াইবে, সেই দিন তুমি শাপমুক্ত হইবে।"

প্রবীণ। আমি এখনই তোমাকে মুক্তিফল আনিয়া দিতেছি।

দর্প। কৈলাস পর্ব্বত এখন মায়াপুরের রাজার রাজ্যভুক্ত। সুতরাং মুক্তিফল আনয়ন সহজ নয়। মা! তুমি এমন কথা বল যাহা মানবের সাধ্যাতীত।

নিন্দুক। কোন কার্য্যই মানুষের সাধ্যাতীত নহে।

প্রবীণ। আমি মায়াপুরের রাজার চরণে ঐ ফল ভিক্ষা চাহিব। আমি সম্রাটের চরণ উদ্দেশে চলিলাম।

কাঙ্গালিনীর দুহিতা শ্রীমতী কাঁদিয়া বলিলেন, "আহা! মা আমাদের প্রতি অনাদর অবহেলা করার জন্য শাপগ্রস্তা হইয়াছেন। তবে আমরা কি মায়ের কাজ করিব না? চল দাদা, আমিও তোমার সঙ্গে রাজদ্বারে ভিক্ষা চাহিতে যাইব।"

দর্প। তুমি আবার কোথায় যাইবে? তুমি যেখানে আছ সেইখানে থাক, আর এক পদ অগ্রসর হইও না।

নিন্দুক। (করতালি দিয়া) শ্রীমতী আর ফাটকে আটক রহিবে না!! আর মায়ের চিন্তা কি?—এইবার শ্রীমতী মুক্তিফল আনিবে।

শ্রীমতী। (স্বগত) দর্পদাদা অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিবেন না, নিন্দুক দাদার বিদ্রূপ বাণ ততোদিক অসহ্য! যদি ঈশ্বর সহায় হন তবেই মায়ের সেবা করিতে পারিব। (প্রকাশ্যে) নিন্দুক দাদা! তোমার বিদ্রূপ আমি গ্রাহ্য করি না, বরং তোমার দুর্ম্মতির জন্যই আমার দুঃখ হয়—আমি তোমারই জন্য ব্যথিত।

নিন্দুক। নেহাল হইলাম! শ্রীমতী আমার প্রতি দয়া করেন আর চাই কি?

প্রবীণ। শ্রীমতী, তোমার রচিত দুই চারিটি গানের নকল আমাকে দাও দেখি, ভিক্ষা প্রার্থনার সময় গানের প্রয়োজন হয়।

শ্রীমতী। ঐ জন্যই ত আমি তোমার সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম—আমিও গান গাইতাম।

প্রবীণ। না বোন, তোমাকে কৈলাস পর্য্যন্ত যাইতে দিতে পারি না। তুমি আমার সহিত গল্প কর, উপন্যাস পাঠ কর, আমার সঙ্গে পারমার্থিক গান গাও—এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট; ইহাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা বা সমকক্ষতা দিতে পারি না।

নিন্দুক। সীমা লঙ্ঘন করিও না, শ্রীমতী, লোক হাসাইও না।

দর্প। দেখ ত সুমতি কেমন সরল মেয়ে, সে ত কুটীরের বাহিরে পদার্পণ করে না।

শ্রীমতী। সুমতি বোকা, তাই কোণের ভিতর লুকাইয়া থাকে! আর তাহার বাহিরে আসিবার সাহস কই?

সুমতি কাজ না পাইয়া কুটীরাভ্যন্তরে বসিয়া জীর্ণকন্থা সংস্কার করিতেছিলেন এবং নীরবে সকলের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন ; তিনি শ্রীমতীর শেষ কথা শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, "আমি বোকা হই বা ভীরু হই, কিন্তু যথাবিধি শক্তি সঞ্চয় না করিয়া দিদির মত হঠাৎ বাহিরে যাইব না। দিদি বাহির হইয়াই এমনকি দিগ্বিজয় করিয়াছেন? কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন?—ঐ উপন্যাস পাঠ করা আর দাদার সহিত সুর মিলাইয়া গান করা—বাস্! ঐ পর্য্যন্তই ত?"

দর্প। সুমতি বোকা বলিয়াই ত আমরা উহাকে একটু কৃপাচক্ষে দেখি।

শ্রীমতী। বেশ। দেখিব, সুমতি আর কত দিন তাহার মস্তিষ্কের অস্তিত্ব গোপন রাখে। কিন্তু দাদা, আমাদিগকে মস্তক উত্তোলন করিতে না দিলে তোমাদেরও বলবৃদ্ধি হইবে না যে!

নিন্দুক। চুপ কর শ্রীমতী, তোমার বক্তৃতা শুনিতে চাই না। তুমি নিজের কাজ দেখ, হাঁড়ি বাসন ধোও গিয়া।

২

কৈলাস পর্ব্বত শিখরে মায়াপুরের রাজার প্রমোদ কানন। আঠারো হাজার দৈত্য মুক্ত কৃপাণ হস্তে উদ্যান রক্ষা করিতেছে। মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু দূরে থাকুক, পক্ষী, মক্ষিকা, পিপীলিকা পর্য্যন্ত সে কাননে প্রবেশ করিতে পারে না।

মায়াপুরের বৃদ্ধ রাজা দিবাশেষে রাজকার্য্য সমাধা করিয়া কর্ম্মচারীবৃন্দকে একে একে বিদায় দিলেন। এখন রাজকুমার, মন্ত্রী এবং কতিপয় প্রধান কর্ম্মচারী মাত্র আছেন। এমন সময় একজন দৈত্য রাজসভায় আসিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিল, "মহারাজ! ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?"

রাজা। নির্ভয়ে বল।

দৈত্য। কৈলাস শিখরে জিনকুল চূড়ামণি মহারাজের প্রমোদ কাননে মুক্তিফলের গাছ আছে—

মন্ত্রী। হাঁ, তাই কি?

দৈত্য। সে অমর বাঞ্ছিত বৃক্ষে শত বৎসরে একটি ফল হয়—

জনৈক কর্ম্মচারী। হাঁ জানি। আবার তাহাতে ফল ধরিয়াছে ইহাও আমরা অবগত আছি। তোমার বক্তব্য শীঘ্র বল, দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন নাই।

দৈত্য। (ভয়কম্পিত কলেবরে) জনশ্রুতি শুনিতে পাই ভোলাপুর হইতে মানবনন্দন মুক্তিফল চয়ন করিতে আসিতেছে—

যুবরাজ। অসম্ভব! মিথ্যা জনরব।

মন্ত্রী। যদিই জনশ্রুতি সত্য হয় তবে তোমরা আঠারো হাজার দৈত্য আছ কিসের জন্য?

কর্ম্মচারী। তোমাদের ন্যায় ভীমকায় জাগ্রত প্রহরী থাকিতে ভয় কি? বিশেষতঃ পৃথিবীতে ভোলাপুর অতি ভ্রান্ত নগণ্য দেশ তথাকার মানব সন্তান কি তোমাদের অপেক্ষা অধিক বল্‌বান?

দৈত্য। না মহাশয়! আমি কেবল রাজধানীতে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। আমরা সকলে সশস্ত্রে প্রস্তুত আছি—আবশ্যক হইলে কৈলাস ভূধরে মানব রক্তের নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইবে।

মন্ত্রী। বীরের উপযুক্ত কথা! এখন তুমি যাইতে পার।

যুবরাজ। (আসন ত্যাগ করিয়া) আমার কিছু বক্তব্য আছে।

সকলে। আপনি বলুন।

যুবরাজ। আমি রাজকার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার আস্পর্দ্ধা রাখি না। কিন্তু এ সময় মন্ত্রীবরের কথার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি দৈত্যদিগকে মানব রক্তের নদী প্রবাহিত করিতে উৎসাহ দিয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য করেন নাই। ভোলাপুরের নির্বীয্য মানব ধ্বংস করা আমাদের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত জাতির পক্ষে কিছুমাত্র বীরত্বের পরিচায়ক নহে। পরন্ত মায়াপুররাজ দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ নামে জিন জগতে বিখ্যাত। মায়াপুর রাজ্যে নরশোণিত পাত হইলে আমাদের প্রতিবেশী জিনরাজগণ কি বলিবেন? সমস্ত পরীস্থান আমাদিগকে বীর না বলিয়া কাপুরুষ বলিবে না কি?

মন্ত্রী। যুবরাজের কথা অতি যুক্তিসঙ্গত। মানবরুধিরে আমাদের সুনাম কলঙ্কিত হইবে, এমনকি সমগ্র পরীস্থান কলুষিত হইবে। কিন্তু মানবের আস্পর্দ্ধাও-ত অসহ্য! তাহারা মুক্তিফল লইতে আসিতেছে, তাহাদিগকে বাধা দিবার কি উপায়?

কর্ম্মচারী। যুবরাজ অবশ্যই উপায় ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

রাজা। বৎস! তোমার যুক্তি অতি সারবান! তুমি পরীস্থানের মুকুটতুল্য মায়াপুর সাম্রাজ্যের আসন্ন কলঙ্ক মোচন করিলে। এখন যাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয় তাহাই কর। তুমি কৃতকার্য্য হইলে তোমাকে রাজ্যদান করিয়া আমি বানপ্রস্থ লইব।

সকলে। যাহাতে সাপ মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে তদ্রূপ ব্যবস্থা হওয়া চাই।

যুবরাজ। কথিত আছে, মানবজাতি অতিশয় মূর্খ এবং জিন জাতি ও দৈত্যগণ মায়াবিদ্যায় পারদর্শী। অজ্ঞ বিবেকহীন মানবকে ইন্দ্রজালে বশীভূত করা অতি সহজ ব্যাপার। মায়াবিদ্যাবিশারদ মুরলীধর করুণ সুরে সহানুভূতিসূচক মোহন মুরলী বাজাইলে তাহা শুনিয়া মানবগণ তালে তালে নৃত্য করিবে! তখন অন্যান্য জিন গায়কেরা তাহাদের বলিবে, চল আমরা তোমাদিগকে মুরলীধরের নিকট লইয়া যাই। তাহাতে মানুষেরা সম্মত হইলে জিন ও দৈত্যগণ অনায়াসে তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে।

উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী করতালিসহকারে যুবরাজের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

অতঃপুর যুবরাজ প্রধান প্রধান দৈত্য, প্রহরী ও মায়াবিদ্যাবিশারদ মুরলীধরকে লইয়া কয়েক দিন গোপনে পরামর্শ করিয়া সমস্ত ঠিক করিলেন।

পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হইল যে দৈত্যগণ কোন প্রকারে মানবের অনিষ্ট করিবে না। তাহারা কেবল মানুষের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং যথাকালে মায়াপুরে সেই সংবাদ প্রেরণ করিবে।

বহুদিন পূর্ব্বেই কৈলাস পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে কণ্টক রোপণ করা হইয়াছিল। জিন, পরী ও দৈত্যগণ মায়াযানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে।

৩

লায়েক দিবানিশি জননীর সেবা করিয়া ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের আহার নিদ্রায় উদাসীন থাকায় তাঁহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। তিনি মাতার পদপ্রান্তে নীরবে বসিয়া তাঁহার পায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে ছিলেন ; পুত্রের সস্নেহ করস্পর্শে কাঙ্গালিনী নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "লায়েক ! তুমি এখানে ! তাই ত লায়েক ভিন্ন অভাগিনী মায়ের ব্যথায় আর কে ব্যথিত হইবে। তা বাছা ! তোমার যত্নে আমার বিশেষ কিছু উপকার হইবে না। মুক্তিফল প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি ব্যাধিমুক্ত হইব না।"

শ্রীমতী ছোট একটি থালায় কিছু খাবার আনিয়া মাতাকে বলিলেন, "মা, তুমি বড়ই দুর্ব্বল হইয়াছ। এখন কিছু একটু মুখে দাও তবে একটু সবল হইবে।"

কাঙ্গালিনী। মুক্তিফলের পূর্ব্বে আর কিছু ভক্ষণ করিতে পারি না।

লায়েক। প্রবীণ কবে না কবে ফল আনিবে। এদিকে তুমি যে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়াছ, মশা মাছি তাড়াইবার সামর্থ্যও তোমার নাই।

শ্রীমতী। দাদার ফল আনয়নের পূর্ব্বেই হয়ত মা মারা যাইবেন। হায় ! রোগীর মৃত্যুর পর ঔষধ আসিলে লাভ কি?

কাঙ্গালিনী। আমার জন্য ভাবিস না মা ! আমি মরিব না, —আমি মরিলে জগতে ক্লেশ ভার কে বহন করিবে? উপবাসে থাকিয়া, নানা ব্যাধির আধার হইয়া অশেষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহিয়াও আমাকে জীবিত থাকিতে হইবে ! এই যে পরিধানে জীর্ণ কন্থাখণ্ড—ইহার একপ্রান্ত মায়াপুর রাজ্যের জিনদের হস্তে, অন্যপ্রান্ত আমি অভাগিনী অর্দ্ধউলঙ্গিনী দ্রৌপদীর ন্যায় প্রাণপণে ধরিয়া কটিদেশে বেষ্টন করিয়া কোন মতে লজ্জা নিবারণ করিতেছি ! এত অপমান সহিয়াও আমাকে জীবিত থাকিতে হইবে ! হে আল্লাহ ! আমায় ক্ষমা কর।

ইতিমধ্যে লায়েক রোগ যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন। শ্রীমতী শশব্যস্তে দৌড়িয়া ভ্রাতার নিকট আসিলেন। সহোদরের আসন্নকাল বুঝিতে না পারিয়া শ্রীমতী দীন নয়নে মাতার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, —"দেখ মা ! দাদা এমন হইলেন কেন?"

কাঙ্গালিনী। তখন কোনরূপে উঠিয়া মুমূর্ষু পুত্রকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "লায়েক !—লায়েক ! বাপ ! তুই আমারে ছাড়িয়া চলিলি ! হায় ! এ দুর্দ্দিনে তুই আমার সহায় ছিলি ! আমার মরণ লইয়া তুই মরিলি !"

লায়েক অর্দ্ধনিমীলিত লোচনে বলিলেন, "মা তুমি কাতর হও কেন? জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ আমি মায়ের সেবা করিতে গিয়া মরিতেছি। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? যে নিজের জন্য মরে তাহার মৃত্যু ক্লেশদায়ক ; যে মায়ের চরণে আত্মবলিদান করে—" এই মাত্র বলিয়াই লায়েক প্রাণত্যাগ করিলেন।

কাঙ্গালিনী। এই জন্য লায়েককে আমার শুশ্রূষা করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম ; আমার দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া লায়েক মারা গেল। হায় ! অভিশপ্তার শাপ মোচন করে, কাহার সাধ্য। পুত্রগুলিকে অধিক ভালবাসিতাম—অতি সোহাগে তাহাদের কেহ হইল দর্পানন্দ, কেহ হইল কৃতঘ্ন, কেহ হইল নিন্দুক, কেহ হইল মাতৃদ্রোহী, —আর যে মানুষ নামের উপযুক্ত হইল, সে সোণার চাঁদ লায়েক শমন কবলে পড়িল ! আর আমার, আশা ভরসা কোথায়— !

শ্রীমতী। মা, নৈরাশ্যে আকুল হইও না, —এখনও ধীমান দাদা, প্রবীণ দাদা ও নবীন আছেন ; আমিও তোমার দীনতমা সেবিকা আছি। আশা ছাড়িতে পারি না। তোমার এ দুর্দ্দশা দূর হইবে এরূপ আশা করি।

কাঙ্গালিনী। দর্পানন্দের এ ঐশ্বর্য্য থাকিতে আমি দীনহীনা, এ দুঃখ কাহাকে বলিব ?

নবীন লায়েকের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকাডাকি করিল। লায়েকের সাড়া শব্দ না পাইয়া দ্রুতপদে শ্রীমতীকে গিয়া বলিল, "দিদি, লায়েকদাদা এ সময় ঘুমাইলেন কেন ?"

শ্রীমতী। আমাদের লায়েক দাদা ঘুমান নাই, —অমর হইয়াছেন।

নবীন। আমিও অমর হইব দিদি !

কাঙ্গালিনী। বেশ ! যা এখন বকিস না, খেলা কর গিয়া।

নবীন। একা একা খেলা ভাল লাগে না, প্রবীণ দাদা কখন ফিরবেন ?

কাঙ্গালিনী। প্রবীণ মুক্তিফল লইয়া আসিবেন।

নবীন। দাদা মুক্তিফল আনিতে পারিবেন না, আমি আনিতে যাই।

শ্রীমতী। তুমিও ত এখন এত বড় হইয়াছ, বেশ ত যাও না,— ফল লইয়া শীঘ্র ফিরিও-- আমরা প্রতীক্ষায় রহিলাম।

৪

প্রবীণ কৈলাস ভূধরের পাদমূলে বসিয়া প্রতিদিন মায়াপুরের রাজাকে সম্বোধন করিয়া আবেদনের পাণ্ডুলিপি লিখেন। আবেদন লিখিতে ইতিমধ্যে ঝাড়া সাতমণ মসী ব্যয় হইয়াছে ; লেখনীর জন্য দেশের সমুদয় খাক্‌ড়া বনের খাক্‌ড়া প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে ; কাগজে আর কুলায় না, এখন মানকচুর পাতায় আবেদন লিখা হয়। এদিকে আবার মানকচু পত্রের বিনাশ দেখিয়া মানকচুর দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কায় বরাহকুল অন্নদাতা দেবতার নিকট অভিযোগ লিপি প্রেরণ করিয়াছে।

প্রবীণ এক একবার এক এক দৈত্যের দ্বারা লিপি প্রেরণ করেন, কিন্তু আবেদনের কোন উত্তর আর প্রাপ্ত হন না। মায়াবী গায়কেরা তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে রাজা স্বহস্তে মুক্তিফল চয়ন করিয়া তোমাদিগকে দিবেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

প্রবীণ। (মায়াবীর প্রতি) আমি ত নিশ্চিন্ত আছিই। কিন্তু বাড়ী গেলেই দর্পানন্দ মাতাকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন, "তোমার গুণধর পুত্র মুক্তিফল আনিল কই ?" আর ইদানিং নবীন বড় হইয়াছে, তাহার তাড়া আরও অসহ্য বোধ হয়। সে আমাকে কিছুতেই স্থির থাকিতে দেয় না, নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া জ্বালাতন করে।

মায়াবী। নবীনটাকে কোনরূপে জব্দ করিতে পারেন না।

প্রবীণ। পঁচিশ ত্রিশ জন দৈত্য প্রহরী সহায় হইলে নবীনকে জব্দ করা কঠিন ব্যাপার নয়।

মায়াবী। নবীনের ধরা পাইলে হয়,—সে বড় দাম্ভিক, সে দৈত্যদের নিকট আসিয়া ফল প্রার্থনা করে না এবং আমাদের কাছে মোটেই ঘেঁষে না, সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকে। আর দর্পানন্দের বিদ্রূপের জন্য ভাবিবেন না, তিনি এক প্রকার আমাদের হাতেই আছেন। তিনি বানর সাজিতে চাহেন, যে জন্য লাঙ্গুলের প্রয়োজন। সেই লাঙ্গুল লাভের জন্য তিনি এখন জিনের সাধনা করিতেছেন।[৬] এবার আমরা তাঁহাকে লাঙ্গুল বন্ধনে বাঁধিলে তিনি আর নড়িতে পারিবেন না,— তাঁহার মুখে কথাটি ফুটিবে না। —এ বৎসর যুবরাজের জন্মোৎসবের দিন দর্পানন্দ লাঙ্গুলাবদ্ধ হইবেন।

প্রবীণ। (স্বগত) আমিও লাঙ্গুল লাভ করিতে পারিতাম, কিন্তু এখন নবীন হাসিবে, সেই ভয়ে লাঙ্গুলের লোভ সম্বরণ করিলাম। দর্পানন্দের ত ল্যাজ নাই, কাজেই ল্যাজেও আপত্তি নাই! (প্রকাশ্যে) ঐ দেখুন, দর্পানন্দ সবান্ধবে আসিতেছেন।

মায়াবী। আসুন, আপত্তি নাই, উনি আমাদের বন্ধু

দর্প। (মায়াবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া) কুশল আছেন ত?

মায়াবী। আসুন বসুন। আপনার সংবাদ কেমন?

দর্প। আমাদের সবই মঙ্গল। আমার লাঙ্গুলের কথাটা বোধ হয় জিনকুলচূড়ামণি মহারাজের স্মরণ আছে?

মায়াবী। অবশ্য স্মরণ আছে। কিন্তু এক কথা, আপনিও মুক্তিফলের প্রার্থী নাকি?

দর্প। না মহাশয়, আমি কি পাগল? যাহাতে পূজ্যপাদ মায়াপুররাজ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, এমন কাজ আমা দ্বারা হওয়া অসম্ভব ; সে কথা আমার যমজ ভ্রাতা প্রবীণকে জিজ্ঞাসা করুন।

প্রবীণ। (সভয়ে) আমি কি করিয়াছি? আমি কি বলপূর্ব্বক মুক্তিফল আনিতে যাইতেছি? আমি কেবল রাজার চরণ কমলে সবিনয় করপুটে ভিক্ষা চাহিতেছি,—দাতার ইচ্ছা হইলে ভিক্ষা দিবেন।

মায়াবী। তাহাই ঠিক। আপনারা বদান্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। রাজা অবশ্যই আপনাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। মুক্তিফল পাকিতে এখনও অনেক বৎসর বিলম্ব আছে, ফলটি পাকিবা মাত্র আমরা আপনাদিগকে সাধিয়া আনিয়া দিব।

দর্প। সে ফলে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধা মাতা মরিতেছেন, মরুন। আমি এবং আমার একশত ছয় জন বন্ধু জিন রাজার অতিশয় ভক্ত,– সুতরাং আমরা মুক্তিফল চাই না। (বন্ধুদের প্রতি) তোমাদের রচিত সেই স্তব গানটি গাও দেখি।

দর্পানন্দ প্রভৃতি একশত সাতজন ব্যক্তি সেতার বাজাইয়া সমস্বরে গাহিলেন :

---

৬. পার্থিব কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিবার আশায় অনেকে জিনের সাধনা ('আমল') করিয়া থাকে। মানবের সাধনাবলে জিন বশীভূত হয়। আলাদিনের প্রদীপের কথা প্রায় সকলেই জানে।

" আমরা ক'জন সবে একশত সাত
অতি অকপট জিন-ভকত নেহাত !
হৃদয়ের অন্তস্তলে
যে প্রবল বেগে চলে
শীতল বিমল জিন-ভক্তির প্রপাত,
দিগন্ত কাঁপায়ে উঠে তার কলনাদ !
ধারি না কাহার ধার,—
ভগিনী ভ্রাতার মার,—
ক্ষুধায় মরুক মাতা, নাই দৃকপাত !
জিনরাজ ভক্ত মোরা একশত সাত !"

গান শ্রবণে মায়াবী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বাহ্‌বা দর্পানন্দ ! বাহ্‌বা ! ! আপনারা অতিশয় বুদ্ধিমান, নিজের সুখ স্বার্থ বেশ বুঝিয়াছেন। তবে আর বুড়িটার জন্য চিন্তা কি ?"

দর্প। না, বুড়িমায়ের জন্য আমার কিছু মাত্র চিন্তা নাই ; আমাদের সুখ শান্তি বজায় থাকিলেই হইল।

প্রবীণ। (স্বগত) আমাকে হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া নবীন সুখ শান্তি ভোগ করিতে দিবে না ! ধীমান দাদাও বারম্বার তাড়া দিতেছেন ; তিনি বলেন, মুক্তিফল প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না। আমি কেবল মাতাকে প্রবোধ দিবার জন্য মুখে বলিয়াছিলাম, ফল আনিয়া দিব, কিন্তু নবীন সত্য সত্যই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। (প্রকাশ্যে) তাই ত ভাই, আপনি বাঁচিলে বাপের নাম।

মায়াবী। দেখুন, আপনারা ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবেন না। আমরা ব্যাধিক্লিষ্টা কাঙ্গালিনীর জন্যই মুক্তিফল রক্ষা করিতেছি। নতুবা আমাদের আর কি স্বার্থ?

দর্প ও প্রবীণ। তাই ত আহা ! আপনাদের কি দয়া !

মায়াবী। প্রবীণ ! আপনাকে আমরা যৎপরোনাস্তি ভালবাসি, আপনি সতত আমাদের কাছে কাছে থাকিবেন।

প্রবীণ (অনুচ্চস্বরে) যে আজ্ঞা ; আপনারা আমাকে চোখে চোখে রাখিবেন।

(মায়াবীর প্রস্থান)

নিন্দুক বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া সকলের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। মায়াবী প্রস্থান করিলে পর তিনি সমক্ষে আসিয়া সহাস্যে প্রবীণকে বলিলেন, "কি প্রবীণ ! মুক্তিফল পাইলে ?"

প্রবীণ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিলেন, "পাই নাই, পাইবার আশা ত আছে। ধৈর্য্য ধারণ কর, অধীর হইও না,— আমি নিশ্চয় মাতাকে মুক্তিফল আনিয়া দিব। নবীন পর্ব্বতের সন্নিকটস্থিত অরণ্য খানিকটা পরিষ্কার করিয়াছে ; সেই পথে একটু অগ্রসর হইয়া দেখি, কৈলাস কত দূর।"

দর্প। সাবধান ! ও পথে পদার্পণ করা উচিত নয়, দৈত্যগণ দেখিতে পাইলে অনর্থ ঘটাইবে।

প্রবীণ। নবীন যে আমাকে ঐদিক সোপান নির্ম্মাণ করিতে বলে। সে এত কঠিন পরিশ্রম করিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতেছে, আর আমি একটু যাইয়া দেখিব না?

দর্প। তা দেখ, কিন্তু নবীন যেরূপ অবিমৃষ্যকারী, সে ইহার ফলে বিপন্ন হইবে।

নিন্দুক মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "নবীন ও প্রবীণের কৈলাস আরোহণ, মুক্তিফল চয়ন,—এসব কার্য্য অতি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, কারণ দৈত্যগুলি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে কি না।"

প্রবীণ। আমি আত্মগোপন করিতে জানি, আমি নবীনের মত অসতর্ক নই। আমি উভয় কূলের মন রক্ষা করিয়া চলি ; নবীনকে বলি, হাঁ সোপান প্রস্তুত করিব, দৈত্যকে বলি, আমি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া থাকি, যেই তোমরা উপর হইতে মুক্তিফল ফেলিয়া দিবে, অমনি আমি লুফিয়া লইব।

নিন্দুক ও দর্পানন্দ উচ্চহাস্য করিলেন, প্রবীণ একটু অপ্রস্তুত হইলেন।

৫

মায়াপুর রাজসভায় পাত্রমিত্র সকলে উপস্থিত। মহারাজ অসুস্থতানিবন্ধন সভায় আসিতে পারেন নাই, তিনি অন্তঃপুরে পরীমহলে বিশ্রাম করিতেছেন। যুবরাজ রাজকার্য্য করিতেছেন।

জনৈক কর্ম্মচারী মুরলীধরকে বলিলেন, "কই আপনার বংশীরবে মানব ভুলিল কই?"

মুরলীধর। আমার মাননীয় বন্ধু সম্ভবতঃ পৃথিবীর সমাচার অবগত নহেন ; মানুষ ভুলিয়াছে বই কি !

কর্ম্মচারী। প্রবীণের কথা একরূপ, কার্য্য অন্যরূপ। তিনি মুখে বলেন, 'হাঁ, হাঁ, রাজার চরণে শুধু ভিক্ষা চাই" কার্য্যতঃ কিন্তু তিনি গোপনে নবীনের সহিত কৈলাস পর্ব্বতে আরোহণের নিমিত্ত সোপান নির্ম্মাণ করিতেছেন,—এসব সংবাদ মুরলীধর অবগত আছেন কি?

অন্য কর্ম্মচারী। তবে ত চিন্তার বিষয়।

মুরলী। (সহাস্যে) আপনারাও ভাল, প্রবীণের সোপান রচনা ছেলে ভুলানমাত্র। প্রস্তর দ্বারা সোপান প্রস্তুত করিতেছেন, তা'ও আবার বৎসরে এক ধাপের অধিক নির্ম্মিত হয় না।

যুবরাজ। কথা কাটাকাটির কাজ কি, প্রধান গায়ককে ডাকিয়া সমাচার জিজ্ঞাসা করা যাউক।

প্রধান গায়ক তৎক্ষণাৎ মায়াযানে আগমন করিলেন।

মুরলী। বলুন কবিবর, ধরণীর কি সংবাদ,—প্রবীণ মুক্তিফল লইয়া গিয়াছেন?

গায়ক। প্রবীণ মুক্তিফল লইতে পারিবেন, তবে এত দৈত্য প্রহরী আছে কেন? কিন্তু ভবিষ্যতে মানুষেরা কৈলাস আরোহণে কৃতকার্য্য হইতেও পারেন।

মন্ত্রী। অসম্ভব ! অতি অসম্ভব।

যুবরাজ। গায়ক কিরূপে জানিলেন, প্রবীণ কৈলাস শিখর আরোহণে সক্ষম হইবেন?

গায়ক। প্রবীণ কৈলাসারোহণ করিতে পারিবেন না ; সে বেচারা এতদিন কেবল আবেদন লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু এখন নবীনের প্ররোচনায় তিনি সোপান প্রস্তুত করিতে চাহেন। নবীন তাঁহাকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেন না,— নবীনই যত অকাণ্ডের মূল।

মন্ত্রী। তথাপি আশঙ্কার কোন কারণ নাই। নবীন, প্রবীণ, ধীমান, নিন্দুক, দর্পানন্দ প্রভৃতি সকলে মিলিয়া সমবেত চেষ্টা না করিলে তাঁহারা কৈলাস আরোহণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না ; অথচ তাঁহাদের পরস্পরে কখনও একতা স্থাপিত হইবে না, সুতরাং আমাদের চিন্তার কোন কারণ নাই। তদ্ব্যতীত কাঙ্গালিনী পুত্র বলিদান না করিলে মুক্তিফল পাইবেন না আর তিনি অপত্য-বাৎসল্যহেতু পুত্র বলি দিতে পারিবেন না, ইহাও আমরা জানি।

গায়ক। তাহা সত্য, কিন্তু লায়েক স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান করিয়াছেন।

সকলে। (সবিস্ময়ে) বটে? কাঙ্গালিনীর অক্ষম ভীরুপুত্র জীবনের মায়াত্যাগ করিতে পারিয়াছে?

গায়ক। হাঁ, লায়েকের আত্মত্যাগ সত্য ঘটনা ; আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি।

জনৈক সভাসদ্। তাহা হইলে বেচারি কাঙ্গালিনীকে মুক্তিফলে বঞ্চিত করা অন্যায়।

মন্ত্রী। (ব্যঙ্গ ভাষায়) বটে? তবে আমরা কৈলাসগিরি হইতে আঠারো হাজার দৈত্য প্রহরী সরাইয়া লই— মানব অনায়াসে নির্ব্বিঘ্নে অপক্ব মুক্তিফল খাইয়া দেখুক তাহার আস্বাদ কেমন?

অনেকে। (এক বাক্যে) না, না, আহা এমন কাজ করিতে নাই। অবোধ মানবনন্দন স্বকীয় ভালমন্দ বুঝে না, তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ। আমরা থাকিতে তাহারা অপক্ব মুক্তিফল ভক্ষণে বিপন্ন হইবে, ইহা আমাদের দয়াসুধাসিক্ত সুকোমল প্রাণে সহিবে না।

মানবের আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করিয়া রাজসভাস্থিত সকলে এক এক ঘটী অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

যুবরাজ। (প্রথমে বহুকষ্টে অশ্রু সম্বরণ-পূর্ব্বক) গায়ক কি বিশ্বাস করেন, অপরিণামদর্শী নবীন পর্ব্বতারোহণ করিয়া এখন মুক্তিফল চয়নে কৃতকার্য্য হইবেন?

গায়ক। না আমি তাহা বিশ্বাস করি না ; কেবল নবীনের আস্ফালন উল্লম্ফন দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।

মন্ত্রী। জ্যোতিষ শাস্ত্রে জানা যায়, যতদিন কাঙ্গালিনীর কন্যাগণ তাহাদের ভ্রাতৃবর্গের কার্য্যে সহায়তা না করিবে ততদিন কেহই মুক্তিফল লইতে পারিবে না। আর কাঙ্গালিনীর দুহিতা কি প্রকার নগণ্য ও অকর্ম্মণ্য তাহা আপনারা সকলে অবগত আছেন।

সকলে। তবে আমরা বহু বৎসর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

মন্ত্রী। অবশ্য এই ত নবীন ও প্রবীণের সোপান প্রস্তুত ব্যাপারই দেখুন না,— নবীন বলেন, "এক ধাপ উচ্চে নির্ম্মাণ করি," প্রবীণ বলেন,"না, নীচে নামিয়া আর এক ধাপ প্রস্তুত করি।" নবীন বলেন, "উপরে উঠি," প্রবীণ বলেন, "নীচে নামি"— এই বিষয় লইয়া উভয় ভ্রাতার কেবল বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে!

জনৈক পারিষদ। (সহাস্যে) আমার বন্ধু মহোদয়গণ কাঙ্গালিনীর এই সব অযোগ্য পুত্রের আস্ফালন দেখিয়া আমাদিগকে সতর্ক হইতে বলেন! যদি কেহ শূন্যগর্ভ বক্তৃতা গৰ্জ্জনে শঙ্কিত হন, তিনি কোকিলের কাকলি শ্রবণেও মূর্চ্ছা যাইতে পারেন!

(সভাসদগণের উচ্চ হাস্য)

মন্ত্রী। বাস্তবিক উৎকণ্ঠার কারণ নাই, কেবল কতিপয় দুষ্টবুদ্ধি দৈত্য মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া আমাদিগকে এখন বিরক্ত করিতেছে।[৭]

যুবরাজ। এখন আমরা নিরুদ্বেগ হইলাম, কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়; মুরলীধর যথাবিধি মায়াবংশী বাজাইতে থাকুন।

অতঃপর মুরলীধর দিগুণ ত্রিগুণ উৎসাহে মায়াবংশী বাদন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মোহন বাঁশীর ললিত সুর শুনিয়া সপ্তসাগর স্তম্ভিত হইয়া গভীর গৰ্জ্জন ভুলিল; সদাগতি সমীরণ স্থির হইল; তরুলতা, স্থাবর জঙ্গম— সকলে উৎকর্ণ হইল; গগনবিহারী বিহগকুল মধুর কাকলী ভুলিয়া গেল; —তখন বাঁশীর সুরে প্রবীণ ভুলিবেন না কেন?—তিনি ত মানুষ বই নন!

৬

কৈলাসের উপত্যকায় নবীন, প্রবীণ, ধীমান ও নিন্দুক উপস্থিত। ধীমান সোপান প্রস্তুত করিতে উপদেশ দিতেছেন, নবীন তাঁহার উপদেশ উপেক্ষা করিয়া তাড়াতাড়ি কাঁচা বাঁশের মই প্রস্তুত করিতেছে। প্রবীণ অতি ধীরে ধীরে প্রস্তর সোপান নিৰ্ম্মাণের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন। নিন্দুক কার্য্য করিতে আসেন নাই, তিনি অপর কৰ্ম্মোৎসাহী ভ্রাতাদের ছিদ্রান্বেষণ করিতে আসিয়াছেন। নিন্দুক সুবিধা বুঝিয়া কখনও নবীনের প্রতি শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, কখনও বা প্রবীণকে বিদ্রূপ ধারায় নাকানি চোবানি খাওয়াইতেছেন এইরূপে ভ্রাতৃচতুষ্টয় মাতৃকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নবীন। (প্রবীণের প্রতি) দাদা তোমার দীর্ঘসূত্রিতা দেখিয়া গা জ্বলে! আজ পর্য্যন্ত তোমার উপকরণেই সংগৃহীত হইল না,— কবে সিঁড়ি হইবে, তবে তুমি উঠিবে? মুক্তিফল আনা তোমার কাজ নয়!

প্রবীণ। ঈশ্! আমি ২২/২৩ বৎসর হইতে মাতৃসেবা করিয়া আসিতেছি,-- কৈলাসচূড়ায় উঠিতে চেষ্টা করিতেছি, আজ তুই তিন দিনের ছোঁড়া বলিস কি না মুক্তিফল আনা তোমার কাজ নয়! তুই বুঝি মনে করিস ঐ ভাঙ্গা বাঁশের মই দিয়া উঠা যাইবে? একে ত পদচাপে মই ভাঙ্গিয়া যাইবে, দ্বিতীয়তঃ ঝড়বৃষ্টি শিলাপাত হইতে রক্ষা পাইবার কি উপায়?

নবীন। পাথরের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে গেলে তুমি বৃষ্টি জলে ভিজিবে না?

---

৭. সাধারণতঃ মুসলমানরা ভূত প্রেত বিশ্বাস করে না, কিন্তু জিনপরী ও দৈত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। প্রবাদ আছে, জিনেরা মানবের সহিত অল্প বিস্তর হিংসা করে এবং স্থলবিশেষে আবার জিনপরী নরনারীর সহিত বিবাহও করিয়া থাকে! আর দৈত্য দানবও জিন জাতির সহিত শত্রুতা রাখে। কবির মতে দৈত্য ভীমকায় ও অত্যন্ত বলবান হইয়াও জিনের অধীন থাকে। প্রায় শুনা যায়,—জিন রাজা, দৈত্য প্রজা; অমুক পরীর অন্তঃপুরের রক্ষক প্রহরী দৈত্য ইত্যাদি। যাহা হউক, সামান্য সুবিধা পাইলেই দৈত্য জিনকে অনর্থক বিরক্ত করিয়া বৈরসাধন করে।

প্রবীণ। আমি কি তোমার মত অর্ব্বাচীন যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অগ্রসর হইব? আমি প্রতি ধাপ সিঁড়ির নীচে এক একটি চোরকুঠরী নির্ম্মাণ করিব, আবশ্যক হইলে ঢপলাচমক দেখিলে তাহার ভিতর লুকাইব।

ধীমান। নিজের সুখ সুবিধা সম্বন্ধে অত ভাবিতে গেলে পরমায়ুঃ শেষ হইবে, অথচ কার্য্য কিছুই হইবে না।

প্রবীণ। পথে বিস্তর কাঁটা আছে তাহা জান দাদা?

ধীমান। কাঁটার ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। কেবল কাঁটা কেন, পার্ব্বত্য অরণ্যশঙ্কুল পথে সর্প বৃশ্চিকও আছে; আরও ঊর্ধ্বে শিলাবৃষ্টি বজ্রপাতও আছে, সেসব উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

নবীন। না, ওসব কিছু মানিব না,— বাইকাটা অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে ভয় কিসের? চল (প্রবীণের হাত ধরিয়া) দাদা চল!

প্রবীণ। (স্বগত) আমার সাহসে কুলায় না! (প্রকাশ্যে) তোমার মইটা ত মজবুত নয়, উঠিতে পা কাঁপে যে!

নবীন। বাইকাটা অস্ত্রে ভর দিয়া,— কোন মতে লম্ফ দিয়া একবার উঠিলেই হইল।

প্রবীণ। বাইকাটা অস্ত্রখানি লুকাইয়া সঙ্গে রাখিতে হইবে, নচেৎ প্রহরী দৈত্যগণ উহা দেখিলে ক্ষেপিবে। আর আমার আবেদন লিপিগুলিও অবশ্য সঙ্গে থাকিবে।

নবীন। তোমার আবেদন লিখিতে যতগুলি মানকচুপত্র ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা ত সাত গাড়ীর বোঝা,—সেগুলি বহিয়া লওয়া অসম্ভব। না দাদা, আবেদন নিবেদনে কাজ নাই—

প্রবীণ। না নবীন, ঐ শুন মেঘগর্জ্জন। অর্দ্ধপথে ভিজিতে হইবে।

নবীন। ভিজিলেই ক্ষতি কি?

(তিন জন মায়াবী গায়কের প্রবেশ)।

১ম গায়ক। আপনারা কোথায় চলিয়াছেন?

প্রবীণ। নবীন কৈলাস গিরিচূড়া আরোহণ করিতে চাহে।

নিন্দুক। (জনান্তিকে) প্রবীণ কেমন চতুর! তাড়াতাড়ি সে নবীনের যাত্রার কথা বলিল; সে নিজেও যে ঐ পথের পথিক সে কথা আপাততঃ গোপন রহিল!

২য় গায়ক। ঐ মই দিয়া উঠিবেন?— আপনারা বাতুল না কি? আর বাইকাটা অস্ত্রে প্রয়োজন কি?—ওটা ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

৩য় গায়ক। চলুন আমরা পথ দেখাইয়া দিব, সুন্দর পাকা রাস্তা আছে।

প্রবীণ। চল নবীন, উহারা পথ প্রদর্শন করিবেন।

নবীন। না, আমরা অপরের সাহায্য গ্রহণ করিব না।

প্রবীণ। শুনিয়াছি মায়াপুর রাজ্যে মুরলীধরের বসতি, তিনি নাকি কল্পদ্রুমবৎ সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

১ম গায়ক। হাঁ যদি বলেন ত আমরা আপনাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাই। তিনি স্বহস্তে আপনাদিগকে মুক্তিফল দান করিবেন।

প্রবীণ। কি বল নবীন, চলিবে না?

নবীন। অমন অনেক কল্পতরু দাতার প্রশংসা শুনা গিয়াছে। কিন্তু ভিক্ষায় আর আমাদের কুলাইবে না।

প্রবীণ। নিশ্চিয় জানিও মুরলীধরের ন্যায় উদার হৃদয় কল্পদ্রুম দ্বিতীয় আর নাই।

নবীন। আমার ত বিশ্বাস হয় না।

(দূরাগত বংশীধ্বনি)।
তোমরা কি চাও নরনারী—
সব দিতে পার বংশীধারী।
এস গো প্রবীণ ! (দূরে যা নবীন,
তোর মুখ দেখিতে না পারি)—
এস বন্ধু নিকটে আমারি।
মুক্তিফল ছার— কত ফুল আর
কোটি ফলে আমি অধিকারী।
রবি যদি চাও, দিব আমি তা'ও
তারাহার পরাইতে পারি !
চাহিও না কিন্তু পূর্ণিমার ইন্দু,—
শুধু সুধাকর দিতে নারি।
এস গো প্রবীণ, তাড়াতাড়ি

প্রবীণ ! আর কি দেখ নবীন, চল ইহাদের সঙ্গে—

নবীন। আমি যাইব না, মুরলীধর ত আমাকে ডাকেন নাই। তিনি ডাকিলেও যাইতাম না।

"তবে তুমি থাক আমি চলিলাম," এই বলিয়া প্রবীণ ছাড়িয়া গেলেন। জিনগণ তাঁহাকে অন্যদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আরও গভীর অরণ্যে লইয়া গেলেন।[৮] তাঁহারা প্রবীণকে বুঝাইলেন যে প্রবীণ তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে মুক্তি মোক্ষ—সবই পাইবেন। এমনকি জিনেরা তাঁহাকে সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব দান করিবেন।

প্রবীণ (আনন্দ গদ্গদ স্বরে) আমাকে সসাগরা ধরণীর রাজা করিবেন,—আমি অধমের প্রতি আপনাদের এত অনুগ্রহ !

মায়াবী। শুধু সসাগরা বসুন্ধরা কেন,— সৌরজগতের রাজত্বগুলিও ক্রমে ক্রমে আপনাকে দিব। শনির সাম্রাজ্য অতি বিশাল, তাহা জয় করিতে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে।

---

৮. প্রবাদ আছে, জিনেরা নাকি সহজে মানবের বশীভূত হইতে চাহে না, তাই সাধারণতঃ লোকের সাধনায় তাহারা নানা প্রকারে বাধা দিয়া থাকে ; কখনও সাধককে বিকট মূর্তি দেখাইয়া ভয় প্রদর্শন করে, কখনও বা ছলে কৌশলে ভুলাইয়া বনে লইয়া গিয়া সাধনায় বিঘ্ন উৎপাদন করে !
ধ্যানে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ব্যাসদেবও বড় দুঃখে তাঁহার আরাধ্যা দেবীকে বলিয়াছিলেন,—
"শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া
কি গুণ বাড়িল তবে ব্যাসেরে ছলিয়া !"
দূর্গাদেবী কি চমৎকার কৌশলে ব্যাসদেবকে "গর্দ্দভ বারানসী" বরদান করিয়াছেন।

প্রবীণ। আহা! আপনাদের দয়ার বালাই লইয়া মরি! আমাকে একেবারে রাজা না করিয়া আপাততঃ মন্ত্রী করিলেও চরিতার্থ হইব।

নেপথ্যে। দাদা,— দাদা! কোথায় তুমি? আর কত দূর গেলে দাদার দেখা পাইব?

প্রবীণ। একি জ্বালা! নবীন এখানেও আসিল। আমি কিন্তু সাড়া দিব না।

ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া প্রবীণ ত্বরিত পদে একটি গুহার ভিতর লুকাইলেন। নবীনও সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া প্রবীণকে দেখিলেন।

নবীন। একি দাদা! তুমি এ সুড়ঙ্গের ভিতর কেন? এদিকে আমি তোমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্লান্ত হইলাম! আমি দিবানিশি পথ চলিয়া তিন দিন পরে অদ্য তোমার ধরা পাইলাম।

প্রবীণ। তুমি মই দিয়া কৈলাসে উঠিতে চাও, তাহা আমি পারিব না।

নবীন। বেশ দাদা! তুমি যাহাই বল, আমি তাহাই মানিব। চল, তোমারই পথে চল, আমি কেবল আমার স্বদেশী বাইকাটা অস্ত্রখানি সঙ্গে লইব।

প্রবীণ। (স্বগত) তুমি যাহাই বল, আমি আর তোমাকে আমার সঙ্গে কিছুতেই মিশিতে দিব না। (প্রকাশ্যে) তোমারই দোষে আমার সিঁড়ি প্রস্তুত হইল না, নতুবা এত দিন আমি অর্দ্ধপথে উঠিতাম।

নবীন। এখনই কি হইয়াছে, সিঁড়ি প্রস্তুত কর না? কোথায় ইট, পাথর, সব লইয়া চল।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রবীণ চক্ষু লজ্জার দায়ে, নবীনকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতগাত্রে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দুই এক ধাপ সোপান নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় মায়াবী গায়কেরা অদূরে থাকিয়া সমস্বরে মধুর রাগে গাহিতে আরম্ভ করিলেন :

ঐ শুন ঐ শুন মূরলী বাজে—
করিছ সময় নাশ বৃথা কি কাজে?
আবেদন লয়ে হাতে
চল আমাদের সাথে,
লয়ে যাব তোমা বংশীধরের কাছে।
এস ত্বরা ঐ শুন মূরলী বাজে!

প্রবীণ উৎকর্ণ হইয়া গান শুনিতে শুনিতে আত্মবিস্মৃত হইলেন; ভাবিলেন, নবীন সঙ্গে থাকিলে পশ্চাদপদ হওয়া অসম্ভব, মুরলীধরের নিকট কদম তলায় যাওয়া অসম্ভব, অথচ নবীন আমাকে ছাড়ে না,— কি করি? নবীনকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিই!

অতঃপর প্রবীণ সোপান প্রস্তুত করা ছাড়িয়া নবীনকে সবলে ধাক্কা দিলেন— ধাক্কার বেগ সংবরণ করিতে না পারায় নিজেও তাহার সঙ্গে পড়িলেন,—উভয়ে গড়াইতে গড়াইতে নিম্ন উপত্যকায় আসিয়া পড়িলেন।

অনন্তর উভয়ে গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিন্দুক করতালি দিয়া হাসিতে লাগিলেন। ধীমান হাসিলেন না, অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। প্রবীণ নবীনকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, 'তোমারই দোষে আমরা পড়িলাম।"

নবীন। বাঃ দাদা! তুমি ধাক্কা দিলে!

প্রবীণ। আমি কি জানি? —তুমিই আমাকে লইয়া পড়িলে!

নবীন। বেশ বল, উল্টা চোর কোটাল শাসে।! তুমি ধাক্কা না দিলে আমরা পড়িতাম কি রূপে?

প্রবীণ। যদি তোমার কথা সত্য হয় তবে তোমাকে ধাক্কা দিলে আমি পড়িতাম কেন?

নবীন। যে হেতু তুমি ধাক্কার ধাক্কা সামলাইতে পার নাই।

প্রবীণ। সমস্ত জগৎ সাক্ষী—কেহ বলুক ত যে ব্যক্তি ধাক্কা দেয় সে কি পড়ে।

নবীন। সমস্ত জগৎ তোমার চাতুরী বুঝিয়াছে। এক্ষেত্রে তুমিই আমাদের পতনের কারণ।

প্রবীণ। চুপ কর মিথ্যাবাদি! আমি আজ ২২/২৩ বৎসর হইতে সোপান রচনা করিয়া আসিতেছি, আর আজ কিনা আমিই পতনের কারণ হইলাম।

নবীন। অকথ্য ভাষায় গালি দিলেই কেহ বড় হয় না। কে মিথ্যাবাদী তাহাও সকলে বিদিত আছে।

প্রবীণ। তুমি আমার ২৩ বৎসরের পরিশ্রম মাটি করিলে। হায়! আজীবন মায়ের সেবা করিয়া আসিলাম,— সমুদয় যত্ন পরিশ্রমের ফল এক মুহূর্তে ব্যর্থ হইল, চল ত মায়ের নিকট—

নবীন। চল না! মাও বুঝেন, তাঁহার কোন্ পুত্র কেমন।

৭

কাঙ্গালিনী ঘোরতর পীড়িতা,—জীবনের আশা আর নাই। শ্রীমতী ও সুমতি মাতৃসেবায় নিযুক্তা। মাতার কঙ্কালসার দেহ ও পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া এক একবার শ্রীমতী নিরাশ হইয়া কাঁদেন, আবার ভাবেন, এই দাদা মুক্তিফল সহ আসিলেন আর কি! পাতাটি নড়িলে, সামান্য কিছু শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে শ্রীমতী আশায় উৎফুল্ল হন,—এই বুঝি দাদা আসিলেন!

দুরাশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া সুমতি পৌষ মাসের সুদীর্ঘ রজনী জাগিয়া যাপন করিয়াছেন।

প্রভাত হইল, অদ্য নবীন, প্রবীণ প্রভৃতি মুক্তিফলসহ গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। আহা! আজি কি সুখের দিন! সুমতি জননীর মুখ হাত ধোওয়াইয়া, ছিন্ন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া জীর্ণ কুটীরের দ্বারদেশে বসিয়া স্থির নয়নে পথ পানে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

অপর ভ্রাতাদের আগমনের পূর্ব্বে নিন্দুক দ্রুতপদে আসিয়া ভগিনীদিগকে বলিলেন, প্রবীণ, মুক্তিফল লইয়া আসিয়াছেন।

সুমতি। (ব্যাকুলভাবে) আমার ত বিশ্বাস হয় না,— আমার মাথার দিব্য, সত্য বল দাদা!

নিন্দুক। তোমার চুলের দিব্য সত্য বলিতেছি! ধীমান দাদা মায়ের স্বর্ণ থাল ভরিয়া খাবার আনিতেছেন আর নবীন মায়ের জন্য বারাণসী সাড়ী আনিতেছে।

শ্রীমতী। আহা! সকলে শীঘ্র আসুন! এ দিকে মা আমার রোগে-শোকে জীবন্মৃতা হইয়াছেন। হায় দাদারা কতক্ষণে আসিবেন।

নিন্দুক। অধীর হইও না শ্রীমতী, ধৈর্য্য ধারণ কর! ঐ দেখ প্রবীণ আসিতেছে।

প্রবীণকে দূর হইতে দেখিয়া প্রথম সুমতি দৌড়িয়া আসিলেন, "কই দাদা, ফল কই?"

প্রবীণ। তোমার সাধের কনিষ্ঠ নবীনকে জিজ্ঞাসা কর ! নবীন না গেলে আমি আনিতে পারিতাম।

নবীন। তবে এত দিন আন নাই কেন?

সুমতি। শেষে তোমরা কি করিয়া আসিলে? এদিকে মায়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত, ফল না আনিয়া তোমরা রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিলে কোন মুখে?

প্রবীণ। আমাকে অনুযোগ করা বৃথা,— সব দোষ নবীনের।

নবীন। ধর্ম্ম জানেন, সব দোষ দাদার। তিনি আমাকে ফেলিয়া দিলেন—

প্রবীণ। পতনের জন্য নবীন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল—

নবীন। দাদা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমাকে ধাক্কা দিবেন—

প্রবীণ। মিথ্যা বলিয়া আর পাপভার বাড়াও কেন?

নবীন। তুমি বৃদ্ধ বয়সে এত মিথ্যা—

ধীমান। মাতার জীবন সঙ্কটাপন্ন, এই কি তোমাদের কলহের সময়? অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছ, এই লজ্জাই কি যথেষ্ট নয়?

কাঙ্গালিনী। (স্বগত) ধরণি ! দ্বিধা হও,— তোমার বক্ষে মুখ লুকাই ! (প্রকাশ্যে) শ্রীমতী মা, তোর ভাইয়েরা বড় শ্রান্ত, তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে বল।

সুমতি। নিন্দুক দাদা, তুমি ধর্ম্মতঃ বল দেখি কে কাহাকে ধাক্কা দিয়াছে?

নিন্দুক। কি বলিব বোন,—মোহন বাঁশীর স্বরে যার মন তিষ্ঠে না ঘরে,— যাহাকে মায়াবিদ্যাবিশারদ মুরলীধর আপন পার্শ্বে কদম্ব তরুর ছায়াতলে ডাকিতেছেন, সে-ই অন্যমনস্কভাবে ধাক্কা দিয়াছে ! ফলে উভয়ে পতিত হইয়াছে !

নবীন। নিন্দুক দাদা এইবার সত্য বলিয়াছেন !

প্রবীণ। তবে আমি কি এতদিন কেবল অরণ্যে রোদন করিলাম?

শ্রীমতী। দাদা তুমি ২৩ বৎসর অরণ্যে রোদন করিয়াছ, অথবা কি করিয়াছ, তাহা আমরা জানি না—আমরা তোমার কার্য্যফল দেখিতে চাই। মায়ের কুটীরের দ্বার হইতে কৈলাস গিরির সীমা পর্য্যন্ত যে বিজন অরণ্য ছিল, তাহা পরিষ্কার করিয়াছে কে?

ধীমান। সে ঘোর বন নবীন ২/৩ বৎসর ধরিয়া পরিষ্কার করিয়াছে।

নিন্দুক। প্রবীণ ত সেই বিজন বনে বসিয়া কেবল আবেদন লিখিতেছিল !

সুমতি। যাহা হউক তোমরা এখন থাম। ঐ দেখ মায়ের কুটীরে আগুন লাগিয়াছে, চল শীঘ্র নিবাইতে যাই।

কাঙ্গালিনী ভূমি শয্যায় পড়িয়া নীরবে নয়ন জলে মাটি ভিজাইতে ছিলেন। লজ্জা, ক্ষোভ, অভিমানে তাঁহার হৃদয় শতধা হইতেছিল। সুমতি তাঁহাকে ধরিয়া দাহ্যমান কুটীরের বাহির করিতে চেষ্টা করায় তিনি বলিলেন, "কে ও সুমতি? আর আমাকে টানাটানি করিস কেন মা?— পুড়িয়া মরিতে দে !"

শ্রীমতী। না মা ! আমরা থাকিতে তুমি মরিবে, ইহা অসহ্য।

কাঙ্গালিনী। অভাগীর মেয়ে! তোরা জানিস, মুক্তিফল না পাইলে আমি শাপমুক্ত হইব না, তবে আমাকে শুধু প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিয়া বৃথা কষ্ট দিস কেন?

নবীন। মাগো! তুমি রাগ করিও না। আমি মুক্তিফল আনিতে আবার চেষ্টা করিব। এবার কৈলাসে উঠিতে পারি নাই, পুনরায় আরোহণের চেষ্টা করিব।

শ্রীমতী ও সুমতি। এবার আমরাও সঙ্গে যাইব, পথ কি বড় দুর্গম?

নবীন। একেবারে দুর্গম নয়,— কতক দূর মই দিয়া উঠা যাইতে পারে—

শ্রীমতী। বুঝিয়াছি,— থাক মইয়েরও প্রয়োজন নাই। চল নবীন, শীঘ্র; আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়।

নিন্দুক। অবাক করিলে শ্রীমতী,—নবীন ত তবু মই সংগ্রহ করিয়াছে, তুমি তাহার উপরও নির্ভর কর না!

শ্রীমতী। কেন দাদা, আপনার পায়ের উপর নির্ভর করিব! পার্ব্বত্য লতাগুল্ম ধরিয়া উঠিব,— তাহাতে না কুলাইলে হামাগুড়ি দিয়া, বুকে ভর দিয়া—যে কোন প্রকারে হউক, উঠিব।

প্রবীণ। যেখানে পর্ব্বত অত্যন্ত ঢালু সে স্থান অতিক্রম করিবে কিরূপে?

নিন্দুক। সেখানে উভয় ভগিনী উড়িতে চেষ্টা করিবে!

সুমতি। এত বিদ্রূপ কর কেন দাদা? কোন উপায় ত হইবেই। এ জগতে কিছুই স্থায়ী নয়; হয় আরোগ্য নয় মৃত্যু—কিন্তু রোগ চিরকাল থাকে না!

ধীমান। কেবল কথায় কাজ নাই, এখন সকলে মিলিয়া আবার যাত্রা করি।

প্রবীণ। হাঁ চল,— দুই একখানা আবেদন সঙ্গে লইয়া আমিও আসিতেছি।

শ্রীমতী। আমি এই চুল খুলিলাম,—আমরা সকলে জননীকে মুক্তিফল আনিয়া দিতে না পারা পর্য্যন্ত আমি আর চুল বাঁধিব না! হে প্রভূ পরমেশ্বর! সহায় হও!

কাঙ্গালিনী। একি দেখি, আমার কোমলাঙ্গী ননির পুতুল দুহিতা ক্ষুদ্র স্বার্থে, —সাংসারিক ভোগবিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া আমার সেবায় নিযুক্তা হইল! শ্রীমতী ও সুমতি যখন তাহাদের ভ্রাতাদের কার্য্যে যোগদান করিতে বদ্ধপরিকর হইল, তখন আমার ভরসা হয় সম্ভবতঃ আমার সুদীর্ঘ নিরাশযামিনী হইবে!—এত দিনে হয়ত আমার সন্তান সন্ততি মুক্তিফল আনিতে পারিবে!— আশা মায়াবিনী।

সৃষ্টি তত্ত্ব

সে দিন গল্প করিতে করিতে আমাদের অধিক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল, জিন, পরী, ভূত। কেহ শ্বেতশ্মশ্রু জিনকে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছেন; কেহ দেখিয়াছেন সিতবসনা পরী এবং কেহ ভূতকে মাছভাজা খাইতে দেখিয়াছেন! মিস ননীবালা দত্ত ঘুমাইয়া পড়িলেন; আমি একটা সোফায় বসিয়াছিলাম। জাহেদা বেগম আমাকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া ল্যাম্প নিবাইয়া আপন কামরায় চলিয়া গেলেন। শিরীন বেগম

আপন কামরায় না গিয়া আমারই পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। ল্যাম্প নিবিল, কিন্তু এক কোণে মোমবাতি জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকে গৃহসজ্জা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বলিতে পারি না, আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি জাগ্রত ছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ভয়ানক একটা শব্দ হইল। তাহাতে ননীবালা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কিসের শব্দ হলো?"

"বলতে পারি না। কিছুদিন হ'লো আমি সংবাদপত্রে ছবি দেখেছিলুম, বিলেতে একটা এরোপ্লেন এঞ্জিন ভেঙ্গে কোন বাড়ীর ছাদের উপর পড়ে গিয়েছিল, আর এরোপ্লেনের আরোহী ভাঙ্গা ছাদ গলিয়ে অক্ষত শরীরে একেবারে কামরার ভিতর পালঙ্কের উপর গিয়ে পড়েছিল! আমাদের এ উলু খাওয়া ভাঙ্গা ছাদের উপরও কারুর এরোপ্লেন ট্রেন এসে পড়েনি ত? জানালা খুলে দেখুন না?"

মিসিস বীণাপাণি ঘোষ যথাবিধি পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া গাঢ়নিদ্রা সুখ ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম, "বিছানা ছেড়ে উঠুন শিগ্‌গির!"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? আমি ননীকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা পুনরাবৃত্তি করিলাম।

ননী বলিলেন, "যে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ছে, জানালা খুলব কি করে? তা ছাড়া আমার ভয় করে। আপনারা যত সব ভূতের গল্প বলেছেন!"

"আচ্ছা আমি জানালা খুলে দেখছি" বলিয়া বীণা গবাক্ষ খুলিয়া ফেলিলেন।

বাতায়ন খুলিবা মাত্র এক ঝাপটা বাতাস ও বৃষ্টিজল আসিয়া আমাদের ভিজাইয়া দিল—তৎসঙ্গেই মস্ত এক উল্কাপিণ্ড প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে আমাদের ত চক্ষু স্থির। গোলমাল শুনিয়া শিরীন জাগিয়া উঠিয়াছেন, অন্য কক্ষ হইতে আফসার দুলহিন দৌড়িয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও নির্ব্বাক! আমরা চীৎকার করিয়া বাড়ীময় সকলকে জাগাইয়া তুলিব, না, উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেই অগ্নি স্তূপের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অগ্নিস্তূপ ক্রমে এক জ্যোতির্ম্ময় মনুষ্য মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। আমার মনে হইল, এই মহাপুরুষকে কোথায় যেন কখন দেখিয়াছি। কিন্তু ঠিক চিনিতে পারিলাম না। কারণ, মানুষের মুখ চিনিয়া রাখা আমার অভ্যাস নয়, সে জন্য অনেক সময় অপ্রস্তুতও হইতে হইয়াছে। আগন্তুক অগ্নিমূর্ত্তি বলিলেন,—

বৎসে! তোমরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছ? আমি অভয় দিতেছি, কোন ভয় নাই।"

শিরীন। সে দিন আমাদের এখানে একটা টিকটিকি বোবা ফকির সাজিয়া আসিয়াছিল, আপনি তাহাদেরই কেহ নাকি?

ননী। আপনারা মওলানা সাহেবের বাড়ীর কাছে বাসা নিয়াছেন, তাই ত টিকটিকির উপদ্রব।

অগ্নিমূর্ত্তি। (সতেজে) না মা! আমি সেসব কিছু নই। আমি বিশ্বস্রষ্টা ত্বস্তি।

"ত্বস্তি" নাম শ্রবণ করিবামাত্র বীণা ও ননী তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তখন আমারও স্মরণ হইল, কলিকাতায় "নারী সৃষ্টি" লিখিবার সময় আমি এই জ্যোতির্ম্ময়

মহাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। আমরা সসম্মানে ত্বস্তিদেবকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। বীণা বলিলেন, 'অসময়ে নরলোকে পদধূলি (বর্ষাকালে "ধূলি" না বলিয়া "পদকর্দ্দম" বলিতে হয় !) দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

ত্বস্তি। কারণ? (আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) কারণ ঐ মেয়েটা !

আমি সবিস্ময়ে, সভয়ে, সবিনয়ে বলিলাম, "মহাত্মা বলেন কি, আমি?"

ত্বস্তি। হ্যাঁ, তুমি ! আমার নারী সৃজনের ইতিহাস বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া এই গোলমাল বাধাইয়াছ। তা, তোমারই বা দোষ দিব কি ; কতক দোষ "সওগাত" আফিসের।

ননী। সে কি রকম?

ত্বস্তি। তাহা এই : ইনি "নারী সৃষ্টি" লেখাটা "সওগাত" নামক মাসিক পত্রিকায় দিয়াছিলেন। সে সময় সম্পাদক মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না ; আফিসের গণ্ডমূর্খগুলা ইহার লিখিত পাদটীকা দুইটি বাদ দিয়া তাহা প্রকাশ করে। পাদটীকার অভাবে রচনাটি স্থলবিশেষে দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। সুতরাং সুবোধ পাঠকেরা উহা সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না ! তখন তাঁহারা বলেন, "ডাক ব্যাটা ত্বস্তিকে, ইহার কোথায় কি ভ্রান্তি আছে, বুঝাইয়া দিয়া যাউক !" তাই দেখ না, সময় নাই, অসময় নাই, একটা প্ল্যানচেট পাইলেই ইহারা আমাকে সুরলোক হইতে ডাকিয়া আনিয়া বিরক্ত করে। অদ্যকার ঘটনা শুন ;— কতকগুলি যুবক "সত্যগ্রহ" ব্রত লইয়া মাতিয়াছে। রাজপুরুষেরা বলেন, 'তোমরা "সত্যগ্রহ" ছাড়িয়া "মিথ্যাগ্রহণ" কর।' কিন্তু উহারা অবোধ বালক, হিতোপদেশ মানে না। "মিথ্যাগ্রহণ" না করার ফলে পুলিশের তাড়াহুড়া খাইয়া দুইজন উকিল বাবু পলাইয়া রাঁচি আসিয়াছেন। তোমাদের বাড়ীর অদূরেই তাঁহাদের বাসা। কিন্তু জান, "চোর না শুনে ধরম কাহিনী।" রাঁচির এই অবিরাম বৃষ্টি কাদাতেও তাহাদের শান্তি নাই। তাঁহারা আদাজল খাইয়া, দিনের বেলা বালি কাঁকর কাদা জল মাখিয়া "মিথ্যাগ্রহণ"-এর বিরুদ্ধে সত্যপ্রচার প্রয়াসে লেক্‌চার দিয়া দিয়া দেশের শান্তি নষ্ট করিয়া বেড়ান ; আর রাত্রিকালে দুই বন্ধুতে প্ল্যানচেট লইয়া দেবলোকের শান্তিভঙ্গ করেন। রাত্রি ১২টা/১টা পর্য্যন্ত উকিল বাবুদের ডাকাডাকির জ্বালায় অস্থির থাকিতে হয়। তোমাদের নরলোকে যা হোক শান্তিনেশে যুবকদের শাস্তি দিবার জন্য সি. আই. ডি আছে ; কিন্তু সুরলোকে তাহাদের জব্দ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই। তাই দেখ না, এত রাত্রে উকিল বাবুদের বাসা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় আমার বাষ্পরথ তোমাদের ছাদের কলসে আটকাইয়া পড়ে, আমিও সশব্দে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছি। বৃদ্ধ বয়সে বৃষ্টি ভেজা সহ্য হয় না, তাই যেমনই বীরবালা বীণা বাতায়ন খুলিয়াছেন, অমনি আমি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছি।

ননী। কিন্তু দেব ! বাতায়নে লোহার গরাদ আছে যে।

ত্বস্তি। আরে, রাখ তোমার উইদষ্ট গরাদ ! বিশেষতঃ আমাকে আটকায় কে?

ননী। দেব ! আপনি কি কি উপাদানে পুরুষ সৃষ্ট করিয়াছেন, তাহা জানিতে বড় কৌতূহল হয়।

ত্বস্তি। না বাছা ! আমার সময় নাই। এখন আমি আসি। তোমরা ঘুমাও।

কিন্তু আমরা সকলেই তাঁহাকে বেশ করিয়া ধরিয়া বসিলাম। পুরুষ সৃষ্টির রহস্য না শুনিয়া তাঁহাকে কিছুতেই যাইতে দিব না।

শিরীন। আপনি অনেকক্ষণ বৃষ্টিজলে ভিজিয়াছেন, এক পেয়ালা গরম চা খাবেন। আপনি গল্প বলুন, আমি চা প্রস্তুত করিতে বলি। (অতঃপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,) মারো—

ত্বস্তি। (সচকিতে) সে কি? কাহাকে মারিবে?

শিরীন হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

ত্বস্তি। উনি লাঠীয়াল ডাকিতে গেলেন না কি?

বীণা। (কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া) না, তিনি চাকরাণী ডাকিতে গেলেন। উহার চাকরাণীর নাম "মারো"![৯] আপনি এখন গল্প বলুন। ঐ দেখুন, শিরীন বেগম সাহেবাও ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ত্বস্তি। তোমরা নেহাৎ ছাড়িবে না, তবে আর কি করা। তোমরা মেয়েরাও দেখিতেছি, উকিল বাবুদের চেয়ে কম নও! তাঁহারা তবু আইন কানুনের দোহাই মানেন, তোমরা কিছুই মান না। শুনিলে ত তোমাদের মনে থাকিবে না। তবে ননি, তুমি কাগজ কলম লইয়া বস। আমি বলিয়া যাই, তুমি তাড়াতাড়ি লিখ। দেখ, খুব দ্রুতগতি লিখিবে।

ননী যতক্ষণ কলম দোয়াত অন্বেষণ করিতেছিলেন, ততক্ষণে বীণা কাগজ পেন্সিল হস্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,"দেব! সময়ের অল্পতার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনি বলুন, আমি শর্টহ্যাণ্ডে লিখিয়া ফেলিতেছি। আমি মিনিটে শর্টহ্যাণ্ডের তিনশত শব্দ লিখিতে পারি।" ইহা শুনিয়া মহাত্মা ত্বস্তি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলেন, বীণা লিখেন, আর আমরা নীরবে শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলাম।

দেখিলাম, বেচারা ত্বস্তিদেব নিদ্রায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। তিনি কখনও বা হাই তুলিয়া ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়নে অনুচ্চস্বরে বলিতেছিলেন; আবার কখনও চক্ষুমর্দ্দন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিলেন এবং বীণা ঠিক লিখিয়াছেন কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন ভুল থাকিলে তাহা কাটিয়া পুনরায় লিখাইতেছিলেন। তিনি যে নিদ্রা-কাতর নহেন, এতখানি বাগাড়ম্বর দ্বারা যেন তাহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন! একবার তিনি গর্জ্জনস্বরে বলিলেন,

"জান বৎসেগণ! কন্যা রচনার সময় আমার হস্তে কোন বস্তুই ছিল না; সুতরাং আমাকে কোন দ্রব্যের গন্ধ, কোন বস্তুর স্বাদ এবং কোন পদার্থের বাষ্প মাত্র সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পুরুষ নির্ম্মাণের সময় আমাকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় নাই। আমার ভাণ্ডারে

---

৯. বেচারী চাকরাণীর সুন্দর "মরিয়ম"নামটি বিকৃত হইয়া "মারো"তে পরিণত হইয়াছে। আমি বেহার অঞ্চলে থাকাকালীন অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কতিপয় মহিলার নাম শ্রবণের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। যথা—'হাশো," "লাতো", "দুল্লু","উল্লু", "জুব্বা" ইত্যাদি। নামগুলির স্বরূপ না দেখাইলে উহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে এবং পাঠিকা ভগিনী ও ত্বস্তিদেবের মত ভীত হইতে পারেন। তবে শুনুন, "হাশমত আরা" "লতিফন্নেসা" " দৌলতন্নেসা" "অলিউন্নেসা" এবং "জোবেদা"।

সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ছিল,— হস্ত প্রসারণ করিলে যাহা হাতে ঠেকিয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। যথা—দন্ত নির্ম্মাণের সময় সর্পের বিষদন্ত আমূল লইয়াছি ; হস্ত পদ নখ প্রস্তুত করিতে শার্দ্দূলের সমস্ত নখর লইয়াছি ; মস্তিষ্কের কোষসমূহ (cells) পূর্ণ করিবার সময় গর্দ্দভের গোটা মস্তিষ্কটাই ব্যবহার করিয়াছি। নারী সৃজনকালে আমি শুধু অনলের উত্তাপ লইয়াছিলাম ; পুরুষের বেলায় একেবারে জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়াছি। বাছা ! তুমি তাহাই লিখ।"

বীণা লিখিলেন, (জ্বলন্ত অঙ্গার)।

ত্বস্তি। বৎসে ! মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, রমণীর বেলায় আমি তুহিনের শৈত্যটুকু মাত্র লইয়াছিলাম, পুরুষের বেলায় তুষার খণ্ড,— এমনকি আস্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা ব্যবহার করিয়াছি। তাহা কি তুমি লিখিয়াছ বীণা ?

বীণা কাগজ দেখাইলেন—(তুষার, কাঞ্চনজঙ্ঘা)।

শিরিন। আগ্নেয়গিরি বিসুবিয়াস (Vesuvius) এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা যে পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই আমরা পুরুষের নিজের ভাষায়ই পুরুষের বর্ণনা এইরূপ দেখিতে পাই যে এখনই—

"জ্বলিল ললাট বহ্নি প্রদীপ্ত শিখায়
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ,
ধরিল সংহার মূর্ত্তি, রুদ্র ব্যোমকেশ
গর্জ্জিয়া সংহার শূল করিলা ধারণ।"

আবার পর মুহূর্ত্তেই (অবশ্য "পার্ব্বতী বাক্যেতে রুদ্র ত্যাজি উগ্রভাব")—

"সহাস্য বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি কহিলা,
আখণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম।"

শ্রুতলিপি শেষ হইলে মহাত্মা ত্বস্তি বলিলেন, "দেখ বাছা ! তুমি ইহা সহজ ভাষায় লিখিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে, যেন একটি শব্দ, এমনকি একটি ছেদ পর্য্যন্তও এদিক ওদিক না হয়।"

বীণা। তাহাই হইবে ; আপনি ভাবিবেন না। আমি বেশ সাবধানে লিখিব। নচেৎ প্রভুর অত্যন্ত কষ্ট হইবে—এখন ত কেবল পুরুষেরা ডাকাডাকি করে, তখন মেয়েরাও জ্বালাতন করিয়া মারিবে !

অতঃপর ত্বস্তিদেব বিদায় হইলে সকলে যে যাহার শয্যা আশ্রয় করিলেন। কিন্তু আমি শয়ন করিতে যাইবার সময় কি জানি কিরূপে পড়িয়া গেলাম। সেই পতনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি আমি তখনও সোফায় বসিয়া ; গৃহকোণে মোমবাতিটা মিটিমিটি জ্বলিতেছে, আর শিরীন ও বীণা মড়ার সহিত বাজী রাখিয়া ঘুমাইতেছেন ! দূরাগত কুক্কুটধ্বনি শ্রবণে বুঝিলাম, রজনীর অবসান হইয়াছে। তবে কি এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম ?

অগ্রন্থিত প্রবন্ধ

কূপমণ্ডূকের হিমালয় দর্শন

এখন আমরা হিমালয়ে আছি। অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হইল, আমি পর্ব্বত দেখিলাম। পাঠিকাদিগের নিকট হিমালয় নূতন বোধ না হইতে পারে, কিন্তু আমার জন্য ইহা সম্পূর্ণ নূতন। পুস্তকে সাগর, ভূধর, নির্ঝর ইত্যাদির বিষয় পাঠে দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইত—নীরবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতাম, এসব দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। বেশী দুঃখ হইত, এই ভাবিয়া যে, সুদূর ইউরোপের লোকেরা আমাদের হিমালয় দেখিয়া যায়, আর আমরাই তাহা দেখিতে পাই না। এতদিনে ঈশ্বর-কৃপায় আমরাও হিমালয় দেখিলাম।

যথাসময় যাত্রা করিয়া শিলিগুড়ি স্টেশনে আসিয়া পহুঁছিলাম। শিলিগুড়ি হইতে হিমালয় রেল রোড আরম্ভ হইয়াছে। ইস্ট ইণ্ডিয়ান গাড়ীর অপেক্ষা ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলগাড়ী ছোট। হিমালয়ান রেলগাড়ী আবার তাহার অপেক্ষাও ছোট, ক্ষুদ্র গাড়ীগুলি খেলনা গাড়ীর মত বেশ সুন্দর দেখায়। আর গাড়ীগুলি খুব নীচু। —যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে চলিবার সময়ও অনায়াসে উঠিতে নামিতে পারেন।

আমাদের ট্রেন অনেক আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল—গাড়ীগুলি "কটাটটা"—শব্দ করিতে করিতে কখনও দক্ষিণে কখনও উত্তরে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল। পথের দুই ধারে মনোরম দৃশ্য—কোথাও অতিউচ্চ (Steep) চূড়া, কোথাও নিবিড় অরণ্য।

মাঝে মাঝে কয়েকটি Refreshment Room এবং স্টেশন দেখিলাম। প্রায় সব স্টেশনেই Ladie's waiting room আছে। ঘরগুলি বেশ furnished, আমাদের সহযাত্রী ইউরোপীয়া ভগ্নীগণ প্রায় প্রত্যেক স্টেশনেই এক একবার নামিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন। Waiting room-এ মুখ ধুইবার পেয়ালাও অনেক—একসঙ্গে চারিজন হাত মুখ ধুইতে পারে। ভগ্নীরা আর কিছু সঙ্গে রাখুন বা না রাখুন, চিরুণী, ব্রাস পাউডার ত রাখেন। বাঙ্গালী মেয়েরা এত ঘন ঘন চুল বিন্যাস করিতে পারে না। যাহা হউক ইউরোপীয় ভগ্নীদের স্ফূর্ত্তি খুব প্রশংসনীয়। ওয়েটিং রুমে "ভুটিয়ানী" আয়া উপস্থিত থাকে।

ক্রমে আমরা সমুদ্র (Sea level) হইতে তিন হাজার ফীট উচ্চে উঠিয়াছি, এখনও শীত বোধ হয় না, কিন্তু মেঘের ভেতর দিয়া চলিয়াছি। নিম্ন উপত্যকায় নির্ম্মল শ্বেত কুজ্ঝটিকা দেখিয়া সহসা নদী বলিয়া ভ্রম জন্মে। তরু, লতা, ঘাস, পাতা—সকলই মনোহর। এত বড় বড় ঘাস আমি পূর্ব্বে দেখি নাই। হরিদ্বর্ণ চায়ের ক্ষেত্রগুলি প্রাকৃতিক শোভা আরও শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। দূর হইতে সারি সারি চারাগুলি বড় সুন্দর বোধ হয়। মাঝে মাঝে মানুষের চলিবার সঙ্কীর্ণ পথগুলি ধরণীর সীমন্তের ন্যায় দেখায়! নিবিড় শ্যামল বন বসুমতীর ঘন কেশপাশ, আর পথগুলি আঁকাবাঁকা সিঁথি ! !

রেলপথে অনেকগুলি জলপ্রপাত বা নির্ঝর দৃষ্টিগোচর হইল—ইহার সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। কোথা হইতে আসিয়া ভীম-বেগে হিমাদ্রির পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ করিতে করিতে ইহারা কোথায় চলিয়াছে! ইহাদেরই কোন একটি বিশালকায়া জাহ্নবীর উৎস, একথা সহসা বিশ্বাস হয় কি? একটি বড় ঝর্ণার নিকট ট্রেন থামিল, আমরা ভাবিলাম, যাহাতে আমরা প্রাণ ভরিয়া জলপ্রবাহ দেখিতে পাই, সেই জন্য বোধ হয় গাড়ী থামিয়াছে। (বাস্তবিক সেজন্য কিন্তু ট্রেন থামে নাই—অন্য কারণ ছিল। সেইখানে জল পরিবর্ত্তন করা হইতেছিল) যে কারণেই ট্রেন থামুক—আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইল।

এখন আমরা চারি হাজার ফীট ঊর্ধ্বে উঠিয়াছি, তবু শীত অনুভব করি না, কিন্তু গরমের জ্বালায় যে এতক্ষণ প্রাণ কণ্ঠাগত ছিল—সে জুলুম হইতে রক্ষা পাইলাম। অল্প অল্প বাতাস মৃদু গতিতে বহিতেছে। এইখানে ৪১২০ ফীট উচ্চে "মহানদী" স্টেশন। স্টেশনের নামটা খুব ভালমত পড়িতে পারি নাই, যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় "মহানদী"ই নাম। যাহা হউক, যদি স্টেশনের নাম ভুল হইয়া থাকে, তাহা আমার দোষ নহে,—স্টেশন হইতে আমার গাড়ীর দূরত্বের সে দোষ।

অবশেষে কারসিয়ং স্টেশনে উপস্থিত হইলাম, এখানকার উচ্চতা ৪৮৬৪ ফীট। স্টেশনে অত্যন্ত ভীড় দেখিয়া আমি Ladie's waiting room-এ একটু বসিলাম। ইউরোপীয় ভগ্নীদের মুখ ধোয়া এবং কেশ বিন্যাস দেখিলাম। একজনের সঙ্গে কচি ছেলে ছিল, তিনি আয়াকে ছেলের মুখ ধোয়াইতে হুকুম দিয়া গাড়ীতে উঠিতে গেলেন। আয়ার কি গরজ, যে ছেলের মুখ ধোয়াইবে? সে তাঁহার পরিত্যক্ত তোয়ালে দ্বারা ছেলের মুখ মুছাইয়া অনুমান দশ সেকেণ্ড দেরী করিয়া গাড়ী অভিমুখে ছুটিল। চাকরের উপর নির্ভর করিলে ঐ রূপ হয়ই। ট্রেন ছুটিলে ভীড় কম হইল, তখন আমরা ওয়েটিং রুম ছাড়িয়া উঠিলাম।

স্টেশন হইতে আমাদের বাসা অধিক দূরে নহে, শীঘ্রই আসিয়া পঁহুছিলাম। আমাদের ট্রাঙ্ক কয়টা ভ্রমক্রমে দার্জ্জিলিঙ্গের ঠিকানায় book করা হইয়াছিল। জিনিষপত্রের অভাবে বাসায় আসিয়াও (সন্ধ্যার পূর্ব্বে) গৃহসুখ (at home) অনুভব করিতে পারি নাই। সন্ধ্যার ট্রেনে আমাদের ট্রাঙ্কগুলি ফিরিয়া আসিল। আমাদের দার্জ্জিলিং যাবার পূর্ব্বে আমাদের জিনিষপত্র তথাকার বায়ু সেবন করিয়া চরিতার্থ হইল। পরদিন হইতে আমরা সম্পূর্ণ গৃহসুখে আছি। তাই বলি, কেবল আশ্রয় পাইলে সুখে গৃহে থাকা হয় না, আবশ্যকীয় আসবাব-সরঞ্জামও চাই।

এখানে এখনও শীতের বৃদ্ধি হয় নাই, গ্রীষ্মও নাই। এ সময়কে পার্ব্বত্য বসন্তকাল বলিলে কেমন হয়? সূর্য্যকিরণ প্রখর বোধ হয়। আমাদের আসিবার পর একদিন মাত্র সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল। বায়ু ত খুবই স্বাস্থ্যকর, জল নাকি খুব ভাল নহে। আমরা পানীয় জল ফিল্টারে ছাঁকিয়া ব্যবহার করি। জল কিন্তু দেখিতে খুব পরিষ্কার স্বচ্ছ। কূপ নাই, নদী পুষ্করিণীও নাই—সবে ধন নির্ঝরের জল। ঝরণার সুবিমল, সুশীতল জলদর্শনে চক্ষু জুড়ায়, স্পর্শনে হস্ত জুড়ায় এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত শীতল বাতাসে, না ঘন কুয়াশায় প্রাণ জুড়ায়!

এখানকার বায়ু পরিষ্কার ও হাল্কা। বায়ু এবং মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখিতে বেশ চমৎকার। এই মেঘ এদিকে আছে, ওদিক হইতে বাতাস আসিল, মেঘখণ্ডকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। প্রতিদিন অস্তমান রবি বায়ু এবং মেঘ লইয়া মনোহর সৌন্দর্য্যের রাজ্য রচনা

করে। পশ্চিম গগনে পাহাড়ের গায় তরল স্বর্ণ ঢালিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর খণ্ড খণ্ড সুকুমার মেঘগুলি সুকোমল অঙ্গে সুবর্ণ মাখিয়া বায়ুভরে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে থাকে। ইহাদের এই তামাসা দেখিতেই আমার সময় অতিবাহিত হয়, আত্মহারা হইয়া থাকি, আমি কোন কাজ করিতে পারি না।

মনে পড়ে একবার "মহিলা"য় ঢেঁকির শাকের কথা পাঠ করিয়াছি। ঢেঁকি শাককে আমি ক্ষুদ্র গুল্ম বলিয়াই জানিতাম। কেবল ভূ-তত্ত্ব (Geology) গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম যে, কারবনিফেরাস যুগে বড় বড় ঢেঁকিতরু ছিল। এখন সেই ঢেঁকিতরু স্বচক্ষে দেখিলাম—ভারী আনন্দ হইল। একটা ডাল ভাঙ্গিয়া মাপিলাম ১১ ফীট লম্বা। স্বয়ং তরুবর ২০/২৫ ফীট উচ্চ হইবে।

কোন কোন স্থানে খুব নিবিড় বন। সুখের বিষয় বাঘ নাই, তাই নির্ভয়ে বেড়াইতে পারি, আমরা নির্জ্জন বন্য পথেই বেড়াইতে ভালবাসি। সর্প এবং ছিনে জোঁক আছে। এ পর্য্যন্ত সর্পের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। কেবল দুই তিনবার জোঁকে রক্ত শোষণ করিয়াছে।

এদেশে স্ত্রীলোকেরা জোঁক দেখিলে ভয় পায় না। আমাদের ভুটিয়া চাকরানী "ভালু" বলে, "জোঁকে কি ক্ষতি করে? রক্ত শোষণ শেষ হইলে আপনিই চলিয়া যায়।" ভুটিয়ানীরা সাত গজ লম্বা কাপড় ঘাঘরার মত করিয়া পরে, কোমরে একখণ্ড কাপড় জড়ানো থাকে, গায় জ্যাকেট এবং বিলাতী শাল দ্বারা মাথা ঢাকে, পৃষ্ঠে দুই এক মণ বোঝা লইয়া অনায়াসে প্রস্তরসঙ্কুল আবুড়া খাবুড়া পথ বহিয়া উচ্চে উঠে। ঐ রূপ নীচেও যায়। যে পথ দেখিয়াই আমাদের সাহস "গায়েব" হয়—সেই পথে উহারা বোঝা লইয়া অবলীলাক্রমে উঠে।

"মহিলার সম্পাদক মহাশয় আমাদের সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন যে, "রমণীজাতি দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহাদের নাম অবলা"। জিজ্ঞাসা করি, এই ভুটিয়ানীরাও ঐ অবলা জাতির অন্তর্গত না কি? ইহারা উদরান্নের জন্য পুরুষের প্রত্যাশী নহে, সমভাবে উপার্জ্জন করে। বরং অধিকাংশ স্ত্রীলোকদিগকেই পাথর বহিতে দেখি—পুরুষেরা বেশী বোঝা বহন করে না। অবলারা প্রস্তর বহিয়া লইয়া যায়। "সবলেরা" পথে পাথর বিছাইয়া রাস্তা প্রস্তুত করে, সে কাজে বালক বালিকারাও যোগদান করে। এখানে "সাবলারা" বালক বালিকার দলভুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

ভুটিয়ানীরা "পাহাড়নী" বলিয়া আপন পরিচয় দেয়, এবং আমাদিগকে "নীচেকা আদমী" বলে। যেন ইহাদের মতে "নীচেকা আদমী"ই অসভ্য। স্বভাবতঃ ইহারা শ্রমশীলা, কার্য্যপ্রিয়, সাহসী ও সত্যবাদী। কিন্তু "নীচেকা আদমীর" সংস্রবে থাকিয়া ইহারা ক্রমশঃ সদগুণরাজী হারাইতেছে। বাজারের পয়সা অল্পস্বল্প চুরি করা, দুধে জল মিশানো ইত্যাদি দোষ শিখিতেছে। আবার "নীচেকা আদমীর" সঙ্গে বিবাহও হয়। ঐরূপে উহারা অন্যান্য জাতির সহিত মিশিতেছে।

মুসলমান ধর্ম্মে শাস্ত্রানুমোদিত পর্দ্দা রক্ষা করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করা যায়, একথা অনেকেই বুঝে না। তাই তাহারা বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইলে মহাবিপদ ভাবে। শাস্ত্রে পর্দ্দা সম্বন্ধে যতটুকু কঠোর ব্যবস্থা আছে, প্রচলিত পর্দ্দা প্রথা তদপেক্ষাও কঠোর। যাহা হউক কেবল শাস্ত্র মানিয়া চলিলে অধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। আমার বিবেচনায় প্রকৃত পর্দ্দা সে-ই রক্ষা করে, যে সমস্ত মানব জাতিকে সহোদর ও সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করে।

আমাদের বাসা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে বড় একটা ঝরণা বহিতেছে, এখান হইতে ঐ দুগ্ধফেননিভ জলের স্রোত দেখা যায়। দিবানিশি তাহার কল্লোল গীতি শুনিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ ত্রিগুণ বেগে প্রবাহিত হয়। বলি, প্রাণটাও কেন ঐ নির্ঝরের ন্যায় বহিয়া গিয়া পরমেশ্বরের চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়ে না?

অধিক কি বলিব, আমি পাহাড়ে আসিয়া অত্যন্ত সুখী এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছি। সমুদ্রের সামান্য নমুনা, অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর দেখিয়াছি, বাকী ছিল পর্ব্বতের একটি নমুনা দেখা। এখন সে সাধও পূর্ণ হইল।

না, সাধ ত মিটে নাই যত দেখি, ততই দর্শন পিপাসা শতগুণে বাড়ে। বিভু কেবল দুইটি চক্ষু দিয়াছেন, তাহা দ্বারা কত দেখিব? প্রভু অনেকগুলি চক্ষু দেন নাই কেন? যত দেখি যত ভাবি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। প্রত্যেকটি উচ্চশৃঙ্গ, প্রত্যেকটি ঝরণা প্রথমে যেন বলে, "আমায় দেখ। আমায় দেখ"। যখন তাহাকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দেখি তখন যেন তাহারা ঈষৎ হাস্যে ভ্রূকুটি করিয়া বলে, "আমাকে কি দেখ? আমার স্রষ্টাকে স্মরণ কর"। ঠিক কথা। চিত্র দেখিয়া চিত্রকরের নৈপুণ্য বুঝা যায়। নতুবা কেবল নাম শুনিয়া কে কাহাকে চিনে? আমাদের জন্য হিমালয়ের এই পাদদেশটুকু কত বৃহৎ, কত বিস্তৃত, কি মহান! আর সেই মহাশিল্পীর সৃষ্ট জগতে হিমালয় কত ক্ষুদ্র। বালুকাকণা বলিলেও বড় বলা হয়।

আমাদের এমন সুন্দর চক্ষু, কর্ণ, মন লইয়া যদি আমরা স্রষ্টার গুণকীর্ত্তন না করি, তবে কি কৃতঘ্নতা হয় না? মন, মস্তিষ্ক, প্রাণ সব লইয়া উপাসনা করিলে তবে তৃপ্তি হয়। কেবল টীয়া পাখীর মত কণ্ঠস্থ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে (অন্ততঃ আমার মতে) উপাসনা হয় না। তদ্রূপ উপাসনায় প্রাণের আবেগ থাকে কই? ভাবের উচ্ছ্বাস থাকে কই? ভারের উচ্ছ্বাস থাকে কই? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন কালে মন প্রাণ স্বতঃই সমস্বরে বলিয়া উঠে, "ঈশ্বরই প্রশংসার যোগ্য। তিনিই ধন্য।" তখন এসব কথা মুখে উচ্চারণের প্রয়োজনও হয় না।

কূপমণ্ডূকের হিমালয় বর্ণনা আজি এইখানে সমাপ্ত।

রসনা-পূজা

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু পূজা করিয়া থাকে। কেহ অগ্নি উপাসক, কেহ চন্দ্র-সূর্য্যের উপাসক, কেহ জড়-পুত্তলিকা উপাসক ইত্যাদি। কেবল নিষ্ঠাবান মুসলমান অদ্বিতীয় ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বস্তুর উপাসনা করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ রসনা-পূজা করিয়া থাকেন। যদি আমি ইহাদিগকে "রসনা-পরস্ত" (রসনা-উপাসক) বলি, তবে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। এবং নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সমাজে 'বুতপরস্তি'-ও যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।[১] যেহেতু দেবতাদের অনুকরণে অনেকগুলি পীরের নাম শুনা যায়—এক এক প্রকার বিপদে এক এক পীরের অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত

১. যদ্যপি তর্কের অনুরোধে এবং গলাবাজির জোরে অস্বীকার করা হইয়া থাকে সে ভিন্ন কথা!

"নজর ও নেয়াজ" দিতে হয়! যাহাকে ক্ষিপ্ত কুকুর দংশন করে, সে বেচারা "কোত্তা (কুকুর) পীরের দরগাহে" (মন্দিরে?) গিয়া "নজর" (দর্শনী) মানস করিয়া আইসে! হঠাৎ কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে "আচানক (হঠাৎ) পীরের" উদ্দেশ্যে রোজা রাখা হয়!! সম্ভবতঃ পা খোঁড়া হইলে "লঙ্গর শাহের দরগাহে" "শিন্নী" লইয়া যাইতে হয়!![২]

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর পূজা করিলে আত্মার অধঃপতন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রকার অবনতিও হয়। আমাদের দুর্গতি ও অবনতির কারণ অনেকে অনেক রূপে অনুমান করেন; আমার বোধ হয় রসনা-পূজা ইহার অন্যতম কারণ। স্ত্রীলোকেরা ঐ পূজার আয়োজনে সমস্ত সময় ব্যয় করেন। অন্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে তাঁহাদের অবসর থাকে না। সমস্ত দিন ও অর্ধরাত্রি ত তাঁহাদের রন্ধনের চিন্তায়ই অতিবাহিত হয়, পরে নিদ্রায় স্বপ্ন দেখেন —"যাঃ! মোরব্বার সিরা (চিনির রস) জ্বলিয়া গেল!"

আমরা আহার ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারি না, সত্য। আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন হয়। মনে রাখিবেন—ভোজনের উদ্দেশ্য শরীরের পুষ্টিসাধন। কিন্তু সচরাচর আমাদের খাদ্যসামগ্রী যেরূপ হয়, তাহাতে শরীরের পুষ্টিসাধন হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া শরীরের ধ্বংস সাধন হয়। আমাদের চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—খাদ্যগুলি কেবল রসনা-দেবের তৃপ্তির নিমিত্ত প্রস্তুত হয়।

জনৈক ডাক্তার একদা কোন ধনী মুসলমান কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন: "আপনার বাড়ী একদিন খেয়ে আমি তিনদিন খেতে পারি নাই। এই রকম খাবার আপনারা সর্ব্বদাই খেয়ে থাকেন, কাজেই আপনাদের অসুখ ছাড়ে না।" ডাক্তারবাবু ঠিক বলিয়াছেন। আবার মজা এই যে, চিররুগ্ন জীবন বহন করাই ভদ্রতার লক্ষণ! কুশল প্রশ্ন করিলে কেহ সহসা উত্তর দেয় না, "সম্পূর্ণ ভাল আছি।" তাদৃশ চিররুগ্ন অবস্থা রমণী-সুলভ কোমলতা ("নাজাকৎ!") বলিয়া প্রশংসিত হয়। কেবল চাষা স্ত্রীলোকেরা সবল সুস্থ থাকে।

আহারের অত্যাচার যে কেবল ধনবানের গৃহে হয়, তাহা নহে, দরিদ্রের জীর্ণ কুটিরেও সুযোগ অনুসারে রসনা-পূজা হইয়া থাকে।

শুনিতে পাওয়া যায়, কোন ডেপুটি কালেক্টর নাকি বলিতেন, "(দরিদ্র) কুলীন মুসলমান আমি বেশ চিনি। যদি কাহারও মুখ দেখিয়া চিনিতে না পারি, তবে একবার তার বাড়ী গেলে আর চিনিতে বাকী থাকে না। কুলীনের লক্ষণ এই,—

"কাহারও বাড়ী গেলে দেখিবে, চালের উপর খড় নাই, ঘরখানার চারিদিক আবর্জ্জনাময়, বসিবার একটু স্থান নাই; মাথার উপর (চালে) মাকড়সার জাল ঝুলিতেছে—এইরূপ ত হীন অবস্থা। কিন্তু জলখাবার সময় দেখিবে, অতি উৎকৃষ্ট পারাটা, কোর্ম্মা, কাবাব উপস্থিত —আমাদের সাত দিনের খাবার খরচ তাঁহার একদিনে ব্যয় হয়।"

যদি উক্ত কালেক্টর মহাশয় কখন কাহার বহির্বাটী দেখিয়া কুলীন চিনিতে না পারেন, তবে তিনি একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে গৃহস্বামীর কৌলীন্য সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ

---

১. হিন্দুদের নৈবেদ্যের সহিত উক্ত প্রকার 'নজর ও নেয়াজে'র সাদৃশ্য নাই কি?

থাকিবে না! কিন্তু সে ডেপুটি কালেক্টরের ভাগ্যে অন্তঃপুর দর্শনলাভ অসম্ভব। অতএব আমরা একটু নমুনা দেখাই,—

প্রথমে রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হউন—দ্বারদেশে পচা কাদা ; হংস, কুক্কুট ইত্যাদি সেই (পচা ফেনমিশ্রিত) কাদা ঘাঁটিতেছে, তাহার দুর্গন্ধে আপনার ঘ্রাণেন্দ্রিয় ত্রাহি ত্রাহি করিবে।[৩] কিন্তু পশ্চাৎপদ হইবেন না—কোনমতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন কেহ বাটনা বাটিতেছে, কেহ কুটনা কুটিতেছে, কেহ কেওড়া বা গোলাপ জলে জাফরান ভিজাইতেছে ইত্যাদি। এখানকার সুগন্ধ এতই আনন্দপ্রদ (inviting) যে ব্রাহ্মণের পৈতা ছিঁড়িতে ইচ্ছা হইবে! পারাটা, সমোসা ভাজার সৌরভ কি চমৎকার—বলিহারি যাই! এখানকার সৌন্দর্য দেখিলেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে যায়, তৃপ্তি হয়, আহার ত দূরে থাকুক। এখানে দাঁড়াইয়া আপনার বোধ হইবে—"আঃ মরি! মরি! এ কোন্ সৌরভ-রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম! —এ স্বর্গ নাকি!!"

আমাদের খাদ্য সম্বন্ধীয় পরিচ্ছন্নতা সময় সময় সীমা লঙ্ঘন করে। যেমন, মাংস এত ধোওয়া হয় যে, তাহার বলকারক গুণ থাকে না, গরম জলে মাংস ধুইলে মাংসে আর থাকে কি? অন্যান্য বস্তুও প্রায় প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিষ্কার করা হয়। এই প্রকার খাদ্যদ্বারা কেবল জড় রসনার পূজা হয়।

আমরা কেবলই রসনা-পূজায় সময় কাটাই। আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জ্ঞানচর্চ্চা ত আমরা জানিই না। সামান্য সূচিকার্য্য ও রন্ধন-প্রণালী কেবল আমাদের শিক্ষণীয়। ৫০০ রকমের আচার চাটনী ; ৪০০ প্রকার মোরব্বা প্রস্তুত করিতে জানিলেই সুগৃহিণী বলিয়া পরিচিতা হইতে পারা যায়। রমণী রাঁধুনীরূপে জন্মগ্রহণ করে, এবং মরণে বাবুর্চ্চি-জীবনলীলা সাঙ্গ করে। আমাদের সুখের চরম সীমা সচরাচর উপাদেয় খাদ্য রাঁধিতে শিক্ষা করা ও বিবিধ অলঙ্কার ব্যবহার করা পর্য্যন্ত!

এইরূপ অত্যধিক রসনা-পূজায় বিলাসিতা বৃদ্ধি পায়। এস্থলে রসনা-পূজার কেবল ত্রিবিধ অনিষ্টের উল্লেখ করা গেল—(১) ব্যয়-বাহুল্য বা অপব্যয়, (২) শ্রম-বাহুল্য এবং (৩) স্বাস্থ্য নষ্ট । ময়দার পারাটা ও মসলা-বহুল কোর্ম্মা সহজে পরিপাক হয় না, তাহা দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। কারণ ঐ দুষ্পাচ্য খাদ্যের পরিপাক কার্য্যে আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলিকে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ঐ শক্তি যোগাইতে গিয়া শরীরের অন্যান্য যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাদৃশ অখাদ্য রাঁধিতে গৃহিণীদের অনর্থক সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করা হয়।

শরীরের পুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আহার করিতে গেলে রসনা-পূজা ত্যাগ করিতে হইবে। প্রতিদিন অত ছাই-ভস্ম না খাইয়া কেবল যথানিয়মে উপযুক্ত পরিমাণে সুখাদ্য খাইলেই আহারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। মোহনভোগ ফিরণী ইত্যাদির পরিবর্ত্তে পাতলা দুধ খাওয়া যুক্তিসিদ্ধ।

উক্ত প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিতে অপেক্ষাকৃত সময় কম লাগে। ব্যয়ও পরিমিত হয়। ঐ অবসরটুকু অন্য সৎকার্য্যে ব্যয় হইতে পারে।

---

৩. অভ্যাসের কৃপায় গৃহিণী বা গৃহস্বামীর নিকট ঐ দুর্গন্ধ অপ্রিয়বোধ হয় না।

আমরা রসনা-পূজা করিতে বসিয়া অধঃপাতে গিয়াছি। দিল্লীর সম্রাটগণ বিলাস-স্রোতে ভাসিয়াই দিল্লী হারাইয়াছেন। এস্থলে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা গেল। দিল্লীশ্বর মোহাম্মদ শাহের সহিত নাদির শাহ যুদ্ধ করিতেছিলেন। মোহাম্মদ শাহ ছিলেন বিলাসী—সর্ব্বদা নানাবিধ সুস্বাদু বস্তু দ্বারা রসনা-পূজা করিতেন, তাই পরাস্ত হইয়া সিংহাসন হারাইলেন, আর নাদির শাহ রসনা-উপাসক ছিলেন না—কেবল শুষ্ক রুটি ও কাবাব খাইতেন, তাই বিজয়ী হইয়া মোহাম্মদ শাহের মুকুট ও সিংহাসনে লইতে পারিলেন। দেখুন ত শুষ্ক রুটির গুণ ক্ষমতা কত! অতীতের পুরাতন কথা ছাড়িয়া দিলে, বর্ত্তমানে রুশ-জাপান যুদ্ধেও তাই দেখা যায়। রুশীয়দের অপেক্ষা জাপানীদের ভোজনের আড়ম্বর কম, অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জাপান অমিত তেজের পরিচয় দিতেছে। তাই দেখুন, কেবল আহার করিলে বলবৃদ্ধি হয় না। খাদ্য পরিপাক হইলে লাভ, নচেৎ না।

অল্প আহারে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না, বরং পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হয়। অনেকে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। কোন কোন রোগে অন্য চিকিৎসা না করিয়া কেবল আহার পরিমিত করায় রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। একটা প্রবাদ আছে, "যা না করে বৈদ্যে, তা করে পৈথ্যে।" রসনা সংযত করা মানুষের একান্ত কর্ত্তব্য।

একটা বচন আছে, "মৃত্যুর পূর্ব্বে মরিয়া থাক।" এ মরণের অর্থ ত্যাগ স্বীকার, বৈরাগ্য ইত্যাদি। মানুষ ত্যাগ না করিলে মুক্তি পাইতে পারে না। ক্রমে ক্রমে সংযম শিক্ষা না করিলে হঠাৎ বৈরাগ্য শিক্ষা হয় না। এক লাফে কে গাছের আগায় উঠিতে পারে? ক্রমশঃ এক পা দুই পা করিয়া উঠিতে হয়।

রোজা (উপবাস) ব্রত আমাদিগকে সংযম শিক্ষা দিয়া থাকে। এই রোজা যথানিয়মে পালন করিলে সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়। মানুষ মাত্রেরই সংযম শিক্ষা আবশ্যক। এই জন্য দেখা যায়, "পৃথিবীর প্রায় সমুদয় ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে কোন না কোন প্রকারের উপবাসব্রত বর্ত্তমান রহিয়াছে।"[৪] কারণ মানুষ জানে না, কি প্রকার খাদ্য কি পরিমাণে খাওয়া উচিত।

আক্ষেপের বিষয়, রমজান মাসে আমাদের খাদ্য-সামগ্রীর ধুমধাম সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়। সমস্ত দিন সাংসারিক কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া নির্ম্মল চিত্তে উপাসনা করা ত দূরে থাকুক, "ইফতারী" (সন্ধ্যাকালীন খাবার) প্রস্তুত করিতেই দিন শেষ হয়। কোথায় রসনা সংযত হইবে, না আরও রসনার সেবা বৃদ্ধি পায়। প্রকারান্তরে রোজার নাম করিয়া রসনা-পূজার মহা-আড়ম্বর হয়। পূর্ব্বে মহাপুরুষেরা সামান্য ফল-মূল বা শাক-রুটি দ্বারা সন্ধ্যায় জলপান (ইফতার) করিতেন। রাত্রিতে কি খাইবেন, দিবাভাগে খোদাকে ভুলিয়া সে চিন্তাও করিতেন না। ধর্ম্মগুরু মোহাম্মদ (দঃ) নিশ্চিন্তভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করিবার আশায় সমস্ত দিন পান-ভোজন ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন স্থানে থাকিতেন। আর এদেশের মুসলমানেরা তাঁহার উপযুক্ত (?) শিষ্য কিনা,—"ধর্ম্ম ধর্ম্ম" বলিয়া চীৎকার-স্বরে গগন-মেদিনী কাঁপাইয়া তোলেন,—

---

৪. প্রবন্ধ রচনাকালে মৌলভী মকবুল আলী বি.এ. প্রণীত "রোজা" নামক পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য এই প্রবন্ধে গ্রহণ করা হইয়াছে। উদ্ধৃত অংশটুকু 'রোজা' হইতে গৃহীত।

তাই বন্ধু-বান্ধবের নিমন্ত্রণে ও সন্ধ্যার খাবার-আয়োজনে সমস্ত দিন ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকো ! ! ইহাতে রোজার উদ্দেশ্য যে কত দূর সাধিত হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

যত প্রকার উপবাস-ব্রত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে আমাদের রোজা-ব্রতই শ্রেষ্ঠ—অবশ্য যদি রোজার সব নিয়মগুলি যথাবিধি প্রতিপালিত হয়। ইহা দ্বারা যত উপকার হয়, তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা অসাধ্য। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝেন।

খ্রীস্টীয় রোজার (গুড ফ্রাইডের) সময় ধর্ম্মপরায়ণ খ্রীস্টানগণ শুধু পান-ভোজন ব্যতীত পার্থিব সমুদয় কার্য্য হইতে বিরত থাকেন।[৫] সে সময় তাঁহারা কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন না এবং নিজেরাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন না, নূতন কাপড় পরেন না, একান্ত প্রয়োজন না হইলে কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করেন না,—এক কথায়, সকল প্রকার আমোদ, আহ্লাদ, ভোগ, বিলাস ত্যাগ করেন। ঐ ত্যাগ স্বীকার করায় যে অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহা ঈশ্বরের তুষ্টির জন্য সদ্ব্যয় করেন ! আমাদের "এতেকাফ"-এর[৬] সহিত ঐ ব্রতের কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে প্রভেদ এই যে, "এতেকাফের" সময় মস্‌জিদে বসিয়া মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ নহে। (মৌলভী নইমুদ্দীন প্রণীত "জোব্দাতল মসায়েল" দ্রষ্টব্য।) আর খ্রীস্টানদের তাহা নিষিদ্ধ। (তবে দায়ে পড়িলে ভিন্ন কথা)। এবং আমাদের "ফেতরা" দানের সময়ও ঘরের (অতিরিক্ত) পয়সা বাহির করিতে হয়। মহাত্মা মোহাম্মদ (দঃ) হয়ত বলিয়াছিলেন যে, রোজার সময় আহার পরিমিত করায় যে খরচ বাঁচিয়া যায়, তাহা দ্বারা আপন দরিদ্র প্রতিবেশীর সাহায্য কর ("ফেতরা" দাও) ; কিন্তু বঙ্গীয় মোসলেমগণ তাঁহার ভক্তশিষ্য, তাই উল্টা চাল চালেন ; তাঁহার উপদেশের বিপরীত কার্য্য করেন।[৭] সুতরাং অন্যান্য মাসের ব্যয় অপেক্ষা রমজান মাসে তাঁহাদের ব্যয় বৃদ্ধি হয়। আমার এই কথা প্রমাণিত করিবার জন্য অন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নাই—পাঠিকাগণ আপন আপন জমা-খরচ মিলাইয়া দেখিবেন,—অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান শরীফের খরচ বেশী কিনা।[৮]

হিন্দুগণ সময় সময় ভীম (বা নির্জ্জলা) একাদশী করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না। হিন্দু বিধবারা প্রায় দীর্ঘজীবী হয় একথা কেহ অস্বীকার করেন কি ? বিধবাদের পরমায়ুঃ বৃদ্ধির কারণ এই যে, তাঁহারা রসনা সংযত রাখেন—এক সন্ধ্যা আহার করেন।

পাদ্রীগণ বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানের রোজায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ ব্যতীত কোন ফল লাভ হয় না ; এ কথাটি যুক্তিহীন। প্রমাণ—হিন্দু বিধবার স্বাস্থ্য। তবে "মুসলমান" নামধেয় জীবগণ যদি রোজার সব নিয়মগুলি যথাবিধি পালন না করে, সে দোষ তাহাদের, —রোজার নহে। সকল প্রকার সাংসারিক বস্তু ত্যাগ করাই প্রকৃত রোজা। (নতুবা "ধর্ম্ম হয় না ক'রলে উপবাস।") কিন্তু সচরাচর মুসলমানেরা এই পবিত্র রোজার কি ভয়ানক অবমাননা করিয়া থাকেন ! !

---

৫. অনেকে উপবাসও করিয়া থাকেন। কেহ সর্ব্বদাই প্রতি শুক্রবারে উপবাস করেন।

৬. 'এতেকাফ'-ব্রত বিশেষ। ধর্ম্মোদ্দেশ্যে কোন নির্দিষ্ট স্ত পার্থিব কার্য্য হইতে বিরত থাকা।সময় পর্য্য

৭. ঈদ -উৎসবের দিন যে দান করা হয়, তাহাকে 'ফেতরা' বলে।

৮. রোজা ধর্ম্মের পাঁচটি প্রধান অঙ্গের (কলেমা, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ্জ) এক অঙ্গ। সে রোজা যাহারা ঐরূপে পালন করেন, অথচ 'ইসলাম' 'ইসলাম' বলিয়া শত কণ্ঠে চীৎকার করেন, তাঁহারা 'মুসলমান'ই বটে ! তাঁহাদের নামাজও সেইরূপ !

আমাদিগকে মুসলমান বলিলেও "মুসলমান" শব্দটির অপমান করা হয়। সুতরাং আমাদের ভণ্ড রোজার সম্বন্ধে যে পাদ্রীগণ বলেন, ''Whatever is gained by fasting, is lost by feasting'' (অর্থাৎ, দিনে রোজার দ্বারা যে পুণ্য হয়, তাহা রাত্রির অতি-ভোজনে নষ্ট হয়) তাহা ঠিক। আমাদের রোজার উদ্দেশ্য কেবল রসনা-পূজার মহা ঘটা !

করে মুসলমান "মানুষ" হইবে? রসনা-পূজা ছাড়িয়া ঈশ্বর-পূজা করিতে শিখিবে? জগতের অনেক জাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, ভাল-মন্দ বুঝিয়াছে ; কেবল ইহাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। এখন ত আমাদের আর সে "জরির মসনদ" তাকিয়া বা দুগ্ধফেননিভ শুভ্র কুসম-কোমল "শাহানা বিছানা" নাই, তবে নিদ্রা যাইতেছি কোন্ সুখে? আমাদের অবস্থা এখন এই প্রকার—"ঝোপ্ড়ী মেঁ রহনা ও মহলকা খাব দেখ্না !" অর্থাৎ বর্ত্তমানে কুঁড়ে ঘরে থাকি এবং অতীতের অট্টালিকার স্বপ্ন দেখি ! ! একজন কবি বলিয়াছেন,

I slept and dreamt life was beauty,
I woke and found life is duty.

তাই ত জীবনটা খেলা নহে।

পরিশেষে বলি, জীবন-ধারণের নিমিত্ত আহার করিতে হয়, খাইবার আশায় জীবন-ধারণ করা উচিত বোধ হয় না। ভরসা করি, এবার রমজান শরীফে আপনারা সাবধান থাকিবেন।

ঈদ-সম্মিলন

সংবৎসর পরে আবার ঈদ আসিল। আজি আনন্দের দিন, উৎসবের দিন সমুদয় মোস্‌লেম সমাজের সম্মিলনের দিন।

সারা বৎসরের অবসাদের পর আজি উৎসাহের দিন আসিয়াছে। যেন বসন্ত-সমাগমে মানবের গৃহরূপ কাননে অসংখ্য প্রীতি-কুসুম ফুটিয়াছে। বালক-বালিকার দল ত মনে করে, ঈদ না জানি কি! আর তাহাদের অভিভাবকেরাও কি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তাহাদের আনন্দ-কোলাহলে যোগদান করেন না? আজিকার এ আনন্দ-প্রবাহে ধনীর অট্টালিকা ও দরিদ্রের দীনতম কুটির একই ভাবে প্লাবিত।

ঈদের নামাজের মূলে কি মহান ঐক্য লক্ষ্যিত হয়! সহস্র সহস্র লোক একই কাবাশরীফ লক্ষ্য করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নামাজে দাঁড়াইয়াছে ; —সকলে একই সঙ্গে ওঠে, একই সঙ্গে বসে,—একই সঙ্গে সহস্রাধিক মস্তক প্রভুর উদ্দেশে আনত হয়। তারপর? তারপর, নামাজ সমাপ্ত হইলে পর সকলে ভ্রাতৃভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। কি সুন্দর ভ্রাতৃভাব। যাহারা প্রতিবেশীর প্রতি এতদিন কোনরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করিত, তাহারা আজি সে হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছে। আজি মসজিদে ছোট-বড় ধনী-নির্ধন এক যোগে সম্মিলিত হইয়াছে ! এ দৃশ্য কি চমৎকার ! এ দৃশ্য দেখিলে চক্ষু পবিত্র হয়, ক্ষুদ্র স্বার্থ, নীচ ঈর্ষা লজ্জায় দূরীভূত হয়, নিরানন্দ, মৃতপ্রায় প্রাণে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়। জাপানে

একতা আছে সত্য, কিন্তু আমাদের এ অপার্থিব একতার তুলনা কোথায়? বৎসরের শুভদিনে এমন শুভ-সম্মিলন কোথায়?

কালের আবর্ত্তনে এইরূপ আরও অনেক ঈদ আসিয়াছে; আরও অনেকবার মোসলেম ভ্রাতৃগণ এমনই ঈদের নামাজে যোগ দিয়াছেন, আরও অনেক বৎসর ঈদের নবীন চন্দ্র তাঁহাদের প্রাণে এমনই করিয়া ঐক্য জাগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দিবাশেষে ঈদ রবির অস্ত-গমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃভাবও ম্লান হইয়াছে। যেন প্রতি বৎসর ঐক্যরূপ অমূল্য রত্নটি আমরা মসজিদ প্রাঙ্গণে রাখিয়া আসি! অথবা একতা যেন মসজিদ প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকে! বলি, এ বৎসর এ বিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগেও কি আমাদের ঈদ-সম্মিলন দিবাশেষে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইবে? না, এবার আমরা একতা সযত্নে রক্ষা করিব।

একতা মহাশক্তি; একতা আমাদের ধর্ম্মের মূল,—আমাদের সমুদয় ধর্ম্ম-কর্ম্মেই ঐক্য নিহিত আছে। জানি না, কোন্ দস্যু (আমাদিগকে অজ্ঞান-তিমির নিশীথে নিদ্রিত পাইয়া) আমাদের মহামূল্য একতানিধি অপহরণ করিয়াছে। জানি না, কাহার অভিশাপে আমরা অভিশপ্ত হইয়াছি। তাই এখন আমরা সহোদরের সহিত মল্লযুদ্ধ করি, সহোদরার সহিত হিংসা করি, পুত্র-কন্যার অমঙ্গল কামনা করি। আমাদের ঘরে ঘরে আত্মকলহ লাগিয়া আছে। যাহাদের গৃহে পিতাপুত্রে বিবাদ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ, তাহারা সমস্ত সমাজটিকে "আপন" ভাবিতে পারিবে কিরূপে?

ঈদ-সমাগমে আজি আমাদের সে দুঃখ যামিনীর অবসান হউক। ঈদের বালার্কের সহিত আমাদের অন্ধকার হৃদয়ে নব-আশার নবনূর উদ্দীপ্ত হউক। সমষ্টির মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ পদদলিত হউক! বলিয়াছি ত, এবার আমরা একতা মসজিদে ফেলিয়া আসিব না। আমাদের এ মহাব্রতে ঈশ্বর সহায় হউন।

আর এক কথা। এমন শুভদিনে আমরা আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দকে ভুলিয়া থাকি কেন? ঈদের দিন হিন্দু-ভ্রাতৃগণ আমাদের সহিত সম্মিলিত হইবেন, এরূপ আশা কি দুরাশা? সমুদয় বঙ্গবাসী একই বঙ্গের সন্তান নহেন কি? অন্ধকার অমানিশার অবসানে যেমন তরুণ অরুণ আইসে, তদ্রূপ আমাদের এখানে অভিশাপের পর এখন আশীর্ব্বাদ আসুক; ভ্রাতৃ-বিরোধের স্থানে এখন পবিত্র একতা বিদ্যমান থাকুক। আমীন!

আবার বলি, আজি কি সুখের দিন—আশীর্ব্বাদ ও সুসংবাদ লইয়া শুভ ঈদ আসিয়াছে!!

নারী-পূজা

"হিন্দুর নারীমর্য্যাদা অবশ্য প্রশংসনীয়", একখানি পুরাতন "ভারতী" পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আমি বলিলাম, "হিন্দুর নারীমর্য্যাদা অবশ্য প্রশংসনীয়। অন্য কোন দেশে রমণীর প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন হয় না। হিন্দুর আরাধ্য দেবতা নারী।"

আমার কথা শুনিয়া উপস্থিত মহিলাবৃন্দ হাসিয়া উঠিলেন। আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। জমিলা বেগম প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"মাফ করুন মিসেস চাটার্জ্জি! এদেশে ললনারা পদ দাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে!"

জমিলা একজন বিখ্যাত উকিলের পত্নী ; কুসুমকুমারী রায়ের সহিত ইঁহার খুব বন্ধুত্ব। অপর কামিনী আমেনা বেগম বিধবা ; ইনি দশ বৎসর পশ্চিমে ছিলেন ; খুব ভাল উর্দ্দু জানেন। ইনিও কুসুমের প্রিয় বন্ধু। মিসেস রায়ের সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠতা এত অধিক যে, ইঁহারা পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকেন। উক্ত মোসলেম রমণীদের সহিত আমার পরিচয় মাত্র দুই তিন মাস হইল হইয়াছে ; কিন্তু কুসুম আমার সমবয়স্কা বাল্য-সখী।

কুসুমের বসিবার কক্ষে বসিয়াই আমি "ভারতী" দেখিতেছিলাম। আমি তর্কের জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলাম না ; তথাপি আমার ঐ উক্তি লইয়া যথেষ্ট বাদানুবাদ চলিল। আমেনা বেগম ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন--"এদেশে রমণী জাতি পুরুষের নিজস্ব সম্পত্তিবিশেষ!"

আমি : ইহা আপনাদের ভ্রম। হিন্দু নারীকে শ্রদ্ধা না করিলে, তাহাকে দেবী রূপে কল্পনা করিত না। অধিকাংশ দেবতাই নারী।

আমেনা : আমরা কিন্তু ফল দেখিয়া বিচার করিতে চাই! দেবী কল্পনার কথা ছাড়িয়া সত্য ঘটনা দেখান।

আমি : ও ভাই কুসুম! তুমি আমায় সাহায্য কর। আন ত তোমার মহাভারতখানা, ইঁহাদিগকে আমরা ঐতিহাসিক ঘটনা দেখাই।

কুসুম : তোমার তিনজনেই আমার সমান শ্রদ্ধার পাত্রী, আমি কাহারও পক্ষপাতিতা করিতে পারি না। মহাভারত বা ইতিহাসে কাজ কি? বর্ত্তমান সামাজিক ঘটনার আলোচনা করিতে পার।

আমি : (মোসলেম কামিনীদ্বয়ের প্রতি) আপনারা কি দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী প্রমুখ ভারত-ললনাকে দাসী বলিতে চান?

জমিলা : না। সতী সাবিত্রী প্রভৃতি নিজগুণে ধন্যা হইয়াছেন। সীতা নিজে ভাল লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় সমাজ তাঁহাকে কি রূপে পূজা করিয়াছিল?

আমি : (ও কথার উত্তর না দিয়া) পুরাকালে অনেক দেবী ছিলেন। লীলাবতী, খনা প্রভৃতি বিদুষী ললনা ভূতলে অতুল।

আমেনা : তাঁহারা বিদুষী ছিলেন, সে গুণ তাঁহাদের নিজের। এখানে কথা হইতেছে, নারীর প্রতি সমাজের ব্যবহারের। খনা জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্না ছিলেন। আজিও পল্লীগ্রামে এমন কৃষক নাই যে, দুই চারিটি খনার বচন না জানে। কিন্তু—

আমি : কিন্তু আর কি? গ্রামে গ্রামে খনার বচন আবৃত্তি করা হয়, ইহাতেই বুঝা যায়, খনা সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইতেছেন!—

আমেনা : ক্ষমা করুন, মিসেস্ চাটার্জ্জি। আমার কথাটুকু শেষ হইতে দিন! খনা এখন পূজিতা হইতেছেন, কিন্তু তিনি মরিয়াছেন কি প্রকারে তাহা কি আপনি বিদিত নহেন?

তাঁহার যে রসনা ঐ বচনগুলির জনয়িত্রী, সেই রসনা ছেদন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে!

আমি : হত্যা ত করা হয় নাই;—তবে হ্যাঁ,— খনার রসনা কর্ত্তিত হইয়াছিল।

জমিলা : 'হত্যা' কি গাছে ধরে? খনার স্বামী তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদন করিলে পর খনা নীরবে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!

কুসুম : আপনারা পুরাতন কথা ছাড়ুন। বর্ত্তমান শতাব্দীর ঘটনা দ্বারা জয় পরাজয় দেখা যাউক।

আমি : বেগম সাহেবেরা দুইজন, আর আমি একা। জোর যার মুলুক তার, সুতরাং আমি বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করি।

কুসুম : সে কি! তুমি এত শীঘ্র তর্ক ছাড়িবে কেন? যত দূর পার অগ্রসর হও।

আমেনা : আমরা দুইজন হইলেও মোটের উপর আপনার তুলনায় দুর্ব্বল। কারণ আপনি উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তা;— (ঈষৎ হাস্যে) যদিও এফ্. এ. ফেল! আপনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া এবং নানা পুস্তক পাঠে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। আর আমরা কঠোর অবরোধে থাকি,—আমরা কেবল কুসুমদিদিকে জানি, আর চিনি আপনাকে।

আমি : বেশ, বেশ, চলুন; আপনারা নাছোড়বান্দা! কুসুমদিদি! 'বর্ত্তমান শতাব্দী' মানে বাঙ্গালার ১৩১২ সন, না? খ্রীষ্টাব্দের ২০শ শতাব্দী?

কুসুম : ত্রয়োদশও নয়, বিংশও নয়;—এই শেষ একশত বৎসরের ভিতরের ঘটনা ধর না।

আমি : বেশ ! ইদানীং ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হওয়ায় রমণী জাতি কল্পিত দেবত্বের পদ হইতে ক্রমে সত্যকার দেবী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জমিলা : তাহা কতক পরিমাণে সত্য। আপনি আর একটি কথা শুনিয়া রাখুন,— আপনারা যখন হিন্দু সমাজের দেবী লইয়া গৌরব ও গর্ব্ব করেন, তখন উক্ত সমাজের দোষকেও আপনাদের নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকুন।

আমি : এ বড় শক্ত condition!

কুসুম : শক্ত হইলেও পণটা ন্যায়সঙ্গত বটে। উঁহারা পূর্ব্বেই তোমার ফাঁকির পথ বন্ধ করিলেন! বুঝিলে, প্রভা দিদি?

আমি : কি রকম ফাঁকি?

কুসুম : উঁহারা কোন হিন্দু পরিবারের অবলার দুর্দ্দশার কথা বলিলে তুমি বলিতে পারিতে, "আমাদের ব্রাহ্মসমাজে কিন্তু ওরূপ হয় না!"

আমি : তাহা ত ঠিক। ব্রাহ্মসমাজে অবলাপীড়ন হয়, ইহা কেহ বলিতে পারে কি?

আমেনা : যদি কেবল নববিধান সমাজ লইয়া থাকেন, তবে আপনারা হিন্দুসমাজে দেবী লইয়া টানাটানি করেন কেন? কেবল গুণের প্রশংসার ভাগ লইতে অগ্রসর হইবেন, আর দোষের নিন্দা গ্রহণ করিবেন না, ইহা ত বড় অবিচার!

জমিলা : এই জন্য আপনি বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিতেছিলেন, এখন বুঝিলাম। তবে থা'ক, নারী পূজার আলোচনায় কাজ নাই, অন্য কথা পাড়ুন।

আমি প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম, একটু পরে ভাবিলাম, "আমি এতই ভীরু যে বিনা তর্কে হারিব?" প্রকাশ্যে বলিলাম—

"না বেগম সাহেবা! আপনাদের ভয় নাই! আমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব না,—চলুন!"

সকলে হাসিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদিগকে হাসানই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা কিন্তু শিষ্টাচারের অনুরোধে আর সামাজিক কথা বলিতেছিলেন না। তাহা আমার অসহ্য হইল, আমি জেদ ধরিয়া বলিলাম,—

"কই বেগম সাহেবা, আপনি ত একটীও প্রপীড়িতা ললনার কাহিনী বলিতে পারিলেন না!"

জমিলা : বলিলে, "একটি কেন, অনেক বলা যায়",—"সে বহ্নির শত শিখা কে করিবে গণনা?"

আমি : আপাততত একটী শিখাও দেখান দেখি!

জমিলা : বেশ। যে সকল হিন্দু রমণী পূজিতা হন, সেই হিন্দু কুলকামিনীর ভাষায় ত আমরা শুনিতে পাই।

"সাবাসি সাবাসি বটে হিন্দুর সন্তানে,
গড়া কি তোদের বুক নিরেট পাষাণে?

*

বালিকা বধিতে তোর শাস্ত্র টানাটানি

*

নাই দয়া নাই ধর্ম্ম, বোঝে না'ক কর্ম্মাকর্ম্ম
শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বালিকা চিবায়।"

কি বলেন ভাই! ঐ কয় ছত্র পদ্যকে ব্যথিত হৃদয়ের 'আর্ত্তনাদ' না পূজা প্রাপ্তিতে হর্ষে 'আশীর্ব্বাদ' বলিব?

আমি : উহা ত কবির রচনা—কল্পিত বেদনা।

জমিলা : —আপনি বালবিধবার যন্ত্রণাকে কল্পিত বেদনা বলিলেন?

আমিনা : একেবারে কল্পিত নহে, অনেক পরিমাণে সত্য,—

কুসুম : ধ্রুব সত্য।

আমিনা : কিন্তু উহা ত সামাজিক নিয়ম, কাজেই সহিতে বাধ্য হওয়া যায়।

আমেনা : কবিকল্পনার কথা ছাড়িয়া আমি সদ্য দেখাই, ভারতবর্ষ কি কি উপাদানে নারী পূজা করে, তাহার দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রণীত[৯] "Heart Beats" গ্রন্থখানি দেখিয়াছেন?

---

৯. উক্ত গ্রন্থ হইতে কোন কোন অংশ অবিকল উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরন করিতে পারিতেছি না। সেই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ স্বয়ং মাতৃহারা পুত্রের ভাষায়ই চমৎকার শুনায়।

আমি প্রথমে ভাবিয়া দেখিলাম, উক্ত গ্রন্থে কেবল পারমার্থিক কথা আছে। একটু চিন্তা করিয়া শেষে সাহসের সহিত বলিলাম, "হাঁ দেখিয়াছি। তাহাতে কোন ললনাদলনতত্ত্ব নাই।"

আমেনা : মূল গ্রন্থে নাই বটে, কিন্তু মোঃ এস. জে. ব্যারোস্ কর্ত্তৃক লিখিত মজুমদার মহাশয়ের জবানীতে একটি নমুনা পাওয়া যায়।

আমি : অবলাপীড়নের নমুনা?—আচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে?

আমেনা স্থির স্বরে বলিলেন, "হাঁ, তাঁহার মাতার মৃত্যু ঘটনা। যৎকালে মজুমদার মহোদয়ের জননী ওলাউঠা রোগে আক্রান্তা হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলেন, তখন গৃহস্বামী নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতেছিলেন![১০] বাড়ীর গাভীটার কোন রূপ পীড়া হইলেও বোধ হয় কর্ত্তা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। বিধবার প্রতি সমাজের ব্যবহার কিরূপ হয়, তাহা মজুমদার মহোদয়ের ভাষায় চমৎকার শুনায়! আপনারা তাঁহার জীবনীর ১৪শ হইতে ১৬শ পৃষ্ঠা পুনরায় পাঠ করিয়া দেখুন। তাহা পাঠ করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। গৃহপালিত কুকুর বিড়ালও বোধ হয় বিনা চিকিৎসায় মারা যায় না; আর ঈশ্বরের সৃষ্টজগতের শ্রেষ্ঠতমা জীব, পরিবারের এক জন বধূ রোগের যন্ত্রণায় অধীরা, কেহ তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহে নাই! বিধবার জন্য চিকিৎসক ডাকিতে হইবে, একথাও কেহ ভাবে নাই! মজুমদার স্বয়ং তাঁহার পিতৃব্যদের সুখনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য যাইতেছিলেন, কিন্তু কর্ত্তাদের কক্ষে তিনি প্রবেশ করিতে পারে নাই![১১] "চাকরটা পর্য্যন্ত চিকিৎসক ডাকিতে যাইবে না,—না যাউক। কিন্তু পুত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না! যাঁহার জননী জন্মের মত বিদায় লইতেছে, তিনি কি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? না! তিনি পাগলের ন্যায় পথে ছুটিলেন,—(স্বর্গীয়) কেশবচন্দ্র সেন এবং অপর কয়েকজন বন্ধুকে ডাকিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে সকলের গৃহদ্বার রুদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক ডাক্তারের বাড়ী গেলেন; ডাক্তারের চাকর হতভাগ্যকে তাড়াইয়া দিল! সে ভৃত্যটি তো ভারতবর্ষেরই পুরুষ, সে অবশ্যই জানিত, কিরূপে নারী-পূজা করিতে হয়। তাই বিধবার জন্য প্রভুকে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে, ভাবিয়া সে মাতৃশোকাতুর পুত্রকে তাড়াইয়া দিল!!

"আমরা মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাই, সেই ঊনবিংশ বর্ষীয় বালক মাতৃশোকে পাগল প্রায় হইয়া পথে ছুটাছুটি করিতেছেন। আর তাঁহার হৃদয়ে কি আকুলতা, কি মর্ম্মান্তিক যাতনা ছিল, তাহা আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি। আমরা ঈশ্বরের যত প্রকার আশীর্ব্বাদ

---

১০. "Everybody in the house was up expect my uncle, who was the *Karta* (Head). Nobody seemed to care to call in a doctor....My perplexity may be imagined."

১১. Rushing to speak to my uncles. I was not admitted to their rooms ; and no one, not even a servant, would go for a medical man. Maddened and despairing, I rushed into the streets, tried to call up Keshub and other friends ; but every gate was shut for the noght. I ran to a doctor's house in the neighbourhood, but shi servant turned me out. I don't know into how many places I went, and pleaded my poor, dying mother case, butcould not get medical help.
"...What need to bewail the world's hard heartedness? What need to curse the selfish cruelty of men and women to the wretched, forsaken Hindu widow?....
"But if men were more compassionate, and soceity recognised their (women's) rights to the commonest necessaries of life, perhaps they would be less hard on themselves, and many a jeart-stricken son would be spared, the misery I felt when I found my mother's beloved life sink under the load of the world's neglect and indifference."

ভোগ করি, তন্মধ্যে মাতৃচরণ শ্রেষ্ঠতম আশীর্ব্বাদ। সব সুখসমৃদ্ধি তুলাদণ্ডের এক দিকে, আর মা এক দিকে ! !

"ইহাকে—বিধবার প্রতি এইরূপ নির্ম্মম নির্দ্দয় ব্যবহারকে যদি আপনারা 'নারী–পূজা' বলেন, তবে আর আমার বলিবার কিছু নাই।"

আমি : ইদৃশী ঘটনা বিরল। কেবল একটি বিধবার প্রতি যত্ন হয় নাই বলিয়া সকলে দোষী হইতে পারে না।

কুসুম : না প্রভা দিদি ! ওরূপ ঘটনা বিরল নহে—তবে কথা এই যে, আর কেহ মজুমদার মহাশয়ের মত ঐ প্রকার কলঙ্ককাহিনী লিখিয়া রাখে না, তাই আমরা সেসব ঘটনা জানিতে পারি না। আমিও দুই চারিটি পরিবারের ঐরূপ অবস্থা জানি।

আমি : (জমিলা বেগমের প্রতি) আর আপনি? আপনি কোন লোমহর্ষণ ব্যাপার অবগত আছেন?

জমিলা : একটি ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি ; সে অনেক কথা !

আমি : বলুন, শুনি।

জমিলা বলিলেন,—"একজন বড় লোকের শিশুকন্যা পীড়িত ছিল। বাড়ীতে দাস দাসী, ঘোড়া গাড়ী, যত প্রকার বিলাসদ্রব্য হইতে পারে, সবই প্রচুর ছিল। কেবল কন্যা জাতিকে অভিশাপ মনে করা হয় বলিয়া খুকীর চিকিৎসা হইতেছিল না।

"কোন অভাব নাই—অপর শিশুরা টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা করে, অথচ দুগ্ধপোষ্য শিশুটি বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে, এ চিন্তা গৃহিণীর সহ্য হইল না ! তিনি বারম্বার সবিনয়ে সজল নয়নে কর্ত্তাকে চিকিৎসক ডাকিতে অনুরোধ করিলেন,—কর্ত্তা শুনিলেন না ! এমনকি কর্ত্তা একদিন নিজের প্রয়োজনবশতঃ ডাক্তারের নিকট যাইতেছিলেন, সেই সময় কর্ত্রী সকাতরে বলিলেন, 'খুকীর অবস্থাও ডাক্তারকে জানাইও।' 'মেয়ে কি কখনও মরে?' এই বলিয়া কর্ত্তা প্রস্থান করিলেন।

"অতঃপর অসহায়া গৃহিণী উপায়ন্তর না দেখিয়া মুমূর্ষু শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নীরবে অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ! পুংশাবককে যখন পিতা হনুমান বধ করিতে চেষ্টা করে, তখন শাবকটীকে বক্ষে লইয়া হনুমানমাতা বনে জঙ্গলে পলায়ন করিয়া শিশুর প্রাণ রক্ষা করে ! কিন্তু পর্দ্দানশীন মহিলা পিতৃ–অত্যাচার হইতে শিশুকন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য কোথায় যাইবেন? নগরে অসংখ্য ডাক্তার আছেন,—থাকুন ; তাহাতে অন্তঃপুরিকার লাভ কি?"

আমি : "ঈস্ ! মানুষ এমন পাষণ্ড হয় ! শেষে কি হইল ভাই? শিশুটি বাঁচিল, না অযত্নে মারা গেল?"

জমিলা : "শিশুটি শেষে বাঁচিল। যৎকালে কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া মাতা রোদন করিতেছিলেন, সেই সময় দৈবাৎ উক্ত পরিবারের ভাগ্যবান্ জ্যেষ্ঠ পুত্র তথায় গিয়াছিল। সে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, তাই মাতার ক্রন্দনে তাহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল, সে নিজে

ডাক্তারের নিকট গিয়া কয়েক মাত্রা ঔষধ আনিয়া দিল। সে ঔষধ আনিয়াছিল কেবল জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য! ঈশ্বরকৃপায় সেই সামান্য ঔষধে খুকী বাঁচিল। সেই ধনী পরিবার অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে! সেই শিশু, সেই পিতা, মাতা, মাতা, ভ্রাতা— সকলেই জীবিত আছেন!!"

আমি: "পরিবারটি হিন্দু, না মুসলমান?"

জমিলা: "তাহা আমি বলিব না,—তাঁহাদের মুখে মসীলেপন করিয়া কাজ কি? এই পর্য্যন্ত বলাই যথেষ্ট—তাঁহারা বঙ্গবাসী!"

আমি: "দেখুন, এদেশে যে জঘন্য অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে, ইহাই সব অনিষ্টের মূল। মুসলমান সমাজ এ বিষয়ে অগ্রণী। তাঁহারা চাকরের সম্মুখেও বাহির হন না, এই জন্য মোসলেম রমণী একেবারে নিরুপায়। ঐ পর্দা তাঁহাদিগকে পশু—হনুমানমাতা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, অসহায় করিয়াছে।"

আমেনা: অবরোধ প্রথা জঘন্য হইলেও উহা আমাদের হাড়ে-মাংসে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে। পুরুষেরা যতদিন ভদ্রশিষ্ট হইতে না শিখেন, ততদিন এ পর্দ্দা ছাড়া সহজ নহে। পুরুষসমাজ যদি ললনাদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখিতেন, তবে আর দুঃখ ছিল কি?

কুসুম: আমি শুনিয়াছি যে, অন্যান্য মুসলমানপ্রধান দেশে নাকি ঈদৃশ অন্তঃপুরপ্রথা নাই! তবে ভারতবর্ষে মুসলমানেরা কেন এরূপ পর্দার সৃষ্টি করিয়া নিজেদের স্ত্রীকন্যার সহিত আমাদিগকেও বন্দিনী করিলেন?

জমিলা: পর্দার আদিস্রষ্টা কে? তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। কোন মোস্‌লেম ভ্রাতা যখন অবরোধের অনুকূলে কিছু লিখেন, তখন তিনি বলেন, "আমরাই পর্দ্দার স্রষ্টা, হিন্দুভ্রাতৃগণ যে পর্দ্দার আবিষ্কারক বলিয়া দাবী করেন, তাহা ঠিক নহে।" আবার যে মুসলমান ভাইটি পর্দ্দার প্রতিকূলে কিছু লিখেন, তিনি নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, "পর্দ্দার প্রথা মুসলমানেরা বিধর্ম্মীদের নিকট শিখিয়াছে।" যাহা হউক এই প্রথার স্রষ্টা যিনি হউন, ভোগটা আমাদিগকে ভুগিতে হইতেছে!

আমি: আপনারা ধীরে ধীরে পর্দ্দা ছাড়েন না কেন? আমরা ত ছাড়িয়াছি।

জমিলা: আপনারা পর্দ্দাত্যাগে খুব ভাল আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছেন কই? যেভাবে পর্দ্দা ছাড়িয়াছেন, তাহাতে আপনাদিগকে অনেক নিন্দা সহিতে হইতেছে।

আমি: নিন্দাকে ভয় করিবার প্রয়োজন?

আমেনা: ভয় না করুন, কিন্তু অনেকে প্রকৃত পর্দ্দার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে পবিত্রতা নষ্ট—

আমি: থামিলেন কেন? বলুন,—

আমেনা : আমি একটা অপ্রিয় কথা বলিতে যাইতেছিলাম, যাহা হউক, সমাজের প্রতিও আমাদের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, কেবল ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্য আমরা সে কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে পারি না।

আমি : হিন্দুরা ব্রাহ্মসমাজের অযথা নিন্দা করিয়া থাকে, তাহাতে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

কুসুম : কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যে পরিমাণে পর্দ্দাত্যাগে নিন্দা করেন, তাহা শুনিয়া সাবধান হওয়া উচিত। আমেনাদিদি হয়ত ব্রাহ্মসমাজে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতে যাইতেছিলেন।

আমেনা : আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন।

আমি : কিন্তু মোটের উপর মোসলেম সমাজে যেরূপ রমণী–পীড়ন হয়, সেরূপ আর কোথাও হয় না। আপনারা খনার মৃত্যুর কথা বলিলেন, কিন্তু লাহোরের "আনারকলি"র সমাধি মন্দিরের ইতিহাস জানেন? সম্রাট্ আকবরের আদেশে আনারকলিকে জীবন্ত প্রোথিত করা হইয়াছিল!! পরে সম্রাট্ জাঁহাগীর আনারকলির শবের উপর সেই সুন্দর সমাধিভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন! পরন্ত তাজমহলের অভ্যন্তরেও কোন বিষাদের ইতিহাসে লুক্কায়িত আছে কি না কে জানে?

জমিলা : মুসলমানেরা রমণীদলন করে সত্য, কিন্তু তাহারা প্রকাশ্যে "নারীপূজা করি" বলিয়া ছলনা করে না। বরং এ দেশের কাট–মোল্লারা মনে করে যে, অবলাপীড়ন করাই তাহাদের ধর্ম্মত কর্ত্তব্য!

আমেনা : আমার মনে হয়, হিন্দুরা আমাদের নিকট অবরোধপ্রথা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং কাট–মোল্লারা হিন্দুর নিকট নারীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। নতুবা কোরাণ শরীফের বিধান মানিলে অবলা–পীড়নও চলে না; অন্যায় অন্তঃপুরপ্রথাও চলে না।

আমি : আপনারা কি মনে করেন, কাট–মোল্লারা অন্যায় পর্দ্দার পক্ষপাতী?

জমিলা : দেখ ভাই আমেনা! এখন আবার মোল্লাদের মৌচাকে ঢিল ছুড়িও না!

আমেনা : হাঁ, ঠিক বলিলেন। এখন আমি মোল্লাদের মৌচাকে লোষ্ট্রনিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত নহি। মোল্লাদের কথা ছাড়ুন, মিসেস চাটার্জ্জি!

আমি : মৌমাছিকে ভয় করিলে আপনারা মধু আহরণ করিবেন কিরূপে?

জমিলা : মধুলুণ্ঠন করিবার সময় ত পূর্ব্বেই সাবধানে যথেষ্ট ধূম অগ্নি লইয়া যাওয়া হয়; এবং সে সময় দুই একটা মৌমাছির দংশন বরং সহ্য হয়! কিন্তু মধু লইতে প্রস্তুত না থাকিয়া অনর্থক মৌচাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা বালকোচিত মূর্খতা হইবে। এখানে কথা হইতেছে—অবলাপীড়নের, তাহাই বলুন।

আমি : তাহা ত আপনারা বলিবেন, আমি শুনিব।

আমেনা : বলিবার ত অনেক ছিল; সে সব মর্ম্মভেদী কাহিনী কি বলিয়া শেষ করা যায়? তবে, আজি আর সময় নাই; এখন উঠি কুসুম দিদি!

অতঃপর আমরা স্ব স্ব ভবনে ফিরিলাম।

আশা-জ্যোতিঃ

এখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। পূর্ব্বাকাশে তবে ও কিসের আলোক দেখা যায়? মাত্র অমানিশা অবসানে আকাশের কোলে শুকতারা দেখা দিয়েছে ; ঊষা ও বালার্ক এখনও বহুদূরে।

অনেক সময় মনে করি, আমাদের উন্নতির কোনো আশা ভরসা নাই। যে দেশে পুরুষজাতি অবলার প্রতি শক্রতাচরণই গৌরবের বিষয় মনে করে, সে দেশে আর আশা কি? কিন্তু কালের বিচিত্রগতি সবদিন সমান যায় না। এখন দেখি, দয়াময় আমাদের প্রতি সদয় কটাক্ষে চাহিয়াছেন।

বাঙ্গালী হিন্দু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু অপেক্ষা অধিক উন্নত ও সুশিক্ষিত ; পক্ষান্তরে বাঙ্গালী মুসলমান পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানের তুলনায় অনেক হীন ও অধঃপতিত। অতএব কেবল বঙ্গের কতিপয় নারী-বিদ্বেষীর ক্ষুদ্রাশয়তা দর্শনে আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নহে।

সমাজের অর্দ্ধঅঙ্গ বিকল রাখিয়া উন্নতি লাভ করা অসম্ভব ; এ রহস্য বোম্বাই, লাহোর ও আলীগড়ের মোসলেম ভ্রাতৃবৃন্দ বেশ বুঝিয়াছেন। তাই এখন আলীগড়ে স্ত্রীশিক্ষার যথাসাধ্য আয়োজন হইতেছে।

বঙ্গীয়া পাঠিকা বলিতে পারেন, “আলীগড়ে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন হইলে আমাদের লাভ কি? আমরা আছি বঙ্গদেশে—আলীগড় ত বহুদূরে। আমাদের মুক্তির উপায় কৈ?”

মুক্তির উপায় ঐ শিক্ষাবিস্তার। আমরা যদি শিক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, তবে আলীগড়ের দূরত্ব আমাদিগকে আলীগড়ে পৌছিতে বাধা দিতে পারিবে না। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধির আশা করা যায় কি? যদি মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে সুশিক্ষালাভই আধ্যাত্মিক মুক্তির উপায়, তবে শিক্ষার পথে যতই কন্টক থাকুক না কেন, বিশ্বাসী (বিশ্বাসিনী) তাহা উৎপাটন করিতে করিতে অগ্রসর হইবেই। এবার এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় প্রায় ৫০ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল,—তাহারা কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহিয়াছে, কত ব্যক্তি জনতার পদচাপে নিষ্পিষ্ট হইয়াছে। তবু কি তীর্থযাত্রী পুনরায় তথায় যাইতে পশ্চাৎপদ হইবে? কখনই না! তিথি বিশেষে ব্রহ্মপুত্র নদে অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দু কুলবালারা শিবিকাসহ ডুবিয়া স্নান করেন। সুতরাং দেখিতেছেন, বিশ্বাসিনীর শুভকার্য্যে দুর্ভেদ্য পরদাও প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

জ্ঞান ধর্ম্মেরই প্রধান অঙ্গ। এককালে মোস্‌লেম সমাজ অতিশয় উন্নত ছিল ; কিসের বলে? জ্ঞানবলে। আজি ইউরোপ ও আমেরিকা সুসভ্য, ধনাঢ্য এবং সর্ব্ববিষয়ে উন্নত ; কেন জ্ঞানবিজ্ঞানের কৃপায়। যে ক্ষুদ্র জাপানের দিকে চাহিয়া অভাগিনী বঙ্গভূমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তাহারও উন্নতির একমাত্র কারণ— জ্ঞান।

কোন বস্তুই ইচ্ছামাত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; তাহার জন্য পরিশ্রম করিতে হয়। আমরা জ্ঞানপিপাসা অনুভব করা মাত্রই কেহ সুধাভাণ্ড হস্তে আমাদের ঘরে ঘরে উপস্থিত হইবে না! তৃষ্ণার্ত্তের নিকট কূপ আইসে না—পিপাসীকে কূপের নিকট যাইতে হয়। সমাজের একটি সুনীতি একতা—এই একতা স্থাপনের জন্য আলীগড় ও বাঙ্গালাকে একাকার করিতে হইবে।

আমাদের শিক্ষার অন্তরায় অনেক, জানি ; বাঙ্গালী মুসলমানগণ অত্যন্ত নারীবিদ্বেষী, ইঁহারা উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে জ্ঞানপুরীর তোরণ রক্ষা করিতেছেন, জানি। তবু আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। সকল দেশেই কতকগুলি পুরুষ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হয়। ইংলণ্ডের পুরুষসমাজ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তা রমণীদের "ব্লুস্টকিং" বলিয়া বিদ্রূপ করেন ; শিক্ষিতা বঙ্গবালাও "নভেলপাণি" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর এক চমৎকার কথা—আমরা পুরুষের রচনায় ইংলণ্ডের সমাজের যত চিত্র না দেখিতে পাই, তাহা মহিলাদের রচনায় দেখিয়া থাকি। মিসেস হেনরী উড এবং মেরি করেলীর উপন্যাসে অনেক সামাজিক ক্ষত দৃষ্টিগোচর হয়। এমনকি মাননীয়া মেরি করেলী তাঁহার কোন উপাখ্যানের নায়িকার (ডেলিশিয়া) প্রিয় কুকুরটিকে পুরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন![১২] যাহা হউক, এত হিংসা-বিদ্বেষ উপেক্ষা করিয়াও ইংরাজললনা মাথা তুলিয়াছেন ; এবং বঙ্গীয়া (ব্রাহ্ম) ভগিনীরাও মাথা তুলিতেছেন ; এবার মোসলেম ললনার পালা।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছিলাম, "আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া এবং পরীক্ষক স্ত্রীলোক হওয়া কি অসম্ভব?"[১৩] এখন দেখি সত্যই আলীগড়ে আমাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাগারের সূত্রপাত হইতেছে। ইহা কি কম সৌভাগ্যের বিষয়? অবশ্য জেনানা কলেজ এখনও সুদূর ভবিষ্যতের পরপারে। সম্প্রতি কেবল নর্ম্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইতেছে ; এই স্কুলটিকে সেই ভাবী জেনানা কলেজের মাতামহী বা প্রমাতামহী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কেহ বলিতে পারেন, তবে এখনই এত আশায় উৎফুল্ল হওয়া কেন? আশার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমে বীজ, তৎপরে অঙ্কুর, তারপর বৃক্ষ—সর্ব্বশেষে ফল। আজি যে দীর্ঘ তাল-তরুটি উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া গগন চুম্বন করিতেছে, তাহার বীজ কবে নিহিত হইয়াছে? অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে। অতএব আলীগড়ের "স্কুলবীজ" দেখিয়া আমাদের আশান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অবশ্য আমরা ইহার ফল ভোগ করিতে পাইব না—ফল ভোগ করিবে আমাদের তৃতীয় পুরুষ। যে তালের গাছ বপন করে, সে নিজে কদাচিত ফল খাইতে পায়!

আমরা কেবল আশায় আশ্বস্ত হইলেই কি আমাদের কাজ শেষ হইবে? অবশ্য না। ঐ স্কুলবীজটির প্রতি আমাদের অনেক কর্ত্তব্য আছে। উপযুক্ত অর্থাভাবে এখনও স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিতেছে না—আমাদিগকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। ভদ্রলোকেরা চাঁদা দেন, ভাল কথা—যদি না দেন, তবে মহিলাদের চাঁদা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কর্ত্তব্য আছে, যিনি তাহা পালন করিতে ইচ্ছুক তিনি সেক্রেটারী সাহেবকে পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন। সম্প্রতি চাঁদা সংগ্রহই প্রধান কার্য্য। আলীগড়ের মহানুভব লোকেরা যে মহৎ কার্য্যের আয়োজন করিতেছেন, তাহা দুই চারিজনের দ্বারা সাধিত হওয়া অসম্ভব।

এ সময় যদি সকলে উহাতে যোগদান না করেন, তবে ও স্কুলবীজ অঙ্কুরিত হইতে পারিবে না—যদি আশাতরু এবার অর্থাভাবে অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়, তবে আবার বীজ সংগৃহীত

---

১২. মেরী করেলী রচিত Murder of Delicia দ্রষ্টব্য।
১৩. মতীচূরের "বোরকা" শীর্ষক প্রবন্ধ।

হওয়া সুদূর পরাহত। যে মাতৃজাতির কল্যাণের নিমিত্ত এই প্রয়োজন, তাঁহারা নিশ্চিতভাবে নিদ্রিত থাকিলে চলিবে কেন? আর উদাসীন থাকিবার সময় নাই।

লাহোর, বোম্বাই ও আলীগড় নিবাসী লোকের সহিত ঐক্য রক্ষা করিতে হইলে সকলকে একটি সাধারণ ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। সেই ভাষা ইংরাজী হইলে ভাল হয়; নতুবা কোন বিখ্যাত প্রাদেশিক (যেমন হিন্দী) ভাষার চর্চ্চা রাখিলে চলে। লাহোরের লোকে আমাদের বঙ্গভাষা শিখিবে, এরূপ আশা দুরাশা, সুতরাং বাঙ্গালীকেই উর্দ্দু শিখিতে হইবে।

দেশের, বিশেষতঃ নিজের সন্তান সন্ততির মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগে নারী কখনও পশ্চাৎপদ হয় না। যে শিক্ষা মানবের পক্ষে অশেষ উপকারী, সেই শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত রমণী সামান্য অর্থরূপ স্বার্থত্যাগ করিবে না কি? জ্ঞান বিনিময়ে হজরত "হাভা" স্বর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন,—তাহারই দুহিতা হইয়া আমরা কি সামান্য অর্থত্যাগে বিমুখ হইব?

কেহ হয়ত বলিবেন, "একবার আদি জননী জ্ঞানফল চয়ন করায় পিতা আদমকে স্বর্গচ্যুত হইতে হইয়াছে, আবার বঙ্গজননীরা জ্ঞানলাভে অগ্রসর হইলে আমাদিগকে গৃহচ্যুত হইতে হইবে না ত?" উত্তরে বলা যাইতে পারে, গৃহচ্যুত হওয়ার ত আশঙ্কা নাই—আশঙ্কা আছে কর্ম্মহীন, আকাঙ্ক্ষা উদ্যমহীন জড়তারূপ স্বর্গভ্রষ্ট হওয়ার।

আদি মাতা নিষ্কর্ম্মা অলস জীবনের স্বর্গভোগ পরিত্যাগ না করিলে মানব জাতি ধর্ম্মবিশ্বাসরূপ অমূল্যরত্ন পাইত কোথায়? আমাদের মনে হয়, স্বর্গবাসী আদম অপেক্ষা মর্ত্ত্যবাসী দরবেশ মনসুর অধিক সুখী ছিলেন। মহর্ষি মনসুর ঈশ্বরপ্রেমের যে মধুর আস্বাদ পাইয়াছিলেন, স্বর্গে থাকাকালীন হজরত আদম কি সে সুধার আস্বাদ জানিতেন?

স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষেরা সর্ব্বদা হীনবুদ্ধি বলিয়া থাকেন, তাই অবলারা নিজেকে নিতান্ত মেধাহীন ভাবিয়া ক্রমে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে—তাহারা আর জ্ঞানচর্চার দিকে সহজে অগ্রসর হইতে চাহে না। কোন ভাল লোককে ক্রমাগত পাগল বলিলে সত্যই সে পাগল হইয়া যায়। নারীজাতি কি বাস্তবিক হীনবুদ্ধি? না, বরং রমণী প্রতিভার আদি অধীশ্বরী। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে নারীই প্রথমে জ্ঞানফল চয়ন ও ভক্ষণ করিয়াছেন, পরে পুরুষ তাঁহার (উচ্ছিষ্ট!) প্রদত্ত ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতবালাকে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সুযোগ দেওয়া হয় না, সে স্বতন্ত্র কথা। নতুবা এ "ডানাকাটা" অবস্থায়ও তাহা সুবিধা পাইলে পুরুষের তুলনায় তাহাদের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া দেখায়। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, যে ক্ষেত্রে মুসলমান বালক শতকরা ২০/২৫ জন কৃতকার্য্য হয়, সে স্থলে বালিকা (বোম্বাইয়ে) শতকরা ৭৫ জন কৃতকার্য্য হইয়াছে। যে স্বদেশী ব্রত পালনে বাঙ্গালী পুরুষেরা প্রকৃত কার্যের তুলনায় ফাঁকা হৈচৈ বেশী করেন, সেই ব্রত "নভেলপাণি"রা দৃঢ়তার সহিত নীরবে প্রতিপালন করিতেছেন। সুতরাং অবলাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই।

সুদীর্ঘ নৈরাশ্য-যামিনীর শেষে আশা-শুকতারা উদয় হইল। এমন সুপ্রভাতে যে নিদ্রিত থাকে, তাহার দুর্ভাগ্য। তাই বলি, ভগিনী ! ঐ চাহিয়া দেখুন—ঐ দূরে-আশা-জ্যোতিঃ।

মোসলমান কন্যার পুস্তক সমালোচনা

(নূতন পুস্তক ধর্ম্মসাধননীতি)

অদ্য আমার সমালোচনা পাঠাইলাম। আপনার লেখার সমালোচনা আমি কি করিব? "সমালোচনা" বলিতে যেন একটা মুরুব্বিয়ানা ভাব থাকে ; যেন সমালোচক নিজে একজন মান্যগণ্য লোক। তাই আমি আপনাকেই সম্বোধন করিয়া নিজ মন্তব্য ব্যক্ত করিলাম। আশা করি, ইহা মহিলায় প্রকাশিত করিবেন।

"ধর্ম্মসাধননীতি"তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে,—"ধর্ম্মসাধনা", "অদ্ধাত্মানুরাগ", "অনুতাপ", "চিত্তসংযমের উপায়", "বাহ্যিক উপাসনা", "আন্তরিক উপাসনা", "জীবন্ত উপাসনা", "নামসাধন", "ধর্ম্মসঙ্গীত", "যোগ ও প্রেমাবেশ", "রোজা" (সংযমব্রত), "নির্ভয়স্থাপন", "সাংসারিক সুখের অসারতা", "কৃতজ্ঞতাতত্ত্ব", "কামনা ও ক্রিয়া", "সাধুচরিত্র" এবং "পরিশিষ্ট—অনুতাপতত্ত্ব", ইহার প্রত্যেকটি বিষয় কিরূপ মূল্যবান, তাহা সূচীপত্র দেখিলেই বুঝা যায়। আমরা এই উপাদেয় পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।

পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, "সেই মহাগ্রন্থে (অর্থাৎ কিমিয়ায় সাদতে) রাশি রাশি সমুজ্জ্বল সত্যরত্ন শোভা পাইতেছে।" আমি বলি, আমাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত সত্যসমূহ "রত্ন"-ই বটে—তাই তাহা অতি যত্নে আরব্য ও পারস্য ভাষারূপ লৌহসিন্দুকে আবদ্ধ ; আর সমাজের কাটমোল্লাগণ উন্মুক্ত করবালহস্তে ঐ সিন্দুক রক্ষা করিতেছেন !—যেন একটি রত্নও ভাষান্তরিত হইতে না পারে ! যেন আরব্য ও পারস্য ভাষানভিজ্ঞ লোকে সেই জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে না পারে !

যখন কোন উদারচেতা মোসলেম ভ্রাতা ঐ গ্রন্থের কোন এক অংশ উর্দ্দু বা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সাধারণের সমক্ষে ধরেন, তখন আমাদের মনে হয়, যেন সেই রত্নভাণ্ডারের একটি গবাক্ষ খুলিয়া গিয়াছে, দর্শকেরা বাহির হইতে তৃষিত নয়নে তাহার শোভা কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছে।

কিন্তু আপনি এ কি করিয়াছেন ! রত্নভাণ্ডারের অনেকগুলি বাতায়ন মুক্ত করিয়াছেন ! —মোল্লাদের অতি যত্নে রক্ষিত লৌহসিন্দুকও খুলিয়া ফেলিয়াছেন ! সহজ সরল বঙ্গ ভাষারূপ ডালায় রত্ন বিতরণ করিতেছেন ! ! "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে", এই নীতিবাক্যের মর্ম্ম আপনি বুঝিয়াছেন, আপনি বেশ জানেন, বঙ্গের দীনতম ব্যক্তিকেও থালাভরা মাণিক দান করিলেও মহামূল্য "কিমিয়ায় সাদতের" ভাণ্ডার শূন্য হইবে না ! তাই অন্নছত্র খুলিয়াছেন, দেখি।

"মহাপুরুষ মোহম্মদ এবং তৎপ্রবর্ত্তিত এসলামধর্ম্ম" গ্রন্থে "আত্মমন্তব্যে" লিখিত হইয়াছে, "একজন (মোসলমান) বন্ধু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমাদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ একজন কাফের করিয়াছে, তাহাকে পাইলে তাহার শিরশ্ছেদন করিব'।" তাই ত

আপনার হাতে লৌহসিন্দুকের চাবি আছে দেখিয়া যে, মোল্লাগণ ক্রুদ্ধ হইবেন, ইহা বিচিত্র নয়। আপনার কথা দূরে থাকুক, একজন মোসলমানও (বিখ্যাত "বানাতন্ নাশ" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা) উর্দ্দুভাষায় কোরাণ শরীফের অনুবাদ করায় মোল্লাদের কোপে পতিত হইয়াছিলেন।

"মোসলমান জাতীয় ব্রাহ্মবন্ধু" কথাটা ভালমতে বুঝিতে পারিলাম না। জাতিতে মোসলমান, অথচ ধর্ম্ম বিশ্বাসে "ব্রাহ্ম" এরূপ লোকও আছে না কি?

"ধর্ম্মসাধননীতি"র "জীবন্ত উপাসনা" পাঠকালে আমাদের মনে পড়ে হজরত আলীর কথা। তাঁহার ন্যায় একাগ্রচিত্তে উপাসনা আর কে করিতে পারে? অহোদের যুদ্ধের সময় তাঁহার পায়ে শরবিদ্ধ হইয়াছিল। সেই শরটা বাহির করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার অত্যন্ত যন্ত্রণাবোধ হইত, এমনকি তিনি কাহাকেও সেই আহত পদ স্পর্শ করিতে দিতেন না। তাঁহার বন্ধুরা পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন যে আলী মোর্ত্তজা যখন উপাসনা করিবেন, সেই সময় শরমোচন করা হইবে। কার্য্যত তাহাই করা হইয়াছিল। হজরত আলী উপাসনায় এমনই গভীর মগ্ন ছিলেন যে, শরমোচনের বিষয় জানিতেই পান নাই। ধন্য সেই উপাসনা। আর ধন্য সেই ভক্ত উপাসক।

গ্রন্থখানি এমন সর্বাঙ্গীন সুন্দর যে ইহার কোন্ অংশের উল্লেখ করিব, কোন্ অংশ ছাড়িব—ঠিক করা দুঃসাধ্য। আমরা আপনার বিষয়ে ততোধিক চমৎকৃত হই অর্থাৎ আপনি মোসলমান ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়গুলি যে ভাষায় লিখেন, তাহা ভক্তের ভাষা—কূট সমালোচকের ভাষা নহে। সহজেই বুঝা যায় যে, আপনি পাদ্রীদের ন্যায় আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধি বিধানের ছিদ্রান্বেষণে বদ্ধপরিকর নহেন। এজন্য আমরা আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সে দিন আমার জনৈকা বন্ধুকে আমি এই গ্রন্থসম্বন্ধে লিখিয়াছি— "মাননীয় বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুবাদিত অনেকগুলি পুস্তক আমার নিকট আছে। তাঁহার প্রেরিত "ধর্ম্মসাধননীতি' পাঠকালে আমার মনে হয়, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, না ইসলামধর্ম্ম প্রচারক?"

"ধর্ম্মসঙ্গীত" সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। "যে সকল সঙ্গীতে লোকের চরিত্র কলুষিত হইতে পারে, তাহা গান বা শ্রবণ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কিন্তু সাধকদিগের সাধনার প্রধান অনুকূল বলিয়া ধর্ম্মসঙ্গীত মোহম্মদীয় শাস্ত্রে সাধনার জন্য সমাদৃত হইয়াছে।" এই কথা লিখিয়া আপনি আমাদিগকে "সঙ্গীত বিরোধী" দুর্নাম হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস যে "মোসলমান ধর্ম্মটা বড় 'কট খটে'—কারণ সঙ্গীত হেন মধুর বস্তুটি উহাতে নিষিদ্ধ।" এখন আর বোধ হয় কেহ আমাদিগকে সঙ্গীতবিরোধী মনে করিবেন না।

মোসলমান-শাস্ত্র সঙ্গীতকে সুনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া উহাকে অশ্লীলতা দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছে।

সঙ্গীতশ্রবণে লোকের মন কি বিচলিত (disturbed) হয়? না, বরং উহাতে এমন একটি মোহিনী শক্তি আছে যে, শ্রোতা একাগ্রচিত্ত হইয়া পড়ে। প্রায় সকল দেশেই শিশুকে

ঘুম পাড়াইবার জন্য শিশুরঞ্জক সুমধুর ছড়া গীত হইয়া থাকে। ইউরোপে রোগীর নিদ্রাকর্ষণের নিমিত্ত সেবিকাগণ গান করিয়া থাকেন। দুই জন মান্য মোসলমান স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা সঙ্গীতশ্রবণকালে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে উপাসনা করিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদের এক জন অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, একদা তিনি প্রাতঃকালীন নমাজের সময় গায়কদের ভৈরবী আলাপ শুনিতে শুনিতে যেমন একাগ্রমনে নমাজ পড়িতে পারিয়াছিলেন, সেরূপ আত্মহারা নমাজ জীবনে আর কখনও পড়েন নাই! তবে ঢাকের চড়চড়ি বা আনাড়ী গায়কের গর্দ্দভ-গর্জ্জনের কথা ভিন্ন! তাহাতে ত জলস্থল কম্পিত হয়—আর মানুষের মন চঞ্চল না হইবে কেন?

"কৃতজ্ঞতাতত্ত্বে" শিখিবার বিষয় অনেক আছে। যাহারা আপন অবস্থায় সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকে, তাহাদের পক্ষে এ অধ্যায়টি ঔষধস্বরূপ।

"ধর্ম্মসাধননীতি" হিন্দু মোসলমান সকলেরই পাঠ্য হইয়াছে। যিনি একবার ইহা পাঠ করিবেন, তিনি মোহিত হইবেন।

দজ্জাল

যখন 'মহিলা'র শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহোদয় মোসলমান শাস্ত্রসংক্রান্ত অনেক পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন ও করিতেছেন তখন "কেয়ামত" "দজ্জাল" বা "পোলসেরাত" সম্বন্ধে মহিলায় কিছু লেখা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বোধ হইবে না। আমার ত মনে হয়, "মহিলা" যেন আমাদেরই কাগজ।

এস্থলে বলা আবশ্যক, মোসলমানের ন্যায় খ্রীষ্টানগণও মহাপ্রলয় (কেয়ামত) এবং মহাবিচারের দিনে বিশ্বাস করে। কথিত আছে যে, মহাপ্রলয়ের কিছুকাল (ধরাতলে হজরত ঈসার পুনরাগমনের) পূর্ব্বে এক বিধর্ম্মী পৃথিবীতে আসিয়া অনেক লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট করিবে, তাহার নাম 'দজ্জাল', দজ্জাল মাত্র চল্লিশ দিন রাজত্ব করিবে ; এই চল্লিশ দিনের মধ্যেই সে অসংখ্য লোকের উপর প্রভুত্ব করিবে; নিজেকে ঈসা পয়গম্বর (যীশুখ্রিষ্ট) বলিয়া পরিচয় দিবে, সময় সময় ঈশ্বরত্বের দাবী করিবে![১৪] দজ্জালের সঙ্গে একটা অগ্নিকুন্ড (নরক) একটা মনোরম উদ্যান (স্বর্গ) এবং বাহনস্বরূপ একটা গর্দ্দভ থাকিবে।[১৫] এই কয়টা

---

১৪. "ঈসা পয়গম্বর আমি খোদার রছুল।
আমার কলেমা সবে করহ কবুল।"
অন্যত্র : "হর ঠাঁই যাবে সেই চড়ে এক গাধা।
যারে তারে কবে আমি তোমাদের খোদা।"
"কেয়ামত নামা"

১৫. 'বড় এক আতশখানা সঙ্গে হবে তার।
দোজখ বলিয়া নাম রাখিবে তাহার॥
আর এক বাগান তার সঙ্গে সঙ্গে চলে।

জিনিষ লইয়াই দজ্জাল দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে! এবং দিগ্বিজয়ে সে অনেকটা কৃতকার্য্য হইবে। কারণ সে অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে; এবং তাহার সহিত অর্দ্ধখানি রুটী (অর্থাৎ অন্ন) থাকিবে, আর পৃথিবীর যাবতীয় জলাশয় তাহার অধীন হইবে। যে ব্যক্তি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবে, যাহার হাতে সমুদয় অন্ন জল থাকিবে, স্বর্গ ও নরক যাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান, সে যীশুখ্রীষ্টত্বের দাবী না'ই করিবে কেন? তাহার কথায় মূর্খ ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাকাতর লোকেরা আপন পৈতৃক ধর্ম্মবিশ্বাসে জলাঞ্জলি না'ই দিবে কেন? পেটের দায় বড় দায়!

যে ব্যক্তি দজ্জালের কথামতে কুপথে যাইবে, তাহাকে সে স্বীয় স্বর্গে স্থান দিবে, আর যে তাহার কথা অমান্য করিবে, তাহাকে ধরিয়া সে নরকে ফেলিবে! স্বর্গের লোভে নরকের ভয়ে অনেক লোক দজ্জালের দলভুক্ত হইবে। হায় ক্ষুদ্র স্বার্থ!

কিন্তু দজ্জাল যাহাকে স্বর্গে রাখিবে, সে প্রকৃত পক্ষে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে এবং যে তাহার নরকে যাইবে সে স্বর্গসুখ উপভোগ করিবে!

পাঠিকা ভগিনি! ঐ দজ্জালের বর্ণনা হইতে আপনি আর কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করিতে পারেন না কি? প্রকৃত দজ্জাল ত পরে আসিবে, কিন্তু এখনই আমরা কি এ জীবনে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে দজ্জালের কুহকে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই না?

ক্ষণিক সুখের (দজ্জালের স্বর্গের) লোভে লোকে কি প্রেয় পথে অগ্রসর হইয়া শেষে নিজেকে অভিশপ্ত দেখে না? আর যে প্রেয়ের প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া শ্রেয় পথ অবলম্বন করে সে ক্ষণিক কষ্ট (দজ্জালের নরক) ভোগ করে বটে, কিন্তু সে পরিণামে অনন্ত শান্তিলাভ করে।

মানুষের মনে প্রধানত দুইটি ভাব দেখা যায়, একটি ইঙ্গিতে সুপথ, অপরটি কুপথ প্রদর্শন করে। আমরা প্রথমোক্ত ভাবকে দেবভাব এবং শেষোক্তকে অসুর ভাব বলিব। দেবভাবের কার্য্য সাত্ত্বিক, আর অসুর ভাবের কার্য্য তামসিক। শাস্ত্রকারদের মতে মানব ফেরেশ্‌তা (ইঞ্জিল বা দেবদূত) ও পশুর মধ্যবর্ত্তী জীববিশেষ! যে ব্যক্তি পশুভাব জয় করিয়া আপন আত্মাকে উন্নত করিতে পারেন, তিনি নরদেবতা; এমনকি তাঁহাকে ফেরেশ্‌তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আর যে পশুভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে অবনতির দিকে অগ্রসর হয়, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য নরপশু।

দজ্জাল অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ইত্যাদি, অর্থাৎ পতনের পাপপথ কুসুম আস্তৃত এবং সুগম। সুতরাং অবোধ লোকেরা পাপানলে পতঙ্গপ্রায় প্রাণ উৎসর্গ করে। আর ধর্ম্মের বা উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ, অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে হয়, পদে পদে মানবের পদস্খলন হয়। উন্নতির পথে কত বিঘ্ন, কত বাধা! ও পথে পদবিক্ষেপ করিবামাত্র ভুজঙ্গের শত ফণা গর্জ্জন করিয়া উঠে। অবনতি স্রোতে একবার গা ভাসাইয়া দিলে আর কিছু করিতে হয় না, অনায়াসে গড়াইয়া গড়াইয়া নরককূপে পড়া যায়!

রাখিবে তাহার নাম বেহেস্তখানা বলে।।"

একটি অতি দীর্ঘ সেতুর নাম "পোলসেরাত"। "পোলসেরাত" সেতুটি চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম (সঙ্কীর্ণ) এবং অসির অপেক্ষা তীক্ষ্ণ[১৬], তাও আবার সোজা নহে—তিন স্থলে বাঁকা! সে পোলসেরাত নরকের উপর স্থাপিত হইবে।

মহাবিচারের শেষে সকলে ঐ সেতু অতিক্রম করিয়া স্বর্গাভিমুখে যাইবে। স্বর্গের পথ এমনই কঠিন!—

অমাবস্যার রজনীর ন্যায় ঘোর অন্ধকারে মানবকে ঐ সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ সেতু অতিক্রম করিতে হইবে! পুণ্যবান লোকেরা ত অনায়াসে পার হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু পাপীদের পাপের পরিমাণ অনুসারে বারবার পদস্খলন হওয়ায় তাহারা নরকে পতিত হইবে।

আমরা ঐ দুরূহ সেতুর আর একটি অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করিলে দোষ কি? মনে করুন, ঐ পোলসেরাত একটি পরীক্ষা বিশেষ। ঐ পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, সে সিদ্ধি লাভ করে; যে ফেল (fail) হয়, তাহার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রহিয়া যায়। এই সংসার কি? একটা বিরাট পরীক্ষাক্ষেত্র নহে কি? মানব-জীবন পোলসেরাতের পথেই চলিতেছে না কি? কেহ আরম্ভে, কেহ এক-তৃতীয়াংশ পথে (পোলসেরাতের প্রথম মোড়ে), কেহ অর্দ্ধপথে (অথবা সেতুর দ্বিতীয় মোড়ে), কেহ আর কিছু দূরে (সেতুর তৃতীয় মোড় পর্য্যন্ত) অগ্রসর হইয়া ফেল হয়,—অধিকাংশ লোকেই ফেল হয়। ক্বচিৎ দুই দশ জন ভাগ্যবান্ লোক সফলকাম হয়। কবি বড় নৈরাশ্যে গাহিয়াছেন, :

"মিছে কেন কর বিষয় ভাবনা—
কতই দেখিছ, এ ছার সংসারে
কারুই পূরে না মনোবাসনা।"

এই ভারতের ত্রিশ কোটী নরনারীর মধ্যে কয়জন লোক প্রতিদিন দুই বেলা পূর্ণোদর আহার প্রাপ্ত হয়? কয়জন লোকের জন্য জীবিকার পথ সুগম? কয়জনে পোলসেরাতের উপর বসিয়া অশ্রুপাত না করে? কয়জন জীবনের এক একটি দিনকে এক বৎসর তুল্য দীর্ঘ মনে না করে? কয়জনে জীবনের পথটা কণ্টকময় মনে না করে? তাই কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন—

"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে!"

* * * * *

তাই ত, একবার এ ভ্রমে পতিত হইলে আর সহজে নিষ্কৃতি নাই।

---

১৬. "চুল হইতে সরু যে তলওয়ার হৈতে ধার,
অন্ধকার রাত্রি হৈতে সেথা অন্ধকার॥
পোনের হাজার সাল জান সেই রাহা!
তিন বেঁক হবে তাহে এলাহির চাহা॥"
"পোনের হাজার সাল সেই রাহা", অর্থাৎ সেতুটি এত দীর্ঘ যে পদব্রজে চলিয়া উহা অতিক্রম করিতে ১৫০০০ বৎসর সময় লাগিবে!

তাই বলিয়া পোলসেরাত যে একেবারে দুর্গম, তাহাও নহে। অনেকে ধর্ম্মজীবনে সিদ্ধিলাভ করেন ; অনেকে আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন, যিনিই কোন বিশেষ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাকেই কঠোর পরীক্ষা পোলসেরাত অতিক্রম করিতে হইয়াছে। বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

আর এক কথা বলিয়া এখন উপসংহার করি। দজ্জাল ১. যীশুখ্রীষ্টত্বের দাবী করিবে, (অর্থাৎ দজ্জাল খ্রীষ্টান ?) তাহার সঙ্গে ২. অর্দ্ধেক রুটী থাকিবে[১৭] , যে রুটী থাকিবে যে দেশে সে যাইবে, সেই দেশের ৩. জলের কর্ত্তা হইবে[১৮] ; (অর্থাৎ তাহার হাতে দেশের অন্ন জল থাকিবে !) ৪. পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তাহার করায়ত্ত হইবে ; ৫. এবং তাহার ইচ্ছায় শুষ্ক তরু মঞ্জুরিত হইবে, ইত্যাদি কথার অবশ্যই কোন গূঢ় অর্থ আছে। মোটামুটি ত এই দেখা যায়;—১. খ্রীষ্টান দজ্জাল ২. অন্ন ৩. জল ও ৪. অতুল ঐশ্বর্য্যে অধীশ্বর এবং সে ৫. বিজ্ঞান বলে অঘটন ঘটাইতে (অর্থাৎ শুষ্ক বৃক্ষে ফল ফলাইতে) সমর্থ ! !

ঐ দজ্জাল ও পোলসেরাতে প্রচুর নৈতিক ও দার্শনিক শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত। ধন্য সেই ধর্ম্মগুরু (হজরত মহম্মদ), যিনি এত কথা জানিতেন ! যিনি এমন সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী ছিলেন। ধন্য তিনি ! অমর তিনি ! !

অবশ্য আমার সাধ্য কি যে আমি দজ্জাল বা পোলসেরাতের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে বা তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারি ! আমি কোন্ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট ! তবে বাঙ্গালা "কেয়ামত–নামা" পাঠকালে যাহা মনে উদয় হইল, এস্থলে তাই বলিলাম, আবশ্যক বোধে উক্ত পুস্তকের কোন কোন অংশ পাদটীকায় উদ্ধৃত করা গেল।

যাহার চক্ষু আছে, সে দেখুক ; যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক ; আর যাহার মন আছে, সে চিন্তা করুক। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি দজ্জালকে একরূপ বুঝিলাম, আর কেহ হয়ত অন্যরূপ বুঝিবেন, কেহ হয়ত হাসিবেন। যিনি হাসিতে চাহেন, তাঁহার প্রতি আমার এই বিনীত অনুরোধ যে, হাসিবার পূর্ব্বে তিনি যেন একটু গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

সিসেম ফাঁক

আলিবাবার নিকট দস্যুদের গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান পাইয়া কাসেম তথায় গেল। "সিসেম ফাঁক" বলিবা মাত্র ধনাগারের দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে বিস্ময়মুগ্ধ হইল। যক্ষের ধন দেখিয়া কাসেমের চক্ষুস্থির। সে দুই হস্তে প্রবাল, মুক্তা, মরকত, পদ্মরাগ, হীরক প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তর সংগ্রহ করিতে লাগিল। থলিয়া ভরিয়া আশরফী লইল। সে জীবনে এত ধন কখনও দেখে নাই ; আজি তাহার ভারী আনন্দ। সে বহুমূল্য সাটীন, কিঙ্খাপ

---

১৭. "সঙ্গে তার হবে আর এক আধা রুটী।
যাহাকে চাহিবে সেই রুটী দিবে বাঁটি॥"

১৮. "আর তার তাবে হবে দেশে যত পানি।
চাহিলে না দিবে পানি বিনে পেরেশানি॥"
অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগকে জ্বালাতন না করিয়া দজ্জাল জলদান করিবে না।

ইত্যাদি রেশমী বস্ত্রে বস্তা বোঝাই করিয়া রাখিল। অদ্য সে উষ্ট্র-পৃষ্ঠে ধন বহিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু সবই ত হইল ; এখন বাহির হইবার উপায় কি? কাসেম ত মূলমন্ত্র—অর্থাৎ উক্ত চারি শব্দ : " সিসেম ফাঁক," ভুলিয়া গিয়াছে! রাশীকৃত ধন লইয়া, ধনস্তূপে থাকিয়া, মণিমুক্তায় পরিবেষ্টিত হইয়া সে যে বন্দী—মুক্তির উপায় নাই। পরিশেষে কাসেম উন্মত্তের ন্যায় দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া "গোধূম ফাঁক", "উচ্ছে ফাঁক" ইত্যাদি অনেক শব্দ উচ্চারণ করিল: কিন্তু সকল বৃথা—আসল কথা, "সিসেম ফাঁক" সে ভুলিয়া গিয়াছে ; সুতরাং তাহার মুক্তির পথ রুদ্ধ।

আজি ১০/১২ বৎসর হইতে দেখিতেছি, আমাদের মুসলমান সমাজে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে—চারিদিকে বেশ জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে ; নানা প্রকার সভা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা কাসেমের ন্যায় "অল্ ইণ্ডিয়া মোসলেম লীগ," "সেন্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েশন," "অল ইণ্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স," অমুক ইন্সটিটিউশন, অমুক এসোসিয়েশন ইত্যাদি বহুবিধ ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটনের মন্ত্রটি, অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষার বিষয় ভুলিয়া ছিলেন দেখিয়া আমি মৃদুহাস্য করিতাম। মনে মনে বলিতাম, ভ্রাতঃ! যাহাই করুন না কেন, —এ রত্ন-সম্ভার লইয়া সওগাত দিতে যাইবেন কোথায়? দ্বার যে বন্ধ। গৃহে যে গৃহিণী, ধর্ম্মে যে সহধর্ম্মিণী, ভাবী বংশধরের যে জননী, ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার যে রক্ষয়িত্রী ও পালনকর্ত্রী, তাহাকে সঙ্গে না লইলে আপনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবেন না! গরীবের কথা বাসি হইলে ফলে ; আমার কথাও (১০।১২ বৎসরের) বাসি হইয়া ফলিয়াছে।

এখন মুসলমান সমাজ বুঝিয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত এ অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নাই। তাই তাঁহারা আর শুধু ভ্রাতৃসমাজ লইয়াই ব্যস্ত নহেন। চতুর্দ্দিকে স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা হইতেছে ও জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। এখানে মুসলমান মহিলা সমিতি, সেখানে মহিলা ক্লাব প্রভৃতি নানাবিধ সদনুষ্ঠান আমাদের শ্রুতিগোচর ও নয়নগোচর হইতেছে। এমনকি, গত বর্ষের "অল্ ইণ্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্সের" অধিবেশনে পর্দ্দানশীন মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান রাখিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ভ্রাতৃগণ এখন ভগিনীদের চিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন, "না জাগিলে সব ভারত-ললনা" এ ভারত আর জাগিবে না।

চাষার দুক্ষু

"ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরি, রে ভাই
পাছায় জোটে না ত্যানা।
বৌ-এর পৈছা বিকায় তবু
ছেইলা পায় না দানা।"

শুনিতে পাই, দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসী অসভ্য বর্ব্বর ছিল,—এই দেড় শত বৎসর হইতে আমরা ক্রমশঃ সভ্য হইতে সভ্যতর হইতেছি। শিক্ষায়, সম্পদে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতির সমকক্ষ হইতে চলিয়াছি। এখন আমাদের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য্য রাখিবার

স্থান নাই।—সত্যই ত, এই যে অভ্রভেদী পাঁচতলা পাকা বাড়ী, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টীমার, এরোপ্লেন, মোটর লরী, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্টাফিস, চিঠিপত্রের সুনিয়মিত ডেলিভারী, এখানে পাটকল, সেখানে চটকল, অট্টালিকার চূড়ায় বড় বড় ঘড়ি, সামান্য অসুখ হইলে আট দশ জন ডাক্তারে টেপে নাড়ী, চিকিৎসা, ঔষধ, অপারেশন, ইনজেকশন, ব্যবস্থা-পত্রের ছড়াছড়ি, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘৌড়দৌড় জনতার হুড়াহুড়ি, লেমোজেড জিঞ্জারেণ্ড, বরফের গাড়ী, ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, অনারেবলের গড়াগড়ি (বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য-দ্রব্যে ভেজালের বাড়াবাড়ি)—এসব কি সভ্যতার নিদর্শন নহে? নিশ্চয়! যে বলে "নহে", সে ডাহা নিমকহারাম।[১৯]

কিন্তু ইহার অপর পৃষ্ঠাও আছে—কেবল কলিকাতাটুকু আমাদের গোটা ভারতবর্ষ নহে এবং মুষ্টিমেয়, সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের অধিবাসী নহে। অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়, চাষার দারিদ্র্য। চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড। তবে আমার "ধান ভানিতে শিবের গান" কেন? অবশ্যই ইহার কারণ আছে। আমি যদি প্রথমেই পল্লীবাসী কৃষকের দুঃখ-দুর্দ্দশার কান্না কাঁদিতে বসিতাম, তবে কেহ চট্ করিয়া আমার চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেন যে, আমাদের মোটরকার আছে, গ্রামোফোন আছে, ইত্যাদি। ভালর ভাগ ছাড়িয়া কেবল মন্দের দিকটা দেখা কেন? সেইজন্য ভালর দিকটা আগে দেখাইলাম। এখন মন্দের দিকে দেখা যাউক।

ঐ যে চটকল আর পাটকল; —এক একটা জুট মিলের কর্ম্মচারীগণ মাসিক ৫০০.০০-৭০০.০০ (পাঁচ কিম্বা সাত শত) টাকা বেতন পাইয়া নবাবী হালে থাকে, নবাবী চালে চলে, কিন্তু সেই জুট (পাট) যাহারা উৎপাদন করে, তাহাদের অবস্থা এই যে — "পাছায় জোটে না ত্যানা!" ইহা ভাবিবার বিষয় নহে কি? আল্লাহ্তা'লা এত অবিচার কিরূপে সহ্য করিতেছেন?

সমগ্র ভারতের বিষয় ছাড়িয়া কেবল বঙ্গদেশের আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। একটি চাউল পরীক্ষা করিলেই হাঁড়িভরা ভাতের অবস্থা জানা যায়। আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা,—তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন, "ধান্য তার বসুন্ধরা যার"। তাই ত, অভাগা চাষা কে? সে কেবল "ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে," হাল বহন করিবে, আর পাট উৎপাদন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে "মরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরা মুরগী ছিল," এ কথার অর্থ কি? ইহা কি শুধুই কবির কল্পনা? না, কবির কল্পনা নহে, কাব্য উপন্যাসও নহে, সত্য কথা। পূর্ব্বে ওসব ছিল, এখন নাই। আরে! এখন যে আমরা সভ্য হইয়াছি! ইহাই কি সভ্যতা? সভ্যতা কি করিবে, ইউরোপের মহাযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, তা বঙ্গীয় কৃষকের কথা কি?

আমি উপর্যুক্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না, কারণ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ ত এই সাত বৎসরের ঘটনা। ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও কি চাষার অবস্থা ভাল ছিল? দুই একটি উদাহরণ

---

১৯. অনেক আলেমের মতে লিবারপুলের লবণ হারাম। যে ব্যক্তি লিবারপুলের নুন খাইয়া সভ্যতার গুণ না মানে, সে "নিমকহারাম" বই কি!

দেখাই—বাল্যকালে শুনিতাম, টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, আর টাকায় ৪ সের ঘৃত। যখন টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, তখনকার একটা গল্প এই :—

"কৃষক কন্যা জমিরনের মাথায় বেশ ঘন ও লম্বা চুল ছিল, তার মাথায় প্রায় আধ পোয়াটাক তেল লাগিত। সেইজন্য যেদিন জমিরন মাথা ঘষিত, সেদিন তাহার মা তাকে রাজবাড়ী লইয়া আসিত, আমরা তাকে তেল দিতাম।" হা অদৃষ্ট ! যখন দুই গণ্ডা পয়সায় এক সের তৈল পাওয়া যাইত, তখনও জমিরনের মাতা কন্যার জন্য এক পয়সার তেল জুটাইতে পারিত না।

এই ত ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে বেহার অঞ্চলে[২০] দুই সের খেসারী বিনিময়ে কৃষক-পত্নী কন্যা বিক্রয় করিত ! পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত কণিকা রাজ্যের অবস্থা এই ছিল যে, কৃষকেরা "পখাল" (পান্তা) ভাতের সহিত লবণ ব্যতীত অন্য কোন উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিত না। সুটকী মাছ পরম উপাদেয় ব্যঞ্জন বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন সেখানে টাকায় ২৫।২৬ সের চাউল ছিল। সাত ভায়া নামক সমুদ্র-তীরবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা পখাল ভাতের সহিত লবণও জুটাইতে পারিত না। তাহারা সমুদ্র-জলে চাউল ধুইয়া ভাত রাঁধিয়া খাইত। রংপুর জেলার কোন কোন গ্রামের কৃযক এত দরিদ্র যে, টাকায় ২৫ সের চাউল পাওয়া সত্ত্বেও ভাত না পাইয়া লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরকারী ও পাট-শাক, লাউ শাক ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইত ! আর পরিধান করিত কি, শুনিবেন ? পুরুষেরা বহু কষ্টে স্ত্রীলোকদের জন্য ৮ হাত কিম্বা ৯ হাত কাপড় সংগ্রহ করিয়া দিয়া নিজেরা কৌপিন ধারণ করিত ! শীতকালে দিবাভাগে মাঠে মাঠে রৌদ্রে যাপন করিত ; রাত্রিকালে শীত অসহ্য বোধ হইলে মাঝে মাঝে উঠিয়া পাটখড়ি জ্বালিয়া আগুন পোহাইত। বিচালী (বা পোয়াল খড়) শয্যায় শয়ন করিত। অথচ এই রংপুর ধান্য ও পাটের জন্য প্রসিদ্ধ। সুতরাং দেখা যায়, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সহিত চাষার দারিদ্র্যের সম্পর্ক অতি অল্পই। যখন টাকায় ২৫ সের চাউল ছিল, তখনও তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই—এখন টাকায় ৩/৪ সের চাউল হওয়ায়ও তাহারা অর্ধানশনে থাকে :—

এ কঠোর মহীতে
চাষা এসেছে শুধু সহিতে ;
আর মরমের ব্যথা লুকায়ে মরমে
জঠর-অনলে দহিতে !

পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর পূবের্বর চিত্র ত এই, তবে "মরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল-ভরা গরু ছিল, ঢাকা-মসলিন কাপড় ছিল" ইত্যাদি কোন্ সময়ের অবস্থা ? মনে হয়, অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পূবের্বর অবস্থা। যখন —

কৃষক-রমণী স্বহস্তে চরকায় সূতা কাটিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলের জন্য কাপড় প্রস্তুত করিত। আসাম এবং রংপুর জেলায় এক প্রকার রেশম হয়, স্থানীয় ভাষায় তাহাকে "এণ্ডি" বলে। এণ্ডি রেশমের পোকা প্রতিপালন ও তাহার গুটি হইতে সূতা কাটা অতি সহজসাধ্য

---

২০. ১৬ বৎসর পূর্ব্বে বেহার ও উড়িষ্যা বঙ্গের অঙ্গীভূত ছিল।

কার্য্য। এই শিল্প তদ্দেশবাসিনী রমণীদের একচেটিয়া ছিল। তাহারা এ উহার বাড়ী দেখা করিতে যাইবার সময় টেকো হাতে লইয়া সূতা কাটিতে কাটিতে বেড়াইতে যাইত। এণ্ডি কাপড় বেশ গরম এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহা ফ্লানেল হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে, অথচ ফ্লানেল অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। একখানি এণ্ডি কাপড় অবাধে ৪০ (চল্লিশ) বৎসর টেকে। ৪/৫ খানি এণ্ডি চাদর থাকিলে লেপ, কম্বল, কাঁথা—কিছুরই প্রয়োজন হয় না। ফল কথা, সেকালে রমণীগণ হাসিয়া খেলিয়া বস্ত্র-সমস্যা পূরণ করিত। সুতরাং তখন চাষা অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল ছিল না। তখন কিন্তু সে অসভ্য বর্ব্বর ছিল। এখন তাহারা সভ্য হইয়াছে, তাই—

শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ
ঢেকে রাখে টাক্।

কিন্তু তাহাদের পেটে নাই ভাত। প্রশ্ন হইতে পারে—সভ্যতার সহিত দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইবার কারণ কি? কারণ :—যেহেতু আপাতঃ-সুলভ মূল্যে বিবিধ রঙ্গীন ও মিহি কাপড় পাওয়া যায়, তবে আর চরকা লইয়া ঘর্ঘর করিবে কেন? বিচিত্র বর্ণের জুট ফ্লানেল থাকিতে বর্ণহীন এণ্ডি বস্ত্র ব্যবহার করিবে কেন? পূর্ব্বে পল্লীবাসিনীগণ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া কাপড় কাচিত ; এখন তাহাদের কাপড় ধুইবার জন্য হয় ধোপার প্রয়োজন, নয় সোডা। চারি পয়সার সোডায় যে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য আর কষ্ট করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে কেন? এইরূপে বিলাসিতা শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিষে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ যে "পাছায় জোটে না ত্যানা" কিন্তু মাথায় ছাতা এবং সম্ভবতঃ পায়ে জুতা আছে ত! "বৌ-এর পৈছা বিকায়" কিন্তু তবু "বেলোয়ারের চুড়ি" থাকে ত! মুটে মজুর ট্রাম না হইলে দুই পদ নড়িতে পারে না। প্রথম দৃষ্টিতে ট্রামের ভাড়া পাঁচটা পয়সা অতি সামান্য বোধ হয়— কিন্তু ঐ যাঃ, যাইতে আসিতে দশ পয়সা লাগিয়া গেল! এই রূপে দুইটি পয়সা, চারি পয়সা করিয়া—ধীরে ধীরে সর্ব্বস্বহারা হইয়া পড়িতেছে।

নিজ অন্ন পর কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্ত্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে!

বিলাসিতা ওরফে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে 'অনুকরণপ্রিয়তা' নামক আর একটা ভূত তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া আছে। তাহাদের আর্থিক অবস্থা সামান্য একটু সচ্ছল হইলেই তাহারা প্রতিবেশী বড়লোকদের অনুকরণ করিয়া থাকে। তখন চাষার বৌ-ঝির যাতায়াতের জন্য সওয়ারী চাই ; ধান ভানিবার জন্য ভারানী চাই ইত্যাদি। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে : —

সর্ব্ব অঙ্গেই ব্যথা,
ঔষধ দিবে কোথা?

আর

এ বহ্নির শত শিখা
কে করিবে গণনা?

অতঃপর শিবিকাবাহকগণ পাল্কী স্কন্ধে লইয়া ট্রামে যাতায়াত করিলেই সভ্যতার চূড়ান্ত হইবে।

আবার মজা দেখুন,আমরা ত সুসভ্য হইয়া এণ্ডি কাপড় পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু ঐ এণ্ডি কাপড়ই "আসাম সিল্ক" নামে অভিহিত হইয়া কোট, প্যান্ট ও স্কার্ট রূপে ইউরোপীয় নর–নারীদের বর–অঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল। ক্রমে পল্লীবাসিনীর সভ্যতার মাত্রাধিক্য হওয়ায় (অর্থাৎ আর এণ্ডি পোকা প্রতিপালন করা হয় না বলিয়া) এখন আর হোয়াইট–এ্যাওয়ে লেডলর দোকানে "আসাম সিল্ক" পাওয়া যায় না। কেবল ইহাই নহে, আসাম হইতে এণ্ডি গুটি বিদেশে চালান যায়— তথা হইতে সূত্ররূপে আবার আসামে ফিরিয়া আইসে। এই ত সেদিনের কথা— বঙ্গের গভর্ণর লর্ড কার্মাইকেল একখানি দেশী রেশমী রুমালের জন্মস্থানের অনুসন্ধান করেন, কেহই বলিতে পারিল না, সেরূপ রুমাল কোথায় প্রস্তুত হয়। কিন্তু লর্ড কার্মাইকেল ইংরাজ বাচ্চা— সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন ; তিনি রুমালটার জন্মভূমি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের কোন গ্রামে ঐরূপ রেশমী রুমাল প্রস্তুত হইত, এখন আর হয় না, কারণ সে গ্রামের লোকেরা সুসভ্য হইয়াছে ! ফল কথা, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশী শিল্পসমূহ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়াছে।

সুখের বিষয়, সম্প্রতি পল্লীগ্রামের দুর্গতির প্রতি দেশবন্ধু নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেবল দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট নহে ; চাষার দুক্ষু যাহাতে দূর হয়, সেজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিতে হইবে। আবার সেই "মরাই–ভরা ধান, ঢাকা মসলিন" ইত্যাদি লাভ করিবার একমাত্র উপায় দেশী শিল্প—বিশেষতঃ নারী শিল্পসমূহের পুনরুদ্ধার। জেলায় জেলায় পাটের চাষ কম করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কার্পাসের চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া চাই এবং চরকা ও এণ্ডি সূতার প্রচলন বহুল পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আসাম এবং রংপুরবাসিনী ললনাগণ এণ্ডি পোকা প্রতিপালনে তৎপর হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের বস্ত্র–ক্লেশ লাঘব হইবে। পল্লীগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে।

এণ্ডি শিল্প

ধন–ধান্যে–পুষ্পে ভরা রত্ন–প্রসবিনী ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানা রেশম কীট জন্মিয়া থাকে, তাহা অবশ্য অনেকেই অবগত আছেন। কোন প্রকার কীট কূলপত্র, কোন কীট তুতপত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের কোষ বা গুটী দ্বারা বিবিধ রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। অদ্য আমরা 'এণ্ডি' নামক এক প্রকার রেশমের জন্ম এবং ইতিহাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এণ্ডি গুটী প্রধানতঃ আসাম অঞ্চলে এবং রংপুর জেলায় আবাদ হয়।

এণ্ডি গুটী আবাদ করিতে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় না, পরিশ্রমও নগণ্য বলিলেই হয়। ইহার খাদ্য এরণ্ড পত্র। রংপুরে এরণ্ড গাছের কোন মূল্য নাই, যত্রতত্র প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া জঙ্গল হয়। সম্ভবতঃ এরণ্ড–পত্র খায় বলিয়া এ রেশমের নাম "এণ্ডি" ("এরণ্ডি," ক্রমে মধ্যস্থলের "র" লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় "এণ্ডি") হইয়াছে। সুতরাং রংপুরে এণ্ডি পোকার খাদ্য সংগ্রহ কিছু মাত্র আয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে। সম্ভবতঃ চারি আনার ডিম ক্রয় করিয়া যে পরিমাণ পোকার গুটী লাভ হয়, তদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দে একখানা ১১ হাত লম্বা ও ৪৪ ইঞ্চি বহরের

কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এক প্রকার একখানা কাপড়ের মূল্য ৬ ছয় টাকা ছিল ; এখন (যদি পাওয়া যায়) তাহার মূল্য ন্যূনাধিক ১৬/১৭ টাকা। যে গুটী সূতা পূর্ব্বে এক পয়সায় পাওয়া যাইত, এখন তাহার মূল্য ছয় পয়সা ! অতএব এণ্ডি ধুতির মূল্য এখন ৩৬ হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না। ঠিক চারি আনার ডিমে ৫/৬ কাহন (অর্থাৎ একখানি ১১ হাতি ধুতির উপযোগী) গুটী লাভ হয় কিনা তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। কারণ এখন রংপুর জেলায় এণ্ডি শিল্প বিলুপ্ত হওয়ায় আমি বহু চেষ্টা করিয়াও এ সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারি নাই। এণ্ডি সম্বন্ধে বঙ্গের প্রসিদ্ধ লেখক কবিবর মৌলবী শেখ ফজলুল করিম সাহেব লিখিয়াছেন :

"এণ্ডির তূলির জন্য এখানে (রঙ্গপুরে) ২/৪ জনের কাছে অনুসন্ধান লইলাম, যাঁহারা সখের জন্যে পোকা পুষিয়া থাকেন, এমন ২/১ জনকেও জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু দর জানা ব্যতীত আর কোনই উপকার হইল না। ২০ গণ্ডা গুটীর দাম ১৫ পয়সা মাত্র। এখানে কাহারো ঘরে উহা বিক্রয়ের জন্য মৌজুদ নাই।"

গুটীর হিসাব এই প্রকার ২০ গণ্ডায় এক পণ ; ১৬ পণে এক কাহন। তাহা হইলে দেখা যায়, এক কাহন গুটীর মূল্য মাত্র চারি আনা। তিন কাহন গুটীতে যে পরিমাণ সূতা প্রস্তুত হয়, তদ্দ্বারা ৬ হাত লম্বা ও তিন হাত চওড়া একখানি চাদর প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপ একখানি চাদরের মূল্য পূর্ব্বে ৩.০০/৪.০০ ছিল, এখন ৯.০০ হইতে ১৩.০০ পর্য্যন্ত।

আমাদের বাল্যকালে যখন এণ্ডি কাপড় দেখিতাম, তখন শুনিতাম যে উহা ভদ্রলোকের ব্যবহার্য্য নহে ; উহা কেবল চাষারা ব্যবহার করে। সুতরাং এণ্ডি বস্ত্রকে হেয় দৃষ্টিতে দেখিতাম। দরিদ্র চাষী স্ত্রীলোকেরাই এণ্ডি পোকা পোষণ করিত, এণ্ডি সূতা কাটিত এবং ইহার কাপড় ব্যবহার করিত। তাহারা স্বহস্তে কাপড়ের তানা পর্য্যন্ত করিয়া দিত, বাকী কার্য্য তন্তুবায়গণ করিত। আমরা ত এইরূপে লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলাম, কিন্তু ইহার আদর কদর করিল কাহারা ? আমরা যাঁহাদের পদলেহন—না, জুতার ধূলি লেহন করিয়া ধন্য হই !

আসাম অঞ্চলে এই এণ্ডি বস্ত্র বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হয় বলিয়া আমাদের গুরুর গুরু—দেড় শত বৎসরের গুরু ইউরোপীয়গণ ইহাকে "আসাম সিল্ক" বলিয়া অতি আদরের সহিত ইহা দ্বারা কোট, স্কার্ট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি, আমরাও হোয়াইট এ্যাওয়ে লেডলর দোকান হইতে "আসাম সিল্ক"-এর "সুট" ক্রয় করিয়া পরিধান করা ফ্যাশান মনে করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমরা এই মূল্যবান শিল্পের উন্নতির কোন চেষ্টা করিলাম না। ক্রমে রংপুরের চাষা ও আসামের বন্য পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরা এণ্ডি সূতা কাটা ভুলিয়া গেল। ফলে এখন আসাম হইতে গুটী বিদেশে রপ্তানী হয়, তথা হইতে কলে সূতা প্রস্তুত হইয়া পুনরায় আসামে আইসে। স্থানীয় তন্তুবায়গণ সেই সূত্রে বস্ত্র প্রস্তুত করে, পরে সেই "আসাম সিল্ক" কলিকাতার কোন কোন দোকানে বিক্রীত হয়। কিন্তু এখন সে অবস্থাও নাই, অর্থাৎ "আসাম সিল্ক" আর সহজে (অন্ততঃ লেডলর দোকানে) পাওয়া যায় না ! সংবাদপত্রে যে আসামী এণ্ডির বিজ্ঞাপন দেখা যায় তাহা খাঁটি বস্তু কিনা সন্দেহ। কারণ "কাশী সিল্ক" নামে যে রেশমী কাপড় বাজারে দেখা যায়, তাহা জার্ম্মানী হইতে আমদানী করা খোঁটা মাল।

বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে খদ্দর কাপড়ের কি মূল্য ছিল? তাহা কেবল পশ্চিম অঞ্চলের কোল, সাঁওতাল, জোলা, ধুনিয়া প্রভৃতি লোকেরা ব্যবহার করিত। এখন ত খদ্দর আমাদের মাথায় উঠিয়াছে। এই সুবর্ণ সুযোগে খদ্দর, এণ্ডি ও অপরাপর রেশমী বস্ত্রের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। শুনিতেছি, একা খদ্দর আমাদের দেশের ষোল আনা অভাব পূরণ করিতে পারিবে না। তাহা হইলে ভারতের বিবিধ পট্টবস্ত্র অগ্রসর হউক। এণ্ডি খদ্দরের তুলনায় কয়েকটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ; (১) দীর্ঘকাল স্থায়ী (১০ বৎসর–এর পূর্ব্বে ছিন্ন হইবার আশঙ্কা নাই) ; (২) খদ্দর অপেক্ষা ওজনে হাল্কা ; (৩) ফ্লানেলের ন্যায় গরম ; (৪) ইহাতে কোন প্রকার ভেজালের আশঙ্কা নাই। খদ্দরের তানায় মিলের সূতা ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহাকে খাঁটি স্বদেশী বা হস্তনির্ম্মিত বলা যায় না। তাহা ছাড়া "জাপানী খদ্দর" নাকি বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। এণ্ডি বস্ত্রের এসব বালাই নাই। আরও এক মজার কথা এই যে, যাবতীয় কাপড় নূতন অবস্থায় নয়ন–রঞ্জন চকচকে থাকে,—দুই তিন বার ধুইলে বিশ্রী হয়, পুরাতন হইলে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়। এণ্ডি কাপড় ইহার বিপরীত—নূতন অবস্থায় বিশ্রী থাকে, প্রথম দর্শনে গ্রাহক বা ক্রেতাকে উহার প্রতি আকৃষ্ট করিবার মত মনোহর গুণ উহার নাই। কিন্তু এ কাপড় যতই ধোয়া যায়, যতই পুরাতন হয়, ততই সুশ্রী এবং ব্যবহারে আরামদায়ক, মসৃণ ও দেখিতে চিক্‌চিকে হয়।

দুঃখের বিষয়, রংপুরের এণ্ডি শিল্প বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সময় সময় সংবাদপত্রে "আসাম–জাত এণ্ডি" কাপড়ের বিজ্ঞাপন দেখা যায়, কিন্তু রংপুরের সহিত এণ্ডির কোন সম্পর্ক আছে বা ছিল বলিয়া কেহ জানে না। ঝাড়া ছয় মাস পর্য্যন্ত রংপুরের কতিপয় ভদ্রলোককে পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিয়া আমি মাত্র একটি গ্রাম আবিষ্কার করিয়াছি, যেখানে এখন এণ্ডি শিল্পের শেষ নিঃশ্বাসটুকু বহিতেছে। কিন্তু এই সবে ধন নীলমণি বেলকা গ্রামের স্ত্রীলোকরাও এখন এণ্ডি পোকা পোষণ করে না। কেহ কেহ নিতান্ত দারিদ্র্য–পেষণে অনন্যোপায় হইলে পোকা পুষিয়া কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টা করে। এ সময় এই নাভিশ্বাসটুকু রক্ষা না করিলে ইহারও অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

বেলকা হাই ইংলিশ স্কুলের হেড মাস্টার মহাশয় অতিশয় দেশ–হিতৈষী উৎসাহী লোক। তিনি ঐ স্কুলে ছাত্রদের জন্য একটি বয়ন ক্লাশ খুলিয়াছেন। তাঁহার বয়ন যন্ত্রে এণ্ডি বস্ত্র বয়ন করা হয়। কিন্তু সূতার জন্য তাঁহাদিগকে অপরের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সূতা লাভের সহজ উপায় স্কুলে পোকা–পোষণ করা। কিন্তু উৎসাহ, সহায় ও সহকর্ম্মীর অভাবে তিনি পোকা প্রতিপালন করিতে অক্ষম।

এণ্ডি গুটী আবাদের প্রণালী এই : —

(১) হাট হইতে কতকগুলি পোকার বীজ ক্রয় করিয়া আনিতে হয়। বীজ অর্থে, কতকগুলি ডিমোলা প্রজাপ্রতি ও ডিম বুঝিতে হইবে।

(২) ডিমগুলি এক খণ্ড পরিষ্কার নেকড়ায় বাঁধিয়া একটা ডালাতে শিকায় তুলিয়া রাখা হয়।

(৩) সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ কাল পরে ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হইলে এরণ্ডের খুব কচি পাতা ছিঁড়িয়া উহাদের খাইতে দিতে হইবে।

(৪) প্রত্যহ পোকার বাসস্থান একবার পরিষ্কার করিতে হইবে ; পিপীলিকা ও মাছি উহার পরম শত্রু। সেজন্য কেহ কেহ নেটের ন্যায় পাতলা কাপড় দ্বারা পোকা ঢাকিয়া রাখে।

(৫) দুই চারি দিন কচি পাতা খাইয়া পোকাগুলি একটু বড় হয়, ইহার পর একদিন দেখিবেন, পোকাগুলি অসাড়ভাবে পড়িয়া আছে, নড়েও না, পাতাও খায় না। তখন উহাদের মৃত জ্ঞানে ফেলিয়া দিবেন না। এই অবস্থাকে স্থানীয় ভাষায় "পোকার ঘুম" বলে। এক অহোরাত্রি কিম্বা ততোধিক কাল ঘুমাইবার পর পোকাগুলি একটু বড় পাতা অধিক পরিমাণে খাইতে আরম্ভ করে, এখন আর পাতা ছিঁড়িয়া দিতে হয় না।

(৬) কিছুদিন পরে পোকা আবার ঘুমাইবে। এইরূপ পোকা তিন কিম্বা চারি বার ঘুমায়।

(৭) শেষবারে ঘুমের পর পোকাগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩ ইঞ্চি হয়, রংটাও এরণ্ড পত্রের অনুরূপ হয়। এখন ইহারা রাক্ষসের মত পাতা খাইতে আরম্ভ করে। সে সময় ইহাদের পাতা খাওয়ার খস্ খস্ শব্দ শোনা যায়। এখন বড় বড় পাতা গোছা বাঁধিয়া পোকার মাচার উপর একটা বাঁশের আড়ে ঝুলাইয়া দিতে হয়। দিনে তিন চারিবার প্রচুর পরিমাণে পাতা দিতে হইবে এবং দুইবার পোকার বাসস্থান মাচা পরিষ্কার করিতে হইবে।

(৮) ইহার ৩/৪ দিন পরেই পোকা গুটী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, এ অবস্থাকে স্থানীয় ভাষায় "জরা" বলে। পোকা জরিতে আরম্ভ করিলে আর খায় না, বরং পাতার গাছে যেখানে সেখানে জরিয়া থাকে।

(৯) অতঃপর এই জরিত গুটীর যেগুলি বীজের জন্য রাখা হইবে, সেইগুলি ব্যতীত অপর গুটীগুলিকে গরম ক্ষারের জলে ডুবাইয়া তাহাদের ভিতরকার পোকা মারিয়া ফেলা হয়। ঐরূপ না করিলে কিছুদিনের পর পোকাগুলি গুটি কাটিয়া প্রজাপতি রূপে বাহির হইয়া পড়ে। তখন ঐ ছিদ্রযুক্ত গুটী হইতে ভাল সূতা হয় না— হইলেও সে সূতা মজবুত হয় না।

(১০) ক্ষারে সিদ্ধ করিবার পর গুটীগুলিকে উল্টাইয়া আভ্যন্তরীণ মৃত কীট ফেলিয়া দিয়া ধুইয়া লওয়া হয়।

এক ফসল গুটী—অর্থাৎ ডিম ফুটা হইতে আরম্ভ করিয়া পোকা জরা পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়া ২/৩ মাসে সম্পন্ন হয়। তাহা হইলে দেখা যায়, বৎসরে অন্ততঃ তিন ফসল গুটী আবাদ করা যাইতে পারে।

(১১) এণ্ডি সূতা প্রস্তুত করিবার প্রণালী, চরকা দ্বারা তূলার সূতা, এবং অন্যান্য রেশমী গুটী হইতে সূতা প্রস্তুত করার পদ্ধতি হইতে অনুরূপ। ক্ষারে সিদ্ধ করা গুটীর ৫টি হইতে ১০টি পর্য্যন্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগে কিম্বা এক খণ্ড কাঠির উপর পরে পরে সাজাইয়া রাখা হয় ; ইহাকে তূলি বলে। এই তূলিগুলিকে রৌদ্রে শুকাইয়া তুলিয়া রাখা হয়। সূতা কাটিবার সময় ইচ্ছামত দুই তিনটি তূলি শীতল জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া পরে একটি কাঠিতে একটা তূলি রাখিয়া লোহার কিম্বা বাঁশের টোকোর সাহায্যে সূতা কাটা হয়। টোকোর অগ্রভাগ দেখিতে কতকটা ক্রুশের সুচের মত। টোকোর নিম্ন দিকে একটা পাথরের চাক্তি। এই চাক্তির উপর টোকোতে সূতা জড়াইতে হয়।

মাঝে মাঝে তূলিটা জলে ভিজাইয়া লইতে হয়। বাস্, বাম হস্তে তূলির কাঠি, দক্ষিণ হস্তে টেকো—বসিয়া, দাঁড়াইয়া হাঁটিয়া বেড়াইয়া—যেরূপে ইচ্ছা সূতা কাটা যায়।

পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাবধূগণ সখ করিয়া স্বহস্তে অতি সূক্ষ্ম সূতা কাটিতেন। সে এণ্ডি সূতা, রেশমী সূতার সহিত প্রতিযোগিতা করিত। এখন আর সেদিন নাই, সুতরাং এখন কুলবালা দূরে থাকুক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বউ-ঝিও আর টেকো হাতে লয় না।

পূর্ব্বে নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলা পূজা করিবার সময় পট্ট বস্ত্র পরিধান করিতেন, এখন তাঁহাদের পুরোহিতের জন্য পৈতা আইসে জার্ম্মানী হইতে! অধঃপতনের চূড়ান্ত আর কাহাকে বলে?

রংপুরে বামনডাঙ্গা স্টেশনের নিকটবর্ত্তী যে দুই একটি পল্লীতে এণ্ডি শিল্পের নাভিশ্বাস বহিতেছে, তথাকার অধিবাসীগণ সামান্য চেষ্টা করিলে এই ব্যবসায় দ্বারা বেশ দু'পয়সা অর্জ্জন করিতে পারেন। একখানা ৬ হাত লম্বা ও ৩ হাত চওড়া চাদরের জন্য মূলধন ও লাভের একটা মোটা হিসাব দেখুন : —

মূলধন --		
১।	তিন কাহন গুটী—	.৭৫
২।	সূতা কাটার মজুরী (৩ কাহন গুটিতে বোধ হয় ১ সের সূতা হয়) ১ সের সূতার জন্য—	.৫০
৩।	বেলকা বয়ন বিদ্যালয়ে বয়ন করাইলে মজুরী	৩.০০
		৪.২৫
	কিম্বা—	
১।	হাট হইতে ১ সের সরু সূতা কিনিলে—	৫.০০
২।	বয়ন ব্যয়—	৩.০০
		৮.০০
	লাভ—	
ঐরূপ চাদরের মূল্য ন্যুনাধিক—		১২.০০

এই অল্প মূলধনে যে ব্যবসায় পরিচালনা করা যায়, তাহার প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না, ইহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আর একটি উপায়ে বিনা পয়সা ও বিনা পরিশ্রমে এণ্ডি গুটী লাভ করা যায়। তাহা এই : যদি কেহ কেবল এরণ্ড পত্র কৃষক-বধূদের পোকার খাদ্যের জন্য দান করেন, তবে তিনি সে ফসলের অর্ধেক গুটী পাতার বিনিময়ে পাইবেন! দুঃখের বিষয়, কৃষক-রমণীদের পোকা-পোষণ করিতে উৎসাহ দিবার লোক পর্য্যন্ত নাই।

খোদার ফজলে এখন দেশে যে স্বদেশীয় সঞ্জীবনী বাতাস বহিয়াছে, এ শুভক্ষণে ভারতের নানাবিধ সুপ্ত শিল্পের জাগরণ অনিবার্য্য! ৫০/৬০ বৎসরের পরিত্যক্ত—মৃত চরকা পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে ; মৃতপ্রায় এণ্ডি শিল্পও নব জীবন লাভ করিবে। এখন

আমাদের পরিধেয় খদ্দর, এণ্ডি ও অন্যান্য রেশমী বস্ত্র না হইয়া উপায় নাই। এই স্বদেশীয় মাহেন্দ্রক্ষণে খোদার ফজলে রংপুর ও আসামের এণ্ডি জাগিবে ; ভাগলপুর ও মুর্শিদাবাদের রেশমী শিল্প জাগিবে, জাগিবে নিশ্চয় !

এখন কথা এই যে, রংপুরের এণ্ডির পুনরুদ্ধার সাধন কে করিবে ?

(১) স্থানীয় জমিদারগণ ? তাহা হইলে ত আর কথা-ই নাই। তাঁহারা উপাধান হইতে মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া সহানুভূতিসূচক ঈষৎ হাস্য করিলে—একটু উৎসাহ আজ্ঞা প্রচার করিলে এণ্ডি শিল্পের সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইবে—মৃত এণ্ডি প্রাণলাভ করিবে। গ্রামে গ্রামে কৃষক-বধূ পরস্পরে বলাবলি করিবে—"আমাদের জমিদার সাহেব, রাজা মহাশয়, মহারাজা এণ্ডি কাপড় চাহিয়াছেন ; ওরে, আমি আজকেই পোকা পোষা আরম্ভ করিব।" এ বলিবে, "আমি আগে", ও বলিবে, "আমি আগে !" কিন্তু না, জমিদার মহোদয়গণ সুখনিদ্রা, মোহনিদ্রা, আলস্য-নিদ্রা, আফিম-খাওয়া নিদ্রা, সর্পদৃষ্ট প্রাণঘাতিনী নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহা করিবেন না !

(২) স্থানীয় সম্ভ্রান্ত বড়লোকেরা ? তাহা হইলেও অধিক কাঁদিতে হইত না। তাঁহারা আরাম-কেদারা হইতে নবনীত দেহখানিকে ঈষৎ দোলাইয়া, চক্ষু হইতে রঙ্গীন চশমা জোড়া একটু সরাইয়া, গ্রামের দুই চারি জন মাতব্বর শ্রেণীর লোককে ডাকিয়া দুই চারিটা মিষ্ট বাক্য ব্যয় করিলে এণ্ডির শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে জীবনী-প্রবাহ বহিয়া যাইবে। কিন্তু না, তাঁহারা "ঝোঁপড়ি মঁ রহনা ও মহল কা খাব দেখনা" বংশ-গৌরব মান-মর্য্যাদা গৌরব ইত্যাদির অনুরোধে প্রতিবেশী রাজা, মহারাজা, খাঁ বাহাদুরদের সহিত টেক্কা দিবার খেয়ালে ভুলিয়া তাহা করিবেন না।

(৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা ? তাহা হইলেও বেশ হইত। তাঁহারা গ্রামের কৃষকদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, হাতে-কলমে উৎসাহ দিয়া, নিজেরা সখের জন্য পোকা প্রতিপালন করিলে একাধারে কিছু উপার্জ্জন এবং দেশের বস্ত্রক্লেশ মোচন—উভয়ই করিতে পারিবেন। কিন্তু না, তাঁহারা—

"চাকুরী, চাকুরী, চাকুরী !
চাকুরী মাথার মাণিক !
চাকুরী বিনে বঙ্গবাসীর
জীবন ধারণে ধিক্ !
মশ্ক করে হাত পাকিয়ে
লিখে, 'এ, বি, সি, ডী' ;
চাকুরী হলো—ডাক-পিয়াদা,
গ্রামে প'লো টী টী !"

অথবা—

"চাকুরী মা ! তোর চরণ দু'টি
নিত্য পূজা করি,
এই অফিসে চাকুরী যেন
বজায় রেখে মরি !"

এহেন চাকুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া এণ্ডি শিল্প উদ্ধার করিবেন না।

(৪) তবে অপর কোন জেলার দেশ-হিতৈষী লোক? তাহাও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাঁহারা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা মনে করিবেন, বাবা! নিজের ঘর-দ্বার ছাড়িয়া কেউ জঙ্গলা দেশে যাইবে? রংপুরের জলবায়ু ভাল নয়—প্লীহা ও ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি।

তবে?—নীলকর, চা-কর প্রভৃতির ন্যায় কোন শ্বেতাঙ্গ কৃষক (Planter) রংপুরে গিয়া এণ্ডি গুটী আবাদ করিবেন। তখন সেই এণ্ডিকর সাহেবের এণ্ডি বাগানে ঐ রংপুরের দরিদ্র নরনারী কুলীরূপে খাটিবে! আর ভদ্রলোকেরা গুটি মাচার পরিদর্শক, বাজার সরকার কিম্বা অন্ততঃ কুলীর সরদার পদলাভ করিয়া ধন্য হইবেন! হইতে পারে শ্বেতাঙ্গ এণ্ডিকরেরা সূতা প্রস্তুত করিবার জন্য কোন সহজসাধ্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন। অতঃপর রংপুরের অধিবাসিগণ ত্রিগুণ, চতুর্গুণ মূল্যে "রংপুর রিফাইণ্ড সিল্ক" কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিবেন।

প্রথমে "আসাম সিল্ক" নাম শুনিয়া আমাদের চমক লাগিয়াছিল; পরে যখন দেখিলাম, ত দেখিলাম, সেই নগণ্য এণ্ডি!

ফল কথা, অপর জেলার লোকে গুটী আবাদ করিতে গেলে, তাঁহাকে মূলধন স্বরূপ অন্ততঃ ২০০.০০ দুইশত টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। আর স্থানীয় লোকে ঐ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহাকে মাত্র ১০.০০ দশটি টাকা মূলধন স্বরূপ ব্যয় করিতে হইবে।

"কাটা মুণ্ড কথা কয়"

"বঙ্গলক্ষ্মী"র পাঠিকা ভগিনীগণ জানেন, ভারতের বিবিধ সম্প্রদায়ের নারীদের মধ্যে মুসলিম-ললনা কিরূপ পশ্চাৎপদ এবং মৃতপ্রায় নির্জ্জীব। এখন তাঁহারা একথা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, মুসলিম-নারীও সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সামাজিক কুপ্রথা আমাদের মাথা কাটিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় এখন সেই কাটা মুণ্ড কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত সত্য ঘটনা পাঠিকা ভগিনীদের উপহার দিতেছি।

প্রায় দুই মাস হইতে সংবাদপত্রে প্রচার করা হইতেছিল যে, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে সভা-সমিতির বিরাট আয়োজন হইতেছে। মুসলিম পর্দানশীন মহিলাদের জন্য মণ্ডপে বিশেষ পর্দার ব্যবস্থা থাকিবে। ২৬শে ডিসেম্বরে "অল ইণ্ডিয়া মহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের" অধিবেশন হইবে, এবং ২৮শে তারিখে জুবিলী অধিবেশন হইবে। তদনুসারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম মহিলাগণ আলিগড়ে সমবেত হইয়াছিলেন।

২৬শে ডিসেম্বর বেলা ৯টার সময় যখন সমাগত মহিলাবৃন্দ তত্রত্য বালিকা কলেজের সেক্রেটারী শেখ আবদুল্লাহ্ সাহেবের পত্নীকে সভামণ্ডপে যাওয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি বিষণ্নমুখে বলিলেন, "হাঁ সব প্রস্তুত; কিন্তু দেখুন না, মহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের সেক্রেটারী প্রফেসার শিরওয়ানী কি গোলযোগ করিতেছেন। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সভামণ্ডপে যাইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে দিবেন না।" অতঃপর মিসেস্

আবদুল্লাহ্ সকলকে শিরওয়ানীর স্বহস্তলিখিত আদেশ-লিপি দেখাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল, "এডুকেশন্যাল কন্‌ফারেন্সের সেক্রেটারীরূপে আমার হুকুম এই যে, মেয়েরা মণ্ডপে আসিতে পাইবেন না। তাঁহারা হুকুম অমান্য করিয়া যদি আসেন, তবে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য আমি দায়ী হইব না।"

মহিলাগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব দায়িত্বে বোরকায় (বিশেষ প্রকার অবগুণ্ঠনে) আবৃত হইয়া যাইবেন। পরে মিসেস আবদুল্লার সহায়তায় বালিকা কলেজের মোটরবাসে আমরা প্রায় ২৫ জন স্ত্রীলোক রওনা হইলাম। আমরা পুলিশ প্রহরীর রেগুলেশন লাঠির জন্য প্রস্তুত ছিলাম। বিনা দ্বিধায় সকলে মণ্ডপে গিয়া উঠিলাম। তথায় বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা আতিয়া বেগম সাহেবা উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলকে যথাস্থানে বসাইলেন। আমরা দেখিলাম, চিক এবং কাপড় ঘিরিয়া যে পর্দার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা সব খুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চিক ও কাপড়ের পর্দাগুলি পদদলিত ও ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রোফেসার শিরওয়ানীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছিল।

মহিলাগণ আসন গ্রহণ করিলে আতিয়া বেগম সাহেবা ভলান্টিয়ারদের দ্বারা চিকগুলি বাঁধাইয়া দিলেন। কর্ত্তৃগণ আতিয়া বেগমকে প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে দিবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। আর আতিয়া বেগম রাগে কাঁপিতেছিলেন।

যথাসময়ে আতিয়া বেগম একটা চেয়ারে দাঁড়াইয়া দুই চিকের ফাঁক হইতে মুখ বাড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন ; তখন সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী ফিরিয়া বসিলেন। অনেকে চেয়ার বেঞ্চ ইত্যাদি ডিঙ্গাইয়া চিকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন প্রোফেসার শিরওয়ানী বেগতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। পরে আতিয়া বেগম প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া প্রায় ১০ মিনিট বক্তৃতা করিলেন।

২৮শে ডিসেম্বর জুবিলী অধিবেশন ছিল ; সে দিন মহিলাগণ বিনা বাধায় মণ্ডপে গিয়াছিলেন। যথাবিধি চিক পর্দার ব্যবস্থা ছিল। সে দিন আতিয়া বেগম আমাদের নিকট না বসিয়া প্লাটফরমের পার্শ্বে বসিয়া মাঝে মাঝে ভদ্রলোকদের বক্তৃতায় টিট্‌কারী দিতেছিলেন। একবার তিনি বলিলেন, "যে ভদ্রলোক মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন, তিনি চুড়ি পরিয়া অন্তঃপুরে বসুন।" চিকের অন্তরাল হইতে জনৈক মহিলা দুইগাছি চুড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

উপরোক্ত প্রকারে পর্দানশীন নিৰ্জ্জীব মুসলিম মহিলাগণ রণাঙ্গন হইতে প্রোফেসার শিরওয়ানীকে বিতাড়িত করিয়া নিজেরা বিজয়গর্ব্বে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং দেখিলেন, ভগিনি ! এখন কাটা মুণ্ড কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব "বঙ্গলক্ষ্মী"র জয়।

রাঙ্‌ ও সোনা

ভাদ্র মাসের "সওগাত" পত্রিকায় মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী সাহেবের লিখিত "বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমান মহিলা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে মোহিত ও বিস্মিত হইলাম। তিনি যে কতিপয় বঙ্গ-লেখিকাকে উদার সার্টিফিকেট দান করিয়াছেন, সেজন্য আমি "আঞ্জুমনে

খাওয়াতীনে ইসলাম কলিকাতা"র সেক্রেটারীরূপে নারীদিগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কিন্তু বিক্রমপুরী সাহেবের অত্যধিক উদারতায় আমার ভারী আপত্তি আছে। তাহা এই যে, তিনি মাদৃশ নগণ্যাকে কয়েকজন উপাধিধারিণী বঙ্গ-বিখ্যাত লেখিকার তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে আমি নিজেকে অবমানিত বোধ করিতেছি।

"নিখিল ভারত সাহিত্য-সঙ্ঘ" আমার নিকট "বিদ্যা-বিনোদিনী" ও "সাহিত্য-সরস্বতী" উপাধি চৌদ্দ টাকায় বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাহা গ্রহণ করি নাই। ফেরিওয়ালার নিকট জিনিস কিনিলে সস্তায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমার প্রয়োজন নাই।

আজি-কালি যখন বাজারে সামান্য নিকেলের "আনি" পর্য্যন্ত মেকী হইতেছে, এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রমপুরী সাহেব সার্টিফিকেট দানের পূর্ব্বে মেকী "লেখিকা" ও আসল লেখিকাদের বিষয়, এমনকি, কোন লেখিকা মৃতা কি জীবিতা—তাহা একটু অনুসন্ধান করিয়া লইলে ভাল হইত না কি? তিনি একই নিক্তিতে রাঙ্ ও সোনা ওজন করিয়া ফেলিয়াছেন।

বিক্রমপুরী সাহেবের মতে "পরলোকগতা" আফজালুন্নেছা সাহেবাকে আমি অদ্য (১৯শে ভাদ্র, ১৩৩৩ সনে) এই মাত্র (১২টার সময়) দেখিয়া আসিলাম। অবশ্য তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের জন্য আমাকে "পরলোকের" দ্বার পর্য্যন্ত যাইতে হয় নাই!! আফজালুন্নেছা সাহেবার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা আছে ; তাই তাঁহার "মৃত্যু" সংবাদে কাঁদিবার পূর্ব্বে তাঁহার সংবাদ লওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছিলাম। তিনি তখন সুস্থ শরীরে মধ্যাহ্নভোজন করিতেছিলেন।—বেহেশ্‌তের ফলমূল নয়—আমাদের এই মৃন্ময় পৃথিবীর ভাত খাইতেছিলেন।

আশা করি, অতঃপর বিক্রমপুরী সাহেব অতিমাত্রায় সার্টিফিকেট বিতরণের নেশায় বেচারী বঙ্গ "লেখিকা"দিগকে আগে-ভাগে সশরীরে বেহেশ্‌তে পৌঁছাইয়া দিবেন না। আপাততঃ তাঁহাদের জন্য বেহেশ্‌তে সীট রিজার্ভ করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি

[সভানেত্রীর অভিভাষণ]

মাননীয় উপস্থিত ভগিনীবৃন্দ!

আপনারা আমার ন্যায় তুচ্ছ নগণ্য ব্যক্তিকে এ সময়ের জন্য সভানেত্রী পদে বরণ করিয়া আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমি অবশ্যই বলিব যে, আপনাদের নির্ব্বাচন ঠিক হয় নাই। কারণ আমি আজীবন কঠোর সামাজিক "পর্দ্দার" অত্যাচারে লোহার সিন্দুকে বন্ধ আছি—ভালরূপে সমাজে মিশিতে পাই নাই—এমনকি সভানেত্রীকে হাসিতে হয়, না কাঁদিতে হয়, তাহাও আমি জানি না। সুতরাং আমার ভাষায় কথায় অনেক ভুল-ভ্রান্তি থাকিবে তজ্জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

শ্রদ্ধাস্পদা ভগিনী মিসিস্ লিণ্ডসে আমাকে মুসলমান বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় অভাব অভিযোগের কথা বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সমবেত সুশিক্ষিতা গ্রাজুয়েট মহিলাদের সম্মুখে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি, এমন যোগ্যতা আমার নাই। তবে ২০/২১ বৎসর হইতে সাহিত্য ও সমাজসেবা করিয়া,—বিশেষতঃ ১৬ বৎসর যাবৎ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল পরিচালনা করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহাই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস করিতেছি।

স্ত্রীশিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আর সামাজিক অবস্থায় কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা, ঔদাস্য এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য্য হয়। প্রবাদ আছে, "বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়।"

এখন প্রশ্ন এই যে, মুসলমান বালিকাদের সুশিক্ষার উপায় কি? উপায় ত আল্লাহ্‌র কৃপায় অনেকই আছে, কিন্তু অভাগিনীগণ তাহার ফলভোগ করিতে পায় কই? আপনারা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা, জানেন? সে জীব ভারত–নারী! এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য জাতির দুঃখে বিচলিত হইয়াছেন; স্বয়ং থার্ড ক্লাশ গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া দরিদ্র রেল–পথিকদের কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে, তাই যত্রতত্র "পশুক্লেশ–নিবারণী সমিতি' 'দেখিতে পাই। পথে কুকুরটা মোটর চাপা পড়িলে তাহার জন্য এংলো–ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে ক্রন্দনের রোল দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধ বন্দিনী নারীজাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও এ ভূ–ভারতে নাই।

নারী ও পুরুষ বিরাট সমাজ–দেহের দুইটি বিভিন্ন অংশ। বহুকাল হইতে পুরুষ নারীকে প্রতারণা করিয়া আসিতেছে, আর নারী কেবল নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে। পুরুষের পক্ষে নারায়ণী সেনা আছেন বলিয়া তাঁহারা এ যাবৎ নারীর উপর জয়লাভ করিয়া আসিতেছেন। সুখের বিষয়, এত কাল পরে "শ্রীকৃষ্ণ" স্বয়ং আমার হিন্দু ভগিনীদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাই চারিদিকে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবরোধ–বন্দিনী মহিলাদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা, বিশেষতঃ মাদ্রাজের মহিলাবৃন্দ সর্ব্ব–বিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এবার মাদ্রাজের লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের ডেপুটি প্রেসিডেন্টের পদে একজন মহিলা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি রেঙ্গুনে একজন ব্যারিস্টার হইয়াছেন। লেডী ব্যারিস্টার মিস্ ঘোরাবজীর নামও সুপরিচিত; কিন্তু মুসলিম নারীর কথা কি বলিব?—তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরে আছে।

"মাতা যদি বিষ দেন আপন সন্তানে
বিক্রয়েন পিতা যদি অর্থ প্রতিদানে"—

তাহাকে আর কে রক্ষা করিবে? আলীগড়ের প্রসিদ্ধ উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ্ সাহেব এক সময় তাঁহার কোন বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "এদেশে বালক ও বালিকার শিক্ষায় পার্থক্য রাখার ফলে আমাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে

যে আমাদের দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে! বালিকাদের শিক্ষা না দেওয়া আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে, বরং ইহা আমাদের দুরপনেয় কলঙ্ক।" ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমি হেন নগণ্য যাহা ১ম খণ্ড "মতিচূরে" বলিয়াছি, সেই কথা এখন শেখ সাহেবের ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধ লোকের মুখেও শুনিতেছি। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, মূর্খতার অন্ধকার যুগে আরবগণ কন্যা বধ করিত। যদিও ইসলাম ধর্ম্ম কন্যাদের শারীরিক হত্যা নিবারণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলিমগণ অম্লান বদনে কন্যাদের মন, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তি অদ্যাপি অবাধে বধ করিতেছেন। কন্যাকে মূর্খ রাখা এবং চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়া জ্ঞান ও বিবেক হইতে বঞ্চিত রাখা অনেকে কৌলিন্যের লক্ষণ মনে করেন। কিছুকাল পর্য্যন্ত মিসর এবং তুরস্ক স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ঠকিয়া ঠকিয়া নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এখন সুপথে আসিয়াছেন।

সম্প্রতি তুরস্ক এবং মিসর, ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষা দিবার জন্য বাধ্যতামূলক আইন করিয়াছেন। কিন্তু তুরস্ক আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণে সোজা পথ অবলম্বন করেন নাই ; বরং আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের একটি অলঙ্ঘনীয় আদেশ পালন করিয়াছেন। যেহেতু পৃথিবীতে যিনি সর্ব্বপ্রথমে পুরুষ স্ত্রীলোককে সমভাবে সুশিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি আমাদের রসুল মকবুল (অর্থাৎ পয়গাম্বর সাহেব)। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, শিক্ষালাভ করা সমস্ত নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য। তের শত বৎসর পূর্ব্বেই আমাদের জন্য এই শিক্ষাদানের বাধ্যতামূলক আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজ তাহা পালন করে নাই, পরন্তু ঐ আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং তদ্রূপ বিরুদ্ধাচরণকেই বংশ-গৌরব মনে করিতেছে। এখনও আমার সম্মুখে আমাদের স্কুলের কয়েকটি ছাত্রীর অভিভাবকের পত্র মজুত আছে—যাহাতে তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মেয়েদের যেন সামান্য উর্দ্দু ও কোরান শরীফ পাঠ ছাড়া আর কিছু—বিশেষতঃ ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া না হয়। এই ত আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষে যখন স্ত্রীশিক্ষার বাধ্যতামূলক আইন পাশ হইবে, তখন দেখা যাইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মুসলমান—যাঁহারা স্বীয় পয়গাম্বরের নামে (কিংবা ভগ্ন মস্‌জিদের এক খণ্ড ইষ্টকের অবমাননায়) প্রাণ দানে প্রস্তুত হন, তাঁহারা পয়গাম্বরের সত্য আদেশ পালনে বিমুখ কেন? গত অন্ধকার যুগে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা যে ভ্রম করিয়াছেন, তাহাও ক্ষমা করা যাইতে পারে ; কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে যখন বারংবার স্ত্রী-শিক্ষার দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রিয় নবী "ফরয" (অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য) বলিয়াছেন, তবু কেন তাঁহারা কন্যার শিক্ষায় উদাসীন?

এখন শিক্ষার অবস্থা এই যে, আমাদের দেশের গড়পড়তা প্রতি ২০০ (দুই শত) বালিকার একজনও অক্ষর চিনে না ; প্রকৃত শিক্ষিতা মহিলা বোধ হয় দশ হাজারের মধ্যেও একজন পাওয়া যাইবে না। কেবল এই বঙ্গদেশে প্রায় তিন কোটি মুসলমানের বাস। গত জানুয়ারী মাসে শিক্ষা-বিভাগ হইতে আমাকে একখানি পত্রে অনুরোধ করা হইয়াছিল যে, বঙ্গদেশে যতগুলি মুসলিম মহিলা গ্রাজুয়েট আছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া যেন আমি অবিলম্বে পাঠাই। কিন্তু আমি বঙ্গের মাত্র একটি গ্রাজুয়েট এবং আগা মইদুল ইসলাম

সাহেবের কন্যাত্রয় ব্যতীত আর কাহারও নাম দিতে পারি নাই। আগা সাহেব বঙ্গদেশের অধিবাসী নহেন, সুতরাং তিন কোটি মুসলমানের মধ্যে মাত্র একটি মহিলা গ্রাজুয়েট পাওয়া গেল, বলিতে হয়!! সম্ভবতঃ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা অনুসন্ধানের পর প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগের স্কুলের ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস মহোদয়া আমাকে মুসলিম মেয়ে গ্রাজুয়েট খুঁজিয়া বাহির করিতে বলিয়াছিলেন!! আবার আমি শেখ আবদুল্লাহ্ সাহেবের একটি বচন উদ্ধৃত করিতেছি।

"স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীগণ বলে যে, শিক্ষা পাইলে স্ত্রীলোকেরা অশিষ্ট ও অনম্যা হয়। ধিক! ইঁহারা নিজেকে মুসলমান বলেন, অথচ ইসলামের মূল সূত্রের এমন বিরুদ্ধাচরণ করেন। যদি শিক্ষা পাইয়া পুরুষগণ বিপথগামী না হয়, তবে স্ত্রীলোকেরা কেন বিপথগামিনী হইবে? এমন জাতি, যাহারা নিজেদের অর্দ্ধেক লোককে মূর্খতা ও "পর্দ্দা" রূপ কারাগারে আবদ্ধ রাখে, তাহারা অন্যান্য জাতির—যাহারা সমানে সমানে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করিয়াছে, তাহাদের সহিত জীবন-সংগ্রামে কিরূপে প্রতিযোগিতা করিবে?"

ভারতবর্ষে এক কোটি লোক ভিক্ষাজীবী, তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং তাহারা কোন্ মুখে অন্য জাতির সহিত সমকক্ষতা করিবে? আমরা আবার কৌলিন্যের বড়াই করি! ভিক্ষাবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা নীচ কার্য্য, আর মুসলমানের সংখ্যাই ইহাতে অগ্রণী। ইহার কারণ এই যে, তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে বঞ্চিত রাখিয়া সর্ব্ববিষয়ে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। ফলে তাহাদের গর্ভজাত সন্তান অলস ও শ্রমকাতর হয়: সুতরাং "বাপ দাদার নাম" লইয়া ভিক্ষা ছাড়া তাহারা আর কি কাজ করিবে?

এখন স্ত্রীলোকেরা ভোট দানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মুসলিম মহিলাগণ এ অধিকারের সদ্ব্যবহারে স্বেচ্ছায় বঞ্চিতা রহিয়াছেন। গত ইলেক্‌শনের সময় দেখা গেল কলিকাতায় মাত্র ৪ জন স্ত্রীলোক ভোট দিয়াছে। ইহা কি মুসলমানের জন্য গৌরবের বিষয়? তাঁহারা কোন্ সুযোগের আশায় বা অপেক্ষায় বসিয়া আছেন?

যে পর্য্যন্ত পুরুষগণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে স্বীকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাও দিবে না। যাহারা নিজের সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না, তাহারা আর দেশোদ্ধার কিরূপে করিবে? আর্দ্ধাঙ্গীকে বন্দিনী রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা চাহে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা পাগলেরই শোভা পায়! সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যেমন ভারতবাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহ্য করিতে চাহেন না—আমার মনে পড়ে প্রায় ২১ বৎসর পূর্ব্বে মিস্টার মর্লি বলিয়াছিলেন, "যদি তাঁহারা চাঁদের জন্য আবদার করে (If they cry for the Moon), তাহা আমরা দিতে পারি না" ইত্যাদি এবং আমাদের অমুসলমান প্রতিবেশীগণ এখন সাধারণতঃ যেরূপ মুসলমানদের দাবী-দাওয়া সহ্য করিতে পারেন না, সেইরূপ মুসলমান পুরুষগণও নারীজাতির কোন প্রকার উন্নতির অভিলাষ স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদ্‌রত বা প্রকৃতির নিয়ম অতি চমৎকার! তিনি এ বিশ্ব-জগৎকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন—আমরা পরস্পরের সহিত এরূপভাবে জড়িত আছি যে, একে অপরকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারি না। মুসলিম ভ্রাতৃগণ যতদিন আমাদের দুঃখ-সুখের প্রতি মনোযোগ না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের কথাও ভারতের অপর ২২ কোটি লোকে শুনিবে না, আর যত দিন ঐ ২২

কোটি লোকে ৮ কোটি মুসলমানকে উপেক্ষা করিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের রোদনও বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কর্ণকূহরে প্রবেশ করিবে না!! বহুদিন হইল একটি বটতলার পুঁথিতে পড়িয়াছিলাম :

"আপনি যেমন মার খাইতে পারিবে,
বুঝিয়া তেয়ছাই মার আমাকে মারিবে।"

হজরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন, "তুমি নিজে অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অপরের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিও।" এস্থলে আমি শেখ সাহেবের আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, তাহা এই :

"ভারতবর্ষের অবরোধ-প্রথা স্ত্রীলোকদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। অবরোধ-প্রথা আমাদের সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত। ভ্রাতৃগণ! পর্দ্দার নাম শুনিবা মাত্র আপনারা হয়ত একযোগে বলিয়া উঠিবেন, 'তবে কি আমরা ইংরাজদের অনুকরণে বিবিদের রাজপথে বেড়াইতে দিব?' তদুত্তরে বলি, আমি মুসলমান শাস্ত্রের সীমার মধ্যে থাকিয়া আপনাদের সহিত কথা বলিতে চাই। ভারতীয় পর্দ্দার সহিত শাস্ত্রীয় পর্দ্দার কোন সম্বন্ধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।"

পর্দ্দা সম্বন্ধে আমি নিজের কোন মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি—কেবল এইটুকু বলি যে, শেখ সাহেব পর্দ্দাকে "সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত" বলিয়াছেন, আমি তাহা মনে করি না। "যন্ত্রণাদায়ক" হইলে অবলাগণ "বাবারে! মা'রে! মলুম রে! গেলুম রে!" বলিয়া আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতেন! অবরোধ-প্রথাকে প্রাণঘাতক কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত তুলনা করা যায়। যেহেতু তাহাতে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্ব্বনিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায় না! অন্তঃপুরবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে।

মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরান শিক্ষাদান করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কোরান শিক্ষা অর্থে শুধু টীয়া পাখীর মত আরবী শব্দ আবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কোরানের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হইবে। সম্ভবতঃ এজন্য গভর্ণমেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাশ না করিলে আমাদের সমাজ মেয়েদের কোরান শিক্ষাও দিবে না! যদি কেহ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থা-পত্র (Prescription) লয়, কিন্তু তাহাতে লিখিত ঔষধ-পথ্য ব্যবহার না করিয়া সে ব্যবস্থা-পত্রখানাকে মাদুলী রূপে গলায় পরিয়া থাকে, আর দৈনিক তিনবার করিয়া পাঠ করে, তাহাতে কি সে উপকার পাইবে? আমরা পবিত্র কোরান শরীফের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন কার্য্য করি না, শুধু তাহা পাখীর মত পাঠ করি আর কাপড়ের থলিতে (জুযদানে) পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চ স্থানে রাখি। কিছুদিন হইল, মিসর হইতে আগতা বিদুষী মহিলা মিস্ যাকিয়া সুলেমান এলাহাবাদে এক বিরাট মুসলিম সভায় বক্তৃতাদানকালে বলিয়াছিলেন, "উপস্থিত যে যে ভদ্রলোক কোরানের অর্থ বুঝেন, তাঁহারা হাত তুলুন।" তাহাতে মাত্র তিন জন ভদ্রলোক হাত তুলিয়াছিলেন। কোরান-জ্ঞানে যখন পুরুষদের এইরূপ দৈন্য, তখন আমাদের দৈন্য যে কত ভীষণ, তাহা না বলাই ভাল। সুতরাং কোরানের বিধিব্যবস্থা কিছুই আমরা অবগত নহি। স্থানীয় ভাষা বলিতে অন্য

স্থানের ভাষা যাহাই হউক, কলিকাতার ভাষা কি হইবে? ষোল বৎসর যাবৎ এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনার ফলে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, এখানকার মুসলমানেরা মাতৃহীন—অর্থাৎ তাহাদের মাতৃভাষা নাই। তাহারা উর্দ্দুকে মাতৃভাষা বলিয়া দাবী করে বটে, কিন্তু এমন বিকৃত উর্দ্দু বলে যে, তাহা শুনিলে শ্রবণবিবর ক্ষত-বিক্ষত হয়! যাহা হউক, তথাপি উর্দ্দু এবং বাঙ্গালা উভয় অনুবাদই শিক্ষা দিতে হইবে। আমার অমুসলমান ভগিনীগণ! আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোরান শিক্ষা দিতে বলিয়া আমি গোঁড়ামীর পরিচয় দিলাম। তাহা নহে, আমি গোঁড়ামী হইতে বহুদূরে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরানে পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য কোরান শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রীশিক্ষায় ঔদাস্য। ভ্রাতৃগণ মনে করেন, তাঁহারা গোটাকতক আলীগড় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা ইস্‌লামিয়া কলেজে ভর করিয়াই পুলসিরাত (পারলৌকিক সেতু বিশেষ) পার হইবেন—আর পার হইবার সময় স্ত্রী ও কন্যাকে হ্যাণ্ড ব্যাগে পুরিয়া লইয়া যাইবেন।[২১] কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার বিধান যে অন্য রূপ—যে বিধি-অনুসারে প্রত্যেককেই স্ব-স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং স্ত্রীলোকদের উচিত যে, তাঁহারা বাক্স-বন্দী হইয়া মালগাড়ীতে বসিয়া সশরীরে স্বর্গলাভের আশায় না থাকিয়া স্বীয় কন্যাদের সুশিক্ষায় মনোযোগী হন। কন্যার বিবাহের সময় যে টাকা অলঙ্কার ও যৌতুক ক্রয়ে ব্যয় করেন, তাহারই কিয়দংশ তাহাদের সুশিক্ষায় ও স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যয় করুন। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা করা প্রয়োজন; আর প্রয়োজন বিশুদ্ধ বাতাসের। আল্লাহ্‌র দান বিশুদ্ধ বাতাস বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে মহিলাগণ কেন অনিচ্ছুক, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। শীতকালে তাঁহারা এরূপ ভাবে জানালা-দ্বার, বিশেষতঃ সার্সী বন্ধ করিয়া রাখেন যে, আমার মনে হয়, গভর্ণমেন্ট কেন আইন করিয়া দ্বার-জানালার সার্সী ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করেন না! পাঁচ ছয় বৎসর হইল, ডাক্তার মিস্ কোহেন বালিকা বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমাদের স্কুলের কতিপয় বালিকার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট যখন তাহাদের মাতার নিকট এই অনুরোধ-সহ গেল যে, "আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক শীঘ্র ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করুন," তাহাতে তাঁহারা চটিয়া এই উত্তর দিলেন,—"স্কুলমেঁ লাড়কী পড়নে কো দিয়া হায়, না বিচার করনে কো, কে, আঁখ্ কমজোর, দাঁত কম-জোর, হলক মে ঘাও হায়, ফেঁফ্ড়া খারাব হ্যায়! ইয়ে সব বোলনে সে হামারী লাড়কী কা শাদী ক্যায়সে হোগা? ইয়ে সব বাৎ রহনে দেঁ, হামারী লাড়কী কো ডাক্তারনীসে না দেখায়েঁ!" ইয়া আল্লাহ্! মেয়ের প্রাণ লইয়া টানাটানি, অথচ শাদীর চিন্তায় মায়ের চোখে ঘুম ধরে নাই! ফল কথা, অশিক্ষিতা মাতার নিকট ইহাপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে?

---

২১. সেই জন্য তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার-কল্পে টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা চাহিলে শুনি, মুসলমানগণ বড় দরিদ্র—তাহাদের টাকা নাই! কিন্তু একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? যাঁহারা ইসলামিয়া কলেজে হাজার হাজার টাকা অকাতরে দান করিয়াছেন, তাঁহারা কি দরিদ্র? তাঁহারা যদি শরিয়ত অর্থাৎ শাস্ত্র মানিতেন, তাহা হইলে যিনি যত টাকা বালকদের শিক্ষার জন্য দান করিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক অবশ্যই বালিকা বিদ্যালয়ে দান করিতেন।

আমাদের স্কুলের ছাত্রীগণ পরীক্ষার সময় প্রায়শঃ ভূগোল, ইতিহাস এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে অকৃতকার্য্য (ফেল) হয় ; ইহার কারণ এই যে, তাহারা নিজেদের বাসভবন এবং স্কুল-গৃহ ব্যতীত দুনিয়ার আর কিছুই দেখিতে পায় না, এই দুনিয়ায় তাহাদের পিতা ও ভ্রাতা ছাড়া আরও কেহ আছে কিনা, তাহা তাহারা জানে না ; রুদ্ধ বায়ুপূর্ণ কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া মা-মাসীকে অনবরত রোগ-ভোগ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে দেখে। তাহারা কেবল জানে, অসুখ হইলে ডাক্তার ডাকিতে হয়। এই সকল কু-রোগের এক মাত্র ঔষধ সুশিক্ষা।

উপসংহারে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল এবং আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইস্‌লামের উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কলিকাতার মুসলিম সমাজের উন্নতির নিমিত্ত এই উভয় প্রতিষ্ঠানই প্রাণপণে যত্ন করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহারা এখনও পূর্ণ মাত্রায় সফলতা লাভ করে নাই। স্কুলটিকে হাই স্কুলে উন্নীত করা এবং ইহার জন্য একটা নিজের বাড়ী হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন এবং আঞ্জুমানটি মহিলা-সমাজে সর্ব্বজনপ্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আজ আপনাদের অনেকখানি সময় নষ্ট করিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এখন আমি ইতি করি।[২২]

লুকানো রতন

সাগরের সুগভীর আঁধার গহ্বরে
উজ্জ্বল রতন কত রয়েছে লুকা'য়ে ;
ফুটিয়া কুসুম কত বিজন প্রান্তরে
শুকায় সৌরভ তার বায়ুতে মিশা'য়ে।

অভাগিনী বঙ্গদেশের নিভৃত অন্তঃপুর-উদ্যানে কত ফুল নীরবে ফুটিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে ঝরিয়া পড়ে, কে তাহার হিসাব রাখে? অন্তঃপুরের সুরক্ষিত লৌহ সিন্দুকেও না জানি কত উজ্জ্বল রত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহার সন্ধানও অনেকেই জানে না। অদ্য আমরা মাত্র একটি রত্নের উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চাই যে, আমাদের মুস্‌লিম সমাজ নিতান্ত দীন নহে—তাহাতে এমন অমূল্য রত্নরাজিও আছে।

করিমুন্নেসা খানম সাহেবা

গত ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিল মাসে রঙ্গপুরের অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামের কোন উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত অন্তঃপুরে অর্থাৎ তত্রত্য প্রসিদ্ধ জমিদার মরহুম মৌলবী জহীর মোহাম্মদ আবু আলী সাবের সাহেবের গৃহে ঐরূপ একটি রত্ন (করিমুন্নেসা খানম) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁহাকে টীয়া পাখীর মত কোরান শরীফ ব্যতীত আর কিছু পড়িতে

---

২২. Bengal Women's Educational Conference-এ (বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশনে) পঠিত।

দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইত না। তাঁহার ছোট ভাইয়েরা বাহিরে মুন্সী সাহেবের নিকট ফার্সী পড়িয়া আসিতেন—ভগিনীকে শুনাইয়া আবৃত্তি করিতেন,—

"কে বে-ইলমে না-তওয়াঁ খোদারা শেনাখ্‌ত"

তখন বালিকা করিমুন্নেসাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বয়েতগুলি মুখস্থ করিতেন। ভাইদের বাঙ্গলা পড়া শুনিয়াও তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতেন,— 'ক'য়ে আকার দিলে 'কা', ইকার দিলে' কি', দীর্ঘ ঈকার দিলে 'কী', ক্‌ খ্‌ গ্‌ ঘ্‌ ন্‌—ইত্যাদি। আর তিনি প্রাঙ্গণে মাটিতে আঁক কাটিয়া বাঙ্গলা লিখিতে শিখিয়াছিলেন।

একদিন করিমুন্নেসা গোপনে একটা বটতলার পুঁথি লইয়া অস্ফুটস্বরে পড়িতেছিলেন,—

"কোরানেতে আল্লাতালা কয়েছে এমতি,
ফাদ খুলী ফী ইবাদী ওয়াদ খুলী জান্নাতী"

সেই সময় হঠাৎ তাঁহার পিতা আসিয়া পড়েন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়া ভাবিলেন যে, "আজ আমার সর্ব্বনাশ,—বুঝি এখনই আমাকে যমালয়ে যাইতে হইবে !" কিন্তু না, শোকর আল্‌হাম্‌দোলিল্লাহ্‌ ! পিতা কন্যার হাতে পুঁথি দেখিয়া রাগ করিলেন না,— বরং ভয়ে মূর্চ্ছিতা-প্রায় বালিকাকে কোলে লইয়া আদর করিলেন এবং সেই দিন হইতেই একটু একটু "সাধুভাষা"র বাঙ্গলা পড়াইতে লাগিলেন। বাস্‌ ! আর যায় কোথা ? যত মোল্লা মুরুব্বির দল একযোগে চটিয়া উঠিলেন—"হেঁ—মেয়েকে বাঙ্গলা পড়ান হইতেছে !" তাঁহাদের নিন্দা ও বাক্য-জ্বালায় অধীর হইয়া পিতা তাঁহার পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

শুধু পড়াই বন্ধ হইল না,—এখন করিমুন্নেসাকে অন্ধকার কারাগৃহে (অর্থাৎ বলিয়াদীতে মাতামহের প্রাসাদে) পাঠাইয়া দিয়া বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতে বিবাহ হইয়া গেল। শাপেই বর ; —শ্বশুরালয় দেলদুয়ারে আসিয়া তিনি কয়েকজন দেবর-সম্পর্কীয় ছাত্রের সাহায্যে যথাবিধি বাঙ্গলা ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন। লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। সেজন্য তিনি সমাজের অনেক লাঞ্ছনা সহিয়াছেন। কেবল নিজের লেখাপড়া শিক্ষার জন্যই লাঞ্ছনার শেষ হয় নাই। বিবাহের ৯ বৎসর পরেই তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। বৈধব্যের পর তাঁহার শিশু পুত্রদ্বয়ের সুশিক্ষার জন্যও তাঁহাকে পদে পদে বিড়ম্বনা ও উপদ্রব সহিতে হইয়াছে।

দেলদুয়ারে ছেলেদের উচ্চশিক্ষা লাভ অসম্ভব দেখিয়া করিমুন্নেসা খানম কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বড় ছেলেকে (হাজী এ.কে. গজনভী সাহেবকে) ইংলণ্ডে পাঠাইলেন এবং ছোটটিকে (মিঃ আবদুল হালিম গজনভী সাহেবকে) সেন্টজেভিয়ার কলেজে ভর্ত্তি করিলেন। এত বড় পাপ কার্য্যের জন্য সমাজ তাঁহার প্রতি কি কি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিল, কত অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছিল, কত নিন্দা-কুৎসা করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত— পাঠিকা ভগিনী তাহা অনুমান করিয়া লইবেন।

করিমুন্নেসা খানম স্বভাব-কবি ছিলেন। পারিবারিক ঘটনা এবং সামাজিক বিষয়ে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু সে কবিতাগুলি দিনের আলোক দেখিতে পায় নাই। আজি-কালি দেখি, লোকে ভালমতে বর্ণজ্ঞানের সহিত ভালমতে পরিচিত না হইয়াও ভাড়া-করা লেখকের দ্বারা প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখাইয়া নিজের নামে প্রকাশ করে। কিন্তু করিমুন্নেসা

সাহেবা নিজের রচনা কখনও স্বনামে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন নাই। কালে-ভদ্রে কোন রচনা বা পুস্তক বে-নামীতে ছাপা হইত। অধিকাংশ রচনাই—বিশেষতঃ কবিতার বাঁধানো খাতাগুলি তাঁহার বাক্সের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকিত। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কয়েকটি কবিতা আমি জোর করিয়া কোন হিন্দু সংবাদপত্রে দিয়াছিলাম—তাহাতে নাম প্রকাশ হয় নাই। আমি অনেক পীড়াপীড়ি করায় কবিতার নিম্নে "সাবের বংশের জনৈকা কন্যা" নাম দেওয়া হইয়াছিল। সে পত্রিকার সম্পাদক আমাকে লিখিয়াছিলেন, "সাবের বংশের কন্যার কবিতাগুলি বড় চমৎকার ; আমাদের বেশ লাগিয়াছে। দয়া করিয়া আরও পাঠাইবেন।"

তিনি ইংরাজী ভাষা শিখিবার জন্য সাধনাও কম করেন নাই। তিনি যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক কোন কোন ম্যাট্রিক পাশ-করা লোকের তুলনায় উৎকৃষ্ট বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ স্থলে ১৬ বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা মনে পড়িল। একদিন তিনি ও আমি প্লান্‌চেটে হাত রাখিয়া নানা লোকের আত্মার দ্বারা লিখাইতেছিলাম। আমার খেলাইয়ের আত্মা ইংরাজীতে নাম লিখিল দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "খেলাই মৃত্যুর পর ইংরাজী শিখিয়াছে দেখিয়া আমার মরিতে ইচ্ছা করে—তাহা হইলে অনায়াসে ইংরাজী শিখিতে পারিব।"[২৩]

তিনি ৬৭ বৎসর বয়সে রীতিমত আরবী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমাকে লিখিয়াছিলেন, "মন্ত্রপাঠের মত কোরানের বুলি আবৃত্তি করিয়া তৃপ্তি হয় না, তাই আমি যথাবিধি আরবী পড়িতেছি।" তিনি পারস্য ভাষাও জানিতেন।

সমাজ তাঁহাকে গলা-টেপা করিয়া না রাখিলে করিমুন্নেসা সাহেবা দেশের একটি উজ্জ্বল রত্ন হইতে পারিতেন। ইলেকট্রিক বাতিকে স্তরের পর স্তর—অনেক কাপড়ের আবরণে ঢাকিলে যেরূপ অন্ধকার দেখায়, আমার বর্ণিতা মহিলাটিও সেইরূপ কাপড়-চাপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি জ্ঞানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রজ্বলিত শিখা অন্তরে ঢাকিয়া রাখিয়া নীরবে দগ্ধ হইয়াছেন। তিনি নিজের শিক্ষালাভের জন্য কষ্ট সহিয়াছেন ; পুত্রদ্বয়কে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্যে লাঞ্ছনা সহিয়াছেন—শেষে আমাকে দু'হরফ বাঙ্গলা পড়াইবার জন্যও নিন্দা ও ভ্রূকুটি সহিয়াছেন। ধন্য সমাজ ! তবু তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। আমাকে সাহিত্য-চর্চ্চায় তিনিই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তিনি উৎসাহ না দিলে এবং আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হইলে আমি কখনই প্রকাশ্য সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না। করিমুন্নেসা সাহেবা লক্ষাধিক সংখ্যক বাংলা পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। অনেক পারস্য-গজল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

গত ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর এই রত্নটি ৭১ বৎসর ৫ মাস বয়সে হৃদ্‌যন্ত্র অচল হওয়ায় (হার্ট ফেল করিয়া) চির-লুক্কায়িত হইয়াছেন। তাঁহার দেহত্যাগকে "অকাল-মৃত্যু" বলা যায় না বটে ; তবু কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি আরও দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদিগকে সাহিত্য-চর্চ্চায় উৎসাহ দিলে ভাল হইত। এখন আর আমার কিছুই ভাল লাগে না ; মনে হয় — আর কে পড়িবে ?

---

২৩. প্ল্যান্‌চেট কি জিনিস—তাহা সত্য কি মিথ্যা, এ স্থলে সে-বিষয় আলোচ্য নহে।

রানী ভিখারিনী

আমেরিকাবাসিনী মিস্ মেয়ো "ভারত মাতা" নামক পুস্তকে হিন্দু নারীদের দুঃখ-দৈন্য সম্বন্ধে অতি চমৎকার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই নির্ম্মম সত্য কথা বলার জন্য হিন্দুগণ মিস্ মেয়োকে যত ইচ্ছা গালাগালি করুন ; কিন্তু গালির চোটে কাকের কালো রঙ বকের মত সাদা হইবে না, পরিত্যক্ত জারজ শিশু পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে না, দ্বাদশ বর্ষীয়া প্রসূতিদের বিবিধ রোগ নিরাময় হইবে না ; হাসপাতালে রোগিনীদের সংখ্যাও হ্রাস হইবে না। এ দেশীয় কর্ত্তারা বলেন, "ভারত মাতা" পুস্তকে ভারতের কেবল নিকৃষ্ট অংশ দেখানো হইয়াছে, উৎকৃষ্ট অংশের উল্লেখ করা হয় নাই ; কিন্তু কথা এই যে, যাহা ভাল, তাহা ত ভালই ; তাহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। যাহা মন্দ তাহাই সংশোধন করা আবশ্যক।

ডাক্তারের দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইলে, তিনি রোগীর রোগসমূহেরই উল্লেখ করেন এবং রোগ দূর করিবারই ব্যবস্থা দেন। আপনার চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা দিবার সময় ডাক্তার আপনার পরিপাক শক্তির প্রশংসা-পত্র লিখিতে বসেন না। তারপর ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট অংশের প্রশংসাগীতি গাহিবার জন্য ভারতের গড়পড়তা ১৬ কোটি পুরুষ ত আছেই। সে-জয়ঢাকে কাটি ঠুঁকিবার জন্য মিস মেয়োর দরকার কি ? মিস্ মেয়োর প্রয়োজন সেই কথা কহিতে—যাহা এ যাবৎ আর কেহ বলে নাই,—যাহা এ যাবৎ আর কেহ বলিতে সাহস পায় নাই। সেই কথা আমিও আজ কুড়ি বৎসর হইতে বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কাহারও শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করে নাই—আজ মিস্ মেয়োর গর্জ্জনে সকলের টনক নড়িয়াছে।

"ভারত মাতা" —লেখিকার সহিত ভারত-পিতাগণ "চুলোচুলি" করিতেছেন, এই সুযোগে, মুসলিম-সমাজ ! আপনারা ঐ দর্পণে নিজের মুখ দেখিয়া লউন। দেখুন ত আপনারা নিজ সমাজের রানীকে কিরূপ ভিখারিনী সাজাইয়াছেন। এই বিশাল জগতে কোন দেশ, কোন জাতি, কোন ধর্ম্ম নারীকে কিছুমাত্র অধিকার দান করা দূরে থাকুক, নারীর আত্মাকেও স্বীকার করে নাই। একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মই নারীকে তাহার প্রাপ্য অধিকার দান করিয়াছে ; কিন্তু ভারতবর্ষে সেই মুসলিম-নারীর দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে !

কোন জাতি কন্যাকে সম্পত্তির ভাগ দেয় নাই, ইসলাম কন্যাকে পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভ্রাতার অর্ধেক অংশভাগিনী করিয়াছে। অন্যান্য জাতির স্ত্রীর সম্পত্তি রাখিবার অধিকার নাই। স্ত্রী যদি কিছু টাকা-কড়ি পিত্রালয় হইতে আনে, তাহা স্বামীর কবলে পড়ে—স্ত্রী ভোগ করিতে পায় না। মুসলিম স্ত্রী নিজের সম্পত্তি স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবার অধিকারিণী। কেবল তাহাই নহে, সে বিবাহের সময় স্বামীর অবস্থা-অনুসারে "দেন-মোহর" বাবদ নগদ টাকা বা বিষয়ের অধিকারিণী হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র-কন্যা প্রভৃতি অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অংশ-বিভাগের পূর্ব্বে স্ত্রীর "মোহর" (স্ত্রীধন) এবং তাহার প্রাপ্য অষ্টমাংশ আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে। অতঃপর সম্পত্তির যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অপর সকলে পায়।

হিন্দু স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সহিত পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা আছে। বিধবাগণ এখন সহমৃতা না হইলেও জীবন্মৃতা হইয়া থাকে। তাহাদের গাড়ী বোঝাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, "বিধবা শুধু দ্বিতীয়বার বিবাহ হইতে বিরত থাকিলেই চলিবে না। নারীর উচিত যে, স্বামীর মৃত্যুর পর সর্ব্বপ্রকার সুখাদ্য ত্যাগ করিয়া মাত্র ফল-মূল খাইয়া কোনরূপে বাঁচিয়া থাকে।" কিন্তু ইসলাম নারীকে পুনর্বিবাহের অনুমতি দিয়াছে, বিধবার প্রতি কোন অত্যাচার নাই; তাহার বসন, ভূষণ, আহার সম্বন্ধে কোন বাঁধা নিয়ম নাই।

হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকের প্রতি গৃহপালিত পশু কিম্বা দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে বাধ্য। অষ্টম বর্ষে কন্যা বিবাহ দিলে তাঁহারা গৌরীদানের ফল প্রাপ্ত হন। ইসলাম ধর্ম্মে স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা গিয়াছে। "মাতার পদতলে স্বর্গ" বলা হইয়াছে। স্বেচ্ছাকৃত সম্মতি ব্যতীত কোন নারীর বিবাহ হইতে পারে না, ইহাতে পরোক্ষভাবে বাল্যবিবাহ রহিত করা হইয়াছে।

হিন্দু শাস্ত্র বলে, "স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়।" আর আমাদের রসুলুল্লাহ্ বলিয়াছেন, "তালাবুল 'ইল্মি ফরীজাতুন, 'আলা কুল্লি মুসলিমীন ওয়া মুসলিমাতিন" (অর্থাৎ সমভাবে শিক্ষালাভ করা সমস্ত মুসলিম, নর ও নারীর অবশ্যকর্ত্তব্য)।

কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা কি দেখিতে পাই? হিন্দুগণ কন্যাকে অংশ দিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা "উইল' ' করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।

উইল দ্বারা স্ত্রী কিম্বা কন্যাকে যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে পারেন। আর মুসলমানেরা কন্যার দ্বারা সম্পত্তিতে লা-দাবী লিখাইয়া লইয়া কন্যাকে বিষয়ের অংশ হইতে বঞ্চিত করেন। নানাবিধ জঘন্য উপায়ে নারীকে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হয়।

হিন্দুগণ প্রাণপণে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। আর আমাদের তথাকথিত আশরাফগণ সপ্তম বর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে চির-বিধবা রাখিয়া গৌরব বোধ করেন।

হিন্দুগণ বাল্যবিবাহ রহিত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতেছেন। কন্যার বিবাহের বয়স ১৬ বৎসর বলিয়া ধার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন (যদিও সে-জন্য পণ্ডিতগণ উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদিগকে "অ-হিন্দু" বলিতেছেন)। আর আমাদের সমাজে দেখিতে পাই, টেলিগ্রাফ-যোগে কোন দূর দেশে অবস্থিত বরের সহিত অপ্রাপ্ত বয়স্ক, — ৯ বৎসরের বালিকার বিবাহ হইতেছে। অনেক সময় প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা, ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত অথবা দুশ্চরিত্র পানাসক্ত পাত্রের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে বলিয়া, বুক-ভাঙ্গা রোদনে বক্ষ ভিজাইতে থাকে— সেই হৃদয়-বিদারী অশ্রু-প্রবাহের মধ্যেই বিবাহ-ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। পাত্রী কিছুতেই "হুঁ" বলিবে না,—কিন্তু অভিভাবকও নাছোড়বান্দা—তাঁহারা বলপূর্ব্বক 'হুঁ" "হুঁ" বলাইয়া বিবাহের শ্রাদ্ধ করেন।

এখন হিন্দুগণ অতি উদারভাবে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দান করিতেছেন। পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষাদান করিতেছেন। এখন হিন্দু বালিকা চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, স্কুল, হাই স্কুল ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জয় করিয়াছে। আর আমাদের সমাজ আমাদিগকে শিক্ষার আলো কিছুতেই দেখিতে দিবেন না।

৬০/৭০ বৎসর পূর্ব্বে পুরুষের পক্ষেও ইংরাজী শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। ইংরাজী পড়িলেই লোকে কাফের হইত। এখন কর্ত্তারা তাহার ফলভোগ করিতেছেন। স্বাস্থ্য, অর্থ, শক্তি,

সামর্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিভাগের দ্বারই মুসলমানের জন্য "অযোগ্যতার" অজুহাতে রুদ্ধ হইয়া আছে। কলিকাতা করপোরেশনে শতকরা ৫০টি চাকুরী লাভের জন্য চেঁচামেচি করিয়া মুসলমানগণ ভারতের নিকৃষ্ট শ্রেণীর (Depressed Class-এর) তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। আমি বলি, তাঁহারা নিশ্চয়ই "অযোগ্য"। মুসলমানেরা স্বীকার করুন বা না করুন,—তাঁহারা যে অযোগ্য, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, সুশিক্ষিতা-সুযোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা মুসলমানের ন্যায় অশিক্ষিতা অযোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান যে নিকৃষ্ট হইবে, ইহা ত অতি স্বাভাবিক। "অযোগ্য" বলার জন্য রাগ না করিয়া "যোগ্য" হবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ।

উন্নতির পথে

আজকাল সবাই উন্নতি করেছে—যেদিকে তাকাই কেবল দেখি উন্নতি আর উন্নতি। কেবল আমি অর্থব বুড়ো অচল হয়ে বসে আছি। তাই ভাবি আর বেশী করে ভাত খাই, আর ভাবি যে কি ক'রে আমার উন্নতি হবে।

চশমাটা ভাল ক'রে মুছে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনের নজর পড়লো—'ক্রুশেন সল্ট' খেলে সত্তর বছরের বুড়ো কুড়ি বছরের তরুণ হয়ে যায়। বাস্—এক শিশি কিনে খাওয়া আরম্ভ করলুম।

ভাই! কি বলবো—এক হপ্তা 'ক্রুশেন সল্ট' খেতে না খেতে এক্কেবারে আঠারো বছরের তরুণের মতো গায়ে স্ফূর্তি হলো! তখন ভাবলুম, আর এ বুড়োদের সঙ্গে অথর্ব্ব হয়ে থাকা নয়—যাই তরুণদের সাথে মিশ্‌তে।

লাঠি ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দেখি : মেলা তরুণ এক জায়গায় জড় হয়ে গান করছে—

"নগ্ন শির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে,
কাছা কোঁচা শ বার খসে খসে পড়ে—"

বাঃ! আমার বড় ভালো লাগ্‌লো—বিশেষতঃ আমি বাষট্টি বছর এগিয়ে এসেছি কি না-—অর্থাৎ আমার বয়স আশি বছর; কিন্তু এক হপ্তা ওষুধ খেয়ে যে এক্কেবারে আঠারো বছরের তরুণ হয়ে গেছি—তাই প্রাণে আর স্ফূর্তি ধরে না!

তরুণকে বললুম, "ভাই, আমি দাড়ী গোঁফ চেঁচে ফলে (শিং কাটিয়ে) তোমাদের সঙ্গে মিশতে এসেছি। আমায় তোমার সঙ্গে উন্নতির পথে নিয়ে চল।"

সে বললে, "বেশ এস।"

পরদিন আমি একটা মোটর নিয়ে তরুণের কাছে গেলুম। সে হেসে বল্‌লে, "এখন আর মোটর নয়। আমার এরোপ্লেনে চল। এরোপ্লেনটা ঘণ্টায় ৬০,০০০ মাইল চলে।"

আমি অবাক হয়ে বললুম, "ভায়া। পৃথিবীর গতি ঘণ্টায় ৭২০ মাইল, আর তোমার এরোপ্লেনের গতি ঘণ্টায় ৬০,০০০ মাইল?"

তরুণ বলল, "কি জান দাদা। পৃথিবী বুড়ো হয়ে গেছে—সে আর আমাদের উন্নতির গতির সঙ্গে পেরে উঠছে না।"

যাক, আমাদের প্লেন বোঁ বোঁ করে রওয়ানা হলো। তাতে আরও অনেক যাত্রী ছিল—ইরানী, তুরানী, তুর্কী, আল্‌বানিয়ান, ইরাকী, কাবুলী ইত্যাদি ইত্যাদি; কেবল তরুণ নয়, তরুণীরাও ছিল। সবাই নওজোয়ান,—বুড়ো (আমি ছাড়া আর) একটাও না। আমার মাথার ভিতর কেবলই গুঞ্জন করছিল—

"নগ্ন শির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে,

কাছা কোঁচা শত বার খসে খসে পড়ে—"

কখনও ঐ গানটিই উলট-পালট হ'য়ে মনে ভেসে বেড়চ্ছিল—

"পাগড়ী নাই, টুপি নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—" ইত্যাদি

ও বাবা ! কতকক্ষণ পরে দেখি কি, সত্য সত্যই তরুণরে কাছা-কোঁচা একেবারে খসে পড়ে গেছে-আর-

"রোদ বৃষ্টি হিম হতে বাঁচাইতে কায়

একমাত্র হ্যাট তার রয়েছে মাথায় ! !"

শেষে দেখি, সোবহান্ আল্লাহ্ ! তরুণীরাও অর্ধ-দিগম্বরী।।

যাক, হ্যাট দিয়ে লজ্জা যদি না-ও নিবারণ হয়, তবু রোদ বৃষ্টি হিম হতে মাথাটা বাঁচবে। কিন্তু তরুণীদের মাথায় যে হ্যাটও নাই। আর চেপে থাকতে না পেরে বলে ফেললুম—"ভাই তরুণ, উন্নতির পথে চলেছ তা উলঙ্গ হয়ে কেন ?"

সে বললে, "আমরা এখন দেশোদ্ধার করতে চলেছি—আমাদের কি কাছা-কোঁচা জ্ঞান আছে ? তুচ্ছ বেশ-ভূষা, তুচ্ছ বাস—সব বিসর্জ্জন দাও স্বাধীনতা পাবার আশায়। আমরা চাই কেবল উন্নতি আর উন্নতি।"

চুপ করে থাকা আমার ধাতে নেই—আমি মরণকালে যমের সঙ্গেও গল্প করবো। তুরানী তরুণকে বললুম, "তোমরা ত ভাই নিজের দেশেই আছ, তোমরা স্বাধীন, তবে কাপড় ছাড়লে কেন ?"

সে বল্‌লে, "এ কোথাকার ওল্ড ফুল ! পৃথিবী যে চক্রাকার পথে ভ্রমণ করে—অর্থাৎ যেখান তেকে যাত্রা করেছে, ঘুরে আবার সেইখানে পৌছব-এ তাও জানে না !"

পরে আমি কাবুলী তরুণকে বললুম, "ভাই ! তোমারা ত চিরস্বাধীন, তবে কাপড় চাড়লে কেন।"

সে আমাকে বুঝিয়ে বলল, যে, তাদের দেশ আবর্জনায় ভ'রে গেছে, এখন তা'রা দেশের পঙ্কোদ্ধার করছে। পাপড়ী ও প্রকাণ্ড কাবুলী পায়জামা, আর চুল, দাড়ি—এসব নিয়ে কাজ করতে গেলে, কাদার ছিটায় (চুল, দাড়ি, পাগড়ী, পায়জামা) সব বিদিকিচ্ছি হ'য়ে যাবে যে ! তাই কেবল হ্যাট ছাড়া দেশে আর কোনো আবরণই থাকবে না !

বোঁ বোঁ করে প্লেন উন্নতির পথে ছুটেছে ! এখন দেখি কি, সেই তরুণী তরুণের কথাই সত্য, অর্থাৎ প্লেনটা চক্রাকার পথে ঘুরে ক্রমে কালিদাসের বর্ণিত শকুন্তলার যুগে— যখন

মুনি-কন্যারা গাছের বাকল পরতেন, তাও আবার সব সময় লম্বায় চওড়ায় যথেষ্ট হ'ত না বলে টেনে টুনে পরতে হ'ত—সেই যুগে এসে পড়েছে। তরুণীদের দিকে আর চাওয়া যায় না।

আমি মিনতি করে বল্‌লুম, "ভায়া তরুণ! দয়া করে তোমার প্লেনটা থামাও, আমি এইখানে নেমে পড়ি।"

ইরানী তরুণ হাসতে হাসতে বললেন, "দাদা! এখনই কি হয়েছে—কোল ভীলের যুগ দেখেই ভয় পাচ্ছ? এখনও গায়ে রং মাথার যুগে এসে পৌছায়নি!"

আমি কাকুতি ক'রে বললুম, "দোহাই ভায়া ভরুণ! আর না। আমি বুঝতে পেরেছি : তোমরা এখন আদি-মাতা হজরত হাবার যুগে এসে পড়বে। আদি-পিতা অভিশপ্ত হ'য়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে গাছের তিনটা পাতা চেয়ে নিয়ে—একটায় তহবন্দ, একটা দিয়ে জামা আর একটা দিয়ে মাথা ঢাকবার টুপী করেছিলেন। আর আদি-মাতা তাঁর লম্বা চুল খুলে দিয়ে সমস্ত গা ঢেকেছিলেন। কিন্তু এখনকার তরুণীদের মাথায় ত চুলও নেই—এরা কি দিয়ে গা ঢাকবে?"

বেগম তরজীর সহিত সাক্ষাৎ

[বোম্বাইয়ের কোন বালিকা বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেন্ডেন্ট—ফাতেমা বেগম সাহেবা, মহামান্যা রানী সুরাইয়া বেগমের সহিত সাক্ষাৎ লাভের জন্য 'তাজমহল' হোটেলে গিয়াছিলেন। কিন্তু মহারানীর অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। পরন্তু তাঁহার মাতা 'বেগম তরজী'র সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ফাতেমা বেগম সাহেবা উক্ত সাক্ষাতের বিবরণ কোন উর্দ্দু কাগজে লিখিয়াছিলেন। আমি উক্ত কাগজ হইতে 'সওগাতে'র জন্য তাহা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া দিলাম]

আফগানিস্তানের মুকুটবিহীন রাজা, মুসলমানদের হৃদয়ের বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্ খাঁ এবং তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী সুরাইয়া বেগম সাহেবা বোম্বাইতে আছেন অবধি তাঁহাদের সম্বন্ধে রং-বেরঙের গুজব শহরময় ও দেশময় ছড়াইতেছে; এ সময় আমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা হইল যে, এই পুণ্যবতী সর্ব্বজনপ্রিয়া মহারানীর সহিত অন্ততঃ কয়েক মিনিটের জন্য দেখা করিয়া আসি। এই উদ্দেশ্যে অন্য একটি মুসলমান মহিলাকে সঙ্গে লইয়া তাজমহল হোটেলে সন্ধ্যা বেলায় উপনীত হইলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, রাজদম্পতি মোটর-যোগে বায়ু-সেবনের নিমিত্ত বাহিরে গিয়াছেন। সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, আগামীকল্য দশটার সময় আসিলে মহারানীর সহিত দেখা হইবে; এ সময় রাজদম্পতি হোটেলে নাই। সুতরাং আমরা দ্বিতীয় দিন আবার নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে গেলাম, এবং পারসী ভাষায় একখানা চিঠি সেক্রেটারীকে পাঠাইলাম। তাহার উত্তরে আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান হইল। কামরায় প্রবেশ করিবা মাত্র এক অতিশয় সুদর্শনা এবং বয়স্কা মহিলার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। জানিতে পারিলাম, তিনি রানী সুরাইয়ার জননী—সর্দ্দার মাহমুদ তরজীর বেগম সাহেবা।

বেগম সাহেবা বলিলেন, "আমার স্বামী ২০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রাণপণ যত্নে আফগানিস্তানের সেবা করিয়াছিলেন; সমগ্র ইউরোপীয় জাতিসমূহের দ্বারা আফগানিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র-রূপে স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন, আর কাবুলকে একটি সুন্দর প্রমোদ-কাননে পরিণত করিবার

জন্য বাদশাহকে সকল রকম পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ প্রজাগণ তাহার এমনি প্রতিদান দিল যে, তিনি উহাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আজ তেহরাচন গিয়া বসিয়াছেন। আমাদের এক পুত্র মস্কো গিয়াছে, আর এক পুত্র এবং কন্যা ফ্রান্সে আছে। আর নিজে এই কন্যাদের সঙ্গে এইরূপ পেরেশান হইয়া বেড়াইতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "মহামান্যা সুরাইয়া বেগমের শরীর বড়ই অসুস্থ, তিনি শয্যাগত আছেন। এমনকি, লেডী ডাক্তার পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট আছে। এই কারণে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে পারিলেন না। যদি ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত এখানে থাকা হয় এবং তাঁহার শরীর কিছু ভালো হয়, তাহা হইলে পুনরায় আসিলে তাঁহার সহিত দেখা হইবে।"

এই সময়ের মধ্যে আমি তাঁহার এক দৌহিত্র ও চার দৌহিত্রী, অর্থাৎ রানী সুরাইয়ার চার কন্যা—আমিনা, আবেদা, আরেফা আর আদেলা প্রভৃতিকে দেখিলাম। রাজকুমারীরা অতিশয় সুন্দরী ; তাহাদের পোশাক একেবারে আজকালকার ইউরোপীয় ধরনের, এবং সকলেরই আধুনিক ধরনের চুল কাটা, এমনকি, বেগম তরজী সাহেবারও চুল কাটা এবং পোশাক একেবারে ইউরোপীয় ধরনের। এই মহিলাটির পূর্ব্বপুরুষগণ আরব এবং শ্যাম দেশবাসী, এবং আরব জাতির বিশেষ সৌন্দর্য তাঁহার চেহারায় বিদ্যমান আছে।

কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "আমরা কান্দাহার হইতে এমনি অবস্থায় আসিয়াছিলাম যে, আমাদের পরনের কাপড় ছাড়া কোন জিনিসপত্র, এমনকি, আর এক প্রস্থ কাপড় পর্য্যন্তও আমাদের সঙ্গে আনা সম্ভব হয় নাই। এখানে আসিয়া আমরা হোটেলে দর্জ্জী ডাকিয়া কাপড় তৈয়ার করাইতেছি।"

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "ভারতবর্ষের মুসলমানেরা শাহ্ আমানুল্লাহ্ খানের প্রতি বিশেষ প্রীতি এবং শ্রদ্ধা তাহাদের হৃদয়ে পোষণ করে। আর ভারতবর্ষের শুধু মুসলমান নহে, অন্যান্য জাতির মহিলাগণও মহামান্যা সুরাইয়া বেগমকে প্রাণপণে ভালবাসে। আমাদের ছেলেমেয়েরা শাহ্ আমানুল্লাহ্র জন্য সর্ব্বদা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে।"

তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাস্তবিকই আমরা ভারতবর্ষের মুসলমানদের নিকট কৃতজ্ঞ আছি যে, তাঁহারা আমাদের প্রতি এতখানি সহানুভূতি রাখেন। কিন্তু আক্ষেপ যে, আমাদের নিজেদের দেশের লোকেরা আমাদের কাফেরের ফতোয়া পর্য্যন্ত দিতে ত্রুটি করে নাই। বিশেষতঃ এমন বাদশহ্কে তাহারা কাফের বলিল, যিনি সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্র সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন—যাহাদের সংখ্যা সে দেশে কেবল শতাবধি নহে, হাজারের চেয়েও বেশি ছিল ;—এমনকি, তাঁহার মাতার অন্তঃপুরে যে সমস্ত দাসী ছিল, তাহাদিগকেও তিনি মুক্তি দিয়াছেন। আফগানিস্তানে আমানুল্লাহ্ খানের এই ক্ষণিক রাজত্বের সময়ে একটিও বাঁদী দেখা যায় নাই ; কেননা, বাঁদী অথবা 'গোলাম' কেহ রাখিলে তাঁহাকে দুই হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইত। —বাঁদী গোলামের স্থানে চাকর ও চাকরানী অন্দর ও বাহিরে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই চাকরদের সহিত অধিক কঠোর ব্যবহার করার অনুমতি ছিল না।"

তারপর তিনি বলিলেন—"সমস্ত আফগানিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম ঘটনা যে, বাদশাহের মাত্র এক বিবি থাকে, তাঁহার দ্বিতীয় বিবি কিম্বা কোনো রক্ষিতা থাকে না।

আহা ! এমন বাদশাহের বিরুদ্ধে তাহারা কাফেরী ফতোয়া দিল ! বাদশাহ্ স্বদেশের উন্নতির জন্য এমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন যে, তিনি দশ বৎসরের মধ্যে কাবুলকে গুলজার করিয়া তুলিলেন। তিনি রাস্তা প্রস্তুত করাইলেন, ইমারত নির্ম্মাণ করাইলেন, মোটর চালাইলেন, বৈদ্যুতিক তার লাগাইলেন, উদ্যান প্রস্তুত করাইলেন, হাসপাতাল স্থাপন করিলেন। আধুনিক জগতের সমস্ত প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমৃদ্ধি দ্বারা কাবুলকে গৌরবময় করিয়া তোলাই তাঁহার প্রাণের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি তদুদ্দেশ্যে নিজের দেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া তরুণদিগকে শিক্ষালাভের নিমিত্ত ইউরোপে পাঠাইলেন—যাহাতে তাহারা ইঞ্জিনিয়ারিং, খনির কাজ এবং অন্যান্য বিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে এবং যাহাতে নিজের দেশে নিজের লোকেরাই কাজ করিতে পারে !"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কাবুল শহরে বালিকাদের জন্য কয়টি স্কুল স্থাপন করা গিয়াছে। —তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া এবং গণনা করিয়া বলিলেন— "কাবুলে ৬টি বালিকা বিদ্যালয় স্বয়ং মহারানী সুরাইয়া স্থাপন করিয়াছেন। আমি উক্ত স্কুলসমূহ তদারক করিতাম। স্বয়ং মহারানী মেয়েদের পরীক্ষা নিতেন এবং যখন-তখন স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইতেন। এই স্কুলে যাহারা ভর্ত্তি হইত তাহাদের মধ্যে গরীব মেয়েদের জোড়া-জোড়া কাপড়, এমন কি জুতা মোজা পর্য্যন্ত মহারানী দিতেন। বাদশাহ্ স্বয়ং প্রত্যেক মেয়েকে রাজকোষ হইতে বৃত্তি দিতেন—যাহাতে লোকে কাপড় ও বৃত্তির লোভে মেয়েদিগকে পড়ায়।"

অতঃপর তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি ইউরোপ, মিসর এবং সিরিয়ার বিদ্যালয়সমূহ দেখিয়াছি। আমি বলিতে পারি যে, কাবুলের বিদ্যালয় ঐ সকল বিদ্যালয় অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, বরং কোন কোন বিষয়ে উৎকৃষ্টতর। বাদশাহ্ স্ত্রীলোকদিগকে ইউরোপে ও তুরস্কে এই কারণে পাঠাইলেন যে, সেখানে গিয়া তাহারা প্রত্যেক রকমের আধুনিক শিক্ষা লাভ করিয়া আসে— যাহাতে এই অশিক্ষিত দেশের বালিকাদের শিক্ষার জন্য আমাদিগকে বাহির হইতে শিক্ষয়িত্রী আনিবার প্রয়োজন না হয়। শিক্ষার নিমিত্ত বিভিন্ন দেশে প্রেরিত ঐ সকল বালক-বালিকাদের খরচের জন্য রাজকোষের দ্বার বাদশাহ্ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদিগকে হাজার হাজার পাউণ্ড মাসিক খরচ পাঠান হইত।"

মহারানী সুরাইয়ার কথা উঠিলে তিনি বলিলেন, "আমার কন্যা অতিশয় সুশীলা, সহৃদয়া ও আপন-ভোলা মেয়ে। তিনি নিজের স্বামীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা, সর্ব্বসময়ে শোকে-দুঃখে তাহার ছায়াতুল্যা সহচরী। আর তাহাদের দাম্পত্য-প্রেম অত্যন্ত গাঢ়।"

আমি বলিলাম, "মহারানী সুরাইয়া অতিশয় ভাগ্যবতী। চিন্তা করিবার কিছুই নাই—যদিও তিনি এখন আর আফগানিস্তানের বদ্‌বখ্‌ত ও ছেয়াহ্ বখ্‌ত লোকদের উপর রাজত্ব করিতেছেন না, কিন্তু তিনি বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্‌র উপর রাজত্ব করিতেছেন। রানী সুরাইয়া বাঁচিয়া থাকুন, বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্ দীর্ঘজীবী হইন।"

মহারানীর মাতা বলিলেন, "যিনি নিজের দেশবাসী এবং আপন প্রজাদের রক্তপাত করিতে অনিচ্ছুক এবং যিনি শুধু রক্তপাতকে এড়াইবার জন্য নিজের দেশ ছাড়িয়াছেন, এমন পুণ্যশ্লোক বাদশাহ্‌কে 'কাফের' ফতোয়া দেওয়া হইল ! প্রকৃতপক্ষে, ঐ বদ্‌বখত্ অভিশপ্ত

জাতি বাচ্চাই-সাক্কার মতো ডাকাতের রাজত্বেরই উপযুক্ত। বাচ্চাই-সাক্কা, সে কে? সে কেবল 'হ্যাট' পরার অপরাধে লোকেদের শিরশ্ছেদ করিয়াছে। সে সকল রকম দোষ এবং পাপের বাজার গরম রাখিয়াছে ; তাহার লোকেরা স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্ত অপমানিত করিয়াছে। আমানুল্লাহ্ খাঁকে এই জন্য 'কাফের' বলা হয় যে, তিনি অন্যায় কার্য্য করিবার অনুমতি দেন নাই। তিনি অন্যায়কারীদের পরম শত্রু। তিনি শান্তিপ্রিয়, দয়ালু-হৃদয় এবং ধার্ম্মিক। তিনি প্রাচীন কালের দাসত্ব মোচন করিয়াছেন। তিনি বদ্‌বখ্‌ত আফগানিস্তানকে চিরদিনের জন্য স্বাধীন এবং সভ্য করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য এইরূপ মহাত্মাকে 'কাফের' বলাই চাই!"

মহারানীর মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, রাজকুমারীদিগকে দেখিয়া এবং মহারানীর সঙ্গে আর একদিন আসিয়া দেখা করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়া, যাহা হউক, গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আজকে এমন পাষাণ হইতে পাষাণতর কে আছে যে, প্রকৃত মুসলমান পুণ্যাত্মা বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্ এবং মালেকা সুরাইয়ার জন্য চক্ষু সজল এবং বুকে দীর্ঘশ্বাস না রাখে!

সুবেহ্ সাদেক

জাগো মাতা, ভগিনী, কন্যা—উঠ, শয্যা ত্যাগ করিয়া আইস ; অগ্রসর হও। ঐ শুন, "মোয়াজ্জিন" আজান দিতেছেন। তোমরা কি ঐ আজান-ধ্বনি, আল্লাহর ধ্বনি শুনিতে পাও না? আর ঘুমাইও না; উঠ, এখন আর রাত্রি নাই, এখন সুবেহ্ সাদেক—মোয়াজ্জিন আজান দিতেছেন। যৎকালে সমগ্র জগতের নারীজাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারা নানাবিধ সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে—তাহারা শিক্ষামন্ত্রী হইয়াছে, তাহারা ডাক্তার, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, যুদ্ধমন্ত্রী, প্রধানা সেনাধ্যক্ষা, লেখিকা, কবি ইত্যাদি ইত্যাদি হইতেছে—আমরা বঙ্গনারী গৃহ-কারাগারে অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে মেজেতে পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছি আর যক্ষ্মা রোগে ভুগিয়া হাজারে হাজারে মরিতেছি।

আমরা নিজেদের জন্য যাবতীয় অভিসম্পাত "রিজাভ" করিয়া রাখিয়াছি, আমরা সময়ের গতির সহিত সমপদক্ষেপে নড়িব না। আমরা শপথ করিয়া বসিয়া আছি যে, আজানের শব্দ শুনিয়া শয্যা ত্যাগ করিব না। কিন্তু তাহা যে আর হইবে না। ভগিনীগণ! আপনারা স্বীয় কারাগারের ক্ষুদ্র ছিদ্র পথ দিয়া উঁকি মারিয়া একবার বাহিরের জগৎ দেখুন দেখি!

আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই শুনিয়াছি যে, আমরা জন্মিয়াছি দাসী, চিরকাল দাসী, থাকিব দাসী।

আহা! কবি বড় দুঃখে গাহিয়াছেন, —

"মনের মরম ব্যথা প্রকাশিতে নারি,
কত পাপ ছিল তাই হয়েছিনু নারী।"

আমাদিগকে "নাকে সুল আকেল" বলিয়া দুনিয়ার সমস্ত দোষ আমাদের স্কন্ধে চাপানো হয়। আমরা মূক বলিয়া কোন কালে এইসব অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করি নাই। আমাদের প্রতি পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হয়, আমরা তাহাতেই গৌরব বোধ করি।

কিছুকাল হইতে আমাদের প্রভুগণ আমাদিগকে মূল্যবান অলঙ্কারের শামিল গণনা করিতেছেন। তাই দেখুন কত প্রকারের "নারী রক্ষা সমিতি" গঠিত হইতেছে! বাস্তবিক, আমরা যখন জ্যান্ত লগেজ, তখন যাহাতে আমরা চুরি না হইতে পারি, সেজন্য জাগ্রত প্রহরীর প্রয়োজন। আমার অভাগিনী ভগিনীগণ! আপনারা কি ইহাতে অপমান বোধ করে না? যদি করেন তবে এই নির্ম্মম অবমাননা নীরবে হজম করেন কেন?

একবার নিজের দিকে চাহিয়া দেখুন দেখি—আমাদিগকে পশুর সহিত তুলনা করা হয়; তাই দেখুন, "পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির" পার্শ্বে "নারীরক্ষা সমিতি।" ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট অপমান আর কি হইতে পারে? যাহা হউক, এখন এ অপমানের ইতি হওয়া চাই।

ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন—অগ্রসর হউন! বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে! আমরা জড়াউ অলঙ্কাররূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ! আর কার্য্যতঃ দেখাও যে, আমরা সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্দ্ধেক। বাস্তবিক পক্ষে আমরাই সৃষ্টি জগতের মাতা। তোমরা নিজের দাবী-দাওয়া রক্ষা করিবার জন্য নিজেরাই বিবিধ সমিতি গঠন কর।

শিক্ষা বিস্তারই এইসব অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধ! অন্ততঃপক্ষে বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে! শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি; গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা—যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতারূপে গঠিত করিবে! শিক্ষা—মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। তাহাদের জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ী, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আইসে নাই; বরং তাহারা বিশেষ কর্ত্তব্য সাধনের নিমিত্ত নারীরূপে জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাদের জীবন শুধু পতি-দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে! তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।

শারীরিক শিক্ষার জন্য আমার মতে লাঠি ও ছোরা খেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভানা, যাঁতায় আটা প্রস্তুত করা এবং যাবতীয় গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া প্রশস্ত। এক ধান ভানা ও যাঁতা চালনায় দেশের সর্ব্ববৃহৎ খাদ্য সমস্যা পূরণ হইবে। অধুনা ঢেঁকিছাটা চাউল ও যাঁতায় পেষা আটার অভাবে দেশের লোক মৃত্যুস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। শুধু লম্ফ-ঝম্প, নৃত্য ইত্যাদি অপেক্ষা উপরোক্ত রূপ শরীরচর্চ্চা শতগুণ শ্রেয়ঃ। খোলা মাঠে প্রাতঃভ্রমণও অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। গভর্নমেন্ট এখন শিশুরক্ষার দিকে মনোযোগ দিয়াছেন, ভাল কথা, কিন্তু প্রথমে শিশুর মাতাকে রক্ষা করা চাই।

যাহা হউক, মাতা, ভগিনী, কন্যে! আর ঘুমাইও না,—উঠ, কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হও।

৭০০ স্কুলের দেশে

এই বঙ্গদেশে এমন একটি জেলা আছে, যেখানে একটি নয়, দুইটি নয়, সাত শত বিদ্যালয় আছে। সেই জেলার এক গ্রামের জমীদারের ইচ্ছা হইল যে, তাঁহার নিজ গ্রামে একটি মধ্য ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হউক। বিদ্যালয় স্থাপন করা বরং সহজ, কিন্তু তাহা পরিচালনা করা সহজ নহে ; বিশেষতঃ পর্দ্দানশীন মেয়েদের স্কুল।

জমীদার সাহেব শেষে স্থির করিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিবেন একটি সুশিক্ষিতা পাত্রীর সহিত। সেই বধূ তাঁহার বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিবে। তদনুসারে যথাসময়ে অতি সমারোহের সহিত জমীদার পুত্রের বিবাহ হইয়া গেল। বধূর নাম,— ধরুন, সালেহা খাতুন। সালেহা শ্বশুরবাড়ী গিয়া দেখে, তাহার সহিত কেহ কথা বলে না ; শাশুড়ী, ননদ সবাই যেন তটস্থা ! পাড়ার স্ত্রীলোকেরা বেড়াইতে আসিয়া ফিসফিস করিয়া পরস্পরে কথা বলে। সকলেই বউ দেখিতে আসে— বউ যেন জাদুঘরের কোন আজব চিজ,— তাই সমস্ত দিন ছেলে মেয়েসহ স্ত্রীলোকেরা আসে বউ দেখিতে। কিন্তু কেহই বধূর সহিত কথা বলে না। কারণ সালেহার দোষ ত্রিবিধ। ১ম, সে কলিকাতার মেয়ে ; ২য়, সে জজ ম্যাজিষ্ট্রেরের ম্যায়া ; ৩য়, সে সাখাওয়াত স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের মিডল্ পরীক্ষায় পাশ করা মাইয়া ! তাহা ছাড়া সে উক্ত স্কুলে থাকাকালীন কলিকাতা গার্লস স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গভর্ণমেন্ট হইতে ২৮.০০ জলপানি পাইয়াছে ; ফার্ষ্ট এড্ এবং হোম নার্সিং (অর্থাৎ প্রাথমিক প্রতিকার ও গৃহ চিকিৎসা) পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া ডিপ্লোমা পাইয়াছে, সুচারু সূচিকর্ম্মের জন্য ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হইতে পদক প্রাপ্ত হইয়াছে।

এসব কথা গ্রামময় রাষ্ট্র ছিল। তাই সে শ্বশুরবাড়ীতে উপাধি পাইল, "পড়া বউ"। স্বয়ং কর্ত্তাও গৃহিণীকে চুপি চুপি বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি যেন হঠাৎ যেমন তেমন কোন কথা বলিয়া "পড়া বউ"" এর নিকট হাস্যাস্পদ না হন। তাই তিনিও পুত্রবধূর সহিত ওজন করিয়া কথা কহেন। সুতরাং বেচারী সালেহা সমস্ত দিন জনকোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও নিজেকে নিতান্ত একাকিনী বোধ করিত।

ক্রমে অবস্থাটা সালেহার বর বুঝিতে পারিলেন। একদিন তিনি নিজে ছোট ভগিনীকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কেন তাহার ভাবীজানের সহিত কথাবার্ত্তা বলে না, তাহার কাছে কেন দুদণ্ড বসে না। তাহার উত্তরে সে কাঁদকাঁদভাবে বলিল যে, ভাবীজানের নিকট সমস্ত দিন হাটের মত লোক থাকে, সে কেমন করিয়া তাহাদের সম্মুখে যাইবে, (কারণ সে যে কুমারী বালিকা।) আর তাহাকে মুরুব্বীরা বারণ করিয়াছেন "পড়া ভাবী"র সহিত কথা বলিতে ; কারণ সে তো লেখাপড়া জানে না !

একবার এক মুন্সেফের বউ দুইচারি কথা বলিয়াই হঠাৎ চুপ করিলেন এবং সভয়ে সকাতরে চুপি চুপি বলিলেন, "মাফ করিবেন, আমি মুক্ষু সুক্ষু মানুষ, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম। আমার স্বামী আমাকে আপনার সঙ্গে কথা বলিতে মানা করিয়া দিয়াছেন। কারণ আপনি পড়া মানুষ,— আর আমরা কথা কইতে জানি না।"

এদিকে ছয় সাত মাস পরে সালেহাকে তাহার শ্বশুর তাড়া দিতে লাগিলেন যে, পাড়ার ভাল মানুষের মেয়েদের লইয়া স্কুল আরম্ভ করা হউক। কিন্তু তাহারা পড়ালেখার নাম শুনিয়া আঁতকাইয়া উঠিল,— বাপরে! "পড়া বউ" বলে কি! কোরাণ কিতাব হইল পাক জিনিষ,—আমরা মাগী না ছাগী, কি কাজে লাগি? মাগীর জাত নাপাক, তাহারা কোরান শরীফ ছুঁইবে? সালেহা শ্বশুরকে এ সমস্ত বলায় তিনি বলিলেন, "তবে আপাততঃ অর্দ্ধ ভদ্রদের ছাড়িয়া নিম্ন শ্রেণীর আবালবৃদ্ধবনিতা—সকলকে নামাজ শিক্ষা দাও। নামাজে কেহ আপত্তি করিবে না।"

নামাজ শিক্ষা আরম্ভ হইল। ইহাতে সালেহার শাশুড়ীও সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি বৃদ্ধাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তিন কাল গিয়াছে, এখন আল্লাহতালার এবাদত করা দরকার। নতুবা—

"বেনামাজী, বে-দ্বীন ও বে-ঈমানে
বে-তাইন সাজা হবে হাশর-ময়দানে"

তাহারা নামাজ শিখিতে সম্মত হইল। সালেহা সকলকে একত্রে দাঁড় করাইয়া মুখে মুখে বলিয়া নামাজ পড়াইত। পরে প্রত্যেককে নামাজের জন্য ব্যবহৃত সুরাসমূহ মুখস্থ করিতে দিত।

একদিন মগরিবের সময় সকলকে নামাজের নিয়ত ও সুরা বলিয়া দিয়া সালেহা নিজে নামাজ পড়িতে গেল। তাহার নামাজ শেষ হওয়ামাত্র তাহার ছোট ননদ দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, "ও ভাবীজান! দেখুন আসিয়া,— কালার মা তক্তপোষে শুইয়া ঘরের থামে দুই পা তুলিয়া দিয়া পড়িতেছে,— আলহামদো আলে, দুই ঠ্যাং উঠল চালে।" সালেহা তাহার সহিত গিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সকলের পড়া শুনিতে লাগিল। সকলে আলাদা আলাদা সুর করিয়া পড়িতেছে —

কেহ বলিতেছে— "ইন্নিয়া জাহাদো—"
অপর একজন— "ইসুফ! ইসুফ! ফিছা ধরে নাচ—"
অপর একজন—"খইচালা দিয়া নারাণ জাতা—"
অপর একজন—"আলামতারার কয়টা ফালা—"
অপর একজন— "বেজার হইতেন মুন্সিজী—"

সালেহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল,— রাগে তাহার কান্না পাইতে লাগিল। সে কাঁদিয়া গিয়া শাশুড়ীকে সমস্ত বলিল।

তিনি আসিয়া স্বকর্ণে পড়া শুনিয়া সকলকে ধমকাইয়া বলিলেন, "ওরে সর্ব্বনাশী, কালীচুন্নী—ও! তোদের গালে কালী! দূর হ ! তোরা কিসের নামাজ শিখবি?"

জনৈকা বৃদ্ধা (সেই কালার মা) সাহস করিয়া বলিল, "বিবী সা'ব, দূর দূর করিয়া শেয়াল কুকুরের মত তাড়ান কেন? নামাজ না পড়লে ত আমাদের বয়েই যাবে। কালার বাপ

হজ্ব করে আইল্ছে ; আমরা এত বড় পীরের মুরিদ ; আমরা মনজিলের দিন (মহর্‌রমের ১০ই তারিখে) বিবীর নামে রোজা রাখি ; খোদার নাতীদের নামে শরবত খাওয়াই— আমাদের মত ছওয়াবের কাজ আর কেউ করুক দেখি!" সালেহার শাশুড়ী "নাউজবিল্লাহ! তোবা তোবা!" বলিয়া কানে হাত দিলেন। নামাজ শিক্ষার্থিনীরা রাগে গরগর করিয়া চলিয়া গেল।

উপরোক্ত ঘটনার সপ্তাহকাল পরে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা সালেহার নিকট চাঁদা চাহিতে আসিল। কিসের জন্য চাঁদা দিতে হইবে, এ-কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে, গ্রামে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে, তাই শীতলা দেবীর পূজা করিতে হইবে। সালেহা মিষ্ট ভাষায় তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, এ-সব শেরেক বেদা'ত করা ভাল নয়। তোমরা ছেলে বুড়া—সকলে বসন্তের টিকা লও। তাহারা বলিল, "তুমি 'পড়া বউ' কলিকাতার ম্যায়া, দুই চারিখানা ক্যাতাব পড়িয়াছ, তাই মনে কর তুমি খুব জান,— কিন্তু মা। তুমি ছাই কিছুই জান না! শীতলামাতাকে স্বয়ং খোদাও ভয় করেন! এমনকি শীতলাদেবী খোদার গায়েও পাঁচ গোটা বসন্ত দিয়াছেন।" সালেহা কানে আঙ্গুল দিয়া বলিল, "রক্ষা কর—আর শুনিতে চাই না।"

অপর এক বর্ষীয়সী ধীরভাবে সালেহাকে বলিল, "পড়া-বউ, যদি রাগ না কর তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। লোকে যে বলে, খোদা ও রসুল। হ্যাঁ মা! খোদা ও রসুল একই লোক না?" সালেহা তাহার কথার যথার্থ উত্তর দিয়া তাহাকে কলেমা পড়াইল এবং ভালরূপে কলেমার অর্থ বুঝাইয়া দিয়া বলিল, "এখন হইতে তওবা কর আর কখন বিবীর নামে রোজা রাখিও না। হজরত ইমাম হাসান ও হোসেনকে খোদার নাতি বলিও না—" ইত্যাদি। তদুত্তরে আর একজন বলিল, "আমাদের পয়গম্বর সা'ব খোদার দোস্তজী ; দোস্তের নাতী কি খোদার নাতী হয় না?"

কালার মা বুড়ী বলিল, "দেখ পড়া-বউ, এই জন্যই এতদিন তোমার লগে আমরা কথা কই নাই। কালার বাপ আগেই আমাকে বলেছিল, পড়া বউ ইংরাজী পড়েছে, তার লগে কথা কইলে ঈমান নষ্ট হবে। বিবী ফাতেমা তানার বাপের দোস্তের কাছ থেকে মহর্‌রমের দশটা দিন চাহিয়া লইয়াছেন যে "তাউই সা'ব। বছরের সবদিন আপনার থাকুক, কেবল মহর্‌রম মাসের দশটা দিন আমাকে দেন।" আমাদের পীর সা'ব বলিয়াছেন যে, কোরান শরীফের মানে পড়িলে বা মানে বুঝিতে চাইলে বে-আদবী হয়, আর ঈমান যায়। আর তুমি পড়া বউ, এসময় কলেমার মানে বলিয়া দিয়া আমাদের সকলের ঈমানের মাথা খাইলে। তুমি দুই পাতা ইংরাজী পড়িয়াছ, কিন্তু দীন-এসলামের কথা কাঁচকলা কিছুই শিখ নাই। আমি তোমাকে বলি, আজ থেকে তওবা কর, পীর সা'বের কাছে মুরিদ হও,— আর কখনও ইংরাজী পড়িও না,—কোরান শরীফের তরজমা পড়িও না!"

সালেহা দেখিল, তাহার শ্বশুরের মধ্য-ইংরাজী বালিকা-স্কুলের আশা একেবারে আকাশ-কুসুম। সেলাই প্রভৃতি হাতের কাজে পাড়ায় "ধর্ম্মপরায়ণা" স্ত্রীলোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় কি না, এখন সেইরূপ চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক। সে পাড়ার অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক ও বালিকাদের দেখাইয়া দেখাইয়া নিজে সেলাই করিতে বসিত। স্বহস্তে ব্লাউস, পেটিকোট ইত্যাদি কাটিয়া সেলাই করিত। তাহারা স্থিরভাবে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিত, আর পরস্পরে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি সব বলাবলি করিত। একবার একজন সাহস করিয়া বলিল,—

"আচ্ছা পড়া বউ, তুমি থান কা থান আনাম কাপড় কাটিয়া টুকরা টুকরা কর, আবার সেই টুকরাগুলি জোড়া দাও,— ইহাতে লাভটা কি? আনাম কাপড় কাটই-বা কেন , আবার জোড়াই বা দাও কেন?"

সালেহা তাহাদের বলিল, "তোমরা আগলা গায়ে থাক, ইহা লজ্জার কথা ; শ্যাড়ীর সঙ্গে অন্ততঃ শেমিজ পরা দরকার। তোমরা কাপড় আনিলে আমি ছাঁটকাট ও সেলাই করা শিখাইয়া দিব।"

দুই চারি দিন পরে কয়েকজন ভাল মানুষের বউ-ঝি কয়েকটা ব্লাউস, পেটিকোট , ফ্রক ইত্যাদি আনিয়া সালেহাকে দেখাইয়া বলিল,—"বাপজী বলে, এসব তৈয়ারী জামা পোষাক ত হাটেই কিনতে পাওয়া যায়, তবে এত মেহনত করিয়া সেলাই করার দরকার কি? পড়া বউয়ে জানে না যে এসব পোষাক হাটে পাওয়া যায়।" সালেহা নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল, ইহাদিগকে পথে আনিবার কোনই উপায় নাই। আর মধ্য ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়,— তাহা আপাততঃ স্বপ্নই রহিয়া গেল।

একদিন সালেহার শাশুড়ী একটা সুজনী সেলাই করিতেছিলেন। তিনি কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেলে সালেহা সেই কাঁথা সেলাই করিতে বসিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, নিজের সময় যাপন করা এবং শাশুড়ীর কাজে সাহায্য করা,—বুড়ো মানুষ কষ্ট করিয়া সূচে সূতা পরান, তাই সে সুজনী সেলাই করিতে বসিল। কিয়ৎকাল পরে সে মাথা তুলিয়া দেখে,—পাড়ার স্ত্রীলোকেরা দলে দলে আসিয়া তাহার কাঁথা সেলাই দেখিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতেছে। একে অপরকে বলিতেছে,—"দ্যাখ্ বু! পড়া বউ-এর গুণ আছে—কাঁথা সেলাই করিতে জানে!"

অপরে বলে, "তাইতো এ গুণের কথা আমরা জানতাম না ; আমরা বলি, কলিকাতার জজ ম্যাজিষ্টারের ম্যায়া—সে আবার কি জানবো—আরে আয়, আয়! দ্যাখ্ আইস্যা! পড়া বউ কাঁথা সেলাই করতে জানে!" সকলের দৌড়াদৌড়ি দেখিয়া এবং গোলমাল শুনিয়া সালেহার শাশুড়ী কোন বিপদের আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি তথায় আসিলেন। ব্যাপার দেখিয়া তিনি আনন্দে ও গর্ব্বে স্ফীত হইয়া বলিলেন, "—জানবো না? সেলাই করে মেডাল পাইছে? তোমরা সব্বাই বলতে, আমার বউ কাঁচকলা কিছুই জানে না,— এখন দেখলে তো? কি সুন্দর চিকন সেলাই! আমার চাইতেও ভাল!"

ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম

মাননীয় সভাপতি এবং সভ্য মহোদয়গণ!

আমি সর্ব্বদা আপনাদের এই স্কুলের বিষয় নিয়ে বিরক্ত ক'রে থাকি। এমনকি, অনেকে আমাকে এজন্য একটা nuisance বিশেষ মনে করেন। আমি যদি পৌত্তলিক হতুম, আর আমার কোন দেবতা থাকতেন, তবে তিনিও নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে বলতেন,—"প্রার্থনার সময়ে 'ধনং দেহি, মানং দেহি'এ সব কিছু না বলে এ মেয়েটা কেবল একঘেয়ে—'স্কুলের জন্য গৃহং দেহি স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি দেহি' বলে। দাও বেটীকে লাথি মেরে তাড়িয়ে!"

আজ আমি আপনাদের নিকট খানিকটা সময় ভিক্ষা চাই যে, আপনারা দয়া করে ধৈর্য্যের সহিত আমার দু'টি কথা শুনুন।

আপনারা সকলেই জানেন যে, এই "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল"টা না থাকলে আমি মরে যাব না। এমনটি নিশ্চয় হবে না যে—

"ঘুঘু চরবে আমার বাড়ী,
উনুনে উঠবে না হাঁড়ী,
বৈদ্যেতে পাবে না নাড়ী—
অন্তিম দশায় খাবি খাব !"

এই স্কুলটা না থাকলে আমার তিলমাত্র ক্ষতি নাই। তবে এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই?—চাই, নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয় ; চাই স্বামীর স্মৃতি-রক্ষার জন্য নয় ; চাই, বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য। "সাখাওয়াত মেরোরিয়াল' শব্দ দু'টির জন্য যদি স্কুলের অকল্যাণ হয়, তবে সাইন-বোর্ড থেকে ও শব্দ দু'টি মুছে ফেলা যাক। অবশ্য মুসলিম সমাজটাও টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার নিজের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, কারণ, আমার কোন বংশধর নাই যে, তাদের ভাবী দুর্দ্দশার আশঙ্কায় আমি শঙ্কিত হব, কিম্বা তাদের দুষ্ক্রিয়া দেখে আমি লজ্জিত হব। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন, এই স্কুল সম্বন্ধে মাথা-ব্যথায় আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই। যাঁদের বংশধর আছে, যাঁদের ভবিষ্যৎ আছে, তাঁরা যদি সমাজটাকে রক্ষা করতে চান, তবে সমাজের মাতৃস্থানীয়া এই বালিকা স্কুলটাকে একটা আদর্শ বিদ্যালয়-রূপে গঠিত করুন।

একবার ইতিহাসের পাতা উল্‌টিয়ে দেখুন—এমন একদিন এসেছিল, যখন বাঙ্গালী হিন্দুর আঁধার ঘরে জ্ঞানের আলোক এসে উঁকি মারলে, তখন তাঁরা চোখ খুললেন ; পরে পাখীর কলরব শুনে বুঝতে পারলেন, "আর রাত্রি নাই ভোর হইয়াছে' তখন তাঁরা অলস-শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু হিন্দু উঠে যাবেন কোথায়? —এটা করলে জাতি যায়, সেটা খেলে জাতি যায় ; সুতরাং তখন তাঁরা দলে-দলে খ্রিস্টান হতে আরম্ভ করলেন,--ক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায় নাম বদলে "ব্যানার্জ্জী" হলেন, আর সরকার হলেন, "সিরকা"! সেই ঘোর সঙ্কটের সময়ে রাজা রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি সমাজ-হিতৈষী লোকেরা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রবর্ত্তন ক'রে হিন্দুকে সবংশে খ্রীস্টান হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। তখন তাঁদের নিজের স্কুল, কলেজ হ'ল, —তাঁদের ছেলেমেয়েরা আর খ্রীস্টানের স্কুলে পড়তে যায় না। তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রক্ষা পেলেন।

অপর দিকে মোসলেম সমাজ যখন "ঝোঁপড়ী মে শুয়ে মহলের খাব" দেখছিলেন, সেই সময়ে আলোক এসে মোসলেমের ঝোঁপড়ীর ভাঙ্গা চালের ভিতরও উঁকি মারলে। তখন তাঁরা আর কেবল 'পন্দেনামা' আর "শাহনামা" পাঠ করেই তৃপ্ত থাকতে পারলেন না, —তাঁরা ছুটলেন হিন্দু আর খ্রীস্টানের স্কুলে। তাঁরা কিন্তু নিজেদের জন্য স্কুল কলেজ কিছুই করলেন না। তাঁরা খ্রীস্টানের কলেজের লেখা-পড়া শিখে দিব্যি সাহেব হয়ে গেলেন, —বলেন বিলাতি বুলি ; চাকরকে বলেন বেহারা, আর মুটেকে বলেন কুলী !

তখন পর্য্যন্ত মোসলেম সমাজের তত বেশি অপকার হয় নাই; কারণ বাপ ক্লাবে গিয়ে চা খান, না চুরুট খান, ছেলে-মেয়েরা ত দেখতে পেত না,— তারা বাড়ীতে নামাজী মুসুল্লী মা'কে সর্ব্বক্ষণ দেখ্‌ত,—সেই আদর্শে তারা খেলা করত, নামাজ নামাজ খেলা; আর পূর্ব্ব, দক্ষিণ যে কোন দিকে মুখ করে আজানের অনুকরণে "আল্লাহু আকবর বলে আজান দিত।

ক্রমে শিক্ষিত বাপ মেয়েকে আর শুধু "রাহে-নাজাত" এবং "সোনাভান" পুঁথি পড়িয়ে ক্ষান্ত থাকতে পারলেন না,—তাই তাঁরা মেয়েদের দিলেন Convent এবং হিন্দু স্কুলে পড়তে। Convent-এ পড়তে গিয়ে লয়লার নাম বদলে হল "লিলী" আর জয়নব হল "জেনী'।' হিন্দু স্কুলে গিয়ে আয়শার নাম হল "আশা", আর কুলসুম হয়ে গেল "কুসুম"! ঐ পর্য্যন্ত হয়ে থামলেও ক্ষতি ছিল না, আমাদের অধঃপতনের ঐখানেই শেষ নয়।

পরবর্ত্তী যুগে জেনীর ছেলে-মেয়ে মানুষ করবার জন্য দরকার হল খ্রীস্টান আয়ার, যাতে ছেলেমেয়েরা শৈশব থেকেই ইংরাজী কথা বলতে শিখে। আর তার মেয়ের নাম হল "বারবারা আরীফ" এখন বারবার ঘরে ত আর মা'কে নামাজ পড়তে দেখে না; সুতরাং তার খেলার আদর্শ হল গীর্জ্জা। আর Convent থেকে গান শিখে বাড়ীতে এসে গায়:

"Jesus saves me this I know,
For the Bible tells me so--"

কিম্বা:

"মুসলমান বে-ইমান,
মারো জুতা, পাক্‌ড়ো কান!"

অপরদিকে আমাদের কুসুমের মেয়ের নাম হয়েছে "সৌদামিনী বেগম"! সৌদামিনীর খেলার আদর্শ হয়েছে পূজা, আর মাটি দিয়ে ঠাকুর গড়া। আর সে গান করে:

"যমুনার মাটি অঙ্গেতে লেপিয়া
হরি নাম লিখ তায়;
সব সখী মিলে বল হরি হরি
যখন পরাণ যায়।"

অথবা:

"নেড়ে মুসলমান,—
তার না আছে ধন, না আছে মান।"

সেদিন Bengal Women's Educational Conference উপলক্ষে জনৈক উচ্চশিক্ষিতা "মুসলমান ব্রাহ্ম" মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি স্পষ্টই বললেন যে, যেহেতু তাঁর বাল্যকাল মুসলমান সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাই তাঁর বাবা ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়ে গিয়ে তাঁকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা যেভাবে হয়েছে তাতে তিনি কোরআন হাদীস আলোচনা করবার সুযোগ পান নাই। সুতরাং তিনি নিজেকে মোসলেম সমাজের উপযোগী করতে পারেন নাই।

ঐরূপ একটি সুশিক্ষিতা মহিলাকে তাঁর পিতামাতা এবং ভ্রাতাসহ মোসলেম সমাজ খরচের খাতায় লিখে বাধ্য হল। স্ত্রী-শিক্ষা অভাবে আমাদের খরচের খাতা নানা প্রকারের

খরচ লিখতে লিখতে ক্রমশঃ ভারি হয়ে চলেছে। আমাদের সমাজের খরচের খাতা কিরূপ বেড়ে যাচ্ছে, তার একটু আভাস দিচ্ছি। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, কোন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম যুবক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন যে গ্রাজুয়েট পাত্রী না পেলে তাঁরা বিয়ে কর্‌বেন না ; মোসলেম সমাজে যদি একান্তই গ্রাজুয়েট মেয়ে না পাওয়া যায় তবে তাঁরা খ্রীস্টান হয়ে যাবেন।

কেউ আবদার ক'রে কাঁদেন যে, "মা আমাকে একটা নিরক্ষর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন ; এখন তিনিই বউ নিয়ে থাকুন—ও কাঠের পুতুল নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না।" কোন ভদ্রলোক বায়না ধরেছেন যে, আই. এ. পাশ পাত্রী চাই। কেউ চান অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাশ ; তা না হ'লে তাঁরা খ্রীস্টান বা ব্রাহ্ম হয়ে যাবে। এ সব বিকৃত রুচির প্রধান কারণ, —বর্ত্তমান ধর্ম্মহীন শিক্ষা। এলাহাবাদের কবি আকবর সাহেব বেশ বলেছেন,—

"তিফিল মেঁ আয়ে কেয়া মাঁ বাপ কে আত্ওয়ার কী?—
দুধ তো ডিব্বে কা হায়, —তা'লীম হায় সরকার কী!"

উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রলোকের ঘরে এখন "এম. এ. পাশ" বউ না হলে আলো হয় না। কিন্তু এজন্য সে বেচারাদের গালাগালি না দিয়ে বরং যাতে তাঁরা আমাদের হাত-ছাড়া না হন, তারই ব্যবস্থা করতে হবে।

আমার আরও জানা আছে যে, অনেক বিকৃত-মস্তিক ধর্ম্মহীন লোক উপযুক্তা বিদূষী ভার্য্যার হাতে প'ড়ে শুধরে গিয়ে চমৎকার পাকা মুসুল্লী হ'য়েছেন।

এই বিংশ শতাব্দীতে যৎকালে অন্যান্য জাতি নিজেদের প্রাচীন প্রথাকে নানা রকমে সংস্কৃত, সংশোধিত ও সুমার্জ্জিত ক'রে আঁকড়ে ধরে আছেন ; আমাদেরই উত্তরাধিকার, "তালাক"' "খোলা" প্রভৃতি সামাজিক প্রথা নিজেদের মধ্যে সংযোগ করে "পিতার সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার বিল", "পত্নী-ত্যাগ বিল", "পতি-ত্যাগ বিল" ইত্যাদি নানা রকমের বিল পাশ করিয়ে নিবার চেষ্টা করছেন, তৎকালে আমরা নিজেদের অতি সুন্দর ধর্ম্ম, অতি সুন্দর সামাজিক আচার-প্রথা বিসর্জ্জন দিয়ে এক অদ্ভুত জানোয়ার সাজতে বসেছি। "সুরেন্দ্র সলিমুল্লা, স্যামুয়েল খাঁ" গোছের নাম শুনতে কেমন লাগ্‌বে?

ফল কথা, উপরোক্ত দুরবস্থার একমাত্র ঔষধ—একটি আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়, —যেখানে আমাদের মেয়েরা আধুনিক জগতের অন্যান্য সম্প্রদায় এবং প্রদেশের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলবার মত উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যান্য সুসভ্য সম্প্রদায়ের এবং এই ভারতবর্ষেরই অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান মেয়েরা ডাক্তার, ব্যারিস্টার, কাঁউন্সিলার এবং গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্য হচ্ছে, আমাদের মেয়েরা কোন পাপে ঐ সব সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত থাকবে? আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়ে আদর্শ মোসলেম নারী গঠিতা হবে, —যাদের সন্তান-সন্ততি হবে হজরত ওমর ফারুক, হজরত ফাতেমা জোহরার মত। এর জন্য কোরআন শরীফ শিক্ষার বহুল বিস্তার দরকার। কোরআন শরীফ, অর্থাৎ তার উর্দ্দু এবং বাংলা অনুবাদের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক।

ছেলে-বেলায় আমি মা'র মুখে শুনতুম,—"কোরআন শরীফ ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করবে।" সে কথা অতি সত্য। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, খুব বড় আকারের সুন্দর জেল্‌দ বাঁধা কোরআন খানা আমার পিঠে ঢালের মত ক'রে বেঁধে নিতে হবে। বরং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই বুঝি যে, কোরআন শরীফের সার্ব্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানাপ্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কোরআন শরীফের বিধান অনুযায়ী ধর্ম্ম-কর্ম্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।

হজ্বের ময়দানে

[৯ই জিলহজ্ব]

অদ্য পবিত্র হজ্বের দিন। এই তীর্থযাত্রা মুসলমানদের ধর্ম্মের চারি অঙ্গের একটি অঙ্গ। প্রথম অঙ্গ নামাজ, দ্বিতীয় রোজা, তৃতীয় জাকাত এবং চতুর্থ হজ্ব।

প্রত্যেক বয়োঃপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান মুসলমানের জন্য অন্ততঃ জীবনে একবার হজ্ব ব্রত পালন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। পরিষ্কার বস্ত্র, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন শরীর, সর্ব্বোপরি ভক্তিপূর্ণ বিশুদ্ধ মন, পবিত্র প্রাণ লইয়া হজ্ব করিতে হয়। যাত্রার পূর্ব্বে সমস্ত দেনা-পাওয়া চুকাইয়া, স্ত্রী-পরিজন বা অপর পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হয়। পাথেয় অবশ্যই সঙ্গে থাকা চাই। উপরন্তু অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা কিম্বা বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত হাতে কিছু অতিরিক্ত টাকাও থাকা চাই। মক্কা শরীফে গিয়া যেন পরের দ্বারস্থ বা গলগ্রহ হইতে না হয়। এক কথায়, পার্থিব সমস্ত বিষয় হইতে অবসর লইয়া আল্লাহর দরবারে ধন, মন, তন্‌, প্রাণ উৎসর্গ করিতে হয়।

"ওমরাহ্'কে সাধারণতঃ ছোট হজ্ব বলা হয়। হজ্‌ও "ওমরাহ্"তে অতি সামান্য পার্থক্য আছে। "ওমরাহ্" সকল সময়ই পালন করা যায়, কিন্তু হজ্ব বৎসরে একবার মাত্র জিলহজ্ব চন্দ্রের ৯ই তারিখে সম্পন্ন করিতে হয়।

৯ই জিলহজ্বের দিন এই হজ্বব্রত পালন করা হয়, এবং যাত্রিগণের ৭ই তারিখের পূর্ব্বেই মক্কা-শরীফ পৌঁছা কর্ত্তব্য। হজ্বের সময় কি কি বিধান পালন করা কর্ত্তব্য, তাহা সেখানে গেলে তথাকার "মু'-অল্লিম"দের নিকট সহজেই শিক্ষা করা যায়।

প্রধান ক্রিয়া "আরকান" সমূহ মোটামুটি এই :

১। ইহ্‌রাম বাঁধা। এ সময় সমস্ত পোশাক খুলিয়া বিনা সেলাইয়ের দুই খণ্ড শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতে হয় ও সমস্ত মস্তক অনাবৃত রাখিতে হয়।

২। তওয়াফ, অর্থাৎ কা'বা ঘরের চতুর্দ্দিক সাতবার প্রদক্ষিণ করা।

৩। সা'ঈ, অর্থাৎ "সাফা" এবং "মারওয়া" নামক দুইটি ছোট পাহাড়ের উপত্যকায় সাত বার দৌড়ান।

৪। আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

ইহাতে দেখা যায় যে, ইহ্রাম সমস্ত নরনারীকে তুল্য অবস্থায় রাখে—পুরুষ ও নারীর স্থান সমান। সকলেই সেলাইবিহীন সাদাসিদে কাপড় পরে এবং সকলেই আড়ম্বরশূন্য সাধারণভাবে সাধু জীবনযাপন করে। ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মূর্খ, স্বদেশী বিদেশী সকলে এক সাম্য-মন্দিরে অবস্থান করে। এই দিন এই স্থানে রাজা, বাদশাহ্ আর নগণ্য কৃষকে কোন প্রভেদ থাকে না। ইহ্রামে পুরুষ ও নারীর স্থান সমান। সেখানে পদ ও বর্ণ, সম্পদ ও জাতি, রাজা ও প্রজায় কোনই প্রভেদ নাই। স্রষ্টার সম্মুখে সকল মানবজাতি, সেখানে একই আকার ধারণ করিয়া আছে। সেই কারণে 'আরাফাত' নামক আশ্চর্য মরুভূমিতে সমগ্র মানবজাতির সাম্যই সুন্দর ও মহৎ দৃশ্য। আরাফাতেই মানুষ সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকৃত পরিচয় পাইতে সক্ষম হয়।

সমগ্র পৃথিবীর আর কোনও স্থানে এরূপ সাম্য ও ভ্রাতৃভাব পরিলক্ষিত হয় না। তীর্থযাত্রীর অবস্থা, তীর্থযাত্রার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ, পরিভ্রমণ ইত্যাদিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভক্তবৃন্দ আল্লাহ্‌তা'আলার প্রেমে অনুপ্রাণিত।

নির্ব্বিকার ও সত্যকার "ঈশ্বর-প্রেম" এই স্থানেই বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। উপাসকের হৃদয়ে প্রেমবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে ; নিজের শরীর তাহার নিকট অবহেলার বস্তু। নিজের মন-প্রাণ আল্লাহ্‌র দরবারে বিসর্জ্জন দেওয়াতেই তাহার পরম আনন্দ। প্রকৃত প্রেমিকের ন্যায় সে বাঞ্ছিতজনের গৃহের চারিপাশ দ্রুতপদে প্রদক্ষিণ করে এবং দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ, সে নিজের সত্তা পারমার্থিক সত্তার মধ্যে বিলাইয়া দিয়া নিজের সকল স্বার্থ ভুলিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পরমাত্মার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত করিয়াছে।

তীর্থযাত্রী পার্থিব সকল যোগাযোগ ছিন্ন করিয়াছে, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তাহার আর কোন আকর্ষণ নাই। তীর্থভ্রমণই (অর্থাৎ হজ্ব) আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম উৎকর্ষ। তীর্থযাত্রী (হাজী) তাহার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পৃথিবীর নিকট প্রচার করিয়াছে যে, মানবতার চরম সার্থকতা লাভ করিতে হইলে পার্থিব যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া পরমাত্মার সহিত প্রকৃত সংযোগ রাখিতে হইবে।

"আরাফাত" প্রান্তরের এই দৃশ্য যে একবার দেখিয়াছে, সে মজিয়াছে। সেখানকার জলবায়ু এমনই আল্লাহ্-প্রেমের মদিরায় পরিপূর্ণ যে, সেখানে অবস্থান-কালে মানুষের বাহ্যিক জ্ঞান থাকে না ; তাহার একমাত্র কাম্য হয়, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ। তাহার শিরায়-শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রেমের বিদ্যুৎ চলাচল করে। তাহার মনোগত ভাব এই হয় —

"কি যেন স্বপনে হারাই আপনে,
মনেই থাকে না এ যে ধরাতল।"

এই অবস্থায় হাজীর মনের ভাব অতি নির্ম্মল ও পবিত্র হয়। কোন একটা বটতলার পুঁথিতে দেখিয়াছে, বেহেশ্‌ত-বাসীদের মধ্যে কোন কোন পুণ্যাত্মা একবার আল্লাহ্‌র দর্শন পাইবেন, সে সময় আর তাঁহারা বেহেশ্‌তে ফিরিয়া যাইতে চাহিবেন না, মিনতি করিয়া বলিবেন, —

বেহেশ্‌তে না যাব মোরা, মেওয়া না খাইব,
দেখিয়া তোমার রূপ এইখানে র'ব।

আরাফাতের প্রান্তরে দাঁড়াইয়াও হয়ত লোকের মনের ভাব এই প্রকার হয়। অন্তরের অন্তর হইতে সুর বাজে—

"নাহি চাহি ধন-জন-মান—
নাহি, প্রভু ! অন্য কাম !

আহা ! এ ময়দান ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না !"

হজ সমাপনান্তে কোরবানীর পালা। কোরবানী বলিতে হাজীগণ পশু হত্যা করেন বটে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা মনের সমস্ত কলুষ, হিংসা, দ্বেষ, লোভ, দুষ্ক্রিয়ার কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতি অন্তরের যাবতীয় কালিমা হত্যা করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করেন।

হজ্বের সময় নরনারীর তুল্য অধিকার। উভয়ের পরিধেয় একই প্রকার সেলাইবিহীন দুই খণ্ড বস্ত্র মাত্র। এখানে জরীর লেস্ ঢাকা নূতন ফ্যাসানের বোরকা নাই, ঘেরা-টোপ ঢাকা পাল্কীও নাই। শরীফজাদী বিবিদিগকে পদব্রজেই সাফা এবং মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপত্যকায় দৌড়াইতে হইবে ; কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। এ সময় পুরুষদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি ও ঠেলাঠেলি অনিবার্য্য।

ভারতীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা হজ্বের জন্য আলাদা "পর্দ্দানশীন" দিবস প্রচলন করেন না কেন? কলিকাতায় যেমন প্রদর্শনী ইত্যাদিতে অবরোধ-বন্দিনীদের জন্য একটি বিশেষ দিন ধার্য্য করা হয়, ভারতীয় শরীফগণ সেইরূপ নারীর জন্য হজ্বের স্বতন্ত্র দিন ধার্য্য করিতে পারিলে বুঝিব, তাঁহারা মরদ বটে।

পরিশেষে ভক্তির সহিত এই প্রার্থনা করি, যেন সকল মুসলিম নরনারী জীবনে একবার হজ্বের প্রান্তর দেখিতে পায়। —আমীন !

বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল

(সফল স্বপ্ন)

সে বহুদিনের কথা (১৯০৫ খ্রীঃ)। তখন আমরা ভাগলপুরের বাঁকা নামক সব-ডিভিশনে ছিলাম। মরহুম ডেপুটি সাহেব (আমার পূজনীয় স্বামী) "টুর"-এ গিয়াছিলেন ; আমি বাসায় সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম। সময় যাপনের নিমিত্ত কিছু একটা লিখিলাম। তিনি দুইদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দুই দিন আমি কি করিতেছিলাম ! তদুত্তরে আমি তাঁহাকে খসড়া লেখা, "Sultama's Dream" দেখাইলাম। তিনি দাঁড়াইয়াই সমস্ত পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ---"A Terrible Revenge." (ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ !) অতঃপর তিনি সেই রচনাটা ভাগলপুরের তদানীন্তন কমিশনার মিঃ ম্যাক্ফারসনের নিকট সংশোধনের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন।

যথাসময় লেখাটা মিঃ ম্যাকফারসনের নিকট হইতে ফেরৎ আসিলে দেখা গেল, তিনি কোথাও কলমের আঁচড় দেন নাই। তিনি সেই সঙ্গে ডেপুটি সাহেবকে যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন,

"The ideas expressed in it are quite delightful and full of originality and they are written in perfect English.··· I wonder if she has foretold here the manner in which we may be able to move about in the air at some future time. Her suggestions on this point are most ingenious."

ভাবার্থ —

"ইহাতে যে ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাঁহা অত্যন্ত আনন্দপ্রদ এবং অপূর্ব্ব। রচনার ইংরাজীও নিখুঁত। ... আমি সবিস্ময়ে মনে করি, সুদূর ভবিষ্যতে আমরা বায়ু-পথে কিরূপে ভ্রমণ করিব এখানে লেখিকা তাহারাই আভাস দিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার কল্পনা অতি মনোরম।"

যে সময় আমি "সুলতানার স্বপ্ন" লিখিয়াছিলাম, তখন এরোপ্লেন বা জেপেলিনের অস্তিত্ব ছিল না ; এমনকি সে-সময় ভারতবর্ষে মোটরকারও আইসে নাই। বৈদ্যুতিক আলোক এবং পাখাও কল্পনার অতীত ছিল। অন্ততঃ আমি তখন সে সব কিছুই দেখি নাই।

প্রায় ছয় বৎসর পরে (১৯১১ খ্রীঃ) কলিকাতায় আসিয়া প্রথম হাওয়াই জাহাজ অতি দূর হইতে শূন্যে উড়িতে দেখিলাম। আমি নিজে কখনও উড়ো জাহাজে উঠিতে পাইব, এরূপ আশা কখনই করি নাই। শুধু নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতাম।

গত ৩১শে নভেম্বর (১৯৩০ খ্রীঃ) রবিবার সন্ধ্যার পর যখন শ্রীমান মোরাদ আসিয়া বলিলেন, "খালাআম্মা, চলুন, আগমী পরশু আমার প্লেনে আপনাকে উড়াইয়া আনি ; কলিকাতার চারিদিকে উড়িতে প্রায় ৩৫ মিনিট লাগিবে !" তখন আমার প্রাণ অভূতপূর্ব্ব আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

এ-শুভ সংবাদ বেশি লোককে জানাইলাম না দুই কারণে :—প্রথম কারণ এই যে, মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে, "আর ১০১" নামক সুবৃহৎ এরোপ্লেন ধ্বংস হওয়ায় ৪৫ জন হতভাগ্য আরোহী সশরীরে নরকানলে দগ্ধ হইয়াছে। তাহার বিভীষণ স্মৃতি লোকের মনে তখনও জাজ্জ্বল্যমান থাকায় সকলের মনে এরোপ্লেন সম্বন্ধে ভয়ানক আতঙ্ক আছে বলিয়া আমাকে লোকে উড়িতে বাধা দিবে। দ্বিতীয় কারণ, অনেকে ক্যামেরা লইয়া উপস্থিত থাকিবে আমার ফটো লইতে।

যথাকালে ২রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৪টার সময় আমরা শুভযাত্রা করিলাম। এক মোটরে মিসেস্ রাসাদ (শ্রীমান মোরাদের মাতা), তাঁহার তৃতীয় পুত্র ফোয়াদ, মিসেস্ দে এবং আমি ; অপর মোটরে আমার ভগিনী ও তাঁহার পুত্র কন্যা প্রমুখ ছিলেন। যাত্রার সময়ে দেখি, আমার এক স্নেহময়ী ভগিনী মিসেস্ দাউদর রহমান আসিয়া উপস্থিত। তিনিও আমাদের সঙ্গে দমদম চলিলেন।

এরোড্রামে গিয়া দেখি, একেবারে মুক্ত ময়দান ! কেবল আমাদের মোটর তিনটি এবং আমরাই ! আমি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিয়া বঙ্গের গৌরব প্রথম মুসলিম পাইলট শ্রীমান 'মোরাদের' 'প্লেনে, গিয়া বসিলাম। আকাশে উড়িয়া দেখি—ধরাখানা সত্যই সরা তুল্য। আমি ক্রমে ৩০০০ (তিন হাজার) ফিট উর্দ্ধে উঠিয়াছি। তখনকার দৃশ্য বড় চমৎকার। আমার দক্ষিণ দিকে অস্তগামী সূর্য্য, বাম দিকে ১১ই রজবের (দ্বাদশীর) পূর্ণ-প্রায় চন্দ্র,—উভয়ে যেন

আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতেছিল। নীচে চাহিয়া দেখি—কলিকাতার পাকা বাড়ীগুলি, কোঠা–বালাখানা, এমারত সব ইষ্টক–স্তূপের মত দেখাইতেছে,—হাবড়ার পুল কতটুকু খেলনা বিশেষ, আর হুগলী নদী,—সে ত জলাশয়ের সামান্য একটি রেখার মত দেখাইতেছিল। আমরা পঞ্চাশ মাইল চক্কর দিয়া নীচে আসিলাম। আমি নামিলে পর মিসেস্ রাসাদ মাত্র ৫ মিনিটের জন্য উড়িলেন। শোক্‌র আল্–হাম্‌দোলিল্লাহ্।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত "সুলতানার স্বপ্নে" বর্ণিত বায়ুযানে আমি সত্যই বেড়াইলাম। বঙ্গের প্রথম মুসলিম পাইলটের সহিত যে প্রথম অবরোধ–বন্দিনী নারী উড়িল সে আমিই। আমার পূর্ব্বে যে কয়জন বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা এরোপ্লেনে উঠিয়াছেন, তাঁহারা উড়িয়াছেন সুদক্ষ ইউরোপীয়ান পাইলটের সহিত। আর তাঁহাদের মাথায় হেলমেট, কানে টেলিফোন এবং চক্ষে গগল্‌স্ ছিল। আমার এ সব কিছুই ছিল না। আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও নিরুপায় অবস্থায় একটি বালকের সহিত গিয়াছিলাম। মধ্যপথে প্রয়োজন বোধ করিলে মোরাদের সহিত কথা বলিবার আমার কোনই উপায় ছিল না। শীতে কষ্ট হইবে না শুনিয়া গায়ের শালখানাও "মিসেস্" দের হাতে ফিরাইয়া দিলাম। প্লেনে বসিলে মোরাদ বলিলেন, "খালাআম্মা ! ভাল মতে কান ঢাকিবেন।" যাঃ। কান আর কি দিয়া ঢাকিব ? —শালটাও ত ফেলিয়া আসিলাম। সে সময় মাথার আঁচলখানাই ছিল একমাত্র সম্বল। ইঞ্জিনের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে যখন কানে তালা লাগিতেছিল, তখন বুঝিলাম, মোরাদ কেন কান ঢাকিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার আভ্যন্তরীণ আনন্দের আতিশয্যের তুলনায় সে কষ্ট অসহ্য হইলেও, নগণ্য বোধ হইল।

বিমান–বীর মোরাদের সৎসাহস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আল্লাহ্ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

কিন্তু আমি বলি, মিসেস্ রাসাদের ধৈর্য্য এবং সাহসও কম নয়। বেচারী অসহায়া বিধবা যে কত বড় পাষাণে বুক বাঁধিয়া প্রথম সন্তানটিকে সম্পূর্ণ একাকী কেপটাউন অভিমুখে রওনা হইতে দিয়াছিলেন এবং এখনও মোরাদকে একাকী বিলাতে যাইয়া প্লেনে কাজ শিখিতে দিয়াছেন তাহা ভাবিবার বিষয়। আল্লাহ্ তাঁহার সহায় হউন ! আমীন !

গুলিস্তাঁ

কোরান–শরিফে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন,—

"ফাঁদ খলিফি ইবাদী ওয়দ খুলিফি জান্নাতি"

অর্থাৎ—"অতএব আমার বাগানের মধ্যে আইস এবং আমার বাগানে প্রবেশ কর।"

মানবের চরম লক্ষ্য সেই গুলিস্তাঁ—যাহা আল্লাহ্ পুণ্যাত্মাদিগকে দান করিবেন—যেই গুলিস্তাঁয় প্রবেশ করিতে আল্লাহ্ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

আমরা তুচ্ছ মানব সামান্য লতা–পাতা লইয়া গুলিস্তাঁ রচনা করিয়া থাকি ; কারণ ফুলের মত সুন্দর, ফুলের মত নির্ম্মল এবং ফুলের মত পবিত্র জিনিষ জগতে আর কিছু নাই। কত কবি কত ছন্দে যে ফুলের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বাস্তবিকই ফুলের সুষমা, ফুলের সৌরভ এবং সৌন্দর্য্য মানুষকে যত আনন্দ দেয়, আত্মহারা করে, তেমন আর কিছুতে পারে না। এ জ্বালা-যন্ত্রণাময় জগতে যদি কিছু জুড়াইবার জিনিষ থাকে, তবে সে একমাত্র ফুলকেই বলা যায়।

সৃষ্টিকর্ত্তার কি অপার মহিমা! তিনি মাটী ও ধূলা হইতেই ফুল উৎপন্ন করিয়াছেন। ইহা হইতে এই শিক্ষা পাই যে, আমরা যতই পাপিষ্ঠ হই না কেন, অনুতপ্ত চিত্তে তওবা করিলে আমাদের সমস্ত কলুষ ধুইয়া-মুছিয়া যাইবে, আমাদের মন পবিত্র ফুলের মত হইবে। পাপ, পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই আমরা ফুল হইতে পারিব। ফুল হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন বস্তু পৃথিবীতে আছে কি? ফুল অমূল্য ধন। আমেরিকার একটী গোলাব ফুলের মূল্য সময় সময় ২৫০টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আমেরিকার লোক জানে ফুল কি জিনিষ। আমাদের দেশে প্রকৃতির দয়ায় ফুলের অভাব নাই; তবু গোলাবের মত সুন্দর ফুল বনে-জঙ্গলে হয় না।

ফুল না হলে আমাদের চলে না; জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শুভকর্ম্মে ফুল ব্যবহৃত হয়। নববধূকে ফুলের অলঙ্কার পরাই; ফুলদ্বারা বিবাহের মজলিস্ সাজাই। ফুল প্রিয়জনকে উপহার দেই। ফুল দ্বারা আর আর কত কি হয় তাহা বর্ণনাতীত। জীবনের শেষ ক্রিয়া শবাধার ফুল দ্বারাই সজ্জিত হয়। অতএব আমরা গুলের সৃষ্টিকর্ত্তাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে "গুলিস্তাঁ" পত্রিকাকে এস্তেকবাল্ করিতেছি।

কৌতুক-কণা

এক

প্রধান শিক্ষক ছাত্রদিগকে হিপোপটেমাস্ জন্তুর বিষয় বুঝাইবার সময় বলিলেন,—"হিপোপটেমাস্ কেমন কুৎসিত জন্তু তাহা যদি ভাল মতে বুঝিতে চাও, তবে আমার মুখের দিকে তাকাও।"

দুই

এক আফিংচি ছেলে কোলে লইয়া মেলায় গিয়াছিল; অনেকক্ষণ নানা দৃশ্য দেখার পর তাহার মনে হইল ছেলে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। বেচারা ছেলে খুঁজিয়া হয়রাণ। শেষে থানায় সংবাদ দিয়া বাড়ী ফিরিল। ঘরে প্রবেশের সময় কপাটের আঘাত লাগায় তাহার কোলের ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। তখন সে ছেলের গালে চড় মারিয়া বলিল—"কম্‌বখ্‌ৎ! আগে কাঁদিসনি কেন? তা' হ'লে আমার এত হয়রাণ হয়ে থানায় খবর দিতে হত না।"

তিন

হরিশবাবু চাকরের হাতে একটা চিঠি আর পাঁচটা পয়সা দিয়া বলিলেন যে, সে যেন টিকিট কিনিয়া চিঠিতে আঁটিয়া চিঠিখানা ডাকে দেয়। চাকর কিছুক্ষণ পরে আসিয়া হাসিমুখে পয়সা ফেরত দিয়া বলিল,—"নিন আপনার পয়সা। যেই দেখলুম ডাকবাবু মাথা নীচু করে লেখাপড়া

করছেন, আমি অম্‌নি চুপি চুপি চিঠিখানা ডাক-বাক্সে ফেলেই, দিয়েছি দৌড় ! দেখুন ত কি বুদ্ধি করে বিনি পয়সায় আপনার চিঠি ডাকে দিয়ে এলুম, তবু আপনি আমায় বোকা বলেন !"

চার

পাদ্রী সাহেব মিশন স্কুলের ছাত্রদিগকে পাঠ শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভবিষ্যতে তোমরা কে কি হতে চাও?" জনৈক ছাত্র বলিল,—"আমি কৃষক হব।" পাদ্রী সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বেশ ভাল কথা। তুমি মানবের ক্ষুধা নিবারণের উপায় করবে। লোকের পরম উপকার করবে।"

অপর একজন বলিল, "আমি শিক্ষক হব।" পাদ্রী সাহেব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"এ তো আরও ভাল ; তুমি মানবের মানসিক ক্ষুধা নিবারণ করবে। শারীরিক খাদ্যের চেয়ে মানসিক খাদ্যের মূল্য বেশী।"

তৃতীয় ছাত্র বলিল,—"আমি পাদ্রী হব।" এবার পাদ্রী সাহেব আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,—"বেশ, বেশ, তুমি মানবের পরিত্রাণের কারণ হবে। শারীরিক ও মানসিক খাদ্যের চেয়ে আধ্যাত্মিক খাদ্য আরও শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা বাপু ! বল ত তুমি কেন পাদ্রী হতে চাও?"

ছাত্র বলিল, "আমরা গরীব বলে মাংস খেতে পাই না। কিন্তু আপনি আমাদের বাড়ী যেদিন যান, সে-দিনই আমার মা মুর্গী রেঁধে আপনাকে খাওয়ান।"

পাঁচ

এক বাড়ীতে বিবাহ হইতেছিল। যে মোল্লা বিবাহের মন্ত্র পড়াইতে আসিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন তোতলা ; আর বর ছিল বধির। মোল্লা সাহেব বহু কষ্টে বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ব-ব-বল, বি-বি-বি-ই-ইঃ-ঈ-স্‌মিল্লাহ্‌—", বর জিজ্ঞাসা করিল, "অ্যাঁ?" মোল্লা ভারী বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিলেন, আমি এত কষ্ট করিয়া বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিলাম, ও হতভাগা তাহা শুনিতেই পাইল না !

ছয়

একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে ভূগোল পড়াইবার সময় দিক-নির্ণয় বুঝাইতেছিলেন। তিনি একটী ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখ, তোমার বাম হাত দক্ষিণ দিকে, ডান হাত উত্তরে, মুখ পশ্চিম দিকে, এখন বল ত তোমার পশ্চাতে কি আছে?" সে উত্তর দিল, "স্কুলে আসবার সময় মা আমার ছেঁড়া প্যাৎলুনে একটা তালি লাগিয়ে দিয়েছেন, তাই আছে।"

সাত

দুইটী ছোট বালিকা পুতুলের বিবাহ দিতেছিল। তাহাদের একজন বরের মা এবং একজন ক'নের মা সাজিয়াছিল। বিবাহের মন্ত্র পড়াইবার সময় মোল্লাজী বরের পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। বরের মা উত্তরে বলিয়া পাঠাইল যে, বল উহার মায়ের এখনও বিবাহ হয় নাই।

নারীর অধিকার

আমাদের ধর্ম্মমতে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় পাত্র-পাত্রীর সম্মতি দ্বারা। তাই খোদা না করুন, বিচ্ছেদ যদি আসে, তবে সেটা আসবে উভয়ের সম্মতিক্রমে। কিন্তু এটা কেন হয় এক-তরফা, অর্থাৎ শুধু স্বামী দ্বারা? অন্ততঃ এইটে তো প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে দেখা যায়। আমাদের উত্তর-বঙ্গে দেখেছি, গৃহস্থ শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বদা তালাক হয়, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে সামান্য অপরাধে পরিত্যাগ করে। মেয়েটির কোন ক্রটি হলেই স্বামী দম্ভভরে প্রচার করে, "আমি ওকে তালাক দেব, আজই দেব।" তারপর ঘরের ভিতর বসে কতকগুলি স্ত্রীলোক ঐ ভাগ্যহীনা মেয়েটিকে নিয়ে; সামনে বারান্দায় কিম্বা উঠানে বসে স্বামী নামক জীবটাকে নিয়ে কতকগুলি পুরুষ; এইসব লোকগুলির সামনে স্বামী লোকটি তিনবার উচ্চারণ করে উচ্চস্বরে:

"আয়েন তালাক, বায়েন তালাক,
তালাক তালাক, তিন তালাক
আজ জরুরে দিলাম তালাক।"

এই সময় পুরুষটিকে খুব প্রফুল্ল দেখা যায়। বোধ হয়, নূতন পত্নী লাভ হবে এই আনন্দে। কিন্তু মেয়েটি ভয়ানক কাঁদে। এর পর কোন বয়স্কা স্ত্রীলোক মেয়েটিকে ধরে তার কানের, নাকের, হাতের অলঙ্কারগুলি খুলে শাড়ীর আঁচলে বেঁধে দেয়। হাতের কাঁচের চুড়িগুলি এক টুক্‌রা ইট বা কাঠের সাহায্যে ভেঙ্গে দেয়, আর বলে, "দেন্-মোহর মাফ ক'রে দিয়ে যা।" মেয়েটি এই সময় ভয়ানক কাঁদে। বেচারী স্বামী হারিয়ে, সাজ-সজ্জা হারিয়ে, হাতে-গড়া সাধের পাতানো সংসার হারিয়ে রিক্ততার দুঃখ নিয়েই কাঁদে।

এর পরের দৃশ্য—পুরুষটি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে কোথাও বেড়াতে যায়। আর মেয়েটির বাপ, ভাই, চাচা বা মামু যে অভিভাবক-রূপে উপস্থিত থাকে (কারণ এইরূপ দু' একজনকে পূর্ব্বেই ডেকে আনা হয়) সেই অভিভাবক স্থানীয় লোকটি তখন ঐ ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে টেনেহিঁচড়ে পাল্কী কিম্বা গরুর গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।

বৃদ্ধ পুরুষদের বালিকা-বিবাহে কত আগ্রহ ও সাধ, সেই সম্বন্ধে উত্তর-বঙ্গে এই একটি ছড়া-ও প্রচলিত রয়েছে:

"হুকুর হুকুর কাশে বুড়া
হুকুর হুকুর কাশে।
নিকার নামে হাসে বুড়া
ফুকুর ফুকুর হাসে॥"

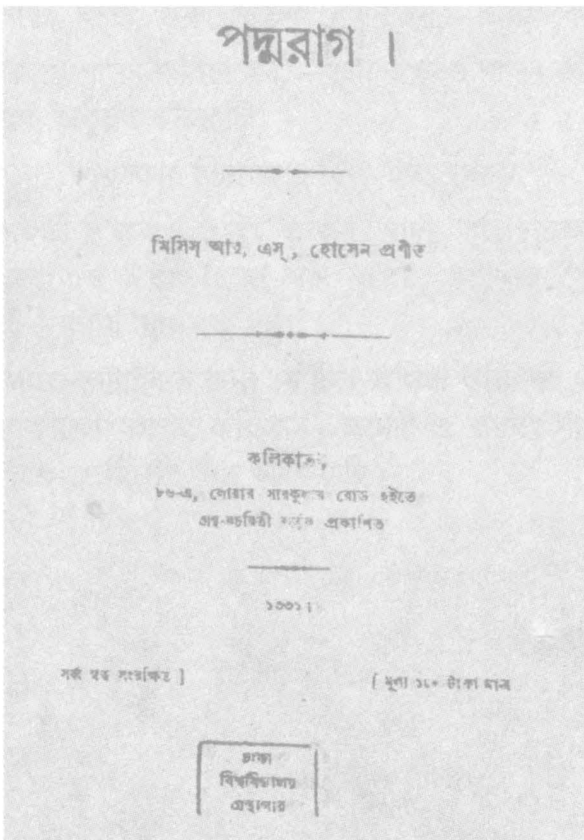

পদ্মরাগ।

মিসিস্ আর, এস্, হোসেন প্রণীত

কলিকাতা,

৮৬-এ, লোয়ার সারকুলার রোড হইতে

গ্রন্থ-রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩৩১।

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ১।০ টাকা মাত্র

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

পদ্মরাগ

উৎসর্গ-পত্র

এই গ্রন্থখানি
পরম স্নেহের দাদা আবোল আসাদ ইব্রাহিম সাবের
সাহেবের করকমলে সমর্পিত হইল।

দাদা !

আমি আশৈশব তোমার স্নেহ-সাগরে ডুবিয়া আছি। আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ। আমি জানি না, —পিতা, মাতা, গুরু, শিক্ষক কেমন হয়,—আমি কেবল তোমাকেই জানি।

জননী সময়ে সময়ে শাসন করিয়াছেন,—তুমি কখনও শাসন কর নাই। তাই মাতৃস্নেহের কোমলতাও তোমাতেই অনুভব করিয়াছি।

"পুরস্কার তিরস্কার হিত-ইচ্ছা থেকে,"—

সেরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী শিক্ষকও তুমিই আমার। দাদা, তুমি পুরস্কারই দিয়াছ, তিরস্কার কদাচ কর নাই। মধুতেও ঈষৎ তিক্ত স্বাদ আছে, তোমার স্নেহ কেবলই মিষ্ট,—ঐ তিক্তভাব-রহিত মধু—স্বর্গীয় 'কওসর'-তুল্য !

দাদা ! অলস সময় কাটাইবার জন্য যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি,—সে প্রথম চেষ্টার প্রথম কাব্য তোমারই চরণকমলে সমর্পণ করিলাম। আমার এ কাব্যে সামাজিক নিয়ম রক্ষা হয় নাই—আমি কেবল বিশ্ব-প্রেমিকের চিত্র আঁকিয়াছি।

তোমার আদরের ক্ষুদ্র ভগিনী,

রকু

নিবেদন

প্রায় ২২ বৎসর পূর্বের এই উপন্যাসখানি লিখিত হইয়াছিল। ইহার পাণ্ডুলিপি তদানীন্তন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পরলোকগত বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়,এম্-এ, বি-এল্ মহোদয়কে প্রদর্শন করা হইয়াছিল। তিনি তাহা পাঠ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অনেক স্থলে "Beautiful" এবং "Most beautiful" বলিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তাহা পরিষ্কার করিয়া পুনরায় লিখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে আমি এতদিন তাহা লিখিতে (revise করিতে) পারি নাই। এখন পুনর্লিপি করিতে অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। কেবল উৎসর্গপত্রখানি পূর্ব্ববৎ অবিকৃত রহিয়াছে।

আজি মনে পড়ে, আমার ভক্তিভাজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছিলেন ; সমস্ত গল্পটী মনে নাই, এইটুকু কেবল স্মরণ হয় :

এক জন ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি জনৈক দরবেশের নিকট যোগ শিক্ষা করিতে চাহিল। তাহাতে দরবেশ বলিলেন, "চল আমার গুরুর নিকট।" সে গুরু একজন হিন্দু। হিন্দু সাধু বলিলেন, "আমি কি শিখাইব, আমার গুরুর নিকট চল।" তাঁহার গুরু আবার একজন মুসলমান দরবেশ ! ! শিক্ষার্থী দরবেশকে এই হিন্দু-মুসলমানে মিশামিশির কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন :

ধর্ম্ম একটী ত্রিতল অট্টালিকার ন্যায়। নীচের তলে অনেক কামরা, হিন্দু-ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ইত্যাদি বিভিন্ন শাখা ; মুসলমান,—শিয়া, সুন্নী, হানাফী, সাফী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় ; ঐরূপ খ্রীষ্টান,—রোমান-কাথলিক, প্রোটেষ্টান্ট, ইত্যাদি। তাহার উপর দ্বিতলে দেখ, কেবল মুসলমান .— সবই মুসলমান ; হিন্দু,—সবই হিন্দু, ইত্যাদি। তাহার উপর ত্রিতলে উঠিয়ে দেখ, —একটী কক্ষ মাত্র, কামরা বিভাগ নাই, অর্থাৎ মুসলমান, হিন্দু কিছুই নাই— সকলে একপ্রকার মানুষ এবং উপাস্য কেবল এক আল্লাহ্। সূক্ষ্মভাবে ধরিতে গেলে কিছুই থাকে না। —সব 'নাই' হইয়া কেবল আল্লাহ্ থাকেন।

ইতিপূর্ব্বে 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের কোন অংশ কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই ; সুতরাং এবার পাঠকগণ বলিতে পারিবেন না যে ইহা 'পুরাতন জিনিষ ; অমুক কাগজে দেখিয়াছিলাম' !

ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু বিনয়ভূষণ সরকার বি-এ, বি-টি, মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক "পদ্মরাগে"র প্রুফ আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন এবং ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন, সে জন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

"পদ্মরাগে" আর যাহা কিছু ত্রুটি রহিল, তাহার কারণ লেখিকার বিদ্যাবুদ্ধির দৈন্য। আশা করি, গুণগ্রাহী পাঠক ও পাঠিকাগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীতা

গ্রন্থকর্ত্রী

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিরুদ্দেশ যাত্রা

নৈহাটী ষ্টেশনে রাত্রি ১১টার সময় যখন ট্রেণ থামিল, তখন ইংরাজী পোষাকে সজ্জিত একজন আরোহী সেকেণ্ড ক্লাস হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি জনতায় না মিশিয়া পাশ কাটিয়া বিশ্রামাগারের (ওয়েটিংরূমের) নিকট গেলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া ষ্টেশনের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন তিনি এরূপ স্থান বা ষ্টেশন-ঘর ও এমন জনতা পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। তাই বিস্ময়পূর্ণ নয়নে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

হুগলী হইয়া কলিকাতায় যাইতে হইলে এইখানে ট্রেণ বদল করিতে হয়। ঘাট-গাড়ী আসিতে কিছু বিলম্ব ছিল। ইত্যবসরে উক্ত আরোহী ষ্টেশনের অপর পার্শ্বে আসিয়া পড়িলেন। কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা গাড়ী সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই গাড়ীর ছায়ায় ঈষৎ অন্ধকারে আসিয়া তিনি পদচারণা করিতে লাগিলেন। অদূরে পাদপশ্রেণী, পরিষ্কার দুর্ব্বাক্ষেত্র—সকলেই যেন শারদীয় চন্দ্রকরে স্নান করিতেছিল ! কিন্তু আমাদের পথিক এসব দেখিতেছিলেন না। তাঁহার বয়স অনুমান ১৮/১৯ বৎসর হইবে ; মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ, গভীর বিষাদপূর্ণ অথচ কোমলতাময়। মনে হয়, তাঁহার হৃদয়খানি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহে ; পদচারণা করিতেছেন বটে, কিন্তু চরণ যেন অচল।

তিনি ত গভীর চিন্তা-সাগরে মগ্ন ছিলেন। এদিকে ট্রেণ আসিল ও ছাড়িল। ক্রমে ল্যাম্পগুলি একটি দুইটী করিয়া নির্ব্বাপিত হইল,—তিনি এসব কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় সহসা জাগিয়া উঠিয়া ষ্টেশনের জনৈক কর্ম্মচারীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ট্রেণ ছাড়িতে কত দেরী?" উত্তর পাইলেন, অনেকক্ষণ হইল ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে ; ঘাট-গাড়ী রাত্রে আর ছাড়িবে না। তিনি যেন বজ্রাহত হইলেন,—দশ দিক অন্ধকার দেখিলেন এবং নীরবে তথা হইতে সরিয়া গেলেন।

কলিকাতায় যাইতেছিলেন, যাওয়া হইল না। এইখানে রাত্রিযাপন করিতে হইবে। ভাবিতেছিলেন, "তবে কি করি? কোথায় যাই? কলিকাতায় যাইয়াই বা কি করিব? সেখানেই বা কাহাকে চিনি? কাহার নিকটই বা কি বলিয়া দাঁড়াইব?"

একথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, হুগলী হইয়া কলিকাতায় যাওয়া কেন? নৈহাটী হইতে ত সোজাসুজি কলিকাতায় যাওয়া যায়। অবশ্য ইহার কিছু কারণ আছে। এ যুবক কোন বিপদে পড়িয়া ছদ্মবেশী হইয়াছেন। বিপদগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতেছেন, সুতরাং সোজা পথে যাইবেন কেন? শত্রু যে তাহার অনুসরণ করিতেছে। হইতে পারে, শত্রুও তাঁহার সহিত কলিকাতা যাইতেছে। তাই তিনি হুগলী যাইবার আশায় এখানে অপেক্ষা করিতেছেন।

আমাদের কথিত যাত্রী নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে দীননয়নে চারিদিকে চাহিলেন। শরতের সুশোভন আকাশ, দীপ্তিমান নক্ষত্রমালা, সুস্নিগ্ধ তরুলতা—কেহই তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র

সহানুভূতি প্রদর্শন করিল না! বরং সুধাকর যেন তাঁহার ট্রেণ ফেল হওয়ায় উপহাস করিতেছিল। তিনি উদাসীনভাবে চন্দ্রমার দিকে চাহিয়া যেন বলিতে লাগিলেন :—

নিঠুর নিদয় শশি! সুদূর গগনে বসি
কি দেখিছ?— জগতের হিংসা পাপরাশি?
—মোরে দেখে পায় তব হাসি?
তোমার হৃদয় তবে বড়ই কঠিন হবে,
দুঃখ দেখি তব চোখে আসিল না জল,
একমনে হাসিছ কেবল!
যখন তাপিত-প্রাণে চাহি তব মুখ পানে,
তোমার ও হাসি দেখে হিংসা হয় চিতে;
আমি কেন পারি না হাসিতে?
তোমারে গড়িল যেই আমার(ও) নির্ম্মাতা সেই,
তুমি সদা ফুল্ল মনে হাস সুধাহাসি,—
আমি কেন আঁখিজলে ভাসি?
জগতের দুঃখ ভয় তোমাদের সঙ্গী নয়,
পাপ তাপ তোমাদের কাছে নাহি যায়;
তারা কেন আমারে কাঁদায়?
তোমরা সর্ব্বত্র যাও; বাধা কি কখন পাও?
কেহ কভু বলে কি 'এ আমাদের ঘর,
এখানে এস না তুমি পর'?
তুমি নীলিমার দেশে যথা ইচ্ছা যাও ভেসে,
অনন্ত আকাশ যেন তোমারি আলয়!—
আমি কেন পাই না আশ্রয়।

অথবা আর কিছু ভাবিতেছেন। তাঁহার মনোভাব আমরা কিরূপে ব্যক্ত করিব? হইতে পারে, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তাসমীপে মনোদুঃখ, হতাশ বেদনা জানাইতেছিলেন। দুঃখের সময় সে মধুর নাম স্মরণে যে সুখ, —তাহা, যে কখনও ব্যথিত হৃদয়ে আল্লাহ্‌কে ডাকিয়াছে,—সেই জানে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
নিরাশ্রয়

যুবক এইরূপে অন্যমনে পদচারণা করিতে করিতে ষ্টেশন ছাড়িয়া কিছু দূরে গিয়া পড়িলেন। এ নিশীথ সময়েও তিনি নিদ্রায় কিছুমাত্র কাতর হন নাই। সন্তাপ-হরিণী, বিরাম-দায়িনী, নিদ্রাদেবীও সুখীর সহচরী—তিনি দুঃখীর সঙ্গিনী নহেন! পথিক অত্যধিক উদ্বিগ্নতায় কাতর হইয়াছেন। তাঁহার প্রধান চিন্তা—আশ্রয় অন্বেষণ।

এখন শেষ-রজনীতে সুধাংশু পাণ্ডুবর্ণ হইল। ধরণী ঈষৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। নক্ষত্র-মণ্ডলীর রূপের ছটায় গগনমণ্ডল ঈষৎ দীপ্ত ছিল। আরও কতক্ষণ এইভাবে গত

হইল। যুবক যে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এ স্থানটী তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

অদূরে একটী মসজিদ হইতে সুমধুর "আজান"-এর শব্দ নিস্তব্ধ ধরণীকে জাগাইতেছিল, মোহিত করিতেছিল, জগতের প্রাণ ভক্তিরসে গলাইতেছিল। সে মোহন রবে প্রকৃতি জাগিল, পাখী সব জাগিল। সমীরণ সেই স্বর দূর হইতে দূরান্তরে বহিয়া লইতেছিল। স্থির শান্ত প্রকৃতি সেই সঙ্গীত-স্রোতে ভাসিল। ঐ সুধাময় সঙ্গীত শ্রবণে পথিক রাত্রিজাগরণ-জনিত বেদনা ভুলিলেন। কেমন আনন্দানুভব করিলেন, তাহা বলিতে পারি না, তাহা কেবল অনুভবেরই জিনিষ ; যে অনুভব করিয়াছে, সেই বুঝে।

আমাদের পথিক ভাবিলেন, ঐ মসজিদে গিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে কেমন হয়? তাঁহার সঙ্গে মাত্র একটী হ্যাণ্ডব্যাগ ছিল, সুতরাং মসজিদে দুই এক দিন বাস করিতে কোন অসুবিধা ছিল না। তিনি মসজিদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু প্রবেশ করিতে সাহস পাইলেন না। একি ! তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন যে ! না, তিনি মসজিদে যাইবেন না। তিনি অসহায়ভাবে পথিপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

এই সময় তিন জন ব্রাহ্ম মহিলা ঐ পথে যাইতে যাইতে কি ভাবিয়া ঐ পথিকের নিকট দাঁড়াইলেন। এবার এ নিরাশ্রয় পথিক হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহিলাত্রয়কে নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন,—

"আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার একটু উপকার করিবেন কি?"

প্রথমা মহিলা। উপকার? কি করিতে হইবে বলুন, চেষ্টা করিয়া দেখি।

"আমার ভগিনীকে আপনারা দুই এক সপ্তাহের জন্য স্থান দিবেন কি? আমার অন্যত্র প্রয়োজন আছে ; বাড়ীতে কেহই নাই। আপনারা তাহাকে দুই সপ্তাহ রাখুন, পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া, যাহা হয়, করিব।"

প্রথমা। আমাদের আপত্তি নাই ; কিন্তু আপনার বাড়ী কোথা? আপনি কে? আমরা আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা, তবু আমাদের নিকট আপনার ভগ্নীকে রাখিতে চাহেন, ইহার অর্থ কি?

দ্বিতীয়া। আমরাও ত এখানে প্রবাসী—আমরা আজই কলিকাতায় চলিয়া যাইতেছি। আপনি স্থানীয় কোন লোকের বাড়ী চেষ্টা দেখুন।

পথিক অতি কাতরভাবে দীননয়নে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনারা কেবল দয়াধর্ম্মের অনুরোধে আমাকে—না, আমার কুমারী ভগ্নীকে আশ্রয় দান করুন।"

মহিলাত্রয় পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "আপনার ভগ্নীকে আমরা রাখিতাম, কিন্তু আমরা বাস্তবিক অদ্যই কলিকাতা যাইতেছি।"

"সেও কলিকাতায় যাইবে। আপনাদের বাসায় তাহাকে পৌঁছাইয়া দিই। রেল-ভাড়া সে নিজেই দিবে।"

প্রথমা মহিলা। (সঙ্গিনীদের প্রতি) তোমাদের কি মত?

দ্বিতীয়া। তোমার যাহা ইচ্ছা। আমার আপত্তি নাই। তবে পরের বাড়ী কি না—মিসিস্ সেনকে পূর্ব্বে কিছু না বলিয়া একজন অপরিচিতাকে লইয়া হঠাৎ যাই কিরূপে? কি বল বিভা?

বিভা। আমার পরামর্শ এই—আজ আমরা যাই; মিসিস্ সেনকে সব বলিয়া রাখিব। (পথিকের প্রতি) আগামীকল্য আপনি সেখানে যাইবেন। এই নিন, এই কাগজে আমাদের ঠিকানা লেখা আছে! আমাদের নিজের বাড়ী নয়—আমরা তারিণী-বিদ্যালয়ে কাজ করি। আপনার ভগিনী-সহ আপনি সেইখানে যাইবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
দীন-তারিণী

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার তারিণীচরণ সেন অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র কন্যা কেহই ছিল না; ছিলেন কেবল তাঁহার দ্বিতীয়পক্ষের সপ্তদশবর্ষীয়া তরুণী বিধবা দীন-তারিণী। তিনি চারি বৎসর পর্য্যন্ত বৈধব্য যন্ত্রণার সহিত নানাবিধ রোগ ভোগ করিলেন। অতঃপর কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তারগণ তাঁহাকে জবাব দিলেন। কিন্তু দীন-তারিণী মরিলেন না।

দেবর ভাশুর প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীন-তারিণী একটী বিধবা-আশ্রম স্থাপন করিলেন। আশ্রমের নাম রাখিলেন—'তারিণী-ভবন'। তারিণী-ভবনের শ্রীবৃদ্ধিতে উৎসাহিতা হইয়া তিনি একটা বিদ্যালয় খুলিলেন এবং 'নারী-ক্লেশ-নিবারণী সমিতি' নামে একটি সভা গঠন করিলেন। তারিণী-ভবনের বিরাট অট্টালিকার এক প্রান্তে বালিকা-বিদ্যালয়, অপর প্রান্তে বিধবা-আশ্রম। কিন্তু ক্রমে তাঁহাকে তৎসংলগ্ন একটা আতুর-আশ্রমও স্থাপন করিতে হইল।

এইরূপে দীন-তারিণী শমন-ভবনের দ্বারদেশ হইতে প্রত্যাগতা হইয়া বিরাট কার্য্যক্ষেত্রে নব-জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহার এই কর্ম্মজীবনে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা বিরক্তই রহিলেন, এবং তারিণী লক্ষাধিক টাকার অযথা শ্রাদ্ধ করিতেছেন বলিয়া আক্ষেপ করিতেন আর তারিণীর কার্য্যকলাপকে বিদ্রূপ করিতেন।

যে বিধবার তিন কুলে কেহ নাই, সে কোথায় আশ্রয় পাইবে?—তারিণী-ভবনে। যে বালিকার কেহ নাই, সে কোথায় শিক্ষা লাভ করিবে?—তারিণী বিদ্যালয়ে। যে সধবা স্বামীর পাশবিক অত্যাচারে চূর্ণ-বিচূর্ণ জরাজীর্ণ হইয়া গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, সে কোথায় গমন করিবে?—ঐ তারিণী-কর্ম্মালয়ে। যে দরিদ্র দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছে তাহারও আশ্রয়-স্থল ঐ তারিণী-আতুরাশ্রম।

দীন-তারিণী স্বীয় আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক একরূপ 'সমাজচ্যুতা' হইয়া নির্জ্জনে বাস করিতেন। কিন্তু 'নির্জ্জন' বলিলে মিথ্যা বলা হয়, কারণ তারিণী-বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রী

(ডে-স্কলার) ব্যতীত কেবল বোর্ডিং হাউসেই শতাবধি বালিকা বাস করে ; তদ্ব্যতীত তাহাদের শিক্ষয়িত্রী, 'মেট্রন', পরিচারিকা ইত্যাদি ত আছেই। তারিণী-ভবনেও লোকসংখ্যা অল্প নহে। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়গণ বলিতেন, "তারিণী আর লোক পাইবে কোথায়? কোন্ ভদ্র ঘরের বউ-ঝি তাহার নিকট যাইবে? দেশের যত পতিতা স্ত্রীলোক, যত কুষ্ঠরোগী, যত সব নগণ্য অনাথ শিশু, তাহাদের লইয়াই ত তারিণীর সংসার!!" এবম্বিধ মন্তব্য শ্রবণে তারিণী দুঃখিত না হইয়া বরং হাসিতেন। তিনি বলিতেন, "পর-সেবা করিবার মত সৌভাগ্য কি সকলের হয়?"

দীন-তারিণী সে দিন সন্ধ্যার সময় বড় ব্যস্ত ছিলেন। বিদ্যালয়-সংক্রান্ত অনেক কাজের ভিড়। একজন কোচম্যান্‌কে কি কারণে সরকারবাবু প্রহার করিয়াছেন, সে নালিশের বিচার। সেইদিন অপরাহ্নে ৫ নং 'বাসের' ঝি বলিয়াছিল, "ওমা! আমি আর থানার মেয়ে পৌঁছাতে যাব না! নেস্‌পেক্টর বাবু বলেছেন, 'তোমাদের গাড়ী আটক দিব, আর কোচম্যান্‌কে ফটক দিব!" তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"—"ঘোড়ার পা খোঁড়া।" তবে তুমি বলিও "ঘোড়াকে আটক দিন, আর সইসকে ফাটক দিন!" কিন্তু সন্ধ্যায় 'কলিকাতা, পশু-ক্লেশনিবারণী সভা'র পত্র আসিয়াছে যে ৩ নম্বর এবং ৫ নম্বর 'বাস্'-এর ঘোড়া খোঁড়াইয়া চলে, সে জন্য তাঁহারা স্কুলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবেন। দুইজন সইসের বিরুদ্ধে ঘোড়ার দানা চুরির অভিযোগ। ৭নং 'বাস' গাড়ীখানা অপরাহ্নে ট্রামের ধাক্কায় চাকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছিল—ইত্যাদি নানাবিধ গোলমালে তারিণী ভারি ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় মিস্ বিভা চক্রবর্ত্তী সংবাদ দিলেন যে নৈহাটী হইতে সেই অজানা মেয়েমানুষটী আসিয়াছেন।

তারিণী। তুমি আজ রাত্রে তাহাকে তারিণী-ভবনে রাখ, আমি এখন তাহার সংবাদ লইতে পারিব না। আগামীকল্য প্রভাতে সর্ব্বপ্রথমে তোমাদেরই দরবার করা যাইবে। এখন যাও—আমি বড় ব্যস্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তারিণী-ভবন

বিভা সিদ্দিকাকে (সেই অপরিচিতা মহিলাকে) তারিণী-ভবনে লইয়া গেলেন।

সাধারণতঃ 'তারিণী-ভবন' বলিতে তৎসংলগ্ন বিদ্যালয়, কর্ম্মালয় এবং আতুরাশ্রমও বুঝায়।

বিদ্যালয় বিভাগে ব্রাহ্ম, হিন্দু খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রী ত ছিলেনই ; ক্রমশঃ মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য দুই তিনজন মুসলমান শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্ত করা হয়। কি সুন্দর সাম্য!—মুসলমান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, সকলে যেন এক মাতৃ-গর্ভজাতা সহোদরার ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতেছেন।

বিদ্যালয়ে গবর্ণমেন্ট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং বাধ্য হইয়া "সরকারী" পাঠ্য-পুস্তকের তালিকাভুক্ত কোন পুস্তক অধ্যয়ন করান হয় না। দেশের

সুশিক্ষিতা মহিলাদের সহিত পরামর্শ করিয়া দীন-তারিণী নিজেই পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচন করেন। ছাত্রীদিগকে দুই পাতা পড়িতে শিখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালিয়া বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠিত করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র—সবই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন। মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহাদিগকে নিজের দেশ এবং দেশবাসীকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। নীতিশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা, চরিত্র-গঠন প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দান করা হয়। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্ম্মকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষতঃ তাহারা আত্ম-নির্ভরশীলা হয় এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পিতা, ভ্রাতা বা স্বামী-পুত্রের গলগ্রহ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।

দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকই এ বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য করেন। বিশেষতঃ দেশীয় করদ ও মিত্ররাজ্যের রাজন্যবর্গের ভিক্ষা গ্রহণ করা হয় না।

আতুরাশ্রমে 'পথে পড়িয়া পাওয়া' নিঃসহায়, নিঃস্ব রোগী আশ্রয় পায়। আরোগ্য লাভ করিবার পর তাহারা চলিয়া যায়। কেবল কুষ্ঠ ও অক্ষম রোগী রহিয়া যায়।

আতুরাশ্রম বিভাগে অনেকেই অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। অনেক মুসলমান মহিলা গোপনে অর্থদান করেন। নাম প্রকাশে পুণ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় এ দান-ক্রিয়া অতি গোপনে সম্পন্ন হয়।

'নারী-ক্লেশ-নিবারণী-সমিতি'র সাহায্যে তারিণী-ভবনের অধিকাংশ ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। অনেক মুসলমান মহিলা গোপনে এই সমিতির সভ্যা হইয়াছেন। বৃদ্ধা ও রোগ-হেতু কার্য্য করিতে অক্ষমা দরিদ্রা বিধবা ও সধবাগণ তারিণী-ভবনে বাস করেন।

কর্ম্মালয়ে কুমারী, সধবা, বিধবা,—সকল শ্রেণীর লোকই আছেন। তাঁহারা বিবিধ সূচিকর্ম্ম করেন, চরকা কাটেন, হাতের তাঁতে কাপড় বোনেন, পুস্তক বাঁধাই করেন, নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। কেহ শিক্ষয়িত্রী-পদলাভের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন ; কেহ টাইপিং শিক্ষা করেন ; কেহ রোগী-সেবা শিখেন। ফল কথা, এ বিভাগে রমণীগণ আপন আপন জীবিকা স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এই বিভাগে তারিণী-বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষয়িত্রী এবং আতুরাশ্রমের জন্য নাস্‌ প্রস্তুত করা হয়। এতদ্ব্যতীত দেশের অন্যান্য হিতকর কার্য্য, যথা দুর্ভিক্ষ, বন্যা এবং মহামারী-পীড়িত লোকদের সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই বিভাগ হইতে মহিলাগণ তণ্ডুল, বস্ত্র ও ঔষধ-বিতরণ এবং রোগী সেবা করিতে গিয়া থাকেন।

সিদ্দিকা কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া গৃহশোভা দেখিতে লাগিলেন ; পরিষ্কার ঝরঝরে পাথরের মেজে ; বিলাসিতার কোন সরঞ্জাম, যথা টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি নাই ; প্রত্যেক ভগিনীর জন্য এক একখানা শয্যা মাত্র। দেওয়ালে বড় একটা ঘড়ী নিয়মমত নিজের কার্য্য করিয়া যাইতেছে।

'ভগিনী'দের পোষাক সকলের প্রায় একই প্রকার ; শ্বেতবস্ত্র শীঘ্র মলিন হয় বলিয়া এখানে তাহা ব্যবহার করা হয় না। সকলের পরিধানে নীলবর্ণের বা গৈরিক সাড়ী আর জামা। সভ্যতার পরিচায়ক জুতা, মোজা নাই ; অলঙ্কারের আড়ম্বর কাহারও নাই ; কাহারও কাহারও হাতে বালা কিংবা শাঁখা আছে মাত্র। অহঙ্কার নাই, বিলাসিতা নাই—কেবলই যেন

সরলতা ও উদারতায় ভূষিতা। যেন মুনিকন্যাগণ তপোবন ছাড়িয়া সংসারক্ষেত্রে আসিয়াছেন! তাঁহাদের এই নিরাভরণ বেশেই কত না রূপ! 'ভগিনীগণ' সকলেই যেন সাক্ষাৎ করুণা!

এখানে সকলেই বয়স বিচার না করিয়া পরস্পরে "তুমি" সম্বোধনে কথা বলেন। একে অপরকে 'দি' (দিদি) এবং মুসলমানদের 'বু' (বুবু অর্থাৎ ভগিনী) বলেন। কোরেশা পাটনার অধিবাসিনী, বাঙ্গালার 'বু'র মর্ম্ম বুঝেন না বলিয়া তাঁহাকে 'বি' বলা হয়। দীন-তারিণী সাধারণত 'মিসিস্ সেন' নামে পরিচিতা। তাঁহাকে সকলে "আপনি" সম্বোধন করেন; তিনিও কয়েকজন মহিলা ব্যতীত অপর সকলকে "আপনি" বলিতেন।

বিভা নিম্নলিখিত মহিলাত্রয়ের সঙ্গে সিদ্দিকার আলাপ করাইয়া দিলেন :—

(১) চারুবালা দত্ত—চিরকুমারী, বয়স ৩৮ বৎসর।

(২) সৌদামিনী—সধবা, বয়স ৪৩ বৎসর; গৌরবর্ণা এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী। বয়স অধিক হওয়াতেও লাবণ্য নষ্ট হয় নাই।

(৩) মিসিস্ হেলেন হরেস,—ইংরাজ-মহিলা, বয়স ৪১ বৎসর, বিধবা বলিয়া পরিচিতা!

সিদ্দিকা ইহাদের আদর যত্নে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন; ভাবিলেন এমন স্থান পাইলে স্বর্গেরও প্রয়োজন নাই। অত্যন্ত ক্লান্তিবশতঃ সিদ্দিকা নৈশ-ভোজনের পর অচিরে নিদ্রাভিভূত হইলেন, সুতরাং 'ভগিনী'গণ ভালরূপে তাঁহার পরিচয় লইতে পারিলেন না।

বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী এবং কর্ম্মালয়ের ভগিনীদের বাসস্থান সম্বন্ধে পার্থক্য আছে। প্রথমোক্তাগণ প্রত্যেকে এক একটী স্বতন্ত্র কামরা পাইয়া থাকেন, আর তাঁহারা গৈরিকবাসা সন্ন্যাসিনীও নহেন। 'ভগিনী'দের কাহারও স্বতন্ত্র কামরা নাই—বৃহৎ দালানে পাথরের মেজের উপর প্রত্যেকের স্বতন্ত্র শয্যা, একটা আল্না এবং একটী ট্রাঙ্ক আছে। সিদ্দিকা এই কর্ম্মালয়ে সৌদামিনীর শয্যায় রাত্রিযাপন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'পদ্মরাগ'

নির্ব্বিঘ্নে রজনী যাপন করিবার পর সিদ্দিকা বেশ প্রফুল্ল হইলেন, এবং আপন স্বাভাবিক কান্তি ফিরিয়া পাইলেন। প্রাতরাশের পর বিভা ও ঊষারাণী সিদ্দিকাকে তারিণীর 'আফিস' কামরায় লইয়া গেলেন।

দীন-তারিণীর সম্মুখে আনীতা হইয়া সিদ্দিকা সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমার নাম কি?"

"সিদ্দিকা।"

"সিদ্দিকা—না, পদ্মরাগ? তুমি দেখিতে ঠিক পদ্মফুলের মত টুকটুকে! এখানে রাত্রে তোমার কোন কষ্ট হয় নাই ত?"

"আজ্ঞে না, আমি বেশ আরামে ঘুমাইয়াছি। আপনার চরণতলে আশ্রয় পাইলে আবার কষ্ট কি?"

"আহা! তুমি এমন কথা বলিও না। এ তোমার নিজের ঘর। এখানে তিনজন মুসলমান শিক্ষয়িত্রী আছেন, তুমি তাঁহাদের নিকট থাকিবে। কোন অসুবিধা হইলে আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিও না। তোমাকে এখানে রাখিয়া তোমার ভাই কোথায় গেলেন?"

"বিদেশে।"

তা। বিদেশে গেলেই ভগ্নীকে এখানে রাখিতে হইবে, ইহার কারণ কি?

সি। আমাদের বাড়ীতে আর কেহ নাই যে।

তা। বিভা! তোমাকে ইহার ভাই কি বলিয়া গেলেন?

বিভা। আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমি নীচে যাইবার পূর্ব্বেই নাকি তিনি ইহাকে গাড়ীতে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

তা। বেশ লোক ত! কুমারী ভগ্নীকে একটা অপরিচিত স্থানে রাখিয়া গেলেন, অথচ সেখানকার লোককে দুটি কথাও বলিয়া গেলেন না!

বি। ইহাতে বুঝা যায়, আপনার প্রতি জন–সাধারণের বিশ্বাস ও ভরসা যথেষ্ট আছে।

তা। কিন্তু তুমি কিরূপে বিশ্বাস করিলে যে, এই মেয়ে নৈহাটীর সেই ভদ্রলোকের ভগ্নী?

সিদ্দিকার মুখের দিকে চাহিয়া বিভা বলিলেন, "ইনি দেখিতে ঠিক তাঁহারই মত, মনে হয় যেন জমজ ভ্রাতা ভগ্নী। আর আমি যে কাগজখণ্ডে ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিলাম, তাহাও ইহার নিকট পাইলাম, আর যে হ্যাণ্ড–ব্যাগটা—"

উচ্চহাস্য করিয়া তারিণী বলিলেন, "বেশ! বেশ! আর প্রমাণের প্রয়োজন নাই। তুমি ইহাকে তারিণী–ভবনে না দিয়া আপাততঃ কোন শিক্ষয়িত্রীর কামরায় রাখ। তাহা হইলে ইহাকে জাফরী খানমের জিম্মায় দিবে, না, কোরেশা বি'র সঙ্গে রাখিবে?"

"কোরেশা বি'ই অধিক সভ্য–ভব্য; আর তিনি নিজেই সিদ্দিকাকে রাখিতে চাহিয়াছেন।"

তা। এই যে কোরেশা বিও আসিয়াছেন। বেশ, এই নিন, এ মেয়েটিকে পরম যত্নে রাখিবেন।

কো। তাহা আর বলিতে? আমি ত সেইজন্য আসিয়াছি। (সিদ্দিকার প্রতি) আসুন, আপনার নাম কি?

বিভা। মিসিস সেন্ উহার নাম রাখিয়াছেন—'পদ্মরাগ'।

কোরেশা। 'পদম্‌রাজ'? এ আবার কি নাম?

তারিণী। আপনি বিভার দুষ্টামী শুনিবেন না; এ বিবির নাম সিদ্দিকা খাতুন্।

বিভা। কোরেশা বি! আপনি আমাদের বাংলা নামগুলির বড় লাঞ্ছনা করেন; আপনি পদ্মরাগকে বলিলেন, 'পদম্‌রাজ'; আপনার এ ভারি অন্যায়।

মিসিস ঊষারাণী চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "এ জন্য আর দুঃখ কেন তুমি প্রথম প্রথম মুসলমান মেয়েদের নামগুলি কেমন বিকৃতভাবে উচ্চারণ করিতে,—রাসেখাকে "রসিকা" আর শওকৎ আরাকে "শুকতারা" বলিতে, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ?"

বিভা। একদিন জা'ফরী খানমের সঙ্গে ঐ বিষয় লইয়া লাঠালাঠি হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাও মনে আছে; তা আমাদের কোরেশা বি বেশ ভাল বাঙ্গালা বলিতে পারেন।

ঊষা। নয় ত কি! এখনই তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন যে, 'আপনাকে চায় খাবেন'।

কো (তারিণীর প্রতি মৃদুস্বরে) কথাটী কি ঠিক বাঙ্গালা হয় নাই?

তা। তা সব ঠিক আছে; আপনিও বাঙ্গালীন্‌দের কথায় কান দিবেন না।

সান্ধ্য উপাসনার পর ঊষারাণীর কামরায় কোরেশা ব্যতীত অপর শিক্ষয়িত্রীদের এবং কর্ম্মালয়ের 'ভগিনী'দের একটা সভা বসিল। আলোচ্য বিষয় ছিলেন—সিদ্দিকা।

জা'ফরী খানম বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার সুরে বলিলেন, "কোন ভদ্রলোকের কন্যা এভাবে কোথাও আইসে না।"

চারুবালা। যদি সহোদর ভ্রাতা সঙ্গে আনিয়া রাখিয়া যায়?

জা'ফরী। ঐ কথাই ত বলিতেছি, কোন ভদ্রলোকে এমন করে না।

ঊষা। কোন একটা ব্যবস্থা-পুস্তক এরূপ আছে কি যাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে,—'ভদ্রলোকে কেবল এই এই কাজ করে' আর 'এই কাজ করে না'?

বিভা। জ্বালাতন করিলেন দেখি; ভদ্রলোকে প্রবঞ্চনা করা, মিথ্যা বলা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা ইত্যাদি সব দোষ করিতে পারে; আর পারে না কেবল কোন সম্ভ্রান্ত জায়গায় ভগ্নীকে রাখিতে?

চারু। ভদ্রলোকে না করেন কি? ডাকাতী, জুয়াচুরি, পরস্বাপহরণ,—পঞ্চ 'মকার' আদি কোন্ পাপের লাইসেন্স্ তাঁহাদের নাই?

ঊষা। যদি বিধবা মাসী-পিসির সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহার হাতে কমণ্ডলু দিয়া পথে না বসাইলেন, তবে আর তিনি কিসের বনিয়াদী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। তাঁহার হজ, তীর্থ পুণ্য সবই বৃথা! যাক্ সে কথা। বলুন দেখি খানম সাহেবা, সিদ্দিকাকে দেখিয়া কি ধারণা হয়?—কোন কুলি মজুরের মেয়ে, সাওঁতাল না কোল?

জা। আমি 'এল্‌মে কেয়াফা' (মুখদর্শনে মানুষ-চেনা বিদ্যা) জানি না। তবে ভদ্রঘরের মেয়ের মত ইহার মুখশ্রীতে কোমলতা আছে।

নলিনী। বলি খানম সাহেবা, আপনার লক্ষৌয়ী ভদ্রলোকেরা কি কাজ করেন?

বিভা। তাঁহারা গোঁফে আতর আর কাপড়ে ঘি মাখেন!

জা। যাও বিওয়া (বিভা) দি! আমি তোমার কথা শুনিতে চাহি না।

সৌদামিনী। অভাগিনী পদ্মরাগ নিশ্চয় সংসারের নির্ম্মম পেষণে বাধ্য হইয়াই শাপভ্রষ্টা দেবীর ন্যায়—বৃন্তচ্যুত কলিকার ন্যায় এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। সে যদি ভদ্র গৃহস্থের কন্যা নাও হয় তবু আমরা তাহাকে 'ভদ্র' করিয়া লইব।

ন। তারিণী-কর্ম্মালয়রূপ পরশ-পাথরের স্পর্শে সে সোণা হইয়া যাইবে।

উষা। সোণা না হইয়া 'পদ্মরাগ' হইলেও আপত্তি নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
নিতান্ত একাকিনী

সিদ্দিকা ৯/১০ মাস হইতে তারিণী-কর্ম্মালয়ে আছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত পরিচয় এ পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারে নাই। তাঁহাকে 'ভগিনী'গণ (তারিণী-কর্ম্মালয়ের মহিলাগণ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণ সাধারণতঃ 'দরিদ্রের ভগ্নী' নামে পরিচিতা, সংক্ষেপে তাই কেবল 'ভগিনী' বলা হয়) অনেক আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয় উঠিয়া পলাইতেন, নয়, কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিতেন, "ক্ষমা করিবেন, আমি কিছুই বলিতে পারিব না—আমি নিতান্ত একাকিনী। জগতে আমার কেহ নাই।"

আবার যদি প্রশ্ন হয়,—"তোমার বাড়ী কোথায়?"
"আমার বাড়ী সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ তারিণী-ভবন।"

এ দীর্ঘকালে সিদ্দিকা কাহাকেও একখানি পত্র লিখেন নাই, তাঁহার নামেও কাহারও চিঠিপত্র আইসে নাই। সুতরাং তাঁহার পরিচয় জানিবার কোন উপায় নাই। তাঁহার ভ্রাতা যে তাঁহাকে মাত্র দুই সপ্তাহের জন্য রাখিয়া গেলেন, তিনিও এযাবৎ একখানা পোষ্টকার্ড দ্বারা ভগ্নীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন নাই। আর সে ভ্রাতাকে তারিণী-ভবনের কোন লোকই দেখে নাই। সিদ্দিকা হ্যাণ্ডব্যাগ সহ গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নিজেই গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়াছেন। পরে বিভা আসিলে, তাঁহার সহিত উপরে গিয়াছেন; যাহা হউক, কোন প্রকারেই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইত না। তিনি সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকিতেন। "ভগিনী"গণ তাঁহাকে হাসাইবার জন্য অনেক প্রকার হাস্য-কৌতুক করিতেন, কিন্তু তিনি অটল পর্ব্বতের মত স্থির গম্ভীর। সময় সময় বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার ঈশান বাবু বলিতেন, "বাবা! অনেক দেখেছি--এমন মেয়ে দেখি নাই! এ যে সাক্ষাৎ পাষাণীর মেয়ে পাষাণী!!"

শিক্ষয়িত্রী এবং রোগী-সেবিকাগণ পরস্পরে সিদ্দিকার সমালোচনা করিয়া বলিতেন,—"পদ্মরাগ কি সত্যই মনুষ্য নহেন,—মানবের ভাষা বুঝেন না? কোন অজ্ঞাত স্বর্গ হইতে শাপভ্রষ্টা দেবী এখানে আসিয়াছেন কি? আহা! এমন শাপ কে দিয়াছে?"

"অথবা স্বর্গের দেবী পথ ভুলিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছেন। যেন সংসারের গতি মতি কিছু জানেন না।"

"তাই বটে ; প্রভাতের ম্লানমুখী পূর্ণশশীটীর মত ; কিম্বা শুষ্কপ্রায় গোলাপ-মুকুলটীর মত। আহা ! কেন ওর গায় এত শীঘ্র সংসারের উত্তাপ লাগিল !"

"এ আশ্রমটী বেশ তাপদগ্ধ জীবনের দাঁড়াইবার স্থান হইয়াছে। দিদি, আমরা ত সংসারের নিষ্ঠুর নির্ম্মমতায় চূর্ণ হইয়া সংসার ছাড়িয়া জুড়াইবার জন্য তারিণীভবনে আসিয়াছি। কিন্তু এ কিশোরী বালিকা সংসারের কি জানে যে এই বয়সে সন্ন্যাসিনী হইতে আসিয়াছে?"

সৌদামিনী। কি জানি ভগিনী, কাহার মনের ব্যথা কে বুঝিতে পারে? জান, অনেক জিনিষ অকালেই পরিপক্ক হয়। ভেবে দেখ, আবার অনেক কলি অকালে শুকায়। এ বিশাল সংসার-আকাশে ছোট বড় কত তারা—কে তার হিসাব রাখে, কে রাখে সংবাদ! নীরবে উদয় হয়, নীরবেই যায় অস্তাচলে ;

নলিনী। হাঁ, সেই কবির বচন মনে পড়ে :—

সাগরের সুগভীর আঁধার গহ্বরে
উজ্জ্বল রতন কত রয়েছে লুকায়ে ;
ফুটিয়া কুসুম কত বিজন প্রান্তরে
শুকায় সৌরভ তার বায়ুতে মিশায়ে !

সোদামিনী। তোমার রোগীর অবস্থা কিরূপ? আজ তুমি বোধ হয় একবারও তাহার নিকট যাও নাই।

নলিনী। না দিদি, তাহাও কি হয়? এই এখনই দেখিয়া আসিলাম। বেশ সুখে নিদ্রায় আছে।

চারুবালা। নার্স নলিনী কর্ত্তব্য ভুলিবার পাত্রী নহেন! তোমরা হীরা মাণিকের আলোচনা কর, আমি ভাবি নলিনীর কথা ; সে যে —

"ভ্রমর-গুঞ্জনে কতই শুনিত
আশার মোহিনী বাণী ;
রচি কল্পনায় প্রসূন রাজত্ব
তাহাতে ছিল সে রাণী ! —"

বাল-বিধবা নলিনী সত্যই পদ্মফুলের মত প্রফুল্ল ; বয়স ৩৮ বৎসর হইবে। তিনি কপট বিরক্তির সহিত বলিলেন, "ছি! চারু-দি'! একটু গম্ভীর হইতে শিখ।"

চা। বেশ তবে —

"জীবন -সরসে কমল-কলিকা
আশার অরুণ পানে চাহিল—
নলিনীর পূর্ণ-বিকাশ দিবসে
মধ্যাহ্ন না এসে, সন্ধ্যা আইল !"

কিছুদিন পরে সিদ্দিকা বলিলেন, "আমাকেও কোন একটি কাজ দিন।"

সৌদামিনী। তুমি কি কি কাজ জান?

সিদ্দিকা। বিশেষ কোন কাজই জানি না ; যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিব।

সৌদা। যদি কাঠ কাটিতে বলি?

সিদ্দি। কাঠ কাটিতে পারিব না — এমন কাজ দিন যাহাতে শারীরিক বলের দরকার না হয়। সেলাই করিতে দিন না?

সৌদা। সেলাই — কি কি রকম জান? আমাদের জামা প্রস্তুত করিয়া দিবে? পেটিকোট, ব্লাউস, শার্ট ইত্যাদি ভাল মত ছাঁটিতে কাটিতে পার?

সিদ্দিকা কারচুবি ইত্যাদি উচ্চদরের সেলাই জানিতেন বটে, কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় কাপড় সেলাই করিতে শিখেন নাই! লেখা-পড়া যাহা শিখিয়াছেন তাহাও এক্ষেত্রে অর্থকরী নহে। ফল কথা, জমিদার-পরিবারের কন্যাগণ যেমন লেখাপড়া — শুধু ভাষাশিক্ষা এবং নানারূপ সূক্ষ্ম সূচিকার্য, উল বুনান ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া থাকেন, সিদ্দিকাও তাহাই জানিতেন। সুতরাং সিদ্দিকা দেখিলেন, তাঁহার কোন বিদ্যাই পয়সা উপার্জন করিবার উপযোগী যোগ্যতা লাভ করে নাই। অঙ্ক না জানার জন্য লেখাপড়া কাজে আসিল না! শেষে সেলাই করিতে চাহিলেন, তাহাতেও কাটা ছাঁটার হেঙ্গাম! অবশেষে স্থির হইল, তিনি দরিদ্র রোগীদের জামা, পর্দা, চাদরের মুড়ি, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি সেলাই করিবেন।

সেই দিন হইতে সিদ্দিকা সর্বদা সুচ সূতা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। অন্যান্য কার্যেও যথাসাধ্য যোগদান করিতেন। ঔষধের মিকচার (mixture) প্রস্তুত করিতেন ; পথ্য রাঁধিতেন। ছোট ছোট কার্য যাহা করিতে অন্য সেবিকাদের অবসর হইত না, তাহা সিদ্দিকা করিতেন। কোন কার্যেই তাঁহার ঔদাস্য দেখা যায় না — কার্যে তিনি বড় মনোযোগী। রীতিমত অভ্যাস (practice) না থাকায় প্রথম প্রথম কোন কার্যই সুচারুরূপে করিতে পারিতেন না।

একদিন তারিণীর 'আফিস' কামরায় গিয়া কতিপয় মহিলাকে টাইপ (type) করিতে দেখিয়া সিদ্দিকা ভাবিলেন, এ কাজটি বেশ সহজ। তিনি রাফিয়া বেগমের নিকটে গিয়া টাইপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি প্রশ্ন করিলেন — "তুমি টাইপ করিতে পার?"

সি। কখনও করি নাই বটে, কিন্তু পারিব ; দেখুন না —

কিন্তু তাঁহার টাইপ করা দেখিয়া সকলে হাসিয়া ফেলিলেন!

সিদ্দিকা লজ্জা পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, — "ইংরাজী জানি ; টাইপরাইটারের চাবিতে লিখিত অক্ষরও পড়িতে পারি, তবু আমার হাতে অঙ্গুলিগুলি ঠিক চলিল না কেন।" পরে তিনি যথাবিধি টাইপ শিক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন, (blind system অনুসারে) সামান্য দুই অক্ষরের একটি শব্দ, যথা " ইস" লিখিতে গেলেও একবার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি এবং পরে বাম হস্তের অঙ্গুলি ব্যবহার করিতে হয়!

যদিও দৈনন্দিন কার্য্যের অনুরোধে তারিণী-ভবনের সকল পুরুষ কর্মচারীদের সঙ্গে সর্বদা দেখা হইত, তবু সিদ্দিকা তাঁহাদের নিকট সুপরিচিতা ছিলেন না। সিদ্দিকাকে মিতভাষিণী জানিয়া তাঁহারা ইঁহার সঙ্গে অনাবশ্যক কথা বলিতে প্রয়াস পাইতেন না।

সন্ধ্যার সময় কার্য শেষ হইলে, রমণীগণ নদীতীরে বা মাঠে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। প্রথম প্রথম সিদ্দিকা তাঁহাদের সঙ্গে বাহির হইতেন না। পরে সকিনা ও নলিনী তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া সঙ্গে লইতে লাগিলেন।

শরৎ নামক একটি বালক এখানে আতুরাশ্রমে আসিয়াছে। তাহাকে সিদ্দিকা খুব যত্ন করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে সিদ্দিকা রোগী-সেবা শিক্ষা করেন। পূর্বে তিনি রোগী দেখিলে ভয় পাইতেন ; শরৎ তাঁহাকে সেবাধর্ম শিক্ষা দিলেন। শরতের সেবা-শুশ্রূষার সময় সৌদামিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বেশী হইল, কারণ সৌদামিনী শরৎকে প্রাণের সহিত ভালোবাসিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
রোগী

গ্রীষ্মাবকাশের সময় তারিণী-বিদ্যালয় বন্ধ হইলে কতিপয় শিক্ষয়িত্রী সমভিব্যাহারে তারিণী কারসিয়ঙ্গে আসিয়াছেন। কোরেশা এবং সিদ্দিকাও আসিয়াছেন।

একদা অপরাহ্নে ঊষারাণী, কোরেশা এবং সিদ্দিকা একটা উপত্যকায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। বোর্ডিলন রোড ধরিয়া ফিরিয়া আসিতে প্রায় রাত্রি হইল। বিভার মাতা পীড়িতা ছিলেন। তাঁর জন্য ঔষধ লইয়া একটি "শর্ট-কাট্' পথ দেখিয়া ঊষা বলিলেন, — "এই পথে চল, শিগ্‌গির যাওয়া যাইবে।"

'শর্ট-কাট্' পথে আসিতে আসিতে একটা ঝোপের নিকট মানুষের মত কি একটা জিনিসের উপর তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহারা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, — এ কি ! সত্যই একজন মানুষ রুধিরাক্ত কলেবরে পড়িয়া আছে ! ঝোপের ভিতর জ্যোৎস্নালোক স্পষ্ট পৌছিতে পারে নাই, তাই কিছু অন্ধকার ছিল। তাঁহাদের শরীর কণ্টকিত হইল ! তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, কি করা উচিত? ঊষা নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মানুষটি এখনও জীবিত আছে — যত্ন করিলে বাঁচিতে পারে। কিন্তু যত্ন অতি শীঘ্র হওয়া আবশ্যক।

হাসপাতাল এখান হইতে অনেকটা দূর, আর তাঁহাদের বাসা অতি নিকটে। বিভা বলিলেন, "আপাতত আমরা ইঁহাকে বাসায় লইয়া গিয়া প্রাথমিক প্রতিবিধান (first-aid) করি, পরে যাহা হয়, করা যাইবে। কিন্তু মিসিস্ সেন যদি বিরক্ত হ'ন !"

কোরেশা। তিনি নিশ্চয় বিরক্ত হইবেন না ; যদি হ'ন ত আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিব।

ঊষা। মরণাপন্ন লোকের সাহায্যে মিসিস্ সেন আপত্তি করিবেন না। এখন তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি একটা 'ডান্ডি' লইয়া আসি !

'ডান্ডি' শিবিকার ন্যায় বাহন বিশেষ। দুই বা তিন জন কুলি স্কন্ধে বহন করে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় দার্জিলিঙ্গে 'রিক্‌শ', অশ্ব এবং 'ডান্ডি' ব্যতীত অপর কোন প্রকার বাহন ছিল না।

সৌভাগ্যবশতঃ 'ডান্ডি' শীঘ্রই পাওয়া গেল ; তাঁহারা মৃতপ্রায় লোকটিকে লইয়া বাসায় ফিরিলেন।

* * * *

তারিণী। স্ত্রীলোক হইলে আমার চিন্তা ছিল না। কিন্তু এ পুরুষ মানুষের যত্ন কে করিবে? তোমরা জানই ত, আমার এখানে পুরুষ চাকর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; বয়টা ছেলেমানুষ; বেহারা ও পানিওয়ালা এ বাড়ীতে রাত্রিবাস করে না। একমাত্র বাবুর্চি — সে ত রান্নাঘর ছাড়িয়া নড়িবার পাত্র নয়!

কোরেশা। তা কি করা যাইবে? এখন ত ইহাকে আনিয়া ফেলিয়াছি।

তারিণী। তা বেশ, আপনারই শুশ্রূষা করিবেন। আমি এ দায়িত্বের মধ্যে নাই। বিভা ত খাটিবেই। কোরেশা-বি! আপনারও পর্দা করা চলিবে না — আপনি এ রোগীকে যথাবিধি দেখিবেন। আর পদ্মরাগ! তুমিও —

সিদ্দিকা। আমি যে 'প্রাথমিক প্রতিবিধান' (first-aid) বা রোগীসেবার কিছুই জানি না। —

তারিণী। জান না — শিক্ষা কর! বিভা, যাও শিগ্‌গির! তোমার মাতাকে দেখিতে ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া এ বেচারাকে দেখাও।

বিভা দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। তৎক্ষণাৎ ডাক্তারবাবু আসিলেন। কোরেশা গরম জল আনিতে রান্নাঘরে ছুটিলেন। ঊষা ডাক্তারবাবুকে রোগীর ক্ষত পরীক্ষায় সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন, সিদ্দিকা হারিকেন্ লণ্ঠন তুলিয়া আলো দেখাইতে লাগিলেন, পরিচারিকাদ্বয় ঔষধ জল ইত্যাদি সম্মুখে বাড়াইয়া দিতেছিল। আর তারিণী? — তিনি কিছু করিবেন না বলিয়াছিলেন, কিন্তু এখন পুরাতন বস্ত্রের ব্যাণ্ডেজ প্রস্তুত করিয়া দিতেছিলেন।

*   *   *   *

একটি কক্ষে একজন রোগী ঘুমাইতেছিলেন; তাঁহার শয্যার নিকট একটা চেয়ারে বসিয়া সিদ্দিকা একখানি বই দেখিতেছিলেন। বই দেখা হইতেছিল বটে, কিন্তু পড়া কত দূর হইল, বলা যায় না। তিনি জাগিয়া থাকিবার জন্য কখনও বই দেখিতেছিলেন, কখনও উন্মনা হইয়া উল্ বুনিতেছিলেন। কিন্তু কোন কাজই যে ঠিকমত হইতেছিল না, একথা বলাই বাহুল্য; কারণ তাঁহার চক্ষু দু'টি নিদ্রাভারাক্রান্ত ছিল।

একবার রোগী পার্শ্ব-পরিবর্তন করিয়া কাতরধ্বনি করিয়া উঠিল। রোগীর জ্ঞান হওয়াতে সিদ্দিকা একটু আহ্লাদিত হইলেন।

রোগী ডাকিল, — "করিম বখ্‌শ — ও করিম বখশ্ — "

সিদ্দিকা রোগীর কথায় বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "করিম বখশ্ ঘুমাইয়াছে।"

রোগী। তবে কি রাত হইয়াছে? কত রাত্রি হইবে?

সি। প্রায় তিনটা।

রো। তবে তুমি জাগিয়া আছ কেন? তুমি কে?

সি। আমি 'দরিদ্র ভগিনী', আপনি কিছু খাইবেন কি না তাহাই জানিতে আসিলাম।

রো। রফিকা ! তুমি কখন আসিলে ?

সি। আপনার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তিন দিন হইল, আসিয়াছি।

রো। আমি পীড়িত নাকি ? ও ! তাইতে আমি উঠিতে পারি না, আমার সর্বাঙ্গে ভারী ব্যথা হইয়াছে।

"সেজন্য চিন্তা নাই, আল্লাহ্ চাহে আপনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন।" এই বলিয়া সিদ্দিকা এক বাটি দুধ আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন।

রোগী উঠিয়া বসিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, — " এ কাহার বাড়ী ? এ ত সে সেনিটেরিয়ম্ নয়।" সিদ্দিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর কই, আপনিও ত রফিকা নহেন। অনুগ্রহ করিয়া বলুন দেখি, আমি এখানে কিরূপে আসিলাম ?"

সি। সে কথা পরে বলিতেছি ; এখন আপনি বড় ক্লান্ত আছেন, এই দুধটুকু খান দেখি। আপনার কোন চিন্তা নাই।

রোগী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দুগ্ধ পান করিলেন। ইতিমধ্যে সেখানে নলিনী আসিলেন ; তাঁহাকে দেখিয়া সিদ্দিকা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

নলিনী পাশ করা নার্স ; তিনি সময়োপযোগী দুই-চারিটি মিষ্ট কথায় রোগীকে তুষ্ট করিলেন। অতঃপর সিদ্দিকার সাহায্যে তাঁহাব ক্ষতস্থলে ঔষধ লাগাইয়া দিলেন।

রোগীকে যথাবিধি শয্যায় রাখিয়া নলিনী যাইতে চাহিলেন। সিদ্দিকা তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, — "একটু ব'স না, রাত ত আর বেশী নাই।"

নলিনী। তাই ত যাইতেছি, একটু ঘুমাইতে চেষ্টা করিব।

সিদ্দিকা। সে কি — তুমি জাগিয়াছিলে নাকি ? আজ ত —

নলিনী। হাঁ, আজ রাত্রে ত আমার কোন কাজ ছিল না ; কিন্তু পোড়া চক্ষে ঘুম নাই, তাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তোমাদেরও দেখিতে আসিলাম।

সি। আর আমার চক্ষে তোমাদের সকলের নিদ্রা আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে, — আমি যেন চক্ষু খুলিতেই পারি না। আমি তোমার মত জাগিতে পারি না কেন ?

নলিনী। অভ্যাস হইলেই পারিবে। এখন ছাড় — যাই।

তখন রজনী প্রভাত হইয়াছিল। সিদ্দিকা একটি জানালা খুলিয়া দেখিলেন, ঊষার রক্তিমচ্ছটায় আকাশমণ্ডল আরক্ত হইয়াছে। প্রভাত হইয়াছে শুনিয়া রোগী একবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন, কিন্তু কিছু কহিলেন না। আবার পূর্ববৎ চক্ষু বুঁজিয়া রহিলেন।

আরও কত দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। এ পর্যন্ত কেহ রোগীকে নামটি পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নাই। অভাগা রোগী নীরবে সবই দেখিতেন, শুনিতেন, স্বয়ং কিছু বলিতেন না। যেন কি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। প্রতিদিন দেখেন — সেবিকা বদল হয়। আজ রাত্রে নলিনী জাগেন ত কাল রাত্রে সিদ্দিকা কিংবা ঊষা জাগেন। রাত্রে যখনই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখনই দেখিতে পান, এক দেবীমুর্তি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা আছেন। তখন মনে করেন, ইঁহারা যথার্থই "ভগিনী"। রফিকা কি এত যত্ন করিতে পারিত ?

একদিন অপরাহ্নে সিদ্দিকা তাঁহার নিকটে বসিয়া ক্রুশে কি বুনিতেছিলেন, সেই সময় রোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, — "সত্য বলুন দেখি, আমি কোথায়? এ কাহার বাড়ি? আমি কি প্রকারে এখানে আসিয়াছি?"

সি। আপনি কারসিয়ঙ্গে মিসিস্ সেন নাম্নী এক ব্রাহ্ম মহিলার বাসায় আছেন। আমরা সকলে তাঁহারই বাসার লোক। আপনি বোর্ডিলন রোডের পার্শ্বে একটি শর্টকাট রাস্তার ধারে আহত অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, আমরা দেখিতে পাইয়া আপনাকে এখানে আনিয়াছি।

এমন সময় কে বাহির হইতে ডাকিল, — "সিদ্দিকা, শুনে যাও!"

সিদ্দিকা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেলেন। রোগীর সহিত আর কোন কথা হইল না। রোগী ভাবিলেন, এ মেয়েটি তবে মুসলমান। ব্রাহ্ম-বাড়ীতে মুসলমান — এ কি প্রহেলিকা! যাক্ — আমার কি।'

তারিণী আসিয়া দেখিলেন, রোগী অনেকটা সবল ও সুস্থ হইয়াছেন এবং উঠিয়া বসিয়াছেন। তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

রোগী। আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ! আপনাদের যত্নে আমি জীবন ফিরিয়া পাইলাম! এখন আমার মনে পড়ে, আমি কিরূপে আহত হইয়াছিলাম। আমি দার্জিলিং হইতে সেদিন কারসিয়ঙ্গে আসিয়াছিলাম; হোটেলে রাত্রিযাপন করিবার মানসে সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। পথে তিনজন লোক আমাকে ধরিল। তাহারা আমার ঘড়ি, চেন, চশমা ইত্যাদি কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল। আমি 'পুলিশ! পুলিশ!' বলিয়া চীৎকার করায় তাহারা ছোরা ও লাঠির দ্বারা আমাকে আক্রমণ করিল, আমি অজ্ঞান হইয়া ভূতলশায়ী হইলাম। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আপনারাই জানেন।

তারিণী। অত্যধিক রক্তস্রাব হওয়ায় আপনি মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। এখানে আনিবার পর আপনার অবস্থা এমন ভীষণ ছিল যে, আমরা আর আপনাকে কষ্ট দিয়া হাসপাতালে পাঠাইতে সাহস করি নাই। আমাদের প্রধান চিন্তা ছিল, আপনার প্রাণরক্ষা করা। যাহা হউক, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমরা আপনার 'দরিদ্র ভগিনী', আমাদের সাধ্যমত আপনার সেবা যত্ন করিব। আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

রোগী। 'লতীফ আল্‌মাস্'। আপনাদিগকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, জানি না। মাতা, ভগিনীও এতটা যত্ন করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

মিঃ লতীফ আল্‌মাসের যখন রোগের কিছু উপশম হইল, তখন আর 'ভগিনী'গণ তাঁহার নিকট বড় একটা আসিতেন না। কেবল কম্পাউন্ডার ঈশানবাবু দুই বেলা তাঁহার ক্ষত অঙ্গে প্রলেপ দিয়া যাইতেন। এইরূপে ঈশানবাবুর সঙ্গে লতীফের বেশ আলাপ হইল; তিনি ইঁহার নিকট 'ভগিনী'দের সংক্ষিপ্ত এবং দীন-তারিণীর বিস্তৃত পরিচয় পাইলেন। তিনি কেবল সিদ্দিকার পরিচয় দিতে পারিলেন না।

ল। আপনারা এরূপ অজ্ঞাতকুলশীলা স্ত্রীলোককে আশ্রয় দিতে সঙ্কুচিত হন না? হইতে পারে, তিনি খুন করিয়া আসিয়াছেন; হইতে পারে, তিনি নিতান্ত জঘন্য স্থান হইতে আসিয়াছেন।

ঈ। যিনিই যাহা করিয়া আসুন না কেন, আমাদের 'তারিণী-ভবন' গঙ্গা — ইহাতে এক ডুব দিলেই সকলে পবিত্র হইয়া যায়।

ঈশানবাবুকে সকলে 'ঈশান-দা' বলিয়া ডাকেন! লতীফও তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ
শরৎকুমার

শরৎকুমার নামক একটি ৯ বৎসরের বালক তারিণী-ভবনে আসিয়াছে। ধীরেন্দ্রবাবু অতি নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্ম। পূর্বে তিনি ধনী লোক ছিলেন। কালের কুটিল আবর্তে এখন দরিদ্র হইয়াছেন। শরৎ এক বৎসর বয়সে মাতৃহীন হয়, সুতরাং পিতার বড় আদরের ধন। ধীরেন্দ্র বাবুর নিকট সমস্ত জগৎ — ঐশ্বর্য-বিভব একদিকে, আর শরৎ একা একদিকে। শরৎকে পাইয়া ধীরেন্দ্র ভাবিতে পারিতেন না যে, জগতে ইহার অপেক্ষা আরও কিছু মূল্যবান জিনিস আছে।

দুই বৎসর যাবৎ শরৎ ম্যালেরিয়া, প্লীহা প্রভৃতি কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছে। ডাক্তারী, কবিরাজী, হাকিমী — সকল প্রকার চিকিৎসাই শরৎ অতিক্রম করিয়াছে। ধীরেন্দ্র আর ডাক্তার হাকিম বিশ্বাস করেন না।

হতভাগ্য ধীরেন্দ্রের বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক নাই — তাঁহার মাতা ভগ্নী ইত্যাদি কেহই নাই। দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়াগণ দরিদ্রের বাড়ী আসিবেন কেন? যাহার কপাল পোড়ে তাহার বিপদও শতাধিক। ধীরেন্দ্র স্বয়ং দিবারাত্রি শরতের শুশ্রূষা করিয়া হতাশ ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি অবশেষে অধিকতর ও যথোপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষার আশায় শরৎকে তারিণী-আতুরাশ্রমে আনিয়া রাখিলেন! আশ্রমবাসিনীগণ যথাসাধ্য তাহার যত্ন করিতে লাগিলেন। শেষে বায়ু-পরিবর্তনের নিমিত্ত তাহাকে লইয়া কারসিয়ঙ্গে আসিলেন।

শরৎকে লইয়া তারিণীর আসিবার ৮ দিন পরে লতীফ আসিয়াছেন। তিনি ক্রমে আরোগ্যলাভ করিলেন।

লতীফ অনেকটা সুস্থ হইলেন ; ধীরে ধীরে হাঁটিতে পারেন। তিনি সময় সময় শরতের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিতেন। শরৎ এখন নিতান্ত শীর্ণ অবস্থায়। একদিন বাল-স্বভাবসুলভ হাস্যমুখে সে সৌদামিনীকে বলিল, — "পিসিমা! বাবা কখন আসিবেন?"

সৌদামিনী। তোমার বাবা ত এখনই গেলেন। আবার বাবাকে দেখিতে চাও কেন? আমাদের উপর বুঝি তোমার মায়া নেই? বাবাই সব? বাবা আসিলে কি হয়?

শরৎ। বাবা ত কিছু করেন না, তবু বাবা আসিলে, অসুখ সারে — জ্বর কমিয়া যায়। আরও কত কি হয়। বাবাকে দেখিলে কত সুখ হয়।

সিদ্দিকা। তবে তোমার বাবাকে ডাকিতে পাঠাই?

শ। না। এখন আর বাবাকে কষ্ট দিয়া কাজ নাই! বাবাকে বেশী কষ্ট দিলে ঈশ্বর বিরক্ত হইবেন।

ল। (ঈষৎ হাস্যে) তাও তুমি জান? আর কি জান?

শ। গান জানি। আপনারা গান শুনিবেন?

সৌ। না, তুমি এখন চুপ কর। বেশী কথা কহিলে তোমার কাশি বৃদ্ধি হয়, তাহাতে ঈশ্বর দুঃখিত হইবেন।

শ। আমি তবে কবিতা পাঠ করি?

সৌ। এখন না।

শ। আমার গান আপনাদের ভাল লাগে না?

নলিনী। ভাল ত লাগে, কিন্তু তোমার কষ্ট হয় যে। তুমি এখন একটু ঘুমাও দেখি।

শ। আমি একটু কষ্ট স্বীকার করিলে — কষ্ট করিয়া গান গাহিলে আপনাদের সুখী করিতে পারি, তবে সে কাজ করিব না কেন? মানুষ কয়দিনের জন্য? পরের জন্য কষ্টভোগ করিব না, তবে কি করিব?

লতীফ ভাবিলেন, এ বালক কে? — এ যে মূর্তিমান প্রেম! ধীরেন্দ্রবাবু এমন রত্ন কোন্ তপস্যার ফলে পাইয়াছেন? তিনি বালকের তেজঃপূর্ণ উদার মুখমণ্ডল দেখিয়া মোহিত হইলেন।

শরৎ এবার গান আরম্ভ করিল; কিন্তু এক পদ গাহিতে না গাহিতেই কাশিতে কাশিতে অস্থির হইল। সৌদামিনী বলিলেন, "তুমি কথা শুন না তুমি ভারি দুষ্ট ছেলে! তোমার সব গুণ আছে, কেবল বাধ্যতা নাই।"

শ। পিসিমা! অবাধ্যতার শাস্তি যথেষ্ট হইল, আর কেন — (কাশি)।

অত্যধিক দুর্বলতাবশতঃ শরৎ আর তাহার অতি সাধের গান " এই বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে —" গাহিতে পারে না। তবু সময় সময় ভৈরবী বা বেহাগের গৎ আবৃত্তি করিত। নিস্তব্ধ গভীর রজনীতে ঐ কণ্ঠে — ঐ শরৎকুমারের সুমধুর কণ্ঠস্বরে সেই সাধারণ 'সা-রে-গা-মা ' যে কত মধুর শুনাইত, তাহা যে শুনিয়াছে, সেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। স্বর্গীয় সঙ্গীত কি তাহা হইতে অধিক সুন্দর?

ক্রমে শরৎ বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িল; আর তাহার সঙ্গীতে রুচি নাই। যে সৌদামিনী তাহাকে গাহিতে নিষেধ করিতেন, তিনিই এখন এক একবার মিনতি করিয়া বলেন, — "বাবা, একটি গান গাও ত।" বাবা উত্তর করে, "না — ভাল লাগে না!" সৌদামিনী মুখ ফিরাইয়া নীরবে অশ্রুমোচন করেন।

১লা আষাঢ় তারিণী-বিদ্যালয়ের ছুটি শেষ হইবে বলিয়া কেবল সৌদামিনী, নলিনী ও সকিনাকে লতীফ ও শরতের শুশ্রূষার জন্য তথায় রাখিয়া, অপর সকলকে লইয়া তারিণী কলিকাতায় গিয়াছেন। সিদ্দিকা স্বয়ং সুস্থ সবল নহেন বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন। ঈশানবাবুও রহিলেন। এই কথা স্থির হইল যে, শরতের অবস্থা কিরূপ হয়, দেখিয়া, শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি অবশিষ্ট সকলে কলিকাতায় যাইবেন।

সন্ধ্যার পর লতীফ আবার শরৎকে দেখিতে আসিলেন। তাহার আকর্ষণী-শক্তি এমনই প্রবল যে, কেহ তাহাকে ছাড়িয়া দূরে থাকিতে পারে না। এ সময় ধীরেন্দ্রও আসিয়াছিলেন। শরৎ ক্ষীণ ক্ষুদ্র বাহু দ্বারা পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, "কেমন আছ বাবা? আজ তুমি হয়ত কিছু খাও নাই, তোমার মুখ শুক্‌নো!"

ধী। (পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া) আমি বেশ আছি। আমার জন্য চিন্তা নাই। তুমি ভাল হইলে জীবন ফিরিয়া পাই।

শ। বাবা, মরণ ত একদিন আছেই, তবে সে নাম শুনিলে তোমরা ভয় পাও কেন? জীবন অল্পদিনের জন্য, মরণ ত চিরদিনের জন্য! তুমি আমাকে যত ভালবাস, সে ভালবাসা ঈশ্বরকে —

ধী। বাবা, চুপ কর! তোমার বক্তৃতা বন্ধ কর শরৎ! বার বার ঐ কথা! আর কোন কথা নাই?

শ। অন্য কথা থাকিতে পারে, আমি জানি না। (ঈষৎ হাস্যে) তুমিই না বলিয়াছ, ঈশ্বরকে সকলের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে হয়? তবে তুমি শরৎ — ক্ষুদ্র শরৎকে ঈশ্বরের চেয়ে বেশী ভালবাস কেন?

ধী। তুমি চুপ করিবে না? এখন একটু ঘুমাইবে না ? তবে আমি চলিলাম।

ধীরেন্দ্রকে গমনোদ্যত দেখিয়া শরৎ ডাকিয়া বলিল — "বাবা! বাবা! ফের! তুমি রাগ কর কেন? আর একদিনের জন্য এত মান অভিমান কেন।" "আর এক দিনের জন্য" — কথাটা ধীরেন্দ্র তখন বুঝিতে পারেন নাই — পরদিন বুঝিলেন ॥

অদ্য শরৎ বড়ই কাতর। কাশিতে কাশিতে মূর্চ্ছিতপ্রায়। সকলেই তাহার জন্য দুঃখিত। সৌদামিনী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যেন সে মৃত্যুর ছায়ায় আচ্ছন্ন মুখ আর দেখিতে পারেন না। সে দৃশ্য নিতান্তই অসহ্য! শরৎ উগ্‌গ্রীব ছিল — পিতার জন্য ; যেন পিতা আসিলেই বিদায় লইয়া যাইতে পারে। হতভাগ্য পিতা আসিলেন। শরৎ অধীরভাবে বলিল, "বাবা! আর বাঁচি না!"

ধী। বাবা! তুমি অমন কথা বলিলে আমি বিবাগী হইয়া বনে যাইব। তুই ছাড়া আমার আর কে আছে? আমার জগৎ আঁধার হইবে যে বাবা! তাহা কি তুই বুঝিস্ না?

আর শরৎ 'আহাটি' বলে নাই। সে জানে, তাহার জন্য তাহার পিতার কত কষ্ট হয়। তাই আর নিজের যন্ত্রণা পিতাকে জানিতে দেয় নাই। নীরবে ছট্‌ফট্ করিয়া মরণ-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল। নিতান্ত অসহ্য হইলে শয্যায় পড়িয়া এ-পাশ ও-পাশ গড়াগড়ি করিত — কিন্তু 'উঃ' পর্যন্ত বলে নাই। কি মহতী সহিষ্ণুতা!! এ কি মানবে সম্ভব? মানব এমন ধৈর্য পাইবে কোথায়?

তারপর? তারপর আর কি — শরৎ পিতাকে কোলে লইতে ইঙ্গিত করিল, পার্থিব পিতার ক্রোড় হইতে বিশ্বপিতার ক্রোড়ে গিয়া অনন্ত বিশ্রাম লাভ করিল!! শ্রাবণের মেঘ গভীর গর্জনে বৃষ্টির ছলে কাঁদিয়া ফেলিল! — সমীরণ চিৎকারস্বরে 'হায় হায়' বলিয়া উঠিল!! গগনে শশী তারা কিছুই নাই — জগৎ ঘোর অন্ধকার!!!

সৌদামিনী ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে, শরৎ যেন মরিতেছে। মৃত্যুকালে যেন সে তাহাকে বলিল, — "পিসিমা ! আমি এখনও মরি নাই — তোমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" সৌদামিনী জাগিবা মাত্রই পাগলিনী-প্রায় মুক্তকেশে দৌড়িলেন। শরৎকে ডাকিলেন — শরৎ একটু চক্ষু খুলিল ; কিছু বলিল না — তখন তাহার বাক্‌শক্তি ছিল না। আবার চক্ষু দুইটি মুদ্রিত হইল। যাও সৌদামিনী ! আর কি দেখ? এ তোমার শরৎ নহে, এ কেবল মৃন্ময় পুতুল মাত্র — তোমার শরৎ এখানে নাই — নাই ! !

* * * *

ধীরেন্দ্র সৌদামিনীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সৌদামিনী চিনিয়াছিলেন, ধীরেন্দ্র চিনেন নাই। তিনি ১৭ বৎসর হইতে ভগিনীকে দেখেন নাই, সুতরাং চেনা অসাধ্য। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী সৌদামিনী কথাবার্তায় ভ্রাতাকে চিনিয়াছেন, কিন্তু নিজের পরিচয় দেন নাই। শরৎকে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, 'আপন' বলিতে একটি লোক পাইয়া দগ্ধপ্রাণ জুড়াইবেন। কিন্তু পোড়া-কপালে তাহাও হইল না। সেই জন্য ভ্রাতাকে আর পরিচয় দিলেন না। কি জানি, ভাইটিকে 'ভাই' বলিয়া ডাকিলে যে আনন্দ হয়, তাহাতেও যদি বিধাতার হিংসা হয়, তাহার ফলে ভাইটিও যদি না থাকে? তবে কাজ কি? দগ্ধ-হৃদয়ের আগুন কণামাত্র নির্বাপিত করিবার চেষ্টা করাও বৃথা — জ্বলুক হৃদয় তবে জ্বলুক ! জ্বলুক ! !

শরৎকুমারের মৃত্যুর পর ধীরেন্দ্র আর দেখা দেন নাই। কোথায় গিয়াছেন, আল্লাহ্ জানেন। যাও ধীরেন ! যোগী হইয়া গহন কাননে, হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে শরতের অনুসন্ধান, — না, শরতের নির্মাতার অনুসন্ধান কর গিয়া। নিষ্ঠুর জগৎ তোমাকে অনায়াসে ভুলিয়া থাকিবে !

নবম পরিচ্ছেদ
পদার্থপরতা

মানুষ সময় সময় কোন একটি জিনিসের প্রতি কেন যে আকৃষ্ট হয়, তাহা তাহারা নিজেই বুঝিতে পারে না। সেই অজ্ঞাত কারণটা কি? লতীফের পীড়ার সময় তিনি সর্বদা সিদ্দিকাকে আপন শিয়রে উপবিষ্টা দেখিতে ইচ্ছা করিতেন। অন্যান্য ভগিনীগণ নানাপ্রকার গল্প পরিহাস দ্বারা তাঁহার রোগ যন্ত্রণা লাঘব করিতে চেষ্টা করিতেন, আর সিদ্দিকা কেবলই নীরবে বসিয়া থাকিতেন। লতীফ ঐ মৌনভাবই ভালবাসিতেন। এখন লতীফ অনেক পরিমাণে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, সুতরাং সিদ্দিকা আর নিকটে আসিয়া বসেন না।

এমন স্বর্গতুল্য স্থান ছাড়িয়া যাইতে লতীফের মনে একটু কষ্ট হইতেছিল ; কিন্তু যাইতে হইবেই। শরতের জন্য 'ভগিণীগণ শ্রাবণ মাসের ১৫ই পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ; কিন্তু শরৎ-কামিনী শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহেই শেষ হইয়াছে। 'ভগিণী'গণ এখন কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন ; তাঁহারা কেবল লতীফের গৃহ-গমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। লতীফ হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পাথেয় ইত্যাদিতে ২৫০্ টাকার কম লাগিবে না।

কাপড় দুই এক জোড়া প্রস্তুত করিতে হইবে। আশ্রমে তাঁহার জন্য যে ব্যয় হইয়াছে, তাহাও শোধ করা উচিত, কারণ তাঁহার ন্যায় বিশিষ্ট লোকে আতুরাশ্রমের দান গ্রহণ করিলে দান দিবে কে? তিনি ৩০০্ টাকা পাঠাইবার জন্য বাড়ীতে চিঠি লিখিলেন।

যথাসময় লতীফের পত্রের উত্তর আসিল। পত্রখানি রমণীর কোমল হস্তলিখিত ছিল বটে, কিন্তু ভাষার কোমলতায় লতীফ সন্তুষ্টি অনুভব করিতে পারিলেন না। পত্রের মর্ম এই ঃ

"তোমার পত্রে জানা যায় যে, একদল দস্যু তোমার সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে ; এবং দুই মাস তুমি পীড়িত থাকায় আমাদের পত্র লিখিতে পার নাই। কিন্তু তোমার সঙ্গী এখানে আসিয়া আমাদের জানাইয়াছেন যে, দস্যুগণ তোমাকে হত্যা করিয়াছে। তিনি তোমার জিনিস-পত্র ফেরৎ আনিয়াছেন। সুতরাং তোমার চিঠি দেখিয়া সন্দেহ হয় যে, আর কেহ তোমার হস্তাক্ষর জাল করিয়া টাকার জন্য লিখিয়াছে। আমরা তোমাকে স্বচক্ষে না দেখিলে, তুমি বাঁচিয়া আছ বলিয়া বিশ্বাস করিব না। আমি ভাইকে এ বিষয় লিখিয়াছি। তিনি তোমাকে দেখিতে যাইবেন, তাঁহার সঙ্গেই তুমি আসিও।"

লতীফ পত্রখানি ছিড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন। কি পাগল, এমন কথা শুনিলে কাহার না রাগ হয়? সালেহার কোন কাজ করিবারই যোগ্যতা নাই ; সন্দেহ যে করিবেন, সে সন্দেহ করিবার যোগ্যতাও তাঁহার নাই। লতীফ ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি করি? টাকা না পাইলে গৃহে গমন করি কি করিয়া? এমন সময় মৃদু পদ-বিক্ষেপে সৌদামিনী তথায় উপস্থিত হইলেন।

সৌদামিনীকে দেখিয়া লতীফের মনে কেমন যেন একটু আনন্দ -সঞ্চার হইল। যেন নিরাশার মেঘ ঘনীভূত হইতেছিল, হঠাৎ আশা-সৌদামিনী দেখা দিলেন। লতীফের হস্তে ছিন্ন পত্রখণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর চিঠি পাইয়াছেন, মিঃ আলমাস্? কি খবর? সকলে ভাল আছেন ত?"

ল। ভাল ত আছেন।

সৌ। তবে কিসের ভাবনা?

ল। কই, ভাবনা ত নাই।

সৌ। কিন্তু আপনি যে ভাল সংবাদ পান নাই, এ-কথা নিশ্চিত। অন্ততঃ আশানুরূপ সন্তোষজনক উত্তর পান নাই।

ল। আপনার কথাই ঠিক। আমি কিন্তু চিন্তান্বিত নহি।

সৌ। আপনি চিন্তান্বিত না হইতে পারেন, কিন্তু রাগান্বিত হইয়াছেন।

ল। (লজ্জিতভাবে) আপনি দেবী, আপনার নিকট কিছু গোপন করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। সত্যই আমার রাগ হইয়াছে। আমি টাকা চাহিয়াছিলাম, তাহা পাঠাইবেন না। আমার টাকা আমিই পাইব না।

সৌ। সেজন্য দুঃখ কেন? আপনার যত টাকা প্রয়োজন, ধার লইতে পারেন, সুবিধামত শোধ করিবেন।

ল। আমাকে এখানে কে চিনে যে টাকা ধার দিবে?

সৌ। আমরা দিব। উপস্থিত আমাদের কয় ভগিনীর হাতে যত টাকা আছে, তাহাতে না কুলাইলে, মিসিস্ সেনকে লিখিয়া তারিণী–ভবন হইতে টাকা আনাইব। আপনার কত টাকার দরকার?

লতীফ বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। টাকা এমন জিনিস — সেই টাকা এ অজ্ঞাতা রমণীগণ তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া দিতে প্রস্তুত। আর তাঁহার স্ত্রী ৩০০ টাকা না হউক, অন্ততঃ ৫০টি টাকাও পাঠাইতে সাহস করেন নাই। লতীফ সকৃতজ্ঞ স্বরে বলিলেন, "ভগিনী! আমি আপনাদের দয়ায় ডুবিয়া আছি। বাস্তবিক আপনাদের অতি–অনুগ্রহে আমি লজ্জিত হই। আমি আপনাদের এত দয়া স্নেহের যোগ্য নহি। আমি পাথেয় অভাবে বাড়ী যাইতে পারিতেছি না। আপাততঃ ১০০ টাকা হইলেই হইবে!"

সন্ধ্যার সময় ভগিণীগণ বাগানে বসিয়াছিলেন। সমস্ত দিনের বৃষ্টির পর আকাশ এখন কিঞ্চিৎ মেঘমুক্ত ছিল। দশমীর শশী প্রাণ খুলিয়া তারাকুমারীদের সঙ্গে হাস্যামোদ করিতেছিল। তাহার রূপের ছটায় ধরণী রজতস্রোতে ভাসিতেছিল। এক একবার একখণ্ড মেঘ আসিয়া সুধাকরকে ঢাকিয়া কৌতুক দেখিতেছিল। সিদ্দিকা এক কোণে বসিয়া ঐ গগনে অলকমালার লুকোচুরি, চারুচন্দ্রমা ও নক্ষত্রের সমাবেশ সমালোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় লতীফ ও সৌদামিনী তথায় উপস্থিত হইলেন। সৌদামিনী সকৌতুকে বলিলেন, "কি সিদ্দিকা! তারা গণিতেছ নাকি?"

সি। (সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কি দিদি! তুমি কিছু বলিতে চাও?

সৌ। হাঁ, মিঃ আলমাস্ বাড়ী যাইবেন, কিন্তু অন্যত্র টাকার যোগাড় হয় নাই; সুতরাং আমাদিগকে চাঁদা তুলিয়া তাঁহার পাথেয় ধার দিতে হইবে। অন্ততঃ ১০০ টাকার প্রয়োজন। তুমি কত টাকা দিতে পার?

সি। আমি মাত্র ৫০ টাকা কি ৬০ টাকা দিতে পারি।

সৌ। দেখুন মিঃ আলমাস্, আপনার ৬০্ টাকা হইল।

লতীফের অপরিমিত কৃতজ্ঞতা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। সে নীরব কৃতজ্ঞতার ভাষা সিদ্দিকা এবং সৌদামিনী বুঝিলেন।

পরদিন প্রাতঃরাশের পর সৌদামিনী সিদ্দিকাকে টাকা দিতে বলিলেন। সিদ্দিকা টাকা আনিবার জন্য উঠিয়া গেলে লতীফ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

সিদ্দিকা একটি একটি করিয়া ৬০টি টাকা লতীফের হস্তে গুণিয়া দিলেন। লতীফ ভাবিতেছিলেন,—যদি স্বর্গ নামে কোন স্থান থাকে তবে এই স্বর্গ! ইহারা কেমন সরল লোক; টাকা কাহাকে দিতেছেন, — এ টাকা ফিরিয়া পাইবেন কি না সে বিষয় একটু চিন্তাও করেন না। তিনি মুগ্ধনেত্রে অর্থদাত্রীর হাত দুইটি দেখিতেছিলেন — সে হাত কেমন স্বাধীন! সিদ্দিকা সস্নেহ কোমল স্বরে বলিলেন, "আর আপনার কত টাকার প্রয়োজন?"

ল। যদি পারেন ত ১০০্ টাকা পুরণ করিয়া দিলে বাধিত হইব।

সি। আমার যাহা ছিল, সব দিয়াছি; বাকী টাকা অপর ভগিনীরা দিবেন।

'আমার যাহা ছিল সব দিয়াছি' কথাটা লতীফের হৃদয়ে গিয়া বাজিল। যে ভাবে, যে অপরূপভাবে কথাটা বাজিল, সেরূপ বাজা উচিত ছিল না। কারণ তাঁহার যে সালেহা আছেন। তিনি বক্তার মুখপানে চাহিলেন, — সে মুখ দেখিয়া কিছু অর্থ বুঝা গেল না — সে মুখ কেবলই দেবতুল্য সুন্দর, সদয়, সরল। লতীফ নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আপনার সুবিধার জন্য কিছু টাকা রাখিলেন না?"

সি। আমার কোন অসুবিধা হইবে না, আপনি সেজন্য ভাবিবেন না।

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী–দি! তোমার ভাগের চাঁদার টাকা দিলে না?

চঞ্চলস্বভাবা বাচাল নলিনী বলিলেন, "দিব বই কি, তবে আমাদের 'পথে কুড়ান ভাইটি' এখন দেশে চলিলেন; জানি না, আবার কবে দেখা হইবে।"

লতীফ। আপনারা দয়া করিয়া স্মরণ রাখিলেই দেখা হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, আমি কলিকাতায় প্র্যাক্‌টিস্ করি না। (লতীফ একজন উদীয়মান ব্যারিস্টার এবং অবস্থাপন্ন জমীদার।)

নলিনী সকিনা খানমকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার বাক্স খুলিয়া দশটি টাকা আনিয়া দাও ত দিদি! এই যে চাবি —"

সকিনা ২০ টাকা আনিয়া নলিনীর হস্তে দিলেন। নলিনী টাকা গণিয়া বলিলেন, "দশ বেশী কেন?"

স। চাঁদার টাকা দিবার অধিকার কি আর কাহারও নাই? আমি গরীব মানুষ, বেশী দিতে পারিলাম না।

ল। (সকৃতজ্ঞস্বরে) আপনাদের সৌজন্য দেখিয়া আমার হিংসা হয়, — আমিও কেন আপনাদের মত তারিণী–ভবনের একজন 'ভগিনী' হই নাই!

ন। এক জোড়া চুড়ি আর একখানা গৈরিক শাড়ী পরিলেই ত 'ভগিনী' হইতে পারেন!

স। খোদাতালার সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব পুরুষ হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি বাঞ্ছনীয়? লেডী ডাক্তার নলিনীর ব্যবস্থা অনুসারে এ শাড়ী ও চুড়ি জোড়াই কি বড়?

(ঈশান বাবুর প্রবেশ)

ঈশান। সৃষ্টি সম্বন্ধে কি কথা হইতেছে?

ন। মিঃ আলমাস্ মেয়েমানুষ হন নাই বলিয়া আক্ষেপ করেন।

ল। যে–সে মেয়ে ত নহে, আপনাদের ন্যায় দেববালা হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

ঈ। অবশ্য। (ভগিনীত্রয়ের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া লতীফের প্রতি) কিন্তু ইঁহারা কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা আপনি জানেন কি?

ল। না।

ঈ। তবে শুনুন ঃ—

“দুঃখীদের রোদনের ধ্বনি
একদা পশিল গিয়া স্বরগ–দুয়ারে।
জগদীশ সদয় হইয়া
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন তাহাদের 'পরে।
স্বরগের বিচিত্র সুন্দর
ফুলদল ধরাতলে পতিত হইল ;
ইতস্ততঃ যে যেখানে পায় —
মানুষের উপবনে ফুটিয়া উঠিল।
মানুষেরা নিতান্ত পামর
আদর করিতে ফুলে নাহি ভালবাসে।
ফুলগণ কহিল বিধিরে,
“মোদের পাঠালে কেন মানব–আবাসে?”
তাই প্রভু দয়ার সাগর
স্বর্গচ্যুত ফুল ল'য়ে গাঁথিলেন মালা।
তদবধি তারিণী–ভবনে
'দরিদ্র–ভগিনী' নামে রহে সুরবালা।”

ল। ঈশান–দা, আপনি চমৎকার কবি! আমি মনে করিতাম, 'বেরিয়াম্ সাল্‌ফেট্' ও 'বেরিয়াম সাল্‌ফাইড্' এর পার্থক্য–চিন্তায় যে মস্তিষ্ক অহরহ ব্যস্ত থাকে, সে আর অন্য বিষয় ভাবিবার অবসর পায় না ; এখন দেখি, বিবিধ ঔষধের শিশির সঙ্গে এক শিশি 'সাল্‌ফেট অব্ কবিত্ব'ও থাকে!

ঈ! তা থাকিবে বই কি! কম্পাউণ্ডারকে সকল প্রকার ঔষধই নাড়াচাড়া করিতে হয়। বিশেষতঃ আমাদের মিসিস্ সেন যেখানেই যান, হাসপাতাল তাঁহার সঙ্গে যায়। নার্স নলিনী এবং আমি আপনার শুশ্রূষার জন্য আহূত হইয়াছি। আমাদের সঙ্গে একটা 'ডিসপেনসরী বক্স' আসিয়াছে।

এমন সময় সৌদামিনী আসিয়া বলিলেন, “কিসের আলোচনা হইতেছে?”

ঈ। কিছু না, দিদি! অদ্য ডাক্তারের ব্যবস্থানুসারে মিঃ আলমাস্‌কে একমাত্রা 'বাই কার্‌বনেট্ অব্ কবিতা' দিলাম!

সৌ। তা বেশ করিয়াছেন। টাকা পাইলেন মিঃ আলমাস্?

ল। হাঁ, ৮০ টাকা পাইলাম।

সৌ। বেশ, বাকী ২০্ টাকাও পাইবেন।

বিদায়ের দিন লতীফ অতি প্রত্যূষে জাগিলেন, জাগিবা মাত্র তাঁহার কর্ণে দূরাগত সঙ্গীত–ধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়, সুতরাং সঙ্গীতের রাগ লয় চিনিলেন

— মধুর ভৈরবী রাগিণী। আর ঘরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না — সেই হারমোনিয়মের সুর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। অদ্য তাঁহার বিদায়ের দিন —

তাই কি দেবতাগণ (স্বরগপুরে)
গাহিছে বিদায়–গীতি করুণ সুরে?

তিনি বাহির হইয়া জনৈক চাকরানীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, — সিদ্দিকা হারমোনিয়ম্ বাজাইতেছেন। তিনি কান পাতিয়া আশা করিলেন যে, গায়িকার কণ্ঠস্বরও শুনিবেন, কিন্তু তাহা ভাগ্যে ঘটিল না। ক্রমে সঙ্গীত থামিল। গায়িকা কি হৃদয়ের গভীর বেদনা এই সঙ্গীতরূপে বাতাসে মিশাইয়া অনন্ত আকাশে ঢালিতেছেন? তাঁহার প্রাণটা গলিয়া তরল হইয়া ঐ সঙ্গীতস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল কি? না, এ কেবল তাঁহাদের প্রাত্যহিক প্রাতঃসঙ্গীত?

লতীফ মধ্যাহ্নে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। সকলেই নানা প্রকার স্নেহসূচক ভাষায় তাঁহাকে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন। কেবল সিদ্দিকা একটিও কথা বলেন নাই। লতীফ ভাবিলেন, "তিনি পাষাণ–প্রতিমা!"

দশম পরিচ্ছেদ
গৃহ–জীবন

লতীফ বাড়ী যাইবার চিন্তায় সুখী হন নাই। লোকে বিদেশ হইতে গৃহে যাইতে যেরূপ আনন্দিত হয়, লতীফ তদ্রূপ আহ্লাদে আত্মহারা হন নাই — বরং বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে যাইতে বিষাদ কেন? গৃহে কি শান্তি নাই? শান্তি নাই বলিয়াই ত এ গৃহযাত্রা — শুভযাত্রায় আনন্দ নাই।

লতীফ শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছেন। পিতামহ বর্তমানে পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি ও তাঁহার ভগিনীদ্বয় রশীদা ও রফিকা সম্পত্তির অংশে বঞ্চিত হইলেন। পিতামহের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হাজী হবীব আলম জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি বিধবা ভ্রাতৃবধূ ও তাঁহার শিশু দুইটিকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। লতীফের মাতা অতিশয় বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন, তিনি দেখিলেন, মুষ্টিঅন্ন ত যথাবিধি লাভ হইতেছে, কিন্তু লতীফের সুশিক্ষার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। তিনি দাসীর অধম হইয়া ভাশুর–পত্নীর মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন, ; তাহার ফলে তিনি (ভাশুর–পত্নী) স্বামীকে বলিয়া কহিয়া লতীফকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন।

লতীফ ক্লাসের পর ক্লাস উল্লঙ্ঘন করিয়া ২২ বৎসর বয়সে এম, এ. পাশ করিয়া ফেলিলেন। এই সময় তাঁহার মাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা রশীদার ননদের সহিত লতীফের এবং অন্যত্র রফিকার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিলেন। রফিকার বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু লতীফের তিন বৎসর পরে বিবাহ হওয়ার শর্তে কেবল "আক্‌দ্‌বস্ত" হইয়া রহিল।*

---

* প্রচলিত ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, লতীফের ভাবীপত্নী 'বাগ্‌দত্তা' হইয়া রহিলেন।

অতঃপর লতীফ পিতৃব্যের অনুগ্রহে ইংলন্ড গেলেন। তথা হইতে তিন বৎসর পরে ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিলেন।

হাজী হবীব আলম অত্যন্ত জমিদারী-পিপাসু ছিলেন। তিনি দেখিলেন, 'লতীফ ব্যারিস্টার' কন্যাদায়গ্রস্ত লোকদের জন্য বেশ একটি মনোরম 'প্রলোভন'। তাঁহার জনৈকা আত্মীয় একমাত্র কন্যা লইয়া বিধবা হইয়াছেন, এই কন্যাটিকে হস্তগত করিলে বিধবার সম্পত্তিও করায়ত্ত হয়। কিন্তু বোকা লতীফ সহজে দ্বিতীয় বিবাহে সম্মত হইবার পাত্র নহেন। এই জন্য তিনি রশীদার স্বামীর সঙ্গে এক 'চাল' চালিলেন। জমীদার হইলেও মহম্মদ সোলেমান ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ন্যায়, সাধুতা ও ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন।

"আক্‌দবস্ত"-এর তিন বৎসর পরে হাজী সাহেব জামাতাকে লিখিলেন যে, তাঁহারা বিবাহের জন্য প্রস্তুত কিন্তু বিবাহের পূর্বেই কন্যাকে যেন তাঁহার ভাগের সম্পত্তি লিখিয়া দেওয়া হয়।

সোলেমান উত্তরে লিখিলেন যে, তিন বৎসরের শর্ত অনুসারে তাঁহারা বিবাহের জন্য প্রস্তুত আছেন। যথাবিধি বিবাহের দিন তারিখ ধার্য হউক। দ্বিতীয়তঃ, কন্যা যখন বয়োপ্রাপ্তা (অর্থাৎ ১৮ বৎসরের) হইবে, তখন সে নিজের সম্পত্তির ভাগ বুঝিয়া লইবে। তিনি স্বয়ং কিছু লিখিয়া দিবেন না।

তদুত্তরে হাজী সাহেব জানাইলেন যে, সম্পত্তি লিখিয়া না দিলে ও মেয়েকে বিবাহ করা হইবে না। অতএব তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ অন্যত্র ঠিক করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর যেন তাঁহাকে দোষ দেওয়া না হয়।

সোলেমান তাঁহাকে লিখিলেন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। সেই দিন তিনি লতীফকেও পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কি বক্তব্য আছে।

পল্লীগ্রামের ডাকঘর জমীদারদের করায়ত্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হাজী সাহেব দৃষ্টি রাখিলেন, যাহাতে লতীফ সোলেমানের সহিত পত্রব্যবহার করিতে না পারেন। লতীফের নামে সোলেমানের যে রেজেস্ট্রী পত্র আসিয়াছিল, তাহা তিনি জাল স্বাক্ষর দিয়া চুরি করিলেন। সুতরাং লতীফ সোলেমানের পত্রই পাইলেন না আর উত্তর দিবেন কি!

এদিকে সোলেমান লতীফের কোন উত্তর না পাইয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। ইহার পক্ষকাল পরে যখন শুনিলেন, লতীফ পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন, তখন তাঁহার বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইল।

হতভাগ্য লতীফ দ্বিতীয় বিবাহে মোটেই সম্মত ছিলেন না। কিন্তু পিতৃব্য, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার মাতা বলিলেন, "বাবা! তুমি দুই বিবাহ করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না। না করিলে হাজী সাহেব রাগ করিয়া তোমাকে এক কড়ার সম্পত্তিও দিবেন না।"

ল। আমি তাঁহার এক কানাকড়ির সম্পত্তিও চাহি না। তিনি অনুগ্রহপূর্বক সুশিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট।

লতীফের মাতা। তুমি সম্পত্তি না চাহিলে কিছু আসে যায় না। হাজী সাহেবের কথার অবাধ্য হইলে সকলেই তোমাকে কৃতঘ্ন পামর মনে করিবে।

ল। তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া সব গোল চুকাইয়া দিই।

মাতা। শুধু আত্মহত্যা কেন, মাতৃহত্যাও কর। আইস, মাতা পুত্রে হাত ধরাধরি করিয়া পুকুরে ডুবি।

লতীফের জনৈকা মাসী কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা! আমার ত আর কেহ নাই, একমাত্র আশা–ভরসা তুমি! তোমরা মাতা পুত্রে আত্মহত্যা করিলে আমার কি গতি হইবে?"

অপর কক্ষ হইতে জনৈকা পিসি আসিয়া সক্রোধে বলিলেন, "বাবা! আজিকালিকার ছেলেদের কথা শুনিলে মরা মানুষের পিত্তি জ্বলিয়া যায়! হাজী সাহেব সম্পত্তি লিখিয়া দিতে চাহিয়া কি এমন দোষ করিলেন? সম্পত্তি হইলে তোমার হইবে, ভোগ করিবে তুমি! বাহাত্তরে বুড়ো হাজী সাহেব কবরে লইয়া যাইবেন না। সোলেমানকে একটু শাস্তি দেওয়া দরকার, তাই আবার বিবাহ করিতে বলেন।"

ল। শাস্তি ত সোলেমান সাহেবের হইবে না; শাস্তি দেওয়া হইবে একটি নিরীহ জীবকে।

পিসি। (স্বগত) এখনও তাহাকে চক্ষে দেখা হয় নাই, তবু এত মায়া! (প্রকাশ্যে)

'নিরীহ জীব'টির এমন কি ক্ষতি হইবে? আর কেহ সপত্নী লইয়া ঘর করে না কি? লোকে শুনিলে মনে করিবে, হাজী সাহেব না জানি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছেন যে ইহারা মাতাপুত্রে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইল! ঐ দেখ, রফিকা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু মুখ ফুলাইয়াছে; কালি হইতে সে অন্নজল গ্রহণ করে নাই।

লতীফ চাহিয়া দেখিলেন, রফিকা সত্যই ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছেন। তিনি কর্কশস্বরে বলিলেন, "তবে আমাকে কি করিতে বল?"

পিসি। বলি আমার মাথা মুণ্ডু! (যুক্তকরে) বলি, সব দিক বজায় রাখ, গুরুজনের কথা রাখ!

লতীফ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিদানের ছাগলের মত বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অর্থপিপাসু হাজী সাহেব কিন্তু বেশ ঠকিলেন। লতীফের শাশুড়ীকে তিনি যেরূপ বৃহৎ সম্পত্তিশালিনী মনে করিয়াছিলেন; প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহা নহেন। সমস্ত জমিদারী ঋণজালে আবদ্ধ! ইঁহারা কিছু লাভ করিবেন, দূরে থাকুক বৃথা মোকদ্দমায় আরও ঘরের টাকা নষ্ট করিতে হইল!

সালেহা (লতীফের স্ত্রী) জানিতেন যে, তাঁহার সম্পত্তির জন্যই বিবাহ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার আর অন্য গুণের প্রয়োজন নাই। তিনি অত্যন্ত মুখরা ও কলহ-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার দৈনিক কার্য ছিল, দাসী প্রহার করা। লতীফও তটস্থ থাকিতেন!

লতীফ বাহির হইতে আসিলে প্রথমে মাতার নিকট যাইতেন, সেখানে বসিয়া সালেহার গতিবিধি জানিয়া তবে তাঁহার ঘরে যাইতেন। আর যদি মাতার ঘরে আসিয়া শুনিতে পাইতেন যে, সালেহা রাগান্বিতা আছেন, অথবা 'জেল-দারোগা'র মত কোন দাসীকে প্রহার করিতেছেন তবে অমনি বাহিরে ফিরিয়া যাইতেন। কিন্তু যদি সালেহা ঐ ফিরিয়া যাওয়া দেখিতে পাইতেন, তবে আর নিস্তার নাই!

এবার কারসিয়ঙ্ হইতে আসিয়াও লতীফ পূর্বে মাতার নিকট গেলেন জননী ত হারাধন — বিশেষতঃ যাহাকে মৃত জ্ঞান করিয়াছিলেন, সেই পুত্রকে যমালয় হইতে ফিরিয়া পাইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। লতীফ আশা করিয়াছিলেন যে, সালেহাও এবার তাঁহার আগমনে ষোল আনা না হউক অন্ততঃ বারো আনা আনন্দ প্রকাশ করিবেন। তাঁহার ওরূপ আশা করা স্পর্ধা ! এক কথায় দুই কথায় তাঁহাদের ঝগড়া আরম্ভ হইল।

লতীফ। তুমি আমাকে টাকা পাঠাও নাই, সে জন্য আমার কাজ বন্ধ থাকে নাই। এ কলুষিতা পৃথিবীতে অনেক দেববালা আছেন, যাঁহারা না চাহিতে দান করেন। বাস্তবিক, তুমি যে ঠাকা পাঠাইলে না, তবে আমি আসিতাম কিরূপে ? আমার ত অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল — আমি আর এখানে আসিতাম না।

সালেহা। তবে আসিলে কেন ? তোমাকে পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া কে ডাকিয়াছে ?

ল। মা ও হামিদ (লতীফের শিশুপুত্র) আছে বলিয়া আসিলাম।

সা। এতদিন বেশ ছিলাম — তুমি আসিলে আর দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ হইল।

"এতদিন বেশ ছিলাম" কথাটা লতীফের হৃদয়ে আঘাত করিল। "এতদিন"— লতীফের অনুপস্থিত সময়ে, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া, — লতীফ মরিয়াছেন জানিয়া , এতদিন বেশ ছিলেন ! তিনি মনোভাব গোপন করিয়া মুখে প্রফুল্লতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, তোমার যে দীর্ঘ কর্ণ তাই বক্তৃতার অবয়বও দীর্ঘ হইয়া দাঁড়ায়।

সা। কি বলিলে, আমি দীর্ঘকর্ণা ? বেশ থাক, গাধা আর এখানে থাকিবে না — এই চলিলাম। (গমনোদ্যতা)

ল। না, থাম। (দৌড়াইয়া যাইয়া অঞ্চল ধরিয়া) আমি ত এমন কিছুই বলি নাই। কেবল এতদিন দুঃখভোগ করিয়াছি, সেই অতীত দুঃখের কথা বলিতেছিলাম। তাহা তুমি শুনিতে না চাও — বলিব না।

সা। দুঃখ আবার কিসের, — দেববালাদের সঙ্গে স্বর্গে ছিলে ! তাহারা পথ খরচের টাকা দিয়াছে। দুঃখটা কোথায় ছিল ?

ল। টাকার অভাবে আমি দ্বীপান্তরে আটক ছিলাম।

সা। এখন দ্বীপান্তর ছাড়িয়া আসিয়াছ ত, আর কি চাও ?

ল। পাঁচশত (৫০০) টাকা চাই। শ্রীমতী দীন-তারিণীকে অদ্যই ঐ টাকা পাঠাইয়া দাও।

সা। তোমার আসিতে ৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে ? তবে এত 'বাদশাহী সফর' আর কি ?*

ল। আমার আসিতে ১০০ টাকা কিংবা ৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে কিনা সে হিসাবে তোমার প্রয়োজন কি। যেদিন তোমার টাকা ব্যয় করিব, সেদিন তোমাকে হিসাব নিকাশ দিব।

সালেহা টাকা আনিয়া দিয়া রাগে গর্ গর্ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই সময় রফিকা তাহাদের ঝগড়া থামাইতে আসিয়া টাকার বিষয় জিজ্ঞাসা করায় লতীফ বলিলেন, "আমার

---

* সফর — ভ্রমণ। বিদেশে যাওয়া, প্রবাস ইত্যাদি।

আসিতে ১০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে, দুই মাস আমার ঔষধ পথ্যের জন্য অনুমান ২০০৲ ব্যয় হইয়াছে এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারিণী-ভবনে ২০০ টাকা দিব — যাহাতে আমার ন্যায় হতভাগ্য নিরাশ্রয়দের সাহায্য হয়।"

লতীফের আগমন-সংবাদ পাইয়া রফিকা আসিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুর-বাড়ী নিকটেই সুতরাং ইচ্ছামাত্রেই আসিতে পারিয়াছেন। তাঁহাকে পাইয়া সালেহা লতীফের অনেক নিন্দা করিলেন। ইহা আজ নূতন নহে, রফিকা চিরকালই জানেন যে, ভ্রাতৃবধূর নিকট যাইবা মাত্রই তিনি এক থলি ভ্রাতা-নিন্দা উপহার পাইবেন। কেবল রফীকা কেন, সালেহা যাঁহাকে সম্মুখে পাইতেন তাঁহারই সাক্ষাতে স্বামী-নিন্দা করিতেন।

লতীফ সর্বদা ভাবিতেন, "সুখই বুঝি মানব-জগতে নাই।" সালেহা তাঁহার প্রত্যেক কার্যে ও বাক্যে দোষ ব্যতীত গুণ দেখিতে পাইতেন না। আজ পাঁচ (৫) বৎসর হইতে লতীফ ও সালেহা এক গাড়ীর দুইটি চাকার ন্যায় এক পথের পথিক হইয়াছেন, কিন্তু উভয়ের মতের ঐক্য কখনও হয় নাই। লতীফ যদি বলেন, "শীতকাল ভাল", সালেহা বলিবেন, 'গ্রীষ্মকাল ভাল !" লতীফ যখন শিশু হামিদকে আদর করেন, সালেহা তখন কোনমতে পুত্রকে কাঁদাইতেন।' এসব অত্যাচার লতীফ নীরবে সহ্য করিতেন। তাহার হৃদয়খানি সর্বদাই শূন্য — আশ্রয়হীন থাকিত।

এই গৃহজ্বালা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লতীফ ব্যারিস্টারি উপলক্ষে অধিকাংশ সময়ে শহরে থাকিতেন। অন্য ব্যারিস্টারদের ন্যায় তিনি সপরিবার শহরে বাস করিতেন না। দুই বৎসর কাল এদিক ওদিক থাকিয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন ; কিন্তু গৃহিণী তাঁহাকে ছয় মাসের অধিক তিষ্ঠিতে দেন নাই। বলিয়াছি ত, এবারও বাড়ী আসিবার সময় লতীফ নিরানন্দ ছিলেন।

নিরন্তর দগ্ধ হইয়া লতীফের জীবন তিক্ত বিষাক্ত হইয়াছিল। তিনি ভাবিতেন, "হয় আমি মরি, নয় সালেহা মরুক — দুইজনে আর একই সংসারে থাকিতে পারি না।" কখনও বা সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু তাঁহার কঠোর কর্তব্য-নিষ্ঠতা তাঁহাকে নিরস্ত করিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ
গভীর হৃদয়

যাহার হৃদয় গভীর হয়, তাহাকে দেখিয়া সহসা তাহার মনোভাব বুঝা যায় না। যাঁহারা মানুষের মুখ দেখিলে মন বুঝিতে পারেন, তাঁহারাও গভীর হৃদয়ের অবস্থা সহজে বুঝিতে পারেন না। সিদ্দিকার হৃদয় অতিশয় গভীর ছিল। তিনি ত আত্মপরিচয় দেন নাই। তিনি কর্তব্য-পালনে অত্যন্ত যত্নবতী ছিলেন, তিনি পরিশ্রমে কাতর হইতেন না।

লতীফের দেশে যাওয়ার পর হইতে দেখা যায়, কাজে আর সিদ্দিকার তত উৎসাহ নাই। এখন তিনি নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে ভালবাসেন। এখন তিনি জীবনের মধ্যে অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাইলেন। এই পরিবর্তনটুকু অন্যলোকে জানিবে কিরূপে? তিনি ত সর্বদাই গভীর চিন্তামগ্না — মূর্তিমতী বিষাদ। অথবা পর্বতের কত অটল, অচল —

বিষাদময়ী পাষাণপ্রতিমা। সেই অটল পর্বতসমা সিদ্দিকা — তাঁহার হৃদয়ে ঝড়-বৃষ্টি? অসম্ভব। তবে কি পাযাণে রেখা অঙ্কিত হইয়াছে?

তাঁহার উপাধানের যদি বাক্‌শক্তি থাকিত তবে সে বলিতে পারিত প্রতি রজনীতে তাহার উপর কত বিন্দু অশ্রুপাত হয়! আর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সংখ্যাও সে বলিতে পারিত। কিন্তু সিদ্দিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের দুঃখ-সুখের হিসাব রাখিবার যে কেহ নাই। বিশেষতঃ তাঁহার বিশ্বস্ত প্রিয়বন্ধু ত কেহ ছিল না — তিনি নিতান্ত একাকিনী। সুতরাং আশার বিদ্যুৎ, নৈরাশ্যের ঝড় — সবই হৃদয়- প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ।

সাধারণতঃ লোকে প্রিয়পাত্রকে নিকটে পাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সিদ্দিকা তাঁহার প্রিয়পাত্রকে নিকটে পাইতে ইচ্ছা করিবেন ত দূরের কথা, সে নামটি পর্যন্ত অগ্নিতুল্য মনে করিয়া সঙ্কুচিত হইতেন।

তাঁহার হৃদয়ের আর একটি কার্য বৃদ্ধি হইয়াছে। একটি একটি করিয়া লতীফের কার্যকলাপ ও কথা তাঁহার মনে পড়িত আর তাঁহার হৃদয় তাহারই ব্যাখ্যা, টীকা ও সমালোচনা করিত। তিনি হৃদয়কে যে-পথ হইতে ফিরাইতে চাহিতেন, অবাধ্য হৃদয় সেই পথে বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় শতধারে ধাবিত হইত। হৃদয়ের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া সিদ্দিকা শেষে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন।

সাকিনা সিদ্দিকার চিন্তাশীলতা দেখিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছেন "সুফিয়া"। ঈশান বাবুও তাঁহাকে "তপস্বিনী" বলেন। কিন্তু তাঁহার সাধনার ধন যে কি তাহা কি কেহ জানে?

লতীফ বাড়ী গিয়া ভদ্রতার অনুরোধে তারিণী এবং অন্যান্য ভগিনীদিগকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। পত্রের সহিত গৃহীত ঋণের ১০০ টাকা পরিশোধ করিয়া আরও চারিশত (৪০০) টাকা তারিণী-ভবনে চাঁদা পাঠাইয়াছেন। সিদ্দিকাও ঐরূপ একখানি ধন্যবাদ-লিপি পাইয়াছেন।

পত্রের ঠিকানায় "রসুলপুর গ্রাম, জিলা * * " এবং লতীফের মনোগ্রাম দেখিয়া সিদ্দিকার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তবে ইনি সেই রসুলপুরের লতীফ? মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন, "একই নামের অনেক লোক থাকে ; একই নামের অনেক গ্রাম থাকে। এ রসুলপুর সে রসুলপুর নহে, এবং এ লতীফও সে লতীফ নহেন। আর তিনি যদি বাস্তবিক সেই ব্যক্তি হন, তাহাতেই বা আসে যায় কি? 'বেল পাকিলে কাকের বাপের কি?' "তিনি ত সালেহার স্বামী, তোমার কে?" কিন্তু মন যদি সব সময় যুক্তি-তর্ক মানিত, তাহা হইলে পৃথিবীর অনেক যন্ত্রণার লাঘব হইত।

* * * *

এক দিন সিদ্দিকা আপন ট্রাঙ্কটা ঝাড়িয়া গুছাইতেছিলেন, সেই সময় তথায় সৌদামিনী কোন কার্য উপলক্ষে আসিলেন। ট্রাঙ্কে ছোট একটি কাগজের কৌটা দেখিয়া সৌদামিনীর কৌতূহল হইল ; তিনি সেই কৌটাটি হাতে লইয়া খুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে সরু একটি সোনার হার — তাহার মধ্যস্থলে চুণী, মুক্তা ও হীরকখচিত একটি বহুমূল্য 'লকেট'। 'লকেট' খুলিয়া দেখেন, তাহাতে লতীফের ফটো! তিনি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সিদ্দিকার দিকে চাহিলেন।

প্রকৃতপক্ষে হতভাগিনী সিদ্দিকা এ লকেটের অভ্যন্তরীণ ফটো সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। কিন্তু সৌদামিনীর নিকট যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে ধরা পড়িয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কোন কথাই খাটিবে না জানিয়া আরক্তিম বদনে দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিলেন। সৌদামিনী তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

'রসুলপুর' ও তাহার অধিবাসী সম্বন্ধে যাহা কিছু সন্দেহ ছিল, তাহা এই লকেটের ফটো দর্শনে সম্পূর্ণ দূর হইল। সিদ্দিকা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন, —

"জগৎ এখন কর্ম্মক্ষেত্র তার,
ব্রহ্মাণ্ড—ব্যাপিনী আশা ;
সে কেন স্মরণ রাখিবে গো বল,
বালিকার ভালবাসা ?"

"আমি কি পাগল ! এ ক্ষেত্রে তিনি 'বালিকা'কে জানেনই না, তবে আর মনে রাখিবেন কি ?" বিধাতার কি নিষ্ঠুর খেলা ! যে ব্যক্তি বিনা কারণে সিদ্দিকাকে অতি নির্মমভাবে উপেক্ষা কয়িাছেন, — যাঁহার বিষয় তিনি কোন দিন স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই, সেই ব্যক্তিই এখন সিদ্দিকার ধ্যান-জ্ঞানের বিষয় হইলেন ! তিনি দারাপুত্র লইয়া পরম-সুখে কালযাপন করিবেন, আর ইনি চিরজীবন দুঃখানলে দগ্ধ হইবেন ! ! ইহাই বিধাতার বিধান ! ! ! সিদ্দিকা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। বিধির বিধান অতি কঠোর হইলেও শিরোধার্য, সুতরাং —

"চিরদিন এ জীবনে তারি তরে কাঁদিব,
অন্তিমে তাহারি দুঃখে দু'নয়ন মুদিব"

রাত্রে সৌদামিনী তাস খেলিবার জন্য সিদ্দিকাকে ডাকিলেন। সিদ্দিকা বিনীতভাবে মৃদুস্বরে বলিলেন, "দিদি ! হাস্যামোদ বা খেলা আমার ভাল লাগে না। আমার হাসির উৎস শুকাইয়া গিয়াছে। তোমাদের প্রফুল্লতা, হাস্যকৌতুক দেখিয়া আমার হিংসা হয়, — সেই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় ;

"Could my heart be light as thine,
I'd gladly change with thee."

সৌদামিনী। (স্মিতমুখে) আহা ! আমার সঙ্গে হৃদয় বদল করিবে ? তবে ত আমার মঙ্গলই হয়। তুমি জান না ইহা কত ভয়ঙ্কর, ভগিনী ! তুমি কি সত্যই মনে কর যে, সৌদামিনীতে আগুন নাই ? দেখ না মেঘের অঙ্কে বিদ্যুতের হাসি কত সুন্দর মনোহর, কিন্তু কত ভয়ানক ! আমি হাসি, — তোমাদিগকে হাসাইবার জন্য। ইহাও এখন অভ্যাস হইয়াছে।

সিদ্দিকা সবিস্ময়ে চাহিলেন। দেখিলেন, সোদামিনী এখন হাস্যময়ী নহেন, — গম্ভীর বিষাদময়ী। তিনি ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "আমাকে তোমার আগুন দেখাইবে ?"

সৌদামিনী নীরব।

সিদ্দিকা ধীরে ধীরে পুনরায় বলিলেন, — "দিদি! আমাকে তোমার আগুন দেখাও। আমি দুঃখের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসি।"

সৌ। তবে তুমি দুঃখের মৰ্ম্ম বুঝিয়াছ?

সি। তোমার গল্প আরম্ভ কর।

সৌ। আরম্ভ করি, কিন্তু পদ্মরাগ, সকল জিনিসেরই বিনিময় আছে। তুমি প্রতিদান দিবে ত?

সি। দিব, কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেহ যেন না শুনে।

সৌ। তাহাই হইবে। আমি তোমাকে আমার আগুন দেখাইব তুমি আমাকে তোমার লকেটের ইতিহাস বলিবে।

তাস খেলা আর হইল না। নলিনী ডাকিতে আসিলে সৌদামিনী তাঁহাকে ঘুমাইতে উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

নলিনী। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া) তোমরা গোপনে কিছু পরামর্শ করিবে, বোধ হয়! আমিও থাকিতে পারি না?

সৌ। না, তুমি যাও। তাস খেলা অপেক্ষা নিদ্রা অধিক উপকারী।

ন। আর তোমাদের জন্য?

সৌ। আজি অনিদ্রা বিধান। তুনি নিদ্রা আরম্ভ কর গিয়া, আমিও যোগদান করিব।

নলিনী চলিয়া গেলে সৌদামিনী বলিলেন, — "নিশ্চয় শুনিবে? শুনিলে তুমি পুরস্কার কি দিবে?"

সি। দুই চারি বিন্দু অশ্রু।

সৌ। তাহাই ত চাই। আহা! নিষ্ঠুর জগতের নিকট — এমন কি মাতার নিকটও আমি কোনদিন একটি বিন্দু অশ্রু পাই নাই। জগৎ আমার প্রতি এমনই কৃপণ ছিল!

সি। বল কি, মাতাও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই?

সৌ। মাতাও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি দেবী, মানুষের কলুষ বুঝিতে পারেন নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
সৌদামিনীর আগুন

সৌদামিনী বলিলেন, — আমার পিত্রালয় গোরস্থান লেনে ছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমরা কলিকাতায় ভাড়াটে বাড়ীতে থাকিতাম। কুলীনের কন্যা ছিলাম এবং পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন না বলিয়া অধিক বয়সে — প্রায় ১৭ বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়। যাহাকে মাতা বলিয়া জানিতাম, তিনি যে আমার গর্ভধারিণী নহেন, তাহা বিবাহের পরে জানিয়াছি। আমি অত্যন্ত বোকা মেয়ে ছিলাম; ৭ বৎসর বয়সে মাতৃহীনা হইয়াছিলাম, তবু বুঝিতাম না যে মা নাই। বিমাতাকেই মাতা বলিয়া জানিতাম।

আমার বিবাহের কিছুদিন পরে পাশের বাড়ীর কয়েকটি মেয়েমানুষ আমার চুল বাঁধিতেছিল, মা নিকটে বসিয়াছিলেন। তাহারা পরস্পর বলিল, — "এর মাথায় 'সতীন-চুল' আছে।" মা তাড়াতাড়ি মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন, — " তা সতীন হয় ত মরে গেছে, এখন আর ভয় কি?" কিন্তু আমার ভাগ্যে যে সতীনের সতীনত্ব রহিয়া গিয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না।

শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় মা আমাকে সতর্ক থাকিতে এবং আমার বরের ছেলেমেয়ের যত্ন করিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। আমি স্বয়ং বিমাতার ক্রোড়ে প্রতিপালিতা হইয়াছি, — সুতরাং 'বিমাতা' হওয়া যে জীবনের অভিশাপ, তাহা জানিতাম না।

আমার স্বামীর ছেলে ও মেয়ের নাম নগেন্দ্র ও জাহ্নবী। আমি যখন সেখানে যাই, তখন তাহারা তাহাদের দিদিমার নিকট ছিল। তাই তাহাদের দেখিতে পাই নাই। তাহাদের সঙ্গে পাঁচ বৎসর পর দেখা হইয়াছিল।

আমি স্বামী-গৃহে যাইবামাত্র চতুর্দিক হইতে আমার প্রতি বিষবাণ বর্ষণ হইতে লাগিল। যাহারা 'বউ' দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারাই মধুরবাণী বলিয়া নববধূর প্রাণে অমৃত ঢালিয়াছিল। 'ক' বলিল, — "এখন হইতে নগেন ও জাহ্নবী পর হইল।"

'খ'। আহা, তাই ত, বাছারা আর কি আসিবে?

'গ'। তাঁহারাই বা কোন্ প্রাণে বাছাদের এখানে পাঠাইবেন?

'ঘ'। এখন তাহারা পিতৃহীন হইল।

'ঙ'। এ বাড়ী ঘর দালান কোঠা যে উহাদের ভাগ্যে ছিল না, তাহা কে জানিত?

'চ'। যার মা নাই, তার কিছুই নাই।

আমার ননদদ্বয় সেই সময় কাঁদিতে বসিয়াছিলেন। কান্নার সুর ছিল — "লক্ষ্মী ত গিয়াছে, এখন ডাকিনী আসিল — " ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি খুনী আসামীর মত ভয়ে, চিন্তায় আকুল হইলাম। যেন এ সব দুঃখের মূল আমিই। আমিই যেন সে স্বর্গীয়া লক্ষ্মীকে হত্যা করিয়াছি।

ক্রমে পাঁচ বৎসর অতীত হইল, আমার সন্তান-সন্ততি হইল না। নিতান্তই একলা ছিলাম। স্বামী উপার্জন উপলক্ষে প্রায়ই বিদেশে থাকিতেন। আমার ননদ দুইজন সময় সময় আসিতেন, কিন্তু তাঁহাদের উপস্থিতি আমার বাঞ্ছনীয় ছিল না।

ঈশ্বর সন্তান দেন নাই, তাহাও যেন আমারই দোষ! ললিতা (আমার ছোট - ননদ) বলিত — "তা হ'বে কেন? ও মাতৃহীন বাছাদের তাড়াইয়া, তাহাদের ভাগ যে ভোগ করিতে চাহিবে, সে ভোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে কেন। ঈশ্বর উহাদের সহায় — উহাদের ভাগ কম করিতে চেষ্টা করিলে তা হইবে কেন?"

পাঁচ বৎসর পরে বাছারা আসিল। তাহারা উভয়ে যমজ ভ্রাতা-ভগ্নী। তাহাদের মাসীমাও সঙ্গে আসিলেন। এখন হইতে ঐ শ্যামা দিদি আমার জন্য সুন্দর চিতা সাজাইয়া আমাকে পরতে পরতে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এখন বলিতে লজ্জা করে, আমি বাছাদের পাইয়া যত সুখী হইব মনে করিয়াছিলাম তত সুখী হইতে পারি নাই। স্বীকার করি যে, আমার মনের

সেরূপ ভাব হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ করে। কিন্তু কি করিব? আমি আত্মসম্বরণ করিতে পারি নাই। যে অভাব আমার হৃদয়ে ছিল—যে অভাব নগেন ও জাহ্নবীকে কোলে পাইলে দূর হইবে ভাবিতাম, সে অভাব যেন আরও শতগুণ বৃদ্ধি হইল!

শাশুড়ী আমাকে কখনও কটু-কাটব্য বলেন নাই। এখন দিদির মুখে সর্বদা শুনিতেন, "ছেলেদের খাওয়ার যত্ন হয় না, ছেলেদের কাপড় নাই," ইত্যাদি। সুতরাং তিনিও এখন আমাকে বেশ দু'কথা শুনাইতে লাগিলেন।

স্বামী আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তিনি আমাকে সরল প্রকৃতি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ভীষণ অন্ধকারে আমি কেবল তাঁহার চরণ দুইটি দেখিতে পাইতাম। আমার মরুময় জগৎ সংসারে ছায়া কেবল তিনিই ছিলেন। শ্যামাদিদি আমার বিরুদ্ধে সকলকে বিষাক্ত করিয়া তাঁহারও হৃদয়ে বিষ ঢালিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে দিদির কথায় বিশ্বাস করেন নাই, বরং তাঁহাকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দিদি কাঁদিতে বসিলেন — নগেন জাহ্নবীকে ডাকিনীর হাতে দিয়া কিরূপে যাইবেন? আর যাইবেনই বা কোথায়? তিনি নিরাশ্রয়া বিধবা ছিলেন।

দিদি বাছাদের কাপড় চুরি করিয়া নিজের মাতার নিকট পাঠাইতেন, আর কর্তাকে বলিতেন, "তোমার স্ত্রী ছেলেদের কাপড় কিনিয়া দেয় না।" সেই সব কাপড় আবার প্রকাশ্যে দিদির ছেলের জন্য ফিরিয়া আসিত। শুনিতাম "খগুর পিসি দিয়াছে। খগুর দিদিমা দিয়াছে," ইত্যাদি।

খাবার জিনিস সর্বদা চুরি হইত, কি হইত, জানিতাম না, তাই বাছাদের খাইতে দিতে পারিতাম না। খাবার জিনিস বন্ধ করিয়া রাখিলে দিদি ও প্রতিবেশিনীগণ কপালে করাঘাত করিত — " ছেলেদের খাবার সময়, তারাই খেতে পায় না!" একদিন কর্তাও বলিলেন, "তবে বল ত — ওরা না খেলে খাবে কে?" উহাদের যে যত্ন করিয়া খাওয়াইতাম, তাহা কেহই অন্ধচক্ষে দেখিত না। দেখা যাইত, সন্দেশ প্রভৃতি উপাদেয় মিষ্টান্ন ঘরের কানাচে পড়িয়া আছে। দিদি চুরি করিয়া ফেলিয়া দিতেন — আর সকলকে ডাকিয়া দেখাইতেন — "দেখ, ফেলে দেয়, তবু বাছাদের খেতে দেয় না!" আমার কথা কেহ বিশ্বাস করিত না। দিদির কথাই বেদবাক্য!

কত বলিব? এরূপ ঘটনা ত দৈনিক ব্যাপার ছিল। একবার শীতকালে আমার ভয়ানক সর্দি-কাশি হয় — দিবারাত্রি ঘরে আগুন থাকিত। একদিন তন্দ্রা হইতে জাগিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ পাইলাম — রেশম পোড়ার গন্ধ! আর দেখিলাম দিদি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। কর্তাও তখনই আসিলেন। তিনি দুর্গন্ধে বিরক্ত হইয়া ঘরের আগুন বাহির করিতে বলিলেন। দিদি পুনরায় আসিয়া বলিলেন, "দেখি এতে কি? কিসের এমন গন্ধ? " তিনি কাপড়ের দগ্ধাবশিষ্ট খণ্ড বাহির করিয়া বলিলেন — "দেখেছ! এই যে বাছাদের জামার সেই কিংখাপ কাপড়! ওঁর একখানা শাড়ী হয় নাই, উনি বাছাদের এ কাপড় পর্‌তে দিবেন কেন! তাই ত বলি — বাছাদের কাপড় সব হয় কি?" — এই সঙ্গে কান্না আরম্ভ হইল। কর্তা নীরবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন — একটিও কথা কহিলেন না। সেই নীরব তিরস্কার যে কত বিষাক্ত, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিবে, পদ্মরাগ?

সিদ্দিকা গল্পের গতিরোধ করিয়া বলিলেন, "তুমি কেন কর্তাকে বল নাই যে, দিদিই কাপড় পোড়াইয়াছিল?"

সৌ। সে কথা বলিলে, বিশ্বাস করিত কে? সে আপন মাসী — আমি বিমাতা। আমার হিংসায় বস্ত্র দগ্ধ হয় নাই, তবে কি তাহাদের মাতার সহোদরা অমন কাজ করিবে? তাঁহার রক্তের টান, অগাধ স্নেহ — আমি কি? এ কথা বলিলে একটা তুমুল সংগ্রাম বাধিত, পাড়ার স্ত্রীলোকেরা সকলে আমার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিত। দিদির অত সৈন্য-সামন্তের সঙ্গে একা আমি কিরূপে যুঝিতাম? বিশেষতঃ আমি তখন শাপগ্রস্তা ছিলাম — সুতরাং আমি যাহাই করিতাম ফল বিপরীত হইত।

একদিন নগেন দৌড়িয়া আসিয়া আমার কোলে বসিল। আমি সাদরে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলাম — অমনি সে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল — "বাবা গো — মলুম গো!" আমি ত অবাক্! এ কি সরল সুকুমার শিশু? কে যেন উত্তর দিল — আমার হৃদয়ে যে বাজিয়া উঠিল, 'না, — সতীনের সতীনত্ব!!'

ললিতা দৌড়িয়া আসিয়া নগেনকে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "হতভাগা! ওখানে মরতে গিয়েছিলি কেন? তোর মা নাই — মায়ের মমতা কোথায় পাবি?" আমি স্বীকার করি, যে নগেনকে 'মায়ের মমতা' দিতে পারি নাই। তাই বলিয়া তাহাকে গলা টিপিয়া মারিতেও যাই নাই ত। অনেক সত্য ঘটনায় মাতার নিষ্ঠুরতার কথাও শুনা যায়। 'সৎ' সম্বন্ধটাই বড় ভয়ানক। যে কাজ মাতা করিলে দোষ নাই, সেই কাজ 'বিমাতা' করিলে জগৎ তাহার উপর খড়গহস্ত হয়।

আর একদিন আমি ভাঁড়ার-ঘরে একটা বড় সিন্দুক খুলিয়া জনৈক অতিথিকে সিধা দিলাম। সিন্দুকটা বন্ধ করিয়া রন্ধনশালায় তৈল আছে কি না দেখিতে গেলাম — সিন্দুকে তালা বন্ধ করা হয় নাই। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সিন্দুক সেইরূপ বন্ধই আছে। আমি কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে গোলাপের মা (ঝি) আসিয়া বলিল — "দেখসে মা! তোমার সিন্দুকের ভিতর কি যেন ধুপ-ধাপ করে!" আমি বললাম — "দূর, আমি এখনই যে সিন্দুক বন্ধ করিয়া আসিলাম।"

কৌতূহল-পরবশ হইয়া কর্তাও আমার সঙ্গে সিন্দুক দেখিতে চলিলেন, আমি সিন্দুক খুলিয়া দেখি — নগেন্দ্র! আমার ত চক্ষুস্থির! শ্যামা তাড়াতাড়ি নগেনকে তুলিল। তখন যে ঝড়-তুফান আরম্ভ হইল, তাহা অনুমান করিয়া দেখ!

এইখানে সৌদামিনী থামিলেন। যেন সেই অতীত ঘটনা-রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে সিদ্দিকা কহিলেন — "নগেন কিরূপে বন্ধ হইয়াছিল, তাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলে?"

সৌ। না। সেই দিন হইতে স্বামী আমার সঙ্গে কথা কহা বন্ধ করিলেন। ইহাতে তাঁহার দোষ দিতে পারি না? তিনি কি করিবেন? এতকাল সকলের বাক্য জ্বালা, বিষবাণ অকাতরে সহিতেছিলাম, — বেশী দুঃখ হয় নাই। কিন্তু এখন তাঁহার অনাদর অবহেলা অত্যন্ত অসহ্য হইল। সপ্তাহকাল নীরবে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আমার মাতার নিকট যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

আবার সেই শান্তিপ্রদ মাতৃক্রোড়ে যাইয়া জুড়াইলাম। দুঃখের বিষয়, আমার দুঃখে কেহই সহানভূতি করিত না। জগতে আমার জন্য কেহ আহাটি বলিত না! এমন কি মা — যে মা আমার (বিমাতা হইলেও) সুধা-স্বরূপিনী ছিলেন, তিনিও আমার দুঃখ বুঝিতেন না। তিনি বলিতেন — " মা! তোর কথা আমি বুঝতে পারি না — তুই ছেলে দু'টোকে — পোষ মানিয়ে নিতে পার্‌লি না? আমি তোর চেয়ে কম বয়সে তোদের মানুষ করলেম কি ক'রে? আমি তোর চেয়ে মোটে পাঁচ বছরের বড়!" হা অদৃষ্ট! কেমন করিয়া বুঝাইব, — কেন ছেলেদের পোষ মানাইতে পারি নাই? সেইদিন বুঝিলাম — জগৎ অন্ধ! আমার দুঃখ দেখিবার চক্ষু জগতের নাই। আমার যন্ত্রণা দেখিবার — বুঝিবার কেহ নাই। যখন সেই স্নেহময়ী মা বুঝিলেন না, তখন আর কে বুঝিবে? হৃদয়ের তারে তারে যেন কেমন সুরে বাজিত —

ভাবি মনে নিশিদিন, কিরূপে কাটিবে দিন
এ ভব-রাক্ষস-পুরে — মরু সাহারায়?
হেথা স্নিগ্ধ ছায়া নাই, পর দুঃখে মায়া নাই,
কিরূপে কাটাব দিন — হায় এ কারায়?"

প্রায় এক বৎসর পরে স্বামী-গৃহে আসিলাম। আবার নূতন করিয়া নগেন ও জাহ্নবীর সহিত সুখের ঘর রচনার চেষ্টা করিলাম। এখন আমার জন্য নূতন অপবাদের সৃষ্টি হইল। জাহ্নবীর তিন চারিখানা মূল্যবান অলঙ্কার চুরি গিয়াছিল। আমি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিতাম — "শ্যামা চুরি করিয়াছিল," কিন্তু বলা হয় নাই! শ্যামা ও ললিতা আমাকে চুরির অপবাদ দিল। আমি কেবল বলিতাম — "হরি হে, তুমি সত্য!"

সিদ্দিকা.। উঃ! এত নিপীড়ন!!

সৌ। ইহাই শেষ নহে — আরও শুন। পাড়ায় ত রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, আমি দুইবার নগেনের প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছি। দ্বিতীয় বারের ঘটনার পর হইতে আমার নাম 'রাক্ষসী' হইল! ক্রমে আমার বিবাহ-জীবনের দশ বৎসর অতীত হইল। আমার বাছাদের বয়স তখন ১২ বৎসর। এই সময় আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। আমি প্রাঙ্গণস্থিত বাঁধা কূপের ধারে দাঁড়াইয়া আছি। একবার সাধ হইল, ঐ কাল জলে লীন হই। অমনি কে যেন বলিল — "অমন কাজ করিও না — আর কয়দিন অপেক্ষা কর!" বোধ হয়, এ বক্তা সেই জন, যিনি বলেন — 'সতীনের সতীনত্ব'।

জাহ্নবী কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া কূপের দেওয়ালের উপর উঠিল। আমি সভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিব, মনে করিলাম; সে কিন্তু আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। আমি বলিলাম, "করিস্ কি বাছা! পড়ে যাবি।" সে বলিল, "তবে আমাকে ধরে নাবিয়ে দাও।" যেই তাহাকে ধরিলাম, অমনি সে চীৎকার করিয়া উঠিল — "মাসিমা দেখ! মা আমায় ফেলে দিল!" আমি তখন কি যে করি ভাবিয়া পাই নাই — চক্ষে আঁধার দেখিতাম। শ্যামা আসিবার পূর্বে কর্তা আসিলেন। তিনি স্বয়ং আমাকে জাহ্নবী-বধের চেষ্টা করিতে দেখিলেন। তিনি বলিলেন — "আজ ত আমি স্বচক্ষে তোমার কাণ্ড দেখিলাম!" আমি কিছু বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু তিনি শুনিবার অপেক্ষা করিলেন না— জাহ্নবীকে লইয়া দ্রুতগতি প্রস্থান করিলেন।

দশদিক্ অন্ধকার দেখিলাম — একদণ্ড নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইবারও স্থান নাই। কূপের ধারে একটু দাঁড়াই, তাহাও বিধাতার অসহ্য! আমি প্রতিদিন পলে পলে অনুভব করিতে লাগিলাম ঃ আপন সন্তান স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর করে, কিন্তু সপত্নী-সন্তান স্ত্রীকে স্বামীর হৃদয় হইতে দূর করে! আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, স্বামীর হৃদয় হইতে অনেক দূর সরিয়াছি, এবং ক্রমশঃই দূর হইতেছি। অথচ তাঁহাকে আবার আমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দেয়, এমন কেহ ত ছিল না! হইতে পারে — আমার এ ধারণা ভ্রান্ত।

সি। আমার বিশ্বাস, তোমার ধারণা ভ্রান্ত নহে, কারণ কোরেশা-বিও ত ঐ কথা বলেন। তিনি পাটনা-ত্যাগিনী হইয়া তারিণী-বিদ্যালয়ে কেন? ঐ দুঃখেই ত! তিনি ঝাড়া আট বৎসর স্বামীর সহিত দুর্বিসহ বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন! তাঁহার সপত্নী-পুত্র, দশমবর্ষীয় বালক কমরজ্জমান ওলাউঠা রোগে মারা পড়িবার পর হইতে স্বামীর ঔদাস্য এমন অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল যে, তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ট্রেনিং স্কুলে পড়িতে গেলেন। তাহার পর শিক্ষায়িত্রীরূপে গয়া, মুজফ্ফরপুর ইত্যাদি বালিকা-স্কুলে ঘুরিয়া শেষে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

সৌ। এই যে যত্র-তত্র চাকুরী করা — বিশেষতঃ এখানে চাকুরী-গ্রহণও ত তাঁহার স্বামীর অভিপ্রেত ছিল না; কিন্তু স্ত্রীর প্রতি ঔদাসীন্য বশতঃ তিনি বাধা দেন নাই। ইহাতে কোরেশা-বির পক্ষে শাপে বরই হইয়াছিল।

সি। কোরেশা-বির ভাশুর, দেবর, জায়েরা ও কমরুর সাহোদরা — সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রবাসী স্বামীকে বুঝাইলেন যে, ওলাউঠায় আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা অভাবেই কমরু মারা গেল। বেচারী যদিও সেই রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় পাটনার অন্যতম বিখ্যাত ডাক্তার ডাকিয়া কমরুকে দেখাইয়াছিলেন, তবু তাঁহাকে চিকিৎসা না করার অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল।

সৌ। কেবল ইহাই নহে — সেই দিন অপরাহ্নে অপর ছেলেদের সঙ্গে কমরু যেই লুচি-পুরি কিনিয়া খাইয়াছিল, তাহা কিনিবার দু'গণ্ডা পয়সা কোরেশা-বিই দিয়াছিলেন। আর সে ডাক্তারও ছিলেন তাঁহার পিতৃ-বন্ধু। আমি কোরেশা-বির স্বামীর কোন দোষ দেখি না, তিনি বেচারা কি করিবেন ? — "দশচক্রে ভগাবান ভূত"! তবু তিনি স্ত্রীর সহিত বেশ ভদ্র ব্যবহার করেন। এখানে প্রায় সর্বদাই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। গত বৎসর ছুটির সময় কোরেশা-বিও বাড়ী গিয়াছিলেন।

সি। ইহার কারণ, আমার বোধ হয় যে, এখন তিনি স্বয়ং পুত্রবতী হইয়াছেন, তাই ১১ বৎসর পরে তাঁহার কপাল ফিরিয়াছে। যাক্, দিদি, এখন তোমার কাহিনী চলুক্।

সৌ। বলিয়াছি ত, আমার জগৎ-সংসার ঘোর অন্ধকারময় মরুভূমি ছিল। যিনি এই মরুভূমিতে কেবল একবিন্দু সুধা — সেই অন্ধকারে একটি মাত্র ক্ষীণ জ্যোতির্ময় তারকা — তিনিও দূরে — বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং আমি জীবনে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম।

সি। তোমার নগেন ও জাহ্নবী ছেলেমানুষ বই ত নয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ কি?

সৌ। তাহা সত্য। এই জন্যই ত এসব কথা এতকাল কাহাকেও বলি নাই ; তুমি শুনিতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে বলিয়া তোমাকে বলিতেছি। নচেৎ এসব কথা কি বলিবার? এ কেবলই নীরবে সহিবার — আর হৃদয়ের পরতে পরতে দগ্ধ হইবার ব্যাপার ! বাছারা ত সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক, তাহাদের কার্যের জন্য তাহারা দায়ী ছিল না; কেবল আমারই দায়িত্ব গুরুতর ছিল। উহাদের কর্ম্মফল আমাকে ভোগ করিতে হইত ! আর সেই কর্ম্মফল কত ভীষণ, তাহা একবার কল্পনা-সহায়ে মানস-চক্ষে দেখ !

সি। তোমার কি দিদিই সব সর্বনাশের মূল ছিল। তাহাকে তাড়াইতে পারিলে তুমি নির্বিঘ্নে থাকিতে পারিতে।

সৌ। ও হরি ! বল কি ! তাই ত অসম্ভব ছিল। তাহাকে তাড়াইবে কে? সেই গিন্নী, সেই সর্বেসর্বা — সে যে দয়া করিয়া আমাকে তাড়ায় নাই, তাহাই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য ! শ্যামা দূর হইলেই ত ছেলেমেয়ে, ঘর-দ্বার সমস্তই আমার হইত।

সি। এখন বল কিরূপে শাপমুক্তা হইলে। আর অভিশাপের কথা শুনিতে ইচ্ছা হয় না।

সৌ। এখন দেখিলে ত — আগুন আছে কি না? মানুষ যখন নিতান্ত নিরুপায় হয়, জীবনে মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করে, তখন পরম দয়াল ঈশ্বর মানবের প্রতি দয়া করেন। —

“নিদাঘের তীব্র তাপ অসহ্য যখন,
জলদ তখনি করে সলিল বর্ষণ।”

ঈশ্বর পতিতপাবন, পতিত মানবকে উদ্ধার করেন। কাহারও জন্য মৃত্যু বিধান, কাহারও জন্য অন্যকিছু — যাহা হয় একটা উপায় করিয়া দেন। আমারও উপায় হইল।

আমরা তীর্থযাত্রা করিলাম। ললিতা পুত্রের কল্যাণে মথুরায় কোন ঠাকুরের পূজা মানিয়া ছিল। সেই উপলক্ষে মথুরায় যাওয়া হয়। আমরা যেখানে ছিলাম, তথা হইতে ললিতার মানিত ঠাকুরের মন্দির কিছু দূরে ছিল, তাই সেখানে জলযানে যাইতে হইয়াছিল। ললিতা ছোট একটা বজরা ভাড়া লইল। আমাদের সঙ্গে আরও অনেক যাত্রী ছিল। কর্ত্তা স্বয়ং নগেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া শ্যামাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, জাহ্নবীকে যেন খুব সাবধানে রাখে। তাঁহার অতি-সতর্কতার কথা শুনিয়া আমার প্রাণটা যেন কেমন করিয়া উঠিল — মনে হইল , জাহ্নবী যদি ডুবিয়া যায়?

সেই দিন কর্ত্তা আমারও প্রতি যেন একটু প্রসন্ন হইলেন, ; স্বয়ং হাত ধরিয়া বজরায় তুলিলেন, বসিবার স্থানটা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহার মুখের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল — সে দিন সে মুখ বড় সুন্দর লাগিয়াছিল — চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছিলাম না। মনে হইল, এই বুঝি শেষ দেখা — আর ও মুখ দেখা হইবে না — যদি আর না দেখিতে পাই — ভালমতে দেখিয়া লই ! সে সময় সুখানুভব করিতে পারি নাই — কেমন যেন গভীর বিষাদে মগ্ন হইতেছিলাম।

সৌদামিনী থামিলেন। সিদ্দিকা ভাবিলেন, সৌদামিনী বুঝি রোদন করিতেছেন। কিন্তু না, সে চক্ষু শুষ্ক — অনেক অশ্রু বিসর্জনে অশ্রুর উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তিনি স্থির-শান্তভাবে পুনরায় গল্প আরম্ভ করিলেন ঃ

যমুনার শীতল বাতাস পাইয়া শ্যামা ঘুমাইয়া পড়িল। চঞ্চলা জাহ্নবীকে আমিই "এদিকে এস, ওদিকে যেও না" ইত্যাদি বলিয়া নিরস্ত করিতে চষ্টা করিলাম। সেদিন সে প্রতি কথায় আমার সহিত তর্ক করিতে লাগিল ; ক্রমে আমাকে ছাড়িয়া সে ললিতাকে আক্রমণ করিল। তাহারা ঝগড়া করিতে লাগিল। আমি মুক্ত বাতায়ন হইতে যমুনার কাল জল দেখিতেছিলাম , আর ভাবিতেছিলাম —

জগৎ-জননী !
জুড়াতে জগৎ-জীবে স্নিগ্ধ করুণায়
শীতল যমুনা-রূপে বিরাজ ধরায়

সহসা জাহ্নবী আমার গায়ের উপর দিয়া একেবারে জানালায় আসিয়া বসিল। আমি ভারী ব্যস্ত হইয়া বলিলাম — 'মা ! করিস্ কি !' সে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল — "কেন, তুমি এম্নি কর ; নিজে বুড়ো মাগী তামাসা দেখ — আমার দেখা তোমার সহ্য হয় না ! আমি একেবারে খুকী না কি যে ভয় করছ?" এই বলিয়া উচ্চহাস্য করিল। অতঃপর কহিল — "দেখ, আমি আরও —" কথাটা শেষ হয় নাই — সে নদীর জলে পড়িয়া গেল। আমি সহসা অজ্ঞান হইলাম।

যখন প্রথম চক্ষু খুলিলাম, দেখিলাম জাহ্নবী ও আমি পাশাপাশি ধরাতলে পড়িয়া আছি, আর পাঁচ সাত জন লোক আমাদের শুশ্রূষা করিতেছে। তাহাদের যত্নে আমি বাঁচিয়া উঠিলাম ; জাহ্নবী বাঁচিল না। আমি সংজ্ঞালাভ করিয়াছি দেখিয়া তাহারা আমাকে লইয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিল। আমি কেবল দীননয়নে জাহ্নবীর প্রতি চাহিয়া রহিলাম—চক্ষের জলে বুক ভাসাইলাম — যাহার মরণে সঙ্গিনী হইয়াছিলাম, তাহাকে ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? জেলেরা মাছ ধরিতে গিয়া আমাদের ধরিয়াছিল — আমরাই উহাদের জালে উঠিয়াছিলাম।

সি। মাছ দুইটা মন্দ নহে ! কিন্তু দিদি ! জাহ্নবীকে ও তোমাকে উহারা একসঙ্গে পাইল কিরূপে?

সৌ। আমিও তখনই ডুবিয়াছিলাম যে, কোন মতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। তাহাকে দৃঢ়ভাবে বক্ষে জড়াইয়া রাখিয়াছিলাম — ভাবিয়াছিলাম, যদি ডুবি ত একসঙ্গেই ডুবিব? যদি উঠি, তবে দুইজনে একসঙ্গেই উঠিব। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল ; তাই যদিও উভয়ে একত্রে জালে উঠিলাম, তবু তাহাতে আমাতে চির-বিচ্ছেদ হইল ! (এইবার সৌদামিনীর চক্ষে জল দেখা দিল — হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল। বলিলেন) — ধীবরেরা আমাকে তাহাদের সঙ্গে লইল। আমি পূর্ব-পশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহাদের কাছে গেলাম। দুই একদিন পরে আমি পাগল হইয়া তাহাদের দ্বারা বাতুলালয়ে প্রেরিত হইলাম। প্রায় এক বৎসর পরে প্রকৃতিস্থ হই। সে আজ ১৭/১৮ বৎসরের ঘটনা।

আমি আরোগ্য লাভ করিলে বাতুলালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে একটা সম্ভ্রান্ত ঘরে 'গবর্নেস'-এর কাজ যোগাড় করিয়া দিলেন। সেখানে যাইবার এক বৎসর পরে আমার ছাত্রীর বিবাহ হইলে, তাঁহারা আমাকে সরযূর সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইলেন। কিছুদিন পরে সরযূ তাহার ছোট ননদকে তারিণী-বিদ্যালয়ে ভর্তি করিবার জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে

গেল। এই উপলক্ষে মিসিস্ সেনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হইল ; তাহার ফলে আমি তারিণী–কর্মালয়ে চলিয়া আসিলাম। আমি এখানে ১৫/১৬ বৎসর হইল আছি। এখন দেখি হৃদয়টা বৃহৎ — বিশ্বব্যাপী হইয়াছে। এখন আর ওরূপ ক্ষুদ্র ঘটনায় — সামান্য অনাদর অবহেলায় হৃদয় আলোড়িত হয় না।

সি। তাহা হইলে এখন আবার ঐ গৃহে ঐসব লোকের সহিত স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার? তবে যাইতে বাধা কি?

সৌ। আহা! কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব, শ্যামা দিদি সে গৃহ কেমন বিষাক্ত — কালকূটময় করিয়া তুলিয়াছিল। তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে না, বিশ্বাস করিতে পারিবে না।

সি। আল্লাহ্‌তালার রাজত্বে কিছুই অসম্ভব নহে। ক্ষুদ্রকায় সুকুমার শিশু দ্বারা বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের অনিষ্ট হইতে না পারিবে কেন? অতিকায়ের অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়েরই অত্যাচার অধিক হয়। তাই দেখনা — মৌমাছির হুল অতিশয় তীক্ষ্ণ, যন্ত্রণাপ্রদ বটে — যখন তুমি তাহার মধুর ভাণ্ডার লুটিতে যাও! নতুবা সে তোমাকে বিনা কারণে আক্রমণ করে না। আর ক্ষুদ্রকায় মশক তোমাকে নিতান্ত নির্দোষ — নিদ্রিতাবস্থায় দংশন করে। মশার অত্যাচারে মশারি প্রস্তুত করিতে হইয়াছে — কিন্তু মধুকরের জ্বালায় ত কোন প্রকার 'দুর্গ' নির্মাণ করিতে হয় নাই!

প্রায় রাত্রি শেষ হইল দেখিয়া উভয়ে বিষণ্নহৃদয়ে শয়ন করিলেন। সৌদামিনী ঘুমাইয়াছিলেন কি না, জানি না। সিদ্দিকা কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও চক্ষু মুদিত করেন নাই। তিনি সৌদামিনী–আগুনের তরঙ্গে ওৎপ্রোত হইতেছিলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক সৌদামিনী–আগুনে পরিপূর্ণ!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
আবার দেখা

লতীফ মুঙ্গেরে আসিয়াছেন। ডাক্তারের উপদেশ–মতে তাঁহার মাতাকে লইয়া বায়ু–পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত মুঙ্গেরে আসিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার সেই মাসী (যাঁহার কেহ নাই) এবং রফীকাও আছেন। রফীকা এক বৎসর হইল বিধবা হইয়াছেন।

রফীকা সীতাকুণ্ড দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় একদিন তাহাদিগকে লইয়া সন্ধ্যার প্রাককালে লতীফ সীতাকুণ্ডে চলিলেন। তখন দিনমণি পশ্চিমে অস্ত যাইতেছিল, সুতরাং অন্ধকার তখনও গাঢ়তর হয় নাই। তাঁহারা পদব্রজে বেড়াইতে বেড়াইতে কিছুদূর লক্ষ্মণকুণ্ডের নিকট আরও কয়েকজন মহিলাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা নিকটবর্তী হইলে লতীফ দেখিলেন, সিদ্দিকা এবং তাঁহার 'ভগিনী'গণ। কিন্তু সিদ্দিকা লতীফকে দেখিয়াও না দেখার ভান করিয়া দ্রুতপদে তাঁহাদের অতিক্রম করিয়া গেলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে হেলেন ছিলেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন,

"কেমন আছেন মিস্টার — ?"

লতীফ অগত্যা দাঁড়াইলেন। যথারীতি অভিবাদনের পর বলিলেন, "মিসিস্ হরেস আমার নাম পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন!"

সৌদামিনী। চেহারাখানি কিন্তু মনে আছে!

হেলেন। আপনার নামের শেষভাগটা আমি ঠিক উচ্চারণ করিতে পারি না। আপনার সঙ্গিনীদের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিবেন না?

লতীফ। 'সঙ্গিনী' বলিলেই হয় না?

হে। না, তাহা কি হয়? তবে আপনার পরিচয়ের ইচ্ছা না থাকিলে আমি জোর করি না।

ল। ইনি ভগিনী, ইনি মাসী। (তাঁহাদের প্রতি) ইঁহারা আমার পরম হিতকারিণী — ইঁহারাই সেই তারিণী–ভবনের 'দরিদ্র ভগিনী'।

রফীকা। ভাল হইল, ইঁহাদের সহিত দেখা হইল।

হে। আমরাও কৃতার্থ হইলাম।

র। ভাই–এর বাচনিক আপনাদের সৌজন্যের কথা শুনিয়া অবধি আপনাদের দেখিতে আগ্রহ ছিল; এত দিনে সে সাধ মিটিল।

সৌ। সময় সময় অনেকেরই তীর্থযাত্রা সফল হয়। আমি জীবনে একবার সার্থক তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। অদ্য (রফীকার প্রতি) আপনিও একটি বাঞ্ছনীয় বস্তু পাইলেন — অর্থাৎ আমাদের দেখিলেন। (লতীফকে দূরবর্তী সিদ্দিকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে দেখিয়া) মিস্টার আল্মাস্, আপনারও কোন ইষ্ট লাভ হইয়াছে কি? আমরা ত আপনার ভগিনীকে পাইলাম। আপনি কিছু পাইলেন কি?

ল। আপনাদের সঙ্গে দেখা হইল, এই যথেষ্ট লাভ, আর কি চাই?

(কিন্তু যাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে আনন্দ লাভ হইত, তিনি এখনও দূরে আছেন — তাঁহার সঙ্গে একটি কথাও হয় নাই।)

সৌদামিনী ঊষাকে দূরে দেখিয়া ডাকিলেন। সিদ্দিকা ও ঊষা তখন ফিরিয়া আসিলেন।

ঊ। আমরা দেখিলাম যে, মিঃ আলমস্ পলাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাই আমরাও দেখিয়া না দেখার ভাণ করিয়া দূরে যাইতেছিলাম!

ল। আপনারাই অতিক্রম কয়িরা গেলেন বলিয়া আমিও পশ্চাৎপদ হইতেছিলাম। এখন বলুন, আপনারা ভাল আছেন ত?

ঊ। আমি ভাল আছি, ধন্যবাদ! সিদ্দিকা কিন্তু প্রায়ই অসুস্থ থাকেন।

র। (সিদ্দিকার প্রতি) ভাই–এর নিকট আপনার অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। আপনার কি অসুখ?

মৌনী সিদ্দিকার প্রতি প্রশ্ন হইল দেখিয়া তিনি বিপদ গণিলেন। "... না, এমন কিছু অসুখ নয়" — এই মাত্র সংক্ষেপে বলিয়া অন্যদিকে চাহিলেন।

ঊ। চল, আমরা ওদিকে গিয়া বসি।

সকলে একখণ্ড পাথরের উপর উপবেশন করিলেন। রফীকা প্রথম দৃষ্টিতেই সৌদামিনীকে ভক্তি করিতে শিখিলেন। সৌদামিনীর এই ভক্তি-আকর্ষণের গুণটা কেবল তাঁহার স্বামী প্রভৃতির হৃদয়েই কার্যকরী হয় নাই।

র। আরও যে কয়েকজন ভগিনীর নাম শুনিয়াছি, কোরেশা, বিভা — এখন তাঁহারা কোথায়?

সৌ। তাঁহারা সকলে এখন কলিকতায়। এবার পূজার সময় কেবল আমরা কর্ম্মালয়ের কয়েকজন 'ভগিনী' আসিয়াছি। বিদ্যালয় হইতে কেবল ঊষা, অসুস্থতার জন্য ছুটি লইয়া আসিয়াছেন।

র। (হেলেনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) ও মেমও কি তারিণী-ভবনে থাকেন?

সৌ। হাঁ, উনি কর্ম্মালয়-বিভাগের ইংরাজী শিক্ষায়িত্রী। কলিকাতায় উঁহার স্বতন্ত্র বাসাবাড়ী নাই বলিয়া তারিণী-ভবনেই বাস করেন।

লতীফের মাতা কিছু অসুস্থ আছেন, শুনিয়া সৌদামিনী তাঁহাকে দেখিতে যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

রফীকা সিদ্দিকাকে বলিলেন, "আপনিও আসিবেন।"

সি! আমি যাইব না, ক্ষমা করিবেন।

র। কেন, আমি আপনাদের তাঁবুতে যাইব, আপনি আসিবেন না কেন? যাওয়া আসাই ত নিয়ম।

সি। আপনারই ত আমার যাইবার পথ রাখেন নাই।

র। আপনার কথা আমি ভালমতে বুঝিলাম না। পথ রাখি নাই কেমন?

সি। আমরা সামাজিক মানুষ নহি, সুতরাং ও নিয়ম আমাদের জন্য নহে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল দেখিয়া সকলে যাইতে উদ্যত হইলেন। বিশেষতঃ রফীকার সঙ্গে একটি চারি বৎসরের শিশু ছিল, সে নিদ্রায় কাতর হইল। রফীকা ছেলেটিকে কোলে লইতে লইতে বলিলেন, "এ ভাইএর ছেলে। আজ এক বৎসর হইল, ইহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, সেই অবধি এ আমার সঙ্গে আছে।"

ঐ কথাটা শুনিয়া বিদ্যুতের মত হঠাৎ একটু দূরাশার আলোক সিদ্দিকার হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইল। সেই আলোকে তিনি মুহূর্তের জন্য লতীফকে স্বাধীন — বন্ধনমুক্ত দেখিতে পাইলেন! তখনই আবার একখণ্ড নিরাশার মেঘ আসিয়া সে আলোটুকু ঢাকিয়া ফেলিল। সিদ্দিকার হৃদয়ের এই আশাবিদ্যুৎ ও নৈরাশ্য মেঘ কেহই জানিতে পারিল না। কেবল লতীফ ও সৌদামিনী তাঁহার মুখভাবের এই ক্ষণিক পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করিলেন।

রফীকা কিছু লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া যাইতেছিলেন — "আমি নিজের ছেলেমেয়ে রাখিয়া আসিয়াছি — ইহাকে ছাড়িতে পারি নাই।"

ল। তুমি হামিদ্‌কে আদুরে করিয়া তুলিতেছ, এতটা ভাল নহে। শেষে তাহার মাতার মত একগুঁয়ে না হইলেই রক্ষা।

এইবার সকিনা বলিলেন — "ছেলেটি ঠিক মিঃ আল্‌মাসের মত! দেড় বৎসর পরে আবার আপনাকে দেখিলাম — সেই রকমই আছেন।"

ল। আমি কি শিশু ছিলাম যে, এখন আমায় বড় দেখিবেন?

সৌ। রোগাটে ছিলেন, সবল সুস্থ হওয়া উচিত ছিল।

উ। তা হইতেন, কিন্তু একটা গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন যে!

সৌ। (সিদ্দিকার কানে কানে) তুমিও ত মোটা-সোটা হও না, ঐ আঘাতের ভাগ তুমিও পাইয়াছ না কি?

ইহাতে সিদ্দিকা রাগ করিয়া উঠিয়া দূরে সরিয়া গেলেন।

সিদ্দিকাকে অপর ভগিনীদের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একা দেখিয়া লতীফ ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে তাঁহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে কিছু বলিবেন মনে করিতেছেন, কিন্তু কি বলিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া নীরবে তাঁহার দর্শনসুধা পান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সুখটুকুও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, কারণ রফীকা ও সৌদামিনী তথায় আসিলেন।

রফীকা (বাসায় ফিরিয়া যাইতে যাইতে সিদ্দিকার হাত ধরিয়া) আপনি নিশ্চয় আমাদের বাসায় আসিবেন; আপনার কোন আপত্তি আমি শুনিব না।

সি। বেশ; কিন্তু আপনাকে আমাদের 'নারী-ক্লেশ নিবারণী-সমিতি'র সভ্য হইতে হইবে। বার্ষিক চাঁদা ১২৲ টাকা মাত্র।

র। (উচ্চ-হাস্যে) 'নারী-ক্লেশ-নিবারণী-সমিতি?' এমন নাম ত কখনও শুনি নাই! 'পশু-ক্লেশ-নিবারণী-সভা' আছে জানিতাম। বেশ বেশ! আমি নিশ্চয় সভ্য হইব।

ল। এমন সমিতির প্রতি সমস্ত নারীজাতির সহানুভূতি থাকা বাঞ্ছনীয়। (সিদ্দিকার প্রতি) আমার মাতাকেও সভ্য করুন; এই নিন্ তাঁহার চাঁদার টাকা।

সি। সৌদামিনী দিদি এ সমিতির সম্পাদিকা, টাকা তাঁহাকে দিন।

সৌ। না, সকিনাবু কোষাধ্যক্ষ, টাকা তিনিই লইবেন।

ল। তাহা হইলে দেখিতেছি যথাবিধি সভার কার্য সম্পন্ন হয়।

সৌ। তাহা নহে ত কি ছেলেখেলা? এবার সমিতির অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে, আপনি দয়া করিয়া নূতন সভ্যদের সহিত যোগদান করিবেন।

উ। হাঁ, মিঃ আলমাস্, আপনি নিশ্চয় সকলকে লইয়া কলিকাতায় আসিবেন; সেই সময় তারিণী-বিদ্যালয়ের কুড়ি বৎসরের জুবিলী এবং পুরস্কার বিতরণ হইবে।

ল। বহু ধন্যবাদ! আল্লাহ্ চাহে নিশ্চয় যাইতে চেষ্টা করিব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ
আগুনের সৌন্দর্য্য

সিদ্দিকা আর কোথাও বাহির হয়েন না। যদি লতীফের সহিত দেখা হয় — এই ভয়ে বাহির হইতে ইচ্ছা করেন না। কয়দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে ভীষণ তুফান চলিতেছে। তাঁহার অবাধ্য হৃদয় আপন মনে একদিকে বহিয়া যাইতে চাহে — তিনি বারণ করেন।

সিদ্দিকা বাহির না হইলে কি হইবে? লতীফ প্রায় প্রতি সপ্তাহে মাসী ও গভিনীসহ, 'ভগিনী'দের তাঁবুতে আসিতেন। এই সময় 'ভগিনী'দের সহিত তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। রাফিয়া এবং সকিনা তাঁহার আত্মীয়া—রাফিয়া সম্পর্কে মাসতুতো ভগ্নী এবং শ্যালক-পত্নী; আর সকিনা এক সম্পর্কে ভগ্নী, অন্য সম্পর্কে ভ্রাতৃবধূ। ঊষা এবং সৌদামিনী তাঁহার 'দিদি' হইয়া তাঁহার সহিত 'তুমি' সম্বোধনে কথাবার্তা কহিতে সম্মতা হইয়াছেন। তিনি কেবল সিদ্দিকাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। কিন্তু সিদ্দিকা-জয়ের চেষ্টা ত্যাগ করেন নাই।

অভাগিনী সিদ্দিকা ভাবেন, তারিণী-ভবনে ত সকলেই সুখে আছেন, কেবল তাঁহার মনে শান্তি নাই কেন? সৌদামিনীও জ্বলিয়া পুড়িয়া এখন শান্তি লাভ করিয়াছেন।

সিদ্দিকার এ দাহক্রিয়া কতদিনে শেষ হইবে? আরও ভাবিতেন, ইংরাজ ভগিনীদের কোন জ্বালা-যন্ত্রণা নাই। তাঁহারা পরমসুখী।

সকাল বেলা তাঁবুর বারান্দায় বসিয়া হেলেন সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন—অন্যমনস্কভাবে সহসা বলিয়া উঠিলেনঃ — "Oh poor thing! (আহা! গরীব বেচারী!)"

"কেন দিদি! ও কথাটা বলিলেন, কেন?" নিকটে যে আর কেহ ছিল, হেলেন তাহা লক্ষ্য করেন নাই। সিদ্দিকার প্রশ্ন শ্রবণে চকিতের ন্যায় ফিরিয়া দেখিয়া বলিলেন, " ও! সিদ্দিকা, তুমি তাহা শুনিয়া কি করিবে?"

সিদ্দিকা। বলুন না, "poor thing" কাহাকে বলিলেন?

হেলেন। মনে কর, তোমাকে বলিলাম।

সি। আমাকে বলিলেন কেন? আমি কিসে দয়ার পাত্রী?

হে। এই দেখ না, মিস্ স্টার এতকাল অবিবাহিতা থাকিয়া এখন বিবাহ করিয়াছেন।

সি। তাহাতে তিনি দয়ার পাত্রী হইলেন কেন?

হে। ঈশ্বর করুন, তিনি সুখী হউন। আমার ভুক্তভোগী হৃদয় কাহারও বিবাহের সংবাদ শুনিলে স্বতঃই আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে।

সি। কেন দিদি, কিসের আশঙ্কা? বিবাহ-সংবাদ ত আনন্দের বিষয়।

বারান্দার অপর প্রান্তে রাফিয়া, সকিনা ও ঊষা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন; হেলেন তাঁহাদের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ উহারা সকলেই বিবাহিতা —"

তাঁহাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ হইল দেখিয়া রাফিয়া সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের কি নিন্দা করিতেছেন, হেলেন দিদি?"

হেলেন সিদ্দিকার হাত ধরিয়া তাঁহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন — এই দেখ, ইঁহাদের সকলেরই বিবাহ-জীবন 'ফেল' (fail) হইয়াছে। এই যে রাফিয়া বেগম, ইনি বড়ঘরের কন্যা, ততোধিক বড়লোকের স্ত্রী; কিন্তু তোমাদের দেশীয় প্রথা অনুসারে সধবার চিহ্নস্বরূপ হাতে একগাছি চুড়ি পর্য্যন্ত নাই! ঐ যে সকিনা খানম, উনিও অতি সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা, নোয়াখালীর জনৈক প্রসিদ্ধ উকিল, মিষ্টার কি 'খান' — নামটা এখন আমার মনে পড়ে না, — তাঁহার স্ত্রী; কিন্তু দেখ অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার নাই। কেবল ঊষারাণী শাঁখা খুলিতে পারেন নাই — "ছাড়ব না হাতের শাঁখা, ঐটি সধবার নিশানা!"

ঊষা। হেলেনদি ! তুমি আজ আমাদের 'বিয়ে ফেল্'-এর আলোচনা লইয়া বসিলে কেন ?

সকিনা। সম্ভবতঃ সিদ্দিকাবুকে সাবধান করিতেছেন। — আমিও বলি, ভাই পদ্মরাগ ! তুমি বিবাহ করিও না, সাবধান !

রাফিয়া। কিন্তু 'আল্মাস্' আসিয়া জুটিলে তোমার সতর্কবাণী মনেও থাকিবে না —

উ। মিঃ আল্মাস্ আসিলে দূর হইতে নমস্কার করিও — ধরা দিও না পদ্মরাগ !

সিদ্দিকা তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিতে যাইয়া বলিলেন — "ঊষাদি ! তুমি ভুল বুঝিয়াছ। আল্মাস্' শব্দের অর্থ হীরক। সকিনাবু আমায় 'পদ্মরাগ' বলিলেন কি না তাই রাফিয়াবু পরিহাস করিয়া 'আল্মাস্' বলিয়াছেন।"

উ। হাঁ , হাঁ, আমিও তাহাই বলি, হীরা আসিলে চুণী যেন দূর হইতে নমস্কার করিয়া সরিয়া পড়ে !

হে। সিদ্দিকা, এখন তুমি বুঝিলে ত যে বিবাহ আনন্দের বিষয় নহে। নতুবা ইহারা গৈরিকবসনা ও নীলাম্বরধারিনী সন্ন্যাসিনী হইতেন না।

সি। ইঁহাদের বিবাহ কিরূপে বিফল হইয়াছে, তাহা শুনিলাম না।

উ। উনি একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহেন ! পদ্মরাগ সহজে পশ্চাৎপদ হইবার পাত্রী নহেন।

হে। তবে শুন। এই যে রাফিয়া বেগম, ইনি জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টারের পত্নী। বিবাহের তিন বৎসর পরে ইঁহাকে মাত্র দুইটি শিশু কন্যা-সহ রাখিয়া তিনি ইংলন্ড যাত্রা করেন। সাধারণতঃ লোকের ব্যারিস্টারী শিক্ষা করিতে তিন বৎসর লাগে। কিন্তু উঁহার প্রিয়তম ঝাড়া দশটি বৎসর ইংলন্ডে রহিলেন। ইনি পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান করিয়া বিরহের সেই সুদীর্ঘ দশ বৎসরের দিন একটি একটি করিয়া গণনা করিতে লাগিলেন। এই দশ বৎসর ইনি দুধের সর ও আম্রফল খান নাই — যেহেতু তাঁহার প্রিয়তম ইংলন্ডে ঐ দুইটি জিনিসে বঞ্চিত ছিলেন —

রা। যান, হেলেন দি ! আপনি ও-সব কি বলেন —

হে। সত্য ঘটনা বলিতেছি — কাব্য উপন্যাস নহে ! ইঁহার প্রিয়তম ইংলন্ড গিয়া প্রথম বৎসর সপ্তাহে ৭ খানি পত্র পাঠাইতেন ; দ্বিতীয় বৎসর সপ্তাহে ৩ খানি — পর বৎসর সপ্তাহে ১ খানি, ক্রমে মাসে দুই মাসে ১ খানি পত্র পাঠাইতে লাগিলেন। রাফিয়া বেগম তাহাতেও দুঃখিত ছিলেন না। জ্যেষ্ঠা কন্যাটি ৫/৬ বৎসরের হইলে শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গে নিজেও পিয়ানো, সেতার প্রভৃতি বাজাইতে এবং প্রাণপণে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যাহাতে ইংলন্ড-প্রত্যাগত স্বামীর উপযুক্তা ভার্যা হইতে পারেন — স্বামীর সহিত ইংরাজীতে প্রেমালাপ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই সকল সাধনা।

রা। ও হেলেন দি ! আপনি চুপ করিবেন না ?

হে। এই চুপ করিতেছি, আর অধিক কিছু বলিবার নাই। স্বামীকে চমৎকৃত করিবার জন্য সুমার্জিত ইংরাজী ভাষায় পত্র লিখিলেন। স্বামী দুইমাস পরে একটা যেন-তেন সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া চরিতার্থ করিলেন। ইনি তবু দুঃখিত হন নাই। ক্রমে স্বামীর প্রত্যাবর্তনের সময় নিকটবর্তী হইতে লাগিল। আর দুই বৎসর পরে আসিবেন, আর এক বৎসর বাকী! এখন ছয় মাসেও একখানা পত্র আইসে না — না আসুক, তিনি আসিলে একেবার সুদে আসলে শোধ লওয়া যাইবে! ইহার কি চমৎকার ধৈর্য! প্রিয়তমের আগমনের আর মাত্র ১৫ দিন বাকী! এই সময় তাঁহার দেবর তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, যেন তিনি কোন রেজিষ্টি পত্র গ্রহণ না করেন। স্বামীর আগমনের ১২ দিন পূর্বে তাঁহার ইনশিওর করা পত্র আসিল। ছয় মাস পরে এত বড় একখানি ইনশিওর-করা পত্র — ইহা কি ফেরত দেওয়া যায়? দেবর হয়ত অন্য লোকের পত্র গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। স্বামীর পত্র স্ত্রী গ্রহণ করিবেন না, এ কি কথা? তবু তিনি ডাক-পিয়নকে পরদিন আসিতে বলিয়া পত্রখানি ফেরত দিলেন। অপরাহ্নে দেবরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে সে পত্রের বিষয় বলিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন — " না, ভাইএর পত্র গ্রহণ করিবেন না! ঈস্! ছয় মাস পরে পত্র লেখা হইয়াছে! আপনি পত্র ফেরত দিলে তিনি শিক্ষা পাইবেন যে, আপনিও রাগ করিতে জানেন।"

হতভাগা ডাক-পিয়ন আবার পরদিন এমন সময় আসিল, যখন কোন পুরুষ মানুষ বাড়ীতে ছিলেন না। রাফিয়া বেগম ভাবিলেন, এতকাল পরে পত্র আসিল, ইহা প্রত্যাখান করি কোন্ প্রাণে? আর দশ দিন পরেই ত তিনি আসিবেন, তখন বুঝিয়া লইব। তিনি ভাবিয়াছিলেন, পত্রে না জানি কতই ভালবাসার কথা আছে। দীর্ঘকাল নীরব থাকার বিস্তারিত কৈফিয়ৎ আছে। সুতরাং তিনি যথাবিধি স্বাক্ষর দিয়া পত্র গ্রহণ করিলেন। অতি আগ্রহে তৃষাতুরা চাতকীর ন্যায় পত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন —

রাফিয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হেলেনও অস্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। সিদ্দিকা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, ঊষা এবং সকিনাও বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন — "থাক্, আমি আর শুনিতে চাহি না।"

হেলেন অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন — "এই টুকুই ত গল্পের প্রাণ! শুন — তিনি পত্রের মোড়ক খুলিয়া দেখিলেন, তাহা সুবিস্তৃত ত্যাগপত্র (তালাকনামা)। তিনি ত্যাগপত্র দিয়াছেন, ইনি স্বাক্ষর দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন — সুতরাং তাঁহাদের বিবাহ-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল!! এইরূপে ১৩ বৎসরের বিবাহ-বন্ধন কলমের এক আঁচড়ে শেষ হইল! তিনি ত ইংলন্ড হইতে মেম লইয়া আসিলেন, রাফিয়া পাগল হইয়া গেলেন? —"

সকিনা। আততায়ী একবার দেখিল না ফিরে,

অর্ধমৃত কি প্রকারে ছট্ফট্ করে।*

---

* "না মোড় কর বে-দরদ কাতিল্ নে দেখা
তড়পতী রহী নীম্জান্ কেয়সে কেয়সে।"

হে। সুচিকিৎসার ফলে প্রায় তিন বৎসর পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। পরে কি জানি কি কৌশলে তিনি ও সকিনা একত্রে তারিণী-ভবনে আসিয়াছেন। পাঁচ বৎসর হইতে তাঁহারা এখানে আছেন। রাফিয়া মিসিস্ সেনের প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়াছেন। সকিনা রোগী-সেবা (নার্সিং) শিক্ষা করিয়াছেন।

সি। আর তাঁহার কন্যাদ্বয়?

হে। যথাকালে তাহাদের উভয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

স। মিসি্স হরেস, আপনি ত রাফিয়া-বুর ইতিহাস বলিলেন, কিন্তু নিজের পাগলটার গল্প বলেন না কেন?

উ। হাঁ, সে গল্প তুমি বল ; তুমি সে সংবাদপত্রের পাতা কাটিয়া (কাটিং) রাখিয়াছ।

হে। তাহা হইলে সকিনাবু, আমি তোমারও বিবাহ-রহস্য বলিয়া দিব।

স। বলিবেন, সে ত আর প্রেম-কাহিনী নহে! তবে শুন ঃ —

হেলেন-বিবাহ কথা অনল যেমতি
ব্যথিতা সকিনা ভণে শুনে দয়াবতী।

দয়া এবং মমতার প্রতিমা হৃদয়বতী সিদ্দিকা সত্যই ঐ কথা — ঐ অনলের তরল বৃষ্টিধারা তৃষিতা চাতকীর ন্যায় পান করিতেছিলেন!

সকিনা। বিবাহের তিন বৎসর পূর্ব হইতে হেলেনদি মিঃ জোসেফ হরেস্কে জানিতেন। তিন বৎসরের পরিচয়ের পর তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এক বৎসরকাল পরম সুখে অতিবাহিত হইল। তখন জানিতেন না, সে 'ফুলের মালা' — প্রকৃত ফুলের মালা ছিল না, কিছু দিনের জন্য রূপান্তরিত হইয়াছিল মাত্র।

বিবাহের দ্বিতীয় বৎসর হইতে তিনি সুরাসক্ত এবং তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য কুক্রিয়াসক্ত হইলেন। রাত্রি ১২/১ টার পর বাড়ী আসিয়া দিদির উপর 'মাতলামী' ঝাড়িতেন! রাগারাগি, গালাগালি দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। সময় সময় প্রহারও চলিত। অদ্যাপি ইঁহার সঙ্গে প্রহার-চিহ্ন আছে। ইনি সে সব 'শারীরিক ও মানসিক' যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া তাঁহাকে সৎপথে আনিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি সুযোগ পাইলেই পলায়ন করিতেন, ইনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ধরিয়া আনিতেন।

সি। পলায়ন করিতেন কেন?

স। মরিতে। অপরিমিত সুরাপানে অজ্ঞান হইয়া থাকিতেন। ইনি সেই অবস্থায় ধরিয়া আনাইতেন। অবশেষে হাজারীবাগ হইতে যে পলায়ন করিলেন, তখন আর ইনি কোনও সন্ধান পাইলেন না।

বহুদিন পরে জনশ্রুতি শুনা গেল, তিনি কানপুরে নরহত্যা করিয়া পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়াছেন। দিদি সেইখানে গেলেন। যাইয়া শুনিলেন, হরেস্ নামক এক ব্যক্তি বদ্ধ-পাগল বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তাঁহাকে ইংলন্ডে প্রেরণ করা হইয়াছে। হেলেনদিও পাগলিনী-প্রায় সেই পাগলের অনুসরণে 'ঘটী বাটী' বিক্রয় করিয়া ইংলন্ড যাত্রা করিলেন।

ইংলন্ডে গিয়া জানিতে পারিলেন, মিঃ হরেস্ মিস্ রিভা সন্ডার্স নাম্নী কোন যুবতীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে ধরা পড়িয়াছেন এবং আরও একজন লোককে হত্যা করিয়া ব্রোডমুরে 'ক্রিমিন্যাল্ লুনাটিক্ এসাইলামে' ('অপরাধী–বাতুলাশ্রমে') বন্দী আছেন। তখন ইঁহার মাতা জীবিত ছিলেন। তিনি এই সুযোগে হরেসের বিরুদ্ধে নালিশ করাইয়া হেলেনদিকে আদালত কর্তৃক 'ডিক্রী নিসি' দেওয়াইলেন। কিন্তু রীভা উক্ত কলঙ্কের বিরুদ্ধে আপীল করিয়া নির্দোষ বলিয়া মুক্তি পাইল। এদিকে রীভার মুক্তিতে হেলেনের 'ডিক্রি নিসি' পণ্ড হইল। আহা ! বলিহারি যাই ইংরেজ আইনের ! হেলেনদি আবার আপীল করিলেন। তাহার ফল এই হইল যে, আপীলের লর্ড চতুষ্টয় একবাক্যে বলিলেন — "মিসিস্ হেলেন্ মেরী হরেস্ তাঁহার স্বামী লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিসিল্ জোসেফ্ হরেস্ হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না।"

তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, প্রায় তিন বৎসর হইল সংবাপত্রে "পাগলের সহিত চিরজীবনে বাঁধা" (''Tied for life to a lunatic'') শীর্ষক এক বিলাতী বিচারের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দেখ, আমি সে কাগজ খণ্ড সযত্নে রাখিয়াছি। কোন কোন বিচারকের একটু হৃদয় আছে, তাই লর্ড বার্কেন হেড্ স্বীয় রায়ে বলিয়াছেন — "আমাদের বিবাহ আইনের এই হতভাগিনী–'বলি'র প্রতি অবশ্যই আপনাদের সহানুভূতি আছে। * * * ইহা বড় দুর্ভাগ্যেয় বিষয় যে, এ বেচারী চিরজীবন একটা নরঘাতক, ভয়ঙ্কর অত্যাচারী নিষ্ঠুর বাতুলের সহিত আবদ্ধা থাকিবেন * * অনেকে আমাদের এই বিচার নিষ্পত্তিকে কঠোর ও অমানুষিক মনে করিবেন — কিন্তু ইহাই হইতেছে **ইংলন্ডের আইন !** * * ইহার প্রকৃত প্রতিকার আইন আদালতের বাহিরে।"

ফল কথা, ইংলন্ডের আইন্ হেলেনদিকে বাতুলের বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিতে পারিল না। হরেসের বাতুলতার বিষময় ফল হেলেনকে ভোগ করিতে হইবে ! ইহা অপেক্ষা অবিচার অত্যাচার আর কি হইতে পারে? এই ইংলন্ড — এই পুঁতিগন্ধময় পচা ইংলন্ড আবার সভ্যতার দাবী করে !

হে। এজন্য তুমি দুঃখ কর কেন সকিনাবু'? তুমিও ত তোমাদের দেশের আইন ও আচার–পদ্ধতির উৎসর্গীকৃত 'বলি' !

স। আমাদের দেশ ত অসভ্য পরাধীন দাসাধম দাস — তাহার সর্বাঙ্গে কলঙ্ক–কালিমা। কিন্তু তোমাদের যে সাদা ধব্ধবে দেশ ! এখন আমি 'ইতি' করি — এইরূপে হেলেন'দির সুখের দিন বড় শীঘ্র ফুরাইল। 'গাঁথা না হইতে মালা — ফুলদল শুকাইল।' সূর্যোদয়ের আনন্দটুকু অনুভব করিতে না করিতে সূর্য্যাস্ত হইল। আশালতা সবে মুকুলিত হইতেছিল, তখনই সমূলে উৎপাটিতা হইল !

হে। ভগিনী ! আমি ভাবিয়া দেখিলাম — না পুড়িলে কিছুই পবিত্র হয় না। ধর্ম্মের পথ কন্টকময়, তাই প্রেমে ক্ষণিক সুখ নাই। যত সুন্দর বস্তু দেখ, সকলের মধ্যেই আগুন আছে। যদি জোসেফের সহিত বিচ্ছেদ না হইত, তবে আমি এ বিশ্বপ্রেম শিখিতাম না। এখন এ জ্বালা–পোড়া সুন্দর বোধ হয়। জ্বলিতেই সুখ বোধ হয়। জগৎ–সংসার কেবলই জ্বলিতেছে।

সি। (অন্যমনস্কভাবে) তাই ত সৌদামিনীতেও আগুন আছে।

হে। শুধু সৌদামিনীতে কেন — প্রফুল্ল — নলিনীতেও আছে !

সিদ্দিকা সবিস্ময়ে হেলেনের মুখ দেখিতে লাগিলেন — এ কি, হেলেন কি বলেন? ইহা রূপক নাকি? তিনি কি সিদ্দিকার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন?

হে। কি ভাবিতেছ?

সি। ভাবিতেছি — আপনি এমন সুন্দর মানুষ আপনার বুকে আগুন আছে!

হে। তোমার মনে কি আগুন নাই?

সি। (ত্রস্তভাবে) না।

এই "না" যেরূপ জোরের সহিত উচ্চারিত হইল, তাহাতেই যেন শত "হাঁ" প্রকাশিত হইল। সকলে হাসিলেন। সিদ্দিকা অপ্রতিভ হইলেন।

এমন সময় ঝি আসিয়া বলিল — "মাঠাকরুণরা, আজ না'বেন খা'বেন না? বড় মাঠাকরুণ (সৌদামিনী) রান্না-ঘরে একলাটি বসে আছেন।"

উ। তাই ত, বেলা যে ১২টা! কিন্তু এদের যে "প্রেমসুধা-পানে ক্ষুধা তিরোহিত হয়েছে!" এখন উঠা যাক্।

হে। হাঁ উঠি, কিন্তু সকিনা-বু ও ঊষা-দির গল্প বাকী রহিল।

সি। তাহা আজি রাত্রে শুনিব।

*   *   *   *

নৈশ-ভোজনের পর সিদ্দিকা হেলেনকে ঊষা ও সকিনার গল্পের জন্য ধরিলেন।

হে। সকিনার কথা রাফিয়া বেগম ভাল জানেন, তিনি তাঁহার আত্মীয়া! তাঁহাকে অনুরোধ কর।

রাফিয়া বেগম আরম্ভ করিলেনঃ — সে আজ প্রায় ১৭ বৎসরের ঘটনা। বিবাহের সময় সকিনার বয়স ১৫ বৎসর ছিল। উনি সম্পর্কে আমার ভ্রাতৃবধূ এবং ভগিনীও বটেন। আবদুল গফুর খাঁ তখন খুলনায় একজন উদীয়মান উকিল। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার চরিত্রদোষ ঘটে; তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহার চরিত্র সংশোধনের অনেক চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইলেন। অবশেষে বিবাহ-রূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। পরিচিত লোকেরা কেহ কন্যাদানে সম্মত হইলেন না। ভ্রাতা তখন দূরদেশে শিকারের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এদিকে আবদুল গফুর বাঁকিয়া বসিলেন, কিছুতেই বিবাহ করিবেন না। অনেক সাধ্য-সাধনার পর সম্মত হইলেন যে, নিখুঁৎ সুন্দরী পাইলে বিবাহ করিবেন।

(শ্রোত্রীগণ একযোগে সকিনার প্রতি চাহিলেন সত্যই ত তিনি পরমাসুন্দরী, যেন ডানাকাটা পরী!)

তখন বড় ভাই বলিলেন, যে, চরিত্র-সংশোধন হওয়া উচিত। তিনি নিজে বেশ ভাল লোক ছিলেন; কনিষ্ঠের দুষ্ক্রিয়ার জন্য মর্মপীড়িত থাকিতেন। এবার গফুরের দয়া হইল; তিনি সুবোধ বালকের মত সুরা এবং অন্যান্য কুক্রিয়া ত্যাগ করিলেন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা বর্ধমানে গিয়া সকিনার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিলেন। কিন্তু একটা পরিচারিকা যে গুপ্তভাবে তাঁহার রক্ষিতা ছিল, তাহা কেহই জানিত না।

যথাসময় আমরা বরযাত্রী লইয়া গেলাম। বেলা (সেই পরিচারিকা) ও আমাদের সঙ্গে গেল। বিবাহ অনুষ্ঠানের পর যখন বর কন্যার শুভদৃষ্টির নিমিত্ত বর অন্তঃপুরে আহূত হইয়া কন্যার পার্শ্বে বসিয়াছেন, সেই সময় বেলা বরের কানে কানে কি বলিল।

আমার বলিতে লজ্জা হয় — দূর-সম্পর্কের হইলেও তিনি আমার ভাই — সেই ভাইয়ের অমানুষিক কাণ্ডের কথা বলিতে আমি লজ্জায় অধোবদন হই। তোমরা বিশ্বাস করিবে? — বর তখনই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কন্যার মুখ দর্শন করিবেন না! কারণ বেলা বলিয়াছে, "বিবি-সা'ব্ ত সোন্দর না।" কন্যাপক্ষীয় লোকেরা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বরের দিকে চাহিয়া রহিলেন! বরের ভাই রাগ করিয়া বলিলেন, তিনি খুন করিবেন। উপস্থিত লোকেরা বলিলেন, "তুমি স্বচক্ষে দেখ, পাত্রী সুন্দরী কি না!"

বর-কন্যার শুভ-দৃষ্টি হইল। পরদিন বর নব-বধূর সমস্ত অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করিলেন। বাড়ী গিয়া ভাইকে শাসাইলেন যে, তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া একটা কুৎসিতা পাত্রীর সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, এজন্য তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে 'ড্যামেজ সুট' আনিবেন! সকিনার ভাগ্যে আর স্বামীগৃহে যাওয়া ঘটে নাই।

ভ্রাতা গফুরের মুখদর্শন বন্ধ করিলেন। কিছুদিন পরে সে বেলা মরিল। গফুর একজন বিধবাকে বিবাহ করিলেন। প্রায় তিন বৎসর পরে সকিনার ভ্রাতৃত্রয় 'দেন মোহর' (স্ত্রীধন)-এর জন্য নালিশ করিয়া গফুরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এ সব গোলমালে আরও দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। গফুর বে-গতিক দেখিয়া শ্যালকের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; তাঁহারা ইহাতে সম্মত হইলেন।

গফুর আমাকে এবং আরও কয়েকজন আত্মীয়া মহিলাকে সঙ্গে লইয়া বউ আনিতে চলিলেন। আমরা নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি অনেক উপঢৌকন লইয়া ক'নেকে ফুস্‌লাইতে গেলাম — "আরসী আন্‌ছি, কাঁকই আন্‌ছি, চুল বান্ধনের ফিতা আন্‌ছি!"

কিন্তু সে সব দেখে কে? — সকিনার তখন ভয়ানক জ্বর।

গফুর স্বয়ং বধূর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, মাথা টিপেন, বাতাস করেন ইত্যাদি। কিন্তু বদ্‌রসিক সকিনা তাঁহার প্রতিদান কি দিলেন, জানেন। তাঁহার জ্বর ছাড়িলে আমরা বউ লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলাম। যাত্রার পূর্বদিন বউ বরকে পত্র লিখিলেন। গফুর আমাকে সে পত্র দেখাইলেন। আজি পর্যন্ত সে পত্রের প্রত্যেকটি শব্দ আমার বেশ স্মরণ আছে। তাহা এই ঃ

"আদাব জানিবেন, —

"আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। কিন্তু স্পষ্ট কথা এই ঃ আপনার সহিত ইহজীবনে আমার মিলন অসম্ভব। আপনি একটা পরিচারিকার কথায় আমাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা কি আপনার স্মরণ নাই? আপনার "বেলা যারে 'সোন্দর' কইব, সেই হইবে 'সোন্দর'।" সে আমাকে 'সোন্দর' বলিয়া সার্টিফিকেট না দেওয়াতে যে আমার বিবাহ 'পাশ' হয় নাই, — এ অপমান, — আমার মতে সমস্ত নারীজাতির প্রতি এই অপমান, আমি অদ্যাপি ভুলিতে পারি নাই। অধিক বলা বাহুল্য।

ইতি —
"আপনার পদ-দলিতা
সকিনা।"

*   *   *   *

সকিনার ভ্রাতৃগণ পত্রের বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। সকিনার হাত পা বাঁধিয়া 'প্যাক' করিয়া আমাদের সহিত পাঠাইবেন বলিয়া শপথ করিলেন ! অভাগিনী সকিনা দেখিলেন, সমস্ত জগৎ তাঁহার বিরোধী ; তখন অনন্যোপায় হইয়া সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে কূপে ঝাঁপ দিলেন। ভাগ্যহীনাদের জন্য মৃত্যু এত সহজ নহে ! একটি দাসী তাহা দেখিতে পাইয়া কোলাহল করিল, ফলে সকিনা কূপ হইতে উত্তোলিতা হইলেন ।

*   *   *   *

আমি বহুকষ্টে ভ্রাতৃত্রয়কে বুঝাইলাম যে, তাঁহারা আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন, সকিনার মন ভাল হইলেই আপনি পতি-গৃহে যাইবেন।

অগত্যা আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইলাম।

উক্ত ঘটনার ৭ বৎসর পরে সকিনা স্বীয় ভ্রাতৃবধূদের সহিত কলিকাতায় আসিলেন। সে সময় আমিও উন্মাদ রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলাম। সেই সময় দুইটি সম-দুঃখিনীতে — অর্থাৎ সকিনাতে ও আমাতে বেশ ভাব হইল। তিনি আমাকে একটি সংবাদপত্রে তারিণী-ভবনের বিবরণ দেখাইলেন। অতঃপর আমরা উভয়ে তারিণী-কর্মালয়ে আসিলাম। আত্মীয়গণ প্রাণপণে বাধা দিলেন; কিন্তু আমরা শুনিলাম না।

সকিনা-কাহিনী বিবৃত হইলে পর সৌদামিনী ঊষার দিকে চাহিয়া বলিলেন — "এখন ঊষাদির পালা !'

ঊ। আমার ত প্রেম-কাহিনী নহে, তাহাতে বিরহ-বিকার নাই। সন্ধিও নহে, বিচ্ছেদও নহে।

সৌ। তবুও "কেন যোগীবেশে ভ্রম এ বিজন-কাননে?"

ঊ। রাফিয়াদি'র **পাষণ্ড**, হেলেনদি'র **উন্মাদ**, সকিনাদি'র **লম্পট মাতাল** কিন্তু আমারটির এ তিন গুণের এক গুণও নাই —

সৌ। "কোন গুণ নাই তার মুখেতে আগুন !"

স। আহা ! অমন কথা বলিও না — বেচারী এই দীর্ঘ ২০ বৎসরের বিরহেও শাঁখা খুলেন নাই। এখন ভূমিকা ছাড়, ঊষাদি' ! তোমার 'তিনি'র গুণগান কর।

ঊ। আমার 'তিনি' **কাপুরুষ** !

সৌ। বাহবা ! নহিলে কি — "ঘরের ব্রাহ্মণী ফিরে তারিণী-ভবনে?"

ঊ। আমাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল। তাহারা 'ভদ্রলোক' ডাকাত ছিল — পিস্তলহস্তে আক্রমণ করিয়াছিল। আমার কামরায় কেবল আমার স্বামী ও আমি ছিলাম। ডাকাতেরা পদাঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া কামরায় প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে আমার পতি-দেবতা জানালা টপ্‌কাইয়া পলায়ন করিলেন ! ! আমি তখন ছেলেমানুষ, বয়স মাত্র ১৭ বৎসর — সেই ডাকাতের হাতে আমি একা ! ! আমি তবু প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইলাম — অঞ্চল হইতে চাবির রিং খুলিয়া তাহাদের দিলাম ; অঙ্গে যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল — শাঁখা ব্যতীত

সমস্ত উন্মোচন করিয়া দিলাম। প্রথমে তাহারা আমার সহিত মাতৃ-সম্বোধনে কথা বলিতেছিল; একজন বলিল — 'মা লক্ষ্মী, আর কোথায় কি আছে, বল দেখি?" অন্য একজন বলিল — "তুমি বেশ লক্ষ্মী মেয়ে।" অতঃপর সম্ভবতঃ আমাকে সম্পূর্ণ একাকিনী পাইয়া তাহারা ইংরাজীতে কি পরামর্শ করিল। তখন আমি ইংরাজী মোটেই জানিতাম না, সুতরাং তাহাদের কথা বুঝিতে পারি নাই।

দস্যুগণ আমার মুখে কাপড় বাঁধিয়া এবং হাত বাঁধিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল! গৃহদ্বার অতিক্রম করা পর্যন্ত বাড়ীর কোন লোককে দেখিতে পাইলাম না — অথচ আমার দেবর, ভাশুর প্রভৃতি ছিলেন চারি জন! আমি হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া, একমাত্র বিপদভঞ্জন — অসহায়ের সহায় পরেমশ্বরকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলাম। আহা! তেমন করিয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে আর কখনও স্মরণ করি নাই!

অন্ধকার রাত্রি, বন্য পথ দিয়া কাঁটা-জঙ্গলে পদতল রুধিরাক্ত করিয়া দস্যুদের সহিত চলিলাম। সেই পথে তিনজন লোক লণ্ঠন হস্তে যাইতেছিল — তাহারা আমাদের দেখিতে পাইল। দস্যুগণ তখন আমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সে লোকেরা দ্রুতপদে আমার নিকট আসিয়া আমার বন্ধনমোচন করিয়া বলিল — "মা! কোন ভয় নাই, আমরা কংগ্রেস কমিটির ভলাণ্টিয়ার। তোমার বাড়ী কোথায় বল; চল, তোমায় রাখিয়া আসি।"

সেই লোক তিনটি আমাকে গৃহাভিমুখে লইয়া চলিল; একে ত পদব্রজে চলিবার অভ্যাস নাই, দ্বিতীয়তঃ কণ্টকাঘাতে পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, সুতরাং বাড়ী পৌঁছিতে ভোর হইয়া গেল। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ডাকাডাকি করিলে আমাদের পুরাতন ঝি কেষ্টার মা অসিল। তাঁহারা আমাকে কেষ্টার মা'র হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রথমে শাশুড়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইল; তিনি আমাকে দেখিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বড়—জা বলিলেন — "সেজ বউ! তুমি কোন্ আক্কেলে আবার এখানে ফিরে এলে?" মেজ-জা বলিলেন — "পীরিত জমেজিল ভালই, চার জনে নিয়ে গেল; তিন জনে দিয়ে গেল!" তখন আমি শ্বশ্রূমাতার ক্রন্দনের কারণ বুঝিলাম! সমস্ত দিন স্বামীর দর্শন পাইলাম না। জায়েরা বিদ্রূপ-টিট্‌কারী ছাড়া অন্য ভাষায় কথা কহিলেন না। শাশুড়ী কেবল ক্রন্দন ক্রিয়াই করিতে থাকিলেন। আমি আকাশ পাতাল ভাবিয়া কর্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। আত্মহত্যা ব্যতীত অন্য কোন পথ সম্মুখে দেখিলাম না। অনলে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

হে। যে কাপুরুষ আপন স্ত্রীকে রক্ষা না করিয়া জানালায় লম্ফ দিয়া পলায়ন করিল, তাহার জন্য কোন দণ্ড তোমাদের সমাজে নাই?

সৌ। না — ইহ্-জগতে নাই; আশা করি পরলোকে নিশ্চয় সুবিচার আছে।

উ। সন্ধ্যার সময় কেষ্টার মা আমাকে বলিল "বউ-দি! চল আমার সঙ্গে।" আমি বলিলাম — "তোমার সঙ্গে যাইব কেন?" কেষ্টার মা বলিল — "তুমি যে ডাকাতের সঙ্গে গেলা, ওনারা আর তোমাকে ঘরে নেবেন না।" আমি তাহাকে আমার আত্মহত্যার সঙ্কল্প জানাইলে সে বলিল — "আবাগি! নিজে ম'রে পেত্নী হ'বি কেন? ওনাদের মুখে কালী দিয়া পরের বাড়ী রাঁধুনীর কাজ কর।" ঝির কথায় আমারও সাহস হইল; সত্যই ত, নিজে মরিব

কেন? যাঁহারা আমার এ লাঞ্ছনার কারণ, তাঁহাদের মুখে কালী দিব। আমি হাতের নিকট আর কিছু না পাইয়া আমার সপ্তমবর্ষীয়া ননদ, ঘুমন্ত মিনির হাতের বালা দুইটি লইয়া ঝির সঙ্গে এক বসনে চলিলাম।

চারি পাঁচ দিন পরে ঝি আমাকে বলিল যে, আমার জন্য রাঁধুনীর কাজ ঠিক করিয়াছে, আগামী পরশ্ব তথায় লইয়া যাইবে। কিন্তু কেষ্টার বউ আমাকে চুপি চুপি বলিল যে, আমাকে তাহার শাশুড়ী কোন পতিতা স্ত্রীলোকের নিকট বিক্রয় করিয়াছে! আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। কিঞ্চিৎ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া দীননয়নে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম — "বউ! তবে আমার কি হবে?" সে কাঁদিয়া ফেলিল। পরে সে আমাকে বলিল, তাহারা কলিকতায় যাইবার সময় আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে।

পরদিন কেষ্টা চাকুরী উপলক্ষে বউ-সহ কলিকাতায় যাইবে, আমি লুকাইয়া তাহাদের সঙ্গী হইলাম। কেষ্টার শাশুড়ী একটা স্কুলে দাসীবৃত্তি করে, আমি তাহার সহিত সেই বালিকা-স্কুলে রাঁধুনীর কাজে গেলাম। পরে জানিলাম, সে "স্কুল" তারিণী-কর্ম্মালা। আমি ত এক বসনে গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম; সে কাপড়খানি অত্যন্ত মলিন হইয়াছিল। অন্য কাপড় কিনিবার সুবিধা হয় নাই, কারণ সেই বালা দুইটির বিনিময়ে কেষ্টার বউ আমাকে কলিকাতায় আনিয়াছে, এই যথেষ্ট।

আমি কেষ্টার শাশুড়ীর সহিত মিসিস্ সেনের সম্মুখে আনীতা হইলে, তিনি আসন ত্যাগ করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন! আমি ত অবাক্! এত স্নেহ আমার জন্য! আমি অত্যধিক কৃতজ্ঞতায় আনন্দে মূৰ্চ্ছিতপ্রায় হইলাম। তিনি তখনই আমাকে স্নানাগারে পাঠাইয়া দিলেন। প্রায় পক্ষকাল পরে স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্তন করিলাম।

* * * *

মিসিস্ সেন আমাকে নিজ ব্যয়ে উচ্চশিক্ষা দান করিলেন। মাত্র তিনটি নম্বরের জন্য আমি বি-এ ফেল হইয়াছি। অতঃপর ট্রেনিং পাশ করিয়াছি, এখন আমি তারিণী-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী।

সি। সমাজের এইসব নালীঘায়ের কি ঔষধ নাই? বাতুলের সহিত চিরজীবন আবদ্ধ থাকিতে হইবে, বিনা কারণে পরিত্যক্তা হইতে হইবে, অবমানিতা হইয়া মাতালের সহিত সপত্নী সমভিব্যাহারে ঘর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সহোদর ভাই হাত পা বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইতে চাহিবেন, স্বামী বাতায়ন উল্লঙ্ঘনে পলায়ন করিলেন বলিয়া স্ত্রীকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে — ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

সৌ। আছে! সে প্রতিকার এই তারিণী-ভবনের 'নারী-ক্লেশ-নিবারণী সমিতি'। এস, যত পরিত্যক্তা কাঙ্গালিনী উপেক্ষিতা অসহায়া লাঞ্ছিতা, — সকলে এস। তারপর সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা! আর তারিণী ভবন আমাদের 'কেল্লা।'

হে। রাফিয়াবু'র অকারণ 'তালাকের' বিরুদ্ধে কোন আইন নাই কি?

রা। থাকিলেও আমি তাহার শরণ লইতে ঘৃণা বোধ করি! যে নিষ্ঠিবনের মত পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার তাহার দিকে ফিরিয়া দেখা কেন?

স। আমিও ত ঐ জন্যই তারিণী-ভবনে আসিয়াছি। আমিও দেখাইতে চাহি যে, দেখ, তোমাদের 'ঘর-করা' ছাড়া আমাদের আরও পথ আছে! স্বামীর 'ঘর করাই' নারী-জীবনের

সার নহে। মানব–জীবন খোদাতালার অতি মূল্যবান দান — তাহা শুধু "রাঁধা–উননে ফু–পাড়া আর কাঁদার" জন্য অপব্যয় করিবার জিনিস নহে! সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করিতেই হইবে!

উ। তাহা হইলে শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অশান্তির চিতা জ্বলিবে যে!

রা। চাহি না, শান্তি! চাহি না, মৃত্যুর মত নিষ্ক্রিয় ক্লীব শান্তি!! আর এই 'অবরোধ'–প্রথার মস্তক চূর্ণ করিতে হইবে* — এইটাই যত অনিষ্টের মূল! লাথি ঝাঁটা হজম করিয়া 'অবরোধ'–প্রথার সম্মান রক্ষা, — আর নহে!

হে। আমিও একবার আকাশ–পতাল আলোড়ন করিয়া দেখিব, ইংলন্ডের এই জঘন্য আইন পরিবর্তিত হয় কি না।**

রাত্রি অধিক হওয়ায় সকলে শয়ন করিলেন। সিদ্দিকা আগুনের সৌন্দর্য্য ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
স্বয়ং কবিতা

অপরাহ্নে ঊষা, রাফিয়া, সিদ্দিকা ও সৌদামিনী পীরপাহাড়ে বেড়াইতে আসিয়াছেন। সৌদামিনী ও সিদ্দিকা একখণ্ড পাথরের উপর উপবেশন করিলেন; রাফিয়া ও ঊষা অন্যদিকে গেলেন।

সৌ। আর কতক্ষণ বসিবে?

সি। আজি একটু দেখিতে চাই সূর্যটা অস্তকালে কেমন দেখায়। পাহাড়–ভ্রমণ ত এই শেষ।

সৌ। তবে অনেকক্ষণ বসিতে হইবে। আমার আপত্তি নাই। দেখি, ঊষারা কোন্ দিকে গেলেন।

---

* "অবরোধ প্রথার মস্তক চূর্ণ" কথাটা শুনিয়া পাঠক–পাঠিকা কর্ণে অঙ্গুলী দিবেন না, দোহাই। আমাদের 'শরীয়ত' অনুযায়ী অন্তঃপুর এবং ভারতীয় 'অবরোধ' — ইহার সম্পূর্ণ দুইটি বিভিন্ন বস্তু। ছয় বৎসর পূর্বে "আল–এসলাম" পত্রিকায় কোরআন্ শরীফ ও হাদিসের দলিল–সহ এ সম্বন্ধে একটি অতি চমৎকার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহাতে স্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে যে, "পর্দার" সহিত "অবরোধ" প্রথার কোন সম্পর্ক নাই। "শরীয়ত" আমাদিগকে "পর্দ্দার" সহিত "অবরোধ" প্রথার কোন সম্পর্ক নাই। 'শরীয়ত' আমাদিগকে "পর্দায়" (বস্ত্রাবৃতা) থাকিতে বলে, — "অবরোধে" বন্দিনী থাকিতে কখনও বলে না। এই কথা লাহোরের জ্ঞানবৃদ্ধ মওলানা সৈয়দ মমতাজ আলী সাহেবও বলেন। যাহা হউক, এস্থলে সে সব বিষয় আলোচ্য নহে।

** ইংরাজী সংবাদপত্রের সেই কাটিং হইতে এই অংশ অবিকল উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যথাঃ —

'Referring to Lord Birkenhead's sympathy she said : — ''He could hardly say less, could he? But I refuse to be down-hearted. * * But now I feel if it is required of me I must come forward and help in securing alteration of the law. I'll do anything to secure that.'' ইংরাজ–ললনার উপযুক্ত উক্তি!

এখন — "গৃহ–কারা বন্দিনী লাঞ্ছিতা জাগো!
বাংলার ভগিনী, বাংলার মা গো!"

সি। দিদি, তুমি যদি একটু জল আনিতে পারিতে — আমার বড় তৃষ্ণা —

সৌ। তবে তুমি বস, আমি দেখি, এখানে কাহারও নিকট জল পাই কি না।

সৌদামিনী চলিয়া গেলে সিদ্দিকা নিবিষ্টচিত্তে মুগ্ধনেত্রে প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিয়া দেখিয়া মোহিত হইতেছিলেন। আকাশে নানা বর্ণের অলকমালা, পশ্চিমে সুবর্ণ রবি, নীচে এই বিবিধ তরুলতা-শোভিত সৌম্য মহান পীর পাহাড় — এত সব কাব্য দেখিয়া সৃষ্টিকর্তার শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া কি থাকা যায়?

অদ্য সিদ্দিকা বড়ই ম্রিয়মানা ; কত কি ভাবিতেছেন, সে দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। কি যেন ভাবিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; চক্ষে দুই চারি বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। অতিশয় ক্লান্তি বোধ করিতেছেন, পিপাসাও ক্রমে প্রবল হইতেছে। সৌদামিনী কখন ফিরিবেন, সেই আশায় পথ দেখিতেছেন।

কাহার মৃদু পদশব্দ শ্রুত হইল, — বুঝি সৌদামিনী আসিতেছেন। সিদ্দিকা অভিমানে মাথা তুলিয়া না দেখিয়াই বলিলেন, "তুমি এখন আসিলে! আমি ত ভাবিয়াছিলাম, তুমি আর আসিবে না। তোমার জন্য পথ দেখিতে দেখিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল" — বলিতে বলিতে সহসা মুখ তুলিয়া দেখেন, সে ত সৌদামিনী নহেন — সে যে লতীফ!

লতীফ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। — একি! সিদ্দিকা, যাঁহাকে তিনি পাষাণ-প্রতিমা বলিয়া জানেন — সেই পাষাণ-প্রতিমা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন? — কেন? অত আশা করা যাইতে পারে না। তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন — "সিদ্দিকা! তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলে? ইহা কি সত্য না আমার শুনিবার ভুল?"

সিদ্দিকা নিস্তব্ধ হইলেন। আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন যে, না দেখিয়া কেন কথা কহিলেন। এখন যদি পর্বত বিদীর্ণ হইত তবে বেশ হইত — সিদ্দিকা তন্মধ্যে লুকাইতেন! কিন্তু পর্বত দুর্ভেদ্য পাষাণ! ভাল হইত, যদি লতীফ উত্তর না পাইয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু তাহাও ত হইল না — লতীফ সম্মুখস্থিত শিলাখণ্ডে বসিলেন।

সিদ্দিকা। (মৃদুস্বরে) আমি আপনাকে বলি নাই।

লতীফ। তবে কাহাকে বলিলে। এখানে ত আমি ছাড়া আর কেহ নাই।

সি। আমি সৌদামিনীদি'র জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি আপনাকে তিনি ভ্রমে ও-কথাগুলি বলিয়াছি — ক্ষমা করিবেন। সে যাহা হউক, আপনি এভাবে আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন কেন? আর এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে আমাকে "তুমি" বলিতেছেন কেন।

ল। তোমাদের তারিণী-ভবনে ত সকলেই পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকেন এবং "তুমি" সম্বোধনে কথা কহেন। তুমি কি সে নিয়মের বাহিরে?

সি। আমি সে নিয়মের বাহিরে নহি সত্য, কিন্তু আপনি ত তারিণী-ভবনের কোন 'ভগিনী' নহেন।

ল। 'ভগিনী'গণ আমাকে 'পথে কুড়ান ভাই' বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

সি। আমি কখনও আপনাকে 'পথে কুড়ান ভাই' বলি নাই। অতএব আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ল। তুমি প্রতিবাদ না করিয়া প্রতিশোধ লও — অর্থাৎ তুমিও আমাকে 'লতীফ' এবং 'তুমি' বল!

অনেকক্ষণ উভয়ে নীরব রহিলেন, কেহ কিছু বলিলেন না — যদিও বলিবার অনেক কথা ছিল। অতঃপর লতীফ মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন — "অমন করিয়া পশ্চিম আকাশে কি দেখিতেছ?"

সি। অস্তমান্ রবি।

ল। (ঈষৎ হাস্যে) সূর্যের ত প্রতিদিন উদয় ও অস্ত হয়, তাহাতে আর নূতনত্ব কি?

সি। নূতনত্ব নাই বটে, কিন্তু দেখুন, আজিকার এ দৃশ্য বড় মনোহর। সূর্য্য যাইতেছে — যেমন বড় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া গৃহে গমন করিতেছে। আর বিষাদিনী ধরণী ম্লানমুখে তাহার দিকে করুণ-নয়নে চাহিয়া আছে — যেন বলিতেছে, "আমায় আঁধারে ফেলিয়া কোথায় যাও? একবার এদিকে দেখ!' অন্য দিকে নবোদিত চন্দ্রমা ঈষৎ হাসিয়া মেদিনীকে সান্ত্বনার স্বরে বলিতেছে — 'চিন্তা কি? আমি আছি! আমি শীতল বিমল চন্দ্রিকা দিব!'

ল। তুমি যে এমন সুন্দর কবি, তাহা জানিতাম না। আমি জানিতাম, তুমি নিজে কবিতা। তোমার নিজের সম্বন্ধে এমনই একটা কবিতাপূর্ণ গল্প বল না।

সি। আপনার জীবনের কোন গল্প বলুন, আমি তাহাই শুনিব।

ল। আমার জীবনের এক গল্পে ত তোমরাই নায়িকা। উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনা নাই। তুমি স্বয়ং কবিতা — তোমার গল্প মনোরম হইবে।

সি। আপনি ব্যারিস্টারী উপলক্ষে কত জায়গায় বেড়ান, তাই একটা কিছু বলুন না। (সৌদামিনী আসিলেন, দেখিয়া) দিদি! তুমি বড় শীঘ্র আসিলে — আমি ত এখনও মরি নাই!

সৌ। বালাই! মরিবে কেন? জল আনিতে বিলম্ব হইয়াছে সত্য। তা তুমি ত একা ছিলে না যে, দেরীটা নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছিল!

ল। একাই ত ছিলেন, আমি সবেমাত্র আসিয়াছি।

এই সময় তথায় রাফিয়া এবং ঊষা আসিলেন।

ল। (রাফিয়াকে নমস্কার করিয়া) বেগম সাহেবাকে সেদিন প্রথম-দর্শনে চিনিতে পারি নাই; পরে মা ও রফীকার মুখে সব শুনিয়াছি।

রা। তাহাতে কি হইল?

ল। কিছু না; আপনার সঙ্গে আলাপ হইল।

রা। আপনার সঙ্গে আলাপের জন্য কেহ লালায়িত ছিল কি?

ল। ইয়া আল্লাহ্! আমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য কেহ লালায়িত হইবে কেন। আমি শাপগ্রস্ত হতভাগা!

রা। অত বৈরাগ্য দেখাইবেন না — গৃহ শূন্য হওয়া বরং সুখের বিষয় কারণ অন্য একটি নবীনা গৃহিণী আসিবেন!

ল। (সিদ্দিকার প্রতি) তবে শুন, একটি গল্প মনে পড়িল। একবার একটা মোকদ্দমায় বালিকা আসামী ছিল।

সৌদামিনী নীচে নামিয়া তাঁহাদের গাড়ীর সংবাদ আনিতে গিয়াছেন দেখিয়া সিদ্দিকা বলিলেন, "এখন আমরা তাঁবুতে ফিরিয়া যাইতেছি, আর একদিন শুনিব।

রা। গল্পটা অবশ্যই মনোহর হইবে ; আজই শুনা যাউক।

ইতিমধ্যে বালক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ীওয়ালা আর অপেক্ষা করিতে চাহে না।

সি। (লতীফের প্রতি) আপনার গল্প আর একদিন শুনিব।

সৌদামিনী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন — এস পদ্মরাগ ?"

ল। 'পদ্মরাগ' ! কে ?

সৌ। আমরা সিদ্দিকাকে 'পদ্মরাগ' বলিয়া ডাকি।

ল। (সিদ্দিকার সলজ্জ রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া) সৌন্দর্য হিসাবে নামটি ঠিক হইয়াছে ; কিন্তু প্রস্তরবৎ কাঠিন্যে 'পদ্মরাগ' না হইলেই রক্ষা।

সৌ। শুনিয়াছি 'আল্‌মাস্‌' শব্দের অর্থ হীরক। তবে হীরাও কি পাথর নহে ?

ঊ। হাঁ দিদি ! পাথরে পাথরেই টক্কর !

তাঁহারা চলিয়া গেলে লতীফ সিদ্দিকার সেই দূরগামী মূর্তি অনিমেষলোচনে দেখিতে লাগিলেন ; এবং সিদ্দিকা যে বলিয়াছেন, "আমি কখনও আপনাকে 'পথে কুড়ান ভাই' বলি নাই" সেই কথা ভাবিতে লাগিলেন। সত্যই ত সিদ্দিকা অন্যান্য 'ভগিনী'দের ন্যায় কখনও তাঁহাকে ভ্রাতৃ–সম্বোধন করেন নাই ! কেন ? আরও মনে পড়িল, সেদিন তাঁহার পত্নীবিয়োগ সংবাদে সিদ্দিকার মুখের ভাবান্তর হইয়াছিল। লতীফ ঐ গল্প উপলক্ষে সিদ্দিকাকে আরও কিছুক্ষণ আটক রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন ঃ—

"পূজা উপাসনা সকলি যে ফাঁকি,
এই উপলক্ষে, দেবি ! তোমাদের দেখি !"

আর সিদ্দিকা ভাবিলেন, ঐ গল্প উপলক্ষে আর একদিন লতীফের সহিত কথা কহিবার সুযোগ হইবে। আজি গল্পটা শুনিয়া ফেলিলে ভবিষ্যতের জন্য আর আশা থাকিবে না !

ষোড়শ পরিচ্ছেদ
বীরবালা

অদ্য লতীফ বিশেষ করিয়া রাফিয়া, সকিনা ও সৌদামিনীকে ডাকিতে আসিয়াছেন। লতীফের মাতা তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। কার্যবশতঃ তাঁহাদের যাইতে বিলম্ব হইল ; বিশেষতঃ রাফিয়ার টাইপিং কিছুতেই যেন শেষ হইতেছিল না, তাই লতীফ প্রায় দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করিলেন। ভগিনীগণ সকলেই স্ব স্ব কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। কেবল ঊষা একবার আসিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেলেন ঃ —

"আমরা এখন বড় ব্যস্ত আছি। তুমি কাল আবার আসিও, ভাই! আমরা এখানে আর বেশী দিন থাকিব না। আগামী শুক্রবারে কলিকাতায় যাইব।"

পথে যাইতে যাইতে লতীফ বলিলেন, — বেগম সাহেবা ত চমৎকার টাইপ করিতে শিখিয়াছেন!"

রা। আপনাদেরই জুতার প্রসাদে।

ল। ওহো! কেবল টাইপিং নহে, অস্ত্র-চিকিৎসায় অর্থাৎ মিছরীর ছুরিকা প্রয়োগেও আপনি সিদ্ধহস্তা!

স। তাহাও ত আপনাদেরই কল্যাণে!

ল। তা বেশ, আমাদের কৃপায় সকিনা খানম 'সিভিল সার্জন' রাখিয়া বেগম 'টাইপিস্ট' আর (সিদ্দিকাকে কিছু দূরে দেখিয়া) সিদ্দিকা খাতুন কি হইয়াছেন?

রা। কবি।

সৌ। সিদ্দিকা অতি চমৎকার কবিতা লিখেন; ইংরাজী কবিতা লিখিয়া — ইংরাজ মহিলাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তিন বার পুরস্কার পাইয়াছেন। তুমি তাঁহার লেখা কখনও দেখ নাই?

ল। না, আমার সে সৌভাগ্য হয় নাই।

এদিকে সিদ্দিকা ভাবিলেন, আর বুঝি লতীফের সহিত দেখা হইবে না। আগামী পরশ্বঃই ত তাঁহারা যাইবেন। আজ তিনি লতীফের সহিত একটি কথাও কহেন নাই। কিছু ত বলা উচিত ছিল! লতীফও তাঁহাকে কিছু বলেন নাই যে, সেই কথার উত্তর-ছলে তিনি কোন কথা বলিতেন। লতীফ হয়ত এই জন্য বিরক্ত আছেন যে, তাঁহার 'তুমি' বলার অনুরোধ রক্ষা করা হয় নাই। কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবেন, সিদ্দিকা তাহাই ভাবিতেছিলেন। — এদিকে লতীফ সৌদামিনী প্রমুখ সহ চলিয়া গেলেন। তখন অগত্যা পশ্চাৎ হইতে ডাকিবেন মনে করিয়া তিনিও অনুগমন করিলেন।

লতীফ বুঝিয়াছিলেন, সিদ্দিকা কিছু বলিতে চাহেন — তাই আরও একটু বেশী ঔদাস্যভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন সিদ্দিকা অনুসরণ করিয়া এতদূর আসিলেন দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

সি। সেদিন যে গল্প বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা যে আর শুনাইলেন না?

ল। তুমি কি সত্যই শুনিতে চাও?

সি। হাঁ, নিশ্চয় শুনিব।

ল। আগামীকল্য বলিব।

সৌ। না, আজই সন্ধ্যায়। আমাদের বিশেষ কোন কাজ নাই, তোমার কষ্ট না হইলে আসিও।

*

সন্ধ্যার সময় লতীফ গল্প আরম্ভ করিলেন। শ্রোত্রী মাত্র চারিজন — সিদ্দিকা, ঊষা, রাফিয়া ও সৌদামিনী।

ল। প্রায় আড়াই বৎসর হইল, আমি একবার চূয়াডাঙ্গায় গিয়াছিলাম। সেখানে তখন রবিন্‌সন্ সাহেব নীলের চাষ করিতেন। —

রবিন্‌সন সাহেবের নাম শুনিয়া সিদ্দিকা শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার সে ভাব গোপন করিলেন। তাঁহার ভাব–পরিবর্ত্তন লতীফ লক্ষ্য করিলেন বটে, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ব্ববৎ বলিয়া যাইতে লাগিলেন ঃ —

রবিন্‌সন্ জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমিদারের সহিত বিবাদ করেন। ঐ বিবাদ ক্রমে বর্দ্ধিত হইল। সেই সময় মহম্মদ সোলেমান সাহেব (সেই জমীদার) হঠাৎ খুন হইলেন। তাঁহার বিধবা, একটি শিশুপুত্রও জনৈকা কুমারী ভগ্নী ছাড়া আর কেহ ছিল না। তাঁহার ১৯ বৎসর বয়স্ক পুত্রটিও সেই রাত্রে নিহত হয়।

সৌ। ইস ! একেবারে জোড়া খুন ! !

ল। তাহাই ত হইয়াছিল। প্রতিবেশিগণ বলে, সে রাত্রে তাহাদের বাড়ী ডাকাতি হয় ; সেই দস্যুরা তাহাদের হত্যা করিয়াছিল। আর তাঁহার অসহায়া বিধবা ও ভগিনী বলেন যে, সে ডাকাত আর কেহ নহে — স্বয়ং রবিন্‌সন্ সাহেব ও তাঁহার দলবল। কারণ কোন জিনিস চুরি হয় নাই — ভাঙ্গিয়া নষ্ট করা হইয়াছিল মাত্র ; তবে এ ডাকাত আর কে ?

রবিন্‌সন্ কয়েকবার সোলেমান সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তাই রবিন্‌সনকে তাঁহাদের চাকরেরা চিনিত।

রবিন্‌সন্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, মিসিস্ সোলেমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার মোকদ্দমা আনিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন যে, উক্ত জমিদার, তাঁহার সম্পত্তিতে ভগিনী অংশভাগিনী হইবেন বলিয়া, নামমাত্র বিবাহ দিয়া ভগিনীকে চিরকাল অবিবাহিতা রাখিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার স্বামীর সহিত মিলন হইতে দেন নাই, এই কারণে ভ্রাতা ভগ্নীতে সর্ব্বদা মনান্তর ছিল। সেই জন্য ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়কে হত্যা করিয়া তাঁহার ভগ্নী নিজের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন।

রবিন্‌সন্ প্রাণপণে সেই অসহায়া বালিকাকে আসামী সাজাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'সাহেব'লোক — কি না করিতে পারেন ? রবিন্‌সনের সহিত পূর্ব হইতে আমার আলাপ ছিল, তিনি আমাকে বেশ শ্রদ্ধা–সমাদরও করিতেন। তিনি আমাকে সময়ে সাহায্য করিতে ডাকিলেন। আমি তখন রবিন্‌সনের ব্যারিস্টার হইয়া সেখানে গেলাম ; আমার দৈনিক ফি ২০০ শত টাকা।

সৌদামিনী প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন — মেয়টির বয়স কত ছিল ?

ল। রবিন্‌সন্ আমাকে বলিয়াছিলেন, ২৮ বৎসর ; আর স্থানীয় লোকেরা বলিয়াছিল, ১৮/১৯ বৎসর।

সৌ। 'সোনায় সোহাগা' বলিতে হয় ; নিজে হত্যা করিয়া দোষ চাপাইলেন — ভ্রাতৃহারা ভগ্নীর উপর ! (সিদ্দিকার প্রতি) কি বল পদ্মরাগ, তোমার কি বিশ্বাস হয় যে, ভগ্নী ভ্রাতৃবধ করিবেন ?

সি। শুনাই যাউক না, কি হইল। বিশ্বাস না হইলেও 'সাহেবলোক' ত অপরাধী হইতে পারেন না।

উ। কিন্তু ভগ্নীর বিরুদ্ধে প্রমাণ কি ছিল?

ল। রবিন্‌সন্ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সোলেমান সাহেবের পুত্র যে ছোরায় নিহত হন, সে ছোরাখানি শ্রীমতী জয়নবের সম্পত্তি। জয়নবদের চাকরদিগকে উৎকোচ দ্বারা রবিন্‌সন্ বশীভূত করিয়াছিলেন। পুলিশও তাহার করায়ত্ত ছিল। পুলিশকে ত খুনী আসামী ধরিতেই হইবে ; তাহারা সহজে একটি অসহায়া বালিকাকে 'আসামী' বানাইতে পারিলে অনর্থক অন্য আসামী ধরিবার কথা স্বীকার করিবে কেন?

এই সময় সকিনা তথায় আসিলেন দেখিয়া লতীফ তাঁহার দিকে চাহিয়া সকৌতুকে বলিলেন — "আপনার মনে আছে ত, 'বেলা যা'রে সোন্দর কইব, সেই হইব 'সোন্দর'? এ ক্ষেত্রেও 'পুলিশ যা'দের আসামী কইব, সেই হইব আসামী' ! ! !"

স। হাঁ, আরও মনে আছে, 'পুলিশ যা'রে আসামী সাজাইল, সেই ব্যক্তি খুনের দায় হইতে বে-কসুর মুক্তি পাইলেও, পুলিশ পাইলো পুরস্কার দশ হাজার ট্যাকা'।

ল। রবিন্‌সন্ আরও দেখিলেন, জীবন থাকিতে তিনি তাঁহাদের জমিতে সহজে নীলের চাষ করিতে পারিবেন না। কারণ জয়নব অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সোলেমান সাহেব ভগ্নীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহাকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং জয়নবকে ঠকান সহজ নহে। অতএব তিনি যাহাতে কোন মতে দেশান্তরিতা হন, রবিন্‌সন্ তাহাই করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

আমি রবিন্‌সনের ব্যারিস্টাররূপে তাঁহার সমুদয় অভিসন্ধি ও সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া ছদ্মবেশে জয়নবের বাড়ী গেলাম! বহু কষ্টে তাঁহার ভ্রাতৃবধূর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে পলায়ন করিতে উপদেশ দিলাম। শুধু উপদেশ নহে — গোপনে গোপনে তাঁহাদের পলায়নের উপায় — অর্থাৎ নৌকা ও পাল্কী ঠিক করিয়া দিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে, রবিন্‌সন্ থানায় যথাবিধি সংবাদ দিবার পূর্বেই ইঁহারা সরিয়া পড়ুন ; পরে ওয়ারেন্ট বাহির হইলে দেখিয়া লইব। রবিন্‌সন্ যাহাতে আমার উপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকেন, আমি সেজন্যও সচেষ্ট রহিলাম।

উ। তোমার মক্কেলের সহিত তুমি এমন বিশ্বাসঘাতকতা কেন করিলে?

ল। তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল, সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।

রা। তাহা লতীফ সাহেবের 'গুপ্তকথা'!

স। অথবা 'প্রাণের দারুণ ব্যথা' (তিনি ও রাফিয়া অপরের অলক্ষ্যে দৃষ্টি বিনিময় করিলেন)।

দ্বিতীয় দিন আবার যখন মিসিস্ সোলেমানকে জানাইতে গেলাম যে, সমস্ত প্রস্তুত, অদ্য গভীর রজনীতে তাঁহাদের যাইতে হইবে, তখন তিনি বলিলেন যে, জয়নব আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তিনি পলায়ন করিবেন না। আমি বলিলাম — "কোন ধর্মই আত্মহত্যা অনুমোদন করে না। বিশেষতঃ মুসলমান কখনই আত্মহত্যা করিতে পারে না।

অতএব তাঁহাকে এ পাপচিন্তা হইতে নিবৃত্ত করুন ; এবং আপনারা প্রস্তুত থাকিবেন, আমি রাত্রি বারটার সময় পাল্কীসহ আসিব। মাত্র দুই জন দাসী সঙ্গে লইবেন।”

যথাসময়ে সকলকে লইয়া ঘাটে পৌঁছিলে জানিতে পারিলাম, জয়নব বিবি আইসেন নাই! আমার অত্যন্ত বিরক্তিবোধ হইল, কিন্তু তখন কিছু ভাবিবার সময় নহে। মিসিস্ সোলেমানকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া সেই পাল্কীসহ আবার জয়নবের সন্ধানে ছুটিলাম। তখন বর্ষাকাল, ভাদ্রমাসের শেষ, পথে জল–কাদার অন্ত নাই ; শারদীয় শুক্লপক্ষ হইলেও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, — অমাবস্যা অপেক্ষাও ঘোর অন্ধকার। আমি কোন বাহন সংগ্রহ করিতে পারি নাই ; সুতরাং আমাকে পদব্রজেই মিসিস্ সোলেমানের পাল্কীর অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। আপনারা আমার সেই কর্দমাক্ত মূর্তি অনুমান করিয়া দেখুন!

বাড়ী গিয়া দেখি, দালানের সমস্ত দ্বার–জানালা ভিতর হইতে বন্ধ, বাহির হইতে কোথাও কিছু দেখা যায় না। জয়নব বিবি কামরার ভিতর কি করিতেছেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই! আমি হাত–পা–বাঁধা লোকের মত ছটফট করিতে লাগিলাম — আমার সকল চেষ্টা পরিশ্রম ব্যর্থ হইল! — অবশেষে রবিন্‌সনের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হইল, অর্থাৎ জয়নব অপসারিতা হইলেন!!

জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্যের সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রাঙ্গণে গেলাম! সেই মুহূর্তে শশীও মেঘমুক্ত হইল ; সেই ক্ষণিক চন্দ্রালোকে দেখি, একটি দ্বার খুলিয়া অনেকগুলি কাপড় লইয়া একটি স্ত্রীলোক বাহির হইল। আমি তাহার অনুগমন করিতে মনস্থ করিলাম ; কিন্তু আকাশ আবার মেঘাবৃত হওয়ায় আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সে বাড়ীর পথ–ঘাট আমার পরিচিত ছিল না বলিয়া ঘোর অন্ধকারে আমি তাহার অনুসরণ করিতে না পারিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম! হইতে পারে, জয়নবের কর্তব্য কঠোর — উদ্দেশ্য মহান্! আর আমি কেবল ভূতের বোঝা বহন করিলাম!

সহসা আলোক দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। একটা খড়ের ঘরের ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল। আমার ত মাথা ঘুরিয়া গেল। অতি কষ্টে বেড়া ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম ; যাহা দেখিলাম, তাহা মনে হইলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়! সে অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! দেখি কি, সেই কাপড়গুলি চতুর্দিকে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, আর বীরবালা জয়নব সেই অনলের মাঝখানে অটলভাবে দাঁড়াইয়া!!

সৌ। উঃ! ছুঁড়ীর কি সাহস! যদি আত্মহত্যাই উদ্দেশ্য ছিল, তবে বিষ খাইতে পারিত, গলায় দড়ী দিলেও হইত। কিন্তু পুড়িয়া মরা! — কি ভয়ানক মৃত্যু!

সিদ্দিকা কোন প্রকার বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক ধীর শান্তভাবে বলিলেন, — “কেন দিদি, পুড়িয়া মরণটা তোমার পসন্দ হইল না?”

সৌ। না, অত নিষ্ঠুর মৃত্যু উচিত নহে। জলে ডুবিলে হইত।

ল। আমি এখন বলি যে আমার বিবেচনায়, তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই করা উচিত ছিল।

সৌ। কেন উচিত ছিল, কারণ বল।

ল। তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন, অন্য কোন উপায়ে আত্মহত্যা করিলে দেহ নষ্ট হইত না। পুলিশ ও ডাক্তার তাঁহার শবদেহ পরীক্ষা করিবে — এ চিন্তা তাঁহার অসহ্য ছিল।

সৌ। ঠিক — ঠিক বলিয়াছ ! আমার মাথায় অত কথা আইসে নাই !

ল। আমি কিরূপে তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির করিলাম, বলিতে পারি না। যখন সংজ্ঞা লাভ করিলাম, তখন দেখি, তিনি ও আমি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া — তাঁহার হাতখানি আমি ধরিয়া আছি। জয়নব তীব্রস্বরে বলিলেন — " হাত ছাড়ুন — যাইতে দিন !" যেন আমি তাঁহার নিতান্তই আজ্ঞাবহ দাস !

আমি ব্যস্তভাবে বলিলাম, — "আমি আপনাকে ছাড়িতে পারি না, আপনি আমার — " কথাটা শেষ না হইতেই আবার হুকুম হইল — "ছাড়ুন !"

আমি পুনরায় বলিলাম, "ছাড়িব কি, — চলুন ; আপনার জন্য পাল্কী আনিয়াছি — আপনার ভাবীজান আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন — আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।" কিন্তু তিনি আর এক হেঁচ্‌কা টানে হাত ছাড়াইয়া দৌড়িলেন, আমিও পিছু পিছু ছুটিয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিলাম। পোড়া অঞ্চল (অঞ্চল দগ্ধ হইয়াছিল) আমার হাতে ছিঁড়িয়া আসিল ! তিনি দালানের ভিতর গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

আমি কতক্ষণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনন্তর অন্যান্য লোক আলোক দেখিয়া ঘরের আগুন নিবাইতে আসিল। যৎকালে তাহারা আগুন নিবাইতে ব্যস্ত ছিল, সেই সময়টা জয়নবের অনুকূলে ছিল। তিনি কি করিতেছিলেন, জানিতে পারিলাম না।

বাহিরে আসিয়া দেখি, আমার আনীত সে পাল্কীখানা অন্তর্হিত হইয়াছে। বেহারাদেরও দেখিতে পাইলাম না। আমি আর সে পাল্কীর সন্ধান না করিয়া আপন বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া স্নান করিলাম। তখন রাত্রি অনুমান ৪টা। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম — ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন আমি আপন মনে বনে-জঙ্গলে খুঁজিয়া নিবিড় বনে একটি কূপ দেখিতে পাইয়াছিলাম। বোধ হয়, ঐ কূপে ডুবিয়া জয়নব বিবি জীবনের জ্বালা জুড়াইয়াছেন।

আমার ব্যারিস্টারীর এইটি উল্লেখযোগ্য করুণ কাহিনী।

উ। (দুঃখিত-ভাবে) আজি পর্য্যন্তও জান না, জয়নব বিবি মরিয়াছেন কি না ?

ল। না। কিন্তু এখনও আমার মনে হয়, জয়নব সেই পাল্কীতে কোথাও গিয়াছিলেন — হয়ত তিনি বাঁচিয়া আছেন।

রা। কবি বলেন, 'প্রণয়ীর হৃদয় দর্পণস্বরূপ — প্রণয়িনীর অবস্থা জানিতে পারে !'

ল। বেগম সাহেবা যদি মিছরীর ছুরী সম্বরণ না করেন তবে আর আমার গল্প বলা হইবে না।

সৌ। না ভাই, তুমি বল। রাফিয়া-বু, তুমি মন দিয়া শুন। (লতীফের প্রতি) আর তাঁহার ভ্রাতৃবধূ ?

ল। তিনি এখন শান্তিতে আছেন। জয়নবকে দূর করাই রবিন্‌সনের উদ্দেশ্য ছিল। জয়নব হইতে অভিনয় শেষ হইয়াছে। এ প্রকার আত্মত্যাগ তোমাদের সেবাব্রত অপেক্ষা

কম প্রশংসনীয় নহে। খানম্ সাহেবা সিভিল-সার্জ্জনরূপে মানুষকে কাটিয়া কুটিয়া শাস্তিদান — অর্থাৎ আরোগ্যদান করেন — আর জয়নব আপনাকে ধ্বংস করিয়া চূড়াডাঙ্গাকে শাস্তিদান করিয়াছেন।

স। ঐ দেখুন, উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সিভিল-সার্জন যাহাকে কাটিয়া ক্ষত-বিক্ষত করেন, তাহার ক্ষত অঙ্গে আমি প্রলেপ দিয়া পটি বাঁধি — কাটাকাটি আমার কাজ নহে।

উ। রমণী শৈশব হইতেই আত্মত্যাগ শিক্ষা করে। কুমারী-জীবনে পিতা ও ভ্রাতার জন্য স্বার্থত্যাগ করে, বিবাহিত জীবনে স্বামীর জন্য এবং শেষে সন্তানের জন্য আত্মত্যাগ করে। কাহারও আত্মত্যাগ কেবল গৃহজীবনে সীমাবদ্ধ থাকে — কাহারও আত্মত্যাগ সংসারময় ব্যাপ্ত হয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

'জুবিলী' ও পুরস্কার বিতরণ

তারিণী-ভবনে ভারী ধূম পড়িয়াছে। এ বৎসর চারি পাঁচটি বিষয়ের অনুষ্ঠান এক সঙ্গে হইবে। প্রথম দিন বিদ্যালয়ের বিংশবর্ষীয় জুবিলী, দ্বিতীয় দিন 'নারী-ক্লেশ-নিবারণী সমিতি'র অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন, তৃতীয় দিন কর্মালয়ের মুসলমান ভগিনীগণ 'মিলাদ শরীফ' পাঠ ও শ্রবণ করিবেন, চতুর্থ দিন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পুরস্কার-বিতরণ, পঞ্চম দিন বিদ্যালয়-পরিত্যক্তা পুরাতন 'বালিকা'দের 'চিরহরিৎ সম্মিলনী'র অধিবেশন হইবে, এবং দুই দিন বিশ্রামের পর তারিণী-ভবনে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনী হইবে। এ প্রদর্শনী এক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রদর্শিত হইবে। ইহাতে বিদ্যালয়ের সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কর্মালয়ের সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকের স্বহস্ত-নির্মিত দ্রব্যসমূহ থাকিবে।

'চিরহরিৎ সম্মিলনী' কেবল তারিণী-বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রীদের সমিতি ; তাহাতে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রী ব্যতীত অপর কাহারও সম্বন্ধ নাই। তারিণী উহার নাম এইজন্য 'চিরহরিৎ' রাখিয়াছেন যে, কালে উহাতে মাতা-পুত্রী উভয় শ্রেণীর মহিলাগণ সমভাবে যোগদান করিবেন। সম্মিলনীর দিন 'মাতা-কন্যা' সম্বন্ধ ভুলিয়া, উভয়ে যে এই বিদ্যালয়ের 'ছাত্রী' এই সম্বন্ধ স্মরণ রাখিতে হইবে।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া ঝি-চাকর পর্যন্ত সকলের মুখেই একটা উৎসব আনন্দের প্রফুল্লতা। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর, প্রত্যেকেরই ইচ্ছা — তাহার ভাগের কাজ আগে সমাধা হউক। যেন 'বিয়েবাড়ীর কোলাহল' !

লতীফ পুরস্কারের খেলনা ইত্যাদি ক্রয় করিবার ও ঘর সাজাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পুরস্কার বিতরণ-কারিণী মহিলাও তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে। সেজন্য তিনি দেশের রাণী মহারাণী প্রভৃতির সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিতেছেন।

একবার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখা যাউক, কে কি করিতেছেন ঃ — মিস্ চারুবালা দত্ত একটা আলমারী খুলিয়া পরিচারিকাদের দ্বারা তাহার অভ্যন্তরস্থ জিনিস বাহির করাইতে ব্যস্ত আছেন।

ঝি। ক্যাতাবগুনো কোথায় রাখবো মা? একটু দেখিয়ে দাও।

চারু। এস আমার সঙ্গে।

জনৈকা শিক্ষয়িত্রী। — কই, মিস্ দত্ত কোথা? ঐ যে! মিস্ দত্ত, দেখুন ত এই মেয়ে দুইটিকে 'বনদেবী' সাজাইলে কেমন হয়?

চারু। বেশ হইবে। আর তিনটি মেয়ে সংগ্রহ করুন।

অপর একজন শিক্ষয়িত্রী। — শুনুন মিস্ দত্ত, এ মেয়েরা বলে কি! এরা 'প্রাইজে'র দিন আসিবে না; কে নাকি ইহাদের বলিয়াছে যে ইহারা 'প্রাইজ' পাইবে না!

চারু। সে কি! 'প্রাইজে'র দিন আসিবে বই কি!

মেয়েরা। না, আমাদের মা বারণ করিয়াছেন।

চারু। বেশ, আসিও না।

শিক্ষয়িত্রী। 'আসিও না' বলিলে চলিবে কেন, মিস্ দত্ত? ওরা যে 'চিহ্নে'র মেয়ে!

চারু। আপনি অন্য মেয়ে ধরুন।

ঊষা। অমিয়া! তোমরা বোর্ডার ছাত্রীদের লিখিত সে পদ্য আমাকে কখন দেখিতে দিবে?

অমিয়া। আজ্ঞে, কাল পাইবেন।

ঊষা। বেহারা, জা'ফরী খানম্‌কো সালাম দোও। (জা'ফরী খানম্ আসিলে, তাঁহার প্রতি) কেয়া খানম্ সাহেবা, আপ্‌কি মুসলমান লাড়কীয়োঁকা 'নজম্'* কাহাঁ তক্ হুয়া?

জা। কেয়া বাতাওঁ! কল্‌কাত্তেকি লাড়কিয়াঁ কেয়া উর্দু বোল্‌নে সক্‌তী হ্যায়? হর্ লফজ্** মেঁ বাংলা লহ্‌জা।*** ময়ঁ তো থক্ গেয়ী!

বিভা। ও ভাই মিস্ দত্ত! মুসলমান মেয়েদের বাঙ্গালা পদ্য বলা শুন আসিয়া! যেন কি বিপদে পড়িয়াছে!

চারু। আসি; এই আলমারীটা বন্ধ করি আগে।

ঊষা। চারু–দি'! তোমার কামরাটা কবে খালি করিয়া দিবে?

চারু। আর দুই দিন পরে।

ঊ। তুমি আজ চারি দিন হইতে আমাকে বলিতেছ — 'দুই দিন পরে!'

চা। কি করি দিদি! একদণ্ড নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া জিনিস পত্তরগুলো গুছাইতে পারি না — সমস্ত দিন — 'মিস দত্ত দেখুন', আর 'মিস দত্ত শুনুন'। — আমি দশভুজা দুর্গা হইলে বেশ হইত!

---

* 'নজম' — কবিতা।

** 'লফজ্' — শব্দ।

*** 'লহ্‌জা — উচ্চারণভঙ্গী

উ। আমি কিন্তু দশমুণ্ড রাবণ হইতে চাই — তাহা হইলে এক একটা মাথাকে এক একটা বিষয় চিন্তা করিবার ভার দিতাম!

তারিণীর 'আফিস'-কামরাও টাইপ-রাইটারের শব্দে মুখরিত। তারিণী নিরুপমা নাম্নী শিক্ষয়িত্রীকে বলিলেন, — "নিরু! তোমার জুবিলী-ইতিহাস লেখা কি শেষ হইল?"

নিরু। আজ্ঞে হয়েছে। একবার ভাল ক'রে প'ড়ে দেখে দিই।

তা। বড্ড দেরী করিয়া ফেলিলে, আজই ছাপাখানায় পাঠাইতে হইবে। ও রাফিয়া-বু! তোমার টাইপিং কত দূর?

রা। এখনও বহুদূরে।

(রাজমিস্ত্রী দ্বারদেশ হইতে)

"মাইজী! চূণা ঘট্‌ গিয়া।"

তা। আর কয় কামরা বাকী?

রাজমিস্ত্রী। আউর পাঁচ কামরা বাকী! চূণেকা রুপেয়া দিজিয়ে।

তা। সরকার বাবুসে মাঙ্গো।

(সরদার কোচম্যান দ্বারদেশ হইতে)

"হুজুর! সাত নম্বর গাড়ীকা চাক্কা বদ্‌লী হোগা।"

তা। বদ্‌লো যা'কে!

কোচ। পিত্তল পালিশ্ কা দাম দিজিয়ে।

তা। সরকার বাবুসে মাঙ্গো।

(উড়ে মালী দ্বারদেশ হইতে দন্তবিকাশ করিয়া)

"মাইজী, ম'তে আগে রঙের টঙ্কা দিউ না।"

তা। সরকার বাবুকে বল টঙ্কা দিতে।

মালী। সরকার বাবু টঙ্কা দিউছি না — মুই কিমতি ফুলের টব রঙ্গিবুঁ? এত্তেগুলা টব!

তা। আহ্ জ্বালালে! ডাক ত সরকার বাবুকে!

মালী। (সরকার বাবুকে আসিতে দেখিয়া)) সরকারবাবু আসুছন্তি।

তা। সরকারবাবু! আজ এদের সবাইকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছেন কেন?

সরকার। না মা! ওরা বড় দুষ্টু! আমি বল্লেম, সবুর কর, মা'র কাছ থেকে টাকা এনে দি। তা ওরা শুনলে না, উপরে চলে এল। পূর্বে যে টাকা দিয়েছেন, এই তার হিসাব নিন্। আমাকে এখন আর কিছু টাকা দিন।

তা। পদ্মরাগ, তুমি এ হিসাবের খাতাটা এখন রাখ, অন্য সময় দেখা যাইবে! আর সরকার বাবুকে ১০০্ টাকা আনিয়া দাও।

বেহারা কোন আগন্তুক ভদ্রলোকের কার্ড আনিয়া দিল।

তা। (কার্ড পড়িয়া) মিঃ আল্‌মাস্ — আচ্ছা সাহেবকো সালাম দোও!

লতীফ অনেকগুলি খেলনা ইত্যাদি লইয়া আসিয়াছেন। ঊষা অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে সেগুলি যথাস্থানে রাখিয়া বলিলেন, "ভাই! আরও গোটা চল্লিশ পুতুল কিনিতে হইবে।"

বিভা। হাঁ, ছোট মেয়েই ত বেশী।

কোরেশা। বাঁশী, ঝুনঝুনিও আনিবেন!

ল। বেশ। একটা ফর্দ লিখিয়া দিন।

তা। মিঃ আল্‌মাস্, আপনি আবার এখনই চলিলেন? একটু বসুন, বিশ্রাম করুন।

সৌদামিনী পরিচারিকাকে লতীফের জন্য চা আনিতে ইঙ্গিত করিলেন।

তা। সৌদামিনী-দি' তোমাদের সব ঠিক হইল ত?

সৌ। আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিও না! অনেকগুলি সেলাই এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

তা। ঊষা-দি', তুমি আমায় শেষে লজ্জা দিবে নাকি? তোমাদের মেয়েদের কি কত দূর? শুনিতেছি, মুসলমান মেয়েরা নাকি ঠিক-মত বাঙ্গালা উচ্চারণ করিতে পারে না?

ঊ। তাহারা উর্দ্দূও ত পারে না! যাহা হউক, চিন্তা করিও না — সময়ে সব ঠিক হইয়া যাইবে। তোমাদের পুরস্কার-বিতরণকারিণীও ত এখনও ঠিক হয় নাই।

তা। (চা-পানরত লতীফের দিকে মিষ্টান্নের থালা অগ্রসর করিয়া দিয়া) হাঁ, মিঃ আল্‌মাস্ আপনার সে মহারাণীর কি সংবাদ?

ল। সকালে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, দেখা হয় নাই। আবার পরশ্বঃ যাইব। মহারাণীরা বড় ভোগান, কোন লাট-মহিষীর চেষ্টা করিব?

তা। আমরা দীনা কাঙ্গালিনী — লাট-মহিষী চাহি না। অন্য কোন রাজকর্ম্মচারীর পত্নী হইলে চলিবে। যথা লেডী চ্যাটার্জ্জি বা তদ্রূপ কেহ —

ল। লেডী চ্যাটার্জ্জি এখন দিল্লীতে।

ঊ। ভাই বিভা, যাও ত এই মোড়ের কনেস্টবলকে বল, তাহার স্ত্রী আসিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে পুরস্কার দিয়া যাউক।

বি। কিন্তু তাহার বেতন যে মোটে ৮ আট টাকা! সেও রাজ-কর্ম্মচারী বটে, তবে বেতন অল্প।

ঊ। ক্ষতি কি? এই আট টাকার কনেস্টবল কালে আটশত টাকা বেতে

নর রায় বাহাদুর ইন্‌স্‌পেক্‌টর হইতে পারে! আমরা অগ্রিম সম্মান দিয়া রাখিতে চাই!

সৌ। রায়-বাহাদুর হউকই আগে! —

তা। ওহো! তখন আমাদের বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণ করিতে আসিলে তাঁহার সম্মানের ব্যাঘাত হইবে যে! আর তাঁহার স্বাস্থ্যও তখন ক্ষণভঙ্গুর হইবে।

বি। চল ভাই পদ্মরাগ, মেয়েদের গান শুনিবে।

সি। আমি যে গানের 'গ' বুঝি না।

বি। তবে আমি একা কি করিয়া উহাদের গান ঠিক করিব?

কো। ও আর ঠিক হইবে না, উহার ভিতর 'ইন্দুর' প্রবেশ করিয়াছে!

সি। এ কি কোরেশা-বি! উহা পারমার্থিক গান — উহা লইয়া বিদ্রূপ করা উচিত নহে।

কো। এই না তুমি বলিলে — তুমি গানের 'গ' বুঝ না?

সি। গানের তান-লয় বুঝি না বটে, শব্দ ত বুঝি। 'তার মাঝে ইন্দু'কে আপনি 'ইন্দুর' বলেন!

বি। এস ঊষা-দি'! আর সময় নাই। যদি রাহিলা নিতান্তই স্বর মিলাইতে না পারে, তবে উহাকে ছাড়িয়া দিব।

ঊ। চল — আমার ভাগের কাজে কিন্তু কেহই সাহায্য কর না। ইংরাজী কবিতা লইয়া একাই বকিয়া মরি!

কো। না, ঊষা-দি'! তুমি আগে আমার ড্রিলএর অভ্যাস (rehearsal) দেখ। মিসিস্ সেন আমাকে যতসব কচি কচি মেয়ে দিয়াছেন, তাহারা না পারে ঠিকমত পা ফেলিতে, না পারে হাত তুলিতে গান রাত্রে শুনিলেও চলিবে।

বি। কক্ষণও না! — গান বেশী মুস্কিল, কারণ তাহা হাত ধরিয়া দেখান যায় না!

তা। বিভা, তুমি ব্যস্ত হও কেন? ঊষা-দি' ড্রিল্ ঠিক করুন। তোমার গানের অভ্যাস এইখানে মিঃ আলমাস্-এর সমক্ষে করাও; তিনি একজন ওস্তাদ।

বি। মুসলমান মেয়েরা ত উঁহার সম্মুখে আসিবে না।

ল। হাঁ, মেয়েদের এখানে আনিবার প্রয়োজন নাই। (সিদ্দিকার প্রতি)!

সিদ্দিকা। তুমি স্বয়ং গাহিয়া উহাদের গান কয়টা ঠিক করিয়া দাও।

সি। বেশ বলিয়াছেন, আমি কিন্তু গানের 'গ'ও জানি না।

ল। কারসিয়ঙ্গে থাকাকালীন আমি স্বকর্ণে তোমার হারমোনিয়ম বাদ্য শুনিয়াছি।

সি। (সলজ্জভাবে) একটু সুর তাল জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু গলা ভাল নয় বলিয়া গাহিতে পারি না।

ল। (রাফিয়ার প্রতি) আপনি একটা গান করুন।

রা। আমি চেঁচাইতে পারি বটে, কিন্তু আমার সুর তাল জ্ঞান নাই।

ল। বেশ। — আপনার কণ্ঠস্বর এবং সিদ্দিকার সুর-তাল — এই দুই একত্রে করিয়া আপনারা উভয়ে মিলিয়া গাহিবেন। দোহাই আপনার, আর কোন আপত্তি শুনিব না। মিস্ চক্রবর্তী! আপনি এই দুইজনকে ধরুন ত, আপনার গান ঠিক হইয়া যাইবে।

এ বৎসর বিদ্যালয়ের পুরস্কার ভাণ্ডারে লতীফ স্বয়ং ১০০০্ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং চাঁদা তুলিয়া আরও দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। 'নারীক্লেশ-নিবারণী সমিতি'তেও তিনি ৫০০্ টাকা দান করিয়াছেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মরীচিকা

যথাকালে তারিণী–বিদ্যালয়ের জুবিলী ও শিল্প–প্রদর্শনী ইত্যাদি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু লতীফের মাতা, ভগ্নী ও মাসীমা এখনও কলিকাতায় আছেন। মাতা অনেকটা হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছেন। তিনি প্রায়ই তারিণী–ভবনে বেড়াইতে যান। তাঁহার অমায়িক স্নেহে তারিণী–ভবনের সকলেই তাঁহার ভক্ত হইয়াছে। বোধ হয় তিনি যেন তারিণী–ভবনে কোন হারান বস্তুর অনুসন্ধান করিতে আইসেন অথবা মরীচিকা লক্ষ্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার বিশেষ মনোযোগ সিদ্দিকার প্রতি ; পক্ষান্তরে সিদ্দিকা যথাসম্ভব তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতেন। এক দিন তিনি সিদ্দিকার হাত ধরিয়া বলিলেন, " একি মা ! তুমি হাঁতে দু'গাছি চুড়ি পর্যন্ত রাখ না, বড় বিশ্রী দেখায়।"

তারিণী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি উত্তর দিলেন, "সুশ্রী দেখান ত বাঞ্ছনীয় নহে। এখানে কয়েক জন হিন্দু মহিলা আছেন, তাঁহারা কুসংস্কারবশতঃ শাঁখা ছাড়িতে পারেন নাই। সুখের বিষয়, আপনাদের মুসলমান সমাজে কোন কুসংস্কার নাই।"

লতীফের মাতা। — তুমি বেশ মুসলমান–ভক্ত মেয়ে। তোমার মত যদি আর ২০/২৫ জন মেয়ে থাকিতেন তবে বাঙ্গালার সৌভাগ্য হইত।

লতীফের মাতা প্রায় প্রতিদিন তারিণী–ভবনের 'ভগিনী' ও শিক্ষয়িত্রীদের ছয়জন করিয়া এক এক দলকে মধ্যাহ্ন কিংবা নৈশ–ভোজনে নিমন্ত্রণ করিতেছেন — তারিণী হইতে আরম্ভ করিয়া কোরেশা, বিভা, জা'ফরী প্রভৃতি সকলের নিমন্ত্রণ হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল শেষ ছয় জন — রাফিয়া, সকিনা, সিদ্দিকা, সৌদামিনী, ঊষা ও নলিনী — বাকী আছেন।

অদ্য রফীকা তাঁহাদিগকে মধ্যাহ্ন–ভোজনের নিমিত্ত লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। সকলেই সানন্দচিত্তে যাইতে সম্মতা হইয়াছেন ; কেবল সিদ্দিকা যুক্তকরে অব্যাহতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রফীকা অনুনয় বিনয় আরম্ভ করায় সিদ্দিকা বলিলেন — "আপনি একবার অশ্রু–বিসর্জনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কি বারম্বার সেরূপ আশা করেন?'

রফীকা। আমি আপনার কথা বুঝিলাম না। 'অশ্রু–বিসর্জনে সিদ্ধিলাভ' কেমন? আপনার কোন কোন কথা আমার নিকট হেঁয়ালীবৎ বোধ হয়। সেদিন মুঙ্গেরে বলিয়াছিলেন — "আপনারাই ত আমার যাইবার পথ রাখেন নাই।" সে কথারই বা কি অর্থ?

রাফিয়া। (সহাস্যে) পদ্মরাগ–প্রহেলিকা, —

"পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু' চারি দিবসে,

মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে !"

র। ভাবীজান, পায়ে পড়ি, — আপনি একটু বুঝাইয়া দিন !

রা। আমি নিজেই বুঝি না।

অতঃপর সিদ্দিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং বিভাগে রন্ধন ও বাজারের তদন্ত করিতে গেলেন। মেট্রনের অসুখ, তাই সিদ্দিকা তাঁহার ভাগের কাজ করিতে আসিয়াছেন। রফীকাও সঙ্গে আসিলেন।

তারিণী–ভবনে যেমন নানা জাতি, নানা ধর্ম এবং নানা শ্রেণীর লোক আছে, সেইরূপ নানা দেশেরও পরিচারিকা — ভুটিয়া, নেপালী, বেহারী, সাওঁতাল, কোল, মান্দ্রাজী ইত্যাদি আছে। একজন গাঞ্জামী আয়া বাজার সওদা বাহির হইতে আনিয়া দিতেছিল, আর সিদ্দিকা ফর্দ দেখিয়া সে সব বুঝিয়া লইতেছিলেন। কি একটা জিনিস কম হওয়ায় তিনি আয়াকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ; সে সহজে না বুঝায়, তিনি স্বর কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া বলিলেন — "বাঙ্গালী দুম্বল কই?" সে তৎক্ষণাৎ বলিল — "এই এখন আনিতে যাই!"

র। (উচ্চহাস্যে) 'বাঙ্গালী দুম্বল'! এ আবার কি?

সি। আলু। উহারা আলুকে 'বাঙ্গালী দুম্বল' বলে। আপনি পানির কোন শ্রুতিকটু নাম জানেন কি?

র। মনে হয় না ত। 'জল', 'সলিল' 'মা–আ', 'আব', 'বারি', — ও সব নামেই ত বেশ কোমল তরল ভাব আছে ; কেবল ইংরাজী 'ওয়াটার' একটু কট্‌মটে শুনায়।

সি। ইহা অপেক্ষা আর কোন শ্রুতিকঠোর নাম বলিতে পারিলেন না?

র। না। আপনি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন — আপনি বলুন।

সি। মাইচ্‌রেড়ো!

র। ও বাবা!

এমন সময় সৌদামিনী প্রভৃতি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া তথায় আসিলেন। রফীকা আর একবার সিদ্দিকাকে অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য হওয়ায় অপর সকলকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

০ ০ ০ ০

আহারান্তে সকলে গল্প করিতেছিলেন। সৌদামিনী লতীফের মাতাকে বলিলেন — " না, না! আমরা সিদ্দিকার প্রকৃত পরিচয় জানি না!"

ল–মা। রাফু মা! তুমি জান?

রা। না, খালা আম্মা, সিদ্দিকা আমাকে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

ল–মা। বাপু! এক সঙ্গে তিন বৎসর আছ, অথচ পরিচয় জান না!

উ। আমরা একসঙ্গে আছি বটে, কিন্তু আপন আপন কাজে ব্যস্ত থাকি — কে কাহাকে জিজ্ঞাসা করে — "তুমি কোন্ গগনের তারা, কিম্বা কোন্ বাগানের ফুল?"

ল–মা। আমি ১২/১৩ বৎসর পূর্বে একটি নবমবর্ষীয়া বালিকাকে দেখিয়াছিলাম, তাহার সহিত সিদ্দিকার অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাই।

স। মানুষের মত কি মানুষ হয় না?

র। একেবারে অবিকল নাক চোখ এক প্রকার হইবে কি?

স। তাহা ঠিক বলা যায় না। আমাদের বিদ্যালয়ে কয়েক জোড়া বালিকা আছে — তাহারা দুই দুইটি দেখিতে একই প্রকার ; ফজীলা ও মাহমুদার — কে কোন্‌টি তাহা আমি সহজে চিনিতে পারি না।

ল–মা। বেশ বাপু ! তোমরা কেহ সিদ্দিকার পরিচয় না জান, তাই সই। কিন্তু তাহাকে আমার পুত্রবধূ করিয়া দাও।

সৌ। সে বিষয়ে আমাদের হাত কি ?

ল–মা। মিসিস্ সেনকে বলিয়া এই বিবাহ ঘটাইয়া দাও।

উ। সিদ্দিকা আপনাদের জাতের মেয়ে, তাঁহার বিবাহ মিসিস্ সেন কি করিয়া দিবেন ?

ল–মা। তিনি যে সকলের অভিভাবিকাস্বরূপা।

ন। তাই বলিয়া তিনি কাহারও বিবাহ দিতে পারেন না।

র। তিনি কাহারও বিবাহে বাধাও ত দিতে পারেন না।

ন। অবশ্যই না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনারা তাঁহাকে কি করিতে বলেন ?

র। কন্যা-কর্ত্রী সাজিয়া বিবাহ দিতে বলি।

রা। আয় রফীকা, আমি আজই তোর বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি।

র। আমার বিয়ে আর আপনাকে দিতে হয় না !

রা। তবে সিদ্দিকার বিবাহ দিতে পারে, কাহার সাধ্য ? সিদ্দিকা স্বয়ংসম্মতা না হইলে কেহ তাহার বিবাহ দিতে পারে না।

স। ভাল কথা, খালা আম্মা ! আপনি কি আর পাত্রী পান না ? অমন সচ্চরিত্র, ধনে মানে শ্রেষ্ঠ সুপুরুষকে কে না কন্যাদান করিবে ?

উ। তাই ত ; এ অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়ে লইয়া আপনারা কি করিবেন ? ধনে মানে আপনাদের সমকক্ষ পরিবারে চেষ্টা দেখুন।

ল–মা। লতীফ যে আর কোথাও বিবাহ করিতে চাহে না।

স। বেশ ত। এ পোড়া ভারতবর্ষে অনেক বিধবা আছে, দুই চারিটি বিপত্নীকও থাকুন।

রা। তাই ত, বিবাহের জন্য আবার তাঁহাকে পীড়াপীড়ি কেন ? জোর করিয়া বিবাহ দেওয়ার সাধ কি আপনাদের মিটে নাই ?

র। ওঃ ! এতক্ষণে আমি সিদ্দিকা বিবির হেঁয়ালী বুঝিলাম ! ভাইজানকে বিবাহে সম্মত করাইবার জন্য আমি যে কাঁদিয়াছিলাম, তিনি আমাকে সে কথার খোঁটা দিয়াছেন !

ল–মা। এবার আমি পীড়াপীড়ি করিতেছি না। সে নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করুক — আমি তাহাকে সংসারী দেখিয়া নিশ্চিন্ত হই।

ন। তবে আপনি পাত্রী খোঁজেন কেন ?

ল–মা। আমি তাহাকে পাত্রীর সন্ধান দিয়া বলিব, "দেখ বাপু, এখানে এক ঘর, সেখানে এক ঘর, — যে ঘরে তোমার ইচ্ছা বিবাহ কর।"

রা। কিন্তু আপনার মনোনীত ঘরগুলির তালিকায় সিদ্দিকার নাম কেন? তাঁহার না আছে জমিদারী বিষয় সম্পদ, না আছে নগদ টাকা ও অলঙ্কার। তিনি কর্মালয়ে প্রতি মাসে ২০৲ টাকা বেতন প্রাপ্ত হন ; তাহা হইতে অতি সামান্য ৩০/৪০৲ টাকা খাওয়া–পরায় ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট টাকা তিনি আবার তারিণী–ভবনের অর্থভাণ্ডারে চাঁদা দেন। এ হেন দীনা কাঙ্গালিনী তপস্বিনী আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল কিসে?

ল–মা। আমরা টাকার প্রার্থী নহি।

রা। আপনার বাবার এরূপ বৈরাগ্য কবে হইতে হইয়াছে?

ল–মা। চুয়াডাঙ্গার সে কন্যার বিবাহের সময় হাজীসাহেব সম্পত্তির কথা তুলিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের কোন হাত ছিল না। সে কথার খোঁটা আমাকে দাও কেন?

সৌ। মা, অনুমতি দিন, আমরা এখন আসি।

র। সিদ্দিকা–লাভের কোনও উপায় বলিয়া দিয়া যান।

স। আব্দার মন্দ নহে! — আমরা কি সিদ্দিকাকে ধরিয়া দিব? তাঁহার কোন অভিভাবক থাকিলে হয়ত তিনি সিদ্দিকাকে বাঁধিয়া তোমাদের হাতে সমর্পণ করিতেন।

সৌ। সিদ্দিকা হয়ত একজনকে মন–প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তবে?

র। তাহা হইলে আমরা তাঁহার মন ফিরাইতে চেষ্টা করিব।

স। ঈশ্‌! আস্পর্দ্ধ দেখ! তুমি সিদ্দিকার পিছনে লাগিয়াছ কেন? সে বেচারী কোন অজ্ঞাত কারণে সর্বত্যাগিনী হইয়া তারিণী–ভবনে একটু জুড়াইতে আসিয়াছেন।

র। জুড়াইতে থাকিলে ত আপত্তি ছিল না — এখন যে পোড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন!

রা। যে দাহ্য, সে দগ্ধ হইবে, সেজন্য দুঃখ কি? পতঙ্গ চিরকাল পুড়িবে।

র। আর আমরা কি সিদ্দিকা বিবির ধরা পাইব না?

সৌ। বোধ হয়, না। বৃথা মরীচিকার অনুসরণে ফল কি?

ল–মা। মা! তুমি কিরূপে জানিলে সে মরীচিকা? সে কি স্পষ্ট বলিয়াছে যে বিবাহ করিবে না?

র। বিশেষতঃ আমার ভাইকে বিবাহ করিবেন না, এই কথা বলিয়াছেন কি?

উ। ইচ্ছা হয়, অনুসরণ করিয়া দেখুন।

লতীফ পার্শ্ববর্তী কক্ষে থাকিয়া ইঁহাদের সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "সত্যই এ মরীচিকা! খোদাতালা আমাকে সবই দিয়াছেন — দিলেন না কেবল 'সুখ'! আমার ভাগ্যে 'সুখ' মরীচিকা হইয়া গেল!!"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ
বিদ্যালয়ে দরবার

তারিণী 'আফিস'-কামরায় অনেকগুলি খাতাপত্র লইয়া ব্যস্ত আছেন। সিদ্দিকা তাঁহার 'পার্শনাল্ এসিস্টান্ট', সুতরাং তিনিও উপস্থিত আছেন। রাফিয়া এবং সিদ্দিকা তারিণীর দক্ষিণহস্তস্বরূপা। কিঞ্চিৎ দূরে আর একটি টেবিলে রাফিয়া, সকিনা, সৌদামিনী ও ঊষা স্ব-স্ব কার্যে ব্যাপৃতা আছেন। এমন সময় সরকার বাবু আসিয়া বলিলেন —

"দোহাই মা ! আমি আর এখানে কাজ করিব না।"

তারিণী। কেন, সরকার বাবু ?

সর। মার খাইয়া যে চাকুরী করিতে পারিবে, সেই এখানে থাকিবে। বাহিরে এত হট্টগোল হইয়া গেল, আপনারা তাহা শুনিতে পান নাই কি ?

তা। বলুন শুনি, ব্যাপারখানা কি ? কে আপনাকে মারিতে আসিয়াছে ?

সর। আপনার কয়েকজন ছাত্রীর অভিভাবকেরা দল বাঁধিয়া আজ আমাকে মারিতে আসিয়াছিলেন। শৈলবালার খুড়া বলিলেন — "শৈল পুরস্কার পায় নাই কেন ?" আমি বলিলাম — 'হয় ত পাশ হয় নাই, তাই।' তিনি তখন চীৎকার স্বরে গালি দিয়া বলিলেন, "পাজি ব্যাটা। নচ্ছার ব্যাটা ! তুই বসে বসে কি করিস্ ? মেয়েগুলোকে পাশও করাতে পারিস্ না ?" আমি তাঁহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, মেয়ে পাশ হওয়া — না হওয়ায় আমার কোন হাত নাই। তদুত্তরে তাঁহারা আমায় মারিতে আসিলেন। আমার নাক লক্ষ্য করিয়া হরিমতির পিতা যে ঘুষি তুলিয়াছিলেন —

বেহারা। আমি মাঝে এসে না পড়লে সরকার মশায়ে'র নাক ভেঙ্গে দিত আর কি !

তা। আমার এখানকার কাজ ছাড়িলেই কি আর ওরূপ ঘটনা হইবে না, মনে করেন ? আপনি ব্যাটা ছেলে, আপনাকে ত ঘুষির বদলে লাথি দিয়াই জীবন-সংগ্রাম করিতে হইবে।

ঊ। বলিহারী যাই বাঙ্গালী বাচ্চা ! নাক লক্ষ্য করিয়া ঘুষি তুলিয়াছিল বলিয়া চাকুরি ছাড়িতে হইবে ! !

সর। অনুযোগ করেন কেন মা ? কেবল ইহাই কি একমাত্র ঘটনা ? সুশীলার পিতা বলিলেন — "তোর কি বাবার গাড়ী ? — আমার মেয়েদের জন্য গাড়ী পাঠাস্ না কেন ? আমার বাছারা প্রাইজের সময় স্কুলে যেতে পেলে না !"

তা। ঊষা-দি'। প্রাইজের দিন কি সুশীলারা তিন ভগ্নী উপস্থিত ছিল না ?

ঊ। (হাজিরা-বহি দেখিয়া) না, সেদিন উহারা ছিল না। প্রায় একমাস হইতে উহারা আইসে না।

তা। সুশীলাদের জন্য গাড়ী কেন পাঠান না, সরকারবাবু ?

সর। উহারা যখন ভর্ত্তি হইয়াছিল, তখন আপনি অতদূর গলির ভিতর 'বাস' পাঠাইতে অস্বীকৃতা হওয়ায় মেয়েরা গোরাচাঁদ রোডে জহুর চামড়াওয়ালার বাড়ী আসিয়া অপেক্ষা করিত ; প্রতিদিন তাহারা সেইখান হইতে গাড়ীতে উঠিত এবং বিকালে তাহাদের ঐখানেই নামাইয়া দেওয়া হইত। এখন সুশীলার বাবা নিজের বাসার দ্বারে গাড়ী লইয়া যাইতে বলেন। তাহা ত আপনি বারণ করিয়াছেন, কাজেই গাড়ী যায় না।

তা। (ছাত্রীদের ঠিকানার খাতা দেখিতে দেখিতে) আমি ত রাসেখাদের বাড়ীও 'বাস' পাঠাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু রাসেখা ও জমীলা ত আসিতেছে ; ইহার কারণ কি ?

সর। রাসেখার পিতা কোচম্যান ও সইসকে বখ্‌শিশ দিতে অস্বীকার করায় তাহারা দুষ্টামী করিয়া আপনাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল যে, সে বাড়ীর হাতার ভিতর গাড়ী যাইবার পথ নাই। পরে আমি আপনার আদেশে তাহাদের বাড়ী দেখিয়া আসিয়া বলিলাম, "বেশ পথ আছে।" সেইদিন হইতে গাড়ী যায়।

তা। সরকারবাবু, আপনি এখন যাইতে পারেন। আমাদের অনেক কাজ আছে — এক রাশি চিঠি পড়িতে ও তাহাদের উত্তর লিখিতে হইবে।

ঊষা সরকারবাবুর হস্তে এক দীর্ঘ তালিকা দিয়া বলিলেন, — "এই মেয়েদের বাড়ী দেখিয়া পথ সম্বন্ধে তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট করিবেন।"

তা। ও জানকি, ও নীহার, তোমাদের টাইপিং একটু স্থগিত রাখ। পদ্মরাগ, তুমি এখন চিঠি পড়া আরম্ভ কর।

সি। এই শুনুন ১ নম্বর চিঠি ঃ — "সবিনয় নিবেদন মাননীয়াসু —" *

তা। রক্ষা কর পদ্মরাগ ! পাঠগুলা ছাড় — কেবল পত্রাংশ এবং লেখকের নাম ধাম পাঠ কর।

সি। (কষ্টে হাস্য সম্বরণ করতঃ) "আমার মেয়ে ঊর্মিলা এবার প্রাইজ পাইল না কেন? আপনাদের ত বাঁধিগৎ — উত্তর আসিবে, 'পাশে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় হয় নাই।' কিন্তু 'প্রথম' না হওয়া কাহার দোষ? আপনারা বৎসর ভরিয়া টাকা লইতে জানেন, আর কিছু কর্তব্য আছে কি না, তা জানেন না। আপনি মেয়েমানুষ, তাই কিছু বলিলাম না।"

২নং চিঠি ঃ — "আমার মেয়ে জুলেখা পাঁচ বৎসর হইতে আপনার স্কুলে পড়ে ; প্রতি বৎসর সে পরীক্ষায় প্রথম হইত। এবার তাহার অসুখের জন্য ৮/৯ মাস কামাই করিয়াছে বলিয়া তাহাকে একটা প্রাইজ দিলেন না। এ কেমন আপনাদের বিবেচনা? মেয়েলী বুদ্ধি লইয়া আর কত ভালরূপে কাজ করিবেন? স্কুলের কর্ম-নির্বাহক সভায় যদি কোন পুরুষ থাকিত তবে দেখিতেন, স্কুল পরিচালনা কিরূপে হয়।"

৩নং চিঠি ঃ — "আমার মেয়ে নিরুপমার নাম কাটিয়া দিবেন। সে প্রাইজের দিন গোল করিয়াছিল বলিয়া আপনাদের বিভা নাম্নী গুরুমা তাহার প্রতি চক্ষু রাঙাইয়াছিল। হাতের কাছে পাইলে আমি বিভার চক্ষু উৎপাটন করিতাম।"

* অনেকগুলি পত্র নানা ছন্দের ইংরাজী ভাষায় লিখিত ছিল, তাহাদের অনুবাদ দেওয়া গেল।

ঊ। কে আছে, বিভা-দি'কে একবার ডাক ত!

তা। এখন না, আরও চিঠি শুনি আগে।

৪নং চিঠি ঃ — "স্কুল করিতে জানেন না ত রাখিয়াছেন কেন? — কেবল নাম কিনিবার জন্য? আমার মেয়ে প্রভাতী তিন মাস হইতে পড়িতেছে ; না হ'ল সে পাশ, না পেলে সে একটা পুতুল ছাড়া আর কিছু।"

৫নং চিঠি ঃ— "আমার মেয়ে আব্বাসী তিন মাস হইতে স্কুলে পড়িতেছে, এখনও হিজ্জে করিতে পারে না।"

৬নং চিঠি ঃ — "আমার মেয়ে আতিফা বেগম এখনও রাত্রে বিছানা ভিজায়, তাহাকে একটু শাসন করিতে পারেন না? তবে আপনারা স্কুলে কি শিক্ষা দেন?"

৭নং চিঠি ঃ— "আক্ষেপ যে, আপনার বিদ্যালয়ে গবর্নমেন্টের হাত নাই ; নচেৎ মজা দেখাইতাম। আমার মেয়ে মনোরমা দুই মাস হইতে স্কুলে যায়, এখনও পর্যন্ত তাহার 'আকার' 'ইকার' শিক্ষা হয় নাই।"

৮নং চিঠি ঃ— "আমার মেয়ে প্রজ্ঞাসুন্দরী কাহারও কথা শুনে না, মাতাকে গালি দেয়। পড়া-লেখাও তথৈবচ। দেখি — এডুকেশন মিনিস্টারকে বলিয়া কোন প্রকারে আপনার স্কুলের অনিষ্ট করিতে পারি কি না। এমন নামের স্কুল থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।"

৯নং চিঠি ঃ— "আমার মেয়ে সরমাসুন্দরী আপনাদের মেট্রিক ক্লাসের ছাত্রী ; সে প্রাইজের দিন অপর মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি করিতেছিল, এই অপরাধে আপনাদের জনৈক জুনিয়র শিক্ষয়িত্রী সারদা তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছে। সারদা আপনার নিকট রিপোর্ট করিতে পারিত ; তাহা না করিয়া নিজের হাতে আইন লইল কেন? যাহা হউক, সরমাকে এরূপ গুরুতর আক্রমণ (Criminal assault) করার জন্য আমি সারদার বিরুদ্ধে ফৌজদারী 'কেস' করিতে ও আপনাকে সাক্ষী মানিতে বাধ্য হইলাম।

"পুনশ্চ — আপনি সারদাকে যথাবিধি শাস্তি দিয়া আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে অব্যাহতি পাইতে পারেন।"

১০নং চিঠি ঃ — "আমার দুধের বাছা লীলা একটা পুতুল ছাড়া আর কিছু পায় নাই। সে কাঁদিয়া খুন হইল। আপনার স্কুল গবর্নমেন্টের অধীন নহে, নচেৎ দেখাইয়া দিতাম কেমন স্কুল! আমার পিসে মহাশয়ের খুড়তাতো ভাগিনেয়ের শ্বশুরের আপন মেসো স্বয়ং এডুকেশন মিনিস্টারের শালা!"

উক্ত প্রকারের আরও অনেক পত্র পঠিত হইল। পরে কোরেশা, জা'ফরী ও বিভাকে ডাকিয়া ঊষা ছাত্রীবৃন্দের অভিভাবকদের অভিযোগপত্র দেখাইলেন। বিভা ও কোরেশা "আসি" বলিয়া আবার বিদ্যালয়ে চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কোরেশা একদল মুসলমান বালিকা লইয়া এবং বিভা ও সারদা একদল নানা-ধর্মাবলম্বিনী ছোট বড় বালিকা লইয়া আসিলেন।

কোরেশা। (১) আব্বাসী গত নভেম্বর মাসে স্কুলে আসিয়াছে। সে সময় আমরা বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য পুরাতন পাঠের পুনরাবৃত্তি করাইতেছিলাম, কাহাকেও নূতন পড়া দেওয়া হইত না। ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধ পরীক্ষায় এবং শেষার্ধ প্রাইজের জন্য প্রস্তুত হওয়ায় ব্যয়িত হইয়াছে। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ প্রাইজ ও জুবিলীর হেঙ্গামে অতিবাহিত হইয়াছে। অদ্য জানুয়ারীর ২১শে তারিখ — আব্বাসী এই দুই সপ্তাহে কি পরিমাণ লেখাপড়া শিখিয়াছে, পরীক্ষা করিয়া দেখুন। !

তা। রাফিয়া–বু, আপনি উহার 'বোগ্দাদী কায়দা' পাঠের 'হিজ্জে' 'মতন' ইত্যাদি পরীক্ষা করুন।

রাফিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "পাঁচ বৎসরের মেয়ে, দুই সপ্তাহে যাহা শিখিয়াছে, তাহা আশাতীত।"

কো। (২) আতিফা ১২ বৎসরের মেয়ে — বাড়ীতে রাত্রে বিছানা ভিজায়, সেজন্য স্কুল দায়ী ! (৩) জুলেখা এ বৎসর ৯ মাস অনুপস্থিত ছিল, তবু পাশ হওয়া এবং প্রাইজ পাওয়া চাই ! তার পর দেখুন, (৪) মরিয়ম্ ডাকাতের মত দুর্দান্ত মেয়ে, অষ্টপ্রহর তাহার কোঁদল, নিবৃত্ত করিতে হয়, পড়া করিবে কখন? (৫) আলিয়া আধ–পাগলী মেয়ে, স্কুলে আসিতে 'বাস'এর জানালা ভাঙ্গিত, অপর মেয়েদের মারিত, খামচাইত, কামড়াইত, — বহু কষ্টে তাহাকে ৮ মাসের পরিশ্রমে সোজা করিয়া পথে আনিয়াছিলাম ; ইদানীং অঙ্ক ইত্যাদি বেশ শিখিয়াছিল ; সেই সময় তাহাকে ছাড়াইয়া দেশে লইয়া গেলেন। দুই বৎসর ঘরে রাখিয়া পূর্ণমাত্রায় পাগলী সাজাইয়া আবার স্কুলে দিয়াছেন। আজি পত্র দিয়াছেন যে, তিন বৎসর হইতে তাঁহার মেয়ে স্কুলে আছে, কিন্তু কিছুই শিখে নাই ! (৬) আমিনা পাঞ্জাবী মেয়ে, তাহার ভাষা কেহ বুঝিত না, সেও আমাদের কথা বুঝিত না। বহু কষ্টে দুই মাসে সে যখন আমাদের ভাষা বুঝিতে আরম্ভ করিয়া কিছু কিছু পড়িতে লাগিল, তখন "পড়া ত কিছু হয় না" অজু হাতে তাহাকে ছাড়াইয়া লইলেন। (৭) জাহেদা কচদেশীয় মেয়ে — তাহার সম্বন্ধেও ভাষা না বুঝিবার বিড়ম্বনা ছিল। তিন মাস পরে যখন তাহাকে অনেকটা সুপথে আনিলাম, তখন "পড়া হয় না" বলিয়া ছাড়াইয়া অন্য স্কুলে দিলেন।

সারদা। কোরেশা–বি, আপনার কৈফিয়ৎ এখন রাখুন। আমার নিবেদন একটু শুনুন ঃ — (১) এই যে নিরুপমা তৃতীয় — এ মিডল্ ক্লাসের ছাত্রী — কলহ–বিদ্যায় চূড়ামণি ; ইহার মাথায় দেখুন, কত উকুন, পায়ে ঘা, কাপড় মলিন, — কিছুতেই এসব শোধরাইতে পারিতেছি না। ইহার মাতাকে চিঠি দিলে, তিনি ঝির প্রতি দাঁত–মুখ খিচাইয়া বলেন, "গুরু–মা'রা আছে কি কর্ত্তে?" (২) এখনও দেখুন, উর্মিলার গায়ে অনুমান ১০২ ডিগ্রী জ্বর, পেটে প্লীহা কত বড়, প্রত্যহ বিদ্যালয়ে আইসে, আমরা বেঞ্চের উপর শোয়াইয়া রাখি, কখনও আতুরাশ্রমে রাখিয়া আসি। এ মেয়ে কিরূপে পাশ হইবে, বলুন ত? (৩) প্রভাবতীর বয়স সাড়ে তিন বৎসরের অধিক নহে, সে কি পাশ করিবে? (৪) সরমা পুরস্কার বিতরণের পরক্ষণেই অপর মেয়েদের সঙ্গে ভয়ানক ঝগড়া ও মারামারি আরম্ভ করিল — তখনও লেডী চ্যাটার্জি বিদায় হন নাই। অন্য মেয়েরা ধমক মানিল, সরমা কিন্তু

আমার সঙ্গে মুখামুখি আরম্ভ করিল — তখন অগত্যা আমি তাহার গালে এক চড় মারিলাম। সে সময় ঊষা-দি' ও আপনি ৮০০ লোকের ভীড়ের মধ্যে, তখন আমি কোথায় যাইতাম আপনাদের নিকট রিপোর্ট করিতে? আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা হইবে, হউক ; — আমিও দেখিয়া লইব, তিনি কত বড় 'পুলিশ-ছানা' ! (৫) মনোরমার পিতা স্কুলের প্রবীন ইন্‌সপেক্টর কি না, সেইজন্য দুই মাসে (গত ডিসেম্বর এবং বর্তমান জানুয়ারী) মেয়ের 'আকার' 'ইকার' জ্ঞান চাহেন। মেয়ের যে বই নাই, স্লেট-পেন্সিল নাই, সারা গায়ে পাঁচড়া ভরা — বেঞ্চে বসিতে পারে না, গায়ে ১০২ ডিগ্রী জ্বর, সে খোঁজ রাখেন না !

বিভা। এখন আমার নিবেদন শুনুন ঃ — (১) এই যে আতিফা, ইহার নিশ্চয়ই কোন রোগ আছে, সেই জন্য রাত্রে বিছানা ভিজায়। লেডী ডাক্তার মিস্ বোস সপ্তাহে দুইবার বোর্ডার ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে আইসেন। তিনি দুই তিন মাস হইল, আতিফাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, ইহার শীঘ্র চিকিৎসা করান দরকার। সেই হইতে ক্রমাগত ৪/৫ বার আতিফার মাকে চিকিৎসার জন্য লিখিয়াছি ; কিন্তু তাঁহারা কেবল আমাদিগকেই শাসন করিতে বলেন (৬ নং পত্র দেখুন)। (২) এই যে একদল কচি খুকি, ইহাদের বয়স ৩ $\frac{১}{২}$ হইতে ৪ বৎসরের অধিক নহে ; ইহাদের একমাত্র কাজ — ক্লাসে কাপড় নষ্ট করা ! (৩) এই যে এক শ্রেণী, ইহাদের মাথা খারাপ — অনুক্ষণ হুটোপাটি ও মার-ধর করে, ইহারা কোন গুরু-মা'র কথার বাধ্য নহে। (৪) এই যে এক গুচ্ছ — ইহাদের জামা খুলিয়া দেখুন, সর্বাঙ্গে পাঁচড়া,মাথায় উকুন, গায়ে ১০১ হইতে ১০৩ ডিগ্রী জ্বর। ইহারা প্রায় সমস্ত দিন আতুরাশ্রমে থাকে, সেখানে যথানিয়মে ইহাদের ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হয়।

তা। 'ঊষা-দি' ! তুমি এ জ্বরগ্রস্তা, পাঁচড়া-বিক্ষতা বালিকাদের বিদ্যালয়ে আনাও কেন?

ঊ। আমি ত ইহাদের আনিতে বারণ করি ; কিন্তু ঐ সকল বাড়ী হইতে অন্যান্য মেয়ে এবং উহাদের দিদি, মাসী, পিসীকে আনিতে 'বাস্' যায়। সেই সময় উহাদের মাতা জোর করিয়া উহাদের পাঠান। ঝি আনিতে না চাহিলে কর্ত্রীরা তাহার সঙ্গে ঝগড়া করেন — " তোর বাবার কি? আমরা মাসে মাসে মাইনে দিই — মেয়ে নিয়ে যাবি নে? মেয়ের জ্বর হয়েছে ত তোর বাবার কি?"

সৌদামিনী। মিসিস্ সেন, তুমি দয়া করিয়া তারিণী-ভবনের আর দুইটি শাখা বৃদ্ধি কর — একটা 'তারিণী - নার্সারী', আর একটা 'তারিণী-বাতুলালয়'।

বিভা। তাহা হইলে 'তারিণী- সূতিকাগৃহ'ই বাকী থাকে কেন?

ঊ। কোন চিন্তা করিও না — ঈশ্বরেচ্ছায় মিসিস্ সেন বাঁচিয়া থাকুন, কালে তাহাও হইবে !

তা। ঊষা-দি' ! তুমি আর ব্রহ্মশাপ দিও না ! তুমি এখন তোমার দল-বল লইয়া বিদ্যালয়ে যাও, আমি এ পত্রগুলির উত্তর লিখাই। জানকী ও নীহার, তোমরা স্ব স্ব টাইপিং শেষ কর। রাফিয়া-বু, আপনি আমার সঙ্গে পাঠাগারে আসুন ; পদ্মরাগ, তুমি চিঠিগুলি লইয়া আইস, মণি।

বিংশ পরিচ্ছেদ
লকেট রহস্য

এখন বহুদিন হইতে সিদ্দিকা কোরেশার সঙ্গে না থাকিয়া রাফিয়া ও সকিনার সহিত একটা স্বতন্ত্র কামরায় বাস করেন। রাত্রি অনুমান সাড়ে নয়টা ; তাঁহারা কম্বলাবৃতা হইয়া স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, কেহ নিদ্রা যান নাই। সৌদামিনী আসিয়া দ্বারে আঘাত করায় সিদ্দিকা উঠিয়া দ্বার খুলিলেন।

সৌ। ভাই পদ্মরাগ ! আমি তোমাকেই বিরক্ত করিতে আসিয়াছি, কিছু মনে করিও না।

সি। স্বচ্ছন্দে বল।

সৌ। সেই যে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তোমার 'লকেট রহস্য' বলিবে, জুবিলী ইত্যাদি হেঙ্গামে এতদিন তাহা শুনিবার সুবিধা হয় নাই — আজি শুনিতে চাই।

সি। বেশ। তুমি বস দিদি ! আমি আলোটা নিবাইয়া আসি, কারণ সকিনাবু'দের ঘুমের ব্যাঘাত হইতে পারে।

সৌ। আমি এখানে বসিব না ; চল, মিসিস্ সেনের কামরায়, তিনিও শুনিবেন।

সি। সে কি দিদি ! তুমি একা শুনিবে বলিয়া কথা ছিল ! আমি মিসিস্ সেনের সম্মুখে বলিতে পারিব না !

সৌ। কথাটা তাঁহারও শুনা প্রয়োজন, কারণ তিনি আমাদের সকলের উপর বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন এবং ইহা তাঁহার কর্তব্যও বটে। জান ত, মেয়েমানুষকে মাটির হাঁড়ীর সঙ্গে তুলনা করা হয় — যেহেতু মৃন্ময় পাত্র অতি সামান্য কারণেই অপবিত্র হয়।

সি। কিন্তু আমার ইতিহাস —

> " এ হ'তে পবিত্র প্রেম জীবের সংসারে
> হয় নাই, হইবে না লোক-লোকান্তরে !"

সৌ। তবে আর সঙ্কোচ কিসের? চল, সে লকেটটাও লইয়া চল, মিসিস্ সেনকে দেখাইবে।

সিদ্দিকা কাগজের কৌটা শুদ্ধ লকেট আনিয়া সৌদামিনীর হাতে দিলে তিনি তাহা সিদ্দিকার গলায় পরাইয়া দিলেন।

সি। (সজলনয়নে) এ কি করিলে দিদি ! এটা যে অপয়া জিনিস !

সৌদামিনী সিদ্দিকার রোদনে অপ্রতিভ হইয়া সস্নেহে বলিলেন, "ভগিনী ! তোমার মনে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে। কিন্তু এটা ত কণ্ঠে—বক্ষে রাখিবারই বস্তু !"

তারিণীর কামরার দ্বারদেশে আসিয়া সৌদামিনী অতি ধীরে ধীরে কড়া নাড়িলেন। তারিণী আরাম-কেদারায় উপবেশন করিয়া একখানি পুস্তক দেখিতেছিলেন ; কড়ার শব্দ শুনিয়া ডাকিলেন — "আইস।"

সৌ। সিদ্দিকার সেই লকেটের ইতিহাস অদ্য শুনিতে হইবে, কিন্তু তোমার সম্মুখে বলিতে লজ্জা করে।

তা। (স্নেহসিক্ত স্বরে) না, আমাকে লজ্জা করিতে হইবে না — এখানে তুমি আমাকে সর্বাপেক্ষা অকপট সহৃদয়া বন্ধু বলিয়া জানিবে। আমার হৃদয়ভরা সহানুভূতি পাইবে।

সিদ্দিকার অশ্রু তখনও বিন্দুর পর বিন্দু ঝরিতেছিল।

সৌ। এ কি পদ্মরাগ! তোমাকে আমরা অতি গভীরহৃদয়া বলিয়া জানি — আজি তোমার এ দুর্বলতা কেন?

তা। থাক, এত কষ্ট করিয়া তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না।

সি। (অশ্রুসম্বরণ করিয়া) না, কষ্ট কিসের? শুনুন ঃ— আমার বয়স যখন মাত্র ১২ বৎসর, সেই সময় আমার ভ্রাতার শ্যালকের সহিত আমার বিবাহ হইল। আমি অতি শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিলাম, এক মাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার অভিভাবক ছিলেন। আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সমবয়স্কা ছিলাম বলিয়া তিনি আমায় অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আমি তাঁহার কল্যাণে কখনও পিতৃ-অভাব অনুভব করি নাই। ভাইজান আমার এত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; কিন্তু মাতা বলিলেন, এমন সর্বগুণালঙ্কৃত বর সহজে পাওয়া যাইবে না, অন্ততঃ ইহাকে আটক করিয়া রাখা যাউক, সুতরাং তিন বৎসর পরে বিবাহ হওয়ার শর্তে আমার 'আক্‌দ্‌' হইল। আক্‌দ্‌ একরূপ সম্পূর্ণ বিবাহই, কেবল বর-ক'নের সাক্ষাৎ হয় না। আমার সম্প্রদান-ক্রিয়া ঐ তিন বৎসর পরে অনুষ্ঠিত হইত।

তা। 'হইত' — ইহার অর্থ কি ?

সি। তাহা আজি পর্যন্ত হয় নাই। বিবাহের কিছুকাল পরে মাতার মৃত্যু হইল। সে সময় "আছে" বলিতে আমার ভাইজান এবং তাঁহার পরিবার ব্যতীত আর কেহ ছিল না।

যথাকালে বরপক্ষ হইতে বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য তাকিদ-পত্র আসিল। কিন্তু বরের জ্যেষ্ঠতাত আমার ভাগের সম্পত্তি পূর্বে লিখিয়া চাহিলেন। তাঁহাকে অবিশ্বাস করা হইতেছে ভাবিয়া ভ্রাতা উক্ত প্রস্তাবে বিরক্ত হইলেন এবং সম্পত্তি লিখিয়া দিতে অস্বীকৃত হইলেন। প্রত্যুত্তরে বরের পিতৃব্য স্পষ্ট জানাইলেন যে, সম্পত্তি না পাইলে তাঁহারা আমাকে গ্রহণ করিবেন না এবং তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ অন্যত্র দিতে বাধ্য হইলেন।

ভাইজান এরূপ নিষ্ঠুর অবমাননার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি যেন বজ্রাহত হইলেন। আমারও মনে হইল যেন আমাকে পদাঘাতে বিতাড়িত করা হইয়াছে!

তা। তোমাদের সামাজিক প্রথানুসারে তাঁহারা তোমার মত অমূল্যরত্নকে বধূরূপে বরণ করিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন? তোমার বরের মতও কি তাহাই ছিল?

সি। বরের মত কি ছিল, বলিতে পারি না। ভাইজান বরকে রেজিষ্টি পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত মত কি? তিনি সে পত্রের উত্তর দিলেন না। ইহার পক্ষকাল পরে আমরা শুনিলাম, তিনি আবার বিবাহ করিয়াছেন। এ সংবাদে আমি যতটা মর্মাহত হইলাম, ভাইজান তদপেক্ষা শতগুণ ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি মাস দুই পর্যন্ত একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাকে দেখিলেই উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে রোদন করিতেন।

কিয়ৎপরিমাণে আত্মসম্বরণ করিয়া ভাইজান আমাকে বলিলেন, "আয় জয়নু " — আমার প্রকৃত নাম জয়নব — "তুই জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হ ! মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য যাহাতে তোকে কোন দুরাচার পুরুষের গলগ্রহ না হইতে হয় আমি তোকে সেইরূপ শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিব। তোকে বাল-বিধবা কিংবা চিরকুমারীর ন্যায় জীবন-যাপন করিতে হইবে ; তুই সেজন্য আপন পায়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়া !"

তা। আহা ! "পতন না হ'তে তনু

দাহন হইল আগে !"

সি। (অশ্রুমোচন করিয়া) ভাইজান আমাকে প্রাণপণে জমীদারি সংক্রান্ত সকল বিষয় শিক্ষা দিলেন। তিনি সর্বদা বলিতেন, জমীদারের প্রধান কর্তব্য — প্রজা-পালন ; প্রজা-শোষণ বা প্রজা-দহন নহে। তাঁহার সাধ্যানুসারে আমাকে সকল প্রকার সুশিক্ষা দিলেন।

যে দিন আমার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হইল, সেইদিন ভাইজান আমাকে আমার ভাগের সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া দলিলপত্র সমস্ত আমাকে দান করিলেন।

ভাইজান বলিলেন, "তোমার সম্পত্তিলাভের বিষয় আপাততঃ গোপন থাকুক। আমি একবার সে নরাধমের বন্ধন হইতে তোমাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া দেখি। যদি তিনি তোমাকে 'তালাক' দেন তবে ত পরম মঙ্গল ; তোমার জীবনের গতি অন্যদিকে ফিরিবে। আর যদি 'তালাক' না দেন তবে আর গতি কি — তোমাকে 'চিরদিন এ জীবন তারি তরে কাঁদিতে' হইবে, — অর্থাৎ তুমি নিজেকে বাল-বিধবা জ্ঞান করিবে।"

সে সময় বরের পিতৃব্য পরলোকগমন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন। ভাইজান তাঁহাকে যত পত্র লিখিতেন, সব আমাকে দেখাইতেন ; এবং তাঁহার যত চিঠি আসিত, তাহাও আমাকে পড়িতে দিতেন। তদবধি আমি তাঁহার 'মনোগ্রাম', হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষর চিনি।

তা। কিন্তু তাঁহাকে সশরীরে কখনও দেখ নাই ?

সি। (নতমস্তকে) তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছি কারসিয়ঙ্গে — আপনার বাসায়। কিন্তু তখন তাঁহাকে চিনিতাম না।

তা। আমার বাসায় — কারসিয়ঙ্গে — কে তিনি ?

সৌ। সম্ভবতঃ মিষ্টার আল্‌মাস্। তোমার লকেটে তাঁহারই ফটো আছে না ?

সি। হাঁ। কিন্তু লকেট ও ফটো আমি সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হই নাই।

সৌদামিনী তারিণীকে সিদ্দিকার কণ্ঠস্থিত লকেট দেখাইলেন।

তা। মিঃ আল্‌মাস্ তোমার ভাইকে কি উত্তর দিলেন ? তিনি তোমাকে 'তালাক' দিতে সম্মত হইলেন ?

সি। না। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। প্রায় ছয় মাস পত্র লেখালেখির পর তাঁহার মাতার এক মাতুল মৌলবী জোনাব আলী আমাদের বাড়ী আসিলেন। একদা ভাবীজান আমার হাত ধরিয়া তাঁহার কামরার বাহির দিকের রুদ্ধ জানালার নিকট লইয়া গেলেন। আমরা তথায় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ভাইজান ও জোনাব আলী মিয়ার কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম।

ভাইজান ক্রুদ্ধভাবে যাহা বলেন, জোনাব আলী অতি বিনীতভাবে তাহাতেই সায় দিয়া বলিতেছিলেন —

হাঁ, আপনি যাহা বলিতেছেন সব সত্য। আমি আপনার সব কথা মাথায় রাখি। বৃদ্ধের প্রার্থনা এই যে, আপনি লতীফকে এই বিবাহ-রজ্জুতে বাঁধিয়া স্বহস্তে ইচ্ছানুরূপ শাস্তি দিন !"

ভাইজান একটি পাঁচনলী পিস্তল তুলিয়া বলিলেন, —

"আমার মনোমত শাস্তি এই, — দেখুন ইহাতে মাত্র তিনটি গুলি আছে, — প্রথম গুলিতে লতীফ আল্‌মাস্‌কে শেষ করিব, দ্বিতীয়টিতে জয়নবকে এবং তৃতীয় গুলিতে আমি আত্মহত্যা করিব। — "

জোনাব আলী তাড়াতাড়ি বলিলেন, — "দোহাই আল্লার ! অমন সঙ্কল্প করিবেন না !"

* * * *

ভাবীজান নিজের ভাইয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া ভাইজানকে সবিনয় মিষ্টভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন যে, লতীফের কোন দোষ নাই, তিনি গুরুজনের পীড়নে নিতান্ত বাধ্য হইয়া আবার বিবাহ করিয়াছেন। তোমার এ কি একগুঁয়েমী — লোকে কি সপত্নী লইয়া ঘর করে না ? 'পিয়া যাকে চায়, সেই সোহাগিনী' — আমাদের জয়নু যে 'সোহাগিনী' হইবে, ইহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই।"

ভাইজান বলিলেন, "উহার স্ত্রী বর্তমানে আমি কিছুতেই জয়নুকে সম্প্রদান করিব না। আমার একমাত্র ভগ্নী — আমার অতি আদরের জয়নুকে উপেক্ষা করিল ! — এজন্য লতীফকে চিরজীবন কাঁদিতে হইবে ! !"

সৌ। বেচারা ত এখন সত্যই কাঁদিতেছেন !

সৌদামিনীর কথায় সিদ্দিকা কিঞ্চিৎ বিজয়গর্বে মৃদু হাস্য করিলেন।

তা। অভিসম্পাতটা হাড়ে হাড়ে লাগিয়াছে !

সি। একদিন ভাবীজান আমাকে ডাকিয়া পাঁচটি মূল্যবান অলঙ্কার দেখাইয়া বলিলেন, "একজন সওদাগর এগুলি বিক্রয় করিতে আনিয়াছে, ইহার মধ্যে তুমি যেটি পসন্দ কর, আমি কিনিয়া দিব।" ভাইজান মৃদুহাস্যে বলিলেন, "যদি জয়নু সবগুলি পসন্দ করে ?" ভাবীজান উত্তর দিলেন, "চিন্তা নাই — আমি সবই কিনিয়া দবি।" আমি এই লকেটটাকে সর্বাপেক্ষা স্বল্পমূল্যের মনে করিয়া উহার দিকে ইঙ্গিত করিলাম।

সৌ। তুমি লকেটের বহিরাংশের মণি-মুক্তাখচিত কারুকার্য্য দেখিয়া মনোনীত করিয়াছিলে, না, তাহার অভ্যন্তরীণ ফটো দেখিয়া ?

সি। তখন আমি ফটো দেখি নাই। ভাবীজান সহাস্যে তৎক্ষণাৎ উহা আমার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। আমি লকেট খুলিতে যাইতেছিলাম, তিনি আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "খবরদার ! এখন ওটা খুলিস্‌ না — যেদিন তোর বর আস্‌বে, সেইদিন খুলবি !" ভাইজানও সহাস্যে বলিলেন, "ওটা খুলিস্‌ না।" বহুদিন পরে সেইদিন ভাইজানকে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে দেখিয়াছিলাম।

পরে জানিলাম, বাস্তবিক সে অলঙ্কারগুলি কোন সওদাগর বিক্রয়ার্থ আনে নাই, — তাহা জোনাব আলী মিয়াঁ আমার জন্য আনিয়াছিলেন। সে সময় উভয় পক্ষে সম্ভবতঃ সন্ধি হইয়া যাইত। কিন্তু সেই রাত্রে এক লোমহর্ষক দুর্ঘটনা হইল। ভাইজান ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মারা পড়িলেন — (সিদ্দিকার বাক্‌রোধ হইল)।

কিয়ৎক্ষণ পরে তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর?"

সি। তাহার পর ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে আমি গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। কণ্ঠস্থিত লকেটের বিষয় আর আমার মনেই ছিল না। এখানে আসিয়া প্রথম দিন স্নান করিবার সময় উহা আমার হাতে ঠেকিল। আমি উহাকে 'অপয়া' জ্ঞানে তাচ্ছিল্যভাবে একটা বাক্সে ফেলিয়া রাখিলাম।

আমরা কারসিয়ঙ্গ্‌ হইতে ফিরিয়া আসিবার এক মাস পরে আমি এক দিন ট্রাঙ্ক ঝাড়িয়া গুছাইতেছিলাম, দৈবাৎ সেই সময় সৌদামিনী দিদি সেখানে গিয়া লকেটটাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কৌতূহলবশতঃ তাহা হাতে লইয়া খুলিয়া দেখিলেন — লকেটের অভ্যন্তরীণ ফটো আমি সেই দিন প্রথম দেখিয়াছি। ইহাই আমার 'লকেট–রহস্য'।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সমাজের প্রতিদান

"ভাই বানু! তুমি এবার পুরস্কার বিতরণের দিন আসিলে না কেন? তাহার পর আমাদের 'চিরহরিৎ–সম্মিলনী'তেও আসিলে না, এজন্য তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি না। এখন আবার নূতন করিয়া কোণের বউ হইয়াছ না কি?" এই বলিয়া শাহিদা বানুর গাল টিপিয়া দিলেন।

তারিণীর বসিবার ঘরে (ড্রয়িং–রুমে) বসিয়া এই তরুণীদ্বয় গল্প করিতেছিলেন। ইঁহারা উভয়ে তারিণী–বিদ্যালয়ের এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। ছয় সাত বৎসর হইল ইঁহারা বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া বিবাহিতা হইয়াছেন। বানু তাঁহার প্রথম কন্যা পঞ্চমবর্ষীয়া জরিনাকে বিদ্যালয়ে দিতে আসিয়াছেন।

তারিণী জরিনাকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন, "তাই ত আশ্চর্য্যের বিষয়! মুসলমান মেয়েদের মধ্যে এই রেজিয়া বানুই আমাদের সর্বপ্রথম ছাত্রী — সেই বানু এত সাধের জুবিলীর দিন অনুপস্থিত! কেন মা?"

বানু। (সাশ্রুনয়নে) মাসীমা! এজন্য আমি দায়ী নহি — আমার শাশুড়ী আমাকে আসিতে দেন নাই।

শাহিদা। জ্বালা'লে দেখি! প্রতিবৎসর প্রাইজে ও 'চিরহরিৎ–সম্মিলনী'তে আসিয়া থাক, এবার তৃতীয় ছেলের মা হইলে পর আসিতে বাধা দিলেন! অন্যান্য বার আসিতে কিরূপে?

বা। প্রতি বৎসর — প্রতি মাসেই 'নারী–ক্লেশ–নিবারণী' সমিতির অধিবেশনের দিন তারিণী–ভবনে আসিবার সময় ঝগড়া হইত। এবার তিনি বাড়ী ছিলেন না বলিয়া আমার

শাশুড়ীর জয় হইল। আম্মা আমার এখানে আসায় ঘোর আপত্তি করেন, বলেন — "তারিণী-ভবনে পর্দা নাই।"

কামরার অপর প্রান্তে সাকিনা ও রাফিয়া নিম্নস্বরে গল্প করিতেছিলেন। তাঁহারা বানুর শেষ কথাটি শুনিতে পাইয়া এদিকে 'মনোযোগ' দিলেন। রাফিয়া বলিলেন, —

"হাঁ মা বানু! তোমার শাশুড়ী উঠানে বসিয়া পুরুষ চাকরদের সমক্ষে স্নান করিয়া 'পর্দ্দা' রক্ষা করেন, আর আমরা সর্বদা বস্ত্রাবৃতা থাকিয়াও 'বে-পর্দ্দা'!"

স। তোমরা যে বাহিরের চাকরের সম্মুখে বাহির হও — 'তাঁহারা কেবল গৃহ-পালিত' চাকরের সঙ্গে মিশামিশি করেন।

রা। আমরা চাকরের সম্মুখে বাহির হই — তাহাদের দ্বারা পা টেপাই না ত!

শা। ওঃ! আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, পুরুষ চাকরেরা নাকি বানুর ননদের গা-মাথা টিপে, পা টিপে, তাহাতে 'পর্দ্দার' ব্যাঘাত হয় না!

বা। আর তোমার ননদ ও জায়েদের পোষাকের কথা বল না! সেই নেটের 'আঙ্গিয়া' আর পাতলা ফিন্‌ফিনে হাওয়ার সাড়ী! — সেই বেশে তাঁহারা দেবর নন্দাই — সকলের সম্মুখে বাহির হন! শাশুড়ী লম্বা হইয়া খাটে শুইয়া আছেন, আর জামাই আসিয়া সেই খাটে বসিলেন!

স। বাপু! তোমরা যে বড় বোকা! অবরোধে (চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে) উলঙ্গ থাকিলেও কেহ 'বে-পদর্দ্দা' হয় না।

উ। আচ্ছা বাপু বানু! এখানে 'পর্দ্দা নাই' বলিয়া না হয় না আসিলে; কিন্তু তোমার শাশুড়ী ত খুব বড়লোক দুই চারি শত টাকা জুবিলী-ফাণ্ডে দিলেন না কেন?

বা। টাকা চাহিয়াছিলাম বলিয়াই ত ঝগড়াটা বেশী পাকিল। মাসীমাকে এমন সব বিশ্রী কথা বলিলেন, যাহা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়!

শা। বটে? মাসীমাকে বিশ্রী কথা — কি বলিলেন শুনি?

বা। আমি বলিতে পারিব না।

শা। আমার কানে কানে বল, লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার!

বানুর কথা শুনিয়া শাহিদা ক্রোধে অধর দংশন করিয়া বলিলেন — "বটে! তাঁহারা এমন ছোটলোক! মাসীমাকে এমন কথা! বানু অমন নিরীহ শান্ত মেয়ে, তাই ও সব কথা সহ্য করিয়াছে! আমি হইলে খুনাখুনি হইয়া যাইত!"

সৌ। আচ্ছা বাপু! শুনিই না, কি কথাটা?

শা। আমি মুখে আনিতে পারিব না, বানু বলুক।

বা। বাজি,* তুমি লিখিয়া দাও।

---

* পার্শী ভাষায় বড় ভগ্নীকে 'বাজী' বলে। বানু মোগলকন্যা।

শাহিদা অপরের অগোচরে লিখিয়া কাগজখণ্ড ভাঁজ করিয়া ঊষার হাতে দিলেন। ঊষা উচ্চহাস্যে একটি শব্দ বানান করিয়া পড়িলেন — "ব–এ একার তালব্য শ–এ য-ফলা আকার।"

সৌদামিনী কাগজখণ্ড হাতে লইয়া বলিলেন ...." র মত বলিয়াছে, মিসিস্ সেনকে ত 'পতিতা' বলে নাই, তবে এত রাগ কেন?

তা। ব্রাহ্ম–সমাজের লোকেরা ত আমাকে স্পষ্ট "——"ই বলে ; মুসলমান সমাজ এখনও পর্যন্ত আমাকে তত ভালবাসেন না !

সিদ্দিকা কয়েকখানি পত্রহস্তে আসিয়া বলিলেন, "মাফ করিবেন, এই চিঠিগুলি নিন।"

সিদ্দিকাকে প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া তারিণী বলিলেন, — "বস পদ্মরাগ ! ইঁহারা আমাদের পুরতান ছাত্রী — ইঁহাদের সহিত আলাপ কর।"

ঊ। পদ্মরাগ, আগে পত্রগুলি পড়িয়া শুনাও — পরে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিও।

বা। গুরু–মা ! আপনি নিজেই পড়ুন না।

ঊ। ইহার অধিকাংশই আমার প্রেম–লিপি হওয়া সম্ভব। সে রকম চিঠি একা পড়িতে সুখ বোধ হয় না।

তারিণী ১০/১২ খানা পত্র ঊষার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, "এইগুলি তোমার প্রেম–লিপি।" (অর্থাৎ ছাত্রীবৃন্দের অভিভাবকদের অভিযোগ–পত্র।)

পত্রগুলি পঠিত হইলে শাহিদা বলিলেন, "অনেকেই ধমকাইয়াছেন যে মেয়ে ছাড়াইয়া লইবেন। তাহাতে মাসীমার কি ক্ষতি হইবে?"

ঊ। এই সমস্ত সানাউল্লাহ্, পানাউল্লাহ্, ঘোষ, বোসের মেয়ে তারিণী–বিদ্যালয় ত্যাগ করিলে মিসিস্ সেনের চৌদ্দপুরুষ নরকে যাইবে !

বিভা কয়েকখণ্ড কাগজহস্তে আসিয়া বলিলেন, "এ অমূল্য কাগজগুলি আমি স্বহস্তে আপনাদের দিতে আসিলাম। আমিও একখানা পাইয়াছি।"

শা। কাগজগুলি 'সমন্'–এর মত দেখাচ্ছে ; কিসের 'সমন্'? বি।

ইন্সপেক্টর অমূল্যধন বাগচী সারদা শিক্ষয়িত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছেন। মিসিস্ সেন এবং আমরা সাক্ষী। ইহা সেই সাক্ষীর 'সমন্'।

শা। বটে? হাঁ, আমিও ত কিছু কিছু শুনিয়াছি। তিনি না কি দরখাস্তে লিখিয়াছেন যে, সারদা গুরু–মা সরমাকে ভীষণবেগে আক্রমণ করিয়া মাথায় ও পৃষ্ঠে সবলে চপেটাঘাত করিয়াছেন ; তাহার ফলে সরমা মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, তিন ঘণ্টা অজ্ঞান ছিল। বাড়ী গিয়া সমস্ত রাত্রি প্রবল জ্বরে ছট্‌ফট্ করিয়াছে, একটুও ঘুমায় নাই।

বা। আমিও শুনিয়াছি, তিনি নাকি ঐ মর্মে তিন জন ডাক্তারের সার্টিফিকেটও দাখিল করিয়াছেন।

সৌ। তাহা করিবেনই ত। "পুলিশের অসাধ্য ক্রিয়া নাহি চরাচরে।"

বি। সরমা সেই তিন বৎসর বয়স হইতে স্কুলে আসিত, আমরা তাহার কত উপদ্রব, দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়াছি ; এখন সে মেট্রিক্ ক্লাশে আসিয়া আমাদের এই প্রতিদান দিল !

তা। সেজন্য দুঃখ কেন, বিভা ? তুমি ইহাপেক্ষা আর কি আশা করিয়াছিলে ?

শা। এই ত বানুর শাশুড়ী বলিয়াছিলেন যে, বড়-মাসীমা রাজ্যের সব টাকা আত্মসাৎ করেন — "তারিণী-ভবন' নামে একটা বিশেষ ব্যবসায়ের দোকান খুলিয়াছেন ; বাঙ্গালার বউ-ঝিকে ঘরের বাহির করিয়াছেন। তিনি অতিশয় স্বার্থপর ও অর্থ-পিশাচ। আর — আর — প-তি-তা স্ত্রীলোকদের মত তাঁহার অর্থ-পিপাসা ! কিন্তু মাসীমা এই ব্যবসায় না করিলে তিনি বানুর মত অমন সর্বগুণভূষিতা পুত্রবধূ পাইতেন কোথা হইতে ?

বা। টাকা আত্মসাৎ করার অপবাদটা আমার মনে সব চেয়ে বেশী লাগিয়াছে। যিনি নিজের সর্বস্ব— চারি লক্ষ নগদ টাকা দেশহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন — তিনি পরের টাকা আত্মসাৎ করিবেন ?

শা। কেবল টাকা নহে — যিনি তাঁহার মূল্যবান জীবনের ২২টি বৎসর, স্বাস্থ্য, শক্তি, সামর্থ্য — সব দেশের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার প্রতিদানে এই পাইলেন ?

বা। "আজীবন পূজিলাম দেব দ্বিজগণে,
তার কি এ ফল বাছা ! তুমি যাও বনে ?'

এই সময় পরিচারিকা সকলের জন্য চা-খাবার লইয়া আসিল।

তা। (চা ঢালিতে ঢালিতে) — মা ! তোমরা এত দুঃখিত হইতেছ কেন ? লোকে ওরূপ বলিয়াই থাকে ; ও-সব কথা ধর্ত্তব্য নহে। এখন তোমরা চা খাও। কই জরিনা, আয় এদিকে !

সৌ। তাই ত, দেশ ও সমাজ কি মিসিস্ সেনকে কাঁদিয়া পায়ে ধরিয়া বলিতে আসিয়াছিল যে, "দীন-তারিণি ! আমাদের তারণ কর ! আমাদের জন্য টাকা, স্বাস্থ্য, জীবন উৎসর্গ কর ?" ইনি কেন দেশ-সেবা করিতে গেলেন ? দেশ কি ইঁহার সেবা চায় ?

"তুমি বল মন প্রাণ দিয়াছ তাহায় ;

কেন দাও ? কারে দাও ? সে ত নাহি চায় !"

রা। সৌদামিনী-দি', তোমার কথা মানিলাম, "মন প্রাণ সে ত নাহি চায়,' কিন্তু লইতে আইসে কেন ? মিসিস্ সেন কি দ্বারে দ্বারে "প্রাণ নেবে গো ?' বলিয়া 'ফেরী' করিয়া বেড়ান ? আসল কথা এই যে, আমরা লইব, খাইব, গালিও দিব।

চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া বিভা বলিলেন — " যে যত বড় হয়, তাহার দায়িত্ব তত বেশী। সে তত অধিক গালি শুনে। মিসিস্ সেন এ সব জ্বালা-যন্ত্রণা বহন না করিলে আর কে করিবে ? (বানু ও শাহিদার প্রতি) তোমাদের মনে নেই, সেই যে ইংরাজী পদ্যপাঠে পড়িয়াছিলে, — ইংলণ্ডের কোন রাজা মনোদুঃখে জলযন্ত্র-পরিচালকের টুপীর সহিত মুকুট বদল করিতে চাহিয়াছিলেন ?"*

---

* ''Thy mealy cap is worth my crown,

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ
পাষাণ-প্রতিমা

লতীফ বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। প্রায় ৯ বৎসর পূর্বে জয়নবের সহিত তাঁহার যে 'আকদ' হইয়াছিল, সে কথা ভুলিতে পারেন না। লতীফকে এখন তাঁহার সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, ইহাই হইতেছে তাঁহার কর্ত্তব্য। কিন্তু হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে কে যেন বলে, একবার এক অজ্ঞাতা রমণীকে বিবাহ করিয়া পাঁচ বৎসর বিষময় ফল ভোগ করিয়াছ; জয়নবও সেইরূপ অপরিচিতা! অথচ সিদ্দিকা ত সর্বগুণে বাঞ্ছনীয়া। আর এক কথা, জয়নব অনুপস্থিত আর সিদ্দিকা উপস্থিত। বিবেক বলে — 'না, না, সিদ্দিকার বিষয় ভাবা উচিত নহে,জয়নবকে লইয়াই তাঁহাকে ঘর করিতে হইবে।'

লতীফ জয়নবকে আকাশ-পাতাল খুঁজিতে বিরত হন নাই। কিন্তু জয়নব সম্বন্ধে কোন কল্পনা করিতে গেলে সিদ্দিকা আসিয়া পথরোধ করিতেন — সুতরাং জয়নব ও সিদ্দিকা এক হইয়া যাইত! ষোড়শ পরিচ্ছেদে বর্ণিতা 'বীরবালা', যাঁহাকে লতীফ অনল হইতে উদ্ধার করিতে গিয়াছিলেন, সেই জয়নব লতীফের 'হারানিধি'। সে রাত্রি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কাদা-মাখাই সার হইয়াছিল, — মাছ ধরিতে পারেন নাই! কি দুরদৃষ্ট! এ দীর্ঘ আড়াই বৎসরেও যখন জয়নবের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়নবের আশা ত্যাগ করিলেন।

সিদ্দিকার দিক্ হইতে, লতীফ যদিও কখনও কোন আশা প্রাপ্ত হন নাই, তবু আশার বিরুদ্ধে আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি নানা ইঙ্গিতে সিদ্দিকাকে মনের কথা, প্রাণের ব্যথা জানাইতেন; সিদ্দিকা নির্ব্বিকার — নিবাত্ নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় অটল থাকিয়া, নীরবে প্রত্যাখ্যান করিতেন। এমন মূক বধির ভাব দেখাইতেন যে, আর তাঁহাকে কিছু বলা চলিত না।

এবার পাঁচ ছয় মাস মুঙ্গের ও কলিকাতায় ঘুরিয়া লতীফ এখন বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, জমীদারী সংক্রান্ত অনেক অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য বাকী পড়িয়া রহিয়াছে। এত দিন সালেহার অত্যাচারে গৃহে তিষ্ঠিতে পারেন নাই; এখন গৃহে মনোযোগ দিবেন, মনে করিলেন। বাড়ীর সন্নিহিত উদ্যানটি নদীর ধারের দিকে আরও কিঞ্চিৎ বাড়াইলে এবং তাহাতে ছোট একটি টিনের বাংলো নির্মাণ করিলে, তাহা মনোরম উদ্যান-বাটিকা হইবে। কিন্তু এ সব করিয়া কি হইবে? তাঁহার গৃহলক্ষ্মী কই? ভাল করিয়া অতি স্পষ্টভাষায় আর একবার সিদ্দিকার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দেখিলে হয় না?

তাহাই হইল। তিনি সিদ্দিকাকে এক দীর্ঘ পত্র ইন্‌সিওর করিয়া পাঠাইলেন। পত্রের ভাষা এমন সুকৌশলে রচিত হইল যে, সিদ্দিকা — উত্তর — সদুত্তর হউক অথবা অসন্তোষজনক

Thy mill my Kingdom's fee."

উত্তরই হউক — দিতে বাধ্য হইবেন। উত্তর না দিলে "মৌনং সম্মতি-লক্ষণং" বলিয়া ধরা পড়িবেন। সুতরাং এবার তাঁহার মূক হওয়া খাটিবে না।

বাংলা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। লতীফ দুইজন মালীর সহিত বাগানের যেখানে যাহা সাজে সেইরূপ লতা-গুল্ম দিয়া বাগান সাজাইতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, উদ্যান-বাটিকার নাম রাখিবেন- 'Ruby কুঞ্জ'। সেই সময় ডাক-পিয়ন একখানি ইন্‌সিওর-করা পত্র আনিয়া দিল। পত্রখানি উন্মুক্ত উদ্যানে বসিয়া পাঠ করিতে সাহস হইল না। পত্রহস্তে লতীফ আপন কামরায় গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। অনেকক্ষণ পরেও সাহেব ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া মালীরা হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

বেলা প্রায় তিনটা — এখনও সাহেবের স্নানাহার হয় নাই। চাকরেরা সভয়ে দ্বারে মৃদু আঘাত করিয়া সাহেবের সাড়া-শব্দ না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। তিনি কি ঘুমাইয়াছেন? না, এরূপ অসময়ে তিনি ত ঘুমান না। ভৃত্যবর্গ অনন্যোপায় হইয়া রফীকার সপ্তমবর্ষীয় পুত্রকে দ্বারদেশে আনিয়া "মাম্মা! মাম্মা —" বলিয়া কাঁদিবার জন্য দণ্ডায়মান করিয়া দিল। এই বালকটিকে লতীফ অত্যন্ত ভালবাসেন! কি জ্বালা! নির্জনে একটু কাঁদিবারও সুবিধা পাওয়া যায় না! নিজের কামরায় অবরুদ্ধ থাকিবারও উপায় নাই! তাঁহার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের ভাষা ছিল —

"প্রাণ কাঁদে প্রিয়া লাগি ভীম যাতনায়!
ইচ্ছা হয় ছুটে যাই, যেথা জীব-জন্তু নাই,
কেঁদে আসি প্রাণভরে পড়িয়া ধরায়!"

লতীফ সে 'নিষ্ঠুর' পত্রখানি একটা বাক্সে ফেলিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া রোরুদ্যমান বালককে উপেক্ষা করিয়া মাঠে চলিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে ভাবিতেছেন, সিদ্দিকা কি হৃদয়হীনা পাষাণ! — প্রেম দূরে থাকুক, সাধারণ দয়া মায়া সহানুভূতি পর্যন্ত নাই! সেই যে কবি বলিয়াছেন —

"উত্তরিয়া 'না', পাষাণী বলিল আবার,
'ইথে যদি মর তবে কি করিব আর?"

মানুষ এমন প্রাণহীন অসার পদার্থ হ'তে পারে! তাহা হউক, — আর তাঁহাকে মনে স্থান দিবার প্রয়োজন নাই! তিনি ত স্পষ্টাক্ষরে তাঁর অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে আর কেন? কিন্তু সে কথা ভাবিতেও যে হৃদয় শতধা হয়! তাহাকে ভুলিলে আর থাকে কি? কবি বলেন, প্রেমিক জ্বলিয়া সুখী হয়, তবে প্রেমিক কাঁদে কেন? ঐ রোদনেই ত সুখ! সে সুখ-সাগরে যে একবার ডুবিয়া যায়, সে আর উঠিতে চাহে না! —

"হায়রে হায়! প্রেমিক যে জন, সে কেন চায় ভালবাসা?
দিলে নিলে বদল পেলে ফুরিয়ে গেল প্রেম-পিপাসা।
প্রেমে চায় ভালবাসি, পরাব না পরব ফাঁসি,
চায় না প্রেম কেনা বেচা — ভালবেসে পুরায় আসা!"
বেশ বেশ, তাহাই হইবে, —
'সিদ্দিকা! তোমায় ভালবাসিব আবার!'

এ পাপ-জগতে কিছুই অসম্ভব নহে। ইহতে পারে, লতীফের রোদন নিষ্ফল হইবে না। হইতে পারে, 'পাষাণ-প্রতিমা' এক সময়ে দয়া-প্রতিমা হইবে। এ বিচিত্র নাট্যশালারূপ জগতে কিছুই অসম্ভব নহে। আবার দুই-চারি বিন্দু অশ্রু ঝরিল। ছি! এ কি! অদ্য তাঁহার পুরুষোচিত ধৈর্য্যরক্ষা অসম্ভব হইল কেন? আত্মসম্বরণ করা সম্ভব হইল কেন? আশা লইয়াই মানুষ বাঁচে — নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু —

"এমন করিয়া আর বল দেখি কতবার
গড়িয়া আশার মঠ পুনরায় ভাঙ্গিব?"

ক্রমে যে তিনি নদীর ধারে আসিয়া পড়িয়াছেন, লতীফ তাহা বুঝিতেই পারেন নাই। নদীবক্ষে জেলে-ডিঙ্গীর নাবিকদের কোলাহলে তিনি যেন সংজ্ঞালাভ করিলেন। এবার ভালমতে অশ্রুমোচন করিলেন। ছি! লোকে দেখিলে কি বলিবে! তিনি নিবিষ্টচিত্তে দাঁড়াইয়া তরঙ্গিনীর তরঙ্গ গণনা করিতে লাগিলেন। কে একজন পশ্চাৎ হইতে তাঁহার চক্ষু ঢাকিল।

"জোনাব আলী নানা! কি সংবাদ?"

জোনাব আলীর ত মরণ নাই, তাহার সংবাদ ভালই। কিন্তু তোমার আজ কি হইয়াছে? শুনিলাম, স্নানাহার হয় নাই, রোরুদ্যমান মা'শুককে আদর করা হয় নাই, কেন?"

ল। মানুষের মেজাজ কি সব সময় এক রকম থাকে? তাহা ছাড়া আমার কি একটু হাসিবার কাঁদিবার স্বাধীনতা নাই?

জো। রোদন-ক্রিয়া ত আজি দেড় বৎসর হইতে — অর্থাৎ বউ-কর্ত্রীর মৃত্যুকাল হইতে চলিতেছে, কিন্তু কখনও এরূপ রক্তচক্ষু ক্রন্দন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। নিশ্চয় আমাদের ঘরে আর কেহ সিঁদ দিয়াছে বা ডাকাতী করিয়াছে। কে সে? বল ত, ডাকাত ধরিবার চেষ্টা করি। (লতীফকে পূর্ববৎ নির্বাক্ দেখিয়া) তুমি আশৈশব জোনাব নানাকে বড় ভালবাস — তাহার নিকট কিছু গোপন কর না — আজ আমি 'পর' হইলাম না কি?

ল। আমরা 'চরের' মোকদ্দমাটা হারিয়াছি, তাহা তুমি শুন নাই কি?

জো। শুনিয়াছি। কিন্তু ইহাও জানি, মোকদ্দমা হারিয়া কাঁদিবে, সে ধাতুতে লতীফ গঠিত হয় নাই।

ল। এ মোকদ্দমায় অনেকগুলি টাকা নষ্ট হইয়াছে।

জো। আবার চাতুরী! আমি এত বোকা নই। তোমার প্রকৃত দুঃখের কারণ বল। যত দূর জানি, তোমার পরলোকগতা প্রণয়িনীর সঙ্গে তোমার প্রণয়ের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না! তবে এ 'হিয়া দগ-দগি, পরাণ-পোড়ানি' কাহার জন্য?

ল। তোমার মস্তিষ্ক উর্ব্বর — যাহা ইচ্ছা কল্পনা করিয়া যাও।

জো। দেখিব দাদা, কখনও ধরা পড় কিনা।

দুর্ভাগ্যবশতঃ লতীফ তখনই ধরা পড়িলেন। তিনি পুনরায় চক্ষু মুছিবার জন্য রুমাল বাহির করিবা মাত্র একখানি পত্র তাঁহার পকেট হইতে পড়িয়া গেল। জোনাব আলী তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া লইলেন। তিনি বিজয়গর্বে হাসিয়া বলিলেন, — "এখন?"

ল। 'এখন' কি? কোন্ গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিলে?

জো। আবিষ্কার করিলাম — "সিদ্দিকা"। হুঁ–মা (অর্থাৎ লতীফের মাতা) ও রফীকার মুখে ঐ নাম শুনিয়াছি বটে।

ল। কেবল স্বাক্ষর দেখিয়া বিচার করা উচিত নহে। আদ্যন্ত পাঠ কর, তাহার পর বিচার করিবে।

জো। (পত্র পাঠ করিয়া) হস্তাক্ষর আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হয়। ইহা জয়নব বিবির হস্তাক্ষরের ন্যায়। সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যখন চুয়াডাঙ্গায় ধন্না দিয়া বসিয়াছিলাম, তখন সে বিবির হাতের লেখা অনেকবার দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনিই ত সে বাড়ীতে সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্রী ছিলেন। চাকরেরা 'হুজুর' অপেক্ষা 'সাহেবজাদী'কেই বেশী ভয় করিত।

লতীফের ধমনীতে ধমনীতে তড়িত–প্রবাহ ছুটিয়া গেল! তাই ত, জয়নবের কয়েকখানি পত্র তাঁহার নিকটও ত আছে! কিন্তু তিনি কেমন অন্ধ হইয়া আছেন — একবারও সে চিঠি সিদ্দিকার চিঠির সহিত মিলাইয়া দেখেন নাই! তিনি মনোভাব গোপন করিয়া জোনাব আলীকে বলিলেন, "তুমি নিশ্চয় বলিতে পার — এ পত্রের লেখিকা সেই ব্যক্তি?"

জো। না ভাই, হলফ করিয়া বলিতে পারি না ; আর সে প্রায় তিন বৎসর হইল — তাঁহার হস্তাক্ষর দেখিয়াছিলাম। তবে আমার মনে হয় — উভয় হস্তলিপিতে সাদৃশ্য আছে।

ল। এখন চিঠিখানা ফেরত দাও।

জো। পত্রে ত কোন কথাই নাই ; আরম্ভ — "সবিনয় নিবেদন," "শেষ" — "বিনীতা সিদ্দিকা" ; এরূপ অকর্মণ্য কাগজ খণ্ড এত যত্নে রাখিয়াছ কেন?

ল। কোনরূপে রহিয়া গিয়াছে।

জো। তাহা হইলে একটা বাক্সের মধ্যে অথবা কোন কাগজের স্তূপে পড়িয়া থাকিত — পকেটে থাকিবার ছলে তোমার বুকের উপর থাকিত না!

ল। পকেটে পড়িয়া থাকা কি ভুল হইতে পারে না?

জো। (পুনরায় পত্রের তারিখ ছ, সেই সময়ের। যদি তদবধি উহা পকেটেই থাকিত তবে এতদিন রজক–হস্তে প্রাণত্যাগ কদিেখিয়া) না, কারণ চিঠিখানি অনেক দিনের — তুমি যখন দার্জিলিং হইতে আসিয়ারত! আর তুমি আমাকে ঠকাইতে পারিবে না। আমার চুল রৌদ্রে পাকে নাই — আমিও ত যৌবন অতিক্রম করিয়াই বৃদ্ধ হইয়াছি। এককালে আমিও ত্রিশ বত্রিশ বৎসরের যুবা ছিলাম।

ল। তোমার বার্দ্ধক্যে কেহ সন্দেহ করিতেছে কি? বক্তৃতা ত অনেক শুনাইলে, এখন পত্রখানি দাও।

জো। এমন রাবিশ চিঠি লইয়া কি করিবে?

ল। যাহাই করি না কেন, তোমার ক্ষতি–বৃদ্ধি কি?

জো। নিতান্তই ছাড়িবে না, তবে আর কি করা যায়? আচ্ছা, ঐ স্রোতে ফেলিয়া দিই — তুমি ধর!

ল। এ খেলা সহজ নহে। যদি ধরিতে না পারি, — আর তীরে উঠিব না।

জো। এত গভীর ভালবাসা! কেবল একখানি সাধারণ পত্রের জন্য এতটা উৎসর্গ করা হইবে?

ল। দিবে কি না বল!

জোনাব আলী অগত্যা পত্রখানি ফিরাইয়া দিয়া বিমর্ষভাবে লতীফের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ল। কি ভাবিতেছ, নানা?

জো। আমি তোমার প্রেমের গভীরতা পরীক্ষা করিতেছিলাম। যদি প্রণয়-লিপি হইত তবে তাহার জন্য এরূপ আগ্রহাতিশয্য শোভা পাইত!

পত্রখানির জন্য এতটা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া এখন লতীফের লজ্জা হইল। কিন্তু তিনি ত আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, তখন উচিত অনুচিত বিচার করিবার জ্ঞান ছিল না। ভয় ছিল, — যদি অরসিক জোনাব আলী পত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলেন! তিনি নতমস্তকে ভাবিতে লাগিলেন যে নিজের ঘরে, — এমন কি পথে, ঘাটে মাঠে — কোথাও একটু নির্জনে চিন্তা করিবার সুবিধা নাই — মানুষ এমন পরাধীন! আর সে চিন্তাও ত কিছু সুখ-চিন্তা নহে একটা নির্ম্মম পাষাণ-প্রতিমার আলোচনা মাত্র!

জো। (সানুনয়ে) সত্যই তোমার জোনাব-নানাকে কিছু বলিবে না? সিদ্দিকা খাতুন সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়াও চুরিবিদ্যা ছাড়েন নাই!

ল। আমাকে ছাড়িয়া এখন তাঁহাকে আক্রমণ কেন?

জো। যেহেতু — এই যে বিরস বদন, সজল নয়ন, উদাস মন — "সিদ্দিকারে! মূলীভূতা তুমিই তাহার!

লতীফ আবার ভাবিলেন — কি বিপদ! হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে যে বেদনা লুক্কায়িত আছে, এত সতর্কতা সত্ত্বেও তাহা কিরূপে ব্যক্ত হইয়া পড়িল — এখন তাহা মা জানেন, রফীকা জানে, জোনাব নানা জানেন, তারিণী-ভবনেও অনেকেই জানেন। কেবল এ বেদনা বুঝিল না — সেই পাষাণ-প্রতিমা!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ
ঋণ শোধ

"ঐ শিলাখণ্ড পর্যন্ত উঠ ত দেখি!" বরিয়াতু পাহাড়ের একখণ্ড শিলার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তারিণী সিদ্দিকাকে বলিলেন, — "পাহাড়ের ঐ শিলাখণ্ড পর্যন্ত উঠ ত দেখি!"

কার্ত্তিক মাস, পূজার ছুটি। তারিণী মাত্র চারিজন সঙ্গিনীসহ রাঁচীতে পক্ষকাল যাপন করিবার জন্য আসিয়াছেন। এবার তাঁহারা পাচক সঙ্গে আনিতে পারেন নাই, নিজেরাই পালাক্রমে রন্ধন করেন। অদ্য ঊষা ও রাফিয়া রন্ধনের জন্য বাসায় রহিলেন; কোরেশাও

শিরঃপীড়া বশতঃ বাহির হইতে পারেন নাই। সহজে একটা পুষ্‌পুষ্* পাওয়া গেল বলিয়া তারিণী কেবল সিদ্দিকাকে লইয়া বরিয়াতু পাহাড়ে বেড়াইতে আসিয়াছেন।

অপর দিকে অশ্বপদ-ধ্বনি শ্রবণে তাঁহারা সেইদিকে চাহিলেন। একজন বৃদ্ধ ইংরাজ অশ্বারোহণে পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সিদ্দিকা স্তম্ভিত হইলেন। তখন সায়াহ্ন রবির রক্তিম ছটায় আকাশ রঞ্জিত হইয়াছে। সিদ্দিকা ধীরে ধীর নামিয়া আসিয়া বলিলেন — "বড় দিদি ! চলুন, এখন বাসায় যাই।"

তা। হাঁ চল ; যাইতে যাইতে হয় ত রাত্রি হইবে। পুষ্‌পুষে মাত্র দুইজন কুলী।

তারিণী ও সিদ্দিকা পুষ্‌পুষের জানালা দিয়া পথের দৃশ্য এবং পাহাড় দেখিতে ছিলেন। দেখিলেন, সে অশ্বারোহীও ফিরিয়া আসিতেছেন। ঐ যা ! ঘোড়াটা কিসে টক্কর লাগিয়া পড়িয়া গেল ! ঘোড়া ত উঠিয়া দাঁড়াইল, আরোহী আর উঠিল না। তারিণীর পুষ্‌পুষ্ আরও কিছুদূর চলিয়া গেল।

আবার তাঁহারা পুষ্‌পুষের পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, শ্বেতাঙ্গটি তখনও ভূতলে পড়িয়া আছেন, আর ছিন্নরাশ ঘোড়া আরোহীর পাশে দাঁড়াইয়া যেন তাঁহার পতনের জন্য অনুশোচনা করিতেছে। নিকটে একটিও লোক নাই যে তাহাদের সাহায্য করিবে। তখন সায়াহ্ন-গগনে মাত্র একটি তারকা দেখা দিয়াছে। তারিণী ভাবিলেন, লোকটা এ অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে শৃগাল কুকুরে টানাটানি করিবে।

পুষ্‌পুষ্ ফিরাইয়া লইয়া তাহারা কুলীদ্বয়ের সাহায্যে আহত লোকটিকে গাড়ীতে তুলিলেন। পুষ্‌পুষে কোন প্রকার বেঞ্চ বা উচ্চ আসন নাই — তাহার সমতল মেঝেতে স্বচ্ছন্দে শয়ন করা যায়। মৃতকল্প লোকটিকে সেইখানে শয়ন করাইয়া দিয়া তারিণী ও সিদ্দিকা পদব্রজে চলিলেন।

কিয়দ্দূরে একটি ছোট মসজিদে মগরেব-কালীন (সান্ধ্য) উপাসনা হইতেছিল। তথা হইতে জল আনিয়া তারিণী আহত ব্যক্তির চক্ষু ও মুখে দিয়া তাহার জ্ঞান সঞ্চারের বৃথা চেষ্টা করিলেন। সিদ্দিকা পথপার্শ্বে সায়াহ্ন নামাজ শেষ করিয়া স্বীয় অঞ্চল ছিড়িয়া তাহার মাথায় ও বাহুতে পটী বাঁধিয়া দিলেন। পুষ্‌পুষ্‌ওয়ালাদের লোকটাকে হাসপাতালে পৌছাইয়া দিতে বলিয়া তাঁহারা পদব্রজে তাহার অনুসরণ করিলেন। পুষ্‌পুষ্ মুহূর্তমধ্যে তাঁহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

প্রভুভক্ত ঘোড়াটি পুষ্‌পুষের সঙ্গে চলিল। তদ্দর্শনে সিদ্দিকা বলিলেন, — "দেখিলেন, বড়দিদি ! ঘোড়াটা আপনিই পুষ্‌পুষের সঙ্গে যাইতেছে।"

তা। তাই ত, এইসব ঘোড়া গরু ভালবাসার যতখানি প্রতিদান দিয়া থাকে, মানুষ যদি ইহার দশমাংশও দিত —

---

* পুষ্‌পুষ্, — শাম্পানীর মত গাড়ীবিশেষ। ইহা দুই কিম্বা ততোধিক মানুষে টানে ; একজন পশ্চাতে ও একজন সম্মুখে থাকে। সম্ভবতঃ পশ্চাদ্দিক হইতে ঠেলা দেওয়া হয় বলিয়া ইহার নাম 'পুষপুষ' (Push-push) হইয়াছে।

সি। তাহা হইলে আপনার ছাত্রীদের অভিভাবকগণ আপনাকে অমন সুন্দর* উপাধিরত্নে ভূষিত করিতেন না!

তা। (উচ্চহাস্যে) ওহো! সেদিনকার কথা তুমি এখনও ভুলিতে পার নাই? তা 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে'। কাহারও কথায় কি আর গায়ে ফোস্কা পড়ে।

সি। গায়ে ফোস্কা না পড়ুক, মনে ফোস্কা পড়ে!

আহারান্তে রাত্রি ১০টার সময় ঊষা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এত কষ্ট করিয়া বারিয়াতু হইতে তিন চারি মাইল পথ পদব্রজে আসিলে কেন? তোমাদের সে পুষ্‌পুষ্ কি হইল?"

তারিণী তখন সেই পথে-কুড়ান আহত ইংরাজের কথা বলিলেন।

কোরেশা বঙ্গভাষায় কথা বলিতে ভালবাসেন; তিনি বলিলেন — "পুষ্‌পুষ্‌ওয়ালা ভাড়া লইতে আসিলে জানা যাইবে, তাহাকে হাসপাতালে দিয়াছে, না, কোথায়।"

সি। পুষ্‌পুষ্-কুলীদের অগ্রিম ভাড়া এবং বখশিশ চুকাইয়া দেওয়া গিয়াছে। তাহারা আর আসিবে না।

কো। মিসিস্ সেন! আপ্‌লোক এমন কাচ্চা কাম করিলেন কেন? কুলীরা জখমী লোকটাকে রাস্তা মেঁ ফেলিয়া দিয়া আপ্‌না ঘর গিয়াছি।

তা। পাটনা কিংবা কলিকাতার ঠিকা-গাড়ীওয়ালা হইলে সেরূপ করিত। রাঁচীর কোল, সাওঁতালেরা এখনও তত সভ্য হয় নাই। যাক্, হাসপাতল ত এখান হইতে অনেক দূরে নহে, আমি এখনই মালীকে পাঠাইয়া সংবাদ আনিতেছি।

পরদিন প্রাতঃকালে তারিণী, ঊষা ও সিদ্দিকা সেই আহত ইংরাজটির সংবাদ লইতে গেলেন। তাঁহার পকেটে কিছু টাকা, নোট-বহি ও কার্ড-কেস পাওয়া গিয়াছে। সিদ্দিকা তাঁহার একখানি কার্ড চাহিয়া লইয়া দেখিলেন। কার্ড-দর্শনে তিনি পুনরায় রোমাঞ্চিত হইলেন, — কার্ডে নাম ও ঠিকানা ছিল, —

"মিস্টার চার্লস জেম্‌স্ রবিনসন,
প্লেন্টার এণ্ড জমিনডার,
চুয়াডাঙ্গা!"

সিদ্দিকা তারিণীর অনুমতি লইয়া হাসপাতালে মিঃ রবিন্‌সনের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় রাত্রিবাস করিতেন না, কেবল সমস্ত দিন থাকিতেন। তাঁহার সহিত পালাক্রমে তারিণী ও অপর মহিলাগণ হাসপাতালে থাকিতেন। একদিন রাফিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মিসিস্ সেন, এবার সিদ্দিকাকে আতুরাশ্রমের ভার দিবেন, রোগীসেবা করিয়া উহার সাধ মিটুক!"

---

* "বেশ্যা"।

তা। কি করি বোন্! 'নেপাল যাও — কপাল সাথেই'! এখানকার হাসপাতালে যত্ন করিবার তেমন লোক নাই। আমি পদ্মরাগের এই মহৎ দয়াধর্মে বাধা দিতে চাহি না।

একদিন পরেই রবিন্সনের জ্ঞান হইল; তাঁহার মস্তকের আঘাত তত গুরুতর ছিল না। বাহু এবং উরুদেশের আঘাতই সাঙ্ঘাতিক ছিল। তিনি আর্তনাদ করিতেছিলেন, "হায় মৃত্যু! মৃত্যু হয় না কেন?"

রেভারেন্ড হেনরী হোয়াইট নামক একজন পাদ্রী রবিন্সনকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। রবিন্সনের যন্ত্রণা, — শারীরিক ক্ষতের জন্য তত নহে, কিন্তু তাঁহার কলুষিত আত্মা পাপ-তাপে দগ্ধ, সেই যন্ত্রণায় তিনি ছট্‌ফট্ করেন। তিনি পাদ্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন, — "যদি আমি মরিতেছি, তবে আমাকে অবশ্য পাপ স্বীকার করিতে হইবে! আহা! আমি মরিতেছি!! ও হোয়াইট! পিতা। আপনি আমার পাপস্বীকার শুনিবেন?"

হোয়াইট তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। রবিন্সন উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। তীব্রস্বরে বলিলেন, — "সত্যই আমি মরিব? আমার মরণ বড় শীঘ্র আসিল — "

সিদ্দিকা এক পাত্র দুধ-ব্রান্ডি আনিয়া রোগীকে খাইতে দিলেন। বরিন্সন বলিলেন, — "নার্স! তুমি জান না, আমি কেমন হৃদয়হীন পাষণ্ড। একবার আমার পাপের বোঝা একটি নিরীহ বালিকার স্কন্ধে দিয়া — তাহাকে মারিয়া, — আমি বাঁচিয়া আছি।"

ছয় দিন হইতে রবিন্সন হাসপাতালে আছেন। তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে; আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই। অপরাহ্নে শ্বেতশ্মশ্রু রেভারেন্ড হোয়াইট আসিলেন। রবিন্সনকে অধীর দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে ঘুমাইতে চেষ্টা করিতে বলিলেন।

রবিন। (উচ্চৈঃস্বরে) আমার ঘুম নাই — আমার শান্তি নাই! হোয়াইট, আপনি জানেন না, আমি কি! আমি রাগে অন্ধ হইয়া নরহত্যা করিয়াছি! — হাঁ, ঐ দেখ, তাহার আত্মা আমাকে ভয় দেখাইতেছে! ও হোয়াইট! আমাকে রক্ষা করুন! —

রোগী এই পর্যন্ত বলিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। ঊষা তাঁহাকে একটু টনিক ঔষধ পান করাইলেন। সিদ্দিকা বাতাস করিতে লাগিলেন!

জ্ঞান হইলে রবিনসন উঠিয়া বসিলেন। বিনীতভাবে পাদ্রীকে বলিলেন, "পিতা, সকলকে বিদায় দিন, কেবল আপনাকে আমার মনের কথা বলিব।" হোয়াইট সকলকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

এখন কেবল পাপী ও পাদ্রী রহিলেন। ইহাদের এই গুণটা বেশ যে, মৃত্যুকালে পাপ স্বীকার করে। ইহাতে পরলোকে মুক্তি হয় কি না, আল্লাহ্ জানেন; কিন্তু আমাদের একটি লাভ এই যে, লোকটার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিতে পারি।

রবিন। আমি চুয়াডাঙ্গায় অনেক দিন নীলের চাষ করিতেছিলাম। কত লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই দরিদ্র লোকদের অভিশাপে আমার এই দশা হইয়াছে। কত শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র নষ্ট করিয়াছি, সংখ্যা নাই। পাপের মাত্রা ক্রমে গুরু হইতে গুরুতর হইয়া চলিল। শেষে স্থানীয় জমীদার মহম্মদ সোলেমানের নিকট ৫০ বিঘা জমী চাহিলাম। তিনি দিলেন না। ভয় প্রদর্শন করিলাম, তিনি ভীত হইলেন না। তিনি অতি মহৎ

লোক ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহী করিতে চেষ্টা করিলাম, তাহাও ব্যর্থ হইল। তখন আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিলাম না — আর সহ্য হইল না —

পাদ্রী। তুমি অত উত্তেজিত হইও না, ধীরে ধীরে কথা কও।

রোগীর মাথাটা ঢলিয়া পড়িল। হোয়াইট আর একটা বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার নীচে দিলেন।

র। আমাকে বাধা দিবেন না, বলিতে দিন, যাহা বলিবার আছে, বলিব। ইচ্ছা হইল, সোলেমানকে ডাকিয়া আনিয়া কুকুরের মত গুলী করি ! তাহা তখন ঘটিল না। সোলেমানকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলাম, তিনিও সমান সমান উত্তর দিলেন। আমাকে 'সাহেব লোক' মনে করিয়া কিছুমাত্র ভয় করিলেন না। ইহা কি আমার সহ্য হয়? কি? — তিনি কি মোগল রাজ্যে বাস করিতেছিলেন যে, তাঁহার এমন নির্ভীক স্বভাব?

আমি সেই রাত্রে দলবল লইয়া গিয়া প্রথমতঃ সোলেমানের গলা কাটিলাম ! তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র আজিজ আমার প্রতি একখানা ছোরা নিক্ষেপ করিল — ছোরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। সেই ছোরা লইয়া তাহাকে হত্যা করিলাম ! ! তাহাকে বধ করা আমার অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু সে কেন পিতার হইয়া যুঝিতে আসিল? কেন আমার প্রতি ছোরা নিক্ষেপ করিল? পিতা ! ঐ দেখুন সোলেমান ! — আমাকে রক্ষা করুন ! রক্ষা —

হোয়াইট। ক্ষান্ত হও, আর ও সব কথা বলিও না। এখন শান্ত হও, ঘুমাইতে চেষ্টা কর।

র। না, এখন আর ভয় নাই, — আমি যাহা বলিতেছিলাম, শুনুন, আমি ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিলাম, একটি বালিকাকণ্ঠ আমাকে ইংরাজী ভাষায় শাসন করিয়া বলিল, — "আমি সব দেখিলাম মিঃ রবিন্‌সন্ ! আপনার নিস্তার নাই !" তখন আর ফিরিয়া গিয়া বালিকার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইল না। আমি বীরের মত দ্রুতপদে চলিয়া আসিলাম।

হোয়াইট। (স্বগতঃ) কি বীরত্বের প্রশংসা !

র। পরদিন হইতে তাহাদের ওখানে ডাকাতির তদন্ত আরম্ভ হইল। সোলেমানের ভগ্নী ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিল। সেই আমাকে তিরস্কার করিয়াছিল। আজিজ আমা-কর্তৃক যে ছোরায় নিহত হইয়াছিল, সে ছোরাখানি জয়নব বিবির, এই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি জয়নবকেই নরহত্যার জন্য আসামী করিতে চেষ্টা করিলাম !

আমার জনৈক বন্ধু ব্যারিস্টার ছিলেন, তাঁহাকে আমার পার্শ্বকার্যে সহায়তা করিবার জন্য ডাকিলাম। ব্যারিস্টার মিঃ লতীফ আল্‌মাস্ আমার অভিসন্ধি অবগত হইয়া খুব উৎসাহের সহিত জয়নবকে আসামী সাজাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি রাত্রিকালে ছদ্মবেশে সোলেমানের বাড়ী গিয়া দেখিলেন, জয়নব চিতা সাজাইয়া মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান আছে ! সে সময় মিঃ আল্‌মাস্ তাহাকে রক্ষা করিলেন। পরদিন তাহার আর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। হয়-ত সে অগাধ জলে ডুবিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছে ! পিতা —

রবিন্‌সন্ হঠাৎ নীরব হইলেন। তিনি ভয়ে কাঁপিতেছিলেন। আবার চীৎকার করিয়া বলিলেন — "পিতা, পিতা ! আমায় রক্ষা করুন ! আপনি কি মনে করেন, আমি মুক্তি পাইব? আহা ! না, — আমার মুক্তি কোথায়? "

হোয়াইট অনেক কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "তুমি নিশ্চয় মুক্তি পাইবে, ঈশ্বর দয়ার সাগর।" রোগী ক্ষীণ করুণ স্বরে বলিলেন, —

"নরহত্যা করিয়া আমার যত পরিতাপ হইতেছে, তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ পরিতাপ জয়নবের জন্য হয়। আমি তাহাকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করিয়াছি। আমি কেন সে নির্দোষ বালিকার প্রতি অত্যাচার করিলাম?"

হোয়াইট। তবে এখন তুমি কি করিতে চাও? কি করিতে পারিলে তোমার মনে সান্ত্বনা হইবে?

র। আমি চাই — জয়নব জীবিত আছে, ভাল আছে, — এই কথা শুনিতে। তাহা হইলে সুখে মরিতে পারি।

হো। তুমি আমাকে যাহা বলিলে, এ সব কথা লিখিয়া দিলে জয়নবের উপকার হইতে পারে। লিখিবে?

র। অবশ্য আমি লিখিব। কাগজ কলম দাও।

লিখিবার সরঞ্জাম আনীত হইলে রবিন্‌সন কম্পিতহস্তে লিখিতে আরম্ভ করিলেন, — লিখিতে না পারিয়া হোয়াইটকে বলিলেন, — "আপনি লিখুন, আমি বলিয়া যাই। পরে আমি স্বাক্ষর করিব।"

তাহাই হইল। সে দিন স্বাক্ষর করা হইল না, কারণ রাত্রি হইয়াছিল। পরদিন দুইজন বিশ্বস্ত উকিল ও ম্যাজিস্ট্রেটকে ডাকাইয়া তাঁহাদের সমক্ষে রবিন্‌সন স্বাক্ষর করিলেন।

অদ্য রবিন্‌সনের অবস্থা বড় শোচনীয়। তাহার মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে, — পাপী হউক, পাষণ্ড হউক, — যেই হউক, সে এখন মরিতেছে! ক্রমশঃ রবিন্‌সনের ব্যস্ততা বৃদ্ধি হইল — তিনি কেবল এ-পাশ ও-পাশ করিতেছেন আর সময় সময় বলিতেছেন — "জয়নব, তুমি কোথায়? তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছি তাহার যথেষ্ট প্রতিফল পাইলাম!" কতক্ষণ পরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে আছ? তোমরা কেহ জয়নবের সংবাদ বলিতে পার? — এ অন্তিমকালে আমাকে শান্তি দিতে পার?"

সি। আপনি যাহা চাহেন, তাহাই পাইবেন। আপনি আরোগ্যলাভ করুন।

র। (বিকট হাস্যে) আরোগ্য লাভ? — আর না। যাহা চাই, তাহাই দিবে? আচ্ছা, জয়নবের সংবাদ দাও দেখি!

সি। শুনুন, আমি নিশ্চয় জানি, জয়নব জীবিত আছে। সুখে নিরাপদে আছে।

র। (পূর্ববৎ হাসিয়া) আহা! পরদুঃখকাতরা বালিকা! তুমি আমাকে ঠকাইবে? অমন মনগড়া দুই চারি কথা কে না বলিতে পারে?

সি। আপনি কি প্রমাণ চাহেন? সে জয়নব রাঁচীতেই আছে।

র। আমি তাহাকে দেখিতে চাহি।

সি। দেখিলে আপনি চিনিবেন? আপনি তাহাকে কখনও দেখিয়াছেন কি?

র। তাহার কথা শুনিয়াছিলাম; কণ্ঠস্বর চিনিব বলিয়া বিশ্বাস হয়।

সি। ইহাও আপনার ভুল। প্রায় তিন বৎসর হইল, একবার তাহার কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা আবার চিনিবেন? তবে চিনিতে পারেন কই?

এবার রোগী বিস্ফারিত–নয়নে সিদ্দিকার মুখপানে চাহিলেন, যেন চিনিতে চেষ্টা করিতেছেন। পরে বলিলেন, "তুমি কিরূপে জান যে তিন বৎসর পূর্বে আমি তাহার কথা শুনিয়াছিলাম?"

সি। জয়নব আমাকে জানাইয়াছে।

র। (সহসা সিদ্দিকার হাত ধরিয়া) এখন বুঝিলাম, — তুমি — তুমি সেই জয়নব! হাঁ বুঝিয়াছি! বল, তুমি নিজ মুখে বল যে, তুমি জয়নব, তবে আমি হাত ছাড়িব!

সি। যদি এই কথার উপর আপনার শান্তি নির্ভর কর, তবে বলি, — আমি সেই অভাগিনী জয়নব!

র। (সিদ্দিকার হাত ছাড়িয়া) আমাকে প্রতারণা করিলে না ত?

সি। আপনার সন্দেহ দূর করিবার জন্য যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন করুন।

র। তবে সত্যই তুমি জয়নব। বল, তুমি কিরূপে পলায়ন করিয়াছিলে? আর এখানে কিরূপে আসিলে?

সি। আমি ভ্রাতার ইংরাজী পোষাক পরিয়া ছদ্মবেশে একখানি শাড়ী ও কয়েক শত টাকা একটা হ্যান্ডব্যাগে লইয়া বাহির হই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের বহির্বাটিতে একটা পাল্কী উপস্থিত ছিল, তাহাতেই আমি স্টেশনে গেলাম। তাড়াতাড়ি যাইয়া ট্রেন পাইলাম। সেই গাড়ীতে নৈহাটীতে আসি। সেখান হইতে হুগলী যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ট্রেন ফেল হওয়ায় সেইখানে রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হই। আমি অন্যমনস্কভাবে পদচারণা করিতে করিতে একটা মসজিদের পার্শ্বে আসিয়া পড়ি। সেই পথে তারিণী বিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষয়িত্রী, — মিসিস্ ঊষারাণী চ্যাটার্জি, মিসিস্ হরিমতি ঘোষ ও মিস্ বিভা চক্রবর্তী যাইতেছিলেন; তাঁহাদিগকে আমার কল্পিতা ভগিনীকে আশ্রয় দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলাম।

হোয়াইট সেই কক্ষের এক কোণে দাঁড়াইয়া রোগী ও সেবিকার কথাবার্তা মনোযোগের সহিত শুনিতেছিলেন। সিদ্দিকাকে থামিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, —"বলিয়া যান, ইতস্ততঃ করিবেন না। রবিন্‌সন্ আর বেশীক্ষণ বাঁচিবেন না।"

সি। তাঁহারা আশ্রয়দানে সম্মতা হইলে আমি সন্ধ্যার ট্রেনে কলিকাতায় গেলাম। ঠিকাগাড়ীতে বসিয়া পুরুষ–বেশ পরিবর্তন করিয়া শাড়ী পরিলাম। এইরূপে আমি তারিণী–ভবনে আসিয়াছি। এতকাল ইঁহারা আমাকে 'সিদ্দিকা' নামে জানিতেন, — আজি আমার প্রকৃত পরিচয় জানিলেন।

সিদ্দিকার গল্প শুনিয়া তারিণী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ যুগপৎ বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইলেন। এখন তাঁহারা বুঝিলেন, কেন তারিণী–ভবনের কোন লোক সিদ্দিকার 'ভাই'কে দেখিতে পায় নাই!

র। জয়নব! তুমি আছ, দেখিলাম। এখন আমি সুখে মরিতে পারি। তুমি কিন্তু আশাতীত ঋণ শোধ করিলে! আমি তোমার অশান্তির কারণ হইয়াছিলাম, তুমি আমার

শান্তির কারণ হইলে, — স্বহস্তে আমার সেবা করিলে ! তুমি ধন্য ! তুমি বীরবালা ! ! আমি তোমাকে এক হাজার টাকা পারিতোষিক দিব।

সি। আমি আপনার এক পয়সাও লইব না। আপনার অন্তিমকালে শুশ্রূষা করিতে পারিলাম, ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। এত দিনে আপনার ঋণ শোধ হইল।

র। (পাদ্রীর প্রতি) পিতা ! হোয়াইট ! এখন আর পার্থিব চিন্তা নাই। পিতা ! নিকটে আসুন ! এখন আমার আর কোন দুঃখ নাই — আর — আমার জন্য প্রার্থনা —

রবিন্‌সন্ আর কথা কহিতে পারিলেন না। শয্যায় এলাইয়া আর উঠিলেন না — সব শেষ হইয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ
সুবর্ণরেখা

তারিণী সদলবলে সুবর্ণরেখা নদীর পুলে বেড়াইতে আসিয়াছেন। অপরাহ্ণ চারিটার সময় সেতুর উপর দিয়া ট্রেন যাইবে, ইঁহারা নীচে থাকিয়া সে দৃশ্য দেখিবেন। পুষ্‌পুষের কুলীরা বলিয়া গেল যে তাহারা সন্ধ্যা ছয়টায় আসিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবে।

সুবর্ণরেখা এ সময় বর্ষাকালের মত খরস্রোতা না হইলেও তাহার স্রোত এখনও যথেষ্ট বেগবতী। নদী গভীর নহে — সমস্ত নদীর জল 'হরে দরে হাঁটু জল' হইবে, কিন্তু স্রোতের বেগ কি ভীষণ ! এ নদী পাহাড়ের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। পাহাড় উচ্চ নহে, বড় বড় শিলাখণ্ড বিশেষ। নদীতল কর্দম ও উপল খণ্ডে পরিপূর্ণ। নদী প্রশস্তও নহে। এই অল্প-পরিসর নদীটুকু কেহ পদব্রজে পার হইতে পারে না বলিয়া ইহার উপর সেতু নির্মিত হইয়াছে। ট্রেনও এই পুলের উপর দিয়া চলে।

তারিণী সেতুর নিম্নে বালির উপর বড় একটা শতরঞ্জি পাতিয়া সকলকে লইয়া বসিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঊষা, কোরেশা ও সিদ্দিকা নদীর জলে নামিলেন। সিদ্দিকা এখন পুর্ব্ববৎ সে গভীর চিন্তামগ্না বিষাদময়ী মূর্ত্তি নহেন। রবিনসনের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার এই শুভ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন তিনি সদানন্দা হাস্যময়ী কিশোরী, — তাঁহার প্রফুল্লতা, হাসির ফোয়ারা ও স্ফূর্ত্তি দেখে কে ! সেতুর অনতিদূরে একখানি বৃহৎ প্রস্তরের উপর বসিলেন। তাঁহার বিলম্বিত চরণযুগলের উপর দিয়া ঊর্মিমালা বহিয়া যাইতে লাগিল। ঊষা ও কোরেশা কিঞ্চিৎ দূরে অপর দুই খণ্ড শিলায় উপবেশন করিলেন।

সায়াহ্ন উপাসনার সময় যৎকালে রাফিয়া ও কোরেশা তারিণীর শতরঞ্জির উপর নামাজ পড়িলেন, সিদ্দিকা সেই শিলাখণ্ডের উপর উপাসনা সমাপ্ত করিলেন। তারিণী সোৎসুকে দেখিতেছিলেন যে, উচ্ছ্বসিত বীচিমালা আসিয়া সিদ্দিকাকে ভিজাইয়া না দেয়। ঊর্মিমালা "ধরি ধরি" করিয়াও সিদ্দিকাকে ধরিতে পারিল না। !

কুলিরা তখনও আসিল না। অদ্য কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি, শশাঙ্ক বিলম্বে উদিত হইবে। এই সব ভাবনায় তারিণী উদ্বিগ্ন হইলেন। সেই সময় দেখেন, কোথা হইতে লতীফ আসিয়া উপস্থিত। তারিণী সহর্ষে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বসিতে বলিলেন। মাত্র চারি পাঁচ দিন হইল, তিনি রাঁচি আসিয়াছেন। পুষ্‌পুষ্‌ আসে নাই শুনিয়া লতীফ বলিলেন, —

"সে জন্য কোন চিন্তা নাই, আপনারা দুইবারে আমার মোটরে যাইবেন। আর একটু বসুন।"

রাফিয়া ও তারিণীর সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর লতীফও জুতা মোজা খুলিয়া জলে নামিলেন। তিনি সিদ্দিকার নিকট গেলেন না ; কারণ কয়েক মাস হইল, সিদ্দিকা তাঁহার চিঠির উত্তরে যে নিষ্ঠুর পত্র লিখিয়াছেন, তাহা লতীফ অদ্যাপি ভুলেন নাই। তিনি ঊষার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দিদি ! ছেলেটিকে (অর্থাৎ কোরেশার তিন বৎসরের পুত্রটিকে) সাবধানে রাখিবে, এ স্রোতের মুখে পড়িলে আর রক্ষা নাই।"

কোরেশা। এখানে আর ডুবিয়া মরিতে হয় না !

ঊ। ডুবিবে না সত্য, কিন্তু জলের স্রোত এমন ভীষণ যে শিলাখণ্ডের উপর আছাড় খাইতে খাইতে মরিতে হইবে।

লতীফ বসিবার জন্য স্বীয় ছড়ির সাহায্যে একখণ্ড সুবিধাজনক প্রস্তরের অনুসন্ধান করিতে করিতে কিরূপে সিদ্দিকার উপবিষ্ট প্রস্তরখণ্ডে আসিয়া বসিলেন, তাহা তিনি বুঝিতেই প্যারেন নাই ! তাঁহারা উভয়ে কল্লোলিনীর মধুর সঙ্গীত শ্রবণে আত্মহারা হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে তাহার নৃত্যশোভা দেখিতেছিলেন। এই সুবর্ণরেখা নদীটি তাঁহাদের নীরব প্রেমের অতি সুন্দর মনোরম উপমা — নদী দিবানিশি অবিশ্রান্ত পাহাড়ের চরণে মাথা ঠুকিয়া মরিতেছে, — আর পাহাড় তাহার তরঙ্গ-প্রেমাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত — চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া শতধা হইতেছে ! এই যে মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদ — বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন — ইহা বড় চমৎকার ! বড় চিত্তহারী ! !

এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কখ্‌ন যে শশী গগনে উদিত হইল, তাহা কেহ জানিতেই পারিলেন না ! কোথা হইতে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আসিয়া সুধাকরকে আচ্ছন্ন করিল। কিছুক্ষণ পরে লতীফ বলিলেন, "এই নদীর মত অনেক বোকা লোকই পাথরে মাথা ঠুকিয়া মরে !"

প্রসন্নবদনা সিদ্দিকা উত্তর দিলেন, "আর পাথর বুঝি চূর্ণ হয় না ?"

ল। কিন্তু সাধারণ প্রস্তর অপেক্ষা পদ্মরাগ একটু বেশী মজবুত —

"সেই জন্যই ত পদ্মরাগ এখনও টিকিয়া আছে !"

লতীফ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, তারিণী ! তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, — তারিণী ওরূপ কথা কেন বলিলেন !

তারিণী হয়ত তাঁহার কথাটিও শুনিয়াছেন, ভাবিয়া সিদ্দিকাও অতিশয় লজ্জিতা হইলেন।

গগনে পূর্ণচন্দ্র সহসা মেঘমুক্ত হইয়া সকলের মুখের উপর খানিকটা উজ্জ্বল চন্দ্রিকা ঢালিয়া দিল। তারিণী সেই সুযোগে লতীফ ও সিদ্দিকার অপ্রতিভ মুখভাব দেখিয়া আমোদ অনুভব করিলেন। অতঃপর বলিলেন, "চল পদ্মরাগ, পুষ্‌পুষ্‌ আসিয়াছে।"

তাঁহারা সকলে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া লতীফ ভাবিলেন, তারিণীর সহিত এ সময় একটিও কথা না বলা অভদ্রতা হইয়াছে। তাই তিনি ত্বরিত পদে জল ছিটাইতে ছিটাইতে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "শুনিলাম, মিসিস সেন আপনারা না কি সেদিন আবার একজন আহত লোক কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন।"

তা। হাঁ মিঃ আলমাস্! ঢেঁকীর আর অন্য কাজ কি আছে?

ল। ঈশানবাবু বলেন, আপনি যেখানেই যান, হাসপাতাল আপনার সঙ্গে যায়।

তা। এবার আমার সঙ্গে হাসপাতাল নাই; সেই আহত ইংরাজটিকে স্থানীয় হাসপাতালে দিয়াছিলাম। আজি চারিদিন হইল বেচারা মারা গিয়াছেন।

ল। আপনারা প্রত্যেহ তাঁহাকে দুই বেলা দেখিতে যাইতেন, এবং আপনার সঙ্গিনীগণ হাসপাতালে গিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন।

তা। আপনি এত সংবাদ কোথায় পাইলেন?

ল। সমস্ত রাঁচিময় এ কথা রাষ্ট্র। ফুলের সৌরভ কি প্রচ্ছন্ন থাকে?

রাফিয়া। (সিদ্দিকার কানে কানে) সেইজন্য দুষ্ট ভ্রমর পদে পদে অনুসরণ করে!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বিশ্ব-প্রেমিকা

বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশের সময় তারিণী-ভবনের বাড়ী মেরামত হইয়াছে। এখন জিনিস-পত্র যথাস্থানে গুছাইয়া রাখা হইতেছে। অদ্য সিদ্দিকা দুইজন পরিচারিকার সাহায্যে পাঠাগারের একটি আলমারীতে পুস্তক সাজাইয়া রাখিতেছেন। বেলা তখন অপরাহ্ণ। তাঁহার মাথার উপর হইতে অঞ্চল সরিয়া পড়িয়াছে, আলুলায়িত অলকগুচ্ছ বৈদ্যুতিক পাখার গরম বাতাসের তাড়নায় বিক্ষিপ্ত হইতেছে; কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি একাগ্রচিত্তে তালিকার সহিত পুস্তকগুলি মিলাইয়া লইতেছেন।

তারিণী বসিবার ঘরে কয়েকজন মহিলা অতিথির অভ্যর্থনায় ব্যস্ত আছেন। এই সময় তাঁহার বালক-ভৃত্য কোন ভদ্রলোকের আগমন সংবাদ দিল। তিনি বালককে বলিলেন, "আফিস কামরা ত বড় অগোছাল রহিয়াছে, ভদ্রলোককে পাঠাগারে বসাও; আমি শীঘ্রই আসিতেছি।"

আদম শরীফ* তদনুসারে অভ্যাগতকে পাঠাগারে লইয়া গেল। তথায় তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনয়নে সিদ্দিকার পুস্তক সাজান দেখিতে লাগিলেন। পরিচারিকাদ্বয় সিদ্দিকাকে সাবধান করিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভদ্রলোকটি তাহাদিগকে ইঙ্গিতে বারণ করিলেন। সিদ্দিকা

---

* বালক-ভৃত্যের নাম "— আদমশরীফ"। গাঞ্জামের (মাদ্রাজের) মুসলমানদের নাম ঐ ধরনের হইয়া থাকে। তত্রত্য জেলেনীদের নাম আরও অদ্ভুত, যথা — 'ডাগুাসী'।

এমন তন্ময় ছিলেন যে, তাহাদের মৃদু হাস্য এবং চক্ষুর ইঙ্গিত দেখিতে পান নাই। অবশেষে আগন্তুক বলিলেন, —

"সিদ্দিকা, এখন তুমি যোগ শিক্ষা করিতেছ না কি ? বড় যে গম্ভীর ভাব দেখি !"

সিদ্দিকা চমকিয়া উঠিয়া এবং ত্রস্তভাবে বস্ত্রাঞ্চল সম্বরণ করিয়া, "এ কি আপনি এখানে ! — বসুন !" বলিয়া আবার পুস্তকসজ্জায় মনোনিবেশ করিলেন।

লতীফ। অতিথির অভ্যর্থনা এই রূপেই হয় নাকি ?

সিদ্দিকা। (নম্রস্বরে) ক্ষমা করিবেন, আমার কাজ শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আর আপনি ত আমার অতিথি নহেন !

লতীফ এখন সিদ্দিকার প্রকৃত পরিচয় অবগত আছেন। এই সিদ্দিকা — যাঁহাকে তিনি প্রাণতুল্য ভালবাসেন — তাঁহার সেই ধর্মপত্নী জয়নব। সেই জন্য অদ্য তিনি একটু জোর করিয়া সিদ্দিকার সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইলেন। সিদ্দিকা অগত্যা তাঁহার সহিত "তুমি" সম্বোধনে কথাবার্তা বলিতে সম্মতা হইলেন। এই যৎসামান্য জয়লাভের পর লতীফ বলিলেন, —

"প্রায় আট মাস পরে দেখা হইল, তবু ত তুমি যথোপযুক্ত আগ্রহের সহিত আমায় স্বাগত সম্ভাষণ করিলে না !"

সি। তুমি এতটা আশা করিলে কেন ? তুমিই ত একমাত্র স্নেহভাজন বা চিন্তার বিষয় নহ। যাহার হৃদয়ে কেবল একজনের স্থান থাকে, সে তাহাকে ষোল আনা যত্ন দিতে পারে ; যাহার চারিজন বন্ধু থাকে, সে প্রত্যেককে চারি আনা দিবে। এইরূপ যাহার প্রেমে যত বেশী অংশী থাকে, তাহার প্রেমের ভাগ প্রত্যেকের জন্য ততই কম হইয়া পড়ে ! হৃদয়টি সীমাবদ্ধ , তাহার পরিমাণ বাড়িতে পারে না। তুমি এ বিশ্ব–প্রেমিকার নিকট এক পয়সা, — না, — এক পাই পরিমিত স্নেহের অধিক আশা করিতে পার না। কত 'পথে কুড়ান' লোকের কথা আমাকে ভাবিতে হয় !

ল। আমি এখন তোমার সেরূপ 'পথে কুড়ান লোকের' তালিকায় নহি। তুমি যাহা বলিলে, তাহা অপরের পক্ষে খাটে — আমার সম্বন্ধে নহে। আমি তোমার নিকট — ষোল আনা না হউক, — একটু অধিক যত্নের আশা করি, — না, দাবী করি ; আর তোমার বক্তৃতার উত্তরে বলি, হৃদয় সীমাবদ্ধ হইবে কেন ? বিশেষতঃ বিশ্ব–প্রেমিকার হৃদয় সীমাবদ্ধ হইলে বিশ্ব স্থান পাইবে কোথায় ?

সি। যে স্থান আছে, তাহাতেই থাকিবে। যেখানে — যে ঘরে — পাঁচটি কামরায় দশ জন থাকিত, সেই পাঁচ ঘরে পাঁচশত জনও থাকিবে। এই জন্য স্থান অবশ্য কম হইবে, এবং যত্নের ভাগে টানাটানি পড়িবে।

ল। তর্ক করিতে ইচ্ছুক ছিলে বটে, কিন্তু পারিলে না ! না, হৃদয় সীমাবদ্ধ নহে। উহা অনলের মত, যত বাতি জ্বালাও — সমভাবে জ্বলিবে। যত পতঙ্গ পোড়াইতে পার — পুড়িবে !

সি। (স্মিতমুখে) দগ্ধ পতঙ্গের প্রতি দয়া হয় বটে ; কিন্তু ইহাও বলি, পতঙ্গের কি কোন দোষ নাই ?

ল। দোষ আছে বই কি ! সর্বাপেক্ষা প্রধান দোষ এই যে, সে সৌন্দর্যভিখারী — প্রেমের ভিখারী। সুতরাং ভিক্ষুকের লাঞ্ছনাই তাহার উপযুক্ত প্রাপ্য। সেইজন্যে সে প্রাণদানে প্রায়শ্চিত্ত করে !

সি। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু উপায় কি —

বুলবুলে দিলেন প্রভু সুমধুর স্বর ,
পতঙ্গের ভাগ্য হ'ল পুড়িয়া মরণ ;
দিলেন আমার ভাগে শোক-নিপীড়ন;
দেখিলেন, — সব হ'তে যাহা কষ্টকর !*

ল। আর আমার ভাগে দিয়াছেন, মরীচিকার অনুসরণ করা !

সি। যদি জানই "মরীচিকা," তবে বৃথা অনুসরণ কেন? তোমার জীবনে কি অন্য কাজ নাই?

ল। মানুষের মন যদি সুবোধ বালকের মত যুক্তি-তর্কের বশীভূত হইত তবে এ পাপ পৃথিবী হইতে অর্ধেক যন্ত্রনা ঘুচিয়া যাইত। যাহা হউক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এখন আমার সিদ্দিকা-লাভে কোন অন্তরায় নাই।

সি। আবার বৃথা আশা ! তা তুমি বাতাসে ঘর বাঁধিতেছ — বাঁধ। যত উচ্চ দ্বিতল ত্রিতল প্রাসাদ নির্মাণ করিতে চাও — কর !

ল। আর তোমার ইচ্ছা হইলে আমার অতি সাধের অট্টালিকা পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিও !

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ
সন্ধির চেষ্টা

"শুন পদ্মরাগ, আমি ত তোমার সহিত কৌতুক পরিহাস করি না, অতি গম্ভীরভাবে বলিতেছি, তুমি সন্ধি করিয়া লও।"

তারিণীর বসিবার ঘরে ঊষা, সিদ্দিকা ও সৌদামিনী গল্প করিতেছিলেন। রবিবার — অবসরের দিন, সুতরাং তাঁহারা খোশগল্প করিতেছিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে তারিণী "মুসলমান" নামক দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র দেখিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে ইঁহাদের গল্পে যোগদান করিতেছিলেন। উপরোক্ত কথাগুলি তিনিই বলিলেন।

সিদ্দিকা। এ ক্ষেত্রে ত যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই, তবে আর 'সন্ধি' কিসের, বড় দিদি?

---

* "বুলবুল কো দিয়া নালা — পরওয়ানে কো জ্বল্‌না,
গম ; — হাম কো দিয়া, — সব সে যো মুস্কিল নজর আয়া !"

তারিণী। পূর্ব্বে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল — তোমার বিবাহ, বরপক্ষের দুর্ব্যবহার, তুমি সে সব সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাও। এখন একটি নূতন মানুষ মিঃ লতীফ আলমাসকে বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন কর।

সি। নূতন পুরাতন সব একাকার হইয়া গিয়াছে ; 'সংসারধর্ম্মী আমার জন্য নহে'। সেই যে সম্পত্তি লিখিয়া না পাওয়ার জন্য 'পদাঘাতে বিতাড়িত' হইয়াছিলাম, সে অবমাননা কি করিয়া ভুলিব ? তাঁহারা আমার সম্পত্তি চাহিয়াছিলেন, — আমাকে চাহেন নাই ! আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন ? আমি সমাজকে দেখাইতে চাই যে, 'সুযোগ জীবনে একবার ছাড়া দুইবার পাওয়া যায় না ; — তোমরা পদাঘাত করিবে আর আমরা তোমাদের পদলেহন করিব, সে দিন আর নাই।* আমি আজীবন তারিণী-ভবনের সেবা করিয়া নারী-জাতির কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ-প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব।

তা। না, না, না ! তারিণী-ভবন এত বড় মহামূল্য জীবনের 'বলি' পাইবার উপযুক্ত নহে। সে রাক্ষসী নহে !

সৌদামিনী। তুমি বরং সংসারী হইয়া তারিণী-ভবনের সেবা অধিক পরিমাণে করিতে পারিবে। এই ত তারিণী-বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রীগণ, — শাহিদা, রেজিয়া, বানু, তরঙ্গিনী, জ্ঞানদা — ইঁহারা পূর্ণমাত্রায় তারিণী-ভবনের সেবা করিতেছেন। পরন্তু ইঁহারা সকলেই স্বামীপুত্র লইয়া পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন কেবল বানুর শাশুড়ীটা একটু খিট্‌খিটে মেজাজের লোক, কিন্তু বানুর স্বামী একটি রত্নবিশেষ। আমরা তোমার দ্বারা মিঃ আল্‌মাস্-রূপ রত্নের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশা করি।

তা। হাঁ, আমরা তাহাই পরম লাভ জ্ঞান করিব। আমাদের কথা রাখ, পদ্মরাগ !

সি। বড় দুঃখের বিষয়, বড় দিদি ! আপনিও ঐ কথা বলেন ? আমি যদি উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকট ধরা দিই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা ঠাকুমাগণ উদীয়মানা তেজস্বিনী রমণীদের বলিবেন, "আর রাখ তোমার পণ ও তেজ — ঐ দেখ না, এতখানি বিড়ম্বনার পরে জয়নব আবার স্বামী-সেবাই জীবনের সার করিয়াছিল।" আর পুরুষ-সমাজ সগর্বে বলিবেন, "নারী যতই উচ্চশিক্ষিতা, উন্নতমনা, তেজস্বিনী, মহীয়সী, গরীয়সী হউক না কেন, — ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমাদের পদতলে পড়িবেই পড়িবে !" আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী-জন্মের চরম লক্ষ্য নহে ; সংসার ধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে। পক্ষান্তরে আমার এই আত্মত্যাগ ভবিষ্যতে নারীজাতির কল্যাণের কারণ হইবে বলিয়া আশা করি।

তারিণী আসন ত্যাগ করিয়া আসিয়া সিদ্দিকার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, ধন্য মেয়ে ! ভবিষ্যৎ নারীজাতির কল্যাণের নিমিত্ত এইরূপ আত্মোৎসর্গেরই প্রয়োজন ! বাঞ্ছনীয় বিষয় যত মূল্যবান, তাহার জন্য উৎসর্গও ততই মহার্ঘ হওয়া চাই ! অবশ্য ঈশ্বর অন্ধ ও বধির নহেন, — সকিনার জীবনপাত, জয়নবের আত্ম-বলিদান কখনও বিফল হইবে না। ভারত

---

* "মতিচূর" ২য় খণ্ডের "নারীসৃষ্টি" গল্পের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

মাতা! কে বলে তুই দীনা কাঙ্গালিনী? তোর এ হেন দুহিতারত্ন থাকিতে তুই কিসের ভিখারিনী?”

ঊষা। এই যে ‘পতি পরম গুরু’ — এই ভাবটাই মারাত্মক! পুরুষ যাহাই করুন না কেন, — অবলা সরলার জন্য ‘পতি পরম গুরু পতি বিনে নাই গতি’। কেন বাপু? এত বড় বিশাল ধরনী কি তোমাদেরই একচেটিয়া বাসস্থান?

সৌ। সিদ্দিকার এই মহান্ আত্মত্যাগের ফলে মুসলমান পুরুষগণ ভবিষ্যতে কোন ‘আক্‌দ’ করা মেয়েকে উপেক্ষা-রূপ পদাঘাত করিবার পূর্বে অন্ততঃ একটু ইতস্ততঃ করিবে! আর বিবাহ যেন সম্পত্তি ও অলঙ্কারের জন্য না হয়। কন্যা পণ্যদ্রব্য নহে যে, তাহার সঙ্গে মোটর গাড়ী ও তেতালা বাড়ী ‘ফাউ’ দিতে হইবে! বেশ বোন্ পদ্মরাগ, —

তবে এই অশ্রুধারা
প্লাবিত করিবে ধরা,
সাহারা উর্বরা করি’ ফলাবে সুফল!

সি। আমি তারিণী-ভবনেরও বদনাম করিব না যে ‘যত লক্ষ্মীছাড়ীর দল ঐখানে গিয়া জুটিয়াছে।’ আমি চুয়াডাঙ্গায় ফিরিয়া যাইব। আমার অষ্টমবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র যতদিন ‘সাবালক’ না হয়, ততদিন তাহার এবং জমীদারি তত্ত্বাবধান করিব; আর সেই সঙ্গে পতিত মুসলমান-সমাজের ললনাবৃন্দকে জাগ্রত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

সৌ। কিন্তু মিঃ আল্‌মাস্ তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। তাঁহার জীবনটা অভিশপ্ত করিবে?

সি। তা আর কি করা যায়? (অতি নিম্নস্বরে) — না হয় প্রতিদানে আমিও তাঁহাকে ভালবাসিব।

সেই সময় আদম শরীফ আসিয়া লতীফের আগমন-সংবাদ দিল। তারিণী হাসিয়া বলিলেন, “মিঃ আল্‌মাস্ আসিয়াছেন; এখন তোমরা সম্মুখ-যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা কর!”

ঊ। কি বল পদ্মরাগ, সম্মুখীন হইতে পারিবে?

সি। সম্মুখ-সমরে সিদ্দিকা পরাঙ্মুখ নহে।

তা। (ভৃত্যের প্রতি) সাহেব কো সালাম দোও।

সৌ। আমি মিঃ আল্‌মাসের পক্ষাবলম্বন করিব।

ঊ। আমিও তাঁহার সমর্থন করিব!

তা। তাহা হইলে বেচারী পদ্মরাগ যে একেবারে একেলা হইবে।

সৌ। তুমি উঁহার পক্ষে থাকিও।

তা। আমি কোন পক্ষেই থাকিতে পারি না — আমি নিরপেক্ষ।

ঊ। তবে অদ্য পদ্মরাগের অনল-পরীক্ষা!

সি। ‘তামাম্ জাহান যদি হয় এক দিকে,
কি করিতে পারে তার আল্লাহ্ যদি থাকে!’

লতীফ আসিয়া পড়িলেন। যথাবিধি নমস্কার, প্রতি–নমস্কারের পর এদিক্–ওদিক্‌কার দুই চারি কথা বলিয়া তারিণী কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন। লতীফও এই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি ঊষাকে বলিলেন, —

"দিদি ! শুনিয়াছি মিঃ রবিন্‌সনের মৃত্যুকালে তথায় জয়নব উপস্থিত ছিলেন ; পরে তিনি কোথায় গিয়াছেন, বল ত।"

ঊ। জয়নব বিবির সন্ধান আমি কি জানি ?

ল। ছি দিদি ! 'পথে কুড়ান' ভাইকে কি ছলনা কর্ত্তে আছে ?

ঊ। সেই জন্য বাস্তবিক ছোট ভাইয়ের মত কথায় কথায় আব্দার কর ! এখন তোমার বায়না কোথাকার জয়নব বিবির সন্ধান বলিতে হইবে !

ল। বড় ভগিনীর মত আদর কর বলিয়া 'আদুরে' হইয়াছি। লক্ষ্মী দিদিটি আমার ! এখন আমার আব্দার রক্ষা কর।

সৌ। কিন্তু সে জয়নব বিবির জন্য তোমার এত মাথা ব্যথা কেন ?

ল। যেহেতু তিনি আমার বিবাহিতা পত্নী।

সি। ওঃ ! সেই জন্যই তাঁহার খোঁজ রাখেন না !

সৌ। দেখ বোন, সত্য কথা শ্রুতিকটু হইলেও আমি একটা সত্য কথা বলিব। উনি এখন তোমারই খোঁজে ব্যস্ত আছেন, তাই ধর্মপত্নীর সংবাদ রাখেন না !

একথা শুনিয়া লতীফ লজ্জিত হইলেন ; সিদ্দিকার বদনমণ্ডলও পদ্মরাগবৎ আরক্ত হইল। লতীফ বলিলেন, —

"দিদি ! আর অনুযোগ করিও না, এখন খোঁজ লইতেই আসিয়াছি।"

সৌ। 'খোঁজ লইতে আসা' — তা চুয়াডাঙ্গায় না গিয়া এখানে কেন ?

ল। তিনি এখন চুয়াডাঙ্গার বাহিরে।

ঊ। আর তারিণী–বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে !

ল। (সিদ্দিকার দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া) ঠিক তারিণী–বিদ্যালয়ের না হউক, তারিণী–কর্মালয়ের অভ্যন্তরে বটেন।

সৌ। (উচ্চহাস্যে) এ অপবাদ মন্দ নহে — যত লোকের বউ হারাইবে, তাহারা তারিণী–ভবনে খানাতল্লাসী করিতে আসিবে ! আমরা কি লোকের বউ–ঝি–চোর ?

ল। আমাকে জোনাব আলী নানা বলিয়াছেন — "তারিণী–ভবনে গফুরের স্ত্রী (সকিনা খানম) আছেন, মুজফ্‌ফরের স্ত্রী (রাফিয়া বেগম) আছেন ; দেখ গিয়া — তোমারটিও সেইখানে আছেন।"

ঊ। তাহা হইলে একবার সদলবলে তারিণী–ভবন আক্রমণ করিয়া দেখ !

ল। তোমরা ধর্মতঃ বল দেখি, জয়নব এখানে নাই কি ?

সৌ। এখানে মাত্র কয়েকটি মুসলমান মহিলা আছেন, যথা – কোরেশাবি, জা'ফরী —

ল। আহা ! তাঁহাদের পরিচয় ত সকলেরই জানা আছে। এখানে অজ্ঞাতকূলশীলা কেবল সিদ্দিকা। লোকে উকিল ব্যারিস্টারদের বদনাম করে যে, তাহারা নাকি সত্যকে মিথ্যা — কালোকে সাদা বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পায় —

উ। বদনাম কেন দাদা, অতি সত্য কথা ; — এই ত এখনই তুমি সিদ্দিকাকে জয়নব বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছ !

ল। আর তোমরা সমভাবে তাহার বিপক্ষতা করিতেছ ! যাহা হউক, সিদ্দিকা আমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ অস্বীকার করেন ? তাহা যে দিবাকরের ন্যায় সত্য ঘটনা।

উ। আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। জয়নবের সহিত তোমার বিবাহ ব্যাপার ত তোমার পিতৃব্যের ইচ্ছায় হইয়াছিল — আবার তাঁহারই ইচ্ছায় পণ্ড হইয়াছিল ; তাহাতে তোমার নিজের কোন মতামত ছিল না। তবে আর এ বিষয় লইয়া এখন তুমি মাথা ঘামাও কেন ?

ল। আমাদের বিবাহ ত পণ্ড হয় নাই — তাহা পণ্ড করাও অপরের ক্ষমতার বাহিরে।

উ। কিন্তু তোমার পিতৃব্যই ত সর্বেসর্বা ছিলেন — তাঁহার সম্মুখে তুমি একটা সাক্ষীগোপাল মাত্র। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমার দ্বারাই বিবাহ ভঙ্গ করাইয়া দিতেন।

ল। পিতৃব্য কি করিতেন, না করিতেন, সে কথা লইয়া এখন তর্ক করা বৃথা। ফল কথা, আমাদের বিবাহ অটুট রহিয়াছে।

সি। ঊষা–দি' ! আমি বলি, তুমি হাতের চুড়িটা ভাঙ্গিবার জন্য দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছ, পদদলিত করিয়াছ, — কিন্তু যদি পরমায়ু–বলে চুড়িটা না ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে আর তাহাকে কুড়াইয়া লইতে চেষ্টা কেন ?

ল। ইহা তোমার ভুল — চুড়ি ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় নাই, দুর্ঘটনা বশতঃ হস্তস্খলিত হইয়াছিল ; কিন্তু ঊষা দিদির ভাগ্যবলে ভাঙ্গে নাই। এখন তিনি পরম আগ্রহের সহিত উহাকে তুলিয়া লইবেন — ইহাই স্বাভাবিক।

সৌদামিনী সিদ্দিকার মুখের প্রতি চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে কোন ভাবান্তর দেখিতে পাইলেন না। তখন মৃদুস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "আশাকরি, তোমার আর কোন উত্তর নাই ; সুতরাং 'মৌনং সম্মতি' —"

সি। আইনজ্ঞের সহিত বৃথা তর্কে নষ্ট করিবার মত সময় আমার নাই — আমি চলিলাম।

ল। 'চলিলাম' কি ? — হয় তুমি বিবাহ অস্বীকার কর, নয় ধরা দাও !

সি। (স্মিতমুখে) 'ধরা' কি কেহ স্বেচ্ছায় দেয় ?

সৌ। তাই–ত ধরিতে পারিলে 'তোমার !' তা ভাই, তুমি আদালতের শরণ লও না কেন ? আইন ত চিরদিন তোমাদেরই অনুকূলে।

ল। তাহাতে লাভ কি ? আদালতের কৃপায় না হয় সিদ্দিকার উপর দখল পাইলাম, তাহাতে ত তাঁহাকে পাওয়া হইল না। আমি চাই সিদ্দিকার আভ্যন্তরীণ মানুষটিকে।

উ। সিদ্দিকার ভিতরের মানুষটিকে আজি পর্যন্ত জয় করিতে পারিলে না, তবে আর কি করিলে ভাই ?

ল। কি জান দিদি ! দৈব ঘটনাবলী কতকটা আমাদের বৃটিশ বিচারের মত — রামের পাপের জন্য শ্যামকে ভুগিতে হইবে, আর শ্যামের পুণ্যফল ভোগ করিবে কানাই ! আমি যে ভুগিতেছি, ইহা আমার স্বকৃত দোষের জন্য নহে।

সি। মানুষের নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাই সব চেয়ে বড় জিনিস নহে। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সম্মুখে নিজের ইচ্ছা এবং স্বার্থকে অনেক সময়ে বলি দিতে হয়।

ল। খোদাতা'লা তোমার মঙ্গল করুন — তোমার মুখে একথা শুনিয়া পরম সুখী হইলাম। এখন তুমি বুঝিয়াছ যে, হামিদের মাতার সহিত বিবাহ — আমার ইচ্ছাকৃত ছিল না। আর তোমাকে উপেক্ষাও আমি করি নাই। আমি তোমাকে পাইবার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলাম ; দুর্ভাগ্যবশতঃ সুযোগের সহিত দুর্যোগও আসিল।

সৌ। সে কিরূপ?

ল। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর আমি যখন দুলাভাইকে অর্থাৎ সোলেমান সাহেবকে পত্র লিখিতে বসিলাম, সেই সময় তাঁহার পত্র আগে পাইলাম। তিনি জয়নবকে 'তালাক' দিতে লিখিয়াছিলেন। আমি যতই শান্তির কথা লিখি, তিনি ততই রাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বুবুও (তাঁহার স্ত্রী) কেবল দীর্ঘ পত্র লিখিয়া গালি দিতেছিলেন। দুলাভাই লিখিলেন যে, তাঁহার ভগ্নীরও ইচ্ছা 'তালাক' পাওয়া। আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে, আমাকে অনুমতি দিলে আমি স্বয়ং জয়নব বিবির সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়া এ বিষয়ে মীমাংসা করিব। তিনি অনুমতি দিলেন, আমি জয়নবকে পত্র লিখিলাম। তিনি উত্তর দিলেন যে; এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কিছু বক্তব্য নাই ; তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার কৃত নিষ্পত্তিই তাঁহার শিরোধার্য। আমি বড় ফাঁফরে পড়িলাম ; — এদিকে দুলাভাই তরবারিহস্তে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিতে প্রস্তুত ; ওদিকে জয়নব বলেন, তাহাই তাঁহার শিরোধার্য ! শেষে জোনাবআলী নানাকে চুয়াডাঙ্গায় পাঠাইলাম। তিনি প্রায় দুইমাস ধন্না দিয়া দুলাভাইকে অনেক বুঝাইয়া সন্ধিতে সম্মত করাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি যখন সম্মত হইলেন, সেই সময় পাজী রবিন্‌সন্‌ তাঁহাকে ও আজিজ্‌কে (তাঁহার পুত্র) হত্যা করিল ! ! তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা আমি সেদিন মুঙ্গেরে তোমাদিগকে 'বীরবালা' গল্পে শুনাইয়াছি।

উ। চুয়াডাঙ্গার জয়নবকে উদ্ধার করিতে গিয়াও ত তোমার 'বোকা টিকটিকির' দশা হইয়াছিল। তুমি সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া পাল্কী লইয়া গেলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে বলিয়া ; এদিকে জয়নব তোমারই আনীত পাল্কীতে পলায়ন করিলেন !

ল। তাই ত, সে সব ঘটনার জন্য কি আমিই দায়ী?

উ। ভাই, আমি তোমাদের বিবাহ-পদ্ধতি বুঝি না, — তুমি রহিলে রসুলপুরে পাত্রী রইলেন চুয়াডাঙ্গায় — অথচ উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল ; বিবাহ যদি হইল তবু বরক'নের শুভ-দৃষ্টি বাকী রহিল !

ল। আর 'শুভ-দৃষ্টি' যদি হইল, তবু মিলন বাকী রহিল !

সৌ। তোমাদের 'শুভ-দৃষ্টি' আবার কবে হইল?

ল। কারসিয়ঙ্গে। — যে দিন আমি সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রথম চক্ষু খুলিলাম, সেদিন ইঁহাকেই দেখিলাম।

সৌ। সে দেখা ধর্তব্য নহে — 'শুভ-দৃষ্টি'র দৃষ্টিতে তুমি কোন্ দিন সিদ্দিকাকে দেখিয়াছ, তাহাই বল!

লতীফ হাসিলেন, কিছু বলিলেন না।

সৌ! তোমার ভগ্নীপতির হত্যাকারীকে ধরিবার কোন চেষ্টা হইল না? মিঃ রবিন্‌সন্ নির্বিঘ্নে বিচরণ করিতে লাগিলেন?

ল। চেষ্টা হয় নাই — কে বলে? 'সাহেবলোক'কে ধরা ত সহজ ব্যাপার নহে। বুবুকে রসুলপুরে রাখিয়া আমি পুনরায় চুয়াডাঙ্গায় গিয়া রবিনসনের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের যোগাড় করিতে লাগিলাম। তখন চুয়াডাঙ্গার বাতাস বড় দূষিত ছিল — কেহই রবিনসনের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহস করিল না। যাহা হউক, বহু কষ্টে প্রায় তিন বৎসর পরে যখন তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করাইলাম, তাহার পূর্ব্বদিন তিনি রাঁচি যাত্রা করিলেন। আবার রাঁচিতে যেদিন ওয়ারেন্ট পৌঁছিল, রবিন্‌সন্ তখন মৃত্যুশয্যায়।

সৌ। তারপর তোমার সিদ্দিকা – সমস্যার কি হইল?

ল। তিনি বোধ হয় রাফিয়া বেগম, সকিনা খানম প্রভৃতির অভিশপ্ত বিবাহ-জীবনের কাহিনী শুনিয়া সংসারধর্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের কাহিনী অত্যন্ত করুণ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি এ জগতে কেহ বিবাহ করিবে না?

উ। তাই ত হিন্দুসমাজে বাল-বিধবার সংখ্যা অল্প নহে, তবু ত বালিকাদের বিবাহ হইতেছে। স্বয়ং রাফিয়াবু'র কন্যাদ্বয়েরও বিবাহ হইয়াছে।

সৌ। তোমার কি বক্তব্য, পদ্মরাগ?

সি। অভিশপ্ত বিবাহ-জীবনের কাহিনী শ্রবণের বহুপূর্বে আমি যেদিন চুয়াডাঙ্গা ত্যাগ করিতে বাধ্য হই, সেই দিনই জীবনের গন্তব্য পথ ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম। এমন কি, যে দিন ভাইজান নিহত হইলেন, সেই দিনই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যে, আমার সংসারধর্ম্ম-পালন খোদাতালার অভিপ্রেত নহে।

ল। আমি ইহাই তোমার শেষ উত্তর বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নহি। তোমাকে পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য আরও একটু সময় দিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিযোগ থাকে ত তাহাও বল। আমার ত একমাত্র অপরাধ — হামিদের মাতাকে বিবাহ করা।

সি। ব্যক্তিগতভাবে তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। তুমি যে গুরুজনের আদেশ পালনের নিমিত্ত নিজের ইচ্ছা ও সুখ বলিদান দিয়াছিলে, সে জন্য আমি তোকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। আর হামিদের মাতাও এখন জীবিত নাই, সুতরাং সে কথায় আর প্রয়োজন কি? আল্লাহ্ জানেন, আমার মনে কোন বিদ্বেষভাব নাই।

উ। তাহা হইলে তোমরা উভয়ে 'করমর্দন করিয়া বন্ধু হও'।

ল। সিদ্দিকা, স্পষ্ট বল, তুমি আমার গৃহিণী হইবে কিনা?

সি। না। তুমি তোমার পথ দেখ, আমি আমার পথ দেখি।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদায়

বেলা প্রায় ৪টা, সিদ্দিকা আপন মনে ট্রাঙ্কে জিনিসপত্র গুছাইতেছেন। আগামীকল্য প্রত্যূষে তাঁহাকে দেশে যাইতে হইবে। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। তিনি রাফিয়ার কন্যা গওহর বেগমের বাসায় অতিথি হইয়াছেন। সিদ্দিকা একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; বাকী আছেন কেবল তারিণী। আশ্রমবাসিনী ভগিনীগণ তাঁহাকে স্ব স্ব স্মৃতি চিহ্ন উপহার দিয়াছেন এবং তাঁহাকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সিদ্দিকার নয়নপল্লব তখনও আর্দ্র ছিল, এমন সময় কে দ্বারে করাঘাত করিল। "আসুন!" বলিয়া সিদ্দিকা চাহিয়া দেখিলেন, তারিণীর সহিত তাঁহার ভ্রাতৃজায়া রশীদা ও ঊষা আসিয়াছেন।

রশীদা। (সিদ্দিকার মস্তকে হস্তাবমর্শন করিয়া) দেখি তোমার মাথায় জটা আছে না কি?

তারিণী। আপনি একেবারে জটাধারিণী চাহেন?

র। আমি ইদানিং জয়নুর বিষয় যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে তাহাকে জটাজুটধারিণী সন্ন্যাসিনী বলিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছিল। জয়নু, তোমার জিনিসপত্র ঠিক হইয়াছে কি? গাড়ী আনিতে বলি?

সি। আপনি আর একটু বসুন; চারিদিকে বেড়াইয়া তারিণী-ভবন ভাল করিয়া দেখুন।

র। আমি দুই ঘণ্টা ধরিয়া খুব 'সয়ের' করিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে মিসিস্ সেনকেও হয়রান করিয়াছি।

তা। আমাদের হাঁটিবার অভ্যাস আছে; আপনিই ক্লান্ত হইয়াছেন।

র। তবে এখন চল জয়নু।

সি। আমি আগামীকল্য প্রাতঃকালে যথাসময়ে আপনার ওখানে হাজির হইব, এখন আমি আপনার সঙ্গে যাইতে পারিব না।

র। অত ভোরে আবার কে তোমাকে লইতে আসিবে?

তা। কাহাকেও আসিতে হইবে না, আমরা সিদ্দিকাকে পৌঁছাইয়া দিব। ভালু আয়া আপনাদের বাসা চিনে, সে এবং ঈশানবাবু সঙ্গে যাইবেন।

ঊষা। আমিও যাইব। একেবারে স্টেশন পর্যন্ত গিয়া আপনাদের ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিব।

র। (সিদ্দিকার প্রতি) তুমি যে বিয়ের ক'নের মত কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছ! মিসিস্ সেন, আপনারা স্নেহ-মমতার ডোরে জয়নুকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন, সে আর আপনাদের ছাড়িয়া যাইতে চাহে না।

তা। এরূপ মনে করা আপনার সৌজন্য। পক্ষান্তরে সিদ্দিকাই আমাদের সকলকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন —

উ। এবং বাঁধিয়া রাখিয়া এখন ছাড়িয়া চলিয়াছেন !

রশীদা প্রস্থান করিলে পর অবশিষ্ট কার্য সমাধা করিয়া সিদ্দিকা তারিণীর নিকট বিদায় গ্রহণের নিমিত্ত গেলেন। ভক্তি ও আবেগ ভরে তারিণীর পদচুম্বন করিয়া সিদ্দিকা কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল — কিছুই বলিতে পারিলেন না।

তারিণী তাঁহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তোমরা যাওয়ায় আমি তত দুঃখিত নহি ; কারণ আজি যাইতেছ, দুই মাস কি ছয় মাস পরে আবার আসিবে। তুমি যে সমাজের সমূহ কল্যাণের নিমিত্ত দাম্পত্য জীবন জলাঞ্জলি দিলে, ইহাতেই আমার অধিক দুঃখ হইতেছে। কৃতঘ্ন সমাজ তোমার এ অমূল্য দানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবে না। সমাজ সেবা করিতে গেলে আজীবন অভিসম্পাত কুড়াইতে হইবে। এখনও সময় আছে — ঘরে ফিরিয়া যাও পদ্মরাগ !"

সি। না বড়দিদি ! আর ফিরিবার উপায় নাই। সেদিন তাঁহাকে স্পষ্টই বলিয়াছি — "তুমি তোমার পথ দেখ।"

তা। তবে আশীর্বাদ করি, তোমার এ আত্মত্যাগের ফলে তোমার সাধু উদ্দেশ্য সফল হউক, — তুমি চিরসুখী হও। অতঃপর তারিণী বাষ্পাকুল লোচনে পুনরায় সিদ্দিকার ললাট চুম্বন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

সিদ্দিকা "বিদায়-পর্ব" সমাধা করিয়াছেন বটে, কিন্তু একজনের নিকট বিদায়গ্রহণ তখনও বাকী। জীবনে আবার তাঁহাকে কখনও দেখিতে পাইবেন কি না, কে জানে? চুয়াডাঙ্গায় গিয়া আবার আপাততঃ সিদ্দিকাকে সামাজিক অবরোধ প্রথার বন্দিনী হইতে হইবে, সুতরাং লতীফ সেখানে গেলে দেখা হইবে না। যদি দৈবাৎ অদ্য লতীফ এখানে আসিতেন, তবে শেষ দেখা — জন্মশোধ শেষ দেখা দেখিয়া লওয়া হইত। ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে সিদ্দিকা বসিবার ঘরে গেলেন। সে কক্ষটি তাঁহার স্বহস্তসজ্জিত — তারিণী তাঁহারই হাতে ইহার সজ্জাভার দিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিলেন না। নিভৃত চিন্তার অনুকূল বলিয়া এই নির্জন অন্ধকার কক্ষই তাঁহার নিকট বাঞ্ছনীয় বোধ হইল। তাঁহার স্মরণ হইল, ৪/৫ মাস পূর্বে এই কক্ষে তিনি লতীফকে "তুমি তোমার পথ দেখ" বলিয়া বিদায় দিয়াছেন। তদবধি আর লতীফের সহিত দেখা হয় নাই — হয়ত জীবনে আর দেখা হইবে না। সিদ্দিকা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার ভ্রাতা বলিয়াছিলেন, "জয়নু ! তুই চিরকুমারী বা বাল-বিধবার ন্যায় জীবন-যাপন করিতে প্রস্তুত হ' !"

সিদ্দিকা নিজেকে 'চিরকুমারী' জ্ঞান করিবেন না, কারণ চিরকুমারী নিঃস্ব ; তাহার শূন্য হৃদয় অবলম্বনহীন । তদ্রূপ নিঃসম্বল দরিদ্র জীবনভার অতি দুর্ব্বহ। তিনি নিজেকে বিধবা মনে করিবেন, যেহেতু বিধবার স্বামী-স্মৃতি রূপ বহুমূল্য সম্পদ্ থাকে। পতিধ্যান তাহার জীবনের নিত্যসহচর। তাহা না থাকিলে বিধবা বাঁচিবে কি লইয়া? ভীষণ কন্টকাকীর্ণ সংসারে পতি-স্মৃতি তাহার একমাত্র সহায়। সংসারের কশাঘাতে যখন সে ক্ষতবিক্ষত হয়, তখন

স্বামী চিন্তাই প্রলেপের মত তাহার দগ্ধহৃদয় শীতল করে ; তাহাই তাহার সান্ত্বনা। দেবর, ভাশুর এবং অপর আত্মীয় স্বজন ছলে কৌশলে সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে পারে, কিন্তু এই —

"সতীর দেবতা পতি, জীবনের সার,
তেঁই যাচি পূজিবারে চরণ তার" —

ভাবটুকু অপহরণ করিতে পারে না ! ইহাই বিধবার জীবনসর্ব্বস্ব।

সহসা "হিয়াঁ তস্‌রীফ লাইয়ে" বলিয়া আদম শরীফ আসিয়া বাতি জ্বালিয়া দিল। সিদ্দিকা দ্বারদেশে চাহিয়া দেখিলেন, আগন্তুক ব্যক্তি লতীফ। অদ্য অতর্কিতভাবে লতীফের সহিত চারি চক্ষুর মিলন হইল !

"আপ বইঠিয়ে, মাইজী আবি পূজা পাট কর্‌তা হায়। পূজা হো জানে সে মাইজী আবি আবেগা" বলিয়া আদম শরীফ লতীফকে আশ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেল।

লতীফ কিঞ্চিৎ বিস্মিতভাবে বলিলেন, "সিদ্দিকা, তুমি আজ বুবুর সঙ্গে যাও নাই ?"

সি। আমি যাইতেছি, এ সংবাদ তুমি কোথায় পাইলে ?

ল। তুমি আমার সংবাদ রাখ না বটে, কিন্তু আমি তোমার সব সংবাদ রাখি ! আমি ত তোমার মত পাষাণ নহি — আমার হৃদয় আছে। হাঁ, ভাল কথা মনে পড়িল,— তুমি সেদিন বলিয়াছিলে যে, তুমি তোমার পথ দেখিবে। বেশ, চুয়াডাঙ্গার পথ ব্যতীত আরও কোনপথ আছে না কি, এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?

সি। আমি তোমার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

ল। তবে শুন, আমি তোমাকে অনর্থক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া কষ্ট দিতে চাহি না। আমি তোমার পথের কণ্টক হইয়া তোমার জীবন বিষাক্ত করিতে ইচ্ছুক নহি। তুমি যাহাতে সুখী হও, — সন্তুষ্ট থাক, তাহাই আমার জীবনের লক্ষ্য। সেই জন্য তোমাকে আমি এখন যথাবিধি ত্যাগপত্র (তালাক) দ্বারা মুক্তি দিতে চাহি।

সি। (কিঞ্চিৎ ব্যস্তভাবে) না, আমি মুক্তি চাহি না। তুমি এমন নিষ্ঠুর কথা বলিতেছ কেন ?

ল। (নিম্নস্বরে) দেখ, চক্ষুলজ্জা কিম্বা মিথ্যা লোকলজ্জা ভুলিয়া যাও, তোমার মনের কথা বল।

সি। (কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া) সত্য বলিতেছি, আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহি না।

ল। কেন, ৪/৫ বৎসর পূর্বে যখন দুলাভাই আমাকে তালাকের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন সে সময় তোমার ইচ্ছাও তাহাই ছিল।

সি। (সলজ্জভাবে) তখন আমি তোমাকে জানিতাম না যে।

ল। আমার সহিত পরিচয় হওয়ার পরেও এই ত সেদিন তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী হইতে অস্বীকৃতা হইয়াছ — তুমি তোমার পথ দেখিবে, বলিয়াছ।

সি। কিন্তু তোমায় 'তালাক' দিতে বলি নাই ত ?

ল। আমি তোমার প্রহেলিকা বুঝি না। তবে আমার জীবন-সঙ্গিনী হইতে আপত্তি করিলে কেন? (সিদ্দিকাকে নিরুত্তর দেখিয়া স্নেহসিক্ত স্বরে) আমি নীচ স্বার্থপর নহি ; বলিয়াছি ত, তোমার সুখ-সৌভাগ্যই আমার বাঞ্ছনীয়। আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা করি। এই মহান্ উদ্দেশ্যে তোমাকে বন্ধনমুক্ত করিতে চাহিতেছি।

সি। যদি আমরা সুখ-সন্তোষই তোমার কাম্য হয় তবে আমার বিনীত অনুরোধ, তুমি আবার বিবাহ করিয়া সংসারী হও, আমি তাহাতেই পরম সুখী হইব।

ল। আমাকে একথা বলা বৃথা। আমার আর অন্য বাঞ্ছা নাই ; আমি—

"পরাণ দিয়েছি তারে, তারি তরে রাখিব ;
জন্মান্তরে দেখা হলে তারি হাতে সঁপিব।"

আমার সুখ শান্তি সম্পূর্ণ তোমার হাতে। তুমি বেশ জান, তোমাকে পাইলে আমার —

স্বরগ মুকতি পূণ্য কিছু নাহি প্রয়োজন,
জনম-জনম ধরি তোমারেই কামনা।

সি। তোমার সহধর্মিণী হওয়া সহস্র বার অবাঞ্ছনীয় — লক্ষ বার বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু এ সৌভাগ্য আমার জন্য নহে। (সাশ্রুনয়নে যুক্তকরে) আমাকে আর ও কথা বলিও না !

ল। (ব্যথিত স্বরে) তাহা হইলে আমি এত কাল পৌত্তলিকের ন্যায় কেবল পাষাণ-প্রতিমার পূজা করিলাম? আমার বিদীর্ণ হৃদয় জিজ্ঞাসা করিতে চাহে —

রমণীরে ! বল দেখি, এ জীবনে কখন কি
দারুণ যন্ত্রণা মম উদিয়া স্মরণে,
এক বিন্দু অশ্রু তোর ঝরেছে নয়নে?

তদুত্তরে সিদ্দিকা স্বীয় কণ্ঠস্থিত লকেট হার উন্মোচন করিয়া লতীফের হস্তে দিলেন। লতীফ লকেট খুলিয়া দেখেন — তাঁহারই ফটো ! তদ্দর্শনে তিনি বিস্ময়বিমূঢ় হইলেন !

সি। এখন দেখিলে, তোমার চেয়েও পৌত্তলিক আছে !

লতীফ কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তন্মহূর্তে তথায় তারিণী আসিলেন, সুতরাং আর কিছু বলা হইল না।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

সহযাত্রী

আবার সেই বাষ্পীয় শকটে সিদ্দিকা। আজি কিন্তু স্বদেশ ছাড়িয়া অজ্ঞাত অপরিচিত বিশাল জগতের তরঙ্গে মিশিতে যাওয়া নহে। অদ্য জননী জন্মভূমির স্নেহময় ক্রোড়ে ফিরিয়া যাওয়া। এ যাত্রাতেও সিদ্দিকা নিরানন্দ। তিনি স্বয়ং ভ্রাতৃবধূকে আসিতে লিখিয়াছিলেন, এবং স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত যাইতেছেন, তবু অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে চলিয়াছেন। এখন সিদ্দিকা যেন স্বর্গ

হইতে বিদায় লইলেন! তারিণী-ভবনে আবার কখন আসিতে পারিবেন, কে জানে? তাঁহার নীরব যন্ত্রণা বর্ণনাতীত।

ট্রেনে রশীদা, তাঁহার পুত্র, পরিচারিকা এবং সিদ্দিকা ছিলেন। গাড়ী রিজার্ভ করা ছিল। তখনও গাড়ী ছাড়িতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল, তাই ঊষা তাঁহাদের নিকট বসিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লতীফ সেই ট্রেনে উঠিলেন, সিদ্দিকা প্রথমে স্বীয় চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, — ইহাও কি সম্ভব? সম্ভব না হইলেও ত সত্য! লতীফ যে রশীদার সহোদর ভ্রাতা, একথা সিদ্দিকার মনেই ছিল না! ঊষা গাড়ী হইতে নামিয়া যাইবার সময় বলিলেন, —

"পদ্মরাগ! মিঃ আল্‌মাস্ তোমার সহযাত্রী!"

ট্রেন ছাড়িলে পর রশীদা সিদ্দিকার প্রতি 'ভালবাসার অত্যাচার' আরম্ভ করিলেন। তিনি খোকাকে মাঝের বেঞ্চে শয়ন করাইয়া তাহার নিকট আয়াকে বসাইলেন। পরে সিদ্দিকাকে বলিলেন, —

"তারিণী-ভবনের ভগিনীগণ তোমাকে 'পদ্মরাগ' বলিয়া ডাকে কেন? তুমি যে 'আল্‌মাস-বনিতা', সেই জন্যই কি?"

সি। 'জয়নব' নামের জন্য যেমন আমি দায়ী নহি, সেইরূপ 'পদ্মরাগ' নামের জন্যও নহি!

র। তোমার নাম 'পদ্মরাগ' কে রাখিয়াছে? — লতীফ?

সি। আজ্ঞে না! আমি যে দিন প্রথমে মিসিস্ সেনের সম্মুখে আনীতা হই, তখনই তিনি আমায় 'পদ্মরাগ' বলিয়াছিলেন।

র। তবু আমার বলিতে ইচ্ছা করে —

"পদ্মরাগ-আল্‌মাস-কথা জানিল কি ছলে
নামদাত্রী?"

ভাল কথা, তুমি সেই দারুণ দুর্যোগের দিন আমার সঙ্গে না গিয়া এত বিড়ম্বনা ভোগ করিলে কেন?

সি। আপনি একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের সঙ্গে পলায়ন করিলেন বলিয়া আমি আপনার সঙ্গিনী হইতে সাহস করি নাই।

র। আমি সে মুখোস-পরা অজ্ঞাত লোকের সঙ্গে যাইবার সময় তবু নিজের ঘরের দুইজন চাকরানী এবং একজন বিশ্বাসী চাকর সঙ্গে লইয়াছিলাম। তুমি ত তাহাও কর নাই — তুমি যে একেবারে একাকিনী দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলে!

সি। আমার ত দিগ্বিজয়ে ইচ্ছা ছিল না — আমার ইচ্ছা ছিল অন্য প্রকার।

র। কি ইচ্ছা ছিল, শুনি?

সি। আত্মহত্যা করা।

র। তাহা করিয়া ফেলিলে একরূপ ভালই হইত — সব লেখা সম্পূর্ণ মুছিয়া যাইত। অবশ্য, আমি সে পাপ কার্যের অনুমোদন করি না। খোদা না করেন, কাহারও যেন সে দুর্মতি

না হয়। যাহা হউক, আল্‌মাসের সহিত তোমার 'রু-নোমাই' (বর-ক'নের শুভদৃষ্টি) কখন এবং কোথায় হইয়াছে ?

লতীফ বলিতে যাইতেছিলেন 'গত সন্ধ্যায় মিসিস্‌ সেনের ড্রয়িং-রুমে' কিন্তু বলিলেন না। মৃদুহাস্যে রসনা সংযত রাখিলেন। অতঃপর রশীদা বলিলেন, —

"আমার বড় ঘুম পাইতেছে। জয়নু ! তুমি ও-পার্শ্বের বেঞ্চে গিয়ে বস, আমি একটু শুই।"

সি। কেন, আপনি গত রাত্রে ঘুমান নাই ?

র। না, জানই ত, নূতন জায়গায় আমার ঘুম হয় না।

সি। আর এই গাড়ীর বেঞ্চ্‌খানা বোধ হয় আপনার বহু-পরিচিত জায়গা ?

র। (সহাস্যে) যা, তর্ক করিস্‌ নে ! সর্‌ এখান হ'তে !

সিদ্দিকা অগত্যা লতীফের সহিত একাসনে বসিলেন, লতীফ জানালা খুলিয়া বহির্জগতের শোভা দেখিতেছিলেন, অথবা অন্যমনস্কভাবে কেবল চাহিয়াছিলেন। লতীফ জানেন, সিদ্দিকার সহিত বাক্যালাপ করিবার সুবিধা হয় ত আর কখনও পাইবেন না। তবে তাঁহার ভগিনীর অনুকম্পায় প্রাপ্ত এ শেষ সুযোগটা বৃথায় নষ্ট করা অন্যায় হইবে। তাই তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। সিদ্দিকার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —

"সিদ্দিকা, তুমি আর কখনও এ পথে চুয়াডাঙ্গায় গিয়াছিলে ?"

সি। আমি এ পথে পূর্বে কোথাও গিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

ল। কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে তোমার কিছু কষ্ট বোধ হইতেছে কি ?

সি। কষ্ট, কলিকাতার জন্য নহে, কিন্তু তারিণী-ভবন ছাড়িয়া যাইতে বড় কষ্ট হইতেছে।

ল। তা' তুমি ত ইচ্ছা করিলে তারিণী-ভবনে আবার যাইতে পার। কিন্তু —

আবেগে লতীফের কণ্ঠরোধ হইল ; তিনি আত্মদমন-চেষ্টায় তাড়াতাড়ি জানালার দিকে চাহিলেন। তাঁহার অনুচ্চারিত শব্দ কয়টি মূর্ত্তিমান হইয়া সিদ্দিকার চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইল — "কিন্তু আমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না !"

দুঃখের দিন ফুরাইতে চাহে না — সুখের সময় দেখিতে না দেখিতে, সুখানুভব করিতে না করিতে অনন্তে বিলীন হইয়া যায়। ট্রেনের গতি অদ্য লতীফের নিকট অতিশয় — অতিরিক্ত দ্রুত বলিয়া বোধ হইতেছে। সিদ্দিকাও তাহাই ভাবিতেছিলেন — হতভাগা ট্রেনটা একটু ধীর পদবিক্ষেপে চলিলে ক্ষতি ছিল কি ?

রশীদা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন মাত্র, তাঁহার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। তিনি উঠিয়া বসিয়া সিদ্দিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, —

"শুন জয়নু ! আর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িল।"

সি। বলুন।

র। সেই যে বিপদের সময়, তুমি অন্তর্হিতা হইলে পর, বড় দুঃখে ও নৈরাশ্যে জোনাব আলী নানার আনীত অলঙ্কারগুলি ফিরাইয়া দিয়াছি, তিনি তাহা ফর্দের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া লইবার সময় সেই লকেট হারের 'কেস'টা খুলিয়া বলিলেন — "এটা ত খালি।" আমি সে সময় তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিলাম, — "তবে হারটা আমি গিলিয়া ফেলিয়াছি !" তাহার পর বহুদিন পরে আমার মনে পড়িল যে, লকেট হারটা আমি তোমার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলাম। অতঃপর তাহা কি হইল,—তুমি কোথাও রাখিয়াছিলে, না, আমি অন্যমনস্কভাবে কোথাও ফেলিয়া দিয়াছি,—কিছুই আমার মনে পড়ে না। তুমি এ বিষয়ে কিছু বলিতে পার কি, জয়নু'

লতীফ চক্ষুভরা 'দুষ্টামী' লইয়া সিদ্দিকার উত্তর শ্রবণের নিমিত্ত উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সিদ্দিকা নিরুত্তর রহিলেন ; অধিকন্তু গত সন্ধ্যায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যে দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ লতীফকে লকেট দেখাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া সিদ্দিকা অত্যন্ত সঙ্কুচিতা ও লজ্জিতা হইলেন। তিনি কিছুতেই লতীফের দিকে চাহিতে পারিতেছিলেন না। লতীফ কিয়ৎক্ষণ পরে উত্তর শ্রবণের আশায় বঞ্চিত হইয়া মুক্ত-বাতায়ন দিয়া মুখ বাহির করিয়া নিবিষ্টচিত্তে মাঠের দৃশ্য দেখিতেছিলেন বটে, কিন্তু এক একবার 'চুরি করিয়া' সিদ্দিকার লজ্জানম্র পদ্মরাগবৎ আরক্ত বদনখানি দেখিতেছিলেন, আর হয়ত ভাবিতেছিলেন,—

"প্রণয়ের পুরস্কার থাকে যদি অভাগার ,
এ রোদন পশে যদি বিধাতার শ্রবণে,
জন্মান্তরে পাব আমি এ রমণী-রতনে।"

আহা ! 'জন্মান্তর" ত পরের কথা — এখন যে ইহ-জীবনের দেখা - সাক্ষাৎ ফুরাইতে চলিল ! — ট্রেন চুয়াডাঙ্গায় আসিয়া পৌঁছিল আর কি ! সত্যই চুয়াডাঙ্গা স্টেশন ! !

লতীফ সিদ্দিকার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন। এই তাঁহাদের শেষ দেখা !

•

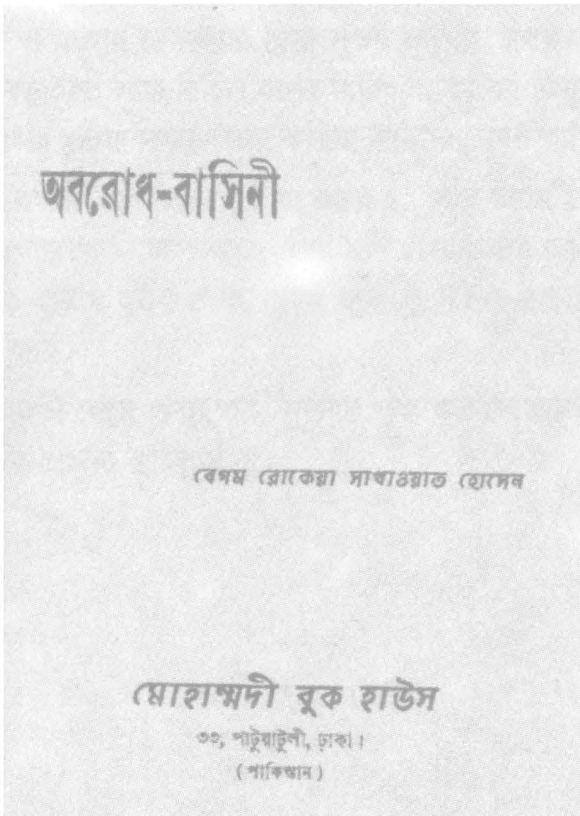

অবরোধ-বাসিনী

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

মোহাম্মদী বুক হাউস
৩৩, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।
(পাকিস্তান)

অবরোধ-বাসিনী

নিবেদন

কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না লইয়া "অবরোধ-বাসিনী" রচিত হইল। পাঠক-পাঠিকাগণ অধিকাংশস্থলে হাসিবেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাঁহাদের মনে সমবেদনার উদ্রেক হইবে এবং আমার বিশ্বাস তাঁহারা 'তাহেরা' মরহুমার অকালমৃত্যুতে দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

মৌলবী মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ সাহেব বিশেষ উৎসাহের সহিত "অবরোধ-বাসিনী" প্রকাশের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বলিতে কি, তাঁহারই আগ্রহাতিশয্যে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-ইনস্‌পেক্টর পরম ভক্তিভাজন জ্ঞান-বৃদ্ধ মৌলবী আবদুল করিম সাহেব, বি, এ, এম, এল, সি দয়া করিয়া "অবরোধ-বাসিনী"র ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি কারসিয়ং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি ; উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগরতীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইতেছি।

হজরত রাবিয়া বসরী বলিয়াছেন, "ইয়া আল্লাহ্! যদি আমি দোজখের ভয়ে এবাদত করি, তবে আমাকে দোজখে নিক্ষেপ কর ; আর যদি বেহেশ্‌তের আশায় এবাদত করি তবে আমার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম হউক।" আল্লাহ্‌র ফজলে সমাজ-সেবা সম্বন্ধে আমিও এখন ঐরূপ বলিতে সাহস করি।

আমার ত প্রত্যেকটী লোম গুণাহ্‌গার, সুতরাং পুস্তকের দোষত্রুটীর জন্য এবার পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম না।

বিনীতা—

গ্রন্থকর্ত্রী

উৎসর্গ-লিপি

এই গ্রন্থখানি
আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদা জননী
মোসাম্মৎ রাহাতন্নেসা সাবেরা চৌধুরাণী মরহুমার
স্মৃতির-চরণে
ভক্তির সহিত সমর্পিত হইল।

আমার স্নেহময়ী জননী অবরোধ প্রথার অত্যন্ত পক্ষপাতিনী ছিলেন। এস্থলে আমার শৈশবের একটি ঘটনা মনে পড়িল। সে সময় কলিকাতা হইতে রঙ্গপুর যাতায়াত করিবার সময় সারা ঘাটে ষ্টীমার যোগে নদী পার হইতে হইত। একবার আমরা কলিকাতায় আসিতেছিলাম ; আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বয়স তখন মাত্র দুই বৎসর ছিল। সে এবং আমি আম্মাজানের সহিত পাল্কীতে বন্দী হইলাম। সেই পাল্কী স্টীমারের ডেকে রাখিয়া আমাদিগকে নদী পার করান হইল। তখন গ্রীষ্মকাল ছিল—বানাতের ওয়াড় ঘেরা রুদ্ধ পাল্কীর ভিতর আমার শিশু ভগিনী 'হোয়া-হোয়া' করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। আম্মাজান প্রাণপণে তাহাকে চুপ করাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু পাল্কীর নিকট উপবিষ্ট কোন আল্লাহ্‌র বান্দাই ক্রন্দনরতা শিশুকে পাল্কী হইতে বাহির করার প্রয়োজন বোধ করে নাই। ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই পুস্তকখানি তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম।

আমরা বহু কাল হইতে অবরোধে থাকিয়া থাকিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি সুতরাং অবরোধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের—বিশেষতঃ আমার কিছুই নাই। মেছোণীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "পচা মাচের দুর্গন্ধ ভাল না মন্দ?"—সে কি উত্তর দিবে?

এস্থলে আমাদের ব্যক্তিগত কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার দিব—আশা করি, তাঁহাদের ভাল লাগিবে।

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে গোটা ভারতবর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষদের বিরুদ্ধে নহে, মেয়েমানুষদের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ীর চাকরাণী ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোকে দেখিতে পায় না।

বিবাহিতা নারীগণও বাজীকর-ভানুমতী ইত্যাদি তামাসাওয়ালী স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে পর্দ্দা করিয়া থাকেন। যিনি যত বেশী পর্দ্দা করিয়া গৃহকোণে যত বেশী পেঁচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই তত বেশী শরীফ।

শহরবাসিনী বিবিরাও মিশনারী মেমদের দেখিলে ছুটাছুটী করিয়া পলায়ন করেন। মেম ত মেম—সাড়ী পরিহিতা খ্রীষ্টান বা বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দেখিলেও তাঁহারা কামরায় গিয়া অর্গল বন্ধ করেন।

এক

সে অনেক দিনের কথা—রংপুর জিলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ নামক গ্রামের জমীদার বাড়ীতে বেলা আন্দাজ ১টা-২টার সময় জমীদার-কন্যাগণ জোহরের নামাজ পড়িবার জন্য ওজু করিতেছিলেন। সকলের ওজু শেষ হইয়াছে কেবল "আ" খাতুন নাম্নী সাহেবজাদী তখনও আঙ্গিনায় ওজু করিতেছিলেন। আলতার মা বদনা হাতে তাঁহাকে ওজুর জন্য পানি ঢালিয়া দিতেছিল। ঠিক সেই সময় এক মস্ত লম্বাচৌড়া কাবুলী স্ত্রীলোক আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত! হায়, হায়, সে কি বিপদ! আলতার মার হাত হইতে বদনা পড়িয়া গেল—সে চেঁচাইতে লাগিল—"আউ আউ! মরদটা কেন আইল!" সে স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল, "হেঁ মরদানা! হাম্ মরদানা হায়?" সেইটুকু শুনিয়াই "আ" সাহেবজাদী প্রাণপণে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তাঁহার চাচীআম্মার নিকট গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ও কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "চাচি আম্মা! পায়জামাপরা একটা মেয়েমানুষ আসিয়াছে!!" কর্ত্রী সাহেবা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে তোমাকে দেখিয়াছে?" "আ" সরোদনে বলিলেন "হাঁ!" অপর মেয়েরা নামাজ ভাঙ্গিয়া শশব্যস্তভাবে দ্বারে অর্গল দিলেন— যাহাতে সে কাবুলী স্ত্রীলোক এ কুমারী মেয়েদের দেখিতে না পায়। কেহ বাঘ ভালুকের ভয়েও বোধ হয় অমন করিয়া কপাট বন্ধ করে না।

দুই

ইহাও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা—পাটনায় এক বড় লোকের বাড়ীতে শুভ বিবাহ উপলক্ষে অনেক নিমন্ত্রিতা মহিলা আসিয়াছেন। অনেকে সন্ধ্যার সময়ও আসিয়াছেন। তন্মধ্যে হাশমত বেগম একজন। দাসী আসিয়া প্রত্যেক পাল্কীর দ্বার খুলিয়া বেগম সাহেবাদের হাত ধরিয়া

নামাইয়া লইয়া যাইতেছে, পরে বেহারাগণ খালি পাল্কী সরাইয়া লইতেছে এবং অপর নিমন্ত্রিতার পাল্কী আসিতেছে। বেহারা ডাকিল—"মামা ! সওয়ারী আয়া !" মামারা মন্থর গমনে আসিতেছে। মামা যতক্ষণে হাশমত বেগমের পাল্কীর নিকট আসিবে ততক্ষণে বেহারাগণ "সওয়ারী" নামিয়াছে ভাবিয়া পাল্কী লইয়া সরিয়া পড়িল। অতঃপর আর একটা পাল্কী আসিলে মামারা পাল্কীর দ্বারা খুলিয়া যথাক্রমে নিমন্ত্রিতাকে লইয়া গেল।

শীতকাল—যত পাল্কী আসিয়াছে "সওয়ারী" নামিলে পর সব খালি পাল্কী এক প্রান্তে বট গাছের তলায় জড় করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। অদূরে বেহারাগণ ঘটা করিয়া রান্না করিতেছে। তাহারা বিবাহ বাড়ী হইতে জমকালো সিধা পাইয়াছে। রাত্রিকালে আর সওয়ারী খাটিতে হইবে না। সুতরাং তাহাদের ভারী স্ফূর্তি—কেহ গান গায়, কেহ তামাক টানে, কেহ খইনী খায়—এরূপে আমোদ করিয়া খাওয়াদাওয়া করিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল।

এদিকে মহিলা মহলে নিমন্ত্রিতাগণ খাইতে বসিলে দেখা গেল—হাশমত বেগম তাঁহার ছয় মাসের শিশু সহ অনুপস্থিতা। কেহ বলিল, ছেলে ছোট বলিয়া হয়ত আসিলেন না। কেহ বলিল, তাঁহাকে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছে— ইত্যাদি।

পরদিন সকালবেলা যথাক্রমে নিমন্ত্রিতাগণ বিদায় হইতে লাগিলেন—একে একে খালি পাল্কী আসিয়া নিজ নিজ "সওয়ারী" লইয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটী "খালী" পাল্কী আসিয়া দাঁড়াইলে তাহার দ্বার খুলিয়া দেখা গেল হাশমত বেগম শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন ! পৌষ মাসের দীর্ঘ রজনী তিনি ঐ ভাবে পাল্কীতে বসিয়া কাটাইয়াছেন !

তিনি পাল্কী হইতে নামিবার পূর্ব্বেই বেহারাগণ পাল্কী ফিরাইয়া লইয়া গেল— কিন্তু তিনি নিজে ত টু শব্দ করেনই নাই—পাছে তাঁহার কণ্ঠস্বর বেহারা শুনিতে পায়, শিশুকেও প্রাণপণ যত্নে কাঁদিতে দেন নাই—যদি তাহার কান্না শুনিয়া কেহ পাল্কীর দ্বার খুলিয়া দেখে ! কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলে আর অবরোধ-বাসিনীর বাহাদুরী কি ?

তিন

প্রায় ৪০/৪৫ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা—কয়েক ঘর বঙ্গীয় সম্ভ্রান্ত জমীদারের মাতা, মাসী, পিসী, কন্যা ইত্যাদি একত্রে হজ করিতে যাইতেছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় ২০/২৫ জন ছিলেন। তাঁহারা কলিকাতায় রেলওয়ে ষ্টেশন পৌঁছিলে পর সঙ্গের পুরুষ প্রভুগণ কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছিলেন। বেগম সাহেবাদিগকে একজন বিশ্বস্ত আত্মীয় পুরুষের হেফাজতে রাখা হয়। সে ভদ্রলোকটীকে লোকে হাজী সাহেব বলিত, আমরাও তাহাই বলিব। হাজী সাহেব বেগম সাহেবাদের ওয়েটিং রুমে বসাইতে সাহস পাইলেন না। তাঁহার উপদেশ মতে বিবি সাহেবারা প্রত্যেকে মোটা মোটা কাপড়ের বোর্কা পরিয়া ষ্টেশনের প্লাটফরমে উবু হইয়া (Squat) বসিলেন ; হাজী সাহেব মস্ত একটা মোটা ভারী শতরঞ্জি তাঁহাদের উপর ঢাকিয়া দিলেন। তদবস্থায় বেচারীগণকে এক একটা বোচকা বা বস্তার মত দেখাইতেছিলেন। তাঁহাদিগকে ঐরূপে ঢাকিয়া রাখিয়া হাজী সাহেব এক কোণে দাঁড়াইয়া খাড়া পাহারা দিতেছিলেন। একমাত্র আল্লাহ জানেন, হজযাত্রী বিবিগণ ঐ অবস্থায় কয় ঘণ্টা অপেক্ষা করিতেছিলেন— আর ইহা কেবল আল্লাহ্‌তালারই মহিমা যে তাঁহারা দম আটকাইয়া মরেন নাই।

ট্রেণ আসিবার সময় জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে হাজী সাহেবকে বলিলেন, "'মুন্সি! তোমারা আসবাব হিঁয়াসে হাটা লো। আভি ট্রেণ আয়েগা—প্লাটফরম পর খালি আদমি রহেগা—আসবাব নেহি রহেগা।" হাজী সাহেব যোড়হস্তে বলিলেন, "হুজুর, ঐ সব আসবাব নাহি—আওরত হায়।" কর্ম্মচারিটী পুনরায় একটা "বস্তায়" জুতার ঠোকর মারিয়া বলিলেন, "হা, হা—এই সব আসবাব হাটা লো।" বিবিরা পর্দ্দার অনুরোধে জুতার গুতা খাইয়াও টু শব্দটী করেন নাই।

চার

উড়িষ্যার অন্তর্গত রাজকণিকায় একজন ভদ্রলোক চাকুরী উপলক্ষে ছিলেন। বাসায় তাঁহার মাতা, দুইজন ভগিনী এবং স্ত্রী ছিলেন। বর্ষার সময়। তাঁহার বাঙ্গলায় চারিজন পাখাটানা কুলি পালাক্রমে সমস্ত দিন ও রাত্রি পাখা টানিত। সাহেব "টুরে" বাহিরে গিয়াছেন ; রাত্রিকালে তাঁহার স্ত্রীর কামরায় একজন চাকরাণী শুইয়াছিল। তাঁহার ভগিনীগণ অন্য কামরায় ছিলেন।

সে অঞ্চলে গরমের সময় লোকে বেশী বিছানা ব্যবহার করে না। রাত্রিকালে প্রবল বেগে বৃষ্টি হওয়ায় সাহেবের স্ত্রীর শীত বোধ হইল। তবু তিনি চাকরাণীকে ডাকিয়া পাখা বন্ধ করিতে বলিলেন না। ক্রমে শীত অসহ্য হওয়ায় প্রথমে তিনি বিছানার চাদরখানি গায়ে দিলেন, তাহাতেও শীত না গেলে তিনি বিছানার দরি (শতরঞ্জি) ও সুজনী তুলিয়া গায়ে দিলেন। কিন্তু হতভাগা পাখাকুলী আরও জোরে জোরে পাখা টানিতে লাগিল। তখন অগত্যা বউ বিবি ঐ দরি চাদর সমস্ত গায়ে জড়াইয়া পালঙ্কের নীচে গিয়া শুইলেন।

পরদিন সকালে একজন চাকরাণী কামরায় ঝাঁটা দিতে আসিয়া পালঙ্কের নীচে সাদা একটা কি দেখিয়া দিল ঝাঁটার বাড়ি—ঝাঁটার চোটে তাড়াতাড়ি বউ বিবি পাশ ফিরিলেন।—বেচারী চাকরাণী যেন মরিয়া গেল!

পাঁচ

ই. আই. রেলযোগে কোন বেহারী ভদ্রলোক সস্ত্রীক পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছিলেন। তিনি স্ত্রীকে লেডীর কক্ষে না দিয়া নিজের সঙ্গেই রাখিলেন। তাঁহারা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট লইয়াছিলেন। বেগম সাহেবা বোর্কা পরিয়াই রহিলেন। এক সময় সাহেব বাথরুমে থাকিতে ট্রেন কোন ষ্টেশনে থামিল। অপর এক যাত্রী কোথাও স্থান না পাইয়া ঐ কক্ষে উঠিয়া অতি সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া একটা জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া রহিলেন। এদিকে পূর্ব্বোক্ত সাহেব বাথরুম হইতে আসিয়া দেখেন, তাঁহার স্ত্রী অনুপস্থিত! কি করিবেন—তখন চলন্ত ট্রেন! পরবর্ত্তী ষ্টেশনে আগন্তুক ভদ্রলোকটি নামিয়া গেলেন। আমাদের কথিত সাহেবও নামিয়া ষ্টেশনের পুলিশে সংবাদ দিলেন যে তাঁহার স্ত্রী অমুক ও অমুক ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে হারাইয়াছে।

বেচারা পুলিশ বিভিন্ন ষ্টেশনে টেলিগ্রাম করিল যে কালো বোর্কায় আবৃতা একটি মহিলার খোঁজ কর। একজন কনষ্টেবল বলিল, "একবার এই গাড়ীখানাই ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখি না।" যে বেঞ্চে সাহেব বসিয়াছিলেন, কনষ্টেবল সেই বেঞ্চের নীচে কালো একটা কি দেখিতে

পাইয়া টানিয়া বাহির করিবা মাত্র সাহেব চেঁচাইয়া উঠিলেন, "আরে ছোড় ছোড়—ওহি ত মেরা ঘর হায়!" পরে জানা গেল সেই নবাগত ভদ্রলোককে দেখিয়া ইনি বেঞ্চের নীচে লুকাইয়া ছিলেন।

ছয়

ঢাকা জিলায় কোন জমীদারের প্রকাণ্ড পাকা বাড়ীতে দিনে দুপুরে আগুন লাগিয়াছিল। জিনিষপত্র পুড়িয়া ছারখার হইল—তবু চেষ্টা করিয়া যথাসম্ভব আসবাব সরঞ্জাম বাহির করার সঙ্গে বাড়ীর বিবিদেরও বাহির করা প্রয়োজন বোধ করা গেল। হঠাৎ তখন পাল্কী, বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ে এক সঙ্গে দুই চারিটা পাল্কী কোথায় পাওয়া যাইবে? অবশেষে স্থির হইল যে একটা বড় রঙীন মশারীর ভিতর বিবিরা থাকিবেন, তাহার চারিকোণ বাহির হইতে চারিজনে ধরিয়া লইয়া যাইবে। তাহাই হইল,—আগুনের তাড়নায় মশারী ধরিয়া চারিজন লোক দৌড়াইতে থাকিল, ভিতরে বিবিরা সমভাবে দৌড়াইতে না পারিয়া হোঁচোট খাইয়া পড়িয়া দাঁত, নাক ভাঙ্গিলেন, কাপড় ছিঁড়িলেন। শেষে ধানক্ষেত দিয়া, কাঁটাবন দিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে মশারীও ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

অগত্যা আর কি করা যায়? বিবিগণ একটা ধানের ক্ষেতে বসিয়া থাকিলেন। সন্ধ্যায় আগুন নিবিয়া গেলে পর পাল্কী করিয়া একে একে তাঁহাদের বাড়ী লইয়া যাওয়া হইল।

সাত

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের জনৈক জমীদারের বাড়ীতে বিবাহ হইতেছিল। অতিথি অভ্যাগতে বাড়ী গম্‌গম্ করিতেছে। খাওয়াদাওয়ায় রাত্রি ২টা বাজিয়া গিয়াছে, এখন সকলের ঘুমাইবার পালা। কিন্তু চোর চোট্টা ত ঘুমাইবে না—এই সুযোগ তাহাদের চুরি করার।

সিঁধ কাটিয়া চোর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। একজন চৌকিদার চোরের সাড়া পাইয়া বাড়ীর কর্ত্তাদিগকে সংবাদ দিয়াছে। কর্তারা ছিলেন, পাঁচ ছয় ভাই। তাঁহারা প্রত্যেকে কুঠার হস্তে সে ঘরটার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন চোরের সন্ধানে। চোরকে পাইলে সে-সময় তাঁহারা কুঠার দিয়া কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতেন। হুঁ—চোরের এত বড় আস্পর্দ্ধা!

ঘরের ভিতর বিবিরা চোরকে দেখিয়া আরও জড়সড় হইয়া চাদর গায়ে দিয়া শুইলেন—একেবারে নীরব, যেন নিশ্বাস ফেলিবারও সাহস নাই। বিশেষতঃ "বেগানা মরদটা" যেন তাঁহাদের নিশ্বাসের শব্দও না শুনে। চোর নিঃশঙ্কচিত্তে সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা ও গহনা পত্র বাহির করিয়া লইল। পরে একে একে প্রত্যেক বিবির হাতপায়ের গহনা খুলিয়া লইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিবিরা তাড়াতাড়ি নাক, কান ও গলার অলঙ্কার খুলিয়া শিয়রে রাখিতে লাগিলেন। ইহাতে চোরের বেশ সুবিধাই হইল—সে আর অনর্থক বেগম-খানমদের নাক, কান বা গলা স্পর্শ করিবে কেন? সেই ঘরে একটি ছিলেন নূতন বউ—সে বেচারী নাকের নথটী ত খুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কানের ঝুমকা প্রভৃতি গহনাগুলি পরস্পরে জড়াইয়া বড় জটীল হইয়া পড়িল—কিছুতেই খোলা গেল না। চোর মহাশয় ভদ্রতার অনুরোধে

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করার পর কলমতারাশ ছুরী দিয়া বউ বিবির উভয় কান কাটিয়া লইয়া গহনার পুঁটুলিতে ভরিয়া সেই সিঁধ পথে পলায়ন করিল।

ঘরের ভিতর এত কাণ্ড হইয়া গেল—বাহিরে পুরুষগণ কুঠার হস্তে চোরের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু বিবিরা কেহ টু' শব্দ করিলেন না—পাছে "বেগানা মরদটা" তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনে! চোর নিরাপদে বাহির হইয়া গেলে পর বিবিরা হাউমাউ আরম্ভ করিয়া দিলেন!

পাঠিকা ভগিনি! এইরূপে আমরা অবরোধ প্রথার সম্মান রক্ষা করিয়া থাকি।

আট

এক বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল। গৃহিণী বুদ্ধি করিয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত অলঙ্কার একটা হাত বাক্সে পুরিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন সমাগত পুরুষেরা আগুন নিবাইতেছে। তিনি তাহাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া অলঙ্কারের বাক্সটী হাতে করিয়া ঘরের ভিতর খাটের নীচে গিয়া বসিলেন। তদবস্থায় পুড়িয়া মরিলেন, কিন্তু পুরুষের সম্মুখে বাহির হইলেন না। ধন্য! কুল-কামিনীর অবরোধ!

নয়

এক মৌলবী সাহেবের মৃত্যু হইল। তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং বিধবা অবশিষ্ট ছিলেন। মৌলবী সাহেব কিছু রাখিয়া যান নাই, সুতরাং অতি কষ্টে তাঁহার বিধবা সংসার চালাইতেন। পুত্রের বিবাহের জন্য তিনি বহু কষ্টে কতকগুলি অলঙ্কার গড়াইলেন। অলঙ্কারগুলি বেশ ভারী দামের হইল। বিবাহের দুই তিন দিন পূর্ব্বে সিঁধ কাটিয়া চোর গৃহে প্রবেশ করিল। সে ঘরে তিনি একমাত্র দাসীসহ শুইয়াছিলেন। চোরের সাড়া পাইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং চুপি চুপি বাঁদীকে জাগাইলেন। চোর ভাবিল, সর্ব্বনাশ—দেই দৌড়!

কিন্তু চোরের সঙ্গীরা বলিল, আচ্ছা একটু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখি না, কি হয়। হইল বেশ মজা—

বিবি সাহেবার সঙ্কেত মত দাসী একখানা কাপড় দিয়া তাঁহার খাটের সম্মুখে পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দিল। পরে চাবির গোছা দেখাইয়া চোরদিগকে বলিল, "বাপু সকল! তোমরা পর্দ্দার এদিকে আসিও না, তোমরা যাহা চাও, আমি সিন্দুক খুলিয়া বাহির করিয়া দিতেছি।" পরে সমস্ত দামী কাপড় ও অলঙ্কার বাহির করিয়া চোরের হাতে দিল। তাহারা গহনা নাড়িয়াচাড়িয়া দেখিয়া বলিল,—"নথ কই?—সেটা সিন্দুকে আছে বুঝি?" কর্ত্রীর সঙ্কেত অনুসারে দাসী বলিল, "দোহাই! তোমরা এদিকে আসিও না—আম্মা সা'ব কেবল নথটা রাখিয়াছেন যে পরশু দিন বিয়া—একেবারে কোন গয়না রহিল না—নথটাও না থাকিলে বিয়া হয় কি করিয়া? তা যদি তোমরা চাও, তবে নেও—নথ লও—পর্দ্দার এদিকে আসিও না।"

চোরেরা ভারী খুশী হইয়া পরস্পরে গল্প করিতে করিতে চলিয়া গেল। তখন রাত্রি তিনটা কি চারিটা। এত সহজে সিদ্ধিলাভ করায় আনন্দের আতিশয্যে তাহারা একটু জোর গলায় কথা কহিয়াছিল। পথে চৌকিদার তাহা শুনিতে পাইয়া তাহাদিগকে ধরিবার জন্য তাড়া

করে। সকলে পলাইল। একটী চোর হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় চৌকীদার তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। অগত্যা সে চৌকীদারের সঙ্গে চুরি-করা বাড়ী দেখাইয়া দিতে গেল। ততক্ষণে ভোর হইয়াছে।

চৌকীদার গিয়া দেখে, বিবি সাহেবা তখনও পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বাহির হন নাই—"যদি ব্যাটারা আবার আসে"—তবে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে যে! দাসীকেও চেঁচামেচি করিতে দেন নাই যে শোরগোল শুনিয়া যদি কোন পুরুষমানুষ তাঁহার ঘরে প্রবেশ করে! চোরের হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তিনি অবরোধ প্রথার সম্মান রক্ষা করিলেন।

দশ

কোন জমিদার গৃহিণী ছোট ভাইয়ের বউ আনিবার জন্য ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ী গিয়াছেন। একদিন হঠাৎ গিয়া দেখেন নববধূকে তাঁহার ভ্রাতৃবধূ ভাত খাওয়াইতেছেন। ভাতের বাসনে একটা কাঁচা মরিচ ছিল। তিনি সরল মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের বউ ঝাল খাইতে ভালবাসে নাকি?" বউয়ের ভাবীজান উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, বড্ড ঝাল খায়!"

পরে তিনি বউ লইয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিলেন। পথে তিন চারি দিন নৌকায় থাকা হইল। এই সময়ে তিনি যাহা কিছু রান্না করাইতেন, তাহাতেই অতিরিক্ত ঝাল দেওয়াইতেন। আসল কথা এই যে, বউ মোটেই ঝাল খাইতে অভ্যস্তা নহেন। খাইবার সময় কাঁচা লঙ্কার খোশবু শুঁকিয়া শুঁকিয়া ভাত খাইতেছিল। তাই ঠাট্টা করিয়া তাঁহার ভাবীজান ঝাল খাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন। ফলে বেচারীর প্রাণ লইয়া টানাটানি।

ননদ মহাশয়া কাঁচা লঙ্কা দিয়া মুড়ি মাখিয়া ভাই-বউকে আদর করিয়া কাছে বসাইয়া খাওয়াইতেন। বউ-এর দুই চক্ষু বহিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া জল পড়িত—মুখ জিহ্বা পুড়িয়া যাইত—তবু বড় ননদকে মুখ ফুটিয়া বলেন নাই যে, তিনি ঝাল খান না!! ও সর্ব্বনাশ! একে নূতন বউ,—তাতে বড় ননদ—প্রাণ গেলেও কথা কহিতে নাই!

এগার

গত ১৯২৪ সনে আমি আরায় গিয়াছিলাম। আমার দুই নাতিনীর বিবাহ এক সঙ্গে হইতেছিল, সেই বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। নাতিনীদের ডাক নাম মজু ও সবু। বেচারীরা তখন "মাইয়াখানায়" ছিল। কলিকাতায় ত বিবাহের মাত্র ৫/৬ দিন পূর্ব্বে "মাইয়াখানা" নামক বন্দীখানায় মেয়েকে রাখে। কিন্তু বেহার অঞ্চলে ৬/৭ মাস পর্য্যন্ত এইরূপ নির্জ্জন কারাবাসে রাখিয়া মেয়েদের আধমরা করে।

আমি মজুর জেলখানায় গিয়া অধিকক্ষণ বসিতে পারি না—সে রুদ্ধ গৃহে আমার দম আটকাইয়া আসে। শেষে এক দিন একটা জানালা একটু খুলিয়া দিলাম। দুই মিনিট পরেই এক মাতব্বর বিবি, "দুলহিন্‌কো হাওয়া লাগেগী" বলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া উঠিয়া আসিলাম। আমি সবুদের জেলখানায় গিয়া মোটেই বসিতে পারিতাম না। কিন্তু সে বেচারীরা ছয় মাস হইতে সেই রুদ্ধ কারাগারে ছিল। শেষে সবুর হিষ্টিরিয়া রোগ হইয়া গেল। এইরূপে আমাদের অবরোধে বাস করিতে অভ্যস্ত করা হয়।

বার

পশ্চিম দেশের এক হিন্দু বধূ তাহার শ্বাশুড়ী ও স্বামীর সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। স্নান শেষ করিয়া ফিরিবার সময় তাহার শাশুড়ী ও স্বামীকে ভীড়ের মধ্যে দেখিতে পাইল না। অবশেষে সে এক ভদ্রলোকের পিছু পিছু চলিল। কতক্ষণ পরে পুলিশের হল্লা। —সেই ভদ্রলোককে ধরিয়া কনষ্টেবল বলে, "তুমি অমুকের বউ ভাগাইয়া লইয়া যাইতেছ।" তিনি আচম্বিতে ফিরিয়া দেখেন, আরে ! এ কাহার বউ পিছন হইতে তাঁহার কাছার খুঁটি ধরিয়া আসিতেছে। প্রশ্ন করায় বধূ বলিল, সে সর্ব্বক্ষণ মাথায় ঘোমটা দিয়া থাকে—নিজের স্বামীকে সে কখনও ভাল করিয়া দেখে নাই। স্বামীর পরিধানে হল্‌দে পাড়ের ধুতি ছিল, তাহাই সে দেখিয়াছে। এই ভদ্রলোকের ধুতির পাড় হলদে দেখিয়া সে তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে !

তের

আজিকার (২৮শে জুন ১৯২৯) ঘটনা শুনুন। স্কুলের একটী মেয়ের বাপ লম্বাচওড়া চিঠি লিখিয়াছেন যে, মোটর বাস তাঁহার গলির ভিতর যায় না বলিয়া তাঁহার মেয়েকে "বোর্কা" পরিয়া মামার (চাকরাণীর) সহিত হাঁটিয়া বাড়ী আসিতে হয়। গতকল্য গলিতে এক ব্যক্তি চায়ের পাত্র হাতে লইয়া যাইতেছিল, তাহার ধাক্কা লাগিয়া হীরার (তাঁহার মেয়ের) কাপড়ে চা পড়িয়া গিয়া কাপড় নষ্ট হইয়াছে। আমি চিঠিখানা আমাদের জনৈকা শিক্ষয়িত্রীর হাতে দিয়া ইহার তদন্ত করিতে বলিলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া উর্দ্দু ভাষায় যাহা বলিলেন, তাহার অনুবাদ এই :—

"অনুসন্ধানে জানিলাম হীরার বোর্কায় চক্ষু নাই। (হীরাকে বোর্কা মে আঁখ নেহী হায়) ! অন্য মেয়েরা বলিল, তাহারা গাড়ী হইতে দেখে মামা প্রায় হীরাকে কোলের নিকট লইয়া হাঁটাইয়া লইয়া যায়। "বোর্কা"য় চক্ষু না থাকায় হীরা ঠিকমত হাঁটিতে পারে না—সেদিন একটা বিড়ালের গায়ে পড়িয়া গিয়াছিল,—কখনও হোঁচট খায়। গতকল্য হীরাই সে চায়ের পাত্রবাহী লোকের গায়ে ধাক্কা দিয়া তাহার চা ফেলিয়া দিয়াছে।"[১]

দেখুন দেখি, হীরার বয়স মাত্র ৯ বৎসর—এতটুকু বালিকাকে "অন্ধ বোর্কা" পরিয়া পথ চলিতে হইবে ! ইহা না করিলে অবরোধের সম্মান রক্ষা হয় না !

চৌদ্দ

প্রায় ২১/২২ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা। আমার দূর-সম্পর্কীয়া এক মামীশাশুড়ী ভাগলপুর হইতে পাটনা যাইতেছিলেন ; সঙ্গে মাত্র একজন পরিচালিকা ছিল। কিউল ষ্টেশনে ট্রেণ বদল করিতে হয়। মামানী সাহেবা অপর ট্রেণে উঠিবার সময় তাঁহার প্রকাণ্ড বোর্কায় জড়াইয়া ট্রেণ ও প্লাটফরমের মাঝখানে পড়িয়া গেলেন। ষ্টেশনে সে সময় মামানীর চাকরাণী ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোক ছিল না। কুলিরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হওয়ায় চাকরাণী দোহাই দিয়া নিষেধ করিল— "খবরদার ! কেহ বিবি সাহেবার গায়ে হাত দিও না।" সে একা

---

১ এখনই আষাঢ় মাসের "মাসিক" মোহাম্মদী"তে শ্রীমতী আমিনা খাতুনের লিখিত প্রবন্ধের একস্থলে দেখিলাম,—"কতক্ষণের জন্য নাক, মুখ, চোক বন্ধ করিয়া বেড়ান (এইরূপ পর্দ্দায় পরপুরুষের ঘাড়ে পড়া সম্ভবপর)—উহা ইস্‌লামের বাহিরের পর্দ্দা।"

অনেক টানাটানি করিয়া কিছুতেই তাঁহাকে তুলিতে পারিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার পর ট্রেণ ছাড়িয়া দিল !

ট্রেণের সংঘর্ষে মামানী সাহেবা পিষিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলেন,—কোথায় তাঁহার "বোর্কা"—আর কোথায় তিনি ! ষ্টেশন ভরা লোক সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া এই লোমহর্ষক ব্যাপার দেখিল, —কেহ তাঁহার সাহায্য করিতে অনুমতি পাইল না। পরে তাঁহার চূর্ণপ্রায় দেহ একটা গুদামে রাখা হইল ; তাঁহার চাকরাণী প্রাণপণে বিনাইয়া কাঁদিল, আর তাঁহাকে বাতাস করিতে থাকিল। এই অবস্থায় ১১ (এগার) ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর তিনি দেহত্যাগ করিলেন ! কি ভীষণ মৃত্যু !

পনের

হুগলীতে এক বড়লোকের বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে এক কামরায় অনেক বিবি জড় হইয়াছেন। রাত্রি ১২টার সময় বোধ হইল, কেহ বাহির হইতে কামরার দরজা ঠেলিতেছে, জোরে, আস্তে—নানা প্রকারে দরজা ঠেলিতেছে। বিবিরা সকলে জাগিয়া উঠিয়া থরথর কাঁপিতে লাগিলেন—নিশ্চয় চোর দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। আর বিবিদের দেখিয়া ফেলিবে ! তখন এক জাঁহাবাজ বিবি সমস্ত অলঙ্কার পরিয়া ফেলিলেন, অবশিষ্ট পুট্‌লী বাঁধিয়া চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেন। পরে বোর্কা পরিয়া দ্বার খুলিলেন। দ্বারের বাহিরে ছিল,— একটা কুকুরী ! তাহার বাচ্চা দু'টী ঘটনাবশতঃ কামরার ভিতর ছিল, আর সে ছিল বাহিরে। বাচ্চার নিকট আসিবার জন্য সেই কুকুরী দরজা ঠেলিতেছিল।

ষোল

বেহার শরীফের এক বড়লোক দার্জ্জীলিং যাইতেছিলেন ; তাঁহার সঙ্গে এক ডজন "মানব-বোঝা" (Human-Luggage) অর্থাৎ মাসী পিসী প্রভৃতি ৭ জন মহিলা এবং ৬ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের ৫ জন বালিকা। তাঁহারা যথাক্রমে ট্রেণ ও ষ্টীমার বদল করিবার সময় সর্ব্বত্রই পাল্কীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মণিহারী ঘাট, সক্রিগলি ঘাট ইত্যাদিতে পাল্কী ছিল। বিবিদের পাল্কীতে পুরিয়া ষ্টীমারের ডেকে রাখা হইত। আবার ট্রেণে উঠিবার সময় তাঁহাদিগকে পাল্কী সহ মালগাড়ীতে দেওয়া হইত। কিন্তু ই.বি. রেলওয়ে লাইনে আর পাল্কী পাওয়া গেল না। তখন তাঁহারা ট্রেণের রিজার্ভ করা সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ীতে বসিতে বাধ্য হইলেন।

শিলিগুড়ি ষ্টেশনেও পাল্কী বেহারা পাওয়া গেল না। এত বড় বিপদ—বিবিরা দার্জ্জীলিঙ্গের ট্রেণে উঠিবেন কি করিয়া? অতঃপর দুইটা চাদর চারিজন লোকে দুই দিকে ধরিল,— সেই চাদরের বেড়ার মধ্যে বিবিরা চলিলেন। হতভাগা পর্দ্দাধারী চাকরেরা ঠিক তাল রাখিয়া পার্ব্বত্য বন্ধুর পথে হাঁটিতে পারিতেছিল না। কখনও ডাইনের পর্দ্দা আগে যায়, বামের পর্দ্দা পিছনে থাকে ; কখনও বামের পর্দ্দা অগ্রসর হয়, আর ডাইনের পর্দ্দা পশ্চাতে। বেচারী বিবিরা হাঁটিতে আরও অপটু—তাঁহারা পর্দ্দা ছাড়িয়া কখনও আগে যান, কখনও পিছে রহিয়া যান ! কাহারও জুতা খসিয়া রহিয়া গেল—কাহারও দোপাট্টা উড়িয়া গেল !

সতের

প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের স্কুলে একজন লক্ষ্ণৌ নীবাসী শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, নাম আখতর জাহাঁ। তাঁহার তিনটি কন্যাও এই স্কুলে পড়িত। একদিন তিনি একালের মেয়েদের নির্লজ্জতার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে নিজের মেয়েদের বেহায়াপনার কথা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কথায় কথায় নিজের বধূ-জীবনের একটা গল্প বলিলেন : "এগারো বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। শ্বশুরবাড়ী গিয়া তাঁহাকে এক নির্জ্জন কক্ষে থাকিতে হইত। তাঁহার এক ছোট ননদ দিনে তিন চারি বার আসিয়া তাঁহাকে প্রয়োজন মত বাথ-রুমে পৌছাইয়া দিত। একদিন কি কারণে সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার সংবাদ লয় নাই। এদিকে বেচারী প্রকৃতির তাড়নায় অধীরা হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্ণৌ-এ মেয়েকে বড় বড় তামার পানদান যৌতুক দেওয়া হয়। তাঁহার মস্ত পানদানটা সেই কক্ষেই ছিল। তিনি পানদান খুলিয়া সুপারীর ডিবেটা বাহির করিয়া সুপারীগুলি একটা রুমালে ঢালিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি সেই ডিবেটা যে জিনিষ দ্বারা পূর্ণ করিয়া খাটের নীচে রাখিলেন, তাহা লিখিতব্য নহে! সন্ধ্যার সময় তাঁহার পিত্রালয়ের চাকরাণী বিছানা ঝাড়িতে আসিলে তিনি তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া ডিবের দুর্দ্দশার কথা বলিলেন। সে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "থাক, তুমি কেঁদ না; আমি কালই ডিবেটা কালাই (Tinning) করাইয়া আনিয়া দিব। সুপারী এখন রুমালেই বাঁধা থাকুক।"

আঠার

লাহোরের জনৈক ভুক্তভোগী ডাক্তার সাহেবের রোগিণী দর্শনের বর্ণনা এই :—

সচরাচর ডাক্তার আসিলে দুইজন চাকরাণী রোগিণীর পালঙ্কের শিয়রে ও পায়ের দিকে একটা মোটা বড় দোলাই ধরিয়া দাঁড়ায়। ডাক্তার সেই দোলাইয়ের একটু ফাঁকের ভিতর হাত দিয়া রোগিণীর নাড়ী পরীক্ষা করেন।[২]

এক বেগম সাহেবা নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। আমি বলিলাম ফেফড়ার অবস্থা দেখা দরকার; আমি পিঠের দিক হইতে দেখিয়া লইব। হুকুম হইল, "ষ্টেথিসকোপের নল, যেখানে বলেন, চাকরাণী রাখিয়া দিবে!" সকলেই জানেন, ফেফড়া বিভিন্ন স্থান হইতে পরীক্ষা করিলে পর রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমি অগত্যা কর্ত্তার হুকুমে রাজী হইলাম। চাকরাণী নলটা দোলাইয়ের ভিতরে বেগম সাহেবার কোমরে নেফার (পায়জামার উপরাংশের) কিছু উপরে রাখিল। কিছুক্ষণ পরে আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে কোন শব্দ শুনিতে পাই না কেন? দুঃসাহসে ভর দিয়া দোলাই একটু উঠাইয়া দেখিলাম,—দেখি কি নলটা কোমরে লাগান হইয়াছে! আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম।[৩]

---

২ আমাকে জনৈকা নন-পর্দ্দা মহিলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন (লেডী ডাক্তারের অভাবে পুরুষ), "ডাক্তারকে জিহবা দেখাইতে হইলে আপনি কি করিবেন? দোলাই ফুটা করিয়া তাহার ভিতর হতে জিহবা বাহির করিয়া দেখাইবেন নাকি?" আমি পাঠিকা ভগিনীদিগকে ঐ প্রশ্নের এবং আমার নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুরোধ করি। ডাক্তারকে চোখ, দাঁত এবং কান দেখাইতে হইলে তাঁহারা কি উপায়ে দেখাইবেন?

৩ ডাক্তার সাহেবের নিজের ভাষায় শুনুন : "লা হাওল বেলা কুওৎ! মযঁ দিক হো কর উঠ আয়া। আব নওয়াব সাহেব পুছ্‌তে হেঁ কে কেয়া পাতা লাগা? মযঁ কেয়া খাক বাতাতা কে কেয়া পাতা লাগা?"

উনিশ

জনৈক রেলপথে ভ্রমণকারীর বৃত্তান্তের সারাংশ এই : ষ্টেশনে টিকিট কেটে মনে মনে একটা হিসেব করলাম। তিনখানা ইন্টার ক্লাসের টিকিটের দরুন দেড় মণ জিনিষ নিতে পারবো, কিন্তু আমাদের জিনিষপত্তর ওজন করিলে পাঁচ মণের কম কিছুতেই হবে না। অনেক ভেবে-চিন্তে লগেজ না করাই ঠিক করলাম। মেয়েদের গাড়ীতে জিনিষপত্তর তুলে দিলে আর কে চেক করতে আসবে।

*

খোকা জিজ্ঞেস করলে,—তোমার সঙ্গে কোন জ্যান্ত লগেজ আছে নাকি?

আবার আছে না কি! একেবারে এক জোড়া! একে বুড়ী, তায় আবার থুড়থুড়ি।

খোকা বল্লে—তবেই সেরেছে!

*

যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন বেশ রাত হয়েছে।

অনুমানে বুঝলাম, একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী থেমে আছে। হঠাৎ মনে হ'ল, বহরমপুর হবে হয়ত। দরজাটা খুলে নামতে যাব, এমন সময় মনে হ'ল যেন শুনতে পেলাম, আমারই নাম ধরে কারা ডাকাডাকি করছে—"ও টুনু—টুনু, এতো ভারী বিপদে আজ পড়লাম,—টুনুরে!"

একে মেয়েলী গলা, তার ওপর আবার করুণ। আমি ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। দেখলাম, দুই বুড়ী মাটিতে দাঁড়িয়ে মহা কান্নাকাটি শুরু করেছে, আর জিনিষপত্তরগুলোও সব নামানো হয়েছে। চারদিকে তিন চার জন কুলী ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমার মেজাজ গরম হয়ে উঠ্‌ল। টি.টি.সি. অর্থাৎ চেকারগুলো যে রাত্রিবেলা মেয়েদের গাড়ী চেক ক'রে—মালপত্তর সব নামিয়ে দেবে এতো কম অন্যায় কথা নয়। আমি কুলীগুলোকে খুব বকে দিলাম, জিনিষপত্তর আবার গাড়ীতে তুলে দিতে বল্লাম। আর একবার কুলীগুলোকে এক চোট বকে দিলাম, এবং টি.টি.সিদের নামে যে রিপোর্ট করতে হবে, সে রকমও অনেক কথা বল্লাম।

ঠাকুরমা কেঁদে বল্লেন, "আরে টুনু, আমরা যে এসে পড়েছি।"

অবশেষে একটা কুলী সাহস করে বল্লে, "বাবু ঘাট আ গিয়া"।

আমি ঠাকুরমাকে বল্লাম,—তাহলে টি. টি. সি. চেক্ করে নামিয়ে দেয়নি—ঘাটে এসে পড়েছ; সে কথা আমাকে আগে বল্লেই হত, এ জন্য কান্নাকাটি কেন?

বিশ

জনৈকা পাঞ্জাবী বেগম সাহেবা নিম্নলিখিত গল্প কোন উর্দ্দু কাগজে লিখিয়াছেন :

আমরা একটা গ্রামে কিছুকাল ছিলাম। একবার তত্রত্য কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে গিয়া কুমারী মেয়েদের প্রতি যে অত্যধিক জুলুম হইতে দেখিলাম, তাহাতে আমি প্রাণে বড় আঘাত পাইলাম।

আমরা যথাসময় তথায় পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ীর মেয়েরা কোথায়? শুনিতে পাইলাম তাহারা সকলে রান্নাঘরে বসিয়া আছে। আমি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, কেবল একা আমাকে সেইখানে ডাকিয়া লওয়া হইল। রান্নাঘরে ভয়ানক গরম, আর স্থানও অতিশয় অল্প। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া সেইখানে বসিয়া সেই "মজলুম" কিন্তু মিষ্টভাষিণী বালিকাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম।

একজন দয়াবতী বিবি আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন, "তোমরা সাবধানে লুকাইয়া উপরে চলিয়া যাও।"

আমি মনে করিলাম, সম্ভবতঃ পুরুষমানুষদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই সাবধানে লুকাইয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু পরে জানিলাম, এ পর্দ্দা সাধারণ অভ্যাগতা মহিলাদের বিরুদ্ধে ছিল। উক্ত বিবি সাহেবার হুকুমে দুইজন মেয়েমানুষ মোটা চাদর ধরিয়া পর্দ্দা করিল, আমরা সেই চাদরের অন্তরাল হইতে উপরে চলিয়া গেলাম।

উপরে গিয়া আমি আরও বিপদে পড়িলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, ছাদের উপর আরামে বসিবার কোন কামরা হইবে, অথবা কমপক্ষে বর্ষাতি চালা হইবে। কিন্তু সেখানে কিছুই ছিল না। একে ত প্রখর রৌদ্র, দ্বিতীয়তঃ বসিবারও কিছু ছিল না। সমস্ত ছাদ জুড়িয়া অর্দ্ধ শুষ্ক ঘুঁটে ছড়ান ছিল ; তাহার দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল। বহু কষ্টে একজন চাকরাণী একটা খাটিয়া আনিয়া দিল, আমরা অগত্যা তাহাতেই বসিলাম। নীচে বাজনা বাজিতেছিল, উৎসব হইতেছিল। কিন্তু অভাগিনী অনূঢ়া বালিকা কয়টি অপরাধিণীর ন্যায় রৌদ্রে বসিয়া ঘুঁটের দুর্গন্ধে হাঁপাইতেছিল। কেহই ইহাদের আরামের জন্য একটুকু খেয়াল করিতেছিল না।

একুশ

বঙ্গদেশের কোন জমীদারের বাড়ী পুণ্যাহের উৎসব উপলক্ষে নাচ গান হইতেছিল। নর্ত্তকীরা বাহিরে যেখানে বিরাট শামিয়ানার নীচে নাচিতেছিল, সে স্থানটা বাড়ীর দেউড়ীর কামরা হইতে দেখা যাইত। কিন্তু বাড়ীর কোনও বিবি সে দেউড়ীর ঘরে যান নাই। নৃত্য দর্শন ও সঙ্গীত শ্রবণের সৌভাগ্য লইয়া বিবিরা ধরাধামে আসেন নাই।

জমীদার সাহেবের একটী তিন বৎসর বয়স্কা কন্যা ছিল। মেয়েটী দিব্যি গৌরাঙ্গী। তাহাকে আদর করিয়া কেহ বলিত, চিনির পুতুল, কেহ বলিত, ননীর পুতুল। নাম সাবেরা। ভোরের সময় রৌশন চৌকির ভৈরবী আলাপে নিদ্রিত পাখীরা জাগিয়া কলরব আরম্ভ করিয়াছে। সাবেরার 'খেলাই'ও (আধুনিক ভাষায় "আয়া") জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার সাধ হইল, একটু নাচ দেখিতে যাইবে। কিন্তু সাবেরা তখনও ঘুমাইতেছিল। সুতরাং খেলাই সে নিদ্রিতা শিশুকে কোলে লইয়া দেউড়ীর ঘরে নাচ দেখিতে গেল।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়! কর্ত্তা সেই সময় বহির্ব্বাটী হইতে অন্তঃপুরে আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সাবেরাকে কোলে লইয়া খেলাই খড়খড়ির পাখী তুলিয়া তামাসা দেখিতেছিল। তাঁহার হাতে একটা মোটা লাঠি ছিল, তিনি সেই লাঠি দিয়া খেলাইকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। খেলাইয়ের চিৎকারে বিবিরা দৌড়িয়া দেউড়ী ঘরে আসিলেন। এক লাঠি

লাগিল সাবেরার উরুতে। তখন কর্ত্তার ভ্রাতৃবন্ধু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ছোট সাহেব, করেন কি ! করেন কি ! মেয়ে মেরে ফেলবেন ?" প্রহারবৃষ্টি তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল। জমীদার সাহেব সক্রোধে কহিলেন, "হতভাগী, নিজে নাচ দেখবি, দেখ না, কিন্তু আমার মেয়েকে দেখাতে আনলি কেন ?"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিশু ত খেলাইয়ের কাঁধে মাথা রাখিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল,—সে বেচারী কিছুই দেখে নাই। বাড়ীময় শোরগোল পড়িয়া গেল।—সাবেরার দুধের মত শাদা ধবধবে উরুতে লাঠির আঘাতে এক বিশ্রী কালো দাগ দেখিয়া কর্ত্তাও মরমে মরিয়া গেলেন। এইরূপে লাঠির গুতায় আমাদের অবরোধ-কারায় বন্দী করা হইয়াছে।

বাইশ

শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্লাটফরমে ভরা সন্ধ্যার সময় এক ভদ্রলোক ট্রেণের অপেক্ষায় পায়চারী করিতেছিলেন। কিছু দূরে আর একজন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন ; তাঁহার পার্শ্বে এক গাদা বিছানা ইত্যাদি ছিল। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ ক্লান্তি বোধ করায় উক্ত গাদার উপর বসিতে গেলেন। তিনি বসিবা মাত্র বিছানা নড়িয়া উঠিল—তিনি তৎক্ষণাৎ সভয়ে লাফাইয়া উঠিলেন। এমন সময় সেই দণ্ডায়মান ভদ্রলোক দৌড়িয়া আসিয়া সক্রোধে বলিলেন,—"মশায়, করেন কি? আপনি স্ত্রীলোকদের মাথার উপর বসিতে গেলেন কেন?" বেচারা হতভম্ব হইয়া বলিলেন, "মাফ করিবেন, মশায় ! সন্ধ্যার আঁধারে ভালমতে দেখিতে পাই নাই, তাই বিছানার গাদা মনে করিয়া বসিয়াছিলাম। বিছানা নড়িয়া উঠায় আমি ভয় পাইয়াছিলাম যে, এ কি ব্যাপার !"

তেইশ

অপরের কথা দূরে থাকুক। এখন নিজের কথা কিছু বলি। সবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দ্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই ; অথচ পর্দ্দা করিতে হইত। পুরুষদের ত অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ, সুতরাং তাহাদের অত্যাচার আমাকে সহিতে হয় নাই। কিন্তু মেয়েমানুষের অবাধ গতি—অথচ তাহাদের দেখিতে না দেখিতে লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত ; অমনি বাড়ীর কোন লোক চক্ষুর ইসারা করিত, আমি যেন প্রাণ-ভয়ে যত্র-তত্র—কখনও রান্নাঘরের ঝাঁপের অন্তরালে, কখনও কোন চাকরাণীর গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটীর অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নীচে লুকাইতাম।

বাচ্চাওয়ালী মুরগী যেমন আকাশে চিল দেখিয়া ইঙ্গিত করিবা মাত্র তাহার ছানাগুলি মায়ের পাখার নীচে পালায়, আমাকেও সেইরূপ পালাইতে হইত। কিন্তু মুরগীর ছানার ত মায়ের বুকস্বরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় থাকে, তাহারা সেইখানে পালাইয়া থাকে ; আমার জন্য সেরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট নিরাপদ স্থান ছিল না। আর মুরগীর ছানা স্বভাবতঃই মায়ের ইঙ্গিত বুঝে—আমার ত সেরূপ কোন স্বাভাবিক ধর্ম্ম (instinct) ছিল না। তাই কোন সময় চক্ষের ইসারা বুঝিতে না পারিয়া দৈবাৎ না পলাইয়া যদি কাহারও সম্মুখীন হইতাম, তবে হিতৈষিণী মুরুব্বিগণ, "কলিকালের মেয়েরা কি বেহায়া, কেমন বেগয়রৎ" ইত্যাদি বলিয়া গঞ্জনা দিতে কম করিতেন না।

আমার পঞ্চম বর্ষ বয়সে কলিকাতা থাকাকালীন আমার দ্বিতীয় ভ্রাতৃবধূর খালার বাড়ী-বেহার হইতে দুইজন চাকরাণী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদের 'ফ্রী পাসপোর্ট' ছিল,—তাহারা সমস্ত বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইত, আর আমি প্রাণ-ভয়ে পলায়মান হরিণশিশুর মত প্রাণ হাতে লইয়া যত্র-তত্র—কপাটের অন্তরালে কিম্বা টেবিলের নীচে পলাইয়া বেড়াইতাম। ত্রিতলে একটা নির্জ্জন চিল-কোঠা ছিল; অতি প্রত্যুষে আমাকে খেলাই কোলে করিয়া সেইখানে রাখিয়া আসিত; প্রায় সমস্ত দিন সেইখানে অনাহারে কাটাইতাম। বেহারের চাকরাণীদ্বয় সমস্ত বাড়ী তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিবার পর অবশেষে সেই চিল-কোঠারও সন্ধান পাইল। আমার এক সমবয়সী ভগিনী-পুত্র, হালু দৌড়াইয়া গিয়া আমাকে এই বিপদের সংবাদ দিল। ভাগ্যে সেখানে একটা ছাপরখাট ছিল, আমি সেই ছাপরখাটের নীচে গিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলাম—ভয়, পাছে আমার নিঃশ্বাসের সাড়া পাইয়া সেই হৃদয়হীনা স্ত্রীলোকেরা খাটের নীচে উঁকি মারিয়া দেখে! সেখানে কতকগুলি বাক্‌স, পেটারা, মোড়া ইত্যাদি ছিল। বেচারা হালু, তাহার (৬ বৎসর বয়সের) ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সেইগুলি টানিয়া আনিয়া আমার চারি ধারে দিয়া আমাকে ঘিরিয়া রাখিল। আমার খাওয়ার খোঁজখবরও কেহ নিয়মমত লইত না। মাঝে মাঝে হালু খেলিতে খেলিতে চিল-কোঠায় গিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাকেই ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা বলিতাম। সে কখনও এক গ্লাস পানি, কখনও খানিকটা "বিন্নি" (খই বিশেষ) আনিয়া দিত। কখনও বা খাবার আনিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিত না—ছেলে মানুষ ত, ভুলিয়া যাইত। প্রায় চারিদিন আমাকে ঐ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল।

চব্বিশ

বেহার অঞ্চলে শরীফ ঘরানার মহিলাগণ সরচাচর রেলপথে ভ্রমণের পথে ট্রেণে উঠেন না। তাঁহাদিগকে বনাতের পর্দ্দা ঢাকা পাল্কীতে পুরিয়া, সেই পাল্কী ট্রেণের মালগাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হয়। ফল কথা, বিবিরা পথের দৃশ্য কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা ব্রুকবণ্ড চায়ের মত Vacuum টিনে প্যাক হইয়া দেশ ভ্রমণ করেন। কিন্তু এই কলিকাতার এক ঘর সম্ভ্রান্ত পরিবার উহার উপরও টেক্কা দিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ীর বিবিদের রেলপথে কোথাও যাইতে হইলে প্রথমে তাঁহাদের প্রত্যেককে, পাল্কীতে বিছানা পাতিয়া, একটা তালপাতার হাত পাখা, এক কুজা পানি এবং একটা গ্লাস সহ বন্ধ করা হয়। পরে সেই পাল্কীগুলি তাঁহাদের পিতা কিম্বা পুত্রের সম্মুখে চাকরেরা যথাক্রমে—(১) বনাতের পর্দ্দা দ্বারা প্যাক করে; (২) তাহার উপর মোম-জমা কাপড় দ্বারা সেলাই করে; (৩) তাহার উপর খারুয়ার কাপড়ে ঘিরিয়া সেলাই করে; (৪) তাহার পর বোম্বাই চাদরের দ্বারা সেলাই করে; (৫) অতঃপর সর্ব্বোপরে চট মোড়াই করিয়া সেলাই করে। এই সেলাই ব্যাপার তিন চারি ঘণ্টা ব্যাপিয়া হয়—আর সেই চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাড়ীর কর্ত্তা ঠায় উপস্থিত থাকিয়া খাড়া পাহারা দেন। পরে বেহারা ডাকিয়া পাল্কীগুলি ট্রেণের ব্রেকভ্যানে তুলিয়া দেওয়া হয়।" অতঃপর গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পর, পুনরায় পুরুষ অভিভাবকের সম্মুখে ক্রমান্বয়ে পাল্কীগুলির সেলাই খোলা হয়। সেলাই খুলিয়া পাল্কীগুলি বনাতের পর্দ্দা ঢাকা অবস্থায় রাখিয়া চাকরেরা সরিয়া যায়। পরে কর্ত্তা স্বয়ং এবং বাড়ীর অপর আত্মীয় এবং মেয়েমানুষেরা আসিয়া পাল্কীর কপাট খুলিয়া মুমূর্ষা বন্দিনীদের অজ্ঞান অবস্থায় বাহির করিয়া যথারীতি মাথায় গোলাপজল ও বরফ দিয়া,

মুখে চামচ দিয়া পানি দিয়া, চোখে মুখে পানির ছিটা দিয়া বাতাস করিতে থাকেন। দুই ঘণ্টা বা ততোধিক সময়ের শুশ্রূষার পর বিবিরা সুস্থ হন।

পঁচিশ

"অবরোধ-বাসিনী"র ১১নং প্যারায় লিখিয়াছি যে, আমি গত ১৯২৪ সনে আমার দুই নাতিনের বিবাহোপলক্ষে আরায় গিয়াছিলাম। কিন্তু আমি আরা শহরটার সেই বাড়ীখানা এবং আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। আমার "মেয়েকে" (অর্থাৎ মেয়ের মৃত্যুর পর জামাতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে) সেই কথা বলায় তিনি অতি মিনতি করিয়া আমাকে বলিলেন, "আম্মা, আপনি যদি দয়া করিয়া শহর দেখিতে চান, তবে আমরাও আপনার জুতার বরকতে শহরটা একটু দেখিয়া লইব। আমরা সাত বৎসর হইতে এখানে আছি, কিন্তু শহরের কিছুই দেখি নাই।" সদ্যপরিণীতা মজু এবং সবুও সকাতরে বলিল, "হ্যাঁ নানি আম্মা, আপনি আব্বাকে বলিলেই হইবে।"

আমি ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন বাবাজীবনকে একখানা গাড়ী সংগ্রহ করিয়া দিতে বলায়, তিনি প্রতিদিনই অতি বিনীতভাবে জানাইতেন যে গাড়ী পাওয়া যায় না। শেষের দিন বিকালে তাঁহার ১১ বৎসর বয়স্ক পুত্র আমাদের সংবাদ দিল যে যদি বা একটা ভাড়াটে গাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু তাহার জানালার একটা পাখী ভাঙ্গা। মজু অতি আগ্রহের সহিত বলিল, "সেখানটায় আমরা পর্দ্দা করিয়া লইব—আল্লার ওয়াস্তে তুমি গাড়ী ফেরত দিও না।" সবু ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "ভালই হইয়াছে, ঐ ভাঙ্গা জানালা দিয়া ভালমতে দেখা যাইবে।" আমরা যতবারই গাড়ীতে উঠিতে যাইবার জন্য তাড়া দিই, ততবারই শুনি : সবুর করুন, বাহিরে এখনও পর্দ্দা হয় নাই।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ীতে উঠিতে গিয়া দেখি, সোবহান আল্লাহ্ ! দুই তিন খানা বোম্বাইয়ে চাদর দিয়া গাড়ীটা সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলা হইয়াছে। জামাতা স্বয়ং গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিলেন, আমরা গাড়ীতে উঠিবার পর তিনি স্বহস্তে কাপড় দিয়া দরজা বাঁধিয়া দিলেন। গাড়ী কিছু দূরে গেলে, মজু সবুকে বলিল, "দেখ এখন ভাঙ্গা জানলা দিয়া !" সেই পর্দ্দার এক স্থলে একটা ছিদ্র ছিল, মজু, সবু এবং তাহাদের মাতা সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন, আমি আর সে ফুটা দিয়া দেখিবার জন্য তাহাদের সহিত কাড়াকাড়ি করিলাম না।

ছাব্বিশ

আমাদের ন্যায় আমাদের নামগুলি পর্য্যন্ত পর্দ্দানশীনা। মেয়েদের নাম জানা যায়, কেবল তাহাদের বিবাহের কাবিন লিখিবার সময়। এক মস্ত জমীদারের তিন কন্যার বিবাহ একই সঙ্গে হইতেছিল। মেয়েদের ডাকনাম বড় গেন্দলা, মেজো গেন্দলা, এবং ছোট গেন্দলা—প্রকৃত নাম কেহই জানে না। তাহাদের সম্পর্কের এক চাচা হইলেন বিবাহ পড়াইবার মোল্লা। কন্যাদের বয়স অনুসারে তিন জন বরের বয়সেরও তারতম্য ছিল। তিন জন বরই বিবাহ কেন্দ্রে অনুপস্থিত। আমরা পাঠিকাদের সুবিধার নিমিত্ত বরদিগকে বয়স অনুসারে ১নং, ২নং এবং ৩নং বলিব।

মোল্লা সাহেবের হাতে তিন বর এবং তিন কন্যার নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। তিনি যথাসময় বিবাহের মন্ত্র পড়াইতে বসিয়া ভ্রমবশতঃ বর ও কন্যাদের নাম গোলমাল করিয়া ১নং বরের সহিত ছোট গেন্দলার বিবাহ দিয়া দিলেন ; ৩নং বরের সহিত মেজো গেন্দলার বিবাহ দিলেন। এখন ২নং বরের সহিত বড় গেন্দলার বিবাহের পালা। মেজো ও ছোট গেন্দলার বয়স খুব অল্প—১১ এবং ৭ বৎসর, তাই তাহারা কোন উচ্চ বাচ্য করে নাই। কিন্তু বড় গেন্দলার বয়স ১৯ বৎসর ; সে লুকাইয়া ছাপাইয়া মুরুব্বিদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া জানিয়াছিল, তাহার বিবাহ হইবে, ১নং বরের সহিত। আর বরের নামও তাহার জানা ছিল। সুতরাং ২নং বরের নাম লইয়া মোল্লা সাহেব যখন বড় গেন্দলার "এজেন" চাহিলেন, সে আর কিছুতেই মুখ খোলে না। মা, মাসীর উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও যখন সে কিছু বলিল না, তখন তাহার মাতা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া মোল্লা সাহেবকে বলিলেন, "হাঁ, গেন্দলা হুঁ বলেছে; বিয়ে হয়ে গেছে, তুমি আর কতকক্ষণ হয়রাণ হবে।" তিনি বলিলেন, "আমরা গেন্দলার মুখের "হুঁ" শুনি নাই, তবে কি আপনার "হুঁ" লইয়া আপনারই বিবাহ পড়াইব নাকি?" তদুত্তরে ক'নের মা তাঁহার পিঠে এক বিরাট কিল বসাইয়া দিলেন। অবশেষে গেন্দলা বেচারী "হুঁ" বলিল কিনা আমরা সে খবর রাখি না।

এদিকে যথাসময়ে টেলিগ্রাফযোগে ৩০ বৎসর বয়স্ক ১নং বর যখন জানিলেন যে, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, (১৯ বৎসর বয়স্কা বড় গেন্দলার পরিবর্ত্তে) সর্ব্বকনিষ্ঠা ৭ম বর্ষীয়া ছোট গেন্দলার সহিত, তখন তিনি চটিয়া লাল হইলেন—শাশুড়ীকে লিখিলেন কন্যা বদল করিয়া দিতে ; নচেৎ তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে জুয়াচুরির মোকদ্দমা আনিবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাতাশ

প্রায় ১০/১১ বৎসরের ঘটনা। বলিয়াছি ত বেহার অঞ্চলে বিবাহের তিন মাস পূর্ব্বে "মাইয়া খানায়" বন্দি করিয়া মেয়েদের আধমরা করা হয়। ও কখনও ঐ বন্দিশালায় বসিবার মেয়াদ,––যদি বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা হইয়া বিবাহের তারিখ পিছাইয়া যায় তবে—বৎসর কালও হয় ; এক বেচারী সেইরূপ ছয়মাস পর্য্যন্ত বন্দিনী ছিল। তাহার স্নান, আহার প্রভৃতির বিষয়েও যথাবিধি যত্ন লওয়া হইত না। একেই ত বেহারী লোকেরা সহজে স্নান করিতে চায় না, তাহাতে আবার "মাইয়াখানার" বন্দিনী মেয়েকে কে ঘন ঘন স্নান করাইবে? ঐ সময় মেয়ে মাটিতে পা রাখে না—প্রয়োজনমত তাহাকে কোলে করিয়া স্নানাগারে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার নড়াচড়া সম্পূর্ণ নিষেধ। সমস্ত দিন মাথা গুঁজিয়া একটা খাটিয়ার উপর বসিয়া থাকিতে হয় ; রাত্রিকালে সেইখানেই শুইতে হয়। অপরে মুখে তুলিয়া ভাতের গ্রাস খাওয়ায়, অপরে "আবখোরা" ধরিয়া পানি খাওয়াইয়া দেয়। মাথার চুলে জটা হয়, হউক—সে নিজে মাথা আঁচড়াইতে পাইবে না—ফল কথা, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য তাহাকে পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। যাহা হউক, ছয় মাস অন্তর সেই মেয়েটির বিবাহ হইলে দেখা গেল, সর্ব্বদা চক্ষু বুজিয়া থাকার ফলে তাহার চক্ষু দুইটি চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে!

আটাশ

বহুকালের ঘটনা। বহু পুণ্যফলে আরবদেশীয় কোন মহিলা কলিকাতায় তশরীফ আনিয়াছিলেন। তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দ্দু বলিতে শিখিয়াছিলেন। যখন দলে দলে বিবিরা

পাল্কীযোগে তাঁহার জেয়ারত করিতে আসিতেন, তিনি পাল্কী দেখিয়া হয়রাণ হইতেন যে এ "আজাব" কেন?

একদিন পূর্ব্ববঙ্গের এক বিবি আসিয়াছিলেন। আরবীয়া মহিলা কুশল প্রশ্ন প্রসঙ্গে আগন্তুক বিবির স্বামীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দান কালে বাঙ্গাল বিবি মাথার ঘোমটা টানেন আর বলেন, "তানি ত বালই আছেন, তানার আবার কি অইব? তানি ত বালই আছেন।" বেচারী আরবীয়া বিবি বুঝিতেই পারিলেন না যে, স্বামীর কুশল বলিবার সময় ঘোমটা টানার প্রয়োজন হইল কেন?

আরবীয়া বিবি বাঙ্গালার বিবিদের পাল্কীতে উঠা ব্যাপারটা কৌতুকের সহিত দাঁড়াইয়া দেখিতেন। একদিন এক বোর্কাপরিহিতা বিবি পাল্কীতে উঠিলেন, তাঁহার কোলে দুই বৎসরের শিশু, সঙ্গে পানদান, একটা বড় কাঠের বাক্স, একটা কাপড়ের গাঁটরী এবং এক কূজা পানি। পাল্কীটার বেতের ছাউনি ভাঙ্গা ছিল, তাহা পূর্ব্বে কেহ লক্ষ্য করে নাই। বেহারাগণ যখন পাল্কী তুলিল, অমনি মড়মড় করিয়া পাল্কীর বেত্রাসন ভাঙ্গিতে লাগিল। পাল্কীর দুই পার্শ্বে দুই বরকন্দাজ চলিয়াছে—তাহারা শিশুটিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেবজাদা, মড়মড় শব্দ করে কি?" কিন্তু পাল্কী হইতে কোন উত্তর আসিল না ; — একটু পরে গেট পার হইয়া পাল্কীটা অত্যন্ত হাল্‌কা বোধ হওয়ায় বেহারাগণ থমকিয়া দাঁড়াইল। ওদিকে ভাঙ্গা পাল্কী গলাইয়া বোর্কা পরা বিবি ছেলেকে আঁকড়িয়া ধরিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছেন ; গাঁটরী, পানদান সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কূজা ভাঙ্গিয়া পানি পড়িয়া তিনি ভিজিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু তবু মুখে বলেন নাই—"পাল্কী থামাও!" কলিকাতার রাস্তায় এই ব্যাপার!—বেচারী আরবের বিবি তাড়াতাড়ি চাকরাণী পাঠাইয়া বিবিটীকে আনাইয়া বলিলেন, "বিবি, পাল্কীর এমন তামাসা দেখিবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না!"

উনত্রিশ

একবার আমি কোন একটি লেডীজ কনফারেন্স উপলক্ষে আলীগড়ে গিয়াছিলাম। সেখানে অভ্যাগতা মহিলাদের নানাবিধ বোর্কা দেখিলাম। একজনের বোর্কা কিছু অদ্ভুত ধরনের ছিল। তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ের পর তাঁহার বোর্কা প্রশংসা করায় তিনি বলিলেন,—"আর বলিবেন না—এই বোর্কা লইয়া আমার যত লাঞ্ছনা হইয়াছে!" পরে তিনি সেই সব লাঞ্ছনার বিষয় যাহা বলিলেন, তাহা এই :

তিনি কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ী শাদীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে (বোর্কা সহ) দেখিবামাত্র সেখানকার ছেলে-মেয়েরা ভয়ে চীৎকার করিয়া কে কোথায় পলাইবে, তাহার ঠিক নাই। আরও কয়েক ঘর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার স্বামীর আলাপ ছিল, তাই তাহার সকলের বাড়ীই যাইতে হইত। কিন্তু যতবার যে বাড়ী গিয়াছেন, ততবারই ছেলেদের সভয় চীৎকার ও কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছেন। ছেলেরা ভয়ে থরথর কাঁপিত।

তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা চারি পাঁচ জনে বোর্কা সহ খোলা মোটরে বাহির হইলে পথের ছেলেরা বলিত, "ওমা! ওগুলো কি গো?" একে অপরকে বলে,

"চুপ কর!—এই রাত্রিকালে ওগুলো ভূত না হয়ে যায় না।" বাতাসে বোর্কা নেকাব একটু আধটু উড়িতে দেখিলে বলিত— "দেখ্‌রে দেখ্‌! ভূতগুলার শুঁড় নড়ে— ! বাবারে! পালা রে!"

তিনি এক সময় দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। ঘুম ষ্টেশনে পৌঁছিলে দেখিলেন, সমবেত জনমণ্ডলী একটা বামন লোককে দেখিতেছে—বামনটা উচ্চতায় একটা ৭/৮ বৎসরের বালকের সমান, কিন্তু মুখটা বয়োপ্রাপ্ত যুবকের,—মুখভরা দাড়ী গোঁফ। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, জনমণ্ডলীর কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার দিকে! দর্শকেরা সে বামন ছাড়িয়া এই বোর্কা ধারিণীকে দেখিতে লাগিল!

অতঃপর দার্জ্জিলিং পৌঁছিয়া তাঁহারা আহারান্তে বেড়াইতে বাহির হইলেন; অর্থাৎ রিক্‌শ গাড়ীতে করিয়া যাইতেছিলেন। "মেলে" গিয়া দেখিলেন, অনেক লোকের ভীড়; সেদিন তিব্বত হইতে সেনা ফিরিয়া আসিতেছিল, সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য লোকের ভীড়। তাঁহার রিকশখানি পথের একধারে রাখিয়া তাঁহার কুলিরাও গেল,—তামাসা দেখিতে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দেখেন, দর্শকেরা সকলেই এক একবার রিক্‌শর ভিতর উঁকি মারিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেছে!

তিনি পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইলে পথের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিত। দুই একটা পার্ব্বত্য ঘোড়া তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে সওয়ার শুদ্ধ লাফালাফি আরম্ভ করিত! একবার চায়ের বাগানে বেড়াইতে গিয়া দেখেন, তিন চারি বৎসরের এক বালিকা মস্ত ঢিল তুলিয়াছে, তাঁহাকে মারিতে![৪]

একবার তাঁহার পরিচিতা আরও চারি পাঁচজন বিবির সহিত বেড়াইবার সময় একটা ক্ষুদ্র ঝরণার ধারে কঙ্করবিশিষ্ট কাদায় সকলেই বোর্কায় জড়াইয়া পড়িয়া গেলেন। নিকটবর্ত্তী চা বাগান হইতে কুলিরা দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাদের তুলিল; আর স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনায় বলিল, "একে ত জুত্তা পরেছ, তার উপর আবার ঘেরাটোপ,—এ অবস্থায় তোমরা গড়াইবে না ত কি করিবে?" আহা! বিবিদের কারচুবি কাজ করা দো-পাট্টা কাদায় লতড়-পতড়, আর বোর্কা ভিজিয়া তর-বতর! কেবল ইহাই নহে, পথের লোক রোরুদ্যমান শিশুকে চুপ করাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিত,—"চুপ কর, ঐ দেখ মক্কা মদিনা যায়,-ঐ!—ঘেরাটোপ জড়ানো জুজুবুড়ী,—ওরাই মক্কা মদিনা!!"

ত্রিশ

কোন একটী কুলে শীলে ধন্য সৎ পাত্রের সহিত এক জমীদারের বয়োপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহ ঠিক হইয়াছিল। কি কারণে বরের পিতার সহিত কন্যাকর্ত্তার ঝগড়া হওয়ায় বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। ইহাতে পাত্রী যাহার পর নাই দুঃখিতা হইল।

কন্যার পিতা তাড়াতাড়ি অন্য বর না পাইয়া নিজের এক দুরাচার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে বসিলেন। সে বেচারী তাহার খুড়তাতো ভাইয়ের কুকীর্ত্তির বিষয় সমস্তই

৪. বাঙ্গালী ও গুর্খায় প্রভেদ দেখুন; যৎকালে বাঙ্গালী ছেলেরা ভয়ে চীৎকার করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া পলাইত, সে সময় গুর্খাশিশু আত্মরক্ষার জন্য ঢিল তুলিয়াছে সে ভয়াবহ বস্তুকে মারিতে!

অবগত ছিল,—কত দিন সে নিজেই ঐ মাতালটাকে তেঁতুলের শরবত খাওয়াইয়া এবং মাথায় জল ঢালিয়া তাহার মাতলামী দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং এ বিবাহে তাহার ঘোর আপত্তি ছিল।

কিন্তু পাত্রী ত মূক,—তাহার বাক্‌শক্তি থাকিয়াও নাই। তাহার একমাত্র সম্বল নীরব রোদন। তাই সে কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু নিষ্ঠুর পিতামাতার ভ্রূক্ষেপ নাই,—তাঁহারা ঐ মাতালের সহিত তাহার বিবাহ দিবেনই দিবেন। এইরূপেই আমাদের কাঠমোল্লা শ্রেণীর মুরুব্বিগণ শরিয়তের গলা টিপিয়া মারিয়া ইসলাম ও শরিয়ত রক্ষা করিতেছে!

বিবাহ-সভায় বসিয়া পাত্রী কিছুতেই "হুঁ" বলিতেছিল না। মাতা, পিতামহী প্রভৃতির অনুনয়, সাধ্যসাধনা, মিষ্ট ভর্ৎসনা,—সবই সে দুই চক্ষের জলে ভাসাইয়া দিতেছিল। অবশেষে একজনে অতর্কিতে কন্যাকে খুব জোরে চিমটি কাটিল; সেই আঘাতে সহসা "উহু— !" বলিয়া সে কাতর ধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই "উহু"কে "হুঁ" বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার বিবাহ ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। সোবহান্ আল্লাহ্! জয়, অবরোধের জয়!

একত্রিশ

একবার কোন স্থলে চলন্ত ট্রেণে মেয়েমানুষদের কক্ষে একটা চোর উঠিল। চোর বহাল তবিয়তে একে একে প্রত্যেকের অলঙ্কার খুলিয়া লইল; কিন্তু লজ্জায় জড়সড় লজ্জাবতী অবলা সরলা কুলবালাগণ কোন বাধা দিলেন না। তাঁহারা সকলে ক্রমাগত ঘোমটা টানিতে থাকিলেন। "তওবা! তওবা! কাঁহা সে মর্দ্দুয়া আ গয়া!" বলিয়া কেহ কেহ বোর্কার "নেকাব" টানিলেন। পরে চোর মহাশয় ট্রেণের এলার্মের শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইয়া নির্ব্বিঘ্নে নামিয়া গেল।

বত্রিশ

ভাংনীর জমীদার সাহেবের ডাকনাম,—ধরুন—বাচ্চা মিয়া। তাঁহার পত্নীর নাম হাসিনা খাতুন। হাসিনার পিতার বিশাল সম্পত্তি,—অগাধ টাকা। একবার বাচ্চা মিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আমার টাকার দরকার, আজই তোমার পিতার নিকট পত্র লিখাইয়া টাকা আনাইয়া দাও।" যথাসময়ে টাকার পরিবর্ত্তে তথা হইতে মিতব্যয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে এক বক্তৃতার ন্যায় পত্র আসিল।

বাচ্চা মিয়ার শ্বশুর অনেকবার জামাতাকে টাকা দিয়াছেন। এখন টাকা দানে তাঁহার অরুচি জন্মিয়া গিয়াছে। তাই কন্যাকে টাকা না পাঠাইয়া উপদেশ পাঠাইলেন। ইহাতে বাচ্চা মিয়া রাগ করিয়া স্ত্রীর "নাইওর" (পিত্রালয়) যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

এক দিকে পিতামাতা কাঁদেন, অপর দিকে হাসিনা নীরবে কাঁদেন—পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ আর হয় না। কিছু কাল পরে হাসিনার ভ্রাতা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন।

তিনি সোজা ভাংনী না গিয়া পথে দুই ক্রোশ দূরে ফুলচৌকী নামক গ্রামে তাঁহার মাসীমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ভাংনীতে সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি অপরাহ্নে তথায় যাইবেন।

যাহাতে ভ্রাতা ও ভগিনীতে দেখা না হইতে পারে, সে জন্য বাচ্চা মিয়া এক ফন্দী করিলেন। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন যে তাঁহাদের লইয়া যাইবার জন্য ফুলচৌকী হইতে লোক আসিয়াছে। হাসিনা স্বামীর চালবাজী জানিতেন, সহসা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না; তিনি কোন প্রকারে জানিতে পারিয়াছিলেন যে অদ্য অপরাহ্নে তাঁহার ভাই সা'ব আসিবেন।

বাচ্চা মিয়া পুনরায় কহিলেন, "ভাই সা'বের মাথা ধরিয়াছে, তিনি আজ আসিতে পারিবেন না। সেই জন্য খালা আম্মা ইয়ার মাহমুদ সর্দ্দারকে পাঠাইয়াছেন আমাদের লইয়া যাইতে। তুমি আমার কথা বিশ্বাস না কর ত চল দেউড়ী ঘরে গিয়া স্বকর্ণে সর্দ্দারের কথা শুন।"

তদনুসারে দেউড়ী ঘরের দ্বারের বাহিরে ইয়ার মাহমুদকে ডাকিয়া আনা হইল। ঘরের ভিতর হইতে বাচ্চা মিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়ার মাহমুদ! তুমি এখন ফুলচৌকী হইতে আইস নাই?" সে উত্তর করিল, "হাঁ হুজুর! আমিই খবর নিয়া আসিয়াছি—"বাচ্চা মিয়া তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িয়া তাহাকে আর বেশী কিছু বলিতে দিলেন না।

হাসিনা হাসি-খুশী, মাসীমার বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার জন্য বানাতের ঘেরাটোপ ঢাকা পাল্কী সাজিল, তাঁহার বাঁদীদের জন্য খেরুয়ার ওয়াড় ঘেরা গোটা আষ্টেক ডুলী সাজিল, বাচ্চা মিয়ার মেয়ানা, (খোলা পাল্কী বিশেষ) সাজিল। আর্দ্দালী, বরকন্দাজ, আসাবরদার, সোটাবরদার ইত্যাদি সহ তাঁহারা বেলা ১টার সময় রওয়ানা হইলেন।

পথে যখন হাসিনা বুঝিতে পারিলেন যে দুইখানি ডিঙ্গী নৌকা যুড়িয়া, তাহার উপর তাঁহার পাল্কী রাখিয়া নদী পার করা হইতেছে, তখন তিনি রোদন আরম্ভ করিলেন যে ফুলচৌকী যাইতে ত নদী পার হইতে হয় না,—আল্লারে, আল্লাহ্! সা'ব তাঁহাকে এ কোন জায়গায় আনিলেন!! পাল্কীতে মাথা ঠুকিয়া কান্না ছাড়া অবরোধ-বাসিনী আর কি করিতে পারে?

তেত্রিশ

প্রায় ১৮ বৎসর হইল, কলিকাতায় একটি দেড় বৎসর বয়স্কা শিশুর জ্বর হইয়াছিল। তাঁহাদের অবরোধ অতি কঠোর,—তাই অতটুকু মেয়েকেও কোন হি-ডাক্তার দেখিতে পাইবেন না, সুতরাং শি-ডাক্তার আসিয়াছেন। বাড়ী ভরা যে স্ত্রীলোকেরা আছেন, তাঁহাদের একমাত্র "শরাফত" ব্যতীত আর কোন গুণ নাই। তাঁহারা লেডী ডাক্তার মিস গুপ্তকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মিস গুপ্ত দেখিয়া শুনিয়া রোগী মেয়েকে গরম জলে স্নান করাইতে চাহিলেন।

শি-ডাক্তার মিস গুপ্ত চাহেন গরম জল,—বিবিরা দেখেন একে অপরের মুখ! তিনি চাহেন ঠাণ্ডা জল,—বিবিরা বলেন, "বাপ্‌রে! ঠাণ্ডা জলে স্নান করালে মেয়ের জ্বর বেড়ে যাবে!" ফল কথা, বেচারী মিস গুপ্ত সে দিন কিছুতেই তাঁহাদিগকে নিজের বক্তব্য বুঝাইতে পারিলেন না। তিনি বাহিরে আসিয়া কর্ত্তার নায়েব সাহেবকে সমস্ত বলিয়া বিদায় হইবার সময় বলিলেন, তিনি এ বাড়ীতে আর আসিবেন না। নায়েব সাহেব অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে ১৬্ ফী গছাইয়া দিয়া পর দিন আবার আসিতে বলিলেন।

পরদিন আবার শি–ডাক্তার মিস গুপ্তকে লইয়া বাড়ীর গিন্নীদের গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। বে–গতিক দেখিয়া নায়েব সাহেব তাঁহার পরিচিতা জনৈকা মহিলাকে আনিয়া মিস গুপ্তের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বীণাপাণি (নায়েব সাহেবের প্রেরিতা সেই বাঙ্গালী মহিলা) আসিয়া দেখেন, লেডী ডাক্তার রাগিয়া ভূত হইয়া আছেন। আর সমবেত বিবিরা দাঁড়াইয়া ভয়ে থর থর কাঁপিতেছেন,—তাঁহাদের মুখে ধান দিলে খই ফোটে! শেষে মিস গুপ্ত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ময়ঁ তামাসা দেখ্‌নে নেহীঁ আয়ী হোঁ!"

বীণাপাণি চুপিচুপি বিবিদের জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাপার কি? তাঁহারা বলিলেন, "বুঝিতে পারি না,—তিনি তোয়ালে চাহেন, টব চাহেন, কিন্তু আমরা যাহা দিই, তাহাই দূরে ছুঁড়িয়া ফেলেন।"

পরে তিনি মিস গুপ্তকে তাঁহার বিরক্তির কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি হাতের ঘড়ী দেখিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি! আধ ঘণ্টার উপর হয়ে এ'ল, এখন পর্য্যন্ত মেয়েকে স্নান করাবার জন্য কোন জিনিষ পেলুম না।" বীণা সভয়ে বলিলেন, "উঁহারা যে জিনিষ দেন, তাই নাকি আপনি পসন্দ করেন না?"

মিস গুপ্ত বলিলেন, "কি করে পসন্দ করব বলুন দেখি? আমি চাই একটা বাথ–টাব তাতে বসিয়ে শিশুকে স্নান করাব, ওঁরা দেন আমাকে এতটুকু একটা একসেরা ডেকচি—কাজেই আমি ছুঁড়ে ফেলেছি! আপনিই বলুন ত ঐটুকু ডেকচির ভিতর আমি শিশুকে বসাই কি করে? আমি চাই নরম পুরাতন কাপড়, শিশুর গা মুছে দেবার জন্য, ওঁরা দেন আমাকে নূতন খস্‌খসে তোয়ালে,—কাজেই আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি! আমাকে ঐশ্বর্য্য দেখান যে নূতন তোয়ালে আছে! এঁরা মনে করেন যে এঁরা পীর—তাই Everybody should worship them!"

শেষে বীণা সমস্ত জিনিষ যোগাড় করিয়া দিয়া শিশুকে স্নান করাইতে মিস গুপ্তের সাহায্য করিলেন। তখন রাগ পড়িয়া গিয়া তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল; বিবিরাও নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

চৌত্রিশ

শুনিয়াছি বঙ্গদেশের কোন শরীফ খান্দানের বাড়ীর নিয়ম এই যে বিবাহের সময় কন্যাকে "হুঁ" বলিয়া এজেন দিতে হয় না। মেয়ের কণ্ঠস্বরের ঐ "হুঁ" টুকুই বা পরপুরুষে শুনিবে কেন? সেই জন্য বিবাহসভায় মোটা পর্দ্দার একদিকে পাত্রীর উকিল, সাক্ষী, আত্মীয়স্বজন এবং বর পক্ষের লোকেরা থাকে, অপর পার্শ্বে কন্যাকে লইয়া স্ত্রীলোকেরা বসে। পর্দ্দার নীচে একটা কাঁসার থালা থাকে,—থালার অর্দ্ধেক পর্দ্দার এপারে, অপর অর্দ্ধাংশ পর্দ্দার ওপারে থাকে।

বিবাহের কলেমা পড়ার পর কন্যার কোন সঙ্গিনী বা চাকরাণী একটা সরোতা (যাঁতী) সেই থালার উপর ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দেয়—যাঁতীটা সশব্দে পুরুষদের দিকে গিয়া পড়িলে বিবাহ–ক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি কথা মনে পড়িল। লক্ষ্ণৌ–এর এক বিবির সহিত আমার আলাপ আছে। একদিন তাহার বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছি; কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সপ্তম বর্ষীয় পুত্র দুষ্টামী করায় তিনি তাহাকে "হারামী—" বলিয়া গালি দিয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। ছেলে

পলাইয়া গেলে পর আমি তাঁহাকে বিনা সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ গালি তিনি কাহাকে দিলেন,—ছেলেকে, না ছেলের মাতাকে? তিনি তদুত্তরে সহাস্যে বলিলেন যে বিবাহের সময় যদিও তিনি বয়োপ্রাপ্তা ছিলেন তথাপি কেহ তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করে নাই। বিবাহ মজলিসে তিনি "হুঁ" "হাঁ" কিছুই বলেন নাই; জবরদস্তী তাঁহার শাদী দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার "সব বাচ্চে হারামজাদে!"

পঁয়ত্রিশ

মরহুম মৌলবী নজীর আহমদ খাঁ বাহাদুরের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিত দিল্লী গদরের সময় অবরোধ-বন্দিনী মহিলাদের দুর্দ্দশার বর্ণনা হইতে অংশবিশেষের অনুবাদ এই :

রাত্রি ১০টার সময় আমার ভাইজানকে কাপ্তেন সাহেবের প্রেরিত লোকটি বলিল যে, আমরা রাত্রি ২টার সময় বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিব। আপনাদের বাড়ীর নিকটেই তোপ লাগান হইয়াছে। অতএব আপনারা আক্রমণের পূর্ব্বেই প্রাণ লইয়া পলায়ন করুন। এ সংবাদ শুনিবামাত্র আমাদের আত্মা শুকাইয়া গেল। কিন্তু কোন উপায় ছিল না!

শেষে আমরা পদব্রজে যাত্রা করিতে বাধ্য হইলাম। সে দিনের দুঃখের কথা মনে হইলে এখনও মনে দুঃখ হয়, হাসিও পায়। এক কর্ত্রী সাহেবা সমস্ত ধন-দৌলত ছাড়িয়া পানদান সঙ্গে লইয়া চলিলেন। হতভাগীদের মোটেই হাঁটিবার অভ্যাস নাই— এখন প্রাণের দায়ে হাঁটিতে গিয়া কাহারও জুতা খসিয়া রহিয়া গেল, কাহাও ইজারবন্দ পায়ে জড়াইয়া গেল; সে দিন যাঁর পায়জামার পাঁয়চা যত বড় ছিল, তাঁহারই হাঁটিতে তত অধিক কষ্ট হইতেছিল। ভাইজান সে সময় তিক্তবিরক্ত হইয়া তাঁহাদের বলিতেছিলেন, "কমবখ্‌তিরা আরও দুই থান নয়নসুখের পায়জামা বানাও। লাহোরের রেশমী ইজারবন্দ আরও জরির ঝালর লাগাইয়া লম্বা কর!"

বেচারীরা বাজারের পথে চলিলেন; ভাগ্যে রাত্রি ছিল,— তাই রক্ষা! অর্থাৎ আমাদের তৎকালীন দুর্গতি দেখিবার জন্য লোকের ভিড় হয় নাই। আহা রে! সকলের পা ফুলিয়া ভারী হইল যেন এক এক মণ,—দুই পা চলেন আর হোঁচট খান; বারবার পড়েন। একজন পথে বসিয়া একেবারে এলাইয়া পড়িলেন যে আর তিনি হাঁটিতে পারিবেন না। কেবল পায় ব্যথা নয়, আমাদের সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়া গেল। বেচারী বিবিদের লাঞ্ছনার অবধি ছিল না।

কিছুদূর যাইয়া দেখি, হাজার হাজার গোরা আর শিখ সৈন্য সারি বাঁধিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহা দেখিবামাত্র ভয়ে আমাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। আরও চলচ্ছক্তি-বিহীন হইয়া পড়িলাম।

অবশেষে বহু কষ্টে কিছু দূর গিয়া ভাইজান চারটা গাধা সংগ্রহ করিলেন। শেষে গাধায় উঠিয়া বিবিরা রক্ষা পাইলেন।

ছত্রিশ

শীতকাল। মাঘ মাসের শীত। সেই সময় কোথা হইতে এক ভালুকের নাচওয়ালা গ্রামে আসিল। গ্রামে কোন নূতন কিছু আসিলে প্রথমে তাহাকে জমীদার বাড়ীতে হাজিরা দিতে হয়।

তদনুসারে ভালুকওয়ালা জমীদার বাড়ীতেই অতিথি হইয়াছে। প্রশস্ত দালানের উত্তর দিকের মাঠে প্রত্যহ ভালুকের নাচ হয়,— গ্রামশুদ্ধ লোকে আসিয়া নাচ দেখে! কিন্তু বাড়ীর বউ ঝি সে নাচ দেখা হইতে বঞ্চিতা।

ছোট ছেলেরা এবং বুড়ী চাকরাণীরা আসিয়া গিন্নীদের নিকট গল্প করে। —ভালুকে খেমটা নাচ নাচে ; থমকা নাচ নাচে। এমন করিয়া ভালুকওয়ালার সঙ্গে কুস্তি লড়ে ; এমন করিয়া পাছাড় ধরে।—ইত্যাদি। এই সব গল্প শুনিয়া শুনিয়া কর্ত্তার দুইজন অল্পবয়স্কা পুত্রবধূর সাধ হইল যে একটু নাচ দেখিবেন। বেশী দূর যাইতে হইবে না, ছোট বউবিবির কামরার উত্তর দিকের জানালার ঝরোকা (খড়খড়ির পাখী) একটু তুলিলেই সুস্পষ্ট দেখা যায়।

যেই বধূদ্বয় ঝরোকা তুলিয়াছেন, অমনি তাঁহাদের চারি বৎসর বয়স্কা ননদ জোহরা দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল যে, সেও দেখিবে। একজন তাহাকে কোলে তুলিয়া দেখাইতে লাগিলেন। জোহরা কখনও বাড়ীর উঠানে নামিয়া কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত দেখে নাই,—এখন দেখিল একেবারে ভালুক! ভালুক কুস্তি লড়িতেছিল, তাহা দেখিয়া জোহরা ভয়ে চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল! ভালুকের নাচ দেখা মাথায় থাকুক—এখন জোহরাকে লইয়া তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

জোহরা সজ্ঞান হইল বটে কিন্তু তাহার ভয় গেল না। রাত্রিকালে হঠাৎ চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে থরথর কাঁপে। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া সুদূর সদর জেলা হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে ডাক্তার আনিতে হইল। ডাক্তার সাহেব সকল অবস্থা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শিশু কোন প্রকারে ভয় পাইয়াছিল না কি? কথা গোপন থাকে না, জানা গেল ভালুকের নাচ দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল।

এদিকে কর্ত্তা সন্ধান লইতে লাগিলেন, জোহরাকে ভালুক-নাচা দেখাইল কে। খেলাই আন্না প্রভৃতি সকলে একবাক্যে অস্বীকার করিল যে তাহারা সাহেবজাদীকে ভালুকের নাচ দেখায় নাই। অবশেষে জানা গেল, বউ বিবিরা দেখাইয়াছেন। তখন তাঁহার ক্রোধ চরমে উঠিল। জোহরা মরে মরুক, তাহাতে কর্ত্তার তত আপত্তি নাই ; কিন্তু এই যে বাড়ীময় রাষ্ট্র হইল যে, তাঁহার পুত্রবধূগণ বেগানা মরদের তামাসা দেখিতে গিয়াছিলেন, তিনি এ লজ্জা রাখিবেন কোথায়? ছি! ছি! ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সিভিল সার্জ্জন ডাক্তারও শুনিয়া মৃদু হাসিলেন যে বউয়েরা ভালুকের নাচ দেখিতে গিয়াছিলেন।

লাজে খেদে ক্রোধে অধীর হইয়া কর্ত্তা বধূদের তলব দিলেন। মাথায় একহাত ঘোমটা টানিয়া শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বধূদ্বয় লজ্জায় অভিমানে থরথর কাঁপিতেছিলেন ; (সেই মাঘ মাসের শীতেও) ঘামিতেছিলেন আর পদতলস্থিত পাথরের মেঝেকে হয়ত বলিতেছিলেন :

"ওমা বসুন্ধরা! বিদর গো ত্বরা—
তোমাতে বিলীন হই!"

তাই ত, পর্দ্দা-নশীনদের ধরাপৃষ্ঠে থাকিবার প্রয়োজন কি? দন্ত কড়মড় করিয়া,— "বউমা'রা শুন ত—" বলিয়াই অতি ক্রোধে কর্ত্তার বাক্‌রোধ হইল। তখন তাঁহার "গোস্বায় অজুদ কাঁপে, আঁখি হইল লাল"—তিনি বউমাদের বিনা লুণে চিবাইয়া খাইবেন, না, আস্ত গিলিবেন, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না!

সাঁইত্রিশ

একবার পশ্চিম দেশ হইতে ট্রেণ হাবড়ায় আসিবার সময় পথে বালী ষ্টেশনে তিনজন বোর্কাধারিণী লোক স্ত্রীলোকদের কক্ষে উঠিল। কক্ষে আরও অনেক মুসলমান স্ত্রীলোক ছিল। ট্রেণ ছাড়িলে পরও তাহারা সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল যে নবাগতা তিনজন বোর্কার নেকাব (মুখাবরণ) তুলিল না। তখন তাহাদের মনে সন্দেহ হইল যে ইহারা না জানি কি করিবে। আর তাহারা লম্বাও খুব ছিল। খোদা খোদা করিয়া লিলুয়া ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে যখন মেয়ে টিকেট কালেক্টার তাহাদের কামরায় আসিলেন, তখন সকলেই তাঁহাকে ঐ বোর্কাধারিণীদের বিষয় বলিল। টিকেট কালেক্টার তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে না হইতে তাহাদের একজন ষ্টেশনের বিপরীত দিকে ট্রেণের জানালা দিয়া লাফাইয়া পলাইয়া গেল ; তিনি "পুলিশ—পুলিশ" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে একজনকে ধরিয়া নেকাব তুলিয়া, দেখেন,—তাহার মুখে ইয়া দাড়ী,—ইয়া গোঁফ ! তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য ! বোর্কার ভিতর দাড়ী গোঁফ !"

আটত্রিশ

আমার পরিচিতা জনৈকা শি-ডাক্তার মিস শরৎকুমারী মিত্র বলিয়াছেন, "বাবা ! আপনাদের--মুসলমানদের বাড়ী গেলে আমাদের যা নাকাল হতে হয় ! না পাওয়া যায় সময়মত একটু গরম জল ; না পাওয়া যায় একখণ্ড ন্যাকড়া !"

একবার তাঁহাকে বহুদূর হইতে একজন ডাকিতে আসিয়া জানাইল যে বউবেগমের দাঁতে ব্যথা হইয়াছে। তিনি যথাসম্ভব দাঁতের ঔষধ এবং প্রয়োজন বোধ করিলে দাঁত তুলিয়া ফেলিবার জন্য যন্ত্রপাতি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। সেখানে গিয়া দেখেন, দাঁতে বেদনা নহে,—প্রসব বেদনা ! তিনি এখন কি করেন? ভাগলপুর শহর হইতে জমগাঁও চারি ক্রোশ পথ। এত দূর হইতে আবার সেই একই ঘোড়ার গাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়াও অসম্ভব ; কারণ ঘোড়া ক্লান্ত হইয়াছে। জমগাঁও শরহতলী,— পাড়া গ্রামের মত স্থান, সেখানে ঘোড়ার গাড়ী কিম্বা পাল্কী পাওয়া যায় না।

কোন প্রকারে ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিয়া তৎকালীন উপযোগী যন্ত্রপাতি লইয়া পুনরায় জমগাঁও যাইতে যাইতে রোগিনীর দফা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা। মিস মিত্র সে বাড়ীর কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহাকে অনর্থক ডাকা হইল কেন? উত্তরে কর্ত্রী বলিলেন, "পুরুষ চাকরের দ্বারা ডাক্তারনীকে ডাকিতে হইল, সুতরাং তাহাকে দাঁতে ব্যথা না বলিয়া আর কি বলিতাম? তোবা ছিয়া ! মর্দ্দুয়াকে ও কথা বলিতাম কি করিয়া? আপনি কেমন ডাক্তারণী যে, লোকের কথা বুঝেন না?"

উনচল্লিশ

সমাজ আমাদিগকে কেবল অবরোধ-কারাগারে বন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। হজরতা আয়শা সিদ্দিকা নাকি ৯ বৎসর বয়সে বয়োপ্রাপ্তা হইয়াছিলেন ; সেই জন্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ঘরের

বালিকার বয়স আট বৎসর পার হইলেই তাহাদের উচ্চহাস্য করা নিষেধ, উচ্চৈস্বরে কথা বলা নিষেধ, দৌড়ান লাফান ইত্যাদি সবই নিষেধ। এক কথায়, তাহার নড়াচড়াও নিষেধ। সে গৃহকোণে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া কেবল সূচি-কর্ম্ম করিতে থাকিবে,— নড়িবে না। এমন কি দ্রুতগতি হাঁটিবেও না।

কোন এক সম্ভ্রান্ত ঘরের একটি আট বৎসরের বালিকা একদিন বিকালে উঠানে আসিয়া দেখিল, রান্নাঘরের চালে ঠেকান একটা ছোট মই আছে। তাহেরার (সেই বালিকা)র মনে কি হইল, সে অন্যমনস্কভাবে ঐ মইয়ের দুই ধাপ উঠিল। ঠিক সেই সময় তাহার পিতা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কন্যাকে মইয়ের উপর দেখিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার হাত ধরিয়া এক হেঁচকা টানে নামাইয়া দিলেন।

তাহেরা পিতার অতি আদরের একমাত্র কন্যা,—পিতার আদর ব্যতীত অনাদর কখনও লাভ করে নাই ; কখনও পিতার অপ্রসন্ন মুখ দেখে নাই। অদ্য পিতার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ও রূঢ় হেচকা টানে সে এত অধিক ভয় পাইল যে কাঁপিতে কাঁপিতে বে-সামাল হইয়া কাপড় নষ্ট করিয়া ফেলিল !

অ-বেলায় স্নান করাইয়া দেওয়া হইল বলিয়া এবং অত্যধিক ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল বলিয়া সেই রাত্রে তাহেরার জ্বর হইল। একে বড় ঘরের মেয়ে, তায় আবার অতি আদরের মেয়ে, সুতরাং চিকিৎসার ত্রুটি হয় নাই। সুদূর সদর জেলা হইতে সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার আনা হইল। সেকালে (অর্থাৎ ৪০/৪৫ বৎসর পূর্ব্বে) ডাক্তার ডাকা সহজ ব্যাপার ছিল না। ডাক্তার সাহেবের চতুর্গুণ দর্শনী, পাল্কী ভাড়া, তদুপরি বত্রিশজন বেহারার সিধা ও পান তামাক যোগান—সে এক বিরাট ব্যাপার।

এত যত্ন সত্ত্বেও তৃতীয় দিনেও তাহেরার জ্বর ত্যাগ হইল না। ডাক্তার সাহেব বে-গতিক দেখিয়া বিদায় হইলেন। পিতার রূঢ় ব্যবহারের নিষ্ঠুর প্রত্যুত্তর দিয়া তাহেরা চিরমুক্তি লাভ করিল ! (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

চল্লিশ

এক ধনীগৃহে কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ধূমধাম হইতেছিল। বাড়ীভরা আত্মীয়া কুটুম্বিনীর হট্টগোল—কিছুরই অভাব নাই। নবাগতাদিগের জন্য অনেক নূতন চালাঘর তোলা হইয়াছে। একদিন ভরা সন্ধ্যায় কি করিয়া একটা নূতন খড়ের ঘরে আগুন লাগিল। শোরগোল শুনিয়া বাহির হইতে চাকরবাকর, লোকজন আসিয়া দেউড়ীর ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিল, আর বারম্বার হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, পর্দ্দা হইয়াছে কিনা,—তাহারা অন্দরে আসিতে পারে কিনা ? কিন্তু অন্তঃপুর হইতে কে উত্তর দিবে ? আগুন দেখিয়া সকলেরই ভ্যাবা-চেকা লাগিয়া গিয়াছে। এদিকে আগুন-লাগা ঘরের ভিতর বিবিরা বসিয়া বলাবলি করিতেছেন যে প্রাঙ্গণে পর্দ্দা আছে কিনা,—কোন ব্যাটাছেলে থাকিলে তাঁহারা বাহির হইবেন কি করিয়া ?

অবশেষে এক বুড়া বিবি ভয়ে জ্ঞানহারা হইয়া উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "আরে ব্যাটারা ! আগুন নিবাতে আয় না ! এ সময়ও জিজ্ঞাসা করিস পর্দ্দা আছে কিনা ?"

তখন সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আগুন নিবাইতে আসিল। কিন্তু আগুন-লাগা ঘরের বিবিরা বাহিরে যাইতে গিয়া যেই দেখিলেন, প্রাঙ্গণ পুরুষ মানুষে ভরা, অমনি তাঁহারা পুনরায়

ঘরে গিয়া ঝাঁপের অন্তরালে লুকাইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ গোটাকয়েক সাহসী তরুণ বিবিদের টানাহেঁচড়া করিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। নচেৎ তাঁহারা সেইখানে পুড়িয়া পসেন্দা কাবাব হইতেন ! !

একচল্লিশ

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর গত ১৩৩৫ সনে লিখিয়াছেন : সেকালের পর্দ্দা।—আমি যে সময়কে সেকাল বলছি, তা সত্য–ত্রেতা–দ্বাপর যুগ নয় কিন্তু—সে আমাদের যৌবনকালের কথা—এই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময় আমরা পর্দ্দার যে রকম কঠোর, তথা হাস্যকর ব্যবস্থা দেখেছিলাম, সে সকল দৃশ্য এখনও আমার চক্ষের সম্মুখে ছবির মত জেগে আছে। তারই গুটিকয়েক দৃশ্যের সামান্য বর্ণনা দিতে চেষ্টা করব।

সেই সময় একদিন কি জন্য যেন হাবড়া ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। আমি তখন কলেজে পড়ি। ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে গিয়ে দেখি কয়েকজন বরকন্দাজ যাত্রীর ভিড় সরিয়ে পথ করছে। এগুতে সাহস হোল না ; হয়ত কোন রাজা মহারাজা গাড়ীতে উঠবেন, তারই জন্য তার সৈন্য সামন্তেরা নিরীহ যাত্রীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। এই ভেবে রাজা–মহারাজার আগমন প্রতীক্ষায় একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তিন চার মিনিট হয়ে গেল, রাজা মহারাজা আর আসেন না। শেষে দেখি কিনা—একটা মশারি আস্ছেন। মশারির চার কোণা চারজন সিপাহী ধ'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। আমি ত এ দৃশ্য দেখে অবাক্—এ ব্যাপার ত পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আমার পাশেই এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এমন করে একটা মশারি যাচ্ছেন কেন?" তিনি একটু হেসে বল্লেন, "আপনি বুঝি কখন মশারির যাত্রা দেখেন নাই? দেখছেন না কত সিপাহী–সান্ত্রী যাচ্ছে। বিহার অঞ্চলের কোন্ এক রাজা না জমীদারের গৃহিণী ঐ মশারির মধ্যে আবরু রক্ষা করে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছেন। বড় মানুষের বৌ কি আপনার আমার সুমুখ দিয়ে আর দশজনের মত যেতে পারেন ; তাঁরা যে অসূর্য্যম্পশ্যা।" এই বলেই ভদ্রলোকটি হাসতে লাগলেন। আমি এই পর্দ্দার বহর দেখে হাস্য সংবরণ করতে পারলাম না। হাঁ, এরই নাম পর্দ্দা বটে— একেবারে মশারি যাত্রা।

আর একবার কি একটা যোগ উপলক্ষে গঙ্গা–স্নানের ব্যবস্থা ছিল। লোক–সমারোহ দেখবার জন্য এবং এ বৃদ্ধ বয়সে ব'লেই ফেলি, গঙ্গাস্নান করে পাপ মোচনের জন্যও বটে, বড়বাজারে আদ্য–শ্রাদ্ধের ঘাটে গিয়াছিলাম। তখন শীতকাল, স্নানের সময় অপরাহ্ণ পাঁচটা।

ঘাটে দাঁড়িয়ে লোক সমারোহ দেখছি, আর ভাবছি এই দারুণ শীতের মধ্যে কেমন করে গঙ্গাস্নান ক'রব। এমন সময় দেখি ঘেরাটোপ আগাগোড়া আবৃত একখানি পাল্কী ঘাটে এল। পাল্কীর চার কোণ ধ'রে চারজন আরদালী, আর পাল্কীর দুই দুয়ার বরাবর দুইটী দাসী। বুঝতে বাকী রহিল না যে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহিণী, বা কন্যা, বা পুত্রবধূ স্নান করতে এলেন। বড় মানুষের বাড়ীর মেয়েরা এমন আড়ম্বর ক'রে এসেই থাকেন, তাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নেই।

কিন্তু তারপর যা দেখলাম, সে হাস্যরসের এবং করুণ–রসের একেবারে চূড়ান্ত। আমি মনে করেছিলাম গঙ্গার জলের কিনারে পাল্কী নামানো হবে এবং আরোহিণীরা অবতরণ করে

গঙ্গাস্নান করে আসবেন। কিন্তু, আমার সে কল্পনা আকাশেই থেকে গেল। দেখলাম বেহারা মায় আরদালী দাসী দুইটী—পাল্কী নিয়ে জলের মধ্যে নেমে গেল। যেখানে গিয়ে পাল্কী থাম্‌লো, সেখানে বোধ হয় বুক–সমান জল। বেহারারা তখন পাল্কীখানিকে একেবারে জলে ডুবিয়ে তৎক্ষণাৎ উপরে তুললো এবং তারপরেই পাল্কী নিয়ে তীরে উঠে এসে, যেভাবে আগমন, সেইভাবেই প্রতিগমন। আমার হাসি এলো পাল্কীর গঙ্গাস্নান দেখে ; আর মনে কষ্ট হ'তে লাগল, পাল্কীর মধ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অবস্থা স্মরণ করে। এই শীতের সন্ধ্যায় পাল্কীর মধ্যে মা–লক্ষ্মীরা ভিজে কাপড়ে হি–হি করে কাঁপছেন। এদিকে তাঁদের স্নান যা হোলো, তা তো দেখতেই পেলাম। এরই নাম পর্দ্দা।

সেন মহাশয় পাল্কীর 'গঙ্গাস্নান' দেখিয়া হাসিয়াছেন। আমরা শৈশবে চিলমারীর ঘাটে 'পাল্কীর ব্রহ্মপুত্রনদের স্নান' শুনিয়া হাসিয়াছি। পরে ভাগলপুরে গিয়া পাল্কীর রেল ভ্রমণের বিষয় শুনিয়াছি।

একবার একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া নব–বিবাহিতা বালিকার শ্বশুর–বাড়ী যাত্রা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ; তাহা বেশ স্পষ্ট মনে আছে। ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে জুন মাসে রৌদ্র কিরূপ প্রখর হয়, তাহা সকলেই জানেন।

জুন মাসে দিবা ৮ ঘটিকার সময় সে বালিকা নববধূকে মোটা বেনারসী শাড়ী পরিয়া মাথায় আধ হাত ঘোমটা টানিয়া পাল্কীতে উঠিতে হইল। সেই ঘোমটার উপর আবার একটা ভারী ফুলের "সেহরা" তাহার কপালে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। পরে পাল্কীর দ্বার বন্ধ করিয়া জরির কাজ করা লাল বানাতের ঘেরাটোপ দ্বারা পাল্কী ঢাকা হইল। সেই পাল্কী ট্রেনের ব্রেকভ্যানের খোলা গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল। এই অবস্থায় দগ্ধ ও সিদ্ধ হইতে হইতে বালিকা চলিল, তাহার শ্বশুর–বাড়ী—যশিদী ! !

বেয়াল্লিশ

সেদিন (৫ই জুলাই ১৯৩১ সাল) জনৈকা মহিলা নিম্নলিখিত ঘটনা দুইটি বলিলেন :

বহুবর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার সম্পর্কের এক নানিজান পশ্চিম দেশে বেড়াইতে গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যথাসময়ে টেলিগ্রাফ যোগে তাঁহার কলিকাতায় পৌছিবার সময় জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন তুফানে সমস্ত টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া গিয়াছিল এবং কলিকাতার রাস্তায় সাঁতার–জল ছিল। সুতরাং এখানে কেহ নানিজানের টেলিগ্রাম পায় নাই এবং হাবড়া ষ্টেশনে পাল্কী লইয়া কেহ তাঁহাকে আনিতেও যায় নাই।

এদিকে যথাসময়ে নানিজানের রিজার্ভ–করা গাড়ী হাবড়ায় পৌছিল ; সকলে নামিলেন জিনিষপত্রও নামান হইল কিন্তু পাল্কী না থাকায় নানিজান বোর্কা পরিয়া থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই নামিতে সম্মত হইলেন না। অনেকক্ষণ সাধ্য–সাধনার পর নানাসাহেব ভারী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তবে তুমি এই ট্রেণেই থাক, আমরা চলিলাম।" বেগতিক দেখিয়া নানিজান মিনতি করিয়া বলিলেন, "আমি এক উপায় বলিয়া দিই, আপনারা আমাকে সেইরূপে নামান।" উপায়টি এই যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অনেক কাপড় জড়াইয়া তাঁহাকে একটা বড় গাঁটরীর মত করিয়া বাঁধিয়া তিন চারি জনে সেই গাঁটরী ধরাধরি করিয়া টানিয়া ট্রেণ হইতে নামাইল। অতঃপর তদবস্থায় তাঁহাকে ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল।

তেতাল্লিশ

এক বোর্কাধারিণী বিবি হাতে একটা ব্যাগ সহ ট্রেণ হইতে নামিয়াছেন। তাঁহাকে অন্যান্য আসবাব সহ এক জায়গায় দাঁড় করাইয়া তাঁহার স্বামী কার্য্যান্তরে গেলেন। কোন কারণবশতঃ তাঁহার ফিরিয়া আসিতে কিছু বিলম্ব হইল। এদিকে বিবি সাহেবা দাঁড়াইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া এবং শরীরের কম্পন দেখিয়া ক্রমে লোকের ভীড় হইল। লোকেরা দয়া করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সঙ্গের লোকের নাম বলুন ত, আমরা তাঁহাকে ডাকিয়া আনি।" তিনি একবার আকাশে সূর্য্যের দিকে ইসারা করেন আর একবার হাতের ব্যাগ তুলিয়া দেখান। ইহাতে উপস্থিত লোকেরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া হাসিতে হট্টগোল বাধাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তি হাঁফাইতে হাঁফাইতে সেখানে দৌড়াইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? ভীড় কেন?" ঘটনা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমার নাম "আফতাব বেগ", তাই আমার বিবি সূর্য্যের দিকে ইসারা করিয়া দেন আর হাতের বেগ (ব্যাগ) দেখাইয়াছেন।"

চুয়াল্লিশ

জনাব শরফদ্দীন আহমদ বি. এ. (আলীগড়) আজিমাবাদী নিম্নলিখিত ঘটনাত্রয় কোন উর্দ্দু কাগজে লিখিয়াছেন। আমি তাহা অনুবাদ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যথা :

গত বৎসর পর্য্যন্ত আমি আলীগড়ে ছিলাম। যেহেতু সেখানকার ষ্টেশন বিশেষ একরূপ জাঁকজমকে ই. আই. আর. লাইনে অদ্বিতীয় বোধ হয়, সেই জন্য আমি প্রত্যহই পদব্রজে ভ্রমণের সময় ষ্টেশনে যাইতাম। সেখানে অন্যান্য তামাসার মধ্যে অনেকগুলি ১৩শ শতাব্দীর বোর্কা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আর খোদা মিথ্যা না বলান, প্রত্যেক বোরর্কাই কোন না কোন প্রকার কৌতুকাবহ ছিল। তন্মধ্যে মাত্র তিনটি ঘটনা এখানে বিবৃত হইল।

প্রথম ঘটনা এই যে, একদিন আমি আলীগড় ষ্টেশনে প্লাট-ফরমে পায়চারি করিতেছিলাম, সহসা পশ্চাৎদিক হইতে আমার গায়ে ধাক্কা লাগিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম যে, এক বোর্কা ধারিণী বিবি দাঁড়াইয়া আছেন ; আর আমাকে শাসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "মিয়া দেখে চলেন না?" তাঁহার কথায় আমরা প্রবল হাসি পাইল, কারণ তিনি ত আমার পশ্চাতে ছিলেন, সুতরাং দেখিয়া চলা না চলার দায়িত্ব কাহার, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমি তাঁহাকে কেবল এইটুকু বলিলাম, "আপনি মেহেরবাণী করিয়া বোর্কার জাল চক্ষের সম্মুখে ঠিক করিয়া নিন" এবং হাসিতে হাসিতে অন্যত্র চলিলাম।

পঁয়তাল্লিশ

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, একদিন আবার আমি কতিপয় বন্ধুর সহিত আলিগড় ষ্টেশনে তামাসা দেখায় মশগুল ছিলাম। এমন সময় আমাদের সন্নিকটে একটি শিশুর কান্নার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমরা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আবার কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম, কোন শিশু আমাদের অতি নিকটে চেঁচাইতেছে, কিন্তু এদিক সেদিক দেখিয়া

কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার বন্ধুরা কিছু বুঝিতে পারিলেন না ; কিন্তু যেহেতু বোর্কা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, তাই আমি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। শেষে দেখি কি, এক বোর্কাধারিণী বিবি যাইতেছেন, তাঁহারই বোর্কা ভিতর হইতে শিশুর রোদনের শব্দ আসিতেছে !

ঘটনা ছিল এই যে বিবি সাহেবা শিশুকে বোর্কা ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন ; সে গরমে অস্থির হইয়া চীৎকার করিতেছিল ! তাই কেহ শিশুকে দেখিতে পায় নাই, কেবল কান্না শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। আমি বন্ধুদের ঐ তামাসা দেখাইয়া দিলাম। আর হাসিতে হাসিতে আমাদের যে কি দশা হইল, তাহা আর কি বলিব ?

ছেচল্লিশ

আমি পূর্ব্বের ন্যায় আবার একদা আলীগড় ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে পায়চারি করিতেছিলাম। সম্মুখে এক "সফেদ গোল" (শাদা দল) আসিতে দেখিলাম। নিকটে আসিলে দেখিলাম আগে আগে এক প্রবীণ ভদ্রলোক এক হাতে পানদান অপর হাতে পাখা লইয়া আসিতেছেন ; তাঁহার পশ্চাতে কয়েকটি বোর্কাধারিণী পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া মিলিত হইয়া আসিতেছেন। এই কাফেলাটি অধিক দূরে না যাইতেই এক মালঠেলা গাড়ীর সম্মুখীন হইল। উহার সহিত টক্কর খাইয়া এক বিবি যেই পড়িলেন, অমনি সমস্ত পার্টি তাঁহার সহিত গড়াইল।

সন্ধ্যার সময়, গাড়ী আসিতেছিল, যাত্রীদের হাঙ্গামা ছিল— এমত স্থলে প্লাটফরমের উপর ঐরূপ আশ্চর্য্য জিনিষ পড়িয়া থাকিতে দেখিলে কে না অগ্রসর হইয়া দেখিবে ? অতি শীঘ্র বেশ একটা ভীড় জমা হইল। প্রত্যেকেই ভূপতিতাদের সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল ; কিন্তু স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে কে ? সঙ্গের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির জন্য আরও দুঃখ হইতেছিল ; বেচারা একা, আর এই বিপদ ! শেষে আমি বলিলাম, "হজরত ! আপনিই উহাদের তুলুন না ; দেখুন তো বিবিদের কোথাও আঘাত লাগে নাই ত ?"

বেচারা যখন তাঁহাদের তুলিতে লাগিলেন, আমি দেখিলাম যে বিবিরা আপন আপন বোর্কা পরস্পরের বোর্কা সহিত বাঁধিয়া লইয়াছিলেন এবং অগ্রবর্ত্তিনীর বোর্কার দামন ধরিয়া সকলেই চক্ষু বুজিয়া চলিতেছিলেন। এখন আমার সম্মুখে এই সমস্যা ছিল যে অগ্রবর্ত্তিনী বিবি এই মাল-ঠেলা গাড়ী দেখিলেন না কেন যে এ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল ? আমি তাঁহার বোর্কা দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে তাঁহার বোর্কার জাল,—যাহা চক্ষের সম্মুখে থাকা চাই, তাহা মাথার উপর পিছনে সরিয়া গিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হইল যে বিবি সাহেবা কেবল আন্দাজে হাঁটিয়া আসিতেছিলেন।

এখন অবস্থা এই হইয়া দাঁড়াইল যে বেচারা "বড়ে মিয়াঁ" একজনকে উঠাইতে গেলে অপর সকলের উপরই টান পড়ে—সুতরাং প্রথম বিবি আবার সেই টানে "বড়ে মিয়াঁর" হাত ছাড়া হইয়া যান। এইরূপে অনেক টানাহেঁচড়ার পরে বিবিরা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন।

সাতচল্লিশ

কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে :
"কাব্য উপন্যাস নহে, এ মম জীবন,
নাট্যশালা নহে, ইহা প্রকৃত ভবন !"

প্রায় তিন বৎসরের ঘটনা, আমাদের প্রথম মোটর বাস প্রস্তুত হইল। পূর্ব্বদিন আমাদের স্কুলের জনৈকা শিক্ষয়িত্রী, মেম সাহেবা মিস্ত্রীখানায় গিয়া বাস দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, মোটর ভয়ানক অন্ধকার*** "না বাবা! আমি কখনও মোটরে যা'ব না।" বাস আসিয়া পৌঁছিলে দেখা গেল,—বাসের পশ্চাতের দ্বারের উপর সামান্য একটু জাল আছে এবং সম্মুখ দিকে ও উপরে একটু জাল আছে। এই তিন ইঞ্চি চওড়া ও দেড় ফুট লম্বা জাল দুই টুকরা না থাকিলে বাসখানাকে সম্পূর্ণ "এয়ার টাইট" বলা যাইতে পারিত।

প্রথম দিন ছাত্রীদের নূতন মোটরে বাড়ী পৌঁছান হইল। চাকরাণী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—গাড়ী বড্ড গরম হয়,— মেয়েরা বাড়ী যাইবার পথে অস্থির হইয়াছিল। কেহ কেহ বমি করিয়াছিল। ছোট মেয়েরা অন্ধকারে ভয় পাইয়া কাঁদিয়াছিল।

দ্বিতীয় দিন ছাত্রী আনাইবার জন্য মোটর পাঠাইবার সময় উপরোক্তা মেম সাহেবা মোটরের দ্বারের খড়খড়িটা নামাইয়া দিয়া একটা রঙীন কাপড়ের পর্দ্দা ঝুলাইয়া দিলেন। তথাপি ছাত্রীগণ স্কুলে আসিলে দেখা গেল,—দুই তিন জন অজ্ঞান হইয়াছে, দুই চারিজনে বমি করিয়াছে, কয়েক জনের মাথা ধরিয়াছে, ইত্যাদি। অপরাহ্ণে মেম সাহেবা বাসের দুই পাশের দুইটী খড়খড়ি নামাইয়া দুই খণ্ড কাপড়ের পর্দ্দা দিলেন। এইরূপে তাহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যায় আমার এক পুরাতন বন্ধু মিসেস মুখার্জ্জি আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। স্কুলের বিবিধ উন্নতির সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,— "আপনাদের মোটরবাস ত বেশ সুন্দর হয়েছে! প্রথমে রাস্তায় দেখে আমি মনে করেছি যে আলমারী যাচ্ছে না কি—চারিদিকে একেবারে বন্ধ, তাই বড় আলমারী বলে ভ্রম হয়! আমার ভাইপো এসে বল্লে, "ও পিসীমা! দেখ, সে Moving Black Hole (চলন্ত অন্ধকূপ) যাচ্ছে।" তাই ত, ওর ভিতর মেয়েরা বসে কি করে?"

তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে চারি পাঁচ জন ছাত্রীর মাতা দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন, "আপ্‌কা মোটর ত খোদা কা পানাহ্! আপ লাড়কীয়োঁ কো জীতে জী ক্ববর মে ভর রহি হয়ঁ।" আমি নিতান্ত অসহায়ভাবে বলিলাম, "কি করি, এরূপ না হইলে ত আপনারাই বলিতেন, "বেপর্দ্দা গাড়ী।" তাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন 'তব কেয়া আপ জান মারকে পর্দ্দা করেঙ্গী? কালসে হামারী লাড়কীয়াঁ স্কুল নেহী আয়েঙ্গী।" সে দিনও দুই তিনটি বালিকা অজ্ঞান হইয়াছিল। প্রত্যেক বাড়ী হইতে চাকরাণীর মারফতে ফরিয়াদ আসিয়াছিল যে, তাহারা আর মোটর বাসে আসিবে না।

সন্ধ্যার পর চারিখানা ঠিকানারহিত ডাকের চিঠি পাইলাম। ইংরাজী চিঠির লেখক স্বাক্ষর করিয়াছেন, "Brother-in-Islam" বাকী তিনখানা উর্দ্দু ছিল—দুইখানা বেনামী আর চতুর্থখানায় পাঁচজনের স্বাক্ষর ছিল। সকল পত্রেরই বিষয় একই—সকলেই দয়া করিয়া আমাদের স্কুলের কল্যাণ কামনায় লিখিয়াছেন যে, মোটরের দুই পার্শ্বে যে পর্দ্দা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাতাসে উড়িয়া গাড়ী বে-পর্দ্দা করে। যদি আগামীকল্য পর্য্যন্ত মোটরে ভাল পর্দ্দার ব্যবস্থা না করা যায়, তবে তাঁহারা ততোধিক দয়া করিয়া "খবিছ" "পলীদ" প্রভৃতি উর্দ্দু

দৈনিক পত্রিকায় স্কুলের কুৎসা রটনা করিবেন এবং দেখিয়া লইবেন, এরূপ বে-পর্দ্দা গাড়ীতে কি করিয়া মেয়েরা আসে।

এ তো ভারী বিপদ,—
"না ধরিলে রাজা বধে,—ধরিলে ভুজঙ্গ !"

রাজার আদেশে এমন করিয়া আর কেহ বোধ হয় জীবন্ত সাপ ধরে নাই! অবরোধ-বন্দিনীদের পক্ষ হইতে বলিতে ইচ্ছা করিল,—

"কেন আসিলাম হায়! এ পোড়া সংসারে,
কেন জন্ম লভিলাম পর্দ্দা-নশীন ঘরে!"

ছোটগল্প ও রস-রচনা

ভ্রাতা-ভগ্নী

সাধারণতঃ দুই মতের লোক দেখা যায়। একদল উন্নতি চাহে, পরিবর্তন চাহে ; অপর দল বলে, "আমাদের যাহা আছে, তাহাই থাকুক, পরিবর্তনের কাজ নাই।" প্রথমোক্ত দলকে আমরা উদার মতাবলম্বী এবং শেষোক্তকে রক্ষণশীল বা গোঁড়া বলিব। অধিক স্থলে আমাদের ভ্রাতৃগণ উদার মতাবলম্বী এবং ভগ্নীদল রক্ষণশীল হইয়া থাকেন। ক্রমে কালের বিচিত্র গতির আবর্তনে এখন কোন কোন স্থলে তাহার বিপরীত অবস্থাও দেখা যায়। অর্থাৎ ভ্রাতা সেই "সেকেলে গোঁড়া" আর ভগ্নী নব-বিভায় আলোকিতা।

এ প্রবন্ধে আমাদের সমাজের কোন কোন ক্ষতের উল্লেখ দেখিয়া যেন ভ্রাতৃ-সমাজ ক্ষুণ্ণ না হন ; কারণ, বলিয়াছি ত, নালী-ঘায় অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন।[১] কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা চিকিৎসা করিতে বসিয়াছি। আমরা কেবল রোগ দেখাইয়া দিতেছি—যাঁহারা সমাজের হাকিম (সমাজ-সংস্কারক) চিকিৎসা করিবেন তাঁহারাই।

"আগুন লেগেছে ঘরে,
আমি শুধু এনেছি সংবাদ ! সুখ-নিদ্রা
দিয়েছি ভাঙ্গায়ে !"

আমাদের কার্য্য কেবল ঐ পর্য্যন্ত।

এখন আসুন, পাঠিকা ! আমরা এইখানে নীরবে দাঁড়াইয়া কাজেব, সিদ্দিকা ও সুফিয়ার কথোপকথন শুনি। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, ইঁহাদের কে রক্ষণশীল এবং কে উদার মতের পক্ষপাতী।

কাজেব যেন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"তোমার পত্রের ভাবে বোধ হইতেছিল যে, অনাহারে বিবস্ত্রাবস্থায় নিতান্ত যন্ত্রণার সহিত ভাইয়েরা মাতাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন, আর তুমি একমাত্র মায়ের সুসন্তান—কাণ্ডাকাণ্ড (!) জ্ঞানশূন্যা হইয়া মায়ের উদ্ধারের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছ।"

সিদ্দিকা। আমার পত্রের ভাষা এক প্রকার এবং ভাব অন্য প্রকার ছিল, তাহা জানিতাম না। তোমরা ভাষা ছাড়িয়া কেবল ভাবটা পাঠ করিয়াছ, বেশ ! কিন্তু আমি জানি, আমার ভাব, ভাষা, অক্ষর, স্বাক্ষর—সবই আমার নিজের এবং একই প্রকার। আমি তো আর নিজের ভাব ভ্রাতার ভাষায় কন্যার হস্তাক্ষরে লিখাইয়া মাতার দ্বারা স্বাক্ষর করাই না। তবে আমার চিঠির ভাব ও ভাষার প্রভেদ হইবে কেন?

---

১. বিশেষতঃ নানা কারণে বাধ্য হইয়া ঐসকল পূতিগন্ধময় দুরারোগ্য ক্ষতের উল্লেখ করা গেল। ভ্রাতৃ সমাজই আমাদিগকে ও-সব বলিতে বাধ্য করিয়াছেন। "শুনা'লে শুনিতে হয় !"

কাজেব সিদ্দিকার কথার উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"মায়ের কি এমন কষ্ট হইয়াছে? আজ ২০ বৎসর যাবত এই কুপুত্রেরা মায়ের ভরণপোষণের ভার বহন করিয়া আসিতেছে। এই ১৫ বৎসরের মধ্যে যদবধি তোমার বিবাহ হইয়াছে, তুমিই বা কি এমন স্বর্ণ ঢালিয়া দিয়াছ?"

সিদ্দিকা। আমি স্বর্ণ ঢালিয়া দিব কোথা হইতে, ভাই? আমার শ্বশুর শাশুড়ী কি মস্ত জমিদারী ছাড়িয়া মরিয়াছেন?

কাজেব। যদি কিছু করিতেই পার না, তবে আর বৃথা কল্পনা খরচ কর কেন? আর এই এক বৎসরের মধ্যে এত কি পরিবর্ত্তন হইল যে, তুমি এমন বেহায়া বেগয়রতের (লজ্জাহীনার) মত মামাতো ভাইয়ের নিকট সহসা পত্র লিখিলে?

সি। এই এক বৎসরের মধ্যে মাতার অসুখ বৃদ্ধি হইল; এই এক বৎসরের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত মাতার অন্যত্র যাওয়া আবশ্যক হইল, কারণ ডাক্তার বলিয়াছেন, এ রোগের ঔষধ নাই, কেবল পশ্চিমাঞ্চলে কতক দিন থাকিলেই আরোগ্য হইবেন, তাই 'কাণ্ডাকাণ্ডা' জ্ঞানশূন্য হইয়াছি! আর মামাতো ভাইকে পত্র লিখা যে "বেহায়া বেগয়রতের" (নিতান্ত লজ্জাহীনার) কাজ, তাহা জানিতাম না। আমি ত সকলকে সহোদরের মত জ্ঞান করি। যদি তোমাকে পত্র লিখা দোষণীয় না হয়, তবে তাঁহাকে পত্র লিখিলে দোষ হইবে কেন?

কাজেব। এতদিন যে তুমি তাদৃশ সুশিক্ষা পাইয়াছিলে না এবং আজিকাল যেরূপ স্বাধীনতা ও উন্নতি লাভ করিয়াছ, তাহাও করিয়াছিলে না, তখন মায়ের খবরগিরি কে করিত? তখন কি অবস্থা ছিল?

এবার সুফিয়া উত্তর দিলেন,"যখন তোমরা শিশু ছিলে ও মাতার ভরণপোষণের ভার বহনে অসমর্থ ছিলে, তখন কি অবস্থা ছিল? তোমাদের ন্যায় সুপুত্রের দল যদি জন্মগ্রহণ না'ই করিত, তথাপি মাতার দিন কাটিত কি না? তোমরা যেমন বড় হইয়া মাতার ভার লইয়াছ, তদ্রূপ এখন আমরাও বড় হওয়াতে আমাদেরও কর্ত্তব্য হইয়াছে মাতৃচরণ-সেবা করা। মানুষ জন্মিলে তাহার কাজও জন্মে, কেহ না জন্মিলেও তাহার জন্য জগতের কিছু ঠেকিয়া থাকে না।"

কাজেব। যদি এমনই কোন কষ্ট তোমাদের কল্পনা-অনুযায়ী তোমরা গড়াইয়া নিয়া থাক, তবে যৎকিঞ্চিৎ টাকা দান করিলেই ত হইত। টাকা হইলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়, আর টাকা পাইয়া মা আপন খাওয়া-পরার যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারিতেন না?

সুফিয়া। ভ্রাতার গৃহে থাকাকালীন মাকে টাকা পাঠাইতাম কিরূপে? গৃহস্বামী টাকা ফেরৎ দিতেন যে? যে বাটীতে অবলাদের নামের চিঠি মারা যায়, সে বাটীতে কি টাকা নিরাপদে মায়ের হাতে পড়িত? আর, ভাই! টাকা হইলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়, এ-কথা তোমরা বেশ জান, তাই অবলার হাতে এক পয়সা থাকিতে দাও না! আমার বেশ মনে আছে, কি কি কৌশলে তোমরা মায়ের নিকট হইতে এক একটি পয়সা দুহিয়া বাহির করিয়া লইতে। সম্ভবতঃ হাতে দু'পয়সা রাখিবার অভিপ্রায়েই স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার ব্যবহার করে। কিন্তু হায়! কপাল! ললনারা কেবল জড় স্বর্ণের বোঝা বহন করেন; অলঙ্কার ভাঙ্গিবার বা বিক্রয়ের

ক্ষমতা তাঁহাদের নাই! তোমাদের ইচ্ছামত তোমরা এক একটি অলঙ্কার মোচন করিয়া বাঁধা দাও—যাহা ইচ্ছা কর। তোমাদের ৫০্ টাকার আবশ্যক হইলে আমাদের ৫০০্ টাকার গহনা সুদের চাপায় মারা যায়। বল্ ত ভাইয়া! মায়ের অতগুলি অলঙ্কারের শ্রাদ্ধ কাহারা করিয়াছে?— তোমরা। পুরুষ প্রভুরা!! স্বর্ণভার বহন করে অভাগিনী অবলারা, আর স্বর্ণ ভোগ করে ভাগ্যবান সবলেরা। টাকা হইলে কি না পাওয়া যায়? তাই অন্তঃপুরে বন্দিনীদের হাতে টাকা থাকিতে দেওয়া হয় না।

সি। কিরূপে মাতার হাত খালি করিতে হয়, তাহা পুত্রেরা বেশ জানেন; কিরূপে ধনবতী শাশুড়িকে জব্দ করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব হস্তগত করিতে হয়, তাহা জামাতারা বেশ জানেন। কিরূপে বিধবা ভগ্নীকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে হয়, সে কৌশলও ভ্রাতৃবৃন্দ অবগত আছেন। এমনকি মৃত ভ্রাতার সম্পত্তির শেষ কণাটুকুও করায়ত্ত করিবার জন্য ভ্রাতারা অনেক সময় অসহায়া ভ্রাতৃবধূকে নিকাহ্ও (বিবাহ) করিয়া থাকেন!

কা। ওঃ, বুঝিলাম! মায়ের সেরূপ কোন কষ্টের জন্য তোমরা অস্থির হও নাই, তোমরা নিজেরা যেরূপ স্বাধীন, মাতাকেও তদ্রূপ স্বাধীনতা দিবার জন্যই বোধ করি এত ব্যস্ত! স্নেহের ও মাতৃভক্তির মাত্রাটা একটু কম রাখাই ভাল। তোমরা উচ্চশিক্ষা পাইয়াছ বলিয়া তোমাদের পক্ষে অনেক কাজই শোভা পায়, কিন্তু মুসলমান (সগর্ব্বে) যাহারা মুসলমান শাস্ত্রের নিয়ম মত চলিতে বাধ্য ও তদ্রূপ চালচলনকে ঘৃণা করে না, তাহারা ত সহসা তোমাদের অনুকরণ করিতে অক্ষম।

সি। যাহারা তোমার মত মুসলমান, তাহারা মুসলমান নামের যোগ্য কি না, পূর্ব্বে তাহার মীমাংসা হওয়া চাই। কেবল গো-মাংস ভক্ষণই মুসলমানের চিহ্ন নহে! তোমার বর্ণিত "মুসলমান" নামধারী ব্যক্তিরা কোন মন্দ কাজ করিতে বাকী রাখে নাই; মিথ্যা বলা, পরস্বাপহরণ করা, জাল-জুয়াচুরি করা—নানা প্রকার অসাধু ব্যবহার করা ত প্রায় তাহাদেরই নিত্যকর্ম্ম। তাহাদের মুসলমান বলিলে পবিত্র "মুসলমান" শব্দটি কলঙ্কিত হয়।

সুফিয়া। ভাই! তোমার আদর্শ একদল মুসলমান এমন আছেন যে, তাঁহারা কোরান শরীফের এক পৃষ্ঠা দেখিয়াছেন, অপর পৃষ্ঠা দেখেন নাই। তাঁহারা "সুরা নেসার" ৩৪শ আয়েত দেখিয়াছেন, "সুরা নূর" ২য় এবং "সুরা মায়দা"র ৯১ আয়েত দেখেন নাই!!

সি। ঐ "সুরা নেসা"রই ২৪শ আয়েতের প্রথমাংশ দেখিয়াছেন, শেষাংশ দেখেন নাই।[২]

সু। ঠিক তাঁহারা করিতে না পারেন, এমন কোন কুকাজ নাই—তাঁহারা শব দ্বারা সম্পত্তি লিখাইয়া লইতে পারেন! তাঁহাদের কৌশলে দুই দিনের মৃতদেহ জবানবন্দী দেয়!

---

২ (১) সূরা 'নেসার' উক্ত আয়েতের অর্থ এই—"পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর কর্তৃত্ব রাখে, ঈশ্বর তাহাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন বলিয়া" ইত্যাদি।

(২) সূরা "নূরের" এ অংশে কুপথগামীদের প্রতি একশত কশাঘাতের বিধান আছে।

(৩) সূরা "মায়দার" ঐ আয়েতের অনুবাদ এই—"মদ্য ও দ্যূত ক্রীড়াতে তোমাদিগের মধ্যে ঈর্ষা ও শত্রুতা স্থাপন এবং তোমাদিগকে ঈশ্বর-স্মরণ ও উপাসনা হইতে নিবৃত্ত রাখা শয়তান ইহা ভিন্ন ইচ্ছা করে নাই, অনন্তর তোমরা কি (সুরাপান হইতে) নিবৃত্ত হইবে?"

(৪) এবং সূরা "নেসা"র ২৪শ আয়েতের প্রথমাংশ এই—

সি। আর যদি সেই "—" শাখা নদীটার বাক্‌শক্তি থাকিত, তবে সে বলিতে পারিত, (২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে) সে কত লোককে গোপনে নরহত্যা করিয়া তাহার গর্ভে শব ডুবাইতে দেখিয়াছে ; আর কত অসহায় ব্যাক্তি তাহার তটস্থিত অরণ্যে নৈশ অন্ধকারে প্রাণবায়ু হারাইয়াছে ! আর বলিতে পারিত, সে কত হতভাগ্যের মৃত্যুকালীন আর্ত্তনাদ শুনিয়াছে—

সু। (ভ্রাতার প্রতি) সেই হত্যাকাণ্ডগুলির অধিকাংশই তোমার তথাকথিত "মুসলমান"দের দ্বারা সম্পাদিত !

কা। কোন্ শাখা নদীর তীরে নরবলি দেওয়া হইত ? আমি ত জানি না !

সি। জান না ? বুকে হাত দিয়া দেখ ত ? স্থানটার সুস্পষ্ট পরিচয় দিতে হইবে না কি ? "গোষ্ঠীর নিকট ফষ্ঠী"[৩] করিতে নাই ; এই নীতিবাক্য মনে রাখিও।

সু। যাঁহারা উক্ত প্রকারে "মুসলমান শাস্ত্রের নিয়ম" প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদের অনুকরণ করিবেন কিরূপে ?

সি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমরা তাদৃশ কপটাচারী "মুসলমান" নহি ! গলার জোরে তোমরা আমাদিগকে "নাস্তিক" "কাফের"—যাহাই বল না কেন, "নরহন্তা" বা "গুপ্তঘাতক" বলিতে পার না !

কা। (সিদ্দিকার কথায় কর্ণপাত না করিয়া) তোমরা যেমন মক্কা মদীনা বেড়াইতে গিয়া উষ্ট্রারোহণ, গর্দভারোহণ—কিছুই বাকী রাখ নাই, মুসলমান অশিক্ষিতা কুলরমণীগণের পায়ের জড়তাই আজিও ভাঙ্গে নাই—

সু। (স্বগত) এখন "মুসলমান রমণীর" পালা ! (প্রকাশ্যে) তোমার আদর্শ কতকগুলি অশিক্ষিতা মুসলমান কামিনীর পায়ের জড়তা ভাঙ্গে নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা ঐ জড়িত পদে এমন এক এক লম্ফ দিয়াছেন যে, তাহাতে, তাঁহাদের পদচাপে সমাজের অস্থিপুঞ্জ চূর্ণ হইয়াছে ! কেহ বা ঐ জড়িত পদে এক লাফে পবিত্র "জেনানা" ত্যাগ করিয়া কুপথে দাঁড়াইয়াছেন ! তাদৃশ অশিক্ষিতা রমণীর প্রশংসা করা তোমাকেই সাজে !

কা। দেখ সুফিয়া ! আমাকে বেশী রাগাইও না ! মনে রাখিও, মাতাকে বৎসর বৎসর দেশ-বিদেশের হাওয়া খাওয়াইবার জন্য তোমরা দুই ভগ্নী যেরূপ ব্যবস্থা করিতে চাও—মায়ের কুপুত্র কয়টির—এই অশিক্ষিত বর্বরদের জীবনে অথবা নিতান্ত পক্ষে যে কয় দিন তাহাদের তত্ত্বাবধানে মাতা আছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের এ সাধ পূর্ণ হওয়া কঠিন, বরং অসম্ভব।

সু। মাতাকে তোমরা স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে যাইতে দিবে না, বেশ ! মাতার অসুখে তোমরা আর ব্যথিত হইবে কেন ? প্রবাদ আছে, "পুত্রের স্নেহ ততদিন পর্য্যন্ত, যে পর্য্যন্ত সে স্ত্রী লাভ না করে, আর কন্যার স্নেহ কখনও হ্রাস হয় না।" তোমরা এখন ক্ষমতাশালী বড়লোক, —তোমাদের নিকট মাতা একজন সামান্য "অবোধ মেয়েমানুষ" মাত্র ! এবং তোমাদেরই আশ্রিতা ! আর আমাদের জন্য মাতা তুলনা-উপমা-রহিতা—স্বর্গের আশীর্বাদ বিশেষ। এই

৩. ইহা পূর্ববঙ্গের প্রচলিত কথা।

মাতৃপ্রেম আমাদিগকে ঈশ্বর-প্রেমের নমুনা দেখায়! আমরা মাতৃচরণে চিরকাল শিশু থাকি; চিরকাল তাঁহার চরণ-ছায়ায় প্রত্যাশিনী! চিরদিন তাঁহার আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করি। তাই ইচ্ছা করি, মাতা অনেক দিন বাঁচিয়া থাকুন। আর সে-বার তোমাকে নিতান্ত কাতরভাবে লিখিয়াছিলাম, "মাতা অত্যন্ত পীড়িত আছেন, তুমি দেখ গিয়া। * * * বৃদ্ধা মাতা কতদিনই বা বাঁচিবেন--"। তাহা শুনিয়া তোমার হৃদয় দ্রব হয় নাই, বরং শুষ্ক ভাষায় উত্তর লিখিয়াছিলে, "আমার এখন তহসিলের সময়—এক পদ নড়িবার যো নাই।" ধন্য পুত্র-হৃদয়! তোমরা মাতার মৃত্যু কামনা কর, যেহেতু তাহা হইলে মাতার "ভরণ পোষণের ভার" হইতে রক্ষা পাইবে! আমরা মাতাকে "তত্ত্বাবধানে" রাখিব এরূপ আস্পর্ধা করি না,—কেবল মাতৃচরণ সেবা করিতে চাহিয়াছিলাম। আর চাহিয়াছিলাম, ধর্ম্মপরায়ণা পুণ্যবতী জননীকে অপবিত্রা পিশাচীদের সংশ্রব হইতে দূরে রাখিতে। ভাই! অন্তঃপুরের উদ্দেশ্য ত এই যে সংসারের অপবিত্রতা হইতে কুল-ললনাবৃন্দকে সুরক্ষিতা রাখা? কিন্তু পবিত্র অন্তঃপুরেও যদি পিশাচিদের অবারিত গতি থাকে, তবে কুলবালারা কোথায় লুকাইবে? কি তামাসাই হয়, যখন মাতা "মগ্‌রেবের" নমাজ পড়িতে (সন্ধ্যাকালীন উপাসনা করিতে) দাঁড়ান—আর বৈঠকখানা হইতে সেতার-সংযোগে পিশাচি-কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত তাঁহার কর্ণকুহরে সুধা ঢালিতে থাকে!! আমাদের এখানে মাতা ওরূপ কুৎসিত গান শুনিতে পাইতেন না যে! সেই জন্য তোমরা সুপুত্রেরা তাঁহাকে "তত্ত্বাবধানে" রাখিয়া তাদৃশ সঙ্গীত শ্রবণ হইতে বঞ্চিতা করিতে চাও না। বেশ! বেশ!!

কা। তা পুত্র-ভবন পবিত্র হউক, অপবিত্র হউক, মাতা তাহা ত্যাগ করিয়া জামাতৃ-ভবনে থাকিতে পাইবেন না, একথা নিশ্চয় জানিও। পুত্র জীবিত থাকিতে তিনি জামাতৃ-অন্ন গ্রহণ করিবেন কেন?

সিদ্দিকা। থাক, জামাতৃ-গৃহে তাঁহার পদধূলি দিবার আবশ্যক নাই। ঈশ্বর-কৃপায় তোমরাই দীর্ঘজীবী হইয়া মায়ের "অভিভাবক" থাক।

কা। তোমার পত্র পাঠ করিয়া বাস্তবিকই বড়ই কষ্ট হইয়াছিল—

সি। (স্বগত) আবার ঐ একই কথা! (প্রকাশ্যে) পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেই বালাই যাইত।

কা। পত্র ধ্বংস করিলে কি স্মৃতিও ধ্বংস হইত? বোধ হয় আমাদের বংশের উপর খোদাতালার নিতান্তই "গজব" (ক্রোধ, আক্রোশ বা অভিশাপ) পড়িয়াছে যে জন্য এ বংশের পুত্রগুলি ঐরূপ অশিক্ষিত ও বর্বর এবং কনাগুলি এক একটি নক্ষত্র! নচেৎ এই ত হাসেদ ভাইয়ের পাঁচ পাঁচটি ভগ্নী অত বড় শহরে বিলাত-ফেরতা এবং সুশিক্ষিতা অবস্থাপন্ন স্বামীদের সঙ্গে অনায়াসে প্রকৃত মুসলমানের ঘরের কুল-কন্যাদের মত সংসার করিতেছে; আজিও একটি মেয়েও সুশিক্ষিতা স্বাধীন[৪] bright star (উজ্জ্বল নক্ষত্র) সাজে নাই।

---

৪. কাজেব ক্রোধভরে কথায় কথায় বেচারী বঙ্গভাষার মুণ্ডপাত করিতেছেন। পাঠিকা "কাণ্ডাকাণ্ড", "সুশিক্ষিতা অবস্থাপন্ন", "মেয়ে সুশিক্ষিতা (স্ত্রীলিঙ্গ) স্বাধীন (পুংলিঙ্গ)" ইত্যাদি কতই মজার কথা শুনিতে পাইতেছেন!

সি। হাসেদ ভাইয়ের ভগ্নিরা উজ্জ্বল নক্ষত্র সাজেন নাই, বেশ ভাল কথা। কিন্তু তাহাদের বংশের পুত্রেরা বিষদানে পিতৃহত্যা করিয়া এবং কন্যারা গোপনে নানা কাণ্ড করিয়া সমাজে কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। যাক্ ভাই! অন্য লোকের পরিবারিক কথায় আমাদের কাজ নাই,—তুমি তাহাদের নাম সগর্বে, সগৌরবে উল্লেখ করিলে, তাই আমিও দু'কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

কা। (ভগ্নীদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া) খোদাতালার নিকট আরাধনা করি যে, তিনি যেন এই পরিবারের অশিক্ষিত বর্বর পুরুষগুলিকে অচিরে ধ্বংস করিয়া ফেলেন, যে তাহারাও উজ্জ্বল নক্ষত্রের ঝক্‌ঝকিতে চক্ষু ধাঁধা হইয়া মুখ ছাপাইয়া না বেড়ায়—

সি। উজ্জ্বল নক্ষত্রের ঝক্‌ঝকিতে চক্ষে ধাঁধা লাগিবে কেন? চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছিল সেই দিন—যেদিন হাসেদ ভাইয়ের স্ত্রী ও শ্যালিকাদিগকে মেলায় দেখিয়াছিলে—

সু। আর সেই মেলায় দুলাভাইকে[৫] তাহাদের সম্মুখে দেখিয়া মুখ লুকাইয়াছিলে! একদিকে ফাসেদ ভাই ভাবির[৬] নিকট হইতে দশ হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন, অপরদিকে তুমি পলায়নের পথ খুঁজিতেছিলে! "যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে রাত হয়"—দুলাভাইয়ের নিকট তুমি সর্বদা ফাসেদ ভাইয়ের শ্বশুরালয়ের পর্দার খুব প্রশংসা করিতে কি না।

কা। (সলজ্জভাবে) এসব আজগুবি কথা তোমরা কোথায় শুনিয়াছ?

সু। দুলাভাই নিজে বলিয়াছেন।

কা। তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিয়া থাকিবেন।

সি! আর এক কথা মনে পড়িল। তুমি যে আমাদের মক্কাশরীফ ভ্রমণের কথা বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছ, তাহার উত্তর দিতে ভুলিয়াছিলাম।

কা। প্রত্যেকটা কথার উত্তর না দিলে কি তোমাদের মানহানি হইবে?

সি! মানহানি হইবে না বটে; কিন্তু এখন আর সেদিন নাই যে আমরা তোমাদের চাবুক নীরবে পরিপাক করিব—

সু। বাস্তবিক এখন আর সেদিন নাই।

কা। সুফিয়া! তুমি আর ক্ষীরে লুন দিও না। তোমারা দুইজন— আমি একা!

সু। তুমি একাই আমাদের দু'জনের সমান।

কা। হায়! এখন আর সেদিন নাই যে! আচ্ছা সিদ্দিকা! আমাদের চাবুক পরিপাক করিবে না ত কি করিবে? তোমরাও আমাদের চাবুক মারিবে না কি?

সি। না, চাবুক মারিব না—রোদনই করিব; তবে প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বে নীরবে রোদন করিতাম, এখন উচ্চকণ্ঠে রোদন করিব, যাহাতে বাহিরের লোকের দয়া উদ্রিক্ত হয়। যাহাতে জগৎ আমাদের দুঃখে সহানুভূতি করিতে পারে!

কা। বেশ! কাঁদ—

---

৫. ভগ্নিপতিকে "দুলাভাই" বলা হয়।
৬ "ভাবি" ভ্রাতৃবধূ।

সি। আমরা ত যাহা হউক, মদীনা শরীফে উষ্ট্রারোহণে "থপ্ থপ" করিয়া বেড়াইয়াছিলাম। আর যাঁহারা এদেশের অন্তঃপুরের জানালা হইতে উঁকিঝুঁকি মারিয়া পথিককে নাকের নোলক, মুখের ঝলক দেখাইয়া থাকেন, শিবিকা ছাড়া এক পা নড়েন না, অথচ মোটা দোহারা পর্দায় বড় বড় ছিদ্র করিয়া ফেলেন, তাহারা বুঝি প্রচলিত অবরোধ-প্রথার মান রক্ষা করেন? কেমন?

সু। মনে পড়ে, মৌলভী নইমুদ্দিন সাহেব প্রণীত "জোব্দাতল মসায়েল" পাঠ করিয়াছি,—"গহনার ঝনঝনিতে আমার নমাজই যেন কেমন কেমন হইল।" তোমরা মনে কর, গোপনে কোন কাজ করিলে দোষ হয় না। আর চতুষ্প্রাচীরের ভিতর কয়েদ থাকার সহিত "মুসলমান শাস্ত্রের" সংশ্রব কি? কোন মুসলমানপ্রধান দেশেই ত ঈদৃশ অন্তঃপুর প্রথা নাই—এই ভারতে ও-প্রথা হইয়াছে কেবল অবলা-পীড়নের উদ্দেশ্যে। মক্কাশরীফে কি শিবিকা অছে? সে দেশে "উল্টা গাধা" ছাড়া আর বাহন কই?

কা। কি বলিলে?—অবরোধ-প্রথা শাস্ত্রের বিধান নহে? তোমরা কোরান শরীফ দেখাইয়া এ কথা প্রমাণ করিতে পার?

সি। অবশ্য পারি। কিন্তু আমাদের কথা প্রমাণের পূর্ব্বে তোমরা প্রমাণিত কর—ভারতের বর্ত্তমান পর্দা কোরান শরীফের অনুমোদিত। আমাদের ত রাঙা চক্ষু দেখাইয়া চুপ করাইতে পার; কিন্তু অক্টোবর মাসের (১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের) "দি ইণ্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিন" ("ভারত ললনার পত্রিকা") দেখ নাই? মাননীয় মীর সুলতান মহিউদ্দীন সাহেব বাহাদুর ৫০০.০০ টাকা পুরস্কার দিবেন, যদি কেহ বর্ত্তমান অবরোধ-প্রথাকে কোরান শরীফের বিধান বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারেন। তিনিই প্রকৃত বাহাদুর। ভাই! তুমিই কেন পুরস্কারটা নিতে চেষ্টা কর না? ঐ পত্রিকায় সৈয়দ সাজ্জাদ হায়দার সাহেবের এবং মীর্জা আবুল ফজল সাহেবের পর্দা সংক্রান্ত মন্তব্যগুলিও দয়া করিয়া পাঠ কর! ঐ কৃত্রিম অন্তঃপুর-বন্ধন মোচন হইলে সমাজে অবাধে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইতে পারে। তখন এ শিক্ষার গতিরোধ করা অসম্ভব হইবে।

কা। যদি আমাদের গায়ে জোর থাকে, তবে প্রাণপণে স্ত্রীশিক্ষার গতিরোধ করিবই। অন্ততঃ আমার কন্যাদিগকে আমি পড়াইব না। তোমাদের পড়াইয়া যথেষ্ট কর্ম্মফল পাইলাম, আর না—এ নেড়ামাথা লইয়া বেলতলায় আর যাইব না।

সি। বেলতলায় যাইতে হইবেই। গত কার্ত্তিক মাসের "নবনূর" পত্রিকায় "আধুনিক শিক্ষা" দেখ নাই? মাননীয় লেখক ভ্রাতাটি ঠিক বলিয়াছেন, "ভারতীয় মহিলাকুলের ইউরোপীয় শিক্ষালাভে বিষময় ফল" ফলিতে পারে; (আমরা ইহা স্বীকার করি না) কিন্তু নীলকণ্ঠের ন্যায় সে বিষ কণ্ঠে ধারণ করিতে হইবে। বুঝিলে?

কা। তোমরা এখন স্বাধীনতার চূড়ায় উঠিয়াছ, কাজেই ধরাখানা সরা হেন দেখ। আহা! এখন মনে হইলে গা শিহরিয়া ওঠে। যখন তোমাদের সহকারে সেই অন্তঃপুরে মাতাকে এই নিষ্ঠুর ভ্রাতারা কয়েদ রাখিয়াছিল, তখন একটু স্বাধীনতার নিঃশ্বাস দিয়া সংবাদ লয়, এমন লোকও ছিল না! হায়! এমন দিনও গিয়াছে!

সি। ঠিক ত, সকলেরই সুদিন কুদিন চলিয়া যায়—পড়িয়া থাকে না। আমারও মনে হইলে হৃৎকম্প হয়, যখন পিতার নিষ্ঠুর আদেশ শুনিয়া তুমি দারুণ অভিমানে বিষভক্ষণ

করিয়াছিলে। হায় ! তোমারও তেমন দিন গিয়াছে,— যেদিন পিতা স্বয়ং গৃহস্বামী ছিলেন, আর তোমরা সকলে তাঁহার অধীন ও আশ্রিত ছিলে ! "আমার বাটী" বলিতে সে সময় তোমাদের এক ইঞ্চি (কিংবা এক অঙ্গুলি) পরিমাণ ভূমিও ছিল না। কালের বিচিত্র গতি !—

কা। কেন, তোমরা কি এত শীঘ্র ভুলিয়া গেলে? সেই বৃহৎ অট্টালিকা নামতঃ "পিত্রালয়" ছিল বটে, কিন্তু এই ভ্রাতাদের নিজ ব্যয়ে ও যত্নে রক্ষিত হইত। ধর্ম্ম ও স্বভাব কুকুর, কুকুরীকেও শিক্ষা দেয় যে কোন অবস্থায় নিজের benefactors-কে (উপকারী ব্যক্তিকে) ত্যাগ করিও না। কিন্তু ধন্য স্বাধীন চিন্তা ! তুমি সকলই অবহেলা করিতে পার।

সু। বিধবা মাতাকে শিশু কন্যাসহ নিজ ব্যয়ে রক্ষা করিয়াছ, ইহার ন্যায় অসাধারণ উপকারের কাজ যেন আর কেহই করে না ! পিতা থাকিলে আমরা তোমাদের গলগ্রহ হইতাম কেন? আর "স্বাধীন চিন্তা" কিসে কুকুরীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা কৃতঘ্ন হইল? তোমাদের ন্যায় মহা অনুগ্রাহকের আমরা কি অপকার করিয়াছি? তোমরা যে অন্নবস্ত্র দিয়া, বাটীতে আশ্রয় দিয়া প্রতিপালন করিয়াছ, সেজন্য সর্বদা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাকি ; আর কত প্রশংসা চাও? যদি বল ত নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে এই বলিয়া ঢোল পিটাই—

"আমরা বেনিফেক্‌টর ক' ভাই—[৭]
মাতাকে অন্ন দিয়াছি সবাই।
আমাদের গুণের নাই ক তুলা,
শৈশবে ভগ্নীর টিপি নাই গলা !
আমরা মহা-উপকারী ক' ভাই—" !

বাস্তবিক, শিশুকালে আমাদের গলা টিপিয়া পাতকুয়ায় ফেলিয়া দিলেই পারিতে ; অন্তঃপুরের ভিতর ফৌজদারী আপদ ত ঢুকিতে পারিত না ! পিতৃহীনা অসহায়া কনিষ্ঠাকে প্রতিপালন করিয়াছ, সে-কথা সগর্বে মুখে আনিলে? এই ত আমাদের বালক চাকরটা যাহা কিছু উপার্জন করে, সব ছোট ভাই ভগ্নীকে খাওয়ায়। ইহার পিতামাতা নাই ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও শিশু তিনটিকে অধিক সাহায্য করে না। হেদায়েত এগার বৎসর বয়ঃক্রম হইতে যাহা উপার্জন করিতেছে, সব ছোট ভাই ভগ্নীর নিমিত্ত ব্যয় করিতেছে। এখন ইহার বয়স ১৬ বৎসর ; এবার কয় মাসের বেতন জমা করিয়া বড় ছুঁড়িটার বিবাহ দিয়াছে। ১৬ বৎসরের বালক যেরূপ আত্মত্যাগ করিতে পারে ; এতটা কি তোমরা আমাদের জন্য করিয়াছ? কই, হেদায়েত ত মনে করে না যে, "ভগ্নীকে বিবাহ দিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধিলাম" বরং নিজের একটা গুরুতর কর্তব্য সাধন করিয়াছে, এই মনে করে। ইহাকে (কাপড় প্রস্তুত করা ব্যতীত) একটি পয়সা নিজের জন্য ব্যয় করিতে দেখি না। এখন কি এই অসভ্য ; অশিক্ষিত, ছোট জাতীয় (জোলা তাঁতি) বালকদের নিকট আমাদের উচ্চবংশজাত, সেন্ট জেভিয়ার কলেজের ছাত্ররা—সুসভ্য (৫০ বৎসরের !) প্রবীণ মিয়াঁ বাবুরা ভদ্রতা শিখিবেন?

কাজেব এখন পুনরায় অন্তঃপুরে কয়েদের কথা তুলিলেন,—

---

৭. 'আমরা বিলাত ফেরতা ক' ভাই
সাহেব সেজেছি সবাই'— এই গানের অনুকরণ।

"আর এক কথা, তোমরা দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র মাতাকে অন্তঃপুর কয়েদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত মামাতো ভাইকে চিঠি না লিখিয়া মেঝে ভাইকে লিখ নাই কেন? তোমরা ত তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি কর, কারণ তিনি বিলাত-ফেরতা—সাক্ষাৎ উদারতার প্রতিমূর্তি!"

সি। তিনি যদি পত্রের উত্তর দিতেন, তবে আর দুঃখ ছিল কি?

কা। হুঁ—! তুমি যেমন বিষমুখী! মুখ নহে—যেন ছুরী, ক্ষুর! ঐ মুখের গুণে কেহ তোমায় দেখিতে পারে না।

সি। সত্য কিঞ্চিৎ কটু শুনায়, তাই বলিয়া মধুমাখা মিথ্যা বলিতে শিখিব না। না, ভাই! মুখের দোষ নহে, অন্য কারণ থাকিতে পারে। বিলাত-ফেরতা লোকেরা অবলার ক্রন্দনে কর্ণপাত করিবেন না, ইহা অসম্ভব। চিঠির উত্তর দিতে শিখেন না, তবে তাঁহারা বিলাতে গিয়া কি শিখেন?

সু। তিনি অবলাকে চিঠির উত্তর পাইবার উপযুক্ত মনে করেন না।

সি। সম্ভবত তাই। কিন্তু আক্ষেপ এই, তাঁহাদের ন্যায় উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত লোকেরাও স্ত্রীজাতির উপকারের নিমিত্ত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম স্বার্থত্যাগ করিতে চাহেন না।

সু। পরের উপকারের প্রত্যাশাই বা কর কেন? "বাহুবলই বল"—আত্মনির্ভরতা চাই। যতদিন অভাগিনী যুক্তিজ্ঞানহীনা অবলা সরলাগণ নিজের ভালমন্দ বুঝিতে সক্ষম না হন, ততদিন তাঁহাদের উপকার করিতে গেলেও বেশী ফল হইবে না।

সি। আমি এই বিষয়ে তোমার সহিত একমত হইতে পারি না। অবলা সরলাগণ যুক্তিজ্ঞানহীনা নহেন—তাঁহারা বুঝেনও সব; কিন্তু প্রভুদের অত্যাচারে মাথা তুলিতে পারেন না—মাথা তুলিতে অক্ষম বলিয়াই বুঝিয়াও অবোধের ন্যায় নীরব থাকেন। এবং সময় সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভুদের "হাঁ" তে "হাঁ" মিশাইয়া থাকেন।

কা। প্রভুদের অত্যাচারে মাথা তুলিতে পারে না, একথা বল কেন? "বরং তোমাদের কেহ একটুকু মাথা উঠাইলে আমরা তাঁহাকে আকাশে চড়াইতে চেষ্টা করি...পণ্ডিতা রমাবাই কতগুলি সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করিয়া দেশটাকে যে তোলপাড় করিয়াছিলেন—"[৮]

সি। পণ্ডিতা রমাবাইকে মাথায় তুলিয়াছিলে, যেহেতু তিনি তোমাদেরই শিখান বুলি মুখস্থ করিয়াছিলেন। যতদিন তোমাদের পালিতা সারিকা তোমাদেরই শিখান বুলি বলিবে "পড় বাবা মতীজান"—ততদিন ত তাহাকে আদর করিবেই; মাথায় তুলিবেই। যেদিন সে "পড় বাবা মতীজান" না বলিয়া আর কিছু বলে, সেদিন আর নিস্তার কই?

কা। আমরা ললনা-পীড়ন ছাড়া আর কিছুই করি নাই কি? তাজমহল, মতি মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করি নাই কি?

সি। এক তাজমহলের জন্য কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই। এখন জিজ্ঞাসা করি, তাজমহলের সংখ্যা কত? কয়টা তাজমহল এ বঙ্গদেশে আছে?

---

৮. গত কার্তিক মাসের "নবনূর" দ্রষ্টব্য।

সু। বঙ্গে বহুসংখ্যক প্রপীড়িতা ললনার উদ্দেশ্যে অনেক মহল হইতে পারিত। তবে কথা এই যে, তাদৃশ অসহায়া মহিলাবৃন্দের সমাধির উপর "অবলা-পীড়নের" স্মৃতি রক্ষার্থে কোনো "পয়জার-মহল" নির্ম্মিত হয় নাই!! যাহা হউক, ইহাকে আর কি বলিব, আমাদের বিলাত-ফেরতা মেজে ভাইও যখন এমন গোঁড়া হইয়াছেন।

সি। বেচারা বিলাত-ফেরতা ভাইয়ের দোষ দিব কি, —তিনি ঐ কোরান শরীফের এক পৃষ্ঠাদর্শী মুসলমানদের দলে মিশিয়া "শিভালরী" (অবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন) ভুলিয়াছেন! অন্ধভাবে গড্ডালিকা-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছেন!

সু। তাই বটে। এ স্থলে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই হাসির গানটা আমার মনে পড়ে,—

"ভেসে যাব যাব হচ্ছি ফাউল ও বিফের বন্যায়[৯]
এমন সময় দিলেন ঈশ্বর গোটা কত কন্যায়।
ছেড়ে দিলেম পথটা　　　বদলে গেল মতটা
অমন অবস্থায় পড়লে সকলেরি মত বদলায়!"

কাজেব। বিলাত-ফেরতাই হও আর আমেরিকা-ফেরতাই হও, দেশ কালের নিয়ম-অনুসারে চলিতেই হইবে। এক এক দেশের এক এক পদ্ধতি। এক দেশের রীতি অন্য দেশে চলিবে না। "ইংলন্ডে প্রতি গৃহে অগ্নিকুণ্ড বারমাস প্রয়োজন—ভারতে কঠোর শীতকালেও তাহার ততটা আবশ্যক মনে হয় না।"[১০]

সি। তাই না কি? "ভারত" অর্থে কেবল কলিকাতা বুঝায় নাকি? দার্জ্জিলিং, শিমলা, মুলতান, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে[১১] "কঠোর শীতকালেও অগ্নিকুণ্ডের ততটা আবশ্যক মনে হয় না?"

কা। শিমলা কাশ্মীর শীতপ্রধান স্থান বটে, কিন্তু হিমালয় পর্ব্বতটা ভারতের অন্তর্ভুক্ত নহে।

সি। বটে! যে হিমালয়কে অতি প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র ভারতবাসী হিন্দু পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই হিমাদ্রিকে—সেই ভারতের আরাধ্য দেবতাকে আজি তুমি বিনাদোষে ভারত হইতে নির্বাসিত করিলে? আচ্ছা, বৃদ্ধ হিমালয়কে না হয় তাড়াইলে; কিন্তু আমাদের লাহোর এবং দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি নগরের প্রতি তোমার কি ব্যবস্থা? এগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত কিনা?

কা। ও-সব নগরে ইংলন্ডের মত শীত হয় না।

সি। ঠিক ইংলন্ডের মত না হইলেও অগ্নিকুণ্ডের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক বুড়ী খাটিয়ার নীচে "আঙ্গেটি" (কাঠ কয়লার আগুন, তুষ ও ঘুঁটেপূর্ণ হাঁড়ি বিশেষ) রাখিয়া শয়ন করে।

---

৯. "ফাউল ও বিফের বন্যায়" অর্থাৎ মুরগী ও গো-মাংসের বন্যায়।

১০. গত আশ্বিন মাসের "নবনূর" দ্রষ্টব্য।

১১. শিমলা হইতে এ বৎসর (অর্থাৎ ১৩১১ সালে) শীতের জুলুমে লোকে পলায়ন করিয়াছে; কাশ্মীরের পথঘাট তুষারাবৃত।

একবার ঘুঁটের গন্ধে বিরক্ত হইয়া কোন বুড়ীকে আঙ্গেটি দূর করিতে বলিয়াছিলাম। সে বলিল, "আমার আঙ্গেটিকে দূর করা যে কথা, আমাকে এ বাড়ী হইতে তাড়ানোও সেই কথা।" বাস্তবিক শয়নকক্ষে (কেবল কয়লার আগুনের) একটি আঙ্গেটি না রাখিলে ভাল মতে নিদ্রা হয় না— যেন রক্ত পর্য্যন্ত শীতল হইয়াছে, এইরূপ মনে হয়। তুমি বোধ হয় কেবল কলিকাতার শীত (temperature) দেখিয়া সমগ্র ভারতের ভাগ্য নির্ণয় করিয়াছ।

সু। হাঁ, তাহাই করিয়াছেন : ভাই ! তুমি ভুট্টার গাছ দেখিয়াছ? ভুট্টা গাছে নানা রঙের ফুল হয় ; ইহার পাতা ছাঁটিয়া তোমাদের ইলেকট্রিক পাখার ফলা (blade)প্রস্তুত হয় ! আর ইহার গুঁড়ির কাঠে তোমাদের আরাম কেদারা তৈয়ার হয় !

কা। (সহাস্যে) ওগো ! তোমরা মহাপণ্ডিত—ভূগোল, খগোল, অদ্ভুত (উদ্ভিদ) বিদ্যা, রসায়নাদি সমস্ত বিদ্যা তোমাদের কণ্ঠস্থ ! তোমাদের মত পণ্ডিতের সহিত তর্ক করা আমার ভারী অর্বাচীনতা ! ক্ষমা কর পণ্ডিত মহাশয় !

সি। কটু বলিলে বা বিদ্রূপ করিলে তর্ক হয় না। যদি তর্কে না পার, যথাবিধি পরাজয় স্বীকার কর।

কা। (সরলভাবে সিদ্দিকার কথার উত্তর না দিয়া) মহাপণ্ডিতই হও, আর যাহাই হও, তোমরা আমাদের সমতুল্য হইতে পারিবে না—কখনই না।

সু। সমতুল্য কেন, আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

কা। তা কি হয়? "মানবের মানসিক বল তাহার brain-এর (মস্তিষ্কের) উপর নির্ভর করে। পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের ব্রেন ওজন ও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের ব্রেন অনেক পরিমাণে অধিক।"

সি। তা হউক। বড় বস্তুতে সারভাগ অল্প থাকে। ছোট বস্তু অধিক সারবান হয়। এই দেখ না, রাশিয়া কত বড় মস্ত, আর জাপান কত ক্ষুদ্র—শেষে পোর্ট আর্থার কে লইল? প্রকৃত বীর--প্রকৃত যোদ্ধা কে?

কা। এই রুশ-জাপানের যুদ্ধটা না হইলে তুমি ছোট বড়র দৃষ্টান্ত কোথায় পাইতে?

সি। দৃষ্টান্তের অভাব হইত? নিত্য প্রকৃতি চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছে ! এই দেখ ছোট মরিচ (লঙ্কা) ও বড় মরিচে—একটা ধান মরিচ যত ঝাল হয়, তিনটা বড় মরিচে তত হয় না।

কা। তা' ঝালের পরিমাণ—বিষের পরিমাণ ত তোমাদের ভাগেই বেশী পড়িয়াছে। ক্রূর বুদ্ধি, কূটনীতি, কপটতা, ছলনা—এই সব উপাদানেই ত তোমরা গঠিতা। যত দুষ্কর্ম্মের মূল কারণ তোমরা !

সি। হাঁ, যত সব প্রসিদ্ধ ডাকাত আমরাই ; যত জালিয়াত, সিদ্ধহস্ত জুয়াচোর, রাজবিদ্রোহী, সব আমরাই ! জেলে অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোকই পচে ! নমরুদ, ফেরাউন এবং সুবিখ্যাত তান্তিয়া ভীলও স্ত্রীলোক ছিল ! !

কা। দুষ্কর্ম্মে স্ত্রীলোকের হাত প্রকাশ্যে না থাকুক, মূলে তাহারা থাকে। "স্বর্গোদ্যানে তোমরাই আমাদের পতনের পথপ্রদর্শক ছিলে, ট্রয় সমরের তোমরাই নায়িকা ছিলে, লঙ্কাকাণ্ড

তোমাদেরই পদানুসারে ঘটিয়াছিল, কারবালার সে ভীষণ কাণ্ডেও তোমরাই অভিনেত্রী ছিলে" ![১২]

সি। হাঁ, মাবিয়ার কন্যার সহিত হজরত আলীর কন্যার যুদ্ধ হইয়াছিল ! আর সেনাপতি ছিলেন হজরতা শহরবানু ! !

কা। "স্ত্রীলোক যে unreasonable (যুক্তিজ্ঞানহীনা) ইহা তাহাদের প্রকৃতি।" তোমরা প্রতি কথায় যুক্তিহীনতার পরিচয় দাও ! পুরুষ জাতি স্বভাবতঃই যুক্তিশক্তিবিশিষ্ট।

সু। ঠিক ! তাই লঙ্কাকাণ্ডে সীতাদেবীকে অভিনেত্রী বলিয়া তুমি হঠাৎ সমস্ত যুক্তিশক্তি ব্যয় করিয়া ফেলিলে ! ভাই ! একটা উদাহরণ শুন, আমার হাঁপানী রোগ আছে, ডাক্তার আমাকে কলা খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু মর্ত্তমান কলা দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আমি গোটা কত কলার শ্রাদ্ধ করিলাম—অতঃপর আমার হাঁপানী বৃদ্ধি হইল ! এখন বল ত, হাঁপানী বৃদ্ধির জন্য কে দোষী হইবে ? আমি, না কলা ?

কা। তুমি দোষী হইবে, কারণ লোভ সম্বরণ করিতে পার নাই।

সি। দোহাই তোমার যুক্তির ! —সব দোষ কলার ! ! কারণ, কলা সীতাদেবী, সুফিয়া রাবণ। ভাইয়া ! তোমার যুক্তির বলিহারী যাই ! !

কা। আচ্ছা, এ-কথা এখন থাকুক। ছোট বড় সম্বন্ধে আর কি উদাহরণ দিতে পার ?

সি। অনেক দিতে পারি ;—বঙ্গদেশে বেল ফুল বড় বড় হয়, পশ্চিমাঞ্চলে ছোট হয়। কিন্তু বঙ্গীয় ফুল (বড় ব্রেন) অপেক্ষা পশ্চিমে ফুলে (ছোট ব্রেনে) গন্ধ বেশী থাকে।

কা। তা থাকিতে পারে, আমি জানি না।

সি। আচ্ছা, বড় লেবু অপেক্ষা ছোট কাগজি লেবু ভাল, এ-কথা স্বীকার কর ?

কা। হাঁ, আমরা বাতাবী লেবু, তোমরা কমলা লেবু।

সি। অবশ্য ! বড় ব্রেন মিশ্রী, গুড় ; ছোট ব্রেন স্যাক্সিন, স্যাকরিন।[১৩]

কা। আজি যথেষ্ট বকিলাম এখন উঠি।

সু। কিন্তু তুমি যথেষ্ট পরাজয় স্বীকার কর নাই !

কা। তাহা করিবও না। আমাদের গায়ে জোর বেশী !

ঐ পর্য্যন্ত বলিয়াই কাজেব প্রস্থান করিলেন।

সুফিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, —"আমাদের রসনায় জোর বেশী— !"

কাজেব হয়ত তাহা শুনিলেন না।

তবে ভগ্নী পাঠিকা ! আমরাও এখন বিদায় হই।

---

১২. গত আশ্বিন এবং কার্ত্তিক মাসের "নবনূর" দ্রষ্টব্য।

১৩. "স্যাক্সিন" ও "স্যাকরিন" অত্যন্ত মিষ্ট চিনি বিশেষ। সাধরণ চিনির অপেক্ষা ইহা ১৬ গুণ (অথবা তদপেক্ষাও) অধিক মিষ্ট।

প্রেম-রহস্য

কবি বলেন, যাহা সুন্দর মনোহর, মানুষ তাই ভালবাসে। শৈশবে চন্দ্রমার প্রতি আমাদের অকপট ভালবাসার ঐ কারণ। শিশু ফুল ভালবাসে যেহেতু ফুল অতি সুন্দর। এই নিয়ম অনুসারে যাবতীয় উপন্যাসের নায়িকাই "সুন্দরী" হইতে বাধ্য হইয়াছে। নহিলে নায়িকা প্রথমে দর্শকের নয়ন রঞ্জন, অতঃপর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইতে পারে না।

বলি, যদি কেহ ঐ নিয়ম ভঙ্গ করে? অর্থাৎ যদি কোন কুৎসিত বিশ্রী বস্তুকে ভালবাসে, তবে কি সে কবিসমাজের বিধান অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে? তা যদি হয়, হউক। প্রেমিক প্রাণ দিতে কাতর নহে।

প্রেম কি? এই রহস্য অতি বড় পণ্ডিতেরাও ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই, আর তুমি আমি কোন্ ছার? তবে আমি এখন জীবনাবর্তের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া এই সুদীর্ঘ ষাট বছরের বহুদর্শিতায় প্রেম সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র বুঝিলাম যে, ও রহস্য দুর্ভেদ্য । যিনি প্রেম সম্পর্কে কিছুটা বিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত "অন্ধের হস্তী দর্শনের" ন্যায়। অন্ততঃ আমার ধারণা ঐরূপ।

এস্থলে আমার জীবনের কতিপয় ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আমি হিন্দু, খৃস্টান, মুসলমান— সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই ভালবাসিয়াছি। কিন্তু কেন ভালবাসিয়াছি, আজি পর্য্যন্ত বুঝি নাই।

আমি কয়েক মাস আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরার নিকট উড়িষ্যায় ছিলাম। সে অনেক দিনের কথা। আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় বায়ু-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত তথায় গিয়াছিলাম। উড়িষ্যার লোকেরা বড় ভীরু প্রকৃতির। আমাদের বাঙ্গালার ত্রিসীমায় (বিশেষতঃ আমার ভগ্নিপতির উপস্থিতির সময়) কেহ আসিত না। আসিত কেবল এক জন। প্রেমিকের অগম্য কোন স্থান নাই প্রেমিককে গিরি লঙ্ঘন করিতে হয়, বিনা নৌকায় দুস্তর সাগর পার হইতে হয়, কত কি করিতে হয়, আর এ "হাকিমবাবুর" বাসাবাটির নিকট আগমন ত সামান্য ব্যাপার।

প্রত্যুষে উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইলে দেখিতাম একটি বালিকা আমাদের বাঙ্গালার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে। আমি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতাম ; ঘুরিয়া ফিরিয়া যখনই বারান্দায় আসিতাম, দেখিতাম সেই চক্ষু দুটির দৃষ্টি আমার প্রতি।

আমার ভগ্নীপতি আফিসে গেলে পর মধ্যাহ্নে যখন আমরা দুই ভগিনী অলস সময় কাটাইবার জন্য কোন রূপ বুনন গাঁথন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতাম, অথবা যখন গল্প করিতে করিতে দিদি তক্তপোষের উপর ঘুমাইয়া পড়িতেন, আর আমি কোন পুস্তক পাঠে রত থাকিতাম, কবিতার ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়া বাহ্য জগৎ ভুলিয়া থাকিতাম, সেই সময় দৈবাৎ মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতাম, জানালার নিকট বাহিরে চম্পা (সেই বালিকা) আমাকেই দেখিতেছে।

একদিন কৌতূহলপরবশ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,"কেন আসিস্?"

চম্পা নত মস্তককে মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "তোমহঙ্কু দেখিবাকু" (তোমাকে দেখিতে)। বলিয়াই আবার শঙ্কিত হইল ; সভয়ে আমার মুখ দেখিতে লাগিল। আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বালিকা পলায়ন করিল। বলা বাহুল্য চম্পার কথা শুনিয়া আমার মনে যারপর-নাই আনন্দ হইল। আমাকে সে প্রতিদিন দেখিতে আইসে ভাবিয়া কেমন একটু অহঙ্কারও অনুভব করিলাম। মানব হৃদয় বুঝি চিরদিনই প্রেম-ভিখারী, তাই (যদিও আমার স্নেহময় আত্মীয় স্বজনের অভাব ছিল না তবু) এ অযাচিত প্রেমলাভে, কাঙ্গালের ধনরত্নলাভে আহলাদিত ও গর্ব্বিত হওয়ার ন্যায়, আমিও অতিশয় পুলকিত হইলাম।

সময় সময় দেখিতাম আমাদের ঝী চাকরেরা চম্পাকে তাড়া দিয়া বলিত, "এখানে রোজ কি কর্ত্তে আসিস?" সে বিনীতভাবে উত্তর দিত, "টিকে তাহাঙ্কু দেখি যাই" (তাঁহাকে একটু দেখে যাই)। একদিন আয়া তাহাকে অতি কর্কশস্বরে আমার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিল। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই চম্পা চলিয়া গেল। আমার বড় দুঃখ হইল। আয়াকে তাহার নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করায় সে বলিল, "ও যে জাতে চাঁড়াল, ওর ছায়া মাড়াতে নেই।" তাহার ছায়া মাড়াইলে আয়াকে স্নান করিতে হইত। চম্পা অস্পৃশ্য চণ্ডাল বলিয়া আমি তাহাকে হৃদয়চ্যুত করিতে পারি নাই। সে সুন্দরী ছিল না, বরং অতি কাল কুৎসিত ছিল, তবু আমি তাহাকে দেখিলে সুখী হইতাম।

আমাদের এই বিমল বিশুদ্ধ ভালবাসা লইয়া দিদিরা আমোদ করিতেন। দিদির এক প্রৌঢ়া ননদ সেখানে ছিলেন ; তিনিও আমাদের যথেষ্ট জ্বালাতন করিতেন। তিনি বলিতেন, "তাহেরা (আমি) চম্পার সহিত আবার মধু-মাস (Honeymoon) যাপন করিতেছে।" সে সময় আমার বিবাহিত জীবনের সপ্তম বৎসর ছিল।

সুখের দিন অস্থায়ী। রবিবারে দুলা-ভাই (আমার ভগ্নিপতিকে আমি আশৈশব দুলা-ভাই বলিয়া ডাকিতাম) আমাদের কক্ষে আসিয়া বসিলেন। আমাদের তিন জনকে অর্থাৎ দিদি, দিদির ননদ ও আমাকে কাপড় সেলাই লইয়া ব্যস্ত দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমারও কিছু করা উচিত।"

দিদি তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন, "মাফ কর, আমাদের ছুঁচ কাঁচি নিয়ে টানাটানি করে কাজ নেই।"

দুলা-ভাই। কেন আমি কি তোমাদের চেয়ে আনাড়ী? তাহারা সেদিন আমায় "য়্যাহু" বলেছিল, তাই বলে কি সত্যই য়্যাহু হয়ে গেলাম?

দিদির ননদ। ডীন, জে, সুইফ্‌টের কল্পনা যে একেবারে সৃষ্টিছাড়া ; — হুহুন্‌হুম্ দেশে অশ্বজাতি রাজত্ব করে, আর মানুষ (য়্যাহু) তাদের অধীনে থেকে শকটবহন করে। ঈশ্! কল্পনার আর সীমা নাই।

দিদি। অশ্ব মানুষের উপর প্রভুত্ব করে, এটা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি, দিদি? আমাদের সত্যিকার জগতে তার চেয়ে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা চিরকাল ঘটে আস্‌ছে।

দুলা-ভাই। বটে? সে অদ্ভুত ব্যাপার কি?

দিদি। সে অদ্ভুত ব্যাপার এই, যে পুরুষেরা আবহমানকাল পৃথিবীতে আধিপত্য করছে, যৎকালে সৃষ্টি জগতের উৎকৃষ্টতমা জীব নারীজাতি তাদের দাসত্ব-শকট বহন করে থাকে।

সহসা একটা উত্তর যোগাইতে না পারিয়া দুলা-ভাই দিদির দিকে "কটমট" দৃষ্টিতে চাহিলেন। আমরা উচ্চ হাস্য করিলাম।

"আমি তোমাদের কর্ম্মশালার কিছু স্পর্শ করিব না— আমি আমার কাজ করি", এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে চুরুট বাহির করিলেন। ধূমপান করাটাও একটা মস্ত বড় কাজ কি না।

দুলা-ভাই চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চম্পাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সকৌতুকে বলিলেন, "কি ছুঁড়ি ! তোর নাম কি?" তৎক্ষণাৎ চম্পা পলায়ন করিল। দিদি বলিয়া উঠিলেন,— "আঃ ! ওকে তাড়ালে কেন, ও যে তাহেরার সখী।"

এই কথায় একটা হাস্য-তরঙ্গ উঠিল, দুলা-ভাই আমার স্বামীকে দয়ার পাত্র বলিয়া আক্ষেপও করিলেন।

পরদিন চম্পা আর আসিল না। স্বয়ং "হাকিম বাবু" (দুলা-ভাই "বাবু" শব্দে আপত্তি করিতেন, কিন্তু গ্রামের লোকেরা কোন মতেই তাঁহাকে "বাবু" বলিতে ছাড়িত না। "সাহেব" শব্দ শিখাইয়া দিলে "সাহেব বাবু" বলিত।) তাহাকে দেখিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাই তাহার ভয়ের কারণ। চম্পার অদর্শনে সমস্ত দিন আমার প্রাণটা কেমন অব্যক্ত যাতনায় দগ্ধ হইতেছিল। দ্বিতীয় তৃতীয় দিনও বালিকা দেখা দিল না। আমি এক একবার উদাস নয়নে জানালার দিকে চাহিলাম,— প্রত্যেক বারই চম্পার স্থান শূন্য দেখিলাম।

অপরাহ্নে দুলা-ভাইকে দিদি চা খাওয়াইতেছিলেন। যখন চা ঢালিলেন ঠিক সেই সময় তাঁহার সাত মাসের খোকা পার্শ্বের ঘরে দাঙ্গা আরম্ভ করিল। দেখিতাম, দিদির উপর খোকার প্রভুত্বই অধিক। সুতরাং তিনি আমাকে চা প্রস্তুত করিতে বলিয়া খোকার আদেশ পালন করিতে গেলেন।

দুলা-ভাই আমার চায়ের প্রদত্ত স্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "তাহেরা ! আজ তুমি আছ কোথায়?" আমি অপ্রতিভ হইলাম। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

দুলা-ভাই। চায়ে চিনি দেওয়া হয় নাই।

তাঁহার দিদি বলিলেন, "তাহেরা এ কয়দিন চম্পা বিরহে অন্যমনস্কা আছে !"

দুলা-ভাই। কি জান, আপা ! তাহেরার অন্যমনস্ক হওয়ার কারণ চম্পা-বিরহ, না আজ ডাকে ব্যারিস্টার সাহেবের পত্র না পাওয়া— তাহা ঠিক বুঝা যায় না ! !

আমি অগত্যা সে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলাম।

শেষে মন মানিল না, সন্ধ্যায় চম্পাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ও তাহার মাতা আসিয়া একেবারে আমার পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল,—"চম্পা পিলা মনুষ্য— হু হু হু !" ব্যাপার দেখিয়া আমি ত অবাক ; চম্পা ছেলেমানুষ, সেজন্য তাহার মাতা কাঁদে কেন? পরে বুঝিলাম, "হাকিম বাবু" স্বয়ং চম্পার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাই তাহাদের বিপদ ও ভয়ের কারণ ! লোকগুলি যেমন ভীরু, তেমনই আবার যুক্তিতর্কেরও ধার ধারে না !

একবার আমি একটি ইংরাজবালাকেও ভালবাসিয়াছিলাম। তিনি শ্বেতাঙ্গী, আমি কৃষ্ণাঙ্গী— এক কথায় বলি, আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক,— তাঁহাদের বড়দিনের উৎসব সময়টা প্রায় আমাদের মধুর বসন্তের ন্যায় ; আমরা বাসন্তী সন্ধ্যায় মুক্ত ছাদে বসিয়া সদ্যঃপ্রস্ফুটিত বেল যূথিকার পরিমলবাহী মলয়ানিল উপভোগ করিতে ভালবাসি, আর তাঁহারা পৌষ মাসের দুরন্ত শীতে অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে বসিয়া অনল উত্তাপ উপভোগ করিতে ভালবাসেন ! তবু আমাদের উভয়ের হৃদয়ে অকপটে সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। মিস্ ডি'ও ইহা স্বীকার করিতেন।

মিস্ ডির বিরহে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম। তাঁহাকে শেষ বিদায় দিবার জন্য আমি স্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। আমি ওয়েটিং রুমে গাড়ী ছাড়িবার বাঁশী শুনিলাম ; গাড়ী চলিবার শব্দও শুনিলাম,— তখন মনে হইল যেন ট্রেনখানা আমার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গেল ! তারপর, মিস্ ডি ও আমার মাঝখানে বিশাল সাগরের ব্যবধান রহিয়া গেল।

আবার বলি, এ কেমন প্রেম ? আমার দীর্ঘজীবনের সমুদয় প্রেমকাহিনী বলিবার এ স্থান ও কাল নয়— তবে আর একটিমাত্র ঘটনা বলিয়াই উপসংহার করিতেছি।

আমি কয়েক বৎসর স্বামীসহ পশ্চিম প্রদেশে ছিলাম। অল্পকাল মধ্যেই প্রতিবেশিনী মহিলাবৃন্দের সহিত আমার আলাপ হইল। বিশেষতঃ একজন প্রবীণা মোসলেম ললনাকে আমি অত্যন্ত ভক্তি করিতাম, তিনিও সুদে আসলে আমার ভালবাসা প্রত্যর্পণ করিতেন। তাঁহার সহিত এক ধর্ম্ম ব্যতীত অপর অনেক বিষয়ে আমার ঐক্য ছিল না। যথা তাঁহার জন্মভূমি পশ্চিমে, আমার জন্মভূমি পূর্ব্বে (অর্থাৎ বঙ্গদেশে) ; তিনি আমার অপেক্ষা বয়সে ত্রিশ বৎসরের বড় ছিলেন, তবুও আমরা দুইটি শৈশবসঙ্গিনীর ন্যায় অভিন্নহৃদয় হইয়া উঠিলাম !

পরমেশ্বর মানবের অতি-প্রেম সহ্য করিতে পারেন না ; সুতরাং আমার মাননীয়া বন্ধুটি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলেন। আমি স্বেচ্ছায় তাঁহার অবৈতনিক সেবিকা হইলাম। এখন হইতে তাঁহাকে "আমার রোগী" বলিব।

জীবনে এই প্রথমবার (আত্মীয় ব্যতীত অপর) রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। পরের সেবায় এত সুখ শান্তি, ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, তাই আমারও এ সুখ শান্তিটুকু দেখিতে না দেখিতে — প্রাণ ভয়ে অনুভব করিতে না করিতে ফুরাইয়া গেল।

আমি অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ-মুকুল, আতর, গোলাপজল প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধি, এবং বেদানা, কমলালেবু ইত্যাদি জড়বস্তুর আকৃতিতে আন্তরিক প্রেম উপহার লইয়া আমার রোগীর নিকট উপস্থিত হইতাম। কিসে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, কোন জিনিষটি তিনি ভালবাসিবেন, এই চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতাম। তাঁহার মনোরঞ্জনই যেন আমার একমাত্র কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার রক্তহীন অধরে ঈষৎ হাস্য দেখিলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না।

আর আমার রোগীর মানসিক অবস্থা ?— সন্ধ্যা হইলেই (আমি প্রত্যহ সায়াহ্নে এবং দিবা এক ঘটিকার সময় তাঁহার নিকট যাইতাম) তিনি আমার জন্য তাঁহার শয্যার সন্নিকটে আসন প্রস্তুত করাইয়া আমার আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতা থাকিতেন। আমাকে দেখিবামাত্র

তাঁহার রোগযন্ত্রণা লাঘব হইত। যখন অত্যধিক দুর্ব্বলতায় অবসন্ন হইয়া মুদ্রিত নয়নে পড়িয়া থাকিতেন, তখনও আমি আসিয়াছি শুনিলে চক্ষু খুলিতেন। সেই জ্যোতিহীন নয়নদ্বয় আনন্দ–কিরণে উজ্জ্বল হইত।

আমার রোগী আবদার করিতেন— ঔষধ খাইবেন না। আমি ঔষধ হস্তে উপস্থিত হইলে তাঁহার শুষ্ক অধরে হাস্যরেখা প্রকটিত হইত— কপট বিরক্তির সহিত বলিতেন, "আয়ি মুঝে সাতানে কো" (আসিলেন আমায় জ্বালাতন করিতে।) কিন্তু ঔষধ তৎক্ষণাৎ সেবন করিতেন। যে পথ্য আর কেহ প্রস্তুত করিলে অখাদ্য হইত, তাহা আমার করস্পর্শে সুস্বাদু হইয়া যাইত। প্রেমের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ! !

আমার রোগী সেই অন্তিম দশায়ও আমাকে দেখিলেই বসিতে অনুরোধ করিতেন। আমি নমস্কার করিলে তিনি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। আমি তাঁহাকে যাতনা বেদনা ভুলাইয়া অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য ছোট ছোট গল্প বলিতাম, তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন। তিনি অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়া ছিলেন, সেজন্য আমাকে উর্দ্দু গজল (গীতি–কাব্য) গাহিতে হইত। অধিকাংশ গজল তাঁহারই ফরমায়েশ অনুসারে পঠিত হইত।

সেদিন আমার রোগীকে দেখিয়া হতাশ হইলাম। তাঁহার আরোগ্য লাভের শেষ আশাটুকু সেই দিন অন্তর্হিত ছিল। আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম, অদ্য বসন্ত ঋতুর শেষ দিন ; এই বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে আমার রোগীও শেষ বিদায় লইতে চলিলেন। সেই রবি, শশী, তারা সবই থাকে, কেবল বসন্তমাধুরী ফুরায়। মানসকর্ণে কোন কবি ও প্রকৃতির প্রশ্নোত্তর শুনিতেছিলাম,—

(প্রকৃতিরে) সুধাইনু "কি হল তোমার
সে সৌন্দর্য্য আর সেই (বসন্ত) যৌবন ?"
সহাস্যে উত্তর দিল সে, "ও প্রিয়তম !
আমি না ছিলাম, ছিল মহিমা স্রষ্টার।"

বসন্ত ত আবার আসিবে, আসিবে না কেবল আমার রোগী।

ঠিক সেই সময় আমার রোগী অনুরোধ করিলেন,

"গোর–চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হল প্রায়— এই গজলটি গাও ত, তাহেরা।"

আমি বিস্মিত হইলাম ; তিনি আমার মনোভাব বুঝিলেন কিরূপে? সে যাহা হউক, এখন রোগীকে কোথায় আশার কথা শুনাইব, না বৈরাগ্যব্যঞ্জক নিরাশার গান গাহিব, বলিব, "(কিছুকাল পর তোমার) গোরের চিহ্ন পর্য্যন্তও থাকিবে না?" আর যিনি আজি না হয় দুদিন পরে নিশ্চয় মরিবেন, এরূপ রোগীর পার্শ্বে বসিয়া মৃত্যুগীতি গাওয়াও ত শিষ্টাচার–বিরুদ্ধ। আমি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম, ওটা খুব কণ্ঠস্থ নাই। তখন তিনি আমার হাতে একখানি গজলের খাতা দিয়া বলিলেন, "তবে—

নাই সেকেন্দর কিম্বা দারার কবর,—
মুছে গেছে মানীদের স্মৃতিচিহ্ন কত !

ইত্যাদি পড়।"

আমি বিপদে পড়িলাম, এটাও যে ঐ ধরনের কাব্য। শেষে রোগীর আবদারই রক্ষা করা গেল ! যদিও—

"মৃত্যুযন্ত্র কত জনে করেছে পেষণ,
হয়েছে ভূগর্ভে লীন যশস্বীরা কত ?"

আবৃত্তিকালে আমার হৃদয় দ্বিধা হইতেছিল ! ভাবিয়াছিলাম এইভাবে আরও কিছুদিন কাটিবে। কিন্তু না—।

সেদিন বুধবার সন্ধ্যা। আমার রোগী অদ্য আমাকে চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন না ; আমাকে বসিতেও বলিলেন না ; আমি কাতরে ডাকিলাম, সাড়া দিলেন না। এই অনাদরে (?) আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। আমার চক্ষে জল দেখিলে তাঁহার কন্যা-বধূরা ধৈর্য্যহারা হইয়া গোল বাধাইবেন, এই ভয়ে অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলাম। ঐ সময় অশ্রু সম্বরণ কি কঠিন ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কে বুঝিবে ?

আমি তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলাম, এমন সময় (আমার করস্পর্শে !) তাঁহার নয়ন উন্মীলিত হইল, অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বহিন্ ! আজ বড় অবসন্ন হয়ে পড়েছি !" সেই "বহিন্" শব্দটি কেমন ভালবাসার সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা যে একবার শুনিয়াছে সে আর এ জীবনে ভুলিতে পারে নাই।

বৃহস্পতিবার রাত্রি ; আমার রোগীর হস্তপদ শীতল হইয়াছে। আমি সেই প্রাণহীন হাত দুখানি গরম করিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছিলাম,— আমার সম্মুখেই কি করিয়া তাঁহার প্রাণপাখী উড়িয়া গেল, দেখিতে পাইলাম না।

*

প্রেমের আলোচনা যতই করি, ততই দেখি উহা দুর্ব্বোধ্য। প্রেমিক-হৃদয় নবনীসদৃশ কোমল ; আবার পাষাণবৎ কঠিন। কখনও দেখি, প্রেম অতিশয় দৃঢ়, কখনও দেখি, ভঙ্গপ্রবণ ! ইহা শিশুর হৃদয়ে থাকে, প্রবীণ-হৃদয়েও থাকে— বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়। প্রেম কি স্বর্গীয় কোন তরুর মত— আমাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ শাখা পল্লবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ? অথবা প্রেম কি কোন ভাষার মত রাগরাগিণীর মত মানবের প্রাণে নানা ছন্দে ঝঙ্কারিত হয় ? যাহা হউক, বুঝা গেল না, প্রেমের স্বরূপ কি। বুঝিলে এইমাত্র বুঝি, প্রেমের আদি অন্ত নাই— প্রেম-রহস্য দুর্ভেদ্য !

তিন কুঁড়ে

বাল্যকালে গল্প শুনেছিলাম, এক যে ছিলেন রাজা, তাঁর বাড়ীতে ছিল তিন জন কুঁড়ে। তারা কোন কাজ করত না, কেবল দিন রাত শুয়ে থাকত। রাজবাড়ীর লঙ্গরখানা থেকে কেউ দয়া ক'রে দু'টি চারটি ভাত এনে দিলে, তারা সেইখানে শুয়ে শুয়েই খেয়ে নিত। এই রকমে তাদের অলস জীবন কাটিয়ে দিয়ে তারা কোন রকমে বেঁচে ছিল। কিছু দিন পরে রাজবাড়ীর অন্যান্য চাকররা মনে করলে, "বাঃ, এ ত বেশ মজা। এ কুঁড়েরা কোন কাজ করে না, তবু

নিয়ম মত দু'বেলা খেতে পাচ্ছে, তবে আমরা এত খেটে মরি কেন? চল,আজ থেকে আমরাও কুঁড়ে হলুম।" বাস্? এই না বলে তারা সবাই শুয়ে পড়লো।

এদিকে রাজা বাহাদুর দেখলেন, এ ত বড় বিপদ! এখন যে সমস্ত বাড়ীঘর কুঁড়েতে ভরে গেছে। এতগুলি কুঁড়েকে লঙ্গরখানা থেকে কাঁহাতক খাওয়াবেন? আর খাওয়াতে চাইলেও এখন লঙ্গরখানার ভাত রাঁধে কে? সবাই ত 'কুঁড়ে' হয়ে পড়ে আছে। তিনি তখন মন্ত্রীকে ডেকে মন্ত্রণা চাইলেন যে, কি করা যায়? মন্ত্রী মশাই বল্লেন, "তাই ত ; আমার আসনখানাও আর কেউ ঝেড়ে মুছে দিচ্ছে না।" (রাজার সিংহাসন ত কেউ মুছতই না, তবে মন্ত্রী মশাইকে চাকররা একটু আধটু ভয় করত।) "আচ্ছা মহারাজ! আপনি চিন্তা করবেন না, আমি এক্ষুনি প্রতিকার করছি!"

এই না বলে মন্ত্রী মশাই তখনই একজন খয়েরখাহ চাকরকে হুকুম দিলেন, "দে বেটা কুঁড়ে-বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে!" অমনি বাড়ীময় চারিদিকে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। সেখানে যত কুঁড়ে ঘুমিয়ে ছিল, তারা সবাই ধড়মড় করে জেগে উঠে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করলে। কিন্তু সেই যে পূর্ব্বের তিন কুঁড়ে ছিল, তারা তখনও উঠল না। যখন তাদের মাথার কাছে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো সেই তীব্র উত্তাপে কাতর হয়ে একজন অপর একজনকে বল্লে—

১ম কুঁড়ে। দ্যাখ হে ভাই! আজ রবি কত জ্বলে?

২য় কুঁড়ে। কেউ আংখি খোলে?

৩য় কুঁড়ে। ঘন ঘন রা' কাড়িস্ না, বাই বান খেলে।

অবশেষে রাজা যখন দেখলেন যে, এরা হচ্ছে আসল কুঁড়ে—এদের সাহায্য না করলে এরা পুড়ে কাবাব হবে ; তখন তিনি লোক-লস্করকে হুকুম দিলেন, ওদের ধরাধরি করে বের করতে। সেপাই সন্তরীরা তাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে একটা নিরাপদ পথের ধারে শুইয়ে দিলে।

শুনতে পাই, বাঙ্গলা মুল্লুকে নাকি প্রায় পৌণে তিন কোটি মুসলমানের বাস। এঁরা সেই তিন কুঁড়ে,—নড়াচড়া, চলাফেরা কিছু করেন না ; কেবল কুম্ভকর্ণের মত শুয়ে শুয়ে ঘুম পাড়েন। গত এপ্রিল মাসে যখন কলকাতায়—তথা সারা বাঙ্গালায় দাঙ্গা হাঙ্গামার আগুন ভীষণ বেগে জ্বলে উঠল, তখন যেখানে যত নকল 'কুঁড়ে' ছিল, তারা সবাই গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠে উন্নতির চেষ্টায় লেগে গেল, কিন্তু আমরা তিন কোটি কুঁড়ে সেই পূর্ব্বের মতই পাশ ফিরে ঘুমুচ্ছি! "স্যার" অমুক দয়া করে দু' চারটা চাকুরি জুটিয়ে দিবেন, শেঠ অমুক খয়রাত ফাণ্ড থেকে কিছু দান করবেন—তাতেই কোন রকমে আমাদের দিন কেটে যাবে। তারপর গোনা দিন কয়টা শেষ হলে পরকালে বেহেস্ত ত আমাদের জন্যই রিজার্ভ হয়ে আছে! সেখানে আমরা ছাড়া আর কে যাবে? চার দিনের দুনিয়া, ইহাকে চায় কে? কোন মতে ভবনদী পার হ'লেই অনন্ত-কালের জন্য অফুরন্ত বেহেস্ত আর অসংখ্য হুরী!!

গত ২৯শে নভেম্বর একজন বোম্বাইয়ের মহিলা আমাদের স্কুল দেখতে এসেছিলেন। কতক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখার পর তিনি আমায় বল্লেন, "মাফ করবেন, আপনাদের বাঙ্গালী মুসলমানের মত অকর্ম্মণ্য এবং জুয়াচোর আর কোথাও নেই। ওয়াক্ফ

সম্পত্তির মতওয়াল্লিরা টাকা ভেঙ্গে আত্মসাৎ করেন। এই ত গত ইলেকশনের সময় একজন মোটা গোছের মতওয়াল্লি দশ হাজার টাকার মদ কিনে খেলেন ও বন্ধুদের খাওয়ালেন।” ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি। যদি আপনি এই কথা বলছেন, তবে আমাকেও অনুমতি দিন, বোম্বেয়ে লোকের কথা কিছু বলি। শেঠ ছোটানী খিলাফত ফাণ্ডের ১৬,০০,০০০ টাকা—

বোম্বেয়ে মহিলাটি আমার কথায় বাধা দিয়ে শেঠ সাহেবের পক্ষ সমর্থন করে যা বল্লেন, তা'তে আমি বেশ বুঝলুম, শেঠ সাহেব হুজুগে পড়ে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই টাকাগুলো নষ্ট করেছেন। তারপর তিনি পুনরায় মাফ চেয়ে আমাকে জুতা মারতে আরম্ভ করলেন ; যথা—

বোম্বেয়ে মহিলা। দেখুন, আমি নিজের জাতের বড়াই করতে চাই না ; তবে বাস্তব ঘটনার কথা বলছি। এত বড় কলকাতা শহরের বাঙ্গালী মুসলমানদের কয়টা প্রতিষ্ঠান—মোসাফেরখানা, হাসপাতাল ইত্যাদি আছে? এখানে যা কিছু আছে, সব বোম্বাইয়ে এবং দিল্লীওয়ালা সওদাগরদের। সবচেয়ে বড় মসজিদটা — যেটাকে বাঙ্গালার গবর্নর বাহাদুর নত-মস্তকে মেনে নিয়েছেন, সেটাও বাঙ্গালীদের নয়। এখানে দশটা এতিম-খানা হলেও সকল দুঃস্থ গরীবের অভাব মোচন হত না—তবু সে স্থলে যে একটা মাত্র আছে, তাও বোম্বেয়ে লোকদের দ্বারা পরিচালিত। * * * কি লজ্জার বিষয়, এই কলকাতায় বাঙ্গালী মুসলমান মেয়েদের জন্য এমন একটা বালিকা-স্কুল নাই, যা'তে তারা বাংলা ভাষায় শিক্ষা লাভ করতে পারে। এই ধরুন না, আপনাদের এই স্কুলটা—ষোল বৎসর হয়ে গেল, আজ পর্য্যন্ত এটাকে না পারলেন হাইস্কুল করতে, না পারলেন বোর্ডিং হাউস খুলতে।[১]

আমি। এখানকার মেয়েরা একটু বড় হলেই পর্দার অনুরোধে তাদের বাপ মা স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেন। হাই-স্কুলে পড়বে কে?

বো-ম। মাফ করবেন, অমন কথা বলবেন না। মেয়েরা লরেটো, কনভেন্ট, ডায়োসেসন এবং অন্যান্য অ-মুসলিম স্কুলে যেয়ে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের মাথা খাচ্ছে। এই ত দু' বছর হ'ল, আপনাদের গ্রামের একটি মেয়ে কোন মুসলমানের বাড়ীতে বা বোর্ডিং হাউসে স্থান না পেয়ে নিতান্ত দীনভাবে বহু কষ্টে বেথুন কলেজে আশ্রয় নিয়ে, বি. এ. পাশ করলে! ...আর পর্দার কথা বলছেন? পর্দা আমাদের বোম্বাইয়ে যথেষ্ট আছে। নাই—বরং আপনাদেরই। সকল রকম অধিকার বঞ্চিতা হয়ে চার দেওয়ালের মাঝখানে বন্দিনী হয়ে থাকার নাম পর্দা নয়। আপনারা কোরান শরীফ পড়েন কি? না শুধু তাবিজ (হেমায়েল শরীফ) করে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন?...

ফল কথা, আমি উক্ত বোম্বেয়ে মহিলার কথা-কষাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে পড়লুম। কিন্তু জানি না, উপরোক্ত কথার খোঁচায় আসল তিন (কোটি) কুঁড়ের গায়ের কোথাও একটু আঁচড় লাগবে কিনা!!

---

১. আপাততঃ চল্লিশ জন বাঙ্গালী শিক্ষার্থিনী ছাত্রী পাইলে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা স্কুলে বাঙ্গলা শাখা খোলা যাইবে।

পরীঢিবি

মসুরী পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া এই সুন্দর সুদৃশ্য ক্ষুদ্র পাহাড়টুকুর নাম না শুনিয়াছে, এমন কে আছে? ইহাকে ইংরেজীতে "Witches Hill" বলে। এই পাহাড়ের ইংরেজী ও দেশি নামের চমৎকার সাদৃশ্য দেখা যায়। "পরীঢিবি" শুনিলেই সেই শৈশবকালীন শ্রুত রূপকথার দৈত্য, পরী এবং পরীস্থানের কথা মনে পড়ে। আর "Witches Hill" –এর অর্থও "যাদুকরীর পাহাড়"। সুতরাং এই নামের কারণ অনুসন্ধান করিবার আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই মনে জাগরূক হয়।

উপরোক্ত ভাবের আবেশে একদিন আমি বন্ধুবর মিঃ শফীকের সহিত মহা তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলাম। তর্কের বিষয় ছিল এই যে, উক্ত উচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড়ে কখনও দৈত্য-পরী অবস্থান করিত কিনা। এবং এখনও কি পরী-ঢিবিতে পরী বাস করে? অনেকক্ষণ তর্কের পর ধার্য্য হইল যে, আগামীকল্য অতি প্রত্যুষে পরীঢিবিতে বেড়াইতে যাওয়া হউক এবং এমন কোন অন্ধকার গুহার অন্বেষণ করা যাউক যদ্দ্বারা পরীস্থানে যাইবার পথ পাওয়া যায়।

পরদিন শফীক ও আমি প্রাতঃকালে ৫টার সময় পকেট ইলেকট্রিক আলোর সাহায্যে বিভিন্ন টিলা অতিক্রম করিয়া পরীঢিবিতে পরীস্থানের কল্পনা করিতে করিতে রকউড কলেজের সন্নিহিত রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। আকাশ পরিষ্কার ছিল—একখণ্ড মেঘও ছিল না। আমরা এই হাজার দেড় হাজার ফিট উচ্চতায় দাঁড়াইয়া দৈত্যকুলের সম্মুখীন হইতে ও আবশ্যক হইলে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। আমার বন্ধুটি (শফীক) স্বভাব কবি, তিনি পথে কল্পিতা পরীদের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

রকউড কলেজের পশ্চাৎ দিক অতিক্রম করিয়া শেষে আমরা সেই সুউচ্চ পাহাড়ের পাদমূলে আসিয়া পড়িলাম। এই স্থান হইতে খাড়া চড়াই আরম্ভ হইয়াছে। উঁচু নীচু আঁকাবাঁকা পথে ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত উঠিবার পর ক্লান্তি বোধ হওয়ায় আমরা বিশ্রামার্থে থামিলাম। স্থানটি অতি সুন্দর। চতুষ্পার্শ্বস্থিত দৃশ্যাবলী অত্যন্ত মনোহর। চতুর্দিকে হরিৎ দুর্বাক্ষেত্র দেখা যাইতেছিল,—পঞ্চাশ গজ দূরে পাদপ শ্রেণী ছিল। সেখানে গিয়া আমরা গাছে ঠেস দিয়া বসিয়া সিগারেটের ধূম পান করিতে করিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।

আমার সিগারেট তখনও খাওয়া শেষ হয় নাই, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কেহ আসিয়া হাত দিয়া আমার চক্ষু ঢাকিল। আমি আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "শফীক! তুমি কি ছেলেমী কর। এই কি তামাসা করিবার—" আমার মুখের কথা শেষ না হইতেই কিছু দূরে শফীকের কণ্ঠস্বর শুনিলাম, —"you are a fool শহীদ!" আমাকে "ফুল" বলা শফীকের উচিত কি অনুচিত তাহা ভাবিবার সময় ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, শফীকও ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতেছে। সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি যাহার প্রতি পড়িল, তাহা পঞ্চ পরীর একটি গুচ্ছ ছিল—সত্যিকার পরী! ঠিক তেমনই অবয়ব, তেমনই পোষাক,—যেরূপ গল্পে পাঠ করিয়াছি এবং ছবিতে দেখিয়াছি। নানাবিধ পরীর গল্পে এবং সেক্সপিয়ারের "Midsummer night's dream"–এ যাহা পাঠ করিয়াছি—সেই দৃশ্য

চক্ষের সম্মুখে আসিতে বারম্বার চক্ষু রগড়াইয়া ভাল করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম, "হে আল্লাহ্ ! ইহা স্বপ্ন দেখিতেছি, না আমি জাগ্রত !"[১]

ইতিমধ্যে জনৈকা পরী অগ্রসর হইয়া ইংরেজীতে দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল— "আপনারা এমন অসাবধানভাবে পরীস্থানের মহারাজা বখ্‌ত্ আজম শাহ–এর রাজ্যের অন্তর্গত উপত্যকায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন কেন? আপনারা কি জানেন না যে, এ–স্থানটি আমাদের রাজকুমারী মমতাজ গুল–এর বেড়াইবার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে? তিনি মহারাজা বখ্‌ত্ আজম এবং মহারানী "মিহির গুল"–এর একমাত্র কন্যা।"

আমি ও শফীক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরস্পরের মুখ দর্শন করিতে লাগিলাম। ইংরেজী ভাষায় কথা বলে, এ কেমন পরী? আর ইহাদের এশিয়াই নামই বা কেন? হঠাৎ মনে পড়িল, পরীগণ সকল প্রকার ভাষা জানে। আর সম্ভবতঃ আমাদের পোষাক–পরিচ্ছদ দেখিয়া আমাদের সম্বন্ধে ইহাদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে। আমি শশব্যস্তে টুপী খুলিয়া ইংরেজী ধরনে অভিবাদন করিয়া উত্তর দিলাম,—"সুন্দরী মহিলা ! আমার বন্ধু মিস্টার শফীক এবং আমি আপনাদের দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি এবং আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম যে, আমরা অজ্ঞাতসারে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ করিয়াছি। যদি জানিতাম যে, এ স্থান কাহারও নিজস্ব, তাহা হইলে কখনই এদিকে আসিতাম না, যদিও তাহাতে আমরা আপনাদের সহিত আলাপ করিবার সুখে বঞ্চিত থাকিতাম। যদি আপনাদের সঙ্গে রাজকুমারী মমতাজ গুল উপস্থিত থাকিয়া থাকেন, আমরা উভয়ে তাঁহার নিকট শ্রদ্ধার সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছি,—যাহা প্রকৃত ভদ্রলোকের করা উচিত।"

প্রথমা পরী উত্তর দিল,—"এখন আপনারা এত সহজে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। রাজকুমারী এখানে উপস্থিত নাই ; কিন্তু অতি নিকটেই একটা পাহাড়ের উপর বিশেষ একটা সাম্বৎসরিক উৎসব করিতেছেন। আপনাদের উভয়কে তথায় যাইতে হইবে। রাজকুমারী স্বয়ং বিচার করিয়া যাহা বিবেচনা করিবেন, তাহাই মানিতে হইবে।"

আমরা উভয়ে একবাক্যে বলিয়া উঠিলাম "রাজী।" শাস্তির ভয় অপেক্ষা পরীদের উৎসব দেখিবার আগ্রহই বলবতী হইয়াছিল।

পরীগণ অগ্রসর হইয়া আমাদের চক্ষে রুমাল বাঁধিতে লাগিল, "ভদ্রলোকের ন্যায় আপনারা সসম্মানে শপথ করুন যে, পথে যাইবার সময় আপনারা কিছু দেখিতে চেষ্টা করিবেন না।" আমরা তাহাই করিলাম। এখানে আমাদের যাত্রা এইরূপে আরম্ভ হইল যে, এক পরী আমার দক্ষিণ হস্ত এবং অন্য পরী আমার বাম হস্ত ধরিয়াছিল, সম্ভবতঃ এইরূপে দুই পরী শফীককেও ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। আমি কিছুই দেখি নাই, কারণ দেখিবার অনুমতি ছিল না।

আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল যে, এ কেমন পরী যে উড়ে না এবং আমাদিগকেও উড়াইয়া না লইয়া পায়ে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছে। শরতের এই পরিষ্কার আকাশে উড়িতে

---

১. পরীঢিবিতে যাত্রার প্রারম্ভে শফীক বলিয়াছিলেন যে, আমরা দৈত্যদের সম্মুখীন হইতে এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলাম। এখন মাত্র পাঁচ জন পরীকে দেখিয়াই হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন ! দৈত্যের সহিত যুদ্ধ ত অনেক দূরের কথা।

বেশ লাগিত। কিন্তু কিছু বলিবার সাহস হইল না। কারণ ভয় ছিল যে, কোন প্রকার আপত্তি আমাদের শাস্তি বৃদ্ধি করিয়া দিবে। প্রায় দশ মিনিট পরে সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমার মনে হইল, এখন আমরা রাজকুমারীর উৎসব-গৃহের নিকটে আসিলাম।

ক্রমে সঙ্গীত-ধ্বনি নিকটবর্তী হইলে উভয় পরী—যাহারা মুনকীর-নকীরের মত আমার দক্ষিণ ও বামে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে—আমার চক্ষু হইতে রুমাল খুলিল। দেখিলাম, অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য! পঁচিশ-ত্রিশজন পরী নানা রঙের পরিচ্ছদে সুশোভিতা হইয়া অতি নিপুণতার সহিত আধুনিক ইংরেজী নৃত্য "ফক্সট্রয়েট" নাচিতেছিল। তাহাদের মধ্যে হরিদ্বর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া একজন অসামান্যা রূপসী বালিকা ছিলেন। তাঁহার মাথায় মুকুট ছিল, যাহা মরকত-মণি দ্বারা ভূষিত বলিয়া মনে হইল। আলোক-রশ্মি সেই মণিমাণিক্য-শোভিত মুকুটে পড়িয়া এক অভিনব আলোক-রাজ্য রচনা করিয়াছে। এদিকে তিন চারিজন পরী ধরাসনে বসিয়া বেহালা, সেতার, বাঞ্জো এবং ক্লারিওনেট বাজাইতেছিল। শফীক ও আমি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া এই সব দেখিতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গিনী পরীগণও নৃত্যে যোগদান করিল।

পাঁচ ছয় মিনিট পর্য্যন্ত আমরা মুগ্ধ নেত্রে ঐ দৃশ্য দেখিবার পর কিয়ৎকাল বিশ্রামের জন্য নৃত্যগীত থামিল। আমাদের সঙ্গে যে পরীরা আসিয়াছিল, তাহাদের একজন রাজকুমারীর দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার কানে কানে কি বলিল। তিনি মৃদুহাস্যে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন ;—"আপনারা ভারী অন্যায়, এমনকি বড় ভারী অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন; ইহার শাস্তিও তদ্রূপ কঠোর হইবে। অর্থাৎ আপনাদিগকে আমাদের সঙ্গে নাচিতে হইবে।"

চার্জ্জ ফ্রেম করা ও সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমরা উভয়ে কাঠ হইয়া গেলাম! আমাদের জন্য এ শাস্তি বাস্তবিকই কঠোর ছিল। কারণ আমরা নাচিতে জানিলে ত নাচিব? আমি তাড়াতাড়ি সবিনয় করপুটে বলিলাম,—"সুন্দরী রাজকুমারী মমতাজ গুল! আমার বন্ধু এবং আমি বড় দুঃখিত যে, আমরা নাচিতে জানি না। কিন্তু আমার বন্ধু গানে ওস্তাদ। আপনি যদি অনুমতি করেন, ত আমরা পালাক্রমে গাহিতে পারি।"

আমার কথায় পরীগণ হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল এবং রাজকুমারী ভাল গান শুনিবার আশায় আমাদিগকে অগ্রিম ধন্যবাদ দিয়া ফেলিলেন। অতঃপর শফীক ও আমি বাদ্যকারিণী পরীদের নিকট গিয়া বসিলাম এবং পালাক্রমে হাফেজ, গালেব, খসরু এবং মীর সাহেবের কয়েকটা গজল গাহিলাম। প্রত্যেকটি গানের সমাপ্তিতে পরীগণ অতি জোরে করতালি দিতেছিল! অবশেষে আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং আমি বলিললাম,—"মাননীয়া রাজকুমারী! এখন আমরা বিদায় হই।"

তখন সমস্ত গীত-বাদ্য থামিয়া গেল। রাজকুমারী সুমধুর মৃদু হাস্যে বলিলেন,—"মেসার্স শাহীদ এণ্ড শফীক! আমি মমতাজ গুল এবং উপস্থিত পরীবৃন্দ আপনাদের উভয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি যে, আপনারা অতি সুন্দর গানে আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কিন্তু আপনারা কি এখনও রকউড কলেজের ছাত্রীবৃন্দকে এই সুন্দর ছদ্মবেশ ধারণের ও "ফ্যান্সি ড্রেস পিক্‌নিক"-এর জন্য শুভেচ্ছা (মোবারকবাদ) জ্ঞাপন করিবেন না?" ইহা শুনিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিলেন।

দ্বিতীয়বার আমরা পরস্পরের মুখ অবলোকন করিলাম—ইহারা তবে পরী নয়—সত্যিকার মানুষ ! পরে আমরাও প্রাণ ভরিয়া উচ্চহাস্য করিলাম। পরে আমি বলিলাম,–"আমরা আপনাদিগকে একবার নয়, শত সহস্র বার মোবারকবাদ জানাইতেছি। আমরা আপনাদের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, আমাদের পরীঢিবি ভ্রমণকে আপনারা আমাদের আশার অতিরিক্ত মনোরম করিয়া দিলেন।"

পরে আমি যখন আমাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলাম, তখন তাহারা খুব হাসিলেন ! অতঃপর সকলের সহিত করমর্দন করিয়া এবং পুনরায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা বিদায় হইলাম ! ![২]

বলিগর্ত্ত

(নির্জ্জলা সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

কলেজ বন্ধ হইয়াছে। গরমের ছুটি। বারান্দায় বসিয়া আছি। হঠাৎ দেখি কমলা দিদি হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আসিলেন। কমলা দেবী কংগ্রেস সেবিকা, চরকা ও খদ্দর প্রচার তাঁহার ব্রত। তাঁহার সঙ্গে জাহেদা বিবি নাম্নী একজন মুসলিম মহিলাও আসিয়াছেন। কমলা একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়াই বলিলেন, "সব দেশ জয় করিয়াছি, এখন চল বলিগর্ত্তে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে আবার কোথায়?"

জাহেদা উত্তর দিলেন, "সে আমার মামার বাড়ী, মামা নেই, এখন মামাতো ভাইদের রাজত্ব।"

আমি। বেশ ত, খুব সহজেই চরকার প্রচার করিতে পারিবেন।

কমলা। ও হো ! তুমি যত সহজ মনে করিয়াছ, তাহা নয়। সে গ্রাম অত্যন্ত দুর্গম, তাহার উপর সেখানে জাহেদার প্রবশ নিষেধ।

আমি। তার অপরাধ?

কমলা। আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, একটু লেখাপড়া জানে, খদ্দর পরে, নিরামিষ খায়।

আমি। তা হ'লে নাইবা গেলে বলিগর্ত্তে। বিশেষতঃ যাঁর মামাতো ভাই–এর বাড়ী তাঁরই যখন প্রবেশ নিষেধ।

কমলা। তা কি হয়? আমি যে কমলা—সর্বত্র আমার অবারিত দ্বার। বিশেষতঃ ঐ প্রবেশ নিষেধ বলিয়াই প্রবেশ করিতে হইবে। আর তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।

আমি। না ভাই ! তোমরাই যাও।

কমলা। আ রে ! তুমি না গেলে আমাদের আমোদ ভাল জমিবে না। চরকা চালাইতে পারিলে মিসিস্ খট্–খটেদের হারের তৈরী সূতায় প্রস্তুত প্রথম খদ্দরখানা তোমাকে দিব।

---

২ কোন একখানি উর্দু পত্রিকা হইতে অনূদিত।

বলিগর্ত্তের জমীদার খাঁ বাহাদুর কশাই-উদ্দীন খট্‌-খটের দেওয়ান মিস্টার জাহেরদার ফর্‌ফরে এখন কলিকাতায় আছেন। চল, তাঁহার সহিত দেখা করিয়া সব ঠিকঠাক করিয়া আসি। ওঠ বীণা ! লক্ষ্মীটি ! চল শীগ্‌গীর।

অগত্যা আমি তাঁহাদের সঙ্গে মিস্টার ফর্‌ফরের বাসায় গেলাম। তাঁহার আর দুইটি ভাইও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত আদর আপ্যায়নে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। আমি মনে মনে আশ্চর্য্য হইলাম যে, এত আদর-যত্ন পাইয়াও কেন জাহেদা বিবি বলেন যে, মামাতো ভাই-এর বাড়ীতে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ। হাঁ, বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এই দেওয়ান মিস্টার জাহেরদার ফর্‌ফরে জমীদারের সহোদর এবং অপর দুই ভদ্রলোক তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই। ইঁহারা কেহই জমীদারীর অংশ পান নাই, মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

জাহেদা। ভাই ! আমি ত একা যাইব না ; এই কমলা দিদি এবং বীণাপাণি দেবীও আমার সঙ্গে যাইবেন। আমাদের সকলের পাথেয়...

মিঃ ফর্‌ফরে। কোন চিন্তা নাই, বুবু ! তুমি দ্বিধা-সঙ্কোচ করিও না। চলুন সকলে, আমাদের মাথায় থাকিবেন। আপনাদের দেখিলে ভাই সাহেব অত্যন্ত সুখী হইবেন।

অতঃপর আমরা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে মিঃ ফর্‌ফরে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। তিনি গুপ্তপুর জেলার টাউনে থাকেন। গুপ্তপুর হইতে বলিগর্ত্ত চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূরে। বলিগর্ত্তে মিঃ খট্‌খটেকে এখনও আমাদের বিষয় জানান হয় নাই ; জাহেদা মিঃ ফর্‌ফরের সঙ্গেই পত্র ব্যবহার করিতেছিলেন। যাইবার তারিখ ঠিক করিয়া জাহেদা বিবি মিঃ ফর্‌ফরেকে কোন ভাইকে পাঠাইতে লেখায় তিনি উত্তর দিলেন যে, তাহারা উভয়ে বলিগর্ত্তে চলিয়া গিয়াছে, বকর-ঈদের পূর্ব্বে ফিরিবে না ; বিশেষতঃ এ সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয় আছে। তাই খাঁ বাহাদুর খট্‌খটে কাহাকেও ঘরের বাহির হইতে দিবেন না। জাহেদা যদি অপর কাহারও সহিত গুপ্তপুর যান, তবে তিনি তথা হইতে সহজেই তাঁহাদিগকে বলিগর্ত্তে পাঠাইয়া দিতে পারিবেন। তাঁহারা গেলে খট্‌খটে ভাই সাহেব বড়ই সুখী হইবেন।...

পরে জাহেদা লিখিলেন যে, পাথেয় পাইলে তাঁহারা রওয়ানা হইতে পারেন। উত্তর আসিল যে, তাঁহার ন্যায় দরিদ্র লোক অত টাকা কোথায় পাইবেন ?

তবে খাঁ বাহাদুর খট্‌খটে ইচ্ছা করিলে ৫০০্ টাকাও দিতে পারেন। যাহা হউক, জাহেদা ভাবিলেন, বলিগর্ত্তে পৌঁছিলে আর টাকার অভাব হইবে না।

যথাসময় আমরা যাত্রা করিলাম।... গুপ্তপুর যাইবার পূর্ব্বে পথে বিষ্ণুগঞ্জে এক বন্ধুর বাড়ীতে এক সপ্তাহের জন্য অতিথি হইলাম। বিষ্ণুগঞ্জ হইতে গুপ্তপুর মাত্র ৮-১০ মাইলের পথ। লোকে দৈনিক দুই তিন বার যাতায়াত করে। বিষ্ণুগঞ্জে অবস্থিতি কালে আমরা জানিতে পারিলাম, মিঃ ফর্‌ফরে নিজকে বড়ই বিপন্ন মনে করিতেছেন ; আর আমরা যাহাতে বলিগর্ত্তে যাইতে না পারি, তজ্জন্য প্রাণপণে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। লজ্জায় জাহেদা বিবির মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল। কিন্তু কমলা বলিলেন, —"কিছুতেই ছাড়িব না —বলিগর্ত্তে নিশ্চয়ই যাইব, যাই আগে গুপ্তপুরে। মিঃ ফর্‌ফরে তাঁহার ভ্রাতার এত প্রশংসা করিয়াছেন— এহেন ধার্ম্মিক সাধক মহাপুরুষকে একবার দেখিতেই হইবে।"

অতঃপর আমরা গুপ্তপুরে গেলাম। কিন্তু জাহেদা বিবি আমাদের লইয়া অন্যত্র গেলেন--মিঃ ফর্‌ফরের বাড়ী যাইতে দিলেন না। দুই তিন দিন পরে ভদ্রতার অনুরোধে মিঃ ফর্‌ফরে আমাদের বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া দুই দিনের জন্য লইয়া গেলেন। তথায় মিঃ ফর্‌ফরে এবং তাঁহার স্ত্রী ডালিমকড়া আমাদিগকে বলিগর্ত্ত সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা এই,—

এখন বলিগর্তে যাইবার কোন পথ নাই — খানা, ডোবা ইত্যাদি কাদায় পূর্ণ। জল প্রচুর নহে বলিয়া নৌকা চলিতে পারে না। পথ শুষ্ক এবং সমতল নহে বলিয়া পাল্কী ও মোটর চলিতে পারে না। পথের কোন স্থান আবার পাহাড়ের মত উচ্চ। লোকে গৌরীশঙ্কর আরোহণের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এখন কেহই বলিগর্ত্তে অবতরণের চেষ্টা করিতে সাহস পায় না। সে অনেক কষ্ট—অনেক কষ্টে জেলে ডিঙ্গী বা অপর কোন বাহনে বলিগর্ত্তের পত্রাদি শহরে আসে। আপনারা পথের অত কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিবেন না। আর যদিই বহু কষ্ট করিয়া যান, তবে থাকিবেন কোথায়?

খাঁ বাহাদুর খট্‌খটের বিশাল প্রাসাদে ছাগল, গরু, ভেড়া, মুরগী ইত্যাদি থাকে। অঙ্গনে দিনে দুপুরে সর্প-বৃশ্চিক কিল্‌বিল্‌ করে। সন্ধ্যার পরে এক জাতি পতঙ্গ উড়ে — তাহারা এমন দংশন করে—উঃ! হাত পা ফুলিয়া যায় আর চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে প্রাণ যায়। খাঁ বাহাদুর মশারির ভিতর বসিয়া ভাত খান — এই ত অবস্থা। আর তিনি স্বয়ং দোতলায় থাকেন। দোতলায় বেশী কামরা নাই যে, আপনাদের স্থান দিতে পারিবেন। তাঁহার তিন জন স্ত্রী তিন সুট ঘর দখল করিয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই দোতলায় একরূপ বন্দী অবস্থায় থাকেন। মিঃ খট্‌খটকে একটা চেয়ারে বসাইয়া বহির্বাটিতে লইয়া যাওয়া হয়। চাকরেরা তাঁহাকে চেয়ারে বহিয়াই ইতস্ততঃ লইয়া বেড়ায়—তিনি স্বয়ং কখনও মাটিতে পা রাখেন না। পাছে সাপে কামড়ায়! মিঃ খট্‌খটে পরম ধার্ম্মিক — দিবানিশি কোরআন, হাদীস, তফসীর এবং তস্‌বীহ্‌ লইয়াই থাকেন—জমিদারী না দেখিলেই নয়, তাই অতটুকু সাংসারিক কাজ করেন। মুসলমান ধর্ম্মীয় শাস্ত্রে সুদ প্রদান করা এবং গ্রহণ করা উভয়ই সমান পাপ। দরিদ্র প্রজাবৃন্দ অন্যত্র টাকা ধার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ধার করে। তিনি অতি উচ্চ হারে সুদ গ্রহণ করেন; কারণ শাস্ত্রে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ সুতরাং ধর্ম্ম বিনিময়ে সুদ লইতে হয়; ধর্ম্ম কি এমন সস্তা যে, তাহা অল্প মূল্যে বিক্রয় করা যায়? তাঁহার বাড়ীর সকলেই—বাঁদী, গোলাম পর্য্যন্ত অতি নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক। তাহারা হাদীসের অতি অস্পষ্ট কিম্বদন্তীও অতি নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকেন। কবে কোন্‌ কাফের জিহ্বা চাঁচিয়া কুল্লি করিয়াছেন, সেইজন্য সে বাড়ীর কেহ মুখ ধুইবার সময় জিব-ছোলা দ্বারা জিব পরিষ্কার করেন না।

জেহাদের পুণ্য অর্জনের নিমিত্ত তাঁহারা বাড়ীর দাসী এবং প্রজাদের ধরিয়া আনিয়া নির্মমভাবে প্রহার করেন। পাঠিকা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে পারেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আমলেও বহু দেশে "দাসী" আছে? ঐ সব দাসী প্রকাশ্য হাটে বাজারে ক্রীতা হয় নাই; ইহারা দরিদ্র প্রজার ঘর হইতে ছলে বলে কৌশলে ধরিয়া আনা দাসী। এইরূপে বাড়ীর বিবিগণ বাঁদী মারিয়া এবং খাঁ বাহাদুর প্রজা ঠেঙ্গাইয়া জেহাদের পুণ্য অর্জন করিয়া থাকেন। কালে ভদ্রে যদি কোন দাসী কোন প্রকারে পায়খানার নর্দ্দমা গলাইয়া পলায়ন করে, তবে তাহাতে খাঁ বাহাদুর বাঁদী "আজাদ" (অর্থাৎ মুক্তিদান) করার পুণ্য লাভ করেন।

পুণ্যশ্লোক খাঁ বাহাদুর অবরোধ প্রথারও ঘোর পক্ষপাতী। একবার চিকিৎসার নিমিত্ত তিনি গুপ্তপুরে সপরিবারে আসিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার কিশোরী ভগিনী এবং কতিপয় ভাগিনেয়ী আবদার করিল যে, তাহাদিগকে একবার বাড়ীর মোটর গাড়ীতে করিয়া গুপ্তপুর শহরটা দেখাইয়া আনিতে হইবে। অগত্যা মোটর গাড়ীটা মোটা বোম্বাই চাদরে সম্পূর্ণ জড়াইয়া তাহার ভিতর বিবিদের বসাইয়া সমস্ত শহর ঘুরাইয়া আনা হইল। বেচারীগণ আবছায়ার মত সামান্য সূর্য্যের আলো ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় নাই। তথাপি মিঃ খট্‌খটে তাহাদিগকে বলিলেন, "দেখ তোমরা মোটরে বেড়াইতে গিয়া অসংখ্য পুরুষের মুখ দেখিয়াছ সে জন্য এখনই আমার সম্মুখে "তওবা" (অনুতাপ) কর এবং প্রতিজ্ঞা কর জীবনে আর কখনও মোটরে উঠিতে চাহিবে না।"

মিঃ জাহেরদার ফর্‌ফরে খাঁ বাহাদুর খট্‌খটের সহোদর ভাই কিনা, তাই তিনিও পরম ধার্ম্মিক। শরিয়তের অতি তুচ্ছ কিম্বদন্তীও তিনি নিষ্ঠার সহিত পালন করেন। তাঁহার মতে মানুষের ফটো তোলা ভয়ানক পাপকার্য্য। তিনি গুপ্তপুরের একটি অনাথ আশ্রমের সেক্রেটারী হইয়া বহু পুণ্য (ছোট লোকে বলে বহু টাকা) অর্জন করিতেছেন। আমরা পরস্পরে শুনিতে পাইলাম, একদা তিনি উক্ত অনাথ আশ্রমে বঙ্গের লাট বাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লাট বাহাদুর বিদায় হইলে পর তাঁহার কতিপয় বন্ধু লাট সাহেবের সহিত তাঁহাদের একটা গ্রুপ ফটো তোলা হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করায় মিঃ ফর্‌ফরে বলিলেন, "তাই ত ভাই, এমন প্রয়োজনীয় কথাটা আমাকে একটু পূর্ব্বে স্মরণ করাইয়া দিলে না। সমস্ত কার্য্যই হইয়া গেল, শুধু এই অত্যাবশ্যক কাজটি বাদ পড়িল। আজ এই মস্ত ভুলটার জন্য আমার কিরূপ আক্ষেপ হইতেছে, তাহা আমি কথায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না।" তাঁহার এই উক্তি শ্রবণে জনৈক দুষ্টবুদ্ধি লোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া উপস্থিত সমস্ত ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এতদিন আমরা জানিতাম যে, আমাদের বন্ধুবর মিঃ ফর্‌ফরের মতে মানুষের ফটো তোলা বেজায় অমার্জনীয় পাপ। কিন্তু আমাদের সে বন্ধুবরের মতেই দেখিতেছি যে, লাট সাহেবের ফটো তোলায় কোন পাপ নাই, বরং উহাতে পুণ্যার্জনই হয়।" (সকলের হাস্য।) নিমন্ত্রণের দিন লাট সাহেব মিঃ ফর্‌ফরের কাজের প্রশংসা করিয়া দু'ছত্র লিখিয়া গেলেন। মিঃ ফর্‌ফরে সেই দু'ছত্রের দম্ভে ফুলিয়া প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গেলেন। তিনি শুধু ফুলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না ; বরং তিনি সেই দু'ছত্র লেখা অবলম্বনে একখানি ৮/১০ পেজী বই ছাপাইতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। অতঃপর সেই বই প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিতে তাঁহার দুই দিন অফিস কামাই হইল। তিনি সকলের নিকট বলিতে লাগিলেন ; "ম্যাজিস্ট্রেট ? ... সে ত একজন petty officer ! কমিশনর ? ... সে ত একজন নগণ্য চাকর। আমি কি উহাদিগকে "কেয়ার" করি ? বরঞ্চ তাহারাই আমার সম্মান করিতে বাধ্য, কারণ আজকাল আমার পত্র-ব্যবহার (communication) স্বয়ং লাট বাহাদুরের সঙ্গে হয়।" ইত্যাদি।

মিঃ খট্‌খটে পুরুষের জন্য চারি বিবাহ করা অতি প্রয়োজনীয় "সুন্নত" মনে করেন ; আর হিন্দুয়ানী সকল প্রথাকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখেন। কিন্তু নিজের ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বিধবা ভগিনীর বিবাহের প্রস্তাবে এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, "আমরা যখন হিন্দুর দেশে আছি, তখন তাহাদের আচার নিয়মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আমরা বাধ্য। কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বিধবার বিবাহ হয় না।" ইত্যাদি।

খাঁ বাহাদুর স্বয়ং তিন স্ত্রীর ভার বহন করিতেছেন ; চতুর্থ স্ত্রীর স্থান রিজার্ভ করা ছিল, একটি অসামান্য রূপসী জমিদার-কন্যার জন্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কোন দিন তিনি সুরার মত্ততায় বোতল হস্তে গুপ্তপুরের পথে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। দুষ্ট লোকেরা সেই কথাটুকু উপরোক্ত জমিদার গৃহিণীকে বলিয়া দেয়। ফলে সে বিবাহ ফস্‌কাইয়া গেল। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার চতুর্থা স্ত্রীর পদটা শূন্যই আছে ; যেহেতু এখন (তিনি ব্যাধি-ভোগে চলচ্ছক্তিহীন হওয়ায়) আর কোন "চোক খাগী" তাঁহাকে কন্যা দানে সম্মত নয়।

খাঁ বাহাদুর খট্‌খটের ভুরি ভুরি গুণের মধ্যে—গুণ এই যে, তিনি অত্যন্ত বন্দোবস্তী লোক। বর্ষার সময় চা'ল, ডাল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য বাজারে সহজপ্রাপ্য নয় বলিয়া তিনি পূর্ব্বেই সমস্ত জিনিস পর্যাপ্ত ক্রয় করিয়া রাখেন। ধান এত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে যে, পরে ধানের গাছ গজাইয়া সে গোলাটাই ধানের ক্ষেত হইয়া যায়। পেঁয়াজ ও নারিকেল গাছে দালানের প্রায় প্রত্যেক কামরাই পরিপূর্ণ। আলুর গাছগুলি ক্রমশঃ লতাইয়া মিঃ খট্‌খটের দোতালা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

বলিগর্ত্তের "ডব্লিউ সি" (পায়খানা) সম্বন্ধে ভগিনী ডালিমকড়া (মিসিস ফর্‌ফরা) যাহা বর্ণনা করিলেন, তাহা নিতান্ত রুচি-বিরুদ্ধ বলিয়া তৎসম্বন্ধে আমরা মসি কাগজ নষ্ট করিলাম না।

মিঃ খট্‌খটে সম্প্রতি আজরাইল নামক জনৈক হাকীমের চিকিৎসাধীন আছেন। হাকীম সাহেব প্রতি সপ্তাহে ২০০্ টাকা দর্শনী পাইয়া থাকেন। শুনিয়াছি, এই চিকিৎসার ফলে খাঁ বাহাদুর অতি দ্রুতগতি "মোকাম মাহ্‌মুদা" (স্বর্গের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠের) দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার দ্রুত আরোগ্য কামনা করিয়া মিস্টার ও মিসিস্ ফর্‌ফরার নিকট বিদায় লইয়া আসিলাম।

গাড়ীতে উঠিতে কমলা দিদি বলিলেন, "আচ্ছা দাদা ! অপেক্ষা করুন। বলিগর্ত্তে যাইবার পথ যদি ধরাধামে না পাই, তবে কিছু কাল পরে আমরা এরোপ্লেন যোগে আসিয়া একেবারে খাঁ বাহাদুর মিস্টার কশাই-উদ্দিন খট্‌খটের দোতালার ছাদের উপর নামিব।"

পঁয়ত্রিশ মণ খানা

কিছুদিন হইল মাসিক "সওগাত"-এর কোন সংখ্যায় "আশরাফ ও আতরাফ" শীর্ষক একটি ছবি দেখিয়াছিলাম। ছবির বিষয় এই যে, আশরাফ ঘৃণায় নাক সিটকাইয়া আতরাফকে বলিতেছেন, — "তুমি দূরে থাক, আমার নিকট আসিও না।" আশরাফের এই ব্যবহারে বড্ড রাগ হইল—এত বড় আস্পর্ধা ! মানুষকে ঘৃণা ! ইচ্ছা হইল, তখনই আশরাফদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া দেই। কিন্তু তাহাতে একটু অসুবিধা ছিল। অসুবিধা এই যে, আমি নিজে আশরাফ-এর তালিকায় নাম লিখাইয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং জেহাদ ঘোষণা করিলে যদি প্রথম তরবারি আমারই গলায় পড়ে তবে সে সমাজ-সংস্কারের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সবই সাফ হইয়া যাইবে।

তখন আমার চেষ্টা হইল, আশরাফদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাহাদিগকে আতরাফের সঙ্গে একাসনে বসাইয়া এক পংক্তিতে ভোজন করান যায় কিনা। তাহাতেও ছিল একটা বাধা।-তাহা এই যে, সেরূপ ভোজের আয়োজন করিতে হইলে আমাকেই গাঁটের পয়সা খরচ করিতে হয়। আমি স্বয়ং উভয় দলকে নিমন্ত্রণ করিলে তবে ত তাহাদের একাসনে বসাইতে পারি? কিন্তু শুকুর আলহামদু লিল্লাহ্! একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। ১১ই শরীফের দিন (অর্থাৎ রবিউস্সানি চাঁদের ১১ই তারিখে) মল্লিকপুরে বড় ধুমধামের সহিত মৌলুদ শরীফের ভোজ হইয়া থাকে। মল্লিকপুর কলিকাতা হইতে রেলযোগে মাত্র অর্ধ ঘণ্টার পথ। কলিকাতা হইতে পীর, ফকীর, আতরাফ, আশরাফ ইত্যাদিতে ট্রেন বোঝাই-করা লোকে সেখানে যায়। দিনের সময় মৌলুদ শরীফ শ্রবণ ও বিনা পয়সায় ভোজন আর রাত্রিকালে আতসবাজী দর্শন--সুতরাং মল্লিকপুর সে সময় লোকে লোকারণ্য। গত ১১ই শরীফের দিন আমিও গেলাম।

মৌলুদ শরীফ শ্রবণের পালা নির্ব্বিঘ্নে নীরবে শেষ হইল---এখন ভোজের পালা। আয়োজনকারী মতওয়াল্লিগণ পাকা মুসলমান---তাঁহারা আতরাফ ও আশরাফ নির্বিশেষে শুধু এক পংক্তিতে নয়---একাসনে, শুধু একাসনেও নয়--- এক বাসনে ভোজন করেন। আমার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল! এইরূপ একটা একাকার মিলনের দৃশ্য দেখাই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাহবা! শুধু মেথর-চামারে এবং ভদ্রলোকে নয়---স্ত্রী-পুরুষেও অবাধ মিশামিশি! অবশ্য হিংসুটে আশরাফ্ ললনাগণ নিজেদের একঘরে করিয়া দোতলায় চিকের অন্তরালে লুকাইয়াছিলেন।

মন-ভরা ডেগের পর ডেগ নাচিতেছে; বাবুর্চিগণ সকলকে দুই হাতে খানা বিতরণ করিতেছে। তথাপি আতরাফ নরনারী গৃহিণী-শকুনির মত ডেগের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দু'হাতে খানা লুট করিতেছে। খানা লুকাইয়া রাখিবার পাত্র — পায়খানার বদনা, পুরাতন টিন ও পরিত্যক্ত মাটির হাঁড়ি! শেষে বাবুর্চিগণ ক্লান্ত হইয়া দোহাই দিল যে, মতওয়াল্লি সাহেবগণ আসিয়া না দাঁড়াইলে তাহারা ডেগের ঢাকনা তুলিবে না। তাঁহারা আসিয়া পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া ডেগ ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাড়াহুড়া খাইয়া পুরুষেরা সরিয়া পড়িল। কিন্তু আতরাফ্ বীর নারীগণ মতওয়াল্লিদের বগলের নীচ দিয়া যাইয়া যে কোন নোংরা বাসনে ডেগের খানা লুটিতে লাগিল। এক একবার খাদেমগণ তাহাদের বাসন কাড়িয়া লইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে---বীরবালা আবার সেই কাদামাখা বাসন কুড়াইয়া লইয়া খানায় ডুবাইয়া দিতেছে!!

তাহার পর দোতলার চিকের অন্তরালের দৃশ্য দেখুন। তখন ভরা বর্ষাকাল--- সুতরাং কাদার অভাব নাই। আতরাফ্ কুলকামিনীগণ নোংরা কাদামাখা পায় আশরাফ্ বিবিদের হাত-পা, কাপড়, বোর্কা মাড়াইয়া তাঁহাদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহাদের নগ্ন শিশুগণ যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করিতেছে---কিন্তু কেহ একটু আপত্তির "উঁহু" পর্য্যন্ত বলিতেছেন না; কারণ, অদ্য এমন মোবারক দিন---১১ই শরীফ! এক একবার সিঁড়ির উপর ইতর ভদ্র---সকল প্রকার পুরুষ মানুষেরা আসিয়া বিবিদের একনজর দেখিয়া যাইতেছে---ইহাতেও কাহাকেও আপত্তি করিতে দেখিলাম না। (বিবাহ বাড়ীতে এবং মহররমের সময় ইমামবাড়ায় বিবিরা পুরুষদের ধাক্কাধাক্কিও খাইয়া থাকেন, ইহাতে "মোল্লা-ই-পর্দার" অবমাননা হয় না!) অতঃপর ভোজনের পালা। আতরাফ্ কামিনীগণ যথাসাধ্য পোলাও, কালিয়া, কাবাব, রুটি,

জরদা, ফিরনী লুটিয়া লইবার পর এখন উপরে আসিয়া বিবিদের সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া গেল। সকলে একাসনে বসিয়া একই বাসনে বসিয়া খাইবে। বড় বড় সেনীতে মধ্যস্থলে খানিকটা খানা—সেই সেনীর এক একটির চারিদিকে ঘিরিয়া চার-পাঁচজন করিয়া খাইতে বসিয়াছে। জানি না,ইহা সেই কাদামাখা বাসনের লুট করা খানার অবশিষ্ট খানা, না অপর কোন সদ্য তৈয়ার খানা ছিল। যাহা হউক, খাওয়া আরম্ভ হইল—ছেলেদের নোংরা হাত, কাহারও নাক বাহিয়া শ্লেষ্মা পড়িতেছে, কাহারও কান বাহিয়া পুঁজ পড়িতেছে, কেহ খাইতে খাইতে হাঁচিতেছে, কেহ কাশিতেছে। সোবহান আল্লাহ! আতরাফ্ ও আশরাফের কি অপূর্ব্ব মিলন!! ছেলেদের মূত্রত্যাগেরও বিরাম নাই। এইরূপে হাঁচি ও কাশির মধ্যে খানা খাওয়া শেষ হইল।

শুনিয়াছি, এইরূপ ভোজনের ফলে "ময়মন" বিবিরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ছয়-সাত মাস রোগ ভোগ করিয়া থাকেন! রোগ ভোগ না করিলেই আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। অনেকে যে ছয় মাস পরে সারিয়া উঠেন, তাহাও কপালের জোর বলিতে হইবে।

রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত মিলন-উৎসব এবং আতসবাজী দেখিয়া আমি স্টেশন অভিমুখে চলিলাম। পথে কয়েকজন মতওয়াল্লি সাহেবের সহিত দেখা হইল ; তাঁহারা পরস্পরে বলাবলি করিতেছিলেন—"দেখিয়ে না, পঁয়ত্রিশ মণ খানা ইস্‌তরেহ সে লুট হো গ্যয়া ; ইস্ ওয়াক্ত হাম্ লোগোঁকো ওয়াস্তে, এক চাওল বাকী নেহী রহা! আব খানা ফের পাকে গা, তব হাম্ লোগোঁকো নসীব হোগা।"

আমি শিয়ালদহ স্টেশনে নামিয়া আর অধিক দূর যাইতে পারিলাম না,— বড্ড ক্লান্ত ছিলাম মওলা আলীর দরগাহে আসিয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িলাম, দরগাহ্‌ওয়ালা তাড়া দিয়া বলিল, "এটা হোটেল নয় ; যাও ইটালী বাজারের বারান্দায় শোও গে।" আমি বলিলাম, "না বাপু! আমি আর উঠিতে পারিব না—বিশেষতঃ আমার পেটে তখন পঁয়ত্রিশ মণ খানার বোঝা ; তাহা লইয়া আমি একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছি।" যাহা হউক, দরগাহ্‌ওয়ালার সহিত কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর আমি সেইখানে শুইয়া পড়িলাম। মল্লিকপুরের কথাই ভাবিতে ভাবিতে চাহিয়া দেখি কি,—

(১) এক বিরাট মিছিল যাইতেছে ; হাতি-ঘোড়া, আসা-বরদার, সোটা-বরদার, তাহাদের হাতে সোনার আসা ও সোটা। হাতির উপর জড়াও হাওদা, তাহাতে জরির পোশাক পরা এক সুপুরুষ ছিলেন ; হাতির উপর আরও অনেক জরীর পোশাক পরা লোক ছিলেন। (২) তাহার পর আর এক মিছিল—ইঁহারা উৎকৃষ্ট ঘোড়ায় খুব জমকাল পোশাক পরিয়া সওয়ার ছিলেন, ইঁহাদের সঙ্গে চাঁদির আসা ও সোটা ছিল। অতঃপর ৩ নং মিছিল, ইঁহাদের পোশাক সাদাসিধে ছিল, ঘোড়াগুলিও দুর্ব্বল (নেহরু-মিছিলের ঘোড়ার মত) "মর কটুয়া"! সঙ্গে বরকন্দাজ আর আসা-সোটাও নাই। অনন্তর দেখি (৪) এক ব্যক্তি সামান্য ময়লা পোশাক পরিয়া একটা আধমরা ঘোড়ায় চড়িয়া অতি ধীরে ধীরে একা যাইতেছেন। তাঁহার চেহারা অতি সুন্দর, কিন্তু মনে হইল যেন তিনদিনের উপবাসী। (৫) সর্ব্বশেষে দেখি, এক বৃদ্ধ ময়লা ও ছেঁড়া কাপড় পরিয়া পদব্রজে যাইতেছেন—"জীর্ণ-শীর্ণ, রুগ্নকায়, মলিন বদন ; শতগ্রন্থি বাসে করি অঙ্গ আবরণ।" মনে হইল, তিনি কোন দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ হইতে আসিয়াছেন, হয়ত মাসাধিককাল হইতে অন্ন জোটে নাই। তিনি অতি কষ্টে খালি পায় রেল লাইনের বন্ধুর পথে চলিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই মল্লিকপুর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

সকলে অদৃশ্য হইলে আমি একজন পথিককে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, ১নং মিছিলে গেলেন দেশের যত পীর-মোরশেদ যথা— গাজী, মাদার, সত্যপীর ইত্যাদি। দেশের লোকে তাঁহাদের পূজা করে, এইজন্য তাঁহাদের এত সমৃদ্ধি। তাঁহারা তাই হীরা জওয়াহেরাতে সাঁতার দেন। ২ নং মিছিলে যত আউলিয়া ছিলেন, দেশের লোকে তাঁহাদের পূজা করে ; দেখ না, এখানে এক দরগাহ, সেখানে এক দরগাহ, তবে প্রথমোক্তদের চেয়ে একটু কম। ৩ নং মিছিলে ছিলেন যত পয়গাম্বর ; তাঁহাদের ত এদেশের লোকে তত মানে না, তাই তাঁহাদের ঘোড়াগুলি দানা পায় না। ৪ নং ব্যক্তি একা যাইতেছিলেন, তিনি ছিলেন আমাদের আখেরী জামানার পয়গাম্বর মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হিস্ সালাম। তাঁহাকে ত এ-দেশের লোকে মানে না, তাই তিনি খাইতে পরিতে পান না। ৫ নং লোকটি ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ মিয়া (নাউজ বিল্লাহি মিন্‌হা)। সে বেচারাকে ত আমরা ভুলিয়াও কখনও মনে করি না, কাজেই তাঁহার এইরূপ দৈন্য ! আমি অবাক হইয়া আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতে ছিলাম, এমন সময় আজান-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল—"আল্লাহু আকবর !" আমি জাগিয়া দেখি, সেই বারান্দায় মাটিতে শুইয়াই আছি। তাই ত, মওলা আলী দরগাহে শুইয়া ছিলাম বলিয়া পীর-পয়গাম্বরদের স্বপ্নে দেখিলাম !

বিয়ে-পাগলা বুড়ো*

শুনিয়াছি, সারদা বিল পাসের সঙ্গে সঙ্গে "কচি মেয়ের সহিত বুড়ো বরের বিবাহ নিষিদ্ধ" বলিয়া আর একটি বিল পাস হইবার কথা ছিল। ব্যবস্থাপক সভায় এই বিল পাস হইলে শরিয়তের নামে তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হইত কিনা, তাহা অনুমান করা সহজ নহে। অদ্য দুই তিন জন বিয়ে-পাগলা বৃদ্ধের বিবাহের ইতিহাস পাঠিকা ভগিনীদের উপহার দিব ? আশা করি, ইহা পাঠে তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না।

এক

পূর্ব্ববঙ্গের একটি পল্লীগ্রামে একজন সত্তর বর্ষীয় বর ক্রমে সাতজন বিবিকে নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিয়া অষ্টমবার বিবাহ করিতে চাহিলেন। গ্রামের দুষ্ট লোকেরা বেচারার দুর্নাম রটনা করিয়াছিল যে, বুড়াটা বউ-খেকো ; কাজেই আর কেহ তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত হয় না। মাতবর সাহেব বৃদ্ধ হইলেও বিবিধ খেজাবের কল্যাণে তাঁহার মাথার চুল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল ; দাড়ি-গোঁফ কলপ-রঞ্জিত করিয়া ভ্রমর-কৃষ্ণ মুখশ্রী বেশ সুন্দর করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার নগদ টাকাও যথেষ্ট আছে। বাক্স-ভরা কাপড়, তবু কোন হতভাগা তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত নয়।

অবশেষে পাড়ার কতিপয় যুবকের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তাহারা বহু কষ্টে একটি পাত্রী ঠিক করিয়া মাতবর সাহেবকে জানাইল যে, কুমারী মেয়ে পাওয়া গেল না ; একটি বাল্য-বিধবা আছে। বয়স একটু বেশী, ২২/২৩ বৎসর, আর একটু হৃষ্টপুষ্ট লম্বা গোছের

---

*অবিকল সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

মেয়ে। তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা ভালই, কুমারী যখন পাওয়া যায় না, তা আর কি করা।"

ঘটকেরা বলিল, "বিধবা বটে, তবে পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, ছয় মাস পরেই বিধবা হইয়াছিল। তদবধি পিতামাতার অন্ন ধ্বংস করিতেছে ; এখন মুরুব্বিরা তাহাকে পাত্রস্থা করিতে চায়। যদি আপনি পছন্দ না করেন, এ তবে সম্বন্ধ ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি সোৎসাহে বলিলেন, "না, না, এ-সম্বন্ধ ছাড়া হইবে না। বয়স একটু বেশী হওয়ায় সুবিধাই হইবে, ভালমতে ঘর গেরস্তি করিতে পারিবে।"

যথাকালে মাতবর সাহেব বরবেশে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন। বিবাহ বেশ ঘটা করিয়া হইতেছে। ঘটকেরা তাহার নিকট হইতে অনেক টাকা লইয়া খুব ধুমধামের সহিত আয়োজন করিয়াছে।

ক'নের সম্পর্কের এক নানী এবং পাড়ার ছেলের দল বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া আচার-পদ্ধতি পালন করিতেছে—এ নিয়ম, সে নিয়ম আর শেষ হয় না। ছোকরাগুলি মুখ টিপিয়া হাসে, আর ফিস্ ফিস্ করিয়া নানীবিবির সহিত কথা কহিয়া সেই উপদেশ-মত কাজ করে। বরের সম্মুখে বড় মোটা খেরুয়ার পর্দা, সেই পর্দার অপর পার্শ্ব হইতে স্ত্রীলোকদের চাপা হাসি শোনা যাইতেছে। বর অধীরভাবে শুভদৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন ; বিলম্বের জন্য মনে মনে গ্রাম্য আচার-পদ্ধতির মুণ্ডপাত করিতেছেন। তিনি পার্শ্বোপবিষ্ট ক'নের অলঙ্কারের মৃদু ঝনঝনি শুনিতেছেন ; আর সতৃষ্ণ নয়নে ক'নের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। পাত্রীর হাত-পা সব মোটা বানারসী শাড়ীতে ঢাকা, কিছুই দেখা যায় না ; কেবল ক্রেপের ওড়নার ভিতর হইতে বাদলা জড়ানো স্থূল ও সুদীর্ঘ চুলের বেণী দেখা যাইতেছে। চুলের বেণীটা ক'নের পিঠ বাহিয়া ফরাশের উপর পড়িয়াছে। বৃদ্ধ মনে মনে ভারী সন্তুষ্ট যে, আর কিছু না হইলেও আমার বউ যেন কেশর-রানী ! এ গ্রামে এমন ঘন লম্বা চুল আর কার আছে ?

অনেকক্ষণ প্রাণঘাতী ধৈর্য্যের পর দর্পণ আসিল, এখন শুভদৃষ্টি। অবগুণ্ঠন তুলিবার সময় পর্দার অপর পার্শ্বস্থিত চাপা হাসি কলহাস্যে পরিণত হইল, এদিকে বৃদ্ধ চমকাইয়া উঠিলেন ;—বউ এর মুখে ইয়া দাড়ী, ইয়া গোঁফ। বউ খিল খিল করিয়া হাসিয়া এক টানে মাথার পরচুলাটা খুলিয়া বরের সম্মুখে রাখিল। হতভম্ব বর তখন দাড়ি-গোঁফশোভিত ক'নেকে চিনিলেন যে, সে তাহার সম্পর্কের নাতি কালুমিয়া। সে দন্ত বিকাশ করিয়া বলিল, "নানা ভাই ! শ্যাষে আপনে আমাইরে বিয়া করলেন ?" মাতবর সাহেব অতি ক্রোধে কি বলিবেন, ঠিক করিতে না পারিয়া কেবল বলিলেন, "তোমরা যে এমন নাদান, তা জানতাম না।" আর সক্রোধে সেই বাদলা জড়ানো সুন্দর বেণীটাকে তুলিয়া এক আছাড় দিলেন। পরে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

দুই

পাটনায় এক ৬৫/৭০ বৎসরের কাজী সাহেব ক্রমাগত কয়েকটি স্ত্রী বিয়োগের পর পুনরায় বিবাহ করিতে চেষ্টা করিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনিও "জরু-খাওয়া" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন

বলিয়া সহজে আঁর জরু ধরিতে পারিতে ছিলেন না। তাঁহার মেহ্‌দী-রঞ্জিত দাড়ির জালে কোন সুন্দরীই ধরা পড়িল না।

অবশেষে কয়েকজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক উপরোক্ত কাজী সাহেবের জন্য ঘটকালী করিবার নিমিত্ত আসরে নামিলেন। কন্যা সহজে পাওয়া যায় না; কারণ শহরে যে কয়টি বিবাহ-যোগ্যা পাত্রী ছিল, তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বহু অর্থব্যয়ে একজনের ১০ম বর্ষীয়া কন্যা সংগ্রহ করা গিয়াছে। কন্যা পক্ষকে ছয় সাত মাস পর্য্যন্ত অনেক পর্বী-তেহারী দিতে হইল; চাকরদের বখশিশ দিতে হইল।

এই প্রকারের অনেক খরচ-পত্র, কাণ্ড-কারখানার পর কোন এক শুভ দিনে বিবাহের তারিখ ধার্য্য হইল। যথাকালে বর প্রাঙ্গণে শামিয়ানার নীচে আনীত হইলেন। এই বিবাহ-সভায়ও এ রছম সে রছম নানাবিধ মেয়েলী রছম (অর্থাৎ স্ত্রী-আচার) শেষ হইলে পর বর ক'নের শুভদৃষ্টি হইবার সময় প্রভাত হইয়া গেল। বর সানন্দে দেখিলেন, বালিকা বধূর কপালে নানাবিধ রঙ্গের চাঁদ-তারা চুমকি আঁটা হইয়াছে, গাল দুটি আফ্‌সা জড়িত হইয়া ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। সে কি সুন্দর! বধূর সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িতেছে। পাটনার নিয়ম অনুসারে ক'নেকে একজন মিরিয়াসিন[২] কোলে তুলিয়া লইয়া বাসর-ঘরে চলিল, বরের আচকানের সম্মুখের দামনের সহিত ক'নের বানারসীর দোপাট্টার এক কোণ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। বর সেই গ্রন্থি ধরিয়া ধীরে ধীরে পাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সহসা পাত্রী মিরিয়াসিনের কোল হইতে লাফাইয়া নামিয়া দিল দৌড়। বেচারা কাজী সাহেবের হাতে ক'নের ওড়নার কোণের গ্রন্থি ছিল, সুতরাং অগত্যা তাহাকেও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে হইল। দৌড়াইবার নির্দিষ্ট পথ পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা ছিল; তদনুসারে পায়ের অলঙ্কারসমূহ ছড়া, মল, ঘুঙুর, পরিছম, পা-জেব ইত্যাদি ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর শব্দে বাজাইতে বাজাইতে পাত্রী চলিল, বাহিরের পুষ্করিণীর চতুর্দিকে ঘুরিয়া,—সেখানে রাখাল ছোকরাগুলি করতালি দিয়া তাহাদের পিছু পিছু ছুটিল। পরে বাগানে দৌড়াইতে গেল, সেখানে মালীরা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। অতঃপর পাত্রী গেল নহবৎখানায়, সেখানে বাজনদারেরা তবলা সারেঙ্গী বাজাইয়া গান করিতেছিল। তাহারা করতালি দিয়া গলা ছাড়িয়া গাহিল, "বাঃ বেটি বাঃ! দৌড়তি হুয়ী দুল্‌হিন্‌ তোমহে মোবারক বড়ে মিয়াঁ! আজী ভাগতী হুয়ী দুল্‌হিন্‌ তোমহে মোবারক বড়ে মিয়াঁ!!"

চারিদিকে খুব খানিকটা চক্কর দিয়া ক'নে গিয়া উঠিল কর্তার বৈঠকখানায়। সেখানে অনেক সাহেব-সুবো অভ্যাগত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা হাসিয়া আকুল—লুটাপুটি। তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাত্রী একে একে তাহার সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল। বানারসি শাড়ী দোপাট্টা সব খুলিয়া ফেলিলে দেখা গেল যে, একটি দিব্যকান্তি বালক!! আহা বেচারা কাজী সাহেব!

---

২ মিরিয়াসিন এক প্রকার গায়িকা বিশেষ; ইহারা পুরুষের মজলিসে গীতিবাদ্য করে না। কেবল মেয়ে-মহলে বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া নাচগান করে এবং বিবাহ ইত্যাদি উৎসবে স্ত্রী-আচার পালন করে।

তিন

ভাগলপুরের এক স্টেশন-মাস্টার বয়োপ্রাপ্ত পৌত্র ইত্যাদি বর্তমানেও পঞ্চম বার বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি এখন স্টেশন-মাস্টারের কাজ হইতে অবসর লইয়াছেন। তিনি মুজফ্ফরপুরের অধিবাসী। বহুকাল ভাগলপুরে ছিলেন বলিয়া সেখানকার লোকেরা তাহাকে বিলক্ষণ চিনে এবং তাঁহাকে স্টেশন-মাস্টার বলিয়া ডাকিতেই ভালবাসে।

মুজফ্ফপুরে খাঁ সাহেবের পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি যথেষ্ট আছে। স্ত্রী-পুত্র সেইখানেই থাকে। তাঁহার প্রথম স্ত্রী বিয়োগ হওয়ার সময় ছেলেমেয়েরা সব ছোট ছিল। সুতরাং তাহাদের প্রতিপালনের নিমিত্ত তাঁহাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইল।

খাঁ সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর সময় মেয়েরা বিবাহিত ছিল, কিন্তু ছেলেদের বিবাহ হয় নাই, সুতরাং ছেলেদের বিয়ে-থা দিবার সময় কুটম্ব সাক্ষাতের সমাদর অভ্যর্থনা ইত্যাদি করিবার জন্য নিতান্ত বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে হইল।

খাঁ সাহেবের গৃহ যখন বধূ, জামাতা, বয়োপ্রাপ্ত পৌত্র, দৌহিত্র ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ সেই সময় তাঁহার তৃতীয় খানম দেহত্যাগ করিলেন। এবার তাঁহার বন্ধুরা বলিলেন, "দুই-চার বৎসর পরে পৌত্রের বিবাহ দিয়া বধূ আনিবেন, নিজে আর বিবাহ করিবেন না।" কিন্তু খাঁ সাহেব বলিলেন, "ঘর সামলাইবে কে? বড় বউ মেজ, সেজ এবং ছোট বউ এরা তিন চারি বা ততোধিক সন্তানের মাতা হইয়াছে সত্য; কিন্তু হাজার হউক তবু তাঁহারা ছেলে মানুষ বই ত নয়। এত বড় সংসার দেখিবে কে?" বন্ধুদের সহানুভূতি না পাইয়া শেষে তিনি অতি গোপনে এক দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাকে পত্নীরূপে ঘরে আনিলেন। বউয়েরা সে সময় পিত্রালয়ে গিয়াছিল, বাড়ীতে কেহ ছিল না।

বউয়েরা বাড়ীতে আসিয়া জানিতে পারিল যে, তাহাদের নতুন শাশুড়ী আসিয়াছেন। তাহাদের দেখিয়া শাশুড়ী তাড়াতাড়ি কামরার দ্বারে অর্গল দিলেন। বউয়েরাও আড়ি পাতিয়া রহিল। যেই একবার দ্বার খুলিল, অমনি সেজ বউ একেবারে শাশুড়ীকে কোলে তুলিয়া আনিয়া বারান্দায় তক্তপোষের উপর বসাইয়া দিল। ছেলেমেয়ের দল দুলাইন দেখিবার জন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইল, এ বলে "দুলাইন দাদী", ও বলে "দুলাইন নানী।"

ফল কথা, চতুর্থা খানম মোটেই ঘর সংসার দেখেন না, কেবল পৌত্রী দৌহিত্রীদের সঙ্গে তাশ খেলে আর গল্প করে। এই জন্য খাঁ সাহেবকে পঞ্চম বার বিবাহ করিতে হইতেছে। পোড়া মুজফ্ফরপুরে বিবাহের সুবিধা না হওয়ায় তিনি সহানুভূতি ও সহৃদয়তা, দু'ই পাইলেন।

যথাসময় খাঁ সাহেবের বিবাহ হইয়া গেল, শুভদৃষ্টিও হইল। বাসর-ঘরে পাত্রীকে লইয়া যাওয়া মাত্র তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। সেবা শুশ্রূষার জন্য স্ত্রীলোকেরা আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল, কাজেই খাঁ সাহেবকে বাহিরে যাইতে হইল।

খাঁ সাহেব কয়েক দিন শ্বশুর বাড়ীতে অবস্থান করিয়া শেষে অন্যত্র বাসা লইলেন। ইতোমধ্যে তিনি আর একবারও নববধূকে দেখিতে পান নাই, কারণ সর্ব্বক্ষণ হাকীম, ডাক্তার ও স্ত্রীলোকদের ভিড় থাকিত।

অবশেষে স্থির হইল যে, দুলাইনের পারিবারিক হাকীমের চিকিৎসা হইবে। সেজন্য প্রতিদিন সকালে হাকীম সাহেবের নিকট বধূর কারুরা[৩] পাঠাইতে হইবে। চাকর-বাকর ঠিকমত কথা শুনে না, কারুরা নিয়মমত হাকীমের নিকট প্রেরিত না হওয়ায় রোগ বাড়িয়াই চলিয়াছে। অগত্যা খাঁ সাহেব নিজেই প্রতিদিন সকালে আসিয়া কারুরা লইয়া হাকীম সাহেবের নিকট যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে।

হাকিম সাহেব প্রত্যহ স্মিতমুখে ৫্ দর্শনী লইয়া কারুরা দেখিতেন। আর দুলাইনের আরোগ্য বিষয়ে খাঁ সাহেবকে আশ্বাস দিয়া নানাবিধ দুর্মূল্য ফল—যথা, আঙ্গুর, বেদানা, বিহী—বিশেষতঃ যে সকল ফল তখন ভাগলপুরে পাওয়া যাইত না, তাহারই ব্যবস্থা করিতেন। খাঁ সাহেব জগৎ ছানিয়া সেই সব ফল পথ্য আনাইয়া শ্বশুর বাড়ীতে হাজির করিতেন।

এইরূপে প্রায় দুই মাস অতীত হইলে একজন চাকর একটু রুক্ষভাবে খাঁ সাহেবকে বলিল, "কি আপনি রোজ রোজ কারুরা লইতে আসেন? এখানে আর কারুরা নাই, আমাদের সকলেরই কারুরা পরীক্ষা করা হইয়া গিয়াছে। আর দরকার নাই।" তিনি তখন একবার অন্দরে গিয়া দুলাইনকে দেখতে চাহিলে, সে বলিল, তাঁহার দুলাইন বলিয়া কোন পদার্থ এ বাড়ীতে নাই।

এ কথা শুনিয়া খাঁ সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি আত্মসংযম করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে যে গোন্দম রঙের ভোলী ভোলী পেয়ারী সুরত দেখিয়াছি সে কে?" উত্তর হইল, "সে বাজারের অমুক নর্তকী ছিল, সেদিন সে ভাড়ায় আসিয়াছিল—চলিয়া গিয়াছে।"

খাঁ সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জনৈক উকিলের নিকট পরামর্শ লইতে গেলেন যে, এইসব বেঈমান দাগাবাজদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা করা যায় কিনা। উকিল সাহেব সমস্ত শুনিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আপনার লাঞ্ছনা যথেষ্ট হইয়াছে ; এখন আদালতে নালিশ করিয়া আরও খানিকটা লাঞ্ছনা কিনিয়া অর্থ নষ্ট করিতে চাহেন কি? আপনি বরং ভালয় ভালয় দেশে ফিরিয়া যান।"

বৃদ্ধ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "জরা খেয়াল করনে কি বাত—মেরা চার হাজার রুপেয়া বরবাদ হুয়া—কোয়ী হাতভী না আয়ী, আওর মালাউন বদ বখ্‌তোনে মুঝসে নওকরোঁকো কারুকা তক ঢোলায়া! হু—হু—হু!!"

---

৩. কারুরা—মূত্র। আর যে কাচের পাত্রে এ জিনিসটা পরীক্ষার নিমিত্ত রাখা হয়, তাহাকে কারুরা বলে। "ঈগেল্‌স্ ক্রেগ্" নামক পর্বত-শিখর হইতে মধ্যাহ্নে (আকাশ নির্মল থাকিলে) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেরূপ দেখায় তদবলম্বনে রচিত। গিরি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রায় সর্বদা মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে, সুতরাং তাহার দর্শন-লাভ সাধারণ ব্যাপার নহে।

অগ্রন্থিত কবিতা

বাসিফুল

"পিসীমা ! তোমার তরে আনিয়াছি ফুল,"
এত বলি' আসি' ছুটি' হাতে দিল ফুল দু'টি ;
চেয়ে' দেখি, আনিয়াছে দু'টি বাসি ফুল।

"পিসীমা ! তোমারি তরে এনেছি এ-ফুল।"
সকালে কাননে গিয়ে বাসি ফুল কুড়াইয়ে
পিসীমারে দিতে এসে হাসিয়ে আকুল।

"পিসীমা ! তোমার তরে আনিয়াছি ফুল।'
শুনে সে বচন-সুধা দূরে গেল তৃষ্ণা-ক্ষুধা,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য একাকার হয়ে গেল ভুল !

মরি ! সে স্বর্গের শিশু মরতে অতুল।—
তাহারে স্মরিয়া তাই আপনা ভুলিয়া যাই,
কোন্ বিধি গ'ড়েছিল সে ননী পুতুল ?

কি দিয়ে কে গ'ড়েছিল সে প্রেম-মুকুল ?
ইন্দ্রধনু-বর্ণ দিয়ে চন্দ্রিকা-লাবণ্য নিয়ে
পারিজাত-গন্ধ দিয়ে মানিক অতুল ?

ললিত রাগিণী নহে তার সমতুল,—
নহে সুখস্বপ্ন-সম, নহে ধন-রত্ন-সম,—
সে ত নহে বসোরার গোলাপ-মুকুল !

তুলনার উপযুক্ত নহে—সে অতুল !
তার সেই উপহার, কি দিব তুলনা তার ?
কোটি কোহিনূর নহে তার সমতুল।

প্রেমের সে উপহার জগতে অতুল।
কোথা পাব সে আদর ? কোথা সেই স্নেহ-স্বর,
হৃদয়-জুড়ান সেই সোহাগ অমূল ?

স্নেহের শিশির-মাখা সেই বাসি ফুল !
অমিয়া ঢালিয়া বুকে কে আর সহাস্য মুখে
কহিবে,-"পিসিমা ! ধর, আনিয়াছি ফুল !"

"পিসিমা ! তোমারি তরে এনেছি এ-ফুল।"
সেই কথা পুনরায় শুনিতে পরান চায়,—
কোথা সে বালক মোর প্রেমের পারুল ?

ভূতলে চামেলী জুঁই নহে অপ্রতুল,—
আছে কত পুষ্পলতা, শুধু নাই সেই কথা,—
"পিসিমা ! তোমারে দিতে আনিয়াছি ফুল।"

সেই কথা শুনিতে এ পরান ব্যাকুল।
বাজে কি স্বরগ-পুরে গন্ধর্বের বীণা-সুরে
"পিসিমা ! তোমারি তরে এনেছি এ-ফুল ?"

কি দিলে আবার পাব স্নেহের পুতুল ?
কোন্ যজ্ঞ-তপস্যায় বাঁচিয়ে সে পুনরায়
হাসিয়ে আমারে দিবে দু'টি বাসি ফুল !

বিধি সর্ব্বশক্তিমান, নিতান্ত এ ভুল।
নতুবা শকতি তার নাই কেন পুনর্ব্বার
ফিরাইয়া দিতে মোর সে প্রেম-পুতুল ?

বিধি সর্ব্বশক্তিমান, ইহা নহে ভুল ;—
নতুবা আর কে পারে সমাহিত করিবারে
অমন স্বরগ-শিশু, বিশ্বে যে অতুল ?

পাব না প্রাণের ধন, পাব না সে ফুল।
আর শুনিবে না প্রাণ সে ললিত কণ্ঠতান—
প্রেমের পীযূষ-ভরা রাগিণী মঞ্জুল।

শুধু স্মৃতি-কুঞ্জে ফুটে আছে "বাসি ফুল"
সে মুখের স্মৃতি-সুখ ভরিয়ে রেখেছে বুক,
অঙ্কিত সে চিরতরে, হইবে না ভুল।

শশধর

কি ভাবিছ শশধর ! বসি' নীলাসনে ?
কি রেখেছ শশধর ! হৃদয়ে গোপনে ?
লু'কাতে পারোনি তাহা প্রভূত যতনে, আহা !
দেখা যায় কালো ছায়া ও চাঁদ-বদনে !
কি ভাবিছ শশধর ! বসি যোগাসনে ?

পুষিছ হৃদয়ে তুমি প্রেমের অনল?
পুড়িয়ে হয়েছে কালো তাই হৃদিতল!
না বুঝে' অবোধ নরে কত অনুমান করে,
অথবা অমিয়া ভ্রমে ভীষণ গরল
হৃদয়ে পুরিয়া—মুখে হাসিছে কেবল!
নীরবে দগ্ধ হও, নীরবে যাতনা সও,
নীরবে নীহার-রূপে ঝরে আঁখিজল।
পুষিছ হৃদয়ে শশি, প্রেমের অনল।

দু'টি সান্ত্বনার কথা তোমারে যে বলে,
নাই কি এমন কেহ বিশ্ব-ভূমণ্ডলে?
এত তারা আছে, কেহ তোমারে করে না স্নেহ?
তাই তুমি, শশধর! বসিয়া বিরলে,
নিশীথে জুড়াও প্রাণ ভিজি' আঁখিজলে।
এ নিঠুর চরাচর শুনে না কাতর স্বর,—
ঢালে না করুণা-বারি যবে প্রাণ জ্বলে!
দু'টি সান্ত্বনার কথা কেহ নাহি বলে।

কি দেখিছ, শশধর! আমার হৃদয়?
তোমারি কলঙ্ক-সম অন্ধকারময়!
শুধু পাপ, তাপ, ভয়, শোকে পূর্ণ এ-হৃদয়,
এ নহে উজ্জ্বল শুভ্র সরলতাময়।
কি দেখিবে, শশধর, এ পোড়া হৃদয়?

এ নহে কোমল স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সুনির্ম্মল,—
এ হৃদয়ে স্তরে স্তরে তীব্র হলাহল!
নৈরাশ্য বেদনা শত, কালানল-শিখা কত,
কি ক'রে দেখাব, শশি! তোমা সে-সকল?
এ নহে পবিত্র রম্য স্বচ্ছ সুনির্ম্মল!

তোমার কলঙ্ক, শশি! মুছিবে কেমনে?
যাবে না কলঙ্ক তব কোন শুভক্ষণে
ও-কলঙ্ক হৃদি 'পরে র'বে যুগ-যুগান্তরে;
তাই বুঝি ভাব সদা বসি' যোগাসনে—
আঁধার কালিমা-রেখা মুছিবে কেমনে?

প্রভাতের শশী

সুপ্রভাত ! কেন শশি ! বিষণ্ন বদন
কোন সুগভীর ভাবে হয়েছ মগন ?
সারারাত জেগে এবে নিশাশেষ ভাগে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু মরি ! নিষ্প্রভ নয়ন।
মৃদুগতি গেহ পানে চলেছে অবশ প্রাণে,—
যেতেছে,—চলিতে যেন সরে না চরণ।
এমন নিঃস্বার্থ প্রাণে, কি কোথা কাহার প্রাণে
ঢালে সুধা নিশাকালে করি জাগরণ ?
বুঝিলাম এতক্ষণে কলুষিত এ ভুবন
নাই স্বার্থহীন আর তোমার মতন।
পরেতে ঢালিয়া প্রাণ ভুলিয়াছ আত্মজ্ঞান,
কেবলি পরের তরে কাঁদে তব মন।
উথলে প্রেমের সিন্ধু, বিন্দু বিন্দু শত বিন্দু
অশ্রুধারে ভিজায়েছ কঠিন ভুবন ! !

(ওই প্রেম অশ্রুধার হয়ে মুক্তার হার
সাজায়েছে তরুলতা করিয়া যতন !
নৃশংস পরাণী যত, না বুঝে প্রেমের তত্ত্ব
হেন নীহারের পরে ধরে যে চরণ।)
শশাঙ্ক ! হেলায় হাসি, সুবিমল সুধারাশি
অকাতরে ধরণীরে কর বিতরণ,
ইহাতে কি সুখ পাও, কেন অবিরাম দাও ?
প্রতিদানে কভু কিছু কর না গ্রহণ।
প্রণয়ে কলঙ্কী হয়ে প্রেমেরি কলঙ্ক লয়ে
ধরিয়াছ হৃদিপরে কলঙ্ক ভূষণ।
বল কোন্ দূরদেশে, কোন্ দেবতার দেশে
যেতেছ বিশ্বাস হেতু করিতে শয়ন ?

তোমার স্রষ্টার কাছে প্রাণের প্রার্থনা আছে,
বলো তাঁরে শুনে যেন মম নিবেদন।
বারেক পাইলে তাঁরে, ধোয়াইব অশ্রুধারে
তাই সেই সুকোমল কমল চরণ।
তাহারি চরণ তরে এ পাপ হৃদয় 'পরে
অধম কিঙ্করী আমি পেতেছি আসন।
আর ভাই শশধর ! এই আশীর্ব্বাদ কর,
পরদুঃখে পারি যেন করিতে রোদন,
জাগি দীর্ঘ নিশা শশি ! দুঃখীর শিয়রে বসি
ঢালি যেন শান্তি সুধা তোমার মতন।

পরিতৃপ্তি

ধীরে ডুবে যায় রবি কনক বরণ,
ধরণী প্রদোষ ছা'য় ঢাকিল বদন।
রাজার প্রাসাদে আজি অভিনব সেজে সাজি
সমাগত হইয়াছে সভাসদগণ,
পরিষদ চারি ভিতে বসিয়াছে হৃষ্টচিতে
কুতূহলে মহারাজে করিয়া বেষ্টন,—
শারদ পূর্ণিমা রাতে কোটিতারা লয়ে সাথে
নীলিমায় শোভা পায় শশাঙ্ক যেমন।
মনোজ্ঞ এ দৃশ্য মরি, রাজা আসে শোভা করি
রতন খচিত রম্য কনক আসন।
আজি নিশি সুপ্রভাত আসিয়াছে সুসংবাদ
পরাজিত হইয়াছে রাজ-শক্রগণ।
বিজয় গরবে রাজ হরষে কহিল, "আজ
সুখের সাগরে মম ডুবিয়াছে মন।
অরি-জয় করিয়াছি, চিন্তা ভয় ত্যজিয়াছি,—
শোক দুঃখ আদি দূর হয়েছে এখন।
বুঝি কেহ সুখী নাই আমার মতন।"
অদূরে (প্রাসাদ পার্শ্বে) বিটপীর ছায়
বোরহানা দাঁড়ায়ে আছে অনাবৃত কায়।
কিছুমাত্র নাই তার,—পরণে বল্কল সার
মাঠে, তরুতলে শুয়ে রজনী কাটায়
যেখানে যা কিছু পায় ফুল্লচিত্তে তাই খায়,
কদাচ ভাবে না "কাল কি খাইব, হায় !"
রাজা যাহা বলেছিল, তাহা শুনে সে কহিল,
"আমি আছি মহাসুখী বিধির কৃপায়।
দিনেকের তরে পেয়ে সুখ তাহে মত্ত হয়ে
কি বলিলে মহারাজ ?—শুনে হাসি পায় !
চিন্তা ভয় অনুক্ষণ আকুলিত করে মন,—
তাই মম সম সুখী নাই এ ধরায় ?
তুমি সুখী একদিন, আমি তুষ্ট চিরদিন
কখন জানি না দুঃখ তোমাদের ন্যায়।
সদানন্দ এ হৃদয় জানে না ভাবনা, ভয়—
সুখের স্বপনসম দিন ব'য়ে যায়।"
রাজা বলে, "হে ফকির, দেখিয়া বয়ান
তব, ভেবেছিনু দীন তোমার সমান
নাই কেহ এ মহীতে, এবে লজ্জা পাই চিতে

দেখিয়া তোমার তৃপ্তি, তুমি ভাগ্যবান !
তবে এই মুদ্রা ধর, আমারে বাধিত কর
লইয়া আমার এই বস্ত্র মূল্যবান।"
বোরহানা বলিল, "ভাই ! কিছু প্রয়োজন নাই,
দীন আমি কি বা জানি শালের সম্মান ?"
রাজা বলে, "ক্লেশ পাও শীতে, তবু নাহি চাও
গ্রহণ করিতে কেন এই রাজদান।"
ফকির তখন কয়, "শুন রাজা মহাশয়,
শীত গ্রীষ্ম মোর তরে একই সমান।
ধন লয়ে কি করিব ? অযতনে ফেলে দিব,—
নাই যে আমার রাজ্য। রাখিবার স্থান,—
তব শাল, মুদ্রা তাই করি প্রত্যাখ্যান।"
অনেকেই ভাবে তৃপ্তি ধনে মানে হয়,
কিছুতে নাশিতে নারে অতৃপ্তি দুর্জয় !
তৃপ্তি লভিবার তরে এটা সেটা লাভ করে,
ও শুধু মনের ভ্রম আর কিছু নয়।
তৃপ্তি বিধাতার দান, তৃপ্তি দিয়ে যে পরাণ
বিধি তুষিয়াছে—তৃপ্তি সেইখানে রয়।

নলিনী ও কুমুদ

নলিনী।

দুর্বল হৃদয় পারে না বহিতে দারুণ যন্ত্রণা হেন ;
জীবন-সর্বস্ব হারায়েছি যদি, পরান যায় না কেন ?
শরীর-পিঞ্জরে এ প্রাণ-বিহগ থাকিতে চাহে না আর,
এস মৃত্যু। ত্বরা কর বিদূরিত দুঃসহ জীবন-ভার।

কুমুদ।

সখি ! কি অপূর্ব শোভা স্বভাবের, দেখ দেখি, খোল আঁখি !

নলিনী।

দেখেছি অনেক, কি দেখিব আর, এখন মরণ বাকি।

কুমুদ।

কৌমুদী-স্নাত বিশ্ব-চরাচর ! যেন ডুবিয়াছে সব
রজত-সাগরে। এ পূর্ণিমা-শশী, আ মরি। কি অভিনব !
কোথা বা মালঞ্চে মধুর হাসিছে আনন্দে শতেক ফুল ;
সুধাকর প্রেম-সুধা পান হেতু ব্যাকুল চকোর-কুল।

কোথা বা অলক ধীরে আসি' চাহে ঢাকিতে বিধুর মুখ,
অপ্রতিভ শশী কহিবেন, "এ কি !" তাহে মেঘ পাবে সুখ।
আসীন পূর্ণেন্দু তারকা-খচিত নীলাম্বর-সিংহাসনে,
হেরি এ মনোজ্ঞ অপরূপ শোভা কত ভাব হয় মনে !

নলিনী।

দেখ সখি তুমি পরান ভরিয়া বিশ্বের সৌন্দর্যরাশি ;
মম এ নয়ন দৃষ্টিশক্তিহীন, অধর ভুলেছে হাসি।
দগ্ধ হ'য়ে এখন কেবল মরণ-আকাঙ্ক্ষা জাগে,
সুখ-সাধময় জীবন আমার ছিল কতক্ষণ আগে।
যখন অরুণ দিয়েছিল দেখা জীবন-প্রভাতে মম
সে-সময় মনে হয়েছিল ধরা নন্দনকানন-সম।
শ্যামলা ধরণী প'রেছিল দীপ্ত কনক কিরণ-বাস,
শিশির-আপ্লুতা কিশোরী বল্লরী ছড়াত হীরক-ভাস।
পূরব-গগনে বালার্কের বিভা হেরি' নরনারীগণ
নব আশা ল'য়ে হৃদয়ে নবীন উৎসাহে বাঁধিয়া মন
অদৃষ্টের স্রোতে সন্তরিতে পুনঃ অগ্রসর হয় ভবে।
নিরাশ-যামিনী হইলে প্রভাত আশা কেন নাই হবে ?
কলকণ্ঠে পাখী গাহিত হরষে, ফুটিত মুকুল কত ;
ফুল্ল সূর্যমুখী হয়েছিল সুখ-সোহাগের ভারে নত।
ভ্রমর-গুঞ্জনে কত না শুনেছি আশার মোহিনী বাণী,
রচি' কল্পনায় প্রসূন-রাজত্ব তাহাতে ছিলাম রাণী।
অর্ধ-নিমীলিত নয়নে দেখেছি সুখের স্বপন শত,
ভাবিতাম, ধন্য অবনী ভিতরে কে আছে আমার মত ?

কুমুদ।

এই দেখ সখি ! এখন ত আছে তেমনি উৎফুল্ল ধরা ;
তবু কেন তুমি ভাব মন-দুঃখে : প্রকৃতি বিষাদে ভরা ?

নলিনী।

ভাস্করের সনে গেছে অস্তাচলে জীবন-আনন্দ মম,
ছিল যে সরসী সুখের আলয়, এবে কারাগার-সম
দিতেছে যন্ত্রণা ; এ-জগতে আর থাকিতে বাসনা নাই।
জাগিয়া সহিয়া অশেষ যাতনা এখন ঘুমাতে চাই।

কুমুদ।

আহা ! সখি, তুমি পূর্ণিমা-নিশির শোভা দেখে হ'তে সুখী
পারিলে না, তাই এ সুখ-জগতে তুমি অপ্রসন্ন-মুখী।

নলিনী।

প্রফুল্লতা আসে আপনি আননে হৃদি উল্লসিত হ'লে,
ডাকিতে হয় না তা'রে সবিনয়ে ; রবি-তাপে যথা গলে
আপনি তুষার, আয়াস করিয়া গলাতে হয় না তা'রে।
তুমি চাহ বালা, নিরানন্দ জনে ভাসাতে আনন্দ-ধারে ;
অয়ি সুখময়ি ! বুঝিতে পার না নৈরাশ্য কাহারে বলে ;
কেমন সে-জ্বালা যাহাতে আমার মরম অন্তর জ্বলে।

কুমুদ।

তাহলে ভগিনি চাহি না বুঝিতে তোমার প্রাণের জ্বালা ;
ভাবি, শশধরে দিব উপহার কোন্ ফুলে গাঁথি' মালা !

নলিনী।

হায় যম ! আর কতক্ষণ হবে অপেক্ষা করিতে মোরে ?
দেখি, পাই কি না শান্তি-বারিকণা ডুবিলে এ সরোবরে ! !

স্বার্থপরতা

তোমরা যে বল "পরার্থপরতা"
কি অর্থ সে কথাটার ?
পরের লাগিয়া আজ বিসর্জ্জন—
বলিদান আপনার।
"পরার্থপরতা করে কি পরাণ
দারুণ যাতনাময় ?"
"মহান হৃদয় আত্মবিসর্জ্জনে
সুখী হয় অতিশয়।"
তবে কেন বল "আত্মবিসর্জ্জন ?"
বল—"সুখ আপনার !"
সকলে কেবল খোঁজে "আত্মসুখ"—
"স্বার্থহীন" কে আবার ?
স্বার্থপর হেরি বিশ্ব চরাচর
কে আছে "পরার্থপর" ?
এত ছল কেন ? সোজা কথা বল,
"সকলেই স্বার্থপর।"
স্বার্থপরতাই প্রচ্ছন্ন যেখানে
পরার্থ তারেই কয়।"
সত্য কথাই বলি, "পরার্থপরতা"
ও কোন কথাই নয়।

দস্যু অপরের সর্বস্ব লুটিয়া
যথা পুলকিত হবে
দানবীর তথা সর্বস্ব বিলায়ে
পরম আনন্দ লভে।
শুধু বলু, রুচি যেমন যাহার
তাঁর সুখ সেই মত।
কোন রোগী জল দেখি' হয় ভীত
কেহ জলে সুখী কত!
খল সুখী হয় চাতুরী কৌশলে
ফিরে সর্ব্বনাশ তরে,
লোক হিতকর চিন্তায় সুজন
স্বর্গসুখ লাভ করে।
পাষণ্ড নিঠুর দুর্ব্বলে পীড়িয়া
হয় চরিতার্থ, হায়।
দয়াবীর জন মুছা'য়ে পরের
শোকাশ্রু সান্ত্বনা পায়।
গুবরে পোকা যত ভালবাসে শুধু
ঘৃণিত দুর্গন্ধভার।
মধুপ ভ্রমর ভালবাসে ফুল,
ফুলের অমিয় ধারা।
তাই বলি, রুচি যেমন যাহার
সেইরূপ সুখ তার
সবে স্বার্থপর, "পরার্থপরতা"
কথা শুধু ছলনার॥

কাঞ্চনজঙ্ঘা

আহা!
কি শান্তির কোলে নীরবে ঘুমাও রানী।
তুষার অম্বরে ঢাকি মোহন মূরতিখানি।
নাই কি তোমার রাজ্যে জনতার কোলাহল,
গাহে না কি কলকণ্ঠ মুখর বিহগ দল?
নাই কি কুসুম তথা,—অলির ঝঙ্কারনাই?
নির্বিবাদে শিশু হেন নিদ্রিতা রয়েছে তাই।
হিমাদ্রি পর্ব্বত রাজ্যে একচ্ছত্র অধিপতি,
তাঁহার দুহিতা তুমি, গুণে যিনি সরস্বতী।
তোমার কটাক্ষে দেবি! মহা মুখ করি হয়,
বারেক দর্শন পেলে চির মূক কথা কয়।

জাগ্রত প্রহরী সম রাশিকৃত নব ঘন
তব রাজ–অন্তঃপুরে ঘিরে থাকে অনুক্ষণ।
জলদ রক্ষক হাতে লয়ে অস্ত্র অনুকার
রক্ষিতেছে দিবানিশি ও পুরীর সিংহদ্বার
হেরিতে তোমারে তাই কত শত ভক্ত এসে
না পেয়ে দর্শন তব ক্ষুণ্নচিত্তে ফিরে দেশে।
আমিও এসেছি রাণি ! তোমারে দেখিব বলে,
মাসাধিক কাল হতে আছি তব পদতলে।
কি মনে করিয়া বালা। দিলে মোরে দরশন ?
(চাতকীর পক্ষে যেন বিনা মেঘে বরিষণ।)
হেরিয়া তোমায় ওগো ! কি হর্ষে ডুবিল মন
এক মুখে কি প্রকারে করিব তা বরণন।
বিমল অম্বরে এবে একটুকু মেঘ নাই,
যবনিকাখানি যেন উঠিয়া গিয়াছে তাই।
কত ঘুমাইবে দেবি ! চেয়ে দেখ আঁখি খুলে
ঊষা শীর্ষে আরক্তিম অঞ্চল নিতেছে তুলে,
পূরবে বালার্ক হের, (আ মরি কি চমৎকার !)
প্রেরিছে তোমায় রানী ! স্বর্ণকার উপহার।
এখন জাগিলে দেখি, হাসিছ মধুর হাসি,
মাখিতেছ বর অঙ্গে কনক–কিরণ–রাশি।
পরি ঐ হৈম ছটা, কি সাজে সাজিলে বালা !
মুক্তানিভ শুক্লাম্বরে তরল সুবর্ণ ঢালা !
হেরি সে অপূর্ব কান্তি মুগ্ধ হল চরাচর,
বলিহারি, যাই আহা ! কিবা রূপ মনোহর।
শ্যামল ভূধর শিরে কাঞ্চন মুকুট তুমি,
ধন্য হয় বসুমতী ঐ চারুচরণ চুমি।
তোমার স্রষ্টারে আমি করি শত নমস্কার,
তোমা হেন গিরিকাব্য অতুল রচনা যাঁর।
ধন্য সেই মহাশিল্পী, করি তাঁরে পরণাম,
যাহার কৃপায় মম পূর্ণ হল মনস্কাম।

কাঞ্চনজঙ্ঘা

কুজ্ঝটিকা মাত্র নাই গগন–মণ্ডলে ;
এ–সময় কাদম্বিনী কোথা গেছে চলে ?
পেয়ে দিব্য অবসর মেঘমুক্ত দিবাকর
সগর্বে আসীন হয়ে সুনীল অম্বরে

ছড়াইছে হাসি' হাসি' উজ্জ্বল কিরণরাশি,
ভাসাইছে জ্যোতিঃধারে বিশ্ব-চরাচরে।
পেয়ে' সে প্রখর কর হাস্যময় চরাচর
কিরণ-ঝলকে যেন হাসিছে পুলকে
জীবজন্তু, নর, দেব ভূলোকে দ্যুলোকে!
এদিকে একটি দু'টি বনফুল আছে ফুটি',
ওদিকে চায়ের ফুল মাধুরী ছড়ায়।
বহে মৃদু সমীরণ করে স্নিগ্ধ প্রাণ মন,
বসন্তের গন্ধ যেন তাহে পাওয়া যায়!
সাগর-লহরী-প্রায় স্তরে স্তরে শোভা পায়
ভূধর-তরঙ্গমালা ত্রিদিকে বিস্তৃত;
কেবল দক্ষিণ দেশে অতি অপরূপ বেশে
হরিৎ প্রান্তরখানি রয়েছে নিদ্রিত।
পূর্ব্বের পর্ব্বতখানি আপনারে শ্রেষ্ঠ জানি'
গৌরব-গরবে যেন চুম্বিছে গগন!
পশ্চিমের উপত্যকা দাঁড়ায়ে রয়েছে একা
বুকে ল'য়ে গোটা কত সুরম্য ভবন।
ওকি ও অনেক দূরে উত্তর-গিরির চূড়ে
স্তূপাকার মুক্তা হেন ও কি দেখা যায়?
ও বুঝি কাঞ্চনজঙ্ঘা? তাই ত কাঞ্চনজঙ্ঘা।
কি হেতু "কাঞ্চন" নাম কে দিল উহায়?
ও ত স্বর্ণবর্ণ নয়, মুক্তা-নিভ সমুদয়
ধবল তুষার-স্তম্ভ অতি মনোহর!
মরি! কিবা সমুজ্জ্বল রবি-করে ঝলমল
করে! কত মনোরম প্রাণমুগ্ধকর!
শ্যামল ভূধররাজি যেন গো ভূপতি সাজি'
কাঞ্চনে মুকুট-রূপে পরেছে মাথায়!
এমন ভূষণ পেয়ে গিরিরাজ ধন্য হ'য়ে
প্রণমিছে নতশিরে কাঞ্চনের পা'য়!
নির্মল তুষার গ'লে কাঞ্চনের পদতলে
বহিছে নীহার-নদী কত না সুন্দর!
কে যাবে ও-হিমদেশে কে কহিবে দেখে এসে'
সে কেমন রম্যস্থান—সৌন্দর্য-আকর?
না জানি কতই তাহা বিমল শীতল, আহা!
তাই বলি, ও-কাঞ্চন ভূতলে অতুল,
যশস্বী উহারে পেয়ে হ'ল গিরিকুল।

কিন্তু সেই মহাকবি আঁকিয়া এমন ছবি
আপনি অদৃশ্য হয়ে আছেন কোথায়?
পরস্পরে তরুলতা কহিছে তাহারি কথা
যেন বলিতেছে : "বিভু এই ত হেথায় !"
সেদিকে ফিরালে আঁখি বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি
বিভু যেন স'রে যান মরীচিকা-প্রায় !
কিন্তু সে চরণ-রেখা সর্বত্রই যায় দেখা,
কুসুম সৌরভে তাঁর গন্ধ পাওয়া যায়।
(ভাব-চক্ষু আছে যার দেখিতে কি বাকি তার?
সে মুদ্রিত চক্ষে তাঁর দরশন পায়।)
অস্ফুট নীরব স্বরে প্রকৃতি প্রচার করে,—
"শিল্পীর মহিমা শিল্প আপনি জানায় !"

"ঈগেল্‌স্ ক্রগ্" নামক পর্ব্বত-শিখর হইতে (আকাশ নির্ম্মল থাকিলে) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেরূপ দেখায় তদবলম্বনে রচিত। গিরি কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রায় সর্বদা মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে, সুতরাং তাহার দর্শন-লাভ সাধারণ ব্যাপার নহে।

প্রবাসী রবীণ ও তার জন্মভূমি

রবীণ। সীমান্ত প্রদেশ হতে সীমান্তের পথে
যাইতে হইল দেখা স্বদেশের সাথে
ভাবিয়া মায়ের মুখ উথলি উঠিল বুক,—
চলিলাম নত শিরে না দেখিনু চেয়ে
জননী কহিল তবে সম্মুখীন হয়ে :—
(স্বদেশের উক্তি)
"রবীণ নীরব কেন এতদিন ধরি?
গাওরে বিহগ, গান প্রাণ মুগ্ধ করি।

বারেক স্বদেশ পানে চাই অনুরাগে,
বিদায় সঙ্গীত গাও বসন্তের রাগে।"
(রবীণের উত্তর)
জননী ! করুণ স্বরে কেন ডাক আর
"অনুরাগে, নিজপানে চাহ একবার?"
ও কথা আবার প্রাণে, অতীতের স্মৃতি আসে
পরাণ গলিয়া চোখে বহে শত ধার।
কি বলিব পোড়া মুখে, বলি কিন্তু বড় দুঃখে
চাহিতে তোমার পানে পারি না যে আর।

এখন হয়েছ তুমি তস্করের লীলাভূমি
আমাদের বাসযোগ্য নহ তুমি আর।
পাথর পাতকী সব এবে অধিবাসী তব,
হৃদয় বিদরে হেরি দুর্গতি তোমার।
কোথা তব ধর্ম নীতি, কোথায় সে শান্তি প্রীতি?
এবে তুমি জনয়িত্রী মায়া ছলনায়।
কেন মা! করুণ স্বরে ডাকিলে আবার?
বড় জ্বালা মাতঃ বিদেশে এসেছি,
বড় দুঃখে জননী গো। তোমায় ত্যাজেছি।
সেই স্নেহপূর্ণ ভোর, বিজন অরণ্য ঘোর,
তেমন মুখর স্থান কোথা কি দেখেছি?
কি যে সুখ ছিল তায় বলিতে পারি না হায়।
ওই মাতৃকোলে বসে স্বরূপ তুলেছি।
পেয়ে ঐ মাতৃবুক ভুলেছি বেদনা দুখ,
কুটীরে থাকিয়া মাগো! প্রাসাদ ভেবেছি।
জনম ভূমিরে হায়! সহজে কি ছাড়া যায়?
স্বর্গাধিক গরীয়সী তোমারে জেনেছি।
পাষাণে বাঁধিয়া মন, সেই রম্য তপোবন
তোমার স্নেহের কোল, তবু যে ত্যজেছি।
বড় জ্বালা পেয়ে মাগো! বিদেশ এসেছি।
সেই লতা পাতা ঘেরা ছোট নীড়খানি,
চারদিকে বিভীষণ শ্যাম অরণ্যানী,
খল, দস্যু ও তরস্কর শার্দ্দূলাদি নিশাচর,
নানারূপে নিপীড়ন করিত। জননি!
সেই যে নিঠুর রাতে প্রাণটুকু নিয়ে হাতে
অনিদ্রায় জাগিতাম সারাটি রজনী
অবশেষে যে সময় নিতান্ত অসহ্য হয়,
তখন আসিনু ছাড়ি তোর বুকখানি
সেই লতা পাতা ঘেরা স্নেহ নীড়খানি
"রবিণ নীরব কেন এতদিন ধরি?"
কি গান গায়িব মাতঃ! প্রাণ মুগ্ধ করি?
সে কোমল ফুল্ল প্রাণে সংসারের বিষবাণে
শত ছিদ্র হইয়াছে—তাই জ্বলে মরি।
এবে দেখি সমুদয় অনল গরলময়,
সুখের সঙ্গীত তাই গিয়াছি বিস্মরি!
সেদিনের সুধাকরে আজি হলাহল করে,
যে সৌন্দর্য্য দেখিতাম আজি আঁখি ভরি,
সে সৌন্দর্য্য নাই ভবে কি হইল? বুঝি তবে
বিগত শৈশব সব লয়ে গেছে হরি।

এখন পরাণ যেন হয়েছে মরুভূ হেন,
দুখের সঙ্গীত গায় হৃদি দীর্ণ করি।
শুনি সে করুণ গীতি মনে কি পাইবে প্রীতি,
হইবে কি সুখী মাতঃ! আপনা পাসরি?
রবিণ নীরব তাই এতদিন ধরি!
যাও মাতঃ চলি, আর পথ রোধিও না,
নীরবে সরিয়া যাও, কথা কহিও না।
করুণা মমতা রাশি আবার উঠিবে ভাসি
কাজ কি? নিবানো বহ্নি আর জ্বালিও না।
বলিয়ে স্নেহের কথা মরমে দিও না ব্যথা
নিদ্রিত স্মৃতিতে জাগায়ে দিও না।
আমি দীর্ঘশ্বাস আর মুখপানে বার বার
করুণ নয়নে মাগো! পুণ্য চাহিও না।
যাও না! নীরবে চলি পথ রোধিও না।

আমি ও মন

—মন! তুমি কোথায় কোথায়?
দিবানিশি খুঁজে মরি, পাই না তোমায়!
কোন শেফালীর সাথে কোন্ পাপিয়ার ডাকে
আকুল উদাসভাবে উন্মাদের প্রায়।
অন্বেষণ কর যাঁর দেখা কি পেয়েছ তাঁর?
তথাপি ধরিতে তাঁরে প্রাণে সাধ যায়?
অবশ বিভল প্রাণে ছুটে যাও, হায়!
অথবা কি নিরাশার তীব্র বেদনায়—
ইতস্ততঃ বনে বনে কোন সুখ অন্বেষণে
ভ্রমিতেছ অহর্নিশ আকুল হিয়ায়?
আহা! মন! যাঁরে চাও, সে জন কোথায়?

আত্মহারা মন! তুমি কোথায় কোথায়?
ঘুরিয়া বেড়াও তুমি কিসের আশায়?

কোন শ্মশানের ঘাটে, কোন নিরজন মাঠে ;
কোন তটিনীর স্রোতে ভাসায়েছ কায় ?
তাই কি খুঁজিতে গিয়ে পাই না তোমায় ?

যথেষ্ট হয়েছে মন ! যেয়োনাক আর
ভ্রমিতে কল্পনা রাজ্যে ছাড়িয়ে সংসার !
এস, শান্ত হও ভাই, আর ঘুরে কাজ নাই,
জান তুমি চিরবন্দী সংসার-রাজার ?
অলসের বেড়ী পায়, কত দূরে যাবে, হায় !
তব অপেক্ষায় আছে গৃহকারাগার।
ভুলিয়ে আপন পর ত্যজি এ মায়ার ঘর,
যেয়ো না স্বপনরাজ্যে খেলিতে আবার !

(মনের উক্তি)

সোনার পিঞ্জরে ধরে রেখো না আমায়
আমারে উড়িতে দাও দূর নীলিমায় !
খুঁজিব তারার দলে কোন্ গগনের তলে,
আমার সে নিরমাতা রয়েছে কোথায়,
যেজন স্বপন ঘোরে পাগল করেছে মোরে,
এমন উদাসী যেই করেছে আমায় ;
যাহার বাঁশীর স্বরে থাকিতে পারি না ঘরে,
যাহার যশের গান জগত শুনায় ;
সে অনন্ত প্রেমময় কেন চাহে এ হৃদয়
অলক্ষিত আকর্ষণে কোথা লয়ে যায় ?
দেখা দাও জগদীশ ! রয়েছ কোথায় ?
অতল জলধিতলে, বিকচ কুসুমদলে,
অথবা লুকায়ে আছ জলদের ছা'য় ?
বল প্রভু, কোনখানে নীচু কিম্বা উচ্চ স্থানে
গভীর গুহায় কিম্বা হিমাদ্রিচূড়ায়—
জুড়াতে তাপিত প্রাণ থাক কি হে ভগবান
ওয়েসিস—বারিরূপে মরু সাহারায়,

শোকার্ত্তের ক্ষত হৃদি আরোগ্য করিতে বিধি,
শীতল প্রলেপরূপে বিরাজ তথায়?
দেখা দাও প্রেমময়! রয়েছ কোথায়?
কোথা আছ প্রেম-সিন্ধু জগত-ঈশ্বর?
আমি যদি হইতাম চারু সুধাকর,
শূন্য পথে ঘুরিতাম নীলাকাশে ভাসিতাম,
আমার আলোকে ধরা হ'ত মনোহর।
তুমি থাক কোন্‌খানে পিপাসা-ব্যাকুল প্রাণে
তোমারে খুঁজিতে গিয়ে হতেম অমর।
জলদ পবন ভরে উড়িয়ে গগন পরে
আসিয়া পড়িত কভু আমার উপর।
ধূসর মেঘের তলে লুকাতাম কুতূহলে
বিস্ময়ে দেখিতে চেয়ে তারকা নিকর!
দেখা দাও প্রেমসিন্ধু জগৎ ঈশ্বর!

অথবা হতেম যদি আকাশের তারা—
তোমারি বিধান মতে ভ্রমিয়া অনন্ত পথে,
নীলাকাশে ছড়াতেম কনকের ধারা!!
ঘুরিতে ফিরিতে কভু আপনা ভুলিয়া প্রভু
ছুটিতাম তব পানে হয়ে আত্মহারা!
হায়! কেন হই নাই আমি ক্ষুদ্রতারা!

অথবা হতেম যদি মলয় সমীর—
তাপিতেরে জুড়াইয়া সৌরভের ভার নিয়া
ছুটিতাম তব আশে হইয়া অধীর!
তোমারে খুঁজিতে গিয়ে স্বর্গের অমিয়া পিয়ে,
অমর হতেম আমি সায়াহ্নে সমীর!
আমি কেন হই নাই মলয় সমীর?

আমি যদি হইতাম বসন্ত কোকিল—
ললিত করুণ স্বরে সদা ডাকিতাম তোরে,
আমার গানের তান বহিত অনিল!

প্রীতি ভক্তি মাখা প্রাণে তব স্নেহ গুণগানে
রত থাকিতাম ভুলে সংসার জটিল।
সাহায্য করিলে বায় উড়িতাম নীলিমায়
দেখিতে বিস্তৃত কত গগন সুনীল !

অথবা হতেম যদি যুথিকা-মুকুল—
স্নিগ্ধ সাঁঝে ফুটিতাম, তোমারেই ভাবিতাম,
দেখিতে তোমায় বিভু, হতেম আকুল !
তৃষিত বিহ্বল প্রাণে চাহিয়া তোমার পানে,
জাগিয়া সারাটি নিশি আমি ক্ষুদ্র ফুল,
প্রাণে মরিতাম পেতে তব পদধূল !

দেখা দাও দীনবন্ধু ! থাক হে কোথায় ?
তুমি প্রভু থাক যথা সকলি অমর তথা,
বিকচ প্রসূনমালা তথা না শুকায়।
চির বসন্তের দেশে থাক কি মোহন বেশে !
অমিয়া সরসী বক্ষে শতদল প্রায় ?

প্রাণ মনমুগ্ধকর কোকিলের কুহুস্বর,—
সঙ্গীত-দেবতারূপে বিরাজ কি তায় ?
ললিত লতিকাসনে খেলা করি ফুল্ল মনে,
যাও কি মিশিয়া ধীরে মৃদু মলয়ায় ?
সুখের স্বপন হয়ে সুধা বর্ষ এ হৃদয়ে
দেখাও স্বরগধাম রচি কল্পনায় ?
সুস্নিগ্ধ জলদপ্রায় ঢাল বারি এ ধরায়
ভাস কি তটিনী-স্রোতে লহরীমালায় ?
করি প্রীতি বরিষণ জুড়াও তাপিত জন,
চাহিলে তোমার পানে শান্তির আশায় ?
আশার তপন বেশে দেখা দাও পূর্ব্বদেশে
আঁধার বিনাশ কর সোনালি ছটায় ?
অস্ত গেলে দিনমণি যবে থাকে এ ধরণী
আঁধারে ডুবিয়া ঘোর নিরাশ-নিশায়,

সে সময় চাঁদ সাজে দেখা দাও নভো মাঝে,
ভূলোক প্লাবিত কর শুভ্র চন্দ্রিকায়?

একাই সহস্র কোটী নিজে তুমি, হায়!
না বুঝিয়া খুঁজি তোমা যথায় তথায়!
নানা ভাবে নানা জন পূজিতেছে ও চরণ,—
যে নামে যাহার রুচি ডাকিছে তোমায়!
দেখি গুণ নানা মত নাম দেয় শত শত—
কোটী শত কোটী রূপ ভাবে কল্পনায়!
তুমি ত রয়েছ মনে, বৃথা খুঁজি বনে বনে,
বুঝিলাম—প্রেমময়! লুকাবে কোথায়?
হৃদয়ের ধন তুমি রয়েছে হিয়ায়!

সওগাত

জাগো বঙ্গবাসী!
দেখ, কে দুয়ারে
অতি ধীরে ধীরে করে করাঘাত।
ঐ শুন শুন!
কেবা তোমাদের
সুমধুর স্বরে বলে : "সুপ্রভাত!"

অলস রজনী
এবে পোহাইল,
আশার আলোকে হাসে দিননাথ।

শিশির-সিক্ত
কুসুম তুলিয়ে
ডালা ভরে নিয়ে এসেছে "সওগাত"।

আপীল

কারো আছে জমিদারী,
কেহ বা উপাধিধারী,—
বাঙ্গালা বিহারে মোরা যত কিছু ধারী,—
সকলে মিলিয়া এই আবেদন করি।—

প্রাণে মরি সেও ভাল,
শতবার মৃত্যু ভাল,
লাঙ্গুল-বিরহ কিন্তু সহিতে না পারি !
বোম্বাই নগরে ধাম,
"ভারত সময়" নাম—
শ্বেতাঙ্গ পত্রিকা এক রাগিয়াছে ভারী,
মহাক্রোধে করেছে সে এ হুকুম জারি,—
"যত মূক ভদ্র* পাও,
লাঙ্গুল কাটিয়া দাও।
তা হ'লে হইবে দণ্ড উচিত সবারি !"

"বোবার অরাতি নাই"—
এই সত্য জানি তাই
নীরব ছিলাম মোরা ল্যাজ-প্রাপ্তগণ।
একি শুনি অকস্মাৎ,
বিনা মেঘে বজ্রপাত—
মৌন দোষে হবে না কি লাঙ্গুল কর্তন !
এস তবে সহচর,
সপ্তমে তুলিয়া স্বর
উচ্চকণ্ঠে করি আজি সবারে জ্ঞাপন,
আমরা করিনি কভু আইন লঙ্ঘন।
কোথা কোন্ দুরাচার
"সিডিসন" পরচার
করে, তার শিরে হোক এই অশনি পতন।
কোথা কে বিদ্রোহী জন,
কর এবে সম্বরণ
লেখনী, রসনা আর স্বরাজ-স্বপন ;
করিও না অপব্যয় অমূল্য জীবন।

স্বাক্ষর—
যত ভূমি-অধিকারী।
যে ক'টি লাঙ্গুল-ধারী।
যার আছে সজমিদারী।
যত সভ্য অনাহারী।

---

* Moderates, who are keeping silence ought to be deprived of their titles.

নিরুপম বীর

বিচারক বলে, "কানাই তোমার
গলায় পড়িবে ফাঁসি !"
শুনি' শ্যামলাল বেপরোয়া ভাবে
হাসিল ঘৃণার হাসি।
রাখিতে পরের পরান যে জন
দেয় নিজে বলিদান,
সে কি বিচলিত ফাঁসির আদেশে?
মৃত্যু তুচ্ছজ্ঞান।

এ মর-জগতে কানাইয়ের তুল
কে আছে কোথায় আর?
শ্যামের গরিমা অতুল অতুল
তুলনা নাই যে তার !
মরিয়া কানাই হইবে অমর
সাধ্য কি বধে তারে?
মৃন্ময় দেহ এক শুধু শ্যাম
ছিল বাঁধা সংসারে ;
ত্যজি' সে পিঁজর চলিল কানাই,
এবে শত কোটি শ্যাম
ভারত-গগনে দেখা দিবে পুনঃ।
(ধন্য তোমার নাম !)

শ্যাম-ঋণ-পাশে রয়েছে যে বাঁধা
সকল বঙ্গবাসী,
অনেকে তাদের করিল প্রণতি
শ্যামে কারাগারে আসি'।
জগতে শ্যামের বিপুল আদর
হ'ল না বর্তমানে,—
যদিও ভকতি নীরব প্রবাহ
বহে বাঙ্গালী প্রাণে।
যত কৃতঘ্ন হোক সংসার
তবু এ কানাই-স্মৃতি
ভারত-হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে
জাগরূক র'বে নিতি !
বীর সন্তান জাগিয়া প্রভাতে
স্মরিবে কানাই নাম ;
প্রাতঃস্মরণীয় কানাই মোদের,
বল বল "বন্দে শ্যাম।"

SULTANA'S DREAM

BY

MRS. R. S. HOSSEIN

Calcutta

S. K. LAHIRI & CO.

54, COLLEGE STREET

1908

Price Four Annas.

SULTANA'S DREAM

One evening I was lounging in an easy chair in my bed-room and thinking lazily of the condition of Indian womanhood. I am not sure whether I dozed off or not. But, as far as I remember, I was wide awake. I saw the moonlit sky sparkling with thousands of diamond-like stars, very distinctly.

All on a sudden a lady stood before me ; how she came in, I do not know. I took her for my friend, Sister Sara.

"Good morning," said Sister Sara. I smiled inwardly as I knew it was not morning, but starry night. However, I replied to her, saying, "How do you do?"

"I am all right, thank you. Will you please come out and have a look at our garden?"

I looked again at the moon through the open window, and thought there was no harm in going out at that time. The men-servants outside were fast asleep just then, and I could have a pleasant walk with Sister Sara.

I used to have my walks with sister Sara, when we were at Darjeeling. Many a time did we walk hand in hand and talk light-heartedly in the Botanical gardens there. I fancied, Sister Sara had probably come to take me to some such garden, and I readily accepted her offer and went out with her.

When walking I found to my surprise that it was a fine morning. The town was fully awake and the streets alive with bustling crowds. I was feeling very shy, thinking I was walking in the street in broad daylight, but there was not a single man visible.

Some of the passers-by made jokes at me. Though I could not understand their language, yet I felt sure they were joking. I asked my friend, "What do they say?"

"The woman say that you look very mannish."

"Mannish?" said I, "What do they mean by that?"

"They mean that you are shy and timid like men."

"Shy and timid like men?" It was really a joke. I became very nervous, when I found that my companion was not Sister Sara, but a stranger. Oh, what a fool had I been to mistake this lady for my dear old friends, Sister Sara.

She felt my fingers tremble in her hand, as we were walking hand in hand.

"What is the matter, dear, dear?" She said affectionately.

"I feel somewhat awkward", I said in a rather apologising tone, "as being a purdahnishin woman I am not accustomed to walking about unveiled."

"You need not be afraid of coming across a man here. This is Ladyland, free from sin and harm. Virtue herself reigns here."

By and by I was enjoying the scenery. Really it was very grand. I mistook a patch of green grass for a velvet cushion. Feeling as if I were

walking on a soft carpet, I looked down and found the path covered with moss and flowers.

"How nice it is", said I.

"Do you like it?" asked sister Sara. (I continued calling her "Sister Sara," and she kept calling me by my name.)

"Yes, very much ; but I do not like to tread on the tender and sweet flowers."

"Never mind, dear Sultana; Your treading will not harm them ; they are street flowers."

"The whole place looks like a garden," said I admiringly. "You have arranged every plant so skilfully."

"Your Calcutta could become a nicer garden than this, if only your countrymen wanted to make it so."

"They would think it useless to give so much attention to horticulture, while they have so many other things to do."

"They could not find a better excuse"; said she with smile.

I became very curious to know where the men were. I met more than a hundred women while walking there, but not a single man.

"Where are the men?" I asked her.

"In their proper places, where they ought to be."

"Pray let me Know what you mean by their proper places."

"O, I see my mistake, you cannot know our customs, as you were never here before. We shut our men indoors."

"Just as we are kept in the zenana?"

"Exactly so."

"How funny," I burst into a laugh. Sister Sara laughed too.

"But dear Sultana, how unfair it is to shut in the harmless women and let loose the men."

"Why? It is not safe for us to come out of the zenana, as we are naturally weak."

"Yes, it is not safe so long as there are men about the streets, nor is it so when a wild animal enters a marketplace."

"Of course not."

"Suppose, some lunatics escape from the asylum and begin to do all sorts of mischief to men, horses and other creatures, in that case what will your countrymen do?"

"They will try to capture them and put them back into their asylum."

"Thank you! And you do not think it wise to keep sane people inside an asylum and let loose the insane?"

"Of course not!" said I laughing lightly.

"As a matter of fact, in your country this very thing is done! Men, who do or at least are capable of doing no end of mischief, are let loose and the innocent women shut up in the zenana! How can you trust those untrained men out of doors?"

"We have no hand or voice in the management of our social affairs. In India man is lord and master. He has taken to himself all powers and privileges and shut up the women in the zenana."

"Why do you allow yourselves to be shut up?"

"Because it cannot be helped as they are stronger than women."

"A lion is stronger than a man, but it does not enable him to dominate the human race. You have neglected the duty you owe to yourselves and you have lost your natural rights by shutting your eyes to your own interests."

"But my dear sister Sara, if we do everything by ourselves, what will the men do then?"

"They should not do anything, excuse me; they are fit for nothing. Only catch them and put them into the zenana."

"But would it be very easy to catch and put them inside the four walls?" said I, "And even if this were done, would all their business, political and commercial—also go with them into the zenana!"

Sister Sara made no reply. She only smiled sweetly. Perhaps she thought it useless to argue with one who was no better than a frog in a well.

By this time we reached sister Sara's house. It was situated in a beautiful heart-shaped garden. It was a bungalow with a corrugated iron roof. It was cooler and nicer than any of our rich buildings. I cannot describe how neat and how nicely furnished and how tastefully decorated it was.

We sat side by side. She brought out of the parlour a piece of embroidery work and began putting on a fresh design.

"Do you know knitting and needle work?"

"Yes, we have nothing else to do in our zenana."

"But we do not trust our zenana members with embroidery!" she said laughing, "as a man has not patience enough to pass thread through a needlehole even!"

"Have you done all this work yourself?" I asked her pointing to the various pieces of embroidered teapoy cloths.

"Yes."

"How can you find time to do all these? You have to do the office work as well? Have you not?"

"Yes. I do not stick to the laboratory all day long. I finish my work in two hours."

"In two hours! How do you manage? In our land the officers, magistrates—for instance, work seven hours daily."

"I have seen some of them doing their work. Do you think they work all the seven hours?"

"Certainly they do!"

"No, dear Sultana, they do not. They dawdle away their time in smoking. Some smoke two or three choroots during the office time. They talk much about their work, but do little. Suppose one choroot takes half an hour to burn off, and a man smokes twelve choroots daily ; then you see, he wastes six hours every day in sheer smoking."

We talked on various subjects ; and I learned that they were not subject to any kind of epidemic disease,—nor did they suffer from mosquito-bites as we do. I was very much astonished to hear that in Lady-land no one died in youth except by rare accident.

"Will you care to see our kitchen?" She asked me.

"With pleasure, " said I, and we went to see it. Of course the men had been asked to clear off when I was going there. The kitchen was situated in a beautiful vegetable garden. Every creeper, every tomato plant was itself an ornament. I found no smoke, nor any chimney either in the kitchen,—it was clean and bright ; the windows were decorated with flower garlands. There was no sign of coal or fire.

"How do you cook?" I asked.

"with solar heat", She said, at the same time showing me the pipe, through which passed the concentrated sunlight and heat. And she cooked something then and there to show me the process.

"How did you manage to gather and store up the sun heat?" I asked her in amazement.

"Let me tell you a little of our past history then. Thirty years ago, when our present Queen was thirteen years old, she inherited the throne. She was Queen in name only, the Prime-Minister really ruling the country."

"Our good Queen liked science very much. She circulated an order that all the women in her country should be educated. Accordingly a number of girls' schools were founded and supported by the Government. Education was spread far and wide among women. And early marriage also was stopped. No woman was to be allowed to marry before she was twenty-one. I must tell you that, before this change we had been kept in strict-purdah."

"How the tables are turned," I interposed with a laugh.

"But the seclusion is the same," she said. "In a few years we had separate Universities, where no men were admitted."

"In the capital, where our Queen lives, there are two Universities. One of these invented a wonderful baloon, to which they attached a number of pipes. By means of this captive baloon which they managed to keep afloat

above the cloud-land, they could draw as much water from the atmosphere as they pleased. As the water was incessantly being drawn by the University people no cloud gathered and the ingenious Lady Principal stopped rain and storms thereby."

"Really! Now I understand why there is no mud here!" said I. But I could not understand how it was possible to accumulate water in the pipes. She explained to me how it was done ; but I was unable to understand her, as my scientific knowledge was very limited, However, she went on,— "When the other University came to know of this, they became exceedingly jealous and tried to do something more extraordinary still. They invented an instrument by which they could collect as much sun-heat as they wanted. And they kept the heat stored up to be distributed among other as required.

"While the women were engaged in scientific researches, the men of this country were busy increasing their military power. When they came to know that the female Universities were able to draw water from the atmosphere and collect heat from the sun, they only laughed at the members of the Universities and called the whole thing 'a sentimental nightmare'!"

"Your achievements are very wonderful indeed! But tell me, how you managed to put the men of your country into the zenana. Did you entrap them first?"

"No".

"It is not likely that they would surrender their free and open air life of their own accord and confine themselves within the four walls of the zenana! They must have been overpowered."

"Yes, they have been!"

"By whom? By some lady-warriors, I suppose?"

"No, not by arms."

"Yes, it cannot be so. Men's arms are stronger than women's."

"Then?"

"By brain."

"Even their brains are bigger and heavier then women's. Are they not?"

"Yes, but what of that? An elephant also has got a bigger and heavier brain than a man has. Yet man can enchain elephants and employ them, according to their own wishes."

"Well said, but tell me please, how it all actually happened. I am dying to know it!"

"Women's brains are somewhat quicker than men's. Ten years ago, when the military officers called our scientific discoveries 'a sentimental nightmare', some of the young ladies wanted to say something in reply to those remarks. But both the Lady-Principals restrained them and said, they should reply, not by word, but by deed, if ever they got the opportunity. And they had not long to wait for that opportunity."

"How marvellous!" I heartily clapped my hands.

"And now the proud gentlemen are dreaming sentimental dreams themselves.

"Soon afterwards certain persons came from a neighbouring country and took shelter in ours. They were in trouble having committed some political offence. The king who cared more for power that for good government asked our king-hearted Queen to hand them over to his officers. She refused, as it was against her principle to turn out refugees. For this refusal the king declared war against our country.

"Our military officers sprang to their feet at once and marched out to meet the enemy.

"The enemy however, was too strong for them. Our soldiers fought bravely, no doubt. But in spite of all their bravery the foreign army advanced step by step to invade our country.

"Nearly all the men had gone out to fight ; even a boy of sixteen was not left home. Most of our warriors were killed, the rest driven back and the enemy came within twenty-five miles of the capital.

"A meeting of a number of wise ladies was held at the Queen's palace to advise and to what should be done to save the land.

"Some proposed to fight like soldiers ; others objected and said that women were not trained to fight with swords and guns ; nor were they accustomed to fighting with any weapons. A third party regretfully remarked that they were hopelessly week of body.

"If you cannot save your country for lack of physical strength, said the Queen, try to do so by brain power.

"There was a dead silence for a few minutes. Her Royal Highness said again, 'I must commit suicide if the land and my honour are lost."

"Then the Lady Principal of the second University, (who had collected sun-heat), who had been silently thinking during the consultation, remarked that they were all but lost ; and there was little hope left for them. There was however, one plan which she would like to try, and this would be her first and last efforts ; if she failed in this, there would be nothing left but to commit suicide. All present solemnly vowed that they would never allow themselves to be enslaved, on matter what happened."

"The Queen thanked them heartily, and asked the Lady Principal to try her plan."

"The Lady Principal rose again and said, 'before we go out the men must enter the zenanas. I make this prayer for the sake of purdah.' 'Yes, of course,' replied her Royal Highness.

"On the following day the Queen called upon all men to retire into zenanas for the sake of honour and liberty.

"Wounded and tired as they were, they took that order rather for a boon! They bowed low and entered the zenanas without uttering a single word of protests. They were sure that there was no hope for this country at all.

"Then the Lady Principal with her two thousand students marched to the battle–field, and arriving there directed all the rays of the concentrated sunlight and heat towards the enemy.

"The heat and light were too much for them to bear. They all ran away panic–stricken, not knowing in their bewilderment how to counteract that scorching heat. When they fled away leaving their guns and other ammunitions of war, they were burnt down by means of the same sun-heat.

"Since then no one has tried to invade our country any more."

"And since then your country-men never tried to come out of the zenana?"

"Yes, they wanted to be free. Some of the Police Commissioners and District Magistrates sent word to the Queen to the effect that the Military Officers certainly deserved to be imprisoned for their failure ; but they never neglected their duty and therefore they should not be punished and they prayed to be restored to their respective office.

"Her Royal Highness sent them a circular letter intimating to them that if their services should ever be needed they would be sent for, and that in the meanwhile they should remain where they were.

"Now that they are accustomed to the purdah system and have ceased to grumble at their seclusion, we call the system 'Murdana' instead of 'zenana'."

"But how do you manage" I asked Sister Sara, "to do without the Police or Magistrates in case of theft or murder?"

"Since the 'Murdana' system has been established, there has been no more crime or sin ; therefore we do not require a Police-man to find out a culprit, nor do we want a Magistrate to try a criminal case."

"That is very good, indeed. I suppose if there were any dishonest person, you could very easily chastise her. As you gained a decisive victory without shedding a single drop of blood, you could drive off crime and criminals too without much difficulty!"

"Now, dear Sultana, will you sit here or come to my parlour?" she asked me.

"Your kitchen is not inferior to a queen's boudoir!" I replied with a pleasant smile, "but we must leave it now ; for the gentlemen may be cursing me for keeping them away from their duties in the kitchen so long." We both laughed heartily.

"How my friends at home will be amused and amazed, when I go back and tell them that in the far-off Lady-land, ladies rule over the country and control all social matters, while gentlemen are kept in the Murdanas to mind

babies, to cook and to do all sorts of domestic work ; and that cooking is so easy a thing that it is simply a pleasure to cook!"

"Yes, tell them about all that you see here."

"Please let me know, how you carry on land cultivation and how you plough the land and do other hard manual work."

"Our fields are tilled by means of electricity, which supplies motive power for other hard work as well and we employ it for our aerial conveyances too. We have no rail road nor any paved streets here."

"Therefore neither streets nor railway accidents occur here," said I. "Do not you ever suffer from want of rainwater?" I asked.

"Never since the 'water balloon' has been set up. You see the big balloon and pipes attached thereto. By their aid we can draw as much rain water as we require. Nor do we ever suffer from flood or thunderstorms. We are all very busy making nature yield as much as she can. We do not find time to quarrel with one another as we never sit idle. Our noble Queen is exceedingly fond of Botany ; it is her ambition to convert whole country into one grand garden."

"The idea is excellent. What is your chief food?"

"Fruits."

"How do you keep your country cool in hot weather? We regard the rainfall in summer as a blessing from heaven."

"When the heat becomes unbearable, we sprinkle the ground with plentiful showers drawn from the artificial fountains. And in cold weather we keep our room warm with sun-heat."

She showed me her bathroom, the roof of which was removable. She could enjoy a shower bath whenever she liked, by simply removing the roof (which was like the lid of a box) and turning on the tap of the shower pipe.

"You are a lucky people!" ejaculated I. "You know no want. What is your religion, may I ask?"

"Our religion is based on Love and Truth. It is our religious duty to love one another and to be absolutely truthful. If any person lies, she or he is————."

"Punished with death?"

"No ; not with death. We do not take pleasure in killing a creature of God, — specially a human being. The liar is asked to leave this land for good and never to come to it again."

"Is an offender never forgiven?"

"Yes, if that person repents sincerely."

"Are you not allowed to see any man, except your own relations?"

"Our circle of sacred relations is very limited to, even first cousins are not sacred."

"But ours is very large ; a distant cousin is as sacred as a brother."

"That is very good. I see purity itself reigns over your land. I should like to see the good Queen, who is so sagacious and farsighted and who has made all these rules."

"All right." said Sister Sara.

Then she screwed a couple of seats on to a square piece of plank. To this plank she attached two smooth and well-polished balls. When I asked her what the balls were for, she said, they were hydrogen balls and they were used to overcome the force of gravity. The balls were of different capacities to be used according to the different weights desired to be overcome. She then fastened to the air-car two wing-like blades, which, she said, were worked by electricity. After we were comfortably seated she touched a knob and the blades began to whirl, moving faster and faster every moment. At first we were raised to the fight of about six or seven feet then off we flew. And before I could realize that we had commenced moving we reached the Garden of the Queen.

My friend lowered the air-car by reversing the action of the machine, and when the car touched the ground the machine was stopped and we got out.

I had seen from the air-car the Queen walking on a garden path with her little daughter (who was four years old) and her maids of honour.

"Hallo! you here!" cried the Queen addressing Sister Sara. I was introduced to Her Royal Highness and was received by her cordially without any ceremony.

I was very much delighted to make her acquaintance. In course of the conversation I had with her, the Queen told me that she had no objection to permitting her, subjects to trade with other countries. "But," she continued, "no trade was possible with countries where the women were kept in the zenanas and so unable to come and trade with us. Men, we find, are rather of lower morals and so we do not like dealing with them. We do not covet other people's land, we do not fight for piece of diamond though it may be a thousand-fold brighter that the Koh-i-Noor, nor do we grudge a ruler his Peacock Throne. We dive deep into the ocean of knowledge and try to find out the precious gems, which Nature has kept in store for us. We enjoy nature's gifts as much as we can."

After taking leave of the Queen, I visited the famous Universities, and was shown over some of their manufactories, laboratories and observatories.

After visiting the above place of interest we got again into the air-car, but as soon as it began moving I somehow slipped down and the fall startled me out of my dream. And on opening my eyes I found myself in my own bed-room still lounging in the easy-chair!!

babies, to cook and to do all sorts of domestic work ; and that cooking is so easy a thing that it is simply a pleasure to cook!"

"Yes, tell them about all that you see here."

"Please let me know, how you carry on land cultivation and how you plough the land and do other hard manual work."

"Our fields are tilled by means of electricity, which supplies motive power for other hard work as well and we employ it for our aerial conveyances too. We have no rail road nor any paved streets here."

"Therefore neither streets nor railway accidents occur here," said I. "Do not you ever suffer from want of rainwater?" I asked.

"Never since the 'water balloon' has been set up. You see the big balloon and pipes attached thereto. By their aid we can draw as much rain water as we require. Nor do we ever suffer from flood or thunderstorms. We are all very busy making nature yield as much as she can. We do not find time to quarrel with one another as we never sit idle. Our noble Queen is exceedingly fond of Botany ; it is her ambition to convert whole country into one grand garden."

"The idea is excellent. What is your chief food?"

"Fruits."

"How do you keep your country cool in hot weather? We regard the rainfall in summer as a blessing from heaven."

"When the heat becomes unbearable, we sprinkle the ground with plentiful showers drawn from the artificial fountains. And in cold weather we keep our room warm with sun-heat."

She showed me her bathroom, the roof of which was removable. She could enjoy a shower bath whenever she liked, by simply removing the roof (which was like the lid of a box) and turning on the tap of the shower pipe.

"You are a lucky people!" ejaculated I. "You know no want. What is your religion, may I ask?"

"Our religion is based on Love and Truth. It is our religious duty to love one another and to be absolutely truthful. If any person lies, she or he is————."

"Punished with death?"

"No ; not with death. We do not take pleasure in killing a creature of God, — specially a human being. The liar is asked to leave this land for good and never to come to it again."

"Is an offender never forgiven?"

"Yes, if that person repents sincerely."

"Are you not allowed to see any man, except your own relations?"

"Our circle of sacred relations is very limited to, even first cousins are not sacred."

"But ours is very large ; a distant cousin is as sacred as a brother."

"That is very good. I see purity itself reigns over your land. I should like to see the good Queen, who is so sagacious and farsighted and who has made all these rules."

"All right." said Sister Sara.

Then she screwed a couple of seats on to a square piece of plank. To this plank she attached two smooth and well-polished balls. When I asked her what the balls were for, she said, they were hydrogen balls and they were used to overcome the force of gravity. The balls were of different capacities to be used according to the different weights desired to be overcome. She then fastened to the air-car two wing-like blades, which, she said, were worked by electricity. After we were comfortably seated she touched a knob and the blades began to whirl, moving faster and faster every moment. At first we were raised to the fight of about six or seven feet then off we flew. And before I could realize that we had commenced moving we reached the Garden of the Queen.

My friend lowered the air-car by reversing the action of the machine, and when the car touched the ground the machine was stopped and we got out.

I had seen from the air-car the Queen walking on a garden path with her little daughter (who was four years old) and her maids of honour.

"Hallo! you here!" cried the Queen addressing Sister Sara. I was introduced to Her Royal Highness and was received by her cordially without any ceremony.

I was very much delighted to make her acquaintance. In course of the conversation I had with her, the Queen told me that she had no objection to permitting her, subjects to trade with other countries. "But," she continued, "no trade was possible with countries where the women were kept in the zenanas and so unable to come and trade with us. Men, we find, are rather of lower morals and so we do not like dealing with them. We do not covet other people's land, we do not fight for piece of diamond though it may be a thousand-fold brighter that the Koh-i-Noor, nor do we grudge a ruler his Peacock Throne. We dive deep into the ocean of knowledge and try to find out the precious gems, which Nature has kept in store for us. We enjoy nature's gifts as much as we can."

After taking leave of the Queen, I visited the famous Universities, and was shown over some of their manufactories, laboratories and observatories.

After visiting the above place of interest we got again into the air-car, but as soon as it began moving I somehow slipped down and the fall startled me out of my dream. And on opening my eyes I found myself in my own bed-room still lounging in the easy-chair!!

প্রবন্ধ

GOD GIVES, MAN ROBS

There is a saying, "Man proposes, God disposes," but my bitter experience shows that God gives, Man Robs. That is, Allah has made no distinction in the general life of male and female – both are equally bound to seek food, drink, sleep, etc. necessary for animal life. Islam also teaches that male and female are equally bound to say their daily prayers five times, and so on.

Our great Prophet has said "Talibul Ilm farizatu ala kulli Muslimeen-o-Muslimat", (i. e. it is the bounden duty of all Muslim males and females to acquire knowledge). But our brothers will not give us our proper share in education. About sixty years ago, they were opposed to the study of English even for males ; now they are reaping the harvest to their bitter experience. In India almost all the doors to wealth, health, and wisdom are shut against Muslims on the plea of inefficiency. Some papers conducted by Muslims may or may not admit this–but fact is fact–the *Inefficiency* exists and stares us in the face! Let me also venture to say that it is so ; for children born of well-educated mothers must necessarily be superior to Muslim children, who are born of illiterate and foolish mothers. The late Lady Shamsul Huda by way of conversation often used to say that the Muslim public abused her husband because he had given certain high posts to Hindus ignoring Muslim claims, but they failed to see their own fault that such and such Muslim gentlemen were really unfit for the posts.

It is an irony of fate that the Hindus, who are bound by their cartload of *Shastras* to treat women like slaves and cattle and to get their daughters married before they are hardly above their girlhood, i. e., within ten years of age, are, as a matter of fact, allowing the greatest liberty to their womenfolk and giving them high education. They are trying to get laws passed against child-marriage raising the age to sixteen years though their Pandits are loud in proclaiming the attempt as "unworthy of a Hindu" ; and they are devising means to popularize widow-marriage, heedless of their Pandits, who quote *Shastras* saying "not only should a woman refrain from marrying a second time but she should reduce her body by living only on fruits, roots, flowers, etc. after her husband's death."

On the other hand, while Islam allows every freedom to women (so much so that a woman cannot be given in marriage without her consent of free will, which indirectly prohibits child-marriage) we see people giving away their daughters in marriage at tender ages or giving them in marriage without their consent. Many a time a bride bitterly bewails her fate on being compelled to marry a bridegroom whom she knows to be a drunkard or an old man of sixty, but the marriage celebration proceeds despite her silent protest. And so-called respectable families in our society take pride in preventing widow-marriage, no matter whether the widow be a girl of thirteen or a child of seven years of age!

The worst crime which our brothers commit against us is to deprive us of education. There is always some grandfather or elderly uncle who stands in the way of any poor girl who might wish to be educated. From experience we find that mothers are generally willing to educate their girls, but they are quite helpless when their husbands and other male relations will not hear of girls attending school. May we challenge such grandfathers, fathers or uncles to show the authority on which they prevent their girls from acquiring education? Can they quote from the holy Quran or Hadis any injunction prohibiting women from obtaining knowledge?

We know there are Mussalmans of advanced ideas who are anxious to give their daughters a good education, but for want of a suitable High School for Muslim girls they cannot have their wishes fulfilled, and so they groan under the wretched social system. Why cannot the public of Calcutta support one ideal school for Muslim girls? Such a High English School with boarding accommodation and hostel, which can supply the demands of all the different classes of people, high and low, is very badly needed in Calcutta. On our part we are willing to convert this school (we mean the Sakhawat Memorial Girls' School) to that ideal one, provided we get public support and money enough to meet the cost of up keep.

EDUCATIONAL IDEALS FOR THE MODERN INDIAN GIRL

From the most ancient times there has existed in India a system of education which though distinct in its characteristics and ideals from the modern western system has produced great men and earnest seekers after truth. This ancient Indian Education developed in the early period of history the science of grammer and mathematics. It has enabled India to make the mark in the sphere of high philosophy and metaphysics. Conditions of life have changed considerably from those prevalent in those early days and to work out without many essential modifications ancient theories and practices in education is by no means a practical proposition. Yes we must seek the elements of value in our ancient heritage. We must assimilate the old while holding to the now. Thus will we render more beneficial our present educational system, the great defect of which is that it is an exotric in an alien soil. It is unsuited to our needs and requirements and incapable of developing the distinctive thread of our national thought and culture.

If education is described as the preparation for life or for complete living the Indian educator had formed of it a true and valuable conception. The ancient curriculum was not confined to mere book-learning. It included many more things. Physical development received its due share of attention.

In those early days little was known of our vast expenditure on costly buildings. The place of instruction was outdoor under the shade of a tree, in a natural environment which impressed what was learnt all the more deeply on the mind. The student's life was, moreover, one of healthy activity, for he had to work for the teacher in his house and on the field, looking after his cattle and even collecting alms for him. Moral education was similarly not neglected. The period of studentship was a time for vigorous discipline. Rigid rules were laid down for the conduct of the pupils including hygienic, moral and religious precepts and the regulation of good manners. Implicit obedience was expected and obtained from the student by the teacher and there were elaborate rules for the respect due to the latter.

The modern demand is for an education which develops all the faculties, physical, moral and mental, From what we know of the ancient system of education in this country methods were followed which conduced to the achievement of this aim. Those were days before science was known or had changed the possibilities of existence. Yet in this civilised and advanced generation we must acknowledge the value of Indian methods. The necessity for open air schooling as far as practicable is emphasised by us today. Healthy outdoor sports are recommended to keep up the physique of the student and the value of moral training is endorsed. We are thus advancing in a right direction. What we should recognise, however, is that our educational goal is age old. We are not experimenting with new fancied ideas but are adopting traditions or our ancient system in introducing what we consider are twentieth century educational reforms. Thus progress be accelerated, for the Indian mind is slow to accept innovation but that which is traditional and of proved utility finds ready favour.

Religion is a tremendous force and the chief concerns of all Asiatic people. From start to finish Eastern philosophy and literature are religious. In India religion has pervaded education as all things else. The very purpose of education in the early ages was religious, namely, to train young Brahmans for their duties in life as priest and teachers of others. Thus the spiritual side of education was greatly stressed. The idea of educational discipline was extended to the whole of life and the theory of Asrams or stages those of student, house holder hermit and wandering ascetic was developed. The student was first to acquire learning. He was next to enter upon the 2nd stage that of grihasta or house holder. Then after having brought up a family and done his duty in the world he would enter upon the life of a Vanprastha or forest hermit and later become a "Sannyasi"or wandering ascetic. The ancient Brahmanic education was therefore not only a preparation for the life but for a future existence as well.

In this utilitarian age when religion is treated as obsolete and the all engrossing objective ordinarily are personal ambition and the advancement of material prosperity it becomes all the more necessary for us to retain our ancient ideals. We should try as in the past to teach true values and give the

students a guidance for all duties and relations of life ...the practical duties of life. At a later stage of history in India (as in the Middle age in Europe) a tendency arose to life. The current philosophy taught the unreality of the world and that the highest wisdom was to....release from worldly fetters. But Islam has disapproved strongly of extreme other worldliness. The Holy Quaran has declared against the monastic life, for if all were to forsake the world the bonds of society would soon be broken. In our daily prayers we Muslims beseech Allah saying. "Our Lord grant us good in this world and good in the hereafter". Our sin should be to hermonise in due proportion the two purposes, spiritual and secular, in the education we impart. Much can be done in accomplishing this aim by impressing on the, girls the excellence of our ancient ideals and of the life of great national heroes.

One of the most notable characteristics of Indian educational ideals is the relation between pupil and teacher. The Indian system knew nothing of a large institution or a large class of pupils taught together. There was usually one teacher for a few pupils from the beginning to the end of his period of studies. Thus individual attention was given. A family relationship sprang up between teacher and pupils which had a high moral effect. "In the most", writes an educationist, "it is the Institution rather than the teacher which is emphasised and it is the school or college which a student regards as his 'Alma Mater'. In India it is the teacher rather than the Institution that is prominent and the same affection and reverence which a western student has for his 'Alma Mater' is in India bestowed with a life long devotion upon the teacher". It is not desirable or practicable in this democratic age when a general spread of education should be our aim to abolish large Institution. But we may with benefit require of the teacher the high responsibility of moulding the character of the pupil by personal influence and example. We must require of our teachers a high intellectual moral and spiritual standard and our aim should be to work for a condition which shall make such a class of teachers available. The teaching profession is one of the noblest in the world. Its responsibilities and opportunities both require to be increased.

The state of the education of women in India has for long centuries been deplorable. In the early Aryan period women held a position of authority and honor. We are told in the "Upanishads" of women who took part in deep discussion on philosophical truths and the authorship of some Vedic hymn is ascribed to them. Yet even in the RiggVeds there are indications that women were coming to be looked down upon as inferior beings who should remain in subjection to men. Education for women has therefore become anonymous with us for breaking the barrior of ancient custom which shut them from learing. When we advocated the education of girls we generally imply the adoption of western methods and deals in their training to the exclusion of all that is Indian. This mistake on our part cannot be too

strongly guarded against. We should not fail to set before the Indian girl the great and noble ideals of womenhood which our tradition has developed. This ideal was narrow and circumscribed in the past. We may enlarge and widen it thus increasing its excellence but what we should avoid is its total neglect and a tendency to slavish imitations of Western custom and tradition. In the past, with a few exception our women were not noted for scholastic attainments. Their sphere was the domestic. Yet in the obscurity of their lives they conducted their duties with capacity and considerable amount of....and care. Their fingers were toilworn. The cares of family, the effort to advance the happiness of others, these engrossed them. They were loyal and steadfast in times of endurance and hardship and proved to be in the words of the Mahabharata–

"A companion in solitude, a father in advice. A rest in passing through life's wilderness."

We should by all means broaden the out-look of our girls and teach them to modernise themselves. Yet they should be made to realise that the domestic duties entrusted to them cover a task on which the welfare of the country depends. They should not fall behind their illiterate sisters in splendid endurance, heroism and discipline. We should teach our girls if they are to fulfil their heavy duties commendably, above all to concentrate on desires and efforts which are not superficial. We should teach them that the art of happiness lies just in discipline, that service should be their watchword, even though that service may not be more than a determination "not to a by add transient sigh to the sum total of the world's unhappiness."

In ancient India the arts and crafts were not neglected. The caste system with its many disadvantages, helped to foster them and keep up the standard of work. The dexterity and skill of each particular trade was handed down from father to son. The teaching was by handling and observing real things and unconsciously the boy picked up from his father many secrets of the trade. The encouragement of kings and great nobles was also responsible for the production of really fine work. But in these days the tradition of vocational training has disappeared in India. Parents give no thought to the career which their boy or girl adopted by temperament to adopt, all that they desire being that their child should obtain a hallmark of the University, a degree I feel tempted to quote from a poem by Justice Akbar, which runs thus--

> "Tifl men bu a's Keya me bap atwar kee. Dooth to dibbe ka
> hai, Ta'llm hai sicar kee."
> That is, How can the infant get any scent of
> its parents' character.

While it is fed on tinned milk and gets educated
by the Government?

The ancient tradition of vocational training (although this training must be given today under changed circumstances) must be revived by active propaganda.

The future of India lies in its girls. The development of its educational system on proper lines is therefore a question of permanent importance. Although India must learn many lessons from the West, to impose on it the western system without modifications to make it suitable to us is a huge mistake. India must retain the elements of good in her age old traditions of thought and methods. It must retain her social inheritance of ideas and emotions, while at the same time by incorporating that which is useful from the West a new educational Practice and tradition may be evolved which will transcend both that of East and the West.

In short, our girls would not only obtain University degrees, but must be ideal daughter, wives and mothers–or I may say obedient daughters, loving sisters, dutiful wives and instructive mothers.

পত্রাবলী

পত্র ১ : মরিয়ম রশীদকে

Sakhawat Memorial Girls' School
86-A, Lower Circular Road,
8th Sept, 1915.

স্নেহাস্পদা মরিয়ম,

তোমার ১৯শে আগস্টের প্রাণ জুড়ানো চিঠিখানা পাইয়া পরম সুখী হইয়াছি। আমার মত জ্বলাপোড়া মরুভূমি তোমার মধুর স্নেহের যোগ্য নহে। তাই দেখ না, তোমার সরস চিঠিখানা মরুভূমি একেবারে শুষিয়াই লইয়াছিল।

চিঠি না লিখিবার একমাত্র কারণ সময়াভাব। বুঝিতেই পার এখন খোদার ফজলে পাঁচটি ক্লাস এবং ৭০টি ছোট–বড় মেয়ে, দু'খানা গাড়ী, দুই জোড়া ঘোড়া, সইস, কোচম্যান ইত্যাদি-ইত্যাদি সব দিকে একা আমাকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। রোজ সন্ধ্যাবেলা সইসেরা ঠিকমত ঘোড়া মলে কি না তাও আমাকে দেখিতে হয়। ভগিনীরে ! এই যে হাড়ভাঙ্গা গাধার খাটুনী— ইহার বিনিময় কি, জানিস? বিনিময় হইতেছে "ভাঁড় লিপকে হাত কালা" অর্থাৎ উনুন লেপন করিলে উনুন তো বেশ পরিষ্কার হয়, কিন্তু যে লেপন করে তাহারই হাত কালিতে কালো হইয়া যায়। আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরিবর্তে সমাজ বিস্ফারিত নেত্রে আমার খুঁটিনাটি ভুল ভ্রান্তির ছিদ্র অন্বেষণ করিতেই বদ্ধপরিকর। কচি মেয়েরা মা–বাপের কাছে নিজেদের বুদ্ধিমত যাহা বোঝে, তাহাই বলে। তাহা নিয়া একটু রঙ্গ হয়। এইরূপ সুখে দুঃখে একরকম চলিয়াছে ভালই। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা কেয়ামতের পর দিন দেওয়া হইবে। এখন পড়া তৈরী করিতেছি।

তোমার স্নেহের ভগিনী
রোকেয়া

পত্র ২ : মরিয়ম রশীদকে

Sakhawat Memorial Girls' school,
86-A, Lower Circular Road.
1-4-17

প্রাণাধিকা মেরী,

গতকল্য তোমার পত্র পাইয়াছি। হাঁ বোন স্কুলের প্রাইজ গত ১৫ই মার্চে হইয়া গিয়াছে। আমি আল্লাহ্ চাহে এবার তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই বোম্বে যাইব। কিন্তু বোন! তুমি যদি এই মাসের আরম্ভে যাও, তবে পারিব না। কারণ আমাদের স্কুল জুন মাসে বন্ধ হইবে। তুমি যদি ১৫ই বা ১৫ইর পরে যাও, তবে আমার যাওয়া হইবে। আমাকে বিধিমত ছুটির জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। অতএব দয়া করিয়া পত্রপাঠ মাত্রই কিম্বা তোমার যাত্রার তারিখ ঠিক হওয়া মাত্রই আমাকে জানাইও। মনে রাখিও লক্ষ্মী বোনটি আমার, ১০ দিনের নোটিশ না পাইলে আমি ছুটী মঞ্জুর করাইতে এবং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব না।

তোমার স্নেহের আপা
রোকেয়া

•

পত্র ৩ : মরিয়ম রশীদকে

Sakhawat Memorial Girls' School
86-A, Lower Circular Road,
5th January, 1926

কল্যাণীয়া মেরী,

খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন। আলীগড়ে মাত্র তিনদিন ছিলাম। শহর দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে নাই। তিনদিনই সভাসমিতি লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে হইয়াছে।

সেখানে কত মুসলমান গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার গ্রাজুয়েট মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের সম্মুখে কি আমি মুখ খুলিতে পারি? কেহ তামাসা করিয়া সংবাদপত্রে আমার বক্তৃতার কথা লিখিয়া থাকিবে। আমি শিক্ষিত মহিলাবৃন্দকে দেখিয়া পুণ্য অর্জন করিয়াছি। আমার চক্ষু কর্ণ ধন্য হইয়াছে। মুঐনুন নিসওয়াঁ (অর্থাৎ নারীকুলের সাহায্য) নামে সমিতি গঠনের জন্য জনৈক (সম্ভবতঃ অতি দরিদ্র) মহিলা হাতের আংটি খুলিয়া চাঁদার জন্য দিলেন। আলীগড়ের মেয়ে কলেজ শীঘ্রই দশ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া নারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবে। আর আমাদের বাংলাদেশ—আহারে! সে কথা না বলাই ভাল। আমি যদি কিছু টাকা পাইতাম (ধর, মাত্র দুই লক্ষ) তবে কিছু করিয়া দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু খোদা আমাকে টাকা দেন নাই।

বলি, আমার বাংলাদেশ। যদি কিছু না-ই করিস, তবে দড়ি ও কলসীর সাহায্যে তোর অস্তিত্ব লোপ করিতে পারিস্ তো! সেজন্যও আর বেশী ভাবনা নাই—ম্যালেরিয়া ও কালাআজার সে ভার লইয়াছে। আহা, বুকটা ফাটিয়া যাইতে চায়।

তোমার দুলার চিঠিও পাইয়াছি। তিনিও আমার বক্তৃতার জন্য মোবারকবাদ দিয়াছেন। আরে বোরকা ঢাকা অবস্থায় দু'একটি কথা বলিয়াছি কি বলি নাই, তাহারই নাম হইল বক্তৃতা। আর ব্যাটারা সব আমার নাম জানিল কিরূপে তাহাও বুঝিতে পারি না। আমি এখানে কাহাকেও বক্তৃতার কথা বলি নাই।

তোমার স্নেহের আপা
রোকেয়া

পত্র ৪ : মরিয়ম রশীদকে

86-A, Lower Circular Road,
Calcutta.
19.8.26

স্নেহাস্পদা মরিয়ম,

অবসর অভাবে তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারি নাই, সেজন্য দুঃখিত হইও না। আমার অবসর নাই বলিয়াই এতদিন মরিতেও সময় পাই নাই। দাঙ্গায় আমরা প্রত্যক্ষ শহীদ হই নাই বটে, কিন্তু পরোক্ষে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতেছি, তন্মধ্যে প্রধান দুইটি এই—(১) অনেক লোক কলকাতা ত্যাগ করায় স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা কমিয়াছে।

(২) সইস, কোচম্যান, দারওয়ান প্রভৃতি চাকর পাওয়া যায় না।

বোন, বলিলাম ত' মরিবার অবসর পাই না। পূর্ব্বের চেয়ে খাটুনী বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিনী ভগিনী
রোকেয়া

পত্র ৫ : মামলুকুল ফাতেমা খানমকে

Sakhawat Memorial Girls' School
86-A, Lower Circular Road,
Calcutta,
the 9th Dec. 1926

প্রিয় খানম সাহেবা,

করুণাময় খোদাতালা আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন। আপনার ৪ঠা তারিখের চিঠি পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। শোকর আলহামদোলিল্লাহ্! এখনও জীবিত আছি। আমি স্বয়ং বেরি-বেরিতে আক্রান্ত হই নাই বটে কিন্তু আমার জনৈক নিকট আত্মীয়ের (অর্থাৎ হাজী এ.কে. গজনবী সাহেবের) ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক পুত্রের বেরি-বেরি রোগে মৃত্যু হওয়ায় মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়াছি।

আমি আপনার নিকট যেরূপ অপরাধিনী আছি, তাহাতে আপনি আমাকে আপনার প্রতি বিরূপ মনে করিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হই নাই। বরং আপনি যে আমাকে "ভদ্রলোকের" খাতা হইতে খারেজ করেন নাই, ইহা আপনার সৌজন্য ভিন্ন আর কিছু নয়। আপনি আমার জীবনের ইতিহাস চাহিয়াছিলেন,—আমার জীবন? অতি নগণ্য—"কুকুরের কাজ নাই দৌড় ছাড়া হাঁটা নাই"—আমি সেই নিষ্কর্ম্মা কুকুর। তাই আপনার সে চিঠির উত্তরে আমার ইতিহাস পাঠাই নাই। কিন্তু তবু একটা উত্তর দেওয়া ত উচিত ছিল। সেই জন্যই ত অপরাধিনী আছি।

মিস চৌধুরীর মৃত্যু হওয়ায় আপনার সিনিয়র পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, শুনিয়া আমার হাসি পাইল! বাস্! এক মিস চৌধুরীর মৃত্যুতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ট্রেনিং স্কুলটা ধ্বংস হইয়া গেল! গোটা ইংরাজ রাজত্বটা যে ধ্বংস হয় নাই, এজন্য খোদাতালার শোকর করিতে ইচ্ছা করে!

আমজাদী বেগমের ঠিকানা

6, Ice Factory Lane
Intally P.O.

আজ তবে আসি। অনেক বাজে বকিলাম। ট্রেনিং স্কুলের বাড়ী বদলান হইয়াছে, এবং পুনরায় মিস মোমগেন আসিবেন, শুনিয়াছি। এ সময় মাত্র তিন জন শিক্ষার্থিনী সেখানে আছে।

সতত আপনার কুশল কামনা করি। ইতি

আপনার খয়েরখাহ্
রোকেয়া খাতুন

পত্র ৬ : কবি মুহম্মদ খান মঈনুদ্দীনকে

25-2-27

কল্যাণবরেষু,

আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। এই নিন, আপনার জন্য কাজ পাঠাইলাম। ১৫০ কপি "অভিভাষণ" বিভিন্ন জেলায় বিতরণের জন্য পাঠাইয়া দিন। রেজিষ্ট্রি বুক পোষ্টে পাঠাইবেন। যাহা খরচ হয় বিনা সঙ্কোচে আদায় করিয়া লইবেন। বইগুলি আপনার পরিচিত বিশ্বাসী লোকের নিকট বিতরণের নিমিত্ত পাঠাইবেন। অন্যথা না হয়। শ্রীমান শাহাদত হোসেন নিম্নলিখিত শহরে পাঠাইবার ভার লইয়াছেন, যথা :

(১) ঢাকা, (২) চট্টগ্রাম, (ব্রহ্মা) এবং রঙ্গপুর।

আপনি অবশিষ্ট জেলায় পাঠাইবেন।

দোয়া ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা

R.S. Hossain

পত্র ৭ : মোহসেনা রহমানকে

Sakhawat Memorial Girls' School.
86/A, Lower Circular Road.
Calcutta,
the 21.5.1929

আমার স্নেহের মোনা,

আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন।...তোমার প্রেরিত কাসন্দ পেয়ে সুখী হয়েছি। বুয়া! তুমি কাসন্দ না দিয়ে যদি স্কুল ফান্ডে চার পাঁচটা টাকা পাঠাতে তা'তে আমি বেশী সুখী হতুম।

এক ব্যক্তি সুদূর রেঙ্গুন থেকে স্কুলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ ক'রে পাঠাচ্ছেন—গত মাসে ২৭ [টাকা]পাঠিয়েছিলেন, এবার ৬৯ টাকা ছয় আনা পাঠিয়েছেন। আর তোমরা আমার আপন লোক হয়ে স্কুলটাকে ভুলে থাক।....এই সঙ্গে স্কুলের একখানা রিপোর্ট পাঠাই।

তোমার স্নেহের আপা

রোকেয়া

পত্র ৮ : মরিয়ম রশীদকে

Sakhawat Memorial Girls' School.
86/A, Lower Circular Road.
Calcutta,
24-3-30

স্নেহাস্পদা মরিয়ম,

তুমি অমন আদর করে আমাকে যেতে বলেছ। তোমার প্রত্যেকটি কথা স্নেহ মমতায় ভরা ছিল। আত্মীয়স্বজনের মমতা কি মধুর জিনিষ তা আমার মত আত্মীয়হারা না হওয়া পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারে না। শুনেছি, লোকে বেহেশতে গিয়েও নাকি আত্মীয় স্বজনের বিরহে ব্যাকুল হবে।

কিন্তু বোন গ্রীষ্মাবকাশে আমার তো কোথাও যাবার যো নেই। এই যে স্কুল সংক্রান্ত রাশীকৃত Office Work এগুলো করবে কে? সুতরাং বেহেশ্তের নিমন্ত্রণ পেলেও তো স্কুল ছেড়ে যেতে পারব না।

তোমার স্নেহের আপা
রোকেয়া

পত্র ৯ : মোহসেনা রহমানকে

86/A, Lower Circular Road
Calcutta.
30-4-31

পরম স্নেহস্পদা মোনা,

করুণাময় আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন। গত বৎসর এমন বকর ঈদের সময় নয়ন পুতুলি সোলতান আমাদের ছেড়ে গেছে;; এবার গেল নূরী।

নূরী যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল, সকলের কাছে মাফ চেয়ে গেছে। সকলকে আদাব লিখতে বলে গেছে।

ভগিনী! আমার আশা নৈরাশ্যের কথা আর কি বলব! আমি ত জানিই যে,—

"জীবন এমন ভ্রম কে জানিত রে?"

"ছিন্ন তুষারের প্রায় বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝা বায়ু প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দূর্গ প্রাকারে।"

আহা ! "কেয়া টিড্ডি, কেয়া টিড্ডি কা রান !" কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য মানুষ, তার আবার আশা ভরসা ! সুতরাং যে কয়দিন বেঁচে আছি খাই দাই—আরাম করি, হাসি খেলি, বাস ! আর যদি পারি ত,' প্রাণভরে একটু আল্লাহ্‌কে ডাকি। তা' ছাই ডাকতেও ত পারি না। আমার মত দুর্ভাগিনী, অপদার্থ বোধ হয়, এ দুনিয়ায়, আর একটা জন্মায়নি।

শৈশবে বাপের আদর পাইনি, বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি। প্রত্যহ Urine পরীক্ষা করেছি। পথ্য রেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি। দুবার মা হয়েছিলুম—তাদেরও প্রাণ ভরে কোলে নিতে পারিনি। একজন ৫ মাস বয়সে, অপরটি ৪ মাস বয়সে চলে গেছে। আর এই ২২ বৎসর যাবত বৈধব্যের আগুনে পুড়ছি। সুতরাং নূরী আর আমাকে বেশি কি কাঁদাবে ? সে ত বোঝার উপর শাকের আঁটি মাত্র ছিল। আমি আমার ব্যর্থ জীবন নিয়ে হেসে খেলে দিন গুনছি। আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের কুশল কামনা করি। তোমরা ভাল থাক, সুখে থাক, তাতেই আমার সুখ। দোয়া ইতি—

তোমার স্নেহের আপা

পত্র ১০ : মোহাম্মদ বাবর আলী খানকে

86-A, Lower Circular Road, Calcutta
26-6-31

সালাম পর আরজ,

শ্রীমতী রাবিয়া খাতুনের পত্রে জানিলাম, সে খোদার ফজলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে এবং এখন এখানে আসিতে চাহে। আগামী সোমবার (২৯শে জুন) স্কুল খুলিবে। দয়া করিয়া মেয়েকে শীঘ্রই লইয়া আসিবেন।

ইতি
বিনীতা
R.S. Hossein

পত্র ১১ : খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদকে

16.8.31

ভাই সাহেব,

আপনার চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি। এখানে কলকাতায় ভালভাবে নিশ্বাস নেবারও যেন অবসর পাওয়া যায় না। আপনার চিঠির উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পর মুহূর্তেই সাংঘাতিক কাজের চাপে তলিয়ে গেলাম। ১৪ তারিখেই আমাদের মিলাদ শরীফ হল। সেজন্য ১১ই তারিখে আমাকে সব দাওয়াতের চিঠির বিলি-বন্দোবস্ত করতে হল। আর অন্যসব দরকারী ব্যবস্থাও করলাম। আর এর সাথে সাথে নিত্যদিনের অফিসের কাজ ত' আছেই। আর সে কাজের চাপ আপনি না থাকার দরুন আমার ওপর দ্বিগুণ পড়েছে।

বহুদিন থেকে আপনাকে আমার ভাই ডাকবার ইচ্ছা। আপনি জানেন, আমার স্নেহময় দুই ভাইকেই আমি হারিয়েছি। তাই এই চিঠিতে আপনাকে আমি ভাই সম্বোধন করলাম।

আমার শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। আল্লার শোকর যে, দাঁতের ডাক্তার আমার দু'চারটা দাঁত রেখে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু পেটের অসুখ ও কিডনীর গোলমাল আমার এখনো আছে, আর সেজন্য ইনজেকশনও নিচ্ছি।

ভাই সাহেব, আমাদের সমাজের কাছ থেকে আমি সম্মান বা খ্যাতি কিছুই চাই না। আমি শুধু চাই যে, তাঁরা সত্যিকার মুসলমান হবার জন্য চেষ্টা করুন।

আপনি শুনে খুশী হবেন যে, মি. ইসলামও বলেন যে, তিনি ভুয়ো পর্দা প্রথার পক্ষপাতী নন। কিন্তু অনেকেই কথায় ওরকম বলে, কিন্তু কাজে দেখায় না। আমার শুভেচ্ছা নেবেন। খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

আপনাদের

রোকেয়া

পত্র ১২ : প্রাপক অজ্ঞাত

6-9-31

বাইবেল বলে, 'শরীরে জোর না থাকলে মনের জোরও থাকে না।' কিন্তু আমার শরীরের জোর না থাকলেও মনে জোর আজো আছে। কিন্তু সময় নাই। কি করে আমি বিশ্রাম নেব? কেমন করে আমার ভাবনা কমবে? আল্লাই ত.পাক কোরানে বলে দিয়েছেন, "কেউ কারো ভার বহন করবে না।" স্কুলের একটা বাড়ী হল না, হেড মিস্ট্রেসের ঠিক নেই। এই দু'টি সমস্যার ওপরে আবার ফরিদপুর ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে নানা সাংঘাতিক গুজব শুনতে পাচ্ছি। ওখানে আমাদের ২০,৫০০ টাকা রয়েছে। আমার মত এক গরীব মেয়েলোককে মেরে ফেলবার জন্য এই কি যথেষ্ট নয়?

পত্র ১৩ : খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদকে

1. Nripendra Lodge
Ghatsila P.O.
Singhbhum - Dist., B.N. Rly,
10-11-31

ভাই সাহেব,

কলকাতায় থাকতে আপনাকে লিখে উঠতে পারিনি। সেজন্য আপনি আমাকে কি যে ভাবছেন! কলকাতায় পৌঁছবার পরই নানা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লাম। অনেক কষ্টে ৮ নভেম্বর কলকাতা ছাড়তে পেরেছি। আল্লার শোকর সেদিনই বেলা ৩টায় এখানে পৌঁছলাম, আর পৌঁছার সাথে সাথেই আমার শরীর মন এতই প্রফুল্ল হয়ে উঠল যে, সন্ধ্যার সময়ই দেড় মাইল হেঁটে বেড়াবার মত জোর গায়ে এসে গেল।

কলকাতায় আমি এত ক্লান্তি বোধ করি যে তা বলতে পারি না। কলকাতা ছাড়া অন্য যে কোন জায়গার আবহাওয়াই যেন আমাকে সয়। এই যেমন, জলপাইগুড়ি পৌঁছে আমি একটুও ক্লান্ত হইনি, কিন্তু জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় নেমে মনে হল যেন আধমরা হয়ে গেছি।

আবার পরশুদিন ঘাটশীলায় এলাম বেশ তাজা ভাবেই।

আচ্ছা, আজ এ পর্যন্তই থাক। আশা করি কুশলে আছেন। সালাম ইতি —

রোকেয়া

পত্র ১৪ : খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদকে

1. Nripendra Lodge
Ghatsila P. O.
14-11-31

ভাই সাহেব,

আমার ১০ তারিখে লেখা চিঠি পেয়েছেন আশা করি। এই সঙ্গে মিসেস খন্দকারকে চিঠি ও "গার্লস্ হোম" সম্বন্ধে আমার মন্তব্য পাঠালাম। দয়া করে ওগুলো ওঁদের কাছে পৌঁছে দেবেন।

আপনার ওখানে থাকাকালীন যে অডিটের রিপোর্ট দেখতে চেয়েছিলেন, তার কপিও এই সাথে দিলাম। কলকাতায় ফিরে ফরিদপুর ব্যাঙ্কের একখানা চিঠি পেয়েছিলাম, তাতে আমাদের ডাইরেক্টরস্ মিটিং-এর গৃহীত প্রস্তাবাবলীর কপি ও সে সম্বন্ধে মন্তব্য যে এই অনুরোধ রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কাজেই টাকা ম্যাচিওর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। অন্যান্য খবর পরে জানাব।

আপনাদের
রোকেয়া

পত্র ১৫ : খান বাহাদুর তসদ্দক আহমদকে

Nripendra Lodge
Ghatsila. P.O.
Singhbhum
B.N. Rly.
28-11-31

ভাই সাহেব,

আমার সব প্রাণখোলা হাসি যেন জলপাইগুড়িতে রেখে এসেছি। কলকাতা নামা মাত্রই ত সব রকম ঝঞ্ঝাট এসে ঘিরে ধরল। আর এখন দেখছি যে সেগুলো এখান পর্যন্ত আমার পিছে পিছে ধাওয়া করে এসেছে, এই সব ভাবনাচিন্তা আমার গলা টিপে যেন দম বন্ধ করে দিচ্ছে। এর মধ্যে আবার মি. অলিউল ইসলাম মেদেনীপুরে বদলী হয়ে যাচ্ছেন। সেক্রেটারীর ভার চাপানোর জন্য আর এক জনকে খুঁজছেন তাই এখন। উনি এতদিনে কলকাতা থেকে চলে গেলেন নাকি, তাও জানি না। সত্যি করে বলতে গেলে, আমার শরীরটাই শুধু ঘাটশীলায় আছে, কিন্তু মনটা এখন কলকাতায়। দুঃখ লাগছে যে, এই জায়গাটা এখন ক্রমেই সুন্দর হয়ে উঠছে আর আমাকে চলে যেতে হবে। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে, কাদা শুকিয়ে গেছে আর ধান কাটাও হয়েছে। তাই হেঁটে বেড়াতে আরো আরাম পাওয়া যাচ্ছে।

এবার আমার ভক্তিপূর্ণ তসলিম জানিয়ে শেষ করছি।

আপনাদের
রোকেয়া

পত্র ১৬ : মোহসেনা রহমানকে

1. Nripendra Lodge
Vill. Gopalpur
Ghatsila P.O.
Singhbhum.
B.N.Rly.
28-11-31

স্নেহাস্পদা মোনা,

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমার ৩০শে অক্টোবরের স্নেহলিপি যথাসময় পেয়েছি। সে সময় নানা ঝঞ্ঝাটে ছিলাম বলে তোমায় লিখতে পারিনি।

সে সব ঝঞ্ঝাটের ফর্দ লিখে তোমার কোমল প্রাণে আর ব্যথা দিতে চাই না। ফল কথা, শেষে ডাক্তারেরা আমাকে দার্জিলিং যেতে বারণ করায় আমি ২৫শে সেপ্টেম্বরে ঘাটশীলায় এসেছি।

কিন্তু অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি কতকগুলো কাজের চাপে আমায় কলিকাতায় যেতে হয়েছিল। স্কুলের কতকগুলি জটিল কাগজপত্র নিয়ে জলপাইগুড়ি গেলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, ফিরিবার পথে হঠাৎ তোমার কাছে যাই। তাই আমিরকে দিয়ে চিঠি (পোঃ কাঃ) লিখিয়েছিলুম। তোমরা আমিরের জন্য প্রস্তুত থাকতে অথচ তার সঙ্গে আমাকেও ফাও স্বরূপ পেয়ে তোমরা আকাশের চাঁদ হাতে পেতে! কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল, তাই আমির বাবাজী চিঠি পোস্ট করলে দেরী করে, আর তোমার উত্তর পেতে অযথা দেরী হয়ে গেল। তবু আমি নিলফামারীতে নামতুম—তোমাদের আশ্চর্য করে দিতুম; কিন্তু আমিরের লেগে গেল সর্দী। তোমার ছোট আপা কলিকাতায় বোর্ডার মেয়েদের নিয়ে আছেন। উনি আমাদের সঙ্গে না থাকায় সর্বদা আমিরের জন্য আমার ভাবনা থাকে। তাই তাকে নিয়ে রাত্রি সাতটার সময় অচেনা জায়গায় টো টো ক'রে বেড়াতে সাহস করলুম না। জান ত' ঘর পোড়া গরু আকাশে সিন্দুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। ট্রেনে সমস্ত রাত্রি মনঃকষ্টে আমার ঘুম হল না। কিন্তু কোন উপায় ছিল না।

কলিকাতার হেঙ্গাম কতক পরিমাণে চুকিয়ে আবার ঘাটশীলায় এসেছি। এখানে আগামী ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকার ইচ্ছা আছে। আগে খোদার মরজী। কলিকাতার হেঙ্গাম আমাকে ছাড়ে নাই; ভাবনা চিন্তা সঙ্গেই আছে। আমার শরীর এখানে, মন কলিকাতায় আছে। ভেবে দেখ বোন! এরূপ অবস্থায় চেঞ্জে এসে আমার কতই উপকার হবে? স্কুলের নিজের বাড়ী হয়ে গেলে, চিন্তা অনেকটা লাঘব হত; তাহলে হয়ত আমার স্বাস্থ্য ভাল হ'ত।

তবু আমি এখানে এসে আল্লাহ্‌র ফজলে অনেকটা ভাল আছি। লোকে শুনলে হাসবে যে এখন কলিকাতার বাতাস আমার মোটে সয় না। সেই যে মাঝে একবার কলিকাতায় গিয়েছিলুম, তখন আবার অসুখ বেড়েছিল! আর ঘাটশীলায় এসে পৌঁছামাত্র আল্লাহ্‌র দয়ায় ভাল হয়ে গেলুম।

তুমি যদি এণ্ডি পোকা পোষার কোন ব্যবস্থা করে দিতে পার; স্থানীয় লোকেরা এণ্ডি পোকা পুষতে রাজী হয়, তবে ইনশাআল্লাহ্‌ নিশ্চয় তোমার ওখানে একবার যেতে চেষ্টা করব।

বোন! তুমি দুঃখ কর না, যদি হায়াত বাকী থাকে ত আবার দেখা হবে। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ এবং আমিরের ভক্তিপূর্ণ আদাব গ্রহণ কর। দোয়া ইতি।

তোমার স্নেহের

আপা

পত্র ১৭ : মোমেনাতুল ফাতেমাকে

14.12.31
I, Nripendra Lodge
Ghatsila P.O.
Singbhum.
B.N.Rly.

স্নেহাস্পদা ভগিনী,

পরম করুণাময় আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন।....এখন এখানে বেড়াইবার বড় আরাম। ধান কাটা হইয়াছে, সেই সব ক্ষেতের নরম খড়ের উপর হাঁটিতে কি মজা। প্রাণ ভরিয়া হাঁটিয়া বেড়াই। একা হাঁটিতে ভাল লাগে না, কেবল আপনাদের মনে পড়ে।

আপনি কোলের মেয়েটিকে আর রশীদাকে সঙ্গে লইয়া ভাই সাহেবের সহিত এখানে আসিয়া যদি দুই চারিদিনের জন্য বেড়াইয়া যান তবে কি মজাই হয়। মানুষের জীবন দুঃখ ও সংগ্রামে ভরা, তারই মধ্যে দুই এক দিন একটু হাসি খুশি পাওয়া যায়, তাহাই গণিমত (যথেষ্ট)। বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম :

"হেসে লও, দু'দিন বই ত নয়,
আছে ত জীবন ভরা দুঃখ।"

ঘাটশীলা আমাকে যেন তাহাই বলিতেছে :

"হেঁটে লও, দু'দিন বই ত নয়,—
আছে ত কলিকাতার বন্দী-খানা !"

তাই বলি, আপনারা আসিয়া দুই চারিদিনের জন্য আনন্দ দিয়া যান। আপনাদের জলপাইগুড়ির বাংলার তুলনায় আমার এ বাসাটুকু একটা গোহাল ঘর বিশেষ।

আমার ঘাটশীলা-লীলা সম্বরণের আর অধিক দেরী নাই। আল্লাহ্ চাহে এই মাসের ৩০শে তারিখে দিনের ১২টার গাড়ীতে রওয়ানা হইব। সুতরাং ২৯শে তারিখ হইতেই ল্যাজ গুটাইতে (অর্থাৎ সমস্ত জিনিসপত্র প্যাক করিতে) হইবে।

আপনার পত্রের আশায় রহিলাম....আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন।

আপনার স্নেহের আপা
রোকেয়া

পত্র ১৮ : খান বাহাদুর তসদ্দক আহমদকে

Sakhawat Memorial Girls' School.
25-4-32

ভাই সাহেব, আপনি ঘুণাক্ষরেও ভাববেন না যে, আমার শ্রদ্ধেয় স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্যই আমি এ স্কুল আঁকড়ে পড়ে আছি। সরকারের সাথে স্কুল বিষয়ে লিখিত আমার চিঠিপত্রের কথা আপনি মনে করে দেখুন, গভর্ণমেন্ট এই স্কুলের নতুন নামকরণ "Government H.E. School for Muslim Girls" অর্থাৎ মুসলিম বালিকা উচ্চ ইংরেজী সরকারী বিদ্যালয় করতে চেয়েছেন, তাতে আমি সেই মুহূর্তেই রাজী হয়েছি। মরহুম নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী ও সার গজনবী তাঁদের নিজেদের ইচ্ছামতই নাম পরিবর্ত্তনে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

কিন্তু আমি আমার স্বামীর নামের কাঙ্গাল নই। কারণ আমি জানি তাঁর সত্যিকার স্মৃতি আমার সাথেই রয়েছে ও আমার সাথেই লুপ্ত হয়ে যাবে। আমার মনে পড়ছে :

"মারকুদ কি চাক্কিনে কিস কিসকো পিসা,
জমিন খা গ্যাই লোকতে দাঁ কাইসে, কাইসে,
না হ্যায় কবর এ সিকান্দার, না গোর এ দারা,
মিটে নামিওঁ কি নিশান কাইসে কাইসে॥"
"কত রূপ হল কবরেতে লীন
মাটীর তলে কাটে শাহানশাদের দিন—
"সিকান্দার দারাউসের গোরের নেই কো চিন,
সে সব জাগ্রত শক্তি আজ ঘুমায় বিরামহীন।"

[অনুবাদ : মোশফেকা মাহ্‌মুদ]

চিরকাল আমি স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য কিছু করবার চেষ্টা করেছি, আর আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ্ আমাকে এতে সাহায্য করবেন এবং একমাত্র আল্লাই আমার ভরসা। আমাকে অনেক দুঃখ দিয়ে তিনি পরীক্ষা করছেন, কিন্তু আমার আশা যে শিগ্‌গিরই তিনি আমাকে দয়া করবেন।

প্রতিদিন ভোরে আমি পাক কোরানের ২/১ পৃষ্ঠা পড়লে বড় শান্তি পাই। কত সান্ত্বনা রয়েছে এই কথা ক'টিতে, "আমি এ দুনিয়ায় কিছু চাই না,আমার পুরস্কার জমা রয়েছে সারা দীন দুনিয়ার মালেকের কাছে'।"

পত্র ১৯ : শামসুন নাহার মাহমুদকে

৮৬ লোয়ার সার্কুলার রোড
২২শে মে ১৯৩২

স্নেহাস্পদা নাহার,

আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন। গতকল্যকার মিটিংয়ে যেসব রিজলিউশান পাশ হইয়াছে তার নকল যদি আজই দিতে পার তো বেশ হয়। কারণ Asst. D.P.I দেখতে চাচ্ছেন। শুভস্য শীঘ্রম।

তুমি আজ ও কাল দুদিন বিশ্রাম করে আগামী পরশু সকালে ৯টা ও ১১টার মধ্যে দয়া করে নিশ্চয় এখানে আসিও। হয়ত খোদা তোমাকে দিয়েই আমার শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন। তাই তোমাকে চাই।

তোমার স্নেহের
আপা

পত্র ২০ : মরিয়ম রশীদকে

Sakhawat Memorial Girls' School
162, Lower Circular Road
14-7-1932

স্নেহাস্পদা মরিয়ম,

আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমার ও দুলা মিয়াঁর পত্র যথাসময় পেয়েছি। তুমি ত জান, কোন non purdah স্কুলেও বোর্ডিং-এ ব্যাটা ছেলেকে রাখে না ; সুতরাং শ্রীমান সেলিমকে আমরা কি করে রাখতে পারি। দুটির একটি তোমায় করতে হবে—(১) হয়, তুমি মেয়েদের নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাক, সেলিম কোন একটা Mess-এ থাকুক ; নয়, তোমরা একটা বাসায় আলাদা থাক—রোজ সেখান থেকে মেয়েরা পড়তে আসবে।

মাশাআল্লাহ্ সেলিম সহ পৃথক বাসায় থাকতে পারবে না কেন? আমি ত একাই ২২ বছর ধরে আছি—তা তুমি বলবে যে তুমি বুড় মানুষ। কিন্তু ২২ বছর পূর্বে ত বুড় ছিলুম না। ফল কথা, তুমি ভাল করে চিন্তা করে দেখ। এখন এই উন্নতির যুগে তুমি একটা আলাদা বাসায় থাকতে সাহস না করলে চলবে কেন? এই স্কুল বাসার আশপাশে বাসা পাওয়া যেতে পারে। কি পরিমাণ ভাড়া দিবে, জানালে বাসা খুঁজতে পারি। আর যদি শ্রীমানকে মেসে রাখতে চাও তবে তাও খুঁজে দেখা যেতে পারে।

জনাব চাচিজান ও তোমরা মোবারকবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ শেম্বিলের খোকাকে দীর্ঘজীবী করুন। শ্রীমান দুলা মিয়াকে দোয়া জানাই। এই পত্রই তিনিও পড়ে দেখবেন।

দোয়া ইতি
তোমার স্নেহের আপা
রোকেয়া

পত্র ২১ : খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদকে

Sakhawat Memorial girl's School
86/A, Lower Circular Road
Calcutta,
the 30-9-1932

ভাই সাহেব,

স্কুলের নানা জটিল কাজকর্ম্মে এত ব্যস্ত থাকি যে, নিজের বাড়ীঘর, বিষয় সম্পত্তির দিকে মোটেই খেয়াল করতে পারি না। ফলে আমার প্রায় দশ হাজার টাকা লোকসান হয়ে গেল। এতটা লোকসান দেওয়া আমার জন্য কতই মারাত্মক। আমার স্বাস্থ্যও দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে। স্কুলের পুরো কাজ ছাড়া অন্যান্য সমিতির কিছু কিছু কাজও আমাকে করতে হয়। তাঁরা আমার কোন আপত্তি শুনবে না। আমার অসুস্থতার ওজর মানবে না। কাজেই আমার ছাড়া পাবার উপায় নেই।

পত্র ২২ : শামসুন নাহার মাহমুদকে (আনুমানিক ১৯২০ সনে)

'তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়া বহুকাল আগের একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। একবার রাত্রিবেলা আমরা বিহারের এক জলপথে নৌকাযোগে যাইতেছিলাম। বাহিরে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। শুধু নদী তীরের অন্ধকার বনভূমি হইতে কেয়াফুলের মৃদু সুরভি ভাসিয়া আসিতেছিল। ঠিক তেমনি তোমাকে কখনো দেখি নাই, কিন্তু তোমার সৌরভটুকু জানি।'

পত্র ২৩ : মুজিবর রহমানকে

Feb. 10,1911

A PROPOSED GIRLS' SCHOOL

To
The Editor of The "Mussalman."

Sir,—Permit the liberty of asking the courtesy of your paper to inform the Mohamedan public that I intend to start a Girls' school in Calcutta in strict observance of Purda at an earliest opportunity possible, which is not only the crying need of the time but the want of which, I believe, is keenly felt by all right thinking men and women.

My beloved husband, the Late Moulvie Sakhawat Hossain, B.A. of the Provincial Executive Service, has bequeathed Rs. 10,000 for female education, the income (Rs. 6,000 annually) of which is at my disposal, I am therefore not only ready to spend that amount but I shall rather be glad to personally conduct the school and am prepared to devote my time, energy, and whatever knowledge I possess, towards its furtherance.

But as the fund in hand is not sufficient to meet the requirements I appeal to the generous Moslem public to extend their helping hand and thus contribute to the success of the project which deserves the hearty sympathy and practical patronage of all well-wishers of the community.

Mohamedan gentlemen desirous of helping me in my scheme are requested to kindly communicate with me direct, while my Moslem sisters who wish to associate themselves by their cooperation in the movement are invited in my house to discuss the subject, or I shall be glad to call on them should they inform me of their addresses.

KHATOON

পত্র ২৪ : মোঃ ইয়াসীনকে

Sakhawat Memorial Girls' School
13 Wallyulla's Lane
Calcutta the 18th Octr., 1912

Sir,

Many thanks for your kind letter dated the 12th inst. The money (Rs 10/-) reached me yesterday. Kindly let me know in whose name shall I put this sum in the account book.

As regards your girl, I shall be glad to take her charge. We have prepared a prospectus which we expect to get printed shortly. I shall send you a copy when it is ready for distribution.

Our boarding arrangement is not completed yet. Therefore you will have to wait for a month or two. At present only one girl is living with me ; she is 8 years old.

I shall send you a formal receipt for the sum of Rs 10/- on hearing from you. Please accept my best thanks for your kind help. I wish there were a few more gentlemen like you, whom I could call friends of poor helpless women, who are no better than the animals kept imprisoned in zoological garden!

Trusting this will find you in better health and good spirits ; and with best salams.

Yours Truly
R.S. Hossein

পত্র ২৫ : মুজিবর রহমানকে

THE SAKHAWAT MEMORIAL GIRLS' SCHOOL

Jan 10,1913

To

The Editor of the "Mussalman"

Sir,–I desire to inform the readers of your widely circulated paper that we are going to establish a boarding house attached to the Sakhawat Memorial Girls' School, for the convenience of the mofussil pupils. At present our school imparts instruction in Urdoo, but we are arranging to open a separate class for teaching regularly Bengali and English such girls who wish to receive instruction through the medium of these languages.

Upto this time we have got applications from 7 girls only and the guardians of these girls are rather pressing hard for their Girl's reception. To start a boarding house with seven girls will be very much inconvenient to us ; but we have, however, made up our minds to make a beginning in spite of all inconvenience. We pray to the Almighty God that he may be pleased to further the work we are about to undertake.

[......] we expected to find some difficulty in getting a suitable grant from Government towards this object, but fortunately for us this was obtained with comparative ease. The Government contribution was, however, made conditional on our raising a substantial amount for this purpose, from private sources, and accordingly we set about in collecting subscriptions from the Mohammedan public. I regret to say that the response to our appeal has not yet been adequate and after about one year's effort we are still short of the amount required for the purchase of the necessary equipage by a sum of Rs. 280. Is this not enough to fill one's soul with a deep sense of shame and bitterness?

In this connection I may be excused for mentioning that in order to add something to the Omnibus Fund I advertised in your paper to sell some of my books at a reduced price for month or so. But such is the public spirit and sense of appreciation of our cause by the members of our community that only Rs. 6 worth of books have been sold during the month of Ramzan! The cost price of the whole lot of Indian Law Reports is Rs. 102 and I am offering the books at Rs. 51 only, which amount will also go to the same Fund, but even then I have not yet been able to find a purchaser.

These are the people, who can not support a single female school but aspire to have a University. It is no wonder that Government denied us the same because we do not deserve it yet. One may well ask what would be the good of having a University when such an important duty as the education of the females is neglected by the community in this sad manner? Granted that we get a University, what will we do with it while your females remain

in the dark? You can not banish all the females from your society nor can you bury your daughters alive like the Arabs of the past.

However, hoping still to get more application for admission in our boarding house, I conclude this.

R.S. HOSSEIN

পত্র ২৬ : মোঃ ইয়াসীনকে

13, European Asylum Lane
Calcutta
10-9-13

Dear Sir,

Your letter of the 30th ultimo reached me in time. I am sorry I could not reply to you earlier.

You will agree with me that anything done in a large scale is done well. I have been advertising in the papers since 18 long month that I would try to keep boarders if I got applications from 15 girls. But the mufussil people kept silence. Then I prepared myself at least for 6 girls and subsequently removed to a bigger house & purchased some furniture such as iron beds (each costing Rs 20/-) & so on. Six months elapsed but no girl excepting one came. Now I repent the waste of the money which has been done in buying furniture. I wonder if my community will be answerable on the day of Judgment for the waste of money I suffered for nothing!

No separate establishment can made for a single girl ; therefore the whole burden of the girl falls on me--which I find too heavy. I am not intended (by God) for bringing up children : had I been so, God would have blessed me with my own.

Oh! the responsibility and trouble one suffers with a single girl! It makes one a regular "কাউয়া হাঁকানি" ! !

However, every rule has its exceptions. At present there is a good friend living with me ; she is willing to look after your daughter. She is just now urging me to ask you to send your girl here.

I hope you won't misunderstand me and would rather pity me. I believe you would be a sincere friend otherwise I won't have written all these things.

Hoping to be excused for any part of my letter which may displease you. There is not a single person, who is unfortunate like me.

More on hearing from you.

Yours truly
R.S. Hossein

পত্র ২৭ : মোঃ ইয়াসীনকে

20-9-13

Dear Sir,

You are keeping silence : perhaps you did not like my last letter. But I expected sympathy from you.

Can you kindly remit me any sum whichever you may have realised by the sale of some books? I enclosed herewith Messrs. S.K. Lahiri & Coys letter for your information. Please return it after perusal. They have been writing scince 5 long years : and I cannot ask them to wait any more.

Hoping this will find you and yours enjoying good health & prosperity.

Yours truly
R.S. Hossein

পত্র ২৮ : মোঃ ইয়াসীনকে

13, European Asylum Lane
Calcutta
30-09-13

Dear Sir,

Many thanks for your very kind letters, received yesterday. These letters worked like some medicine which I required for my soul. Sometimes we yearn to tell somebody of our sorrows and difficulties. I hope you will come to Calcutta soon. I would like to tell you some of my "Ram Kahini".

You need not feel so keenly about me, I do not repent for leaving Bhagalpur, but at times I feel some sort of yearning to see the grave of my husband and the tiny graves of my babies. But never my mind. I am brave enough to bear my cross. For this girls' school, and this school alone I left Bhagalpur. And it makes me unhappy when I see this school does not prosper as I wish.

1.10.13

I could not finish this letter yesterday, so I take up the writing again today.

"Fortune" and "misfortune" are seldom in our hands, and not very often, as you say. Failure of a bank, for instance, can never be under one's control, but at the same time the poor depositor has to suffer the consequence for no

fault of his own. We may very well advise the depositor not to mind his loss! But who is to meet his unavoidable expenses? We cannot expect a hungry person to be satisfied and happy. Can you?

No. I am not unfortunate provided this school works well and I can achieve my literary talents. Only the other day I became very happy when I won the first prize in a rhyme competition. There were some undergraduates & graduates and above all some English lady graduates too among the lady competitors. I enclose herewith a copy of my composition, which......

পত্র ২৯ : মোঃ ইয়াসীনকে

13, European Asylum Lane
Calcutta
11-3-14

Dear Sir,

I got your letter dated the 8th, yesterday evening. I am sorry you did not get my last letter.

I am really very sorry to learn that you are not keeping well. Life is short, what is the use of pining over this & that? Human life does not always find smooth paths, but still I think a gentleman of your position need not be disheartened and dissatisfied with life. After all, life is a very valuable thing and should not be wasted for nothing.

It is a pity you feel so lonely. But I fear your selection was not correct in choosing an ill-fated person like me whose life has been "lost in misadventure", to write to.

Since two months I am suffering from some kind of fever–the fever is not much as the temp never rises above 100 but I have become very weak. The weakness seems almost unbearable. I dread pen and paper ; don't like even reading. I attend school with great difficulty : speaking to the girls tires me so much that many a time I let them have their own ways. I would very much like to write a nice letter to you, but unfortunately I am unable to do so now.

More after hearing from you. Let me assure you that your letters are always welcome : so please write to me as often as you please. It was very kind of you to select me out of your so many friends ; I feel honoured–rather proud of it, though I fear I do not deserve it.

Yours very truly
R.S. Hossein

পত্র ৩০ : মোঃ ইয়াসীনকে

13. European Asylum Lane
Calcutta
9-4-14

My dear Sir,

I am so thankful to your very kind letters dated the 19th & 31st March respectively. Your kind enquiries about me overjoyed me so much that I could not help addressing you as "my dear Sir" and I hope I did no wrong in doing so. You are such a good friend, may God bless you with long life and prosperity. I am so helpless and friendless ; even my nearest relatives are so heartless that they do not hesitate in trying to deprive me of my daily food! In this state of affairs friends like you and Mr Ahmed Ali (the Secretary of our School) are blessings of heaven.

Dear friend! Kindly pray to god to save me from my relatives.

Well, I must stop talking rubbish now. Our prize distribution has been postponed to the end of this month.

I do not get fever now but am dreadfully weak. I look 15 years older than my actual age! I will consult a lady doctor again tomorrow.

Yes, the Prize distribution of Suhrawardi Purdanashini (পর্দ্দানশিনী) Madrassa is over. Have you read all the correspondence and note in the "Mussalman" and "Comrade"?

Yes, God is sufficient for those only, who know how to rely on Him. The difficulty is, that we do not know how to stick to Him. In my opinion I won't care for anything else even if God were not sufficient!

The person about whose death Taifur & Baizid wrote to me was a first...

পত্র ৩১ : মোঃ ইয়াসীনকে

86A, Lr. Circular Road
Calcutta
23-7-15

Dear Sir,

I owe you some apology for not replying to your kind letter earlier. I thought you would be in Calcutta soon & that I would get an opportunity of telling you everything in detail.

I sent a copy of our Annual report & Syllabus for your kind persual. It took a long time & botheration to get the Report printed. I hope one will excuse this unnecessary delay remembering that we are Mohamedans and the job was done by a Mohamedan Press!

I cannot understand why you want to resign your post. Do you find the dept. very wicked? This world as a whole is wicked but the presence of some people like you is necessary to make oasis in this desert.

Hoping this will find you & yours in good health & spirit.

Can Zeenat smile now? She will have to learn many things!

Yours Sincerely
R.S.Hossein

পত্র ৩২ : মুজিবর রহমানকে

SAKHAWAT MEMORIAL GIRLS' SCHOOL

Nov. 30,1917

To

The Editor of The "Mussalman".

Sir,–A certain correspondent by the name Mr. R. Rahman wrote in a letter in your issue of the 25th May last :

"What I regret is that in the capital of a Presidency inhabited by an overwhelming majority of Bengali-speaking people, there is not a single institution for Mussalman girls where education is imparted through the medium of Bengali. If any separate school for Bengali speaking Mussalman girls be needed it ought to be started without delay".

Although it is an axiomatic truth that Bengali is the mother tongue of the people of Bengal, the condition and circumstances of Calcutta are quite different. At least, that is my idea. I have been living in this town for the last seven years at a stretch and during this long period I had occasion to come in contact with good many respectable Mohamedan ladies and I do not remember to have heard Bengali spoken by any of them ; even in case where I found broken and miserable Urdu spoken. I started talking with them in Bengali but they preferred to give their replies in Urdu. Many of these ladies, although natives of Bengal, say that they have forgotten Bengali. They can talk only bad Urdu but still they must talk Urdu!

When this school was started in Waliullah Lane in the beginning of 1911 with only 15 or 16 girls, I used to teach English as an additional subject with a view to popularize the institution with the local people, and I made it a practice to explain the meaning of English words in Bengali. Shortly afterwards requests poured on me from the guardian of pupils to use Urdu as the medium for explaining English.

In the wake of the Sakhawat Memorial School, two or three other girls' school have been established, and in these schools also education is imparted through the medium of Urdu because the guardians prefer Urdu.

For some years past Government is employing a number (I think there are 6 such teachers on Rs. 30/-per month) of peripatetic female, Urdu mistress to teach reading, writing and needlework to the grown up girls and married women of purdanashin Mohamedan families residing in Calcutta. These tutoresses go to the houses of their pupils in "burqa". They also teach Urdu and not Bengali and yet so far I am not aware of any complaint having been made that no provision has been made by Government teaching Bengali-speaking girls in a similar manner. How very difficult it is to secure such Urdu knowing female teachers (and how very incompetent they are, when found) may be ascertained if enquires be made at the office of the Inspectress of Schools, in whose hands the appointment of these teachers lies. And yet teachers competent to teach Bengali--well educated teachers in every way though not belonging to the Islamic faith–are to be found everywhere in Calcutta. Why then does Government teach Urdu instead of Bengali if there is really a demand for the latter? It is because the purdanashin Mohamedan girls in Calcutta are not willing to learn Bengali even without payment of fee.

Mr. R. Rahman has expressed his mortification at the want of a Bengali School for Bengali-speaking Mohamedan girls in this wide city of Calcutta. But why is there such a want and who is responsible for it? Is it not a matter worthy of consideration? It is a law of nature that in course of time a community or country gets what it is in need of. If the Calcutta Moslem public wanted a Bengali school how is it that one such institution has not come into existence during all these years? It is certainly not for the sake of our personal convenience that we have been teaching Urdu instead of Bengali.

The Omniscient alone knows what difficulty and hardship one has to undergo to conduct an Urdu school, and those who practically do the work also know it. The primary difficulty is want of female teachers and one has to hunt out this wide world with a torch in hand to discover a qualified mistress. Secondly, suitable books are not available at any rate in this side of India. How often have I entreated the Inspectresses of schools to include such books in the list of text books prescribed by Government as could be found on this mortal earth. As the result of my seven years insistence such

books are now easily available. Thirdly, Urdu maps, globes and other accessories are not easily available. Besides this, there are a hundred and one other difficulties to contend with. Still we are imparting education in Urdu and can it be said that we are doing so merely in pursuance of a personal whim or sentiment?

Last year, after the annual examinations, when we were making arrangements for holding the Prize Distribution a happy idea struck us, that among other things, a Bengal recitation should be given, and for this I entrusted one of our mistress, Mrs. S.–, a Bengali lady, to get some four girls recite a Bengali poem. She accordingly took up this work, but after a week she came up to me and reported that none of the girls could talk Bengali. I said "How is that? Cannot the Calcutta girls talk Bengali?" She said, "Yes, they can in a manner. Just listen to them and judge for yourself." Shortly after only some of those girls who could talk and understand Bengali were selected. After a week Mrs. S.–again reported that although the girls had got the poem by heart their pronunciation was very bad and quite "foreign". I have heard our European sisters talking Bengali with a peculiar accent, but in the case of our girls I found that although their accent was not the same there was however a tinge of foreign tongue in their Bengali. I then made another selection, and took great pains till the day of the distribution of prizes to coach them but could not make them say "কত পাখী" instead of " কোতো পাখী" and "বণিকের বালা" instead of "বণকের বালা".

At the beginning of the current year I started a Bengali class. Only a couple of girls began to read Bengali only, as their guardian had stipulated this condition. They were aged 5 and 6 years respectively. Eight other girls joined from the Urdu section, their object being to learn Bengali as a language, their other subjects of study (Geography, History etc.) being continued through the medium of Urdu as before. As the number of Bengali reading girls were small, I allotted three days in the week for teaching Bengali. When towards the end of May last the school was closed for the summer and Ramzan Vacation there were only 12 students in the Bengali class. And yet when I read the following in the letter of Mr. R. Rahman "Due provision should be made in the Sakhawat Memorial Girls' School for imparting education through the medium of Bengali" I said to myself "Let it be so".

Immediately on the re-opening of the School after the vacation a whole time Bengali teacher was searched for and a junior vernacular training passed mistress was at once engaged, she was quite ready to teach all the subjects from the first year infant class up to the sixth standard (Middle Vernacular) in the Bengali branch of the school.

Now please mark. In the Sakhawat Memorial Girls' school we have got a Bengali section, a list of Bengali text-book as prescribed by government

and Mrs. J–, a junior training passed female teacher. But what about pupils? "There are your pupil?" she said, "These three girls will read only Bengali throughout the week and those that have got Bengali as optional (সখের বাঙ্গলা) will read only three days in the week". When I went to look at the girls who had taken Bengali as optional I found there were only six instead of ten. I thought to myself however that three little girls who were reading Bengali whole time would, like the three legs of a teapoy support the Bengali branch on their study shoulders. A few days after this I learnt that out of these three girls one left Calcutta for the mofassil with her parents.

At present there are only 5 girls left in the batch who took to learning all subjects in Bengali. I have given special instructions to Mrs. J–to teach this trio everything, even needlework, in Bengali. She said, " I don't know English expressions as used incorrectly such as "Ron, fel" (instead of Run, Fell) and incorrect Hindustan terms." The different kinds of sewing are known as "bakhaya, tepchi, turpai, arma," and these are all Urdu expressions. For want of suitable Bengali equivalents of these terms the trio have been put in the general sewing class with the Urdu speaking girls.

But this does not exhaust the list of our worries in connection with our Bengali branch and its teacher in charge, Mrs. J–. As soon as the bell strikes for the school to begin all teachers attend their respective classes. But Mrs. J–comes to me and says, "What am I to do?" "Why, please go and teach Bengali". "One girl has gone to read the Koran and the other is sewing."

Now it has become a part of my daily routine to invent work for Mrs. J– ; especially when the Bengali reading trio happens to be absent by chance, there is... difficulty for me. Sometimes the teacher would come and... in the middle of the day. "Please what am I to do?"

"Go and teach Bengali, please."

"I have done that."

"Then go and teach writing."

"They have done so."

"Please teach arithmetic in Bengali."

"That has already been done during the first hour."

Mr. R. Rahman further writes in his article, "It is an undeniable fact that more than 99 percent of the Mussalman of Bengal are Bengali speaking, so they have greater claimate that school than the Urdu-Speaking Mussalman...". I quite agree to this. But now I am constrained to ask, where are the writer's "more than 99 percent Bengail-speaking" girl students? From the above, I think, I have been able to make it clear that so far as Calcutta is concerned how misleading it is to say that 99 percent of the Mohamedan inhabitants are Bengali-speaking. It seems to me that even those Bengali-speaking Mohamedan families that are residing in Calcutta, do not quite

appreciate the advantage of school education for their girls. From the experience I have gained during these 7 years I have noticed that Urdu-speaking People are more keen on sending their girls to School and that Bengali-speaking families are less enterprising in this respect.

I have related what success has been attained by our Bengali branch during the past one year. We have at present only three little girls reading Bengali whole time. Now it is my earnest request that Mr. R. Rahman, Mr. Azizur Rahman (belonging to your staff) and other well-wishing gentlemen holding similar views would be good enough to come forward and get students for our Bengali section, for which we are entertaining the services of whole time qualified teacher. Mr. Azizur Rahman himself assured me that he would give us a good many pupils if I were to start a Bengali branch in my school. Now that I have done so, I fail to see why he is unable to act up to his promise. We shall probably be compelled to abolish the Bengali section from next year if we fail to get at least 20 students by the end of this year. It is quite beyond our means to go on paying the salary of the Bengali teacher month after month when there is not sufficient work. We shall be highly obliged to Mr. R. Rahman if he will be good enough to pay us out of his own pocket the amount spent or rather misspent for the Bengali-speaking students. He is quite at liberty to deduct subsequently Rs. 44,352/- per month (i.e., to say Rs. 448x99 times) when he realises the same from Government and also to realise monthly from Government 17,820 being 99 times Rs. 180, the amount which the Government now spend on the salary of the peripatetic female Urdu teachers. Then there will be no want of funds for the spread of Bengali education in Calcutta.

Calcutta (Mrs. R. S. Hossein)
The 20th Nov. 1917.

পত্র ৩৩ : মুজিবর রহমানকে

Dec. 20. 1918

SAKHAWAT MEMORIAL GIRLS' SCHOOL AND BENGALI TEACHING

To
The Editor of The "Mussalman",

Sir, In your issue of 30th November 1917, you were good enough to publish a letter from me with regards to the teaching of Bengali in this school and a similar letter was published in your contemporary

"Mohammadi." I can therefore take it that at any rate the readers of these two Journals were able to know the results of our efforts to impart instruction in Bengali to Mohamedan girls in this city. Now after a lapse of more than a year I am placing before you my further report in connection with the teaching of Bengali in our school.

Before submitting this report it is necessary to mention one or two things. I was anxiously waiting to see that my Bengali speaking brethren, especially that patriotic gentleman Mr. R. Rahman whose incisive pen first ventilated this matter in the columns of your paper, would place mother Bengal–or at any rate the Bengali Mohamedan community–under a heavy debt of gratitude by establishing a Bengali Girls' school during this long one year. But where is that school? To our misfortune, it has not come into existence yet.

Although I stated last year we would be obliged to abolish the Bengali section of our school if sufficient girls were not forthcoming, nevertheless we kept the section continuing for a year more. But at the end of the year I find that its condition is still [same]. It is mostly people from the Mufassil who came to Calcutta and after 6 or 9 months are transferred elsewhere, send their girls to our school to be taught in Bengali. Like meteors these girls blaze forth in the firmament of the school for a few months and then disappear altogether. Now with regard to those girls of the Urdu section who take up Bengali as an optional subject. At first they thought it a good fun to while away some time in the Bengali class trying to pick a smattering of the language: but when at the end of the year they found that they were called upon to give an examination of their knowledge, one by one dropped off.

At present there are only 3.5 pupils in our Bengali section : 3 are whole time Bengali girls and one is a girl from Urdu section learning Bengali as an optional subject. The eldest amongst them being "grown up", will leave school at the end of this session. It is beyond our means to have the responsibility of the Bengali section on our shoulders and to go on paying a mistress month after month for the sake of 2.5 girls only. We have therefore decided to abolish the Bengali branch from the beginning of January next.

R. S. Hossein

Calcutta
The 11th December, 1918.

পত্র ৩৪ : নোটিস

Feb. 7. 1919

ALL INDIA MUSLIM LADIES' CONFERENCE

Notice : The sixth Session of the All-India Muslim Ladies Conference will be held at Calcutta in Mellyville House, 8, Ripon Street, on the 10th, 11th and 12th February 1919 under the presidency of Begum Saheba of Major Khediva Jung Bahadur (Hyderabad). There will be 2 daily sittings i.e. 10 a.m. to 2 p.m. and again from 3 p.m. to 5p.m.Mohamedan ladies coming from the Mofassil with the object of attending the Conference will be provided with board and residence, free of all charges, at 86A, : Lower Circular Road, viz: the premises of Sakhawat Memorial Girls' School. They will be meet at the railway stations on receiving timely intimation, i.e. at least 24 hours before their arrival. They are requested to place themselves in communication with the undersigned.

Local ladies are requested to attend the conference in large numbers. Invitation card can be [...] on application form.

86, Lower Circular Road — (Mrs.) R.S. Hossein
Calcutta
The 27th January, 1919

পত্র ৩৫ : মুজিবর রহমানকে

Feb. 21. 1919

MUSLIMS LADIES' CONFERENCE ENDS IN A FIASCO
REGRETTABLE INTERFERENCE

We have received the following for publication ;–

The following is statement of fact connected with sixth annual session of the All India Muslim Ladies' Conference lately held at Calcutta. As it was at my instance that the Conference was invited to Calcutta I think it proper to let the public know what actually took place and why I and my fellow-workers had to stay away from the meetings.

The Anjuman-i-Khawateen Islam, Calcutta, decided at one of its meetings to invite the All-India-Muslim Ladies' Conference to hold its sixth annual meeting at Calcutta. Accordingly I wrote to the Secretary, Nafis Dulhan Saheba and in reply I was informed that our invitation was accepted. The time at first fixed for holding the Conference during the X'mas week

has to be changed on account of the prevalence of influenza. After some correspondence it was decided to hold the meeting on the 10th, 11th and 12th of this month. A Reception Committee was then formed and Mrs. Abdul Latif Ahmad was elected its President and I its Secretary. As certain things, such as the selection at the site and the construction of the pandal could not be done without the help of the male members of the community a committee of representative Mohamedan gentlemen, interested in the matter, was formed in the middle of January last. At its second meeting held on the 23rd January the Committee carefully considered the question of a site. It was decided that the Conference should be held at a central place, where strict purdah could be ensured and conveyances for the return journey of the ladies attending the meeting could be easily procured. It was also necessary that the site should not be far from the office of the Reception Committee at 86A, Lower Circular Road, so that the work of the erection of the pandal and other arrangements for the meeting could be conveniently supervised. Having regard to these requirements the lawn attached to Mrs. Ariff Bham's house, No. 8, Ripon Street, was selected and Mrs. Bham's consent was obtained with some difficulty the following day. I should not omit to mention that the meeting at which the site was selected was attended by some gentlemen of the Surit community and by Shaikh Mahbub Ali Saheb, whose wife is one of the Vice Presidents of the Anjuman-i-Khawateen Islam. None of these gentlemen raised any objection to the site selected. Besides at the meeting of the Anjuman-i-Khawateen held shortly after the selection of the above mentioned site was duly announced and not even a single member present whispered anything against the proposal or suggested the idea of any objection being raised from any quarter.

2. Six hundred invitation cards were printed and distributed in the 4th and 5th of this month, premises No. 8, Ripon Street being mentioned in it as the place of the meeting. On the 7th instant, two days after the distribution of the cards and three days before the date of the meeting, I received a letter dated the 6th February from Naziri Begum Saheba (Mrs. Sulaiman Arif) in which she expressed her surprise and regret that the Conference was to have been held at Mrs. Bham's place where some of the members of the Anjuman would not attend. In reply I informed her that no other member had expressed unwillingness to attend even if she had any objection on any personal ground as it was communal affair for which Mrs. Bham had made over her lawn to the Reception Committee to the days on which the meetings would be held there.

3. At 2 p.m. on the 7th February (the day on which Naziri Begum Saheba's letter was received) I received a telegram from Nafis Dulhan Saheba that she would arrive at the Howrah Station at 4 p.m. that day, accompanied by the President elect, Mrs. Khedive Jung Saheba, and few other ladies. Immediately I went to the station with some other ladies and received Nafis

Dulhan Sheba and her party at the 1st class Ladies' Waiting Room. When we were conversing with the ladies and their luggage was being put into hackney carriages Mr. G.H. Ariff came to the station and took away the ladies to his residence at Amratala Lane. Some time before they came here it was arranged by correspondence that Nafis Dulhan Saheba and her companions would stay for a day or two with Mr. Ariff who is a great friend of her husband, Moulvi Habibur Rahman Khan Shirwani Saheb and then she would come over to stay with me at the school which was converted into a guest house for the time being and Mrs. Khedive Jung Saheba would be the guest of Lady Shamsul Huda. This being the arrangement previously made I raised no objection to the ladies' going to Mr. Ariff's place. I mention this because several ladies have found fault with me permitting Mr. Ariff to take the ladies to his place.

4. On the 8th instant at about 10 a.m. Nafis Dulhan Saheba with a companion of Mrs. Khedive Jung Saheba and Naziri Begum called upon me at the school and informed me to my utter surprise, that the Conference could not be held at 8th Ripon street as some people had objection to go there. As I was not in a position to say anything without consulting the members of the Reception Committee it was arranged that Nafis Dulhan Saheba and others would again call in the afternoon to discuss the matter. They accordingly called when many members of the Reception Committee previously proposed to hold the Conference elsewhere. As invitation cards had already been issued and there was no time to make other arrangements we could not agree to any change of site. Nafis Dulhan Saheba, however insisted upon holding the conference elsewhere and undertook to make the necessary arrangements herself. The meeting broke up late in the evening without coming to any decision. At the time of leaving, the companion of Mrs. Khedive Jung Saheba and Nafis Dulhan told me that they and their party would come the next day to stay with us at our place. On the 9th instant Mrs. Abdul Latif Ahmad, the Chairman of the Reception Committee, accompanied by me and three other ladies, called at the residence of Mr. G.H. Ariff to fetch Mrs. Khedive Jung Saheba, Nafis Dulhan Saheba and others. We were however coldly received and repeatedly told that they were coming over to our place themselves. When pressed to come with us they gave us to understand that they were going out somewhere and would call in the afternoon. Before they came, there assembled at the school a large number of members of our Anjuman and subsequently the Committee of the gentlemen also met there. On her arrival with her party Nafis Dulhan Saheba informed us that she had already arrange to hold the Conference at the Galstaun Park and had issued notice to this effect. It was pointed out that her action was wholly unconstitutional, that it was the function of the Reception Committee to select a suitable site and to make the necessary arrangements for holding the Conference, that she had no right to hold the

Conference wherever she liked, upsetting all our arrangements for holding the Conference, and outraging our feelings. But all our arguments and entreaties were of no avail, Nafis Dulhan Saheba persisted in doing everything in her own way. The meeting broke up after 11p.m. when Nafis Dulhan Saheba left with her party. It was arranged that our final decision would be communicated to them the next morning. After they left, the matter was again discussed [by] both the ladies and the gentlemen present, at their prespective meetings and it was concluded that it would be most undesirable as well improper to acquiesce in such arbitrary and unconstitutional proceedings. Accordingly on the following morning a telephonic message was sent to Nafis Dulhan Saheba to the effect that the members of the Reception Committee would not co-operate with her in holding the Conference at the Galstaun Park nor would they attend the meeting.

5. From about 11 a.m. on the 10th instant over 200 Mussalman ladies, who unaware of what had happened, had gone to 8 Ripon Street, called upon me and on knowing all the circumstances preferred to return home rather than attend the Conference at the Galstaun Park. In order to give some consolation to the disappointed ladies and to explain the deplorable circumstances which prevented us from joining the conference, to those that were unware of them, it was decided to hold on the 12th instant, under the auspices the local Anjuman-i-Khawateen Islam a general meeting of the Muslim ladies of Calcutta in the pandal at 8, Ripon Street. It was an agreeable surprise to us to find that this meeting was attended by more than six hundred ladies an attendance perhaps not exceed at any meeting of Muslim ladies held anywhere in India. Among others the following ladies were present :

Nawab Begum Baduruddin Haidar, Mrs. Abdul Karim, Umme Salma Begum (mother of Lady Shamsul Huda), Mrs. A.K. Fazlul Huq, Mrs. Abdur Rahim Buksh Ellahi, Mrs. Khan Bahadur Daudur Rahman, Mrs. Khan Bahadur Md. Khorshed, Afsar Jahan Begum (sister of prince Mirza Akram Hossein Bahadur), Mrs. Abdul Latif Ahmed, Mrs. Ahmed Zakaria, Mrs. Shamsul Ulama Velayet Hossain, Mrs. Shamsul Ulama Zulfiqar Ali, Mrs. Shamsul Ulama Kamaluddin Ahmed, Mrs Kabiruddin Ahmed, Mrs. Matloob Ahmed Khan Chaudhury, Mrs. Syed Muhtashem Hossein, Mrs. Abbad, Mrs, Abul Kalam Azad, Mrs. Syeed Abdus Salek, Mrs. Anisuzzaman Khan, Mrs. Syed Fida Ali, Mrs. Musaji Salehji, Mrs Solaiman Salehyi Mrs. Ahmed Duply Mrr. Qasem Ebrahim Salhji Mrs. Ahmed Ibrahim Salehji, Mrs. Ebrahim Salehji, Mrs. Md. Elias and Miss Rabia Elias, Mrs. Saleh Md. Daud, Mrs. Mulla Mahmud, Mrs, Ahman Md. Mamsa, Mrs Osman Jamal, Mrs. Abul Muzaffar Ahmed, Mrs. Hedayet Ali, Mrs. Azizul Kader, Mrs. Nashiruddin Ahmed, Mrs. Baker Shirazi Mrs. Murtaza Shustari, Mrs. Bashir Mirza, Mrs. Aladin Chandoo, Mrs. Abdul Ghaffar, Mrs. Derajuddin

ahmed, Mrs. Abu Imam, Mrs. Mokarem, Mrs. Habib Mohamed, Mrs. Shaikh Abduallah (Aligarh), Fatema Arzoo Begum (Bhopal), Momena Begum (Bulandshahar), Sister of Mr. Zahid Suharawardy, Mrs. Aga Md. Karim, Mrs. Qutbuddin Ahmed, Mrs. Ihtisham Rasul, Mrs. Abdul Aziz Khan (Gaya), Mrs. Mirza Md. Khorasani and Mrs. Mirza Mehdi Khorasani.

Does not this unsurprisingly large attendance of Muslim ladies belonging to the various sections of the community conclusively prove that our arrangements had the hearty approval of the Muslim ladies of Calcutta and there could be no objection to attending any meeting held at Mrs. Bham's Place? In fact the only objection communicated to us either verbally or in writing came from Mrs. Soliman Ariff (Naziri Begum Saheba). This, we have reason to believe was entirely due to family differences between the Ariffs and the Bhams, who were related to one another by marriage. It is very much to be regretted that designing people created so much unpleasantness in order to satisfy some personal grudge. I should not omit to mention that notice of all the meetings of the Anjuman-i-Khawateen at which the arrangements for holding the conference were discussed and settled were sent to Naziri Begum Saheba, who is one of the Vice Presidents of the Anjuman-i-Khawateen but she did not care to attend any of the meetings. Thus she is to blame and not we, for not knowing in time where the conference was to have been held.

At the aforesaid meeting Mrs. Abdul Latif Ahmad occupied the President chair. First of all I read out a statement of what led to our holding aloof from the All-India Muslim Ladies Conference. The business of the meeting was then gone through.

Two resolution were adopted at the meeting, the first expressing regret at the death of Suhrawardiya Begum and sympathising with the bereaved family and the second approving the action of the Reception Committee in not participating at the Galstaun Park meeting. Papers were read by some ladies on female education and cognate subjects.

My attention has been drawn to the reports of the proceedings of the meetings of the Conference held at the Galstaun Park published in some of the newspapers. I regret to have to say that the reports are not correct. From information received from most reliable sources it has been ascertained that the first day's meeting was attended by only 15 ladies, of whom several were non-Mussalman. Such being the case is it not most misleading to state at the "spacious pandal erected for the purpose was packed to the full with ladies resident in Calcutta and those who had come from distant parts of India." The attendance at the second day's meeting according to information received from some of those who were present was 25 and at the third day's meeting only 10, though it has been published in the papers that the latter was attended by about 400 ladies. Mrs. Shaikh Abdullah Saheba of Aligarh and Fatema Arzoo Begum Saheba, sister of Maulana Abul Kalam Azad and

Private Secretary of Her Highness the Begum of Bhopal, corroborated statements made by other eye-witness as regard the attendance at the meetings of the conference. It has been stated that when the President elect arrived at the pandal Mrs. G.H. Ariff in a speech in English, welcomed her on behalf of the ladies of Calcutta. May we enquire whether any new reception committee was formed and when and by whom Mrs. Ariff was authorised to play the part of hostess and welcome the visitors on behalf of the ladies of Calcutta? It has been said that purdah arrangements were perfect. If our information is correct such arrangements are not possible in a place like the Galstaun Park which is overlooked by highly built houses on all sides and inside which there is a three-storied building occupied by different people.

In conclusion I wish to make it clear that there was absolutely no objection on public grounds to hold the Conference at 8 Ripon Street and it is our firm conviction that the unfortunate attitude which Mrs. Khedive Jung and Nafis Dulhan were led to take up was due to the influence and out of difference to the feelings of their hosts, viz. the Ariff family and as outsiders they were not in a position to guage the public feeling. We were the best judges of the local circumstances and when we assured them that there could be no objection in holding the Conference at the place which we had selected and as events have proved the Muslim ladies of Calcutta did not hesitate to attend a meeting in large numbers at that place, they should have been satisfied with our assurance.

Calcutta
The 18th Feb. 1919

(Mrs.) R.S. Hossein
Hon. Secretary
Anjuman-i-Khawateen Isalm

পত্র ৩৬ : মুজিবর রহমানকে

April 4, 1919

The Muslim Ladies' Conference
A Rejoinder

To

The Editor of The "Mussalman".

Sir, — Anent the letter of Nafis Dulhan Saheba published in your last issue I beg to observe that she has taken unnecessary pains to prove that the President Mrs. Khedive Jung Bahadur had nothing whatever to do with the change of the site. In my lengthy letter which was published in the "Mussalman" of the 21st February and a gist of which appeared in some of

the local dailies, nowhere did I say that the aforesaid lady was responsible for the change of site.

It is entirely incorrect on the part of Nafis Dulhan Saheba to assert that she changed the site after due consultation with me and after I had explicitly informed her that I would have no objection whatever to the change or that the ladies of the Reception Committee approved of the new site. As a matter of fact I or the members of the Reception Committee never agreed to the change of site and it is utterly rediculous for her to say that the ladies of the Reception Committee approved of the new site, because on the evening of the 8th February, i.e. only 2 days previous to the Conference, when she broached the subject she could not mention where her "new site" was to be, it was only on the evening of the 9th she sprung a surprise on us by announcing that she had fixed Galstaun Park for the purpose, having already issued earlier in the afternoon, without our knowledge, printed placards to that effect. How absurd her contention is, will be evident from the fact that if it were true that I and the Reception Committee had agreed to the change of site, the necessary announcement would have been made over my signature and is passed (sic!) our comprehension why it should have been at all necessary for the notice to be issued over her signature.

Nafis Dulhan Saheba mentions that "the same thing happened at a previous conference at Delhi, where a man of light and leading like Hazikul Mulk Hakim Md. Ajmal Khan immediately and readily changed the proposed site of the meeting as it did not meet with my approval". Possibly the objections against the site originally chosen at Delhi were valid and hence it had to be changed, but in our case no valid objections were put forward and we were therefore not bound to comply with unreasonable requests merely to please Mr. Golam Hossein Ariff and his family who were the hosts of Nafis Dulhan Saheba and her party. It is also possible that Hakim Ajmal Khan Saheb, who had organised the session at Delhi in February 1917, was too far accommodating and deferential but she cannot expect the same treatment everywhere and others may not care to let her have too much of her own way in all things. I understand similar troubles arose last year also at Lahore but Abroo Begum Saheba, the President of the session, managed to smooth over the difficulties by her tact and firmness. Incidentally it may be noted that the above instances furnish a good example of Nafis Dulhan Saheba's meddlesome habit at the eleventh hours or taking the most charitable view of the matter, they show a singular want of care on her part in not instructing local organisers beforehand what requirmentrs ought to be kept in view selecting a site.

In making the assertion that most of the ladies of our Rception Committee took part in the Galstaun Park conference Nafis Dulhan Saheba

is so wide of the mark that she was able to trot out only 3 names, viz. Mrs. Hakam, Mrs. Wahab and Mrs. Rasul, although the committee consisted of 26 members. It is immaterial to our purpose if a few members deserted our camp and joined the other side. It is natural for some people to be actuated by motives and influenced by considerations other than those of loyalty to one's party or country or nationality. What those motives and considerations were in the case of the aforesid ladies it is not my business to say, but this much I can say that they had their ample reward in having their names prominently mentioned in the proceedings which Nafis Dulhan Saheba published in Tahzibun Niswan and probably in other Urdu periodical, and they will assuredly have the further pleasure of finding their names prominently mentioned in the annual Report of the Conference when it is issued in due course. I should mention that although Mrs. Hakam was a member of the Reception Commitee, the other two ladies were not. Mrs. Wahab was only a volunteer and followed her sister Mrs. Hakam. Mrs. Rasul (who by-the-way is not to mistaken for the wife of the distinguished and public spirited barrister of that name whose recent death we all deplore) was also a volunteer and was not even a member of the local Anjumani-Khawateen at that time. These two probably were the only seceders out of a band about 40 lady volunteers we had.

I cannot understand why Nafis Dulhan Saheba has chosen to fasten on me the charge of holding a "counter conference". In the notice issued by me convening a general meeting of the Muslim ladies of Calcutta under the auspices of the local Anjuman Khawateen on the 12th February I did not call it a conference and in the proceedings published by me in your paper I did not call it conference. In this meeting which, I repeat, was attended by over 600 Muslim ladies, a resolution was adopted approving the action of the Reception Commitee in joining the Galstaun Park meetings and if indeed it was a fact, as stated by Nafis Dulhan that the ladies of the Rception Committee had approved of the new site, it was the right and proper occasion for any member of the Reception Committeee practically all of whom were present there or indeed any one from the audience to have approved the motion. The unanimous adoption of the resolution effectually proves the hollowness of the claim set up by Nafis Dulhan.

Nafis Dulhan Saheba has a fling at me when she says that by holding the "counter-conference". I had evidently to find some way for accounting satisfactorily for the contribution of Rs. 1,500 from Mrs. Abdul Latif Ahmed and other "generous donators" from "many other ladies of Calcutta". As I have said in my previous letter, our arrangements were complete in all respects for which we had already incurred heavy expenditure but everything

was spoiled by the unnecessary interference of Nafis Dulhan at the last moment. I had myself very little handling of the money ; practically the whole of the expenses were incurred through the hands of the male Managing Committee, of which Nawab Nasirul Mamalk Mirza Shujat Ali Baig Khan Bahadur, was the President and Mr. Mowdud Rahman, B.A., Bar-at-Law was the Secretary. A regular account has been kept of the receipts and disbursements together with vouchers in support of the same and any one is welcome to inspect the same at my office. No one regrets more than myself–it was I who by unremitting labour raised the necessary funds that all this money should have gone for nothing, and I have no hesitation in laying the responsibility for this fearful wastage of public money on the shoulders of Nafis Dulhan.

In conclusion I would reiterate my conviction that all this trouble was due to the fact that Nafis Dulhan Saheba allowed herself to be unduly influnced by her old friends and hosts, Mr. Golam Hossein Ariff and his family, who are not in friendly terms with the Bham farmily at whose place we had arranged to hold the Conference. It is highly to be regretted that the claims of friendship and hospitality should have out-weighed her sense of public duty. She has more than requitted the hospitality she and her [torn] received, by the lavish praise she has bestowed on her hosts in the columns of the Urdu papers in which she has published the detailed proceedings of the Galstaun Park meeting.

Calcutta
The Ist April, 1919

(Mrs.) R.S. Hossein
Hony. Secretary
Anjuman-i-Khawateen Islam

পত্র ৩৭ : মোঃ ইয়াসীনকে

Sakhawat Memorial Girls' School
86A, Lower Circular Road
Calcutta, the 14th septr. 1919.

Dear Sir,

I am in receipt of your kind letter dated the 7th inst. I am extremely sorry that I could not send you a letter of consolation on receipt of your last letter received in April. I am ashamed of myself.

I think your daughter Saeeda is about 15 now. How fast the time passes! It was only the other day you were trying to put her in this school!

As I do not understand any refined riddle of religion I had better not venture that matter. My late husband advised me not to discuss religion with anybody.

I had been very ill lately. During summer vacation, I went to Ranchi for change. I am still ailing but strong enough to go on with my daily routine work.

The school is not flourishing to my full satisfaction. The guardians of the students do not co-operate fully with me.

With blessing to your children-poor motherless children!

Yours Sincerely
R.S.Hossein

পত্র ৩৮ : মোঃ ইয়াসীনকে

(First 2 pages missing)

So I did not miss my former teacher. This is all I know about her.

Thank God, our Prize distribution is successfully over. You will certainly get a copy of the report in due course.

Your letter is neither longer nor tiring. I wish it was a little longer.

My feeling towards my relations are very bitter. Fancy they cheated & robbed me when I trusted them blindly. I am thankful that I have no children. I can't forget this amount of money & hope God will not forgive them! They know very well my financial condition, they know too that I am unable to earn a single pice! If God be true, I shall get back the money.

With kindest regards.

Very sincerely yours
R.S Hossein

পত্র ৩৯ : মৌলভী হামিদুর রহমানকে

Sakhawat Memorial Girls' School
86-A, Lower Circular Road,
Calcutta
The 26th Jan-1924

Sir,

I am in receipt of your letter dated the 22nd instant beg to offer my best thanks to your committee for the honour they have bestowed on me by selecting my humble self to preside at the prize distribution of your Maktab. But at the same time I cannot help saying that I cannot congratulate you on your choice ; you should have chosen some lady of high social position.

Moulvi Abul Hashem Khan Chowdhury is a distant relation of mine and I know his wife. I shall certainly be very glad to meet the ladies of his family again.

I would request you to kindly fix the date of your prize function early in March next and inform me accordingly. I may spend a couple of days there if necessary.

Thanking you again.

Yours truly,
Sd/-R.S. Hossein

To
Maulvi Hamidur Rahman Sahib,
Suri.

পত্র ৪০ : মুজিবর রহমানকে

Monday,

The Mussalman, 20th Anniversary Number, December 6, 1926

Mrs. R.S. Hossein's Letter

It is a wellknown fact that no nation can rise without the help of its literature and without newspaper no literature can thrive. Maulvi Mujibur Rahman Saheb realised this truth in his heart of hearts long ago and started "The Mussalman" at a time when there was hardly any paper for Muslim interests in Bengal and when Bengal itself was in chaos and confusion about the "Partition of Bengal," just like our revered Prophet (on whom be peace), who was born in the dark ages of Arabia to save the human beings at large.

I am a constant reader of "The Mussalman" since the very day of its birth and I am glad to notice that it is going on harmoniously on the same path serving our community, without caring for favour or fearing frowns. The path chosen by "The Mussalman" is not smooth and strewn with flowers, but full of thorns and rough stumbling blocks. Anybody who has some experience about public work, knows very well how difficult it is to serve one's country specially when the interests of the people clash with those of their Government's. For a newspaper the task is still harder as it has to face various unfavourable circumstances including uncharitable criticism. Thank God, inspite of all sorts of trouble, "The Mussalman" has victoriously completed the 20th year of its life. I remember to have said the very thing (that "The Mussalman" neither cares for favour nor fears frowns etc.) 20 years ago ; and I believe the old file of the paper may still contain the issue in which my letter was published.

Being an old reader I have every right to congratulate "The Mussalman" most heartily and I hope its worthy editor will be pleased to accept the

same. May God grant Maulvi Mujibar Rahman Saheb long life and prosperity to perform the Diamond jubilee of this paper. Amen.

While appreciating most sincerely its service, of 20 long years I must also complain that "The Mussalman" in doing its duty by half , i.e. while serving our ship-wrecked community most earnestly it is neglecting the feminine portion of the society. Specially, by God's grace the Sakhawat Memorial Girls' School and the Anjuman-i-Islam Calcutta (started by my humble self ten years ago) have been able to change the mentality of Calcutta a great deal, though indirectly (and why not also directly?) and silently. The Muslim population of Calcutta may or may not admit it but "Fact is Fact". Sixteen years ago when the Sakhawat Memorial Girls' School was started there was not a single Muslim girls school in this City of Palaces. In 1914 when we were having the 3rd function of annual Prize distribution of this School, Miss L. Brock, the then Inspectress of Schools for Presidency and Burdwan Divisions, said in her speech that four years ago (i.e.in 1909) she had tried to start a school for Muslim Girls' with the help of (the late) Mr. Justice Sharfuddin but failed. But now the same Calcutta can boast of half-a-dozen Muslim girls schools aided by Government, one Muslim Female Training school, entirely financed by Government, and about one dozen Muslim girls schools started by the Corporation of Calcutta. I may be pardoned when I feel proud to say that at least four of there schools Head Mistresses are the ex-pupils of the Sakhawat Memorial Girls School, who are managing those schools satisfactorily. So you see field is now quite ready for taking up the cause of female re-generation.

I now conclude, congratulating the editor of "The Mussalman" again.

Calcutta. (Mrs) R.S. Hossain

পত্র ৪১ : মুজিবর রহমানকে

The Mussalman

Vol. XXV. T.W. Edition Vol VII. Calcutta Thursday, March 5 1931.

The Mussalman, 8 Dec. 1927 Calcutta

Welcome

I am exceedingly glad to see "The Mussalman" has completed the 21st year of it's existence by fighting out it's way through many troubles and difficulties. I heartily welcome the anniversary number of this paper. While our community is unable to maintain even a Bengalee paper properly conducted, it is gratifying to see an English paper, conducted by Muslims, "still going on strong" for long twenty one years.

Such a paper is extremely necessary for one community. I pray for it's long life and prosperity and hope to see it becoming a daily paper by next year. I take this opportunity to congratulate Moulavi Mujibur Rahman mos sincerely on his success, and thank him for his self-sacrificing services.

Sakhawat Memorial (Mrs.) R.S. Hossein
Girls' School, Calcutta
19.11.27

পত্র ৪২ : খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদকে

Sakhawat Memorial Girls' School
86/A Lower Circular Road
Calcutta, the 9.8.1931

Dear Khan Bahadur,

I owe you a thousand apologies for not replying to your kind letter so long, I had another attack of fever & am very very weak. I have not finished with the injection doctors & dentist yet. The meeting could not be held before the 26th July. Yes, Mr. Waliul Islam is working as secretary since 5th inst.

We expect the new Hd. mistress from the 17th inst. next of course Dq.

Sir G. told me about your visit when I phoned him. Allow me to wish you every success in life. May Allah grant you long & prosperous life. Amen.

I don't think you proved a failure as secy. on the other hand you showed me some path as how to proceed with the "beacon". My only complaint against the former "secres" was that they were pessimist & too cautious while my mind wanted to make a dashing jump! Had they not hold me back tightly perhaps the School could become a High school long ago & also could get a building by this time! I wanted to fight with the object "বাঁচিলে হইব গাজী, মরিলে শহীদ" — both the results are same to me! But the secretaries always wanted to be গাজী! Now I have a mind to proceed with the Note, which you prepared so kindly. If we can use this note properly, it will benefit, not only our school, but the whole Muslim community including

"M.a.o." & Suhrawerdy girls schools. But I do not know if Hazrat Azrail will allow me to carry on my work further!

Let me copy a resolution passed at the last meetings :—

Resolved that the resignation of Khan Bahadur Tasadduq Ahmed as secretary & member of the managing committee of the school be accepted with effect from 16th July 1931 and that thanks of the committee be conveyed to him for his past services to the school.

My sister sends her best salam to you & thanks you for your kind words about her.

I hope you will not forget to see me whenever you happen to come down to Calcutta.

I think I have made pretty compensation for my long silence.

I shall try to write to you again by the end of this month, on hearing from you

With kindest regards,

Yours sincerely,
Roqyiah Khatun

পরিশেষ

তথ্যপঞ্জি

১৮৮০ • জন্ম

বাবা : জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের (মৃত্যু ১৯১৩)।

মা : রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী (মৃত্যু ১৯১২)।

প্রথম ভাই : মোহাম্মদ ইব্রাহীম আবুল আসাদ সাবের।

দ্বিতীয় ভাই : খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাবের (মৃত্যু ১৯২৪)।

তৃতীয় ভাই : মোহাম্মদ ইসরাইল আবু হাফস সাবের (ছোটবেলায় মৃত)।

প্রথম বোন : করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫–১৯২৬)।

দ্বিতীয় বোন : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০–১৯৩২)।

তৃতীয় বোন : হোমায়রা তোফাজ্জল হোসেন (১৮৮৩–১৯৬২)।

পারিবারিক ভাষা : উর্দু

সাহিত্যের ভাষা : বাংলা ও ইংরেজী

অন্যান্য ভাষাজ্ঞান : আরবী ও ফারসী

১৮৮৫ • বড় বোন করিমুন্নেসার বাড়িতে ইয়োরোপিয়ান গভর্নেসের কাছে ইংরেজী অক্ষর পরিচয়।

১৮৯৬ • বিবাহ

স্বামী : খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন, বি.এ. এম. আর. এ.সি. (১৮৫৮–১৯০৯)।

বিহারের ভাগলপুরের অধিবাসী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন বিয়ের সময় উড়িষ্যার কনিকা স্টেটের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিযুক্ত ম্যানেজার। এ বিয়েতে দু'টি কন্যাসন্তানের জন্ম। একজন চার মাস বয়সে ও অন্যজন পাঁচ মাস বয়সে লোকান্তরিত।

১৮৯৯ • সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন ভাগলপুরের কমিশনারের পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট।

১৯০২ • সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ।

প্রথম রচনা : পিপাসা (মহরম)

পত্রিকার নাম : 'নবপ্রভা' (চৈত্র ও বৈশাখ ১৩০৮–১৩০৯ যুগ্ম সংখ্যা)
সম্পাদক : হরেন্দ্রলাল রায় ও জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

১৯০৪ • দার্জিলিং ভ্রমণ।

• মতিচূর (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত (১৫ই ডিসেম্বর)।
প্রকাশক : ম্যানেজার, নবনূর, কড়েয়া, কলকাতা (১৩১১)।

১৯০৫ • প্রথম ইংরেজি রচনা 'Sultana's Dream'।
পত্রিকার নাম : 'Indian Ladies Magazine' (Madras)
সম্পাদক : কমলা সাতথিয়া নাথান ও সরোজিনী নাইডু।

১৯০৭ • 'মতিচূর' (প্রথম খণ্ড) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত।
প্রকাশক : শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা।

১৯০৮ • 'Saltana's Dream' পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
প্রকাশক : S.K. Lahiri & Co.
54 College Street, Calcutta।

১৯০৯ • সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের পরলোক গমন—৩রা মে, কলকাতা। ভাগলপুরে সমাহিত।

• ভাগলপুরের তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ শাহ আবদুল মালেকের সরকারী বাসভবন 'গোলকুঠি'তে ১লা অক্টোবর সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠা পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে। সৈয়দ শাহ আবদুল মালেকের চার মেয়ে স্কুলের ছাত্রী— ১. সৈয়দা কানিজ ফাতেমা ২. সৈয়দা আমাতুজ জোহরা ৩. সৈয়দা হাসিনা খাতুন (পরবর্তীকালে হাসিনা মোর্শেদ) ৪. সৈয়দা আহসানা খাতুন।

• এইসব ছাত্রী কর্তৃক রোকেয়াকে 'স্কুল কি ফুপ্পি' বলে সম্বোধন। স্বামীর মৃত্যুর পর ভাগলপুরের কমিশনারের ব্যবস্থায় সৈয়দ শাহ মালেকের বাড়িতে অবস্থান।

• পঞ্চম ছাত্রীর পরিচয় অজ্ঞাত।

১৯১০ • ছোটবোন হোমায়রা তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে আমীর হোসেন চৌধুরীর জন্মগ্রহণ—সেপ্টেম্বর।

• ভাগলপুর ত্যাগ করে কলকাতায় এসে সৈয়দ শাহ আবদুল মালেকের ছোট ভাই সৈয়দ আবদুস সালেকের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ—৩রা ডিসেম্বর।

১৯১১ • দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৬ই মার্চ কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা আটজন ছাত্রী নিয়ে ১৩নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের ভাড়া বাড়িতে।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানকারী কলকাতার প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়। বাড়ি ভাড়া করার পর এ বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ।

- ১৮২ হ্যারিসন রোডের একজন ব্যবসায়ী আবদুল বারী কর্তৃক ছাত্রীদের যাতায়াতের গাড়ির জন্য একটি ঘোড়া অনুদান প্রদান।
- ছাত্রী সংখ্যা — ৮।

ছাত্রীদের পরিচয়

ছাত্রীদের নাম	বাবার নাম ও পরিচয়
১. আখতারুন্নেসা	সৈয়দ আহমদ আলী (স্কুলের সেক্রেটারী)
২. জোহরা	মওলানা মোহাম্মদ আলী (বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ)
৩. মোনা	
৪. রাজিয়া খাতুন	আবদুর রব (স্কুল পরিচাচলনা কমিটির সদস্য)
৫. জানি বেগম	ড. ওহাব
৬. সৈয়দা কানিজ ফাতেমা	সৈয়দ আবদুস সালেক
৭. সৈয়দা সাকিনা	

(শেষোক্ত দুজন কর্তৃক রোকেয়াকে 'স্কুল কি ফুপ্পি' বলে সম্বোধন)

৮. অষ্টম ছাত্রীর পরিচয় অজ্ঞাত।

- ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের ১৪ নম্বর রয়েড স্ট্রিটের বাড়িতে এক মিটিং–এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মৌলভী সৈয়দ আহমদ আলী সেক্রেটারী নিযুক্ত। স্কুলের নামকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ—২রা এপ্রিল।
- বার্মা ব্যাংক ফেল হয়ে স্কুলের ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা লোকসান—নভেম্বর।
- বিখ্যাত রাজনীতিবিদ দাদা ভাই নৌরোজী প্রতিষ্ঠিত ও বোম্বে থেকে প্রকাশিত 'Weekly Indian Spectator' ও 'Monthly Voice of Indian'র সম্পাদক

বোম্বের বাহরামজি মারওয়ানজি মালাবারী ও কলকাতার নওয়াব বদরুদ্দিন হায়দারের কাছ থেকে স্কুলের জন্য আর্থিক সাহায্য লাভ। জনসাধারণের তরফ থেকে প্রথম সাহায্য লাভ।

- স্কুল পরিচালনা কমিটির সকল সদস্য কর্তৃক আগস্ট থেকে ১৯১৪ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত মাসিক চাঁদা দিয়ে স্কুলকে সাহায্য প্রদান।
- স্যার আব্দুল করিম গজনভীর মাসিক দশ টাকা করে সাহায্য প্রদান (এক বছর পর্যন্ত)—নভেম্বর।

১৯১২
- মা রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানীর পরলোক গমন—কলকাতা।
- ৪ঠা নভেম্বর মেডিক্যাল কলেজ রোডে Turkish Relief Fund-এর সভায় বক্তৃতা প্রদান—১৬ই ফেব্রুয়ারী।
- হিজ হাইনেস দি আগা খানের ৩০০.০০ (তিনশো) টাকা ব্যক্তিগত সাহায্য প্রদান বি. এম. মালাবারির মাধ্যমে।
- বাহরামজি মারোয়ানজি মালাবারির লেডি হার্ডিঞ্জ মারফত আবার ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা প্রেরণ।
- প্রথম মাসিক সরকারী সাহায্য ৭১.০০ (একাত্তর) টাকা বরাদ্দ—১লা এপ্রিল ছাত্রীসংখ্যা—২৭।

১৯১৩
- বাবা জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবেরের পরলোকগমন। পায়রাবন্দ, রংপুর, ৩১শে বৈশাখ, ১৩২০।
- ১৩নং ইয়োরোপিয়ান এ্যাসাইলাম লেনে স্কুল স্থানান্তরিত—৯ই মে।
- ইংরেজি কবিতা রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে রূপার শামাদান (মোমবাতি-দান) পুরস্কার লাভ—সেপ্টেম্বর।
- ছাত্রীদের স্কুলে আনা নেওয়া করার জন্য ঘোড়ার গাড়ির অর্ধেক দাম ৭৫০.০০ (সাড়ে সাতশ) টাকা সরকারী সাহায্য লাভ।
- ছাত্রীসংখ্যা-৩০।

১৯১৪
- ছোট লাট পত্নী লেডী কারমাইকেলের ৩০০.০০ (তিনশো) টাকা বিশেষ সাহায্য প্রদান।
- বর্ধিত মাসিক সরকারী সাহায্য ৪৪৮.০০ (চারশো আটচল্লিশ) টাকা।
- ছাত্রী সংখ্যা-৩৯**

১৯১৫
- পঞ্চম শ্রেণী শুরু করার পর স্কুল উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ে উন্নীত।
- ৮৬/এ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে স্কুল স্থানান্তরিত—২রা ফেব্রুয়ারী।

- দু'টি ঘোড়াটানা বাসগাড়ি ক্রয়—প্রথমটা বছরের শুরুতে, দ্বিতীয়টা জুন মাসে।
- ১৯১৩ সনে প্রাপ্ত সরকারী সাহায্য ৭৫০.০০ (সাড়ে সাতশ) টাকা প্রথম গাড়ির জন্য ব্যয়িত।
- ছাত্রী–সংখ্যা–৮৪

১৯১৬
- তৃতীয় গোড়াটানা বাসগাড়ি ক্রয়। মৌলভী আবদুল করিমের স্ত্রী আয়শা খাতুনের অর্ধেক দাম ৪৫০.০০ (সাড়ে চারশত) টাকা প্রদান–২১শে ফেব্রুয়ারী।
- আলীগড় বালিকা বিদ্যালয়ের নব নির্মিত আবাসিক ভবনের বর্নাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১৯১৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আলীগড়ে আঞ্জুমান–এ–খাওয়াতীনে ইসলামের (All India Muslim Ladis Conference) প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণীত হয়ে আয়েশা খাতুনকে সভানেত্রী করে এবং নিজে সাধারণ সম্পাদিকা হয়ে কলকাতায় 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' নামের মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা। এ সংগঠন "নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি" অথবা Culcutta Mohamedan Ladies Association নামেও পরিচিত। (তবে আলীগরের মাস সম্পর্ক রহিত)
- কলিকাতা বালিকা বৃত্তি পরীক্ষায় ছাত্রীদের প্রথম অংশগ্রহণ ও সাবিরা খাতুনের বৃত্তিলাভ।
- দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সরোজিনী নাইডুর পত্র প্রেরণ—১৬ই সেপ্টেম্বর।
- ছাত্রী সংখ্যা–১০৫

১৯১৭
- বছরের শুরুতে বাংলা ক্লাসের (শাখার) প্রবর্তন।
- বড়লাট পত্নী লেডি চেমসফোর্ডের স্কুল পরিদর্শন—৯ই জানুয়ারী।
- লেডী চেমসফোর্ডের সহায়তায় ষষ্ঠ শ্রেণী আরম্ভ করে মধ্য ইংরেজি স্কুলে পরিণত।
- ছোটলাট–পত্নী লেডী কারমাইকেলের মেধাবী ছাত্রীদের মধ্যে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ—১৫ই মার্চ।
- কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে বিখ্যাত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মা বি আম্মা বেগম ও এ্যানি বেশান্তের আগমন উপলক্ষ্যে গঠিত সেচ্ছাসেবিকা বাহিনীতে রোকেয়ার প্রচেষ্টায় মুসলিম মেয়েদের অংশগ্রহণ।
- আয়েশা খাতুনের সভানেত্রীত্বে ৯০ জন পর্দানশীন মুসলিম মহিলা সদস্যদের মধ্যে ৫০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামে'র প্রথম বার্ষিক সভা ৮৬/এ, লোয়ার সার্কুলার রোডে অনুষ্ঠিত—১৫ই এপ্রিল।

- ছাত্রী সংখ্যা–১০৭

১৯১৮ • লেডী শামসুল হুদার সভানেত্রীত্বে ৮৬ জন পর্দানশীল মুসলিম মহিলা সদস্যদের মধ্যে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে আনজুমান–ই–খাওয়াতীনে ইসলামের দ্বিতীয় বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত—৭ই জুন

- 'সওগাত' পত্রিকার প্রকাশনাকে অভিনন্দন জানিয়ে 'সওগাত' নামের কবিতা রচনা—নভেম্বর।
- চতুর্থ ঘোড়াটানা বাসগাড়ি ক্রয়। মূল্যের ১১০৮.০০ (এগারশ আট) টাকার মধ্যে ৫৫০.০০ (সাড়ে পাঁচশ) টাকা সরকারী সাহায্য লাভ।
- হোমায়রা তোফাজ্জল হোসেনের মেয়ে নূর ওম্মেদের জন্ম—(১৫ই ডিসেম্বর)।
- ছাত্রী সংখ্যা–১১৪

১৯১৯ • ছাত্রীর অভাবে বাংলা শাখা বন্ধ ঘোষণা—জানুয়ারী।

- রোকেয়ার আগ্রহে All India Muslim Ladies Conference এর ৬ষ্ঠ অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হবার জন্য প্রতিনিধি বা কলিকাতায় এলে দুই গ্রুপের পারিবারিক সমস্যার কারণে যথারীতি হতে পারেনি—ফেব্রুয়ারী
- প্রতি বছর স্কুলের বার্ষিক রিপোর্টে মুসলিম মহিলা শিক্ষামন্ত্রীর উপযুক্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে বছরের শেষভাগে সরকার কর্তৃক মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল স্থাপন।
- ছাত্রী সংখ্যা–১২৩

১৯২০ • কলকাতা টাউনহলে স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে সভানেত্রী নির্বাচিত ও 'শিশু পালন' নামের প্রবন্ধ পাঠ—৬ই এপ্রিল। পরে 'বঙ্গীয় মুসলমান–সাহিত্য–পত্রিকা'য় প্রকাশিত—কার্তিক, ১৩২৭।

- শামসুন নাহারকে স্বত: প্রণোদিত হয়ে পত্র প্রেরণ।
- ছাত্রী সংখ্যা ১২৬

১৯২১ • প্রাথমিক চিকিৎসাদান ক্লাসের জন্য মাসিক ১৫.০০ (পনেরো) টাকা বাড়তি সরকারী সাহায্য লাভ —ফেব্রুয়ারী।

- দ্বিতীয় ভাই ও ঢাকার অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট হাফেজ খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাবেরের দ্বিতীয় মেয়ে আজিজুন্নেসা উম্মে সাকিনা সুফিয়া খাতুনের বিয়ে উপলক্ষে ঢাকা আগমন ও বেশ কিছুদিন ঢাকায় অবস্থান। পুরনো ঢাকায় অবস্থিত দ্বিতীয় ভ্রাতৃবধুর সে বাড়ি আজো বর্তমান।
- ছাত্রী সংখ্যা–১২১

১৯২২ • মতিচূর (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত, ১০ই মার্চ। প্রকাশক : গ্রন্থকর্ত্রী স্বয়ং।

- সমাজের পতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনকল্পে ডাঃ লুৎফর রহমান প্রতিষ্ঠিত 'নারীতীর্থে'র সভানেত্রী।
- প্রাথমিক চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা সরকারী সাহায্য লাভ।
- ছাত্র সংখ্যা ১১৪

১৯২৩
- কলকাতা মিউনিসিপাল নির্বাচনে নারীর ভোটাধিকার প্রাপ্তিতে উৎসাহিত ও অনুপ্রেরিত হয়ে দেশের সকল নির্বাচনে নারীর ভোটাধিকারের দাবীতে কামিনী রায়ের নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড লিটনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারী প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে যোগদান
- আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ১৫০.০০ (দেড়শ) টাকা সরকারী সাহায্য লাভ।
- ছাত্রী সংখ্যা–১২২

১৯২৪
- 'পদ্মরাগ' উপন্যাস প্রকাশিত। প্রকাশক : গ্রন্থকর্ত্রী স্বয়ং।
- দ্বিতীয় ভাই হাফেজ খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাহেবের পরলোক গমন—ঢাকা।
- মজু ও সবু ডাক নামের নাত্‌নীদের (মৃত সপত্নী কন্যার দুই মেয়ে) বিয়ে উপলক্ষে বিহারের আরায় গমন।
- আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ১০০.০০ (একশ) টাকা সরকারী সাহায্য লাভ।
- শিউড়ি মুসলিম বালিকা মক্তবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভানেত্রী।
- ছাত্রী সংখ্যা–১২০

১৯২৫
- বর্দ্ধিত মাসিক সরকারী সাহায্য ৫৫০.০০ সাড়ে পাঁচশ) টাকা লাভ—ফেব্রুয়ারী।
- পঞ্চম ঘোড়াটানা বাসগাড়ি ক্রয়।
- লাইব্রেরীর জন্য ৭০০.০০ (সাতশ) টাকা সরকারী সাহায্য লাভ।
- আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী (পঞ্চাশ বছর পূর্তি) উপলক্ষে আয়োজিত 'অল ইন্ডিয়া মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে 'আলিগড় মহিলা সমিতি'র আমন্ত্রণে তিনদিনের জন্য আলিগড়ে গমন এবং বোরকা ঢাকা অবস্থায় বক্তৃতা প্রদান করে প্রশংসা লাভ—২৬–২৮শে ডিসেম্বর।
- কোলকাতায় শামসুন নাহারের রোকেয়াকে সামনা–সামনি দেখার সুযোগ লাভ।
- ছাত্রী সংখ্যা ১০৪

১৯২৬
- বড় বোন করিমুন্নেসার পরলোকগমন—৬ই সেপ্টেম্বর।
- প্রথম মোটর বাস ক্রয় এবং এ বাবদ ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা সরকারী সাহায্য লাভ।

- ৪০ জন ছাত্রী পাওয়া গেলে বাংলা শাখা আবার প্রবর্তন করার ইচ্ছা প্রকাশ।
- ছাত্রী সংখ্যা–১০৯

১৯২৭
- ৭ জন ছাত্রী নিয়ে 4th class অর্থাৎ এখনকার ৭ম শ্রেণী শুরু করে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের সূচনা।
- বাংলা ক্লাস (শাখা) পুনঃ প্রবর্তন
- কিণ্ডারগার্টেন শাখার প্রবর্তন।
- ইয়াং ক্রিশ্চিয়ান উইমেনস এসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত প্রথম বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে The Scope of the Curriculum of a Primary School নামের প্রবন্ধ পাঠ—১৬ই ফেব্রুয়ারী।
- চতুর্থ দিবসের অধিবেশনের সভানেত্রী হিসেবে ভাষণদান—১৯ই ফেব্রুয়ারী। বিভিন্ন নামে এ ভাষণ সাপ্তাহিক 'সত্যাগ্রহী', 'সাহিত্যিক', 'সওগাত' 'আহমদী' ও 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত। ভাষণের অংশবিশেষ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত (চৈত্র, ১৩৩৩)।
- প্রথম মুসলমান মহিলা শিক্ষক এম. ফাতেমা খাতুন এর যোগদান।
- ছাত্রী সংখ্যা–১২৮

১৯২৮
- বর্ধিত মাসিক সরকারী সাহায্য ৭৫০.০০ (সাড়ে সাত শত) টাকা লাভ–মার্চ।
- দ্বিতীয় মোটর বাস ক্রয়। এ বাবদ ৪৭২৫.০০ (চার হাজার সাতশ পঁচিশ) টাকা সরকারী সাহায্য লাভ।
- আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৭৫০.০০ (সাড়ে সাতশ) টাকা সরকারী সাহায্য লাভ।
- লাইব্রেরির জন্য ৫০০.০০ (পাঁচশ) টাকা সরকারী সাহায্য লাভ।
- ছাত্রী সংখ্যা–১৪৯ (১২ জন আবাসিক)।

১৯২৯
- ৩৬, বুকিং স্ট্রীটের অধিবাসী এস. এম. এ. হক কর্তৃক রংপুর বাসীদের পক্ষ থেকে উৎসাহ সূচক পত্র প্রেরণ।
- ছাত্রী সংখ্যা–১৩৩।

১৯৩০
- ছোট লাট পত্নী লেডি জ্যাকসনের ২৫০.০০ (আড়াইশ) টাকা সাহায্য প্রদান।
- 1st Class অর্থাৎ এখনকার দশম শ্রেণী পর্যন্ত শুরু করে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল পূর্ণ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত।
- আহমদর রহমান রচিত "নারী তীর্থ" কবিতার বই-এর ভূমিকা রচনা—নভেম্বর।
- বাংলার প্রথম মুসলমান পাইলট মোরাদের সঙ্গে আকাশ ভ্রমণ—২রা ডিসেম্বর।

- ছাত্রী সংখ্যা–১২৩।

১৯৩১ ● পঞ্চম বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে 'Educational Ideals for the Modernd Indian Girls' প্রবন্ধ পাঠ—১৯শে ফেব্রুয়ারী। পরে 'দি মুসলমান' পত্রিকায় প্রকাশিত—৫ই মার্চ, ১৯৩১।

- স্কুল পরিচালনা কমিটির অধিবেশনে সেক্রেটারী খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদ কর্তৃক রোকেয়া রচিত 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' ভাষণ পাঠ—৮ই মার্চ। পরে 'মোহাম্মদীতে প্রকাশিত—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।
- রংপুর নিবাসী কয়েকজন দানশীল কর্তৃক স্কুলের ইমারত নির্মাণ তহবিলে অর্থদান।
- তিনজন মুসলমান মেয়ের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ।
- ছোটবোন হোমায়রা তোফাজ্জল হোসেনের মেয়ে নূর উম্মেদের অকালমৃত্যু—১৮ই এপ্রিল।
- মর্মাহত রোকেয়া কর্তৃক পয়ারছন্দে চৌপদী শোকগাথা রচনা—

  'বলে গেল নূর উম্মেদ যাবার বেলায়
  ভুল করে এসেছিনু এ মর ধরায়
  ভাঙ্গিয়াছে ভুল আজি দাও মা বিদায়
  ক্ষম মম ভ্রম আজি যে আছ যেথায়।"

- সরকারী চাকরির বদলিজনিত কারণে খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদের সেক্রেটারী হিসেবে পদত্যাগ—৭ই জুলাই।
- নতুন সেক্রেটারী ওয়ালিউল ইসলামের যোগদান—৫ই আগস্ট।
- 'অবরোধবাসিনী' প্রকাশিত—২৮শে অক্টোবর। প্রকাশক : মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ৯১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

১৯৩২ ● আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের সভানেত্রী নির্বাচিত—২১শে মে

- মুসলিম অমুসলিম গন্যমান্য প্রায় তিনশত মহিলার উপস্থিতিতে রেজিস্ট্রেশন বিভাগের ইনসপেক্টর জেনারেল মৌলভী শামসুদ্দিন আহমদের বাসায় অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের মহিলা সভায় সভানেত্রীত্ব প্রদান। মিস জাহানারা চৌধুরীর উদ্বোধনী সঙ্গীত ও কাজী কামরুনাহার চৌধুরীর কাজী নজরুল ইসলামের মহররম কবিতা আবৃতির পর সভার কাজ আরম্ভ। সভাশেষে মিস জাহানারা চৌধুরী কর্তৃক এস্রাজ, মিস কল্যানী দাস কর্তৃক প্রাচ্য নৃত্যকলা ও মিস তরুপ্রভা ঘোষ কর্তৃক বাংলা গান পরিবেশিত—২১শে মে।
- ১৬২ নং লেয়ার সার্কুলার রোডে স্কুল স্থানান্তরিত—জুন

- ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্রীদের পাশের হার—৭৫%.
- লেডী গজনভীর সভানেত্রীতে হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান ভারতীয় ইয়োরোপীয় প্রায় তিনশত গণ্যমান্য মহিলার উপস্থিতিতে ডিষ্টিংশনসহ বি এ. পাশ উপলক্ষে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের পক্ষ থেকে শামসুন নাহারকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন ও তাঁর কৃতিত্বকে কুতুব মিনারের সঙ্গে তুলনা প্রদান—৩রা জুলাই।
- শেষ রচনা 'নারীর অধিকার'—৮ই ডিসেম্বর, রাত ১১টা। (১৩৬৪/১৯৫৮) মাঘ মাসের 'মাহে'নও পত্রিকায় মরণোত্তর প্রকাশিত)।
- মহাপ্রয়াণ—৯ই ডিসেম্বর, ফজরের আযানের পর।
- কায়সার স্ট্রিটের বুআলী কলন্দর মসজিদে জুম্মার নামাজের পর জানাজা অনুষ্ঠিত। জানাজায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ : শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, স্যার আবদুল করিম গজনভী, নবাব কে. জি. এম. ফারুকী, খাজা নাজিমুদ্দিন, ডা: আর. আহমদ, মৌলভী মজিবর রহমান, খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদ, নবাবজাদা কামরুদ্দিন হায়দার, মওলানা আবদুর রহমান খান, রেজাউর রহমান, খান বাহাদুর তোফাজ্জল আহমদ, আমিন আহমদ।
- আত্মীয় মওলানা আবদুর রহমান খানের পারিবারিক কবরস্থান কলকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরের শুখচরে সমাহিত—৯ই ডিসেম্বর।
- বাংলার গভর্ণর স্যার জন এ্যান্ডারসনের শোকবাণী প্রেরণ।
- দৈনিক পত্রিকাসমূহের পৃষ্ঠায় মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত—১০ই ডিসেম্বর।
- দি মুসলমানের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ—১১ই ডিসেম্বর।
- কলকাতা কর্পোরেশনে শোক-সভা।
- কলকাতা এলবার্ট ইনষ্টিটিউট হলে শোকসভা। উদ্যোক্তা : বঙ্গীয় পরিশীলন সমিতি, বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ও আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম। সভানেত্রী : কলিকাতা গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মিসেস সরলা রায় (ডাঃ পি. কে. রায়ের স্ত্রী ও দুর্গামোহন দাসের মেয়ে) ১৫ই ডিসেম্বর।
- আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম আয়োজিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রাঙ্গনে পৃথক শোক সভা। সভানেত্রী লেডী আব্দুর রহিম। বেনিয়া পুকুর রোড অথবা অন্যকোন রাস্তার নাম পরিবর্তন করে রোকেয়ার নামে করার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট প্রস্তাব পেশ—১৮ই ডিসেম্বর।

১৯৩৩
- 'মোহাম্মদী'র 'মরহুম মিসেস আর.এস. হোসেন' নামে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ—মাঘ, ১৩৩৯।

১৯৩৫ ● G.O. No 4404 Edn(s) বলে সরকারের সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ—১৯শে ডিসেম্বর।

১৯৩৬ ● মিস ভারতী চক্রবর্তী প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত—২রা জানুয়ারী।

১৯৩৭ ● রোকেয়া সংক্রান্ত প্রথম বই শামসুননাহার মাহমুদ রচিত 'রোকেয়া জীবনী' প্রকাশিত—অক্টোবর।

১৯৩৮ ● ১৭নং লর্ড সিনহা রোডে একজন ধনী মুসলমান মহিলার বসত বাড়ীতে স্কুল স্থানান্তরিত।

১৯৫৭ ● ১৭নং লর্ড সিনহা রোডের উক্ত বাড়ী অতি জীর্ণ ও পুরোনো হওয়াতে স্কুলের জন্য আর নিরাপদ নয় বলে কর্পোরেশনের চিফ আর্কিচেক্ট 'Condemnation Certificate দেয়াতে আলীপুর হেষ্টিংস হাউসে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্মিত নতুন ভবনে স্কুল স্থানান্তরিত—ডিসেম্বর।

১৯৫৮ ● ভর্তি প্রার্থী বালিকা ও তাদের অভিভাবকদের সমাগমে নতুন ঠিকানায় স্কুলের কার্যক্রম শুরু—২রা জানুয়ারী।

১৯৬৪ ● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের নামকরণ—'রোকেয়া হল'—নভেম্বর।

১৯৬৫ ● রোকেয়া সংক্রান্ত দ্বিতীয় বই শামসুননাহারের পুত্রবধূ ও রোকেয়ার চাচাতো বোনের মেয়ে মোশফেকা মাহমুদ রচিত 'পত্রে রোকেয়া পরিচিতি' প্রকাশিত—ফেব্রুয়ারী।

১৯৬৭ ● পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন চিফ আর্কিটেক্ট মিঃ পাসরিচা ও পরবর্তীতে বিশ্বনাথ ব্যানার্জীর আন্তরিক তত্ত্বাবধানে বছরের মাঝামাঝিতে ১৭নং লর্ড সিনহা রোডে স্কুলের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ সমাপ্ত।

১৯৬৮ ● ১৭নং লর্ড সিনহা রোডে নবনির্মিত নিজস্ব ভবনে স্কুল স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত।

১৯৭৩ ● আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'রোকেয়া-রচনাবলী' প্রকাশিত। এই রচনাবলীতে রোকেয়ার পূর্ণাঙ্গ রচনা প্রথমবারের মতো উপস্থাপিত।

১৯৮০ ● শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি : সরকারী পর্যায়ে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে রোকেয়ার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত। বাংলাদেশ ডাকবিভাগ থেকে দুটি স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশিত। ৯ই ডিসেম্বর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা (শুধু সে বছরের জন্য)।

পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার তালিকা

নবপ্রভা

(সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায়)

১. পিপাসা। প্রবন্ধ। চৈত্র ১৩০৮ ও বৈশাখ ১৩০৯ (যুগ্ম সংখ্যা)

মহিলা

(মাসিক। সম্পাদক : গিরিশচন্দ্র সেন)

১. অলংকার না Badge of slavery ১ম কিস্তি। প্রবন্ধ। বৈশাখ ১৩১০।

২. অলংকার (দ্বিতীয় কিস্তি)। প্রবন্ধ। জ্যৈষ্ঠ ১৩১০।

৩. অলংকার (তৃতীয় কিস্তি)। প্রবন্ধ। আষাঢ় ১৩১০।

৪. অর্দ্ধাঙ্গী (১ম কিস্তি)। প্রবন্ধ। শ্রাবণ ১৩১০। ৯ : ১।

৫. অর্দ্ধাঙ্গী (২য় কিস্তি)। প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩১০। ৯ : ৩।

৬. অর্দ্ধাঙ্গী (৩য় কিস্তি)। প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩১০। ৯ : ৪।

৭. সুগৃহিণী (১ম কিস্তি)। প্রবন্ধ। মাঘ ১৩১০। ৯ : ৭।

৮. সুগৃহিণী (২য় কিস্তি)। প্রবন্ধ। ফাল্গুন ১৩১০। ৯ : ৮।

৯. প্রভাতের শশী। কবিতা। বৈশাখ ১৩১১।

১০. পরিতৃপ্তি। কবিতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩১১।

১১. স্বার্থপরতা। কবিতা। আষাঢ় ১৩১১।

১২. কূপমণ্ডূকের হিমালয় দর্শন। ভ্রমণকাহিনী। কার্তিক ১৩১১।

১৩. কাঞ্চনজঙ্ঘা। কবিতা। পৌষ ১৩১১।

১৪. প্রবাসী রবিন ও তাহার জন্মভূমি। কবিতা। মাঘ ১৩১১।

১৫. নারী পূজা (১ম কিস্তি)। প্রবন্ধ। পৌষ ১৩১২।

১৬. নারী (২য় কিস্তি)। প্রবন্ধ। মাঘ ১৩১২।

১৭. নারী (৩য় কিস্তি)। প্রবন্ধ। ফাল্গুন ১৩১২।

১৮. আমি ও মন। কবিতা। শ্রাবণ ১৩১৩।

১৯. মোসলমান–কন্যার পুস্তক সমালোচনা। প্রবন্ধ। ভাদ্র ১৩১৩।

২০. দজ্জাল। প্রবন্ধ। ভাদ্র ১৩১৪।

নবনূর

(মাসিক। সম্পাদক : সৈয়দ এমদাদ আলী)

১. নিরীহ্ বাঙ্গালী। প্রবন্ধ। মাঘ ১৩১০। ১ : ১০

২. বাসিফুল। কবিতা। ফাল্গুন ১৩১০। ১ : ১১।

৩. শশধর। কবিতা। চৈত্র ১৩১০। ১ : ১২।

৪. বোরকা। প্রবন্ধ। বৈশাখ ১৩১১। ২ : ১।

৫. নলিনী ও কুমুদ। কবিতা। আষাঢ় ১৩১১। ২ : ৩।

৬. আমাদের অবনতি।[১] প্রবন্ধ। ভাদ্র ১৩১১। ২ : ৫।

৭. গৃহ। প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩১১। ২ : ৬।

৮. অর্দ্ধাঙ্গী। প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩১১। ২ : ৬। পুনর্মুদ্রণ।

৯. রসনা-পূজা। প্রবন্ধ। অগ্রহায়ণ ১৩১১। ২ : ৮।

১০. কাঞ্চনজঙ্ঘা। কবিতা। পৌষ ১৩১১। ২ : ৯।

১১. ভ্রাতা-ভগ্নী। ছোট গল্প। জ্যৈষ্ঠ ১৩১২। ৩ : ২।

১২. ঈদ-সম্মিলন। প্রবন্ধ। পৌষ ১৩১২। ৩ : ৯।

১৩. সৌরজগৎ। ১ম কিস্তি। গল্প। ফাল্গুন ১৩১২। ৩ : ১১।

১৪. সৌরজগৎ। ২য় কিস্তি। গল্প। চৈত্র ১৩১২। ৩ : ১২।

১৫. আশা-জ্যোতিঃ। প্রবন্ধ। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩। ৪ : ২।

অন্তঃপুর

(সম্পাদক : বনলতা দেবী)

১. গৃহ। প্রবন্ধ। পৌষ ১৩১১। ৭ : ৯। পুনর্মুদ্রণ

ভারত-মহিলা

(মাসিক। সম্পাদক : সরজুবালা দত্ত)

১. প্রেম-রহস্য। রস-রচনা। শ্রাবণ ১৩১৩। ১ : ১২।

আল-এসলাম

(মাসিক। সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী।

১. নূর-ইসলাম। ১ম কিস্তি। অনুবাদ – প্রবন্ধ। জ্যৈষ্ঠ ১৩২২। ১ : ২।

২. নূর-ইসলাম। ২য় কিস্তি। অনুবাদ – প্রবন্ধ। জ্যৈষ্ঠ ১৩২২। ১ : ২।

৩. নূর-ইসলাম। ৩য় কিস্তি। অনুবাদ – প্রবন্ধ। আষাঢ় ১৩২৩। ১২ : ৩।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক। সম্পাদক : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক)

১. পুরুষ সৃষ্টির অবতারণা।[২] গল্প। শ্রাবণ ১৩২৭। ৩ : ২।

২. শিশু পালন।[৩] কার্তিক ১৩২৭। ৩ : ৩।

৩. চাষার দুক্ষু। প্রবন্ধ। বৈশাখ ১৩২৮। ৪ : ১।

৪. মুক্তি–ফল। রূপক। শ্রাবণ ১৩২৮। ৪ : ২।

৫. এণ্ডি শিল্প। প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩২৮। ৪ : ৩।

সওগাত

(মাসিক। সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন)

১. সওগাত। কবিতা। অগ্রহায়ণ ১৩২৫। ১ : ১।

২. সিসেম ফাঁক। প্রবন্ধ। অগ্রহায়ণ ১৩২৫। ১ : ১।

৩. নারী–সৃষ্টি। প্রবন্ধ। পৌষ ১৩২৫। ১ : ১।

৪. নার্স নেলী। গল্প। অগ্রহায়ণ ১৩২৬। ২ : ১।

৫. রাঙ ও সোনা। প্রবন্ধ (প্রতিবাদ)। আশ্বিন ১৩৩৩। ৪ : ৪।

৬. পরী ঢিবি। ছোট গল্প। (উর্দ্দূ থেকে অনূদিত)। কার্তিক ১৩৩৩। ৪ : ৫।

৭. বঙ্গীয় নারী–শিক্ষা সমিতি।[৪] ভাষণ। চৈত্র ১৩৩৩। ৪ : ১০।

৮. লুকানো রতন। স্মৃতিকথা। আষাঢ় ১৩৩৪। ৫ : ১।

৯. বেগম তরজীর সহিত সাক্ষাৎ। অনুবাদ–প্রবন্ধ। ভাদ্র ১৩৩৬।

১০. ৭০০ স্কুলের দেশে। প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩৩৭।

আহমদী

সম্পাদক :

নারীশিক্ষা ও মোছলেম সমাজ। ভাষণ। ফাল্গুন ১৩৩৩

সাহিত্যিক

(মাসিক : সম্পাদক : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী ও গোলাম মোস্তফা)

১. সভানেত্রীর অভিভাষণ। ভাষণ। ফাল্গুন ১৩৩৩। ১ : ৪।

সত্যাগ্রহী

(সাপ্তাহিক। সম্পাদক : মৌলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ হেল কাফি)

বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতি : সভানেত্রীর অভিভাষণ। ভাষণ। চৈত্র ১৩১৩। ২ : ৩২। পুনর্মুদ্রণ

প্রবাসী

(মাসিক। সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়)

মিসেস আর. এস. হোসেনের বক্তৃতা (অংশবিশেষ)। ভাষণ। চৈত্র ১৩৩৬। পুনর্মুদ্রণ

সবুজপত্র

(মাসিক। সম্পাদক : প্রমথ চৌধুরী)

১. অভিভাষণ। ভাষণ। চৈত্র ১৩৩৩। ১০ : ৬।

সাধনা

(মাসিক। সম্পাদক : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও আবদুর রশীদ সিদ্দিকী)

১. আপীল। কবিতা। ফাল্গুন ১৩২৮।

ধূমকেতু

(অর্ধ-সাপ্তাহিক। সম্পাদক : কাজী নজরুল ইসলাম)

১. পিপাসা।[৫] প্রবন্ধ। ভাদ্র ১৩২৯। মোহররম সংখ্যা। পুনর্মুদ্রণ।

২. নিরুপম বীর। কবিতা। ৫ই আশ্বিন ১৩২৯। ১ : ১১।

বার্ষিক সওগাত

(বার্ষিক। সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন)

১. তিন কুঁড়ে। ছোটগল্প। বার্ষিক সওগাত ১৩৩৩।

নওরোজ

(মাসিক। সম্পাদক : মোহাম্মদ আফজাল-উল-হক)

১. বলিগর্ত্ত। ছোটগল্প। আশ্বিন ১৩৩৪। ১ : ৪।

মোহাম্মদী

(মাসিক। সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ)

১. রানী ভিখারিনী। প্রবন্ধ। পৌষ ১৩৩৪। ১ : ৬।

২ বলিগর্ত্ত।[৬] গল্প। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫। ১ : ৮। পুনর্মুদ্রণ।

৩. অবরোধ-বাসিনী [১-৭] নকশা। কার্তিক ১৩৩৫। ২ : ১।

৪. উন্নতির পথে। প্রবন্ধ। পৌষ ১৩৩৫। ২ : ৩।

৫. পঁয়ত্রিশ মণ খানা। রস রচনা। চৈত্র ১৩৩৫। ২ : ৬।

৬. অবরোধ–বাসিনী [৮–১৭] নকশা। ভাদ্র ১৩৩৬। ২ : ১১।

৭. অবরোধ–বাসিনী [১৮–২৩]নকশা। শ্রাবণ ১৩৩৭।

৮. অবরোধ–বাসিনী[৭] [২৪–৩০] নকশা। ভাদ্র ১৩৩৭।

৯. বিয়ে পাগলা বুড়ো। রস রচনা। পৌষ ১৩৩৭।

১০. ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম ভাষণ।[৮] জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

১১. হজ্বের ময়দানে। প্রবন্ধ। বৈশাখ ১৩৩৯।

মোয়াজ্জিন

(ত্রৈমাসিক। সম্পাদক : সৈয়দ আবদুর রব)

১. সুবেহ সাদেক। প্রবন্ধ। আষাঢ়–শ্রাবণ ১৩৩৭। যুগ্ম সংখ্যা

২. বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল। প্রবন্ধ। অগ্রহায়ণ ১৩৩৯।

*বঙ্গলক্ষ্মী

(মাসিক। সম্পাদক : সাইফুল ইসলাম মোহাম্মদ।)

১. 'কাটা মুণ্ডু কথা কয়'। প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৩২।

গুলিস্তাঁ

(মাসিক। সম্পাদক : এ. এইচ. এম. ফখরুল ইসলাম।)

১. গুলিস্তাঁ। প্রবন্ধ। পৌষ ১৩৩৯।

২. কৌতুক–কণা। প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৩৯।

Indian Ladies Magazine

Editors : (1) Kamala Satthia Nathan & Sorojini Naidu

1. Sultana's Dream, Utopia 1905.

The Mussalman

(Editor : Mujibar Rahman)

1. A Proposed Girls' School, Jan 10. 1911.

---

* জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর হেমলতা দেবী সম্পাদিত 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামেও একটা পত্রিকা ছিল। এটা কোন্ 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকা নিশ্চিত হয়ে বলা যাচ্ছে না।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও রচনা-পরিচয়

মতিচূর : প্রথম খণ্ড

মিসেস আর এস হোসেন প্রণীত 'মতিচূর' (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৪ সালে। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৩৫ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরীতেও পাওয়া যায়। মুদ্রক : কটন প্রেস, অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৫৭ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণে লেখা ছিল : 'All rights reserved'. পৃষ্ঠা ৮ + ১০২।

রোকেয়া-রচিত 'মতিচূর' প্রথম খণ্ডের দীর্ঘ সমালোচনা করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, 'কোহিনূর' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩১৩, আশ্বিন ১৩১৩ ও মাঘ ১৩১৩) এটি প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচনাটি এই।—

বাঙ্গালা ভাষা এখন আর নিতান্ত দীনা নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন জাতীয়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। কোন জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি-পক্ষে কবিতা এবং উপন্যাসের বাহুল্য অনাবশ্যক না হইলেও গুরু সন্দর্ভাদি দ্বারাই সাহিত্যে দৃঢ়তা, গুরুত্ব এবং শক্তি সঞ্চারিত হয়। গুরু সন্দর্ভ সাহিত্য-শক্তির পরিচয় দেয় এবং তাহাকে উদ্বোধিত করে ; সুতরাং গভীর গবেষণা, ভাব এবং চিন্তাপ্রসূত নানা বিষয়ক সন্দর্ভ যত প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল।

মাসিক-সাহিত্য-পত্রই এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু ত্রিপাদ পাঠকের কাছেই এ সকল সন্দর্ভ অপঠিত থাকে। ইহা সাহিত্যের পক্ষে গুরুতর ক্ষতিকর এবং পাঠকের পক্ষে উন্নতি-প্রয়াসহীন তরলতার পরিচায়ক,—নিতান্তই লজ্জার বিষয়। এইজন্যই বাঙ্গালায় সন্দর্ভগ্রন্থের প্রচার এত বিরল,—সন্দর্ভগ্রন্থ-লেখক ও লেখিকাও এত অল্প।

আজিকালি তবু দুই-একখানি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। পাঠকের মধ্যেও সন্দর্ভ পাঠাকাঙ্ক্ষা দেখা গিয়াছে। অধুনা বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন , রামদাস প্রভৃতির আদর্শে মাসিকের অকর্ত্তিক পত্রমধ্য হইতে সন্দর্ভমালা গ্রন্থাকারে বাহির হইতেছে এবং পাঠক সমাজকে আন্দোলিত করিতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রন্থকারদিগের অনুকরণে গ্রন্থকর্ত্রীগণ যে কবিতা-স্রোতে গা ঢালিয়াছিলেন, এখনও তাঁহারা তাহা হইতে একেবারে উঠিতে পারেন নাই। উন্নত-শিক্ষাসম্পন্না মহিলাগণের লেখনী আজও কমকান্ত প্রসূনরাজি-বিশোভিত সুরভি-মধুর মলয়ানিল সন্ধুক্ষিত পিককলমুখরিত মোহন কাব্যকুঞ্জের সৃষ্টি প্রয়াসে সযত্ন নিরত। তাঁহাদের সাহিত্যপাঠ স্পৃহাও সেই কল্পনাজালাবৃত কুঞ্জমধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিতেছে। ইহা প্রকৃত পথ নহে। এই লেখনী যে দিন প্রকৃত সুগৃহিণীর কর্ত্তব্যচিত্র অঙ্কনোদ্দেশে গণ্ডী ভেদ করিয়া বাহিরে আসিবে, আর এই তৃষ্ণা ঐরূপ চিত্র দর্শনে ব্যাকুল হইবে, সেইদিন বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে শুভদিন।

'মতিচূর' এইরূপ একখানি সন্দর্ভ-গ্রন্থ। সন্দর্ভ-গ্রন্থ, সন্দর্ভ-বিষয় এবং সন্দর্ভ-রচয়িত্রী প্রভৃতি বিবিধ হিসাবে 'মতিচূরে'র মূল্য এ সময়ে বড় বেশী। এত বেশী মূল্য বলিয়াই আমরা এ সম্বন্ধে দুই কথা বলিতে বসিয়াছি।

'মতিচূরে'র বহিরাবরণ অতিশয় সুদর্শন,—পরম লোভনীয়। এরূপ আবরণ খুলিয়া আজিকালি অনেকেই স্থূল-চিক্কণ পত্রে দুই-চারি পংক্তি সিপিয়াকালীমুদ্রিত 'আসি তবে' 'যাই তবে' ধরণের কবিতা কিংবা গল্পগুচ্ছ দেখিবার আশা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নৈরাশ্যে আমরা ক্ষুণ্ন হইব না। যে সাহিত্যে সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভাগের সমস্যাপূর্ণ বিষয় লইয়া স্বয়ং মহিলাগণ পর্য্যন্ত আলোচনা করিতেছেন, সে সাহিত্য বাস্তবিকই পরিপূর্ণতার পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিশোরী বঙ্গভাষার পক্ষে ইহা বড়ই আশাপ্রদ,—পরম আনন্দ পুলক-কর।

বিশেষতঃ এই বাঙ্গালা গ্রন্থের রচয়িত্রী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া শিক্ষিতা মুসলমান মহিলা। অধিকন্তু, আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূলতার মধ্যেও হৃদয়ের অদম্য তৃষায়, কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ঐকান্তিক সাহায্যে, যে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানপ্রসূত এ অমূল্য রত্ন তিনি আমাদিগের সাহিত্যভাণ্ডারে উপহার দিয়াছেন। ধন্য লেখিকা, ধন্য এ সাহিত্য, আর ধন্য সেই ভ্রাতা। এ 'মতিচূর' সাহিত্য-পূজায় অকৃত্রিম অনুরাগ-চর্চ্চিত প্রকৃত ভক্তিপূত ফুল্লপুষ্পাঞ্জলি। —এ একলব্যের প্রাণব্যাকুল পূজার অমূল্য অতুল গুরুদক্ষিণা।

হিন্দু-মুসলমান আজি একত্রে বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত,—মাতৃভাষার পূর্ণমাতৃত্ব এবং জাতীয় শক্তির দৃঢ়তা আজি নব বলে জাগিয়া উঠিতেছে, এই বলিয়া আমরা কতই আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু, যেমন হিন্দুর, তেমনই মুসলমানের অন্তঃপুর মধ্যেও আমাদের এই মাতৃভাষা এতখানি আদর পাইতেছে,—এতদূর যত্ন চর্চ্চায়,—এত সুন্দর মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে চন্দন-চর্চ্চিত উপহারের মত উপস্থিত হইয়াছে,—আজি এ অসীম আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। কেবল এই জন্যই বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে এ শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ 'মতিচূর' অমূল্য রত্নখণ্ড।

'মতিচূর' সত্যই মতিচূর। ইহার লিখনভঙ্গী যেমন বিস্ময়কর, ভাষাও তেমনি মনোহারিণী। ভাষার মধ্যে যে গভীর ভাবরাশি উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেক পাঠকের নিকট তাহা অন্তত চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই উপাদেয় গ্রন্থ 'মোহরের পায়েসে'র ন্যায় পাঠকের পাঠ-ক্ষুধার উদ্রেক করে, কিন্তু ইহার স্বাদ লইতে গেলে আনন্দ পুলকের সঙ্গে সঙ্গে অশেষ চিন্তা এবং অপার সমস্যা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।

'মতিচূর' পড়িতে পড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্য' এবং কালীপ্রসন্নের 'ভ্রান্তিবিনোদ' মনে পড়ে। অতুল কাব্যালঙ্কারে, বিপুল রহস্য বিজড়িত রসপূর্ণ যে সুগভীর সমস্যা-প্রশ্নসমুচ্চয়ে কমলাকান্তাদির উৎপত্তি হইয়াছিল, 'মতিচূর'ও সেইরূপ অগণ্য সমস্যা-ভাব আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। পার্থক্য কেবল, তাহাদের মূল প্রধানতঃ দর্শনে ; ইহার ভিত্তি সমাজ সমস্যার উপরে। 'মতিচূরে'র ন্যায় গ্রন্থের পক্ষে ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। সুতরাং ইহার গুরুত্বও সামান্য নহে। 'মতিচূর' শুধু হিন্দু-মোসলেম সমাজকে নহে,

সর্ব্বশ্রেণীর পাঠককে—ভাবতরঙ্গে আলোড়িত করিয়াছে। মুসলমান মহিলা লিখিত সর্বপ্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থের এ ক্ষমতা কতদূর বিস্ময়কর, তাহা ভাষায় বুঝানো সুকঠিন।

'পিপাসা', 'আমাদের অবনতি', 'নিরীহ বাঙ্গালী', 'অর্দ্ধাঙ্গী', সুগৃহিণী', 'বোরকা' এবং 'গৃহ' এই সপ্তসন্দর্ভ-মুক্তা-কণিকায় 'মতিচূর' গঠিত। এই মুক্তাসপ্তক ত্রিবর্ণে বিভক্ত। প্রথমে 'পিপাসা', দ্বিতীয়ে 'নিরীহ বাঙ্গালী' এবং অবশিষ্ট পঞ্চমুক্তা তৃতীয় শ্রেণীর। এই শেষোক্ত পঞ্চমুক্তা সমস্যা সমুদ্রের অতি গভীর তলদেশ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে।

'পিপাসা'র প্রতি অক্ষরে পিপাসার হাহাকার—প্রতি ছত্রে পিপাসার ব্যাকুলতা। ভাব স্রোতে ছন্দতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে—স্নেহ বিধুরা। অনন্ত স্নেহময়ী জননীর আকুল স্নেহ-পিপাসা, রণক্লান্ত বিপুল জনসঙ্ঘের দারুণ জলপিপাসা, আর সংহারোন্মুখ অস্ত্র-কণ্টকিত ভয়াল মরুভূর করাল শোণিতপিপাসা'—পিপাসার এক মহাসংঘর্ষ তুলিকার রেখায় রেখায় স্পষ্টীকৃত।

'নবপ্রভায়' যে দিন প্রথম পড়িয়াছিলাম—মহাত্মা হোসেন স্ত্রীর কাতরতা এবং শিশুর দুরবস্থা দেখিয়া, জলপ্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাতরস্বরে বলিলেন,—'আমি বিদেশী পথিক, তোমাদের অতিথি ; আমার প্রতি যত ইচ্ছা অত্যাচার কর,—সহিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ শিশু তোমাদের কোন দোষে দোষী নহে। পিপাসায় ইহার প্রাণ ওষ্ঠাগত—একবিন্দু জল দাও ! ইহাতে তোমাদের দয়াধর্ম্মের কিছুমাত্র অপব্যয় হইবে না !' শত্রুগণ কহিল, 'বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, শীঘ্র কিছু দিয়া বিদায় কর।' বিপক্ষ হইতে শিশুর প্রতি জলের পরিবর্ত্তে তীরবৃষ্টি হইল !

'পিয়াস লাগিয়া জলদে সাধিনু
বজর পড়িয়া গেল।'

হোসেন শরবিদ্ধ আসগরকে তাহার জননীর কোলে দিয়া বলিলেন, 'আসগর চিরদিনের জন্য তৃপ্ত হইয়াছে ! আর জল জল বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদাইবে না !—আর বলিবে না 'পিপাসা, পিপাসা !' এই শেষ !'—সেদিন* মহরমের 'মর্সীয়া'র হৃদয়-বিদারণ আর্ত্তকরুণ সুর এবং 'হায় হোসেন, হায় হোসেন !' ধ্বনির সহিত ব্যাকুল শোকস্মৃতি, উন্মাদ-ভাবে বক্ষে করাঘাত,—এ সকল চক্ষুর সম্মুখ দিয়া, কর্ণের মধ্য দিয়া হৃদয় ভেদ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সেই দিন যে আকুল পিপাসায় হৃদয় হা হা করিয়া উঠিয়াছিল, আজ 'পিপাসা' পড়িয়া আবার তাহা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিয়াছে।

আর একটি ছবি, 'হৃদয়ানন্দ জানিত—আমি তাহাকে জল দিব না। আমি ডাক্তারের অন্ধ আজ্ঞাবহ দাস, তাহাকে জল দিব না। তাই সে আমার উপস্থিত সময়ে জল চাহিতে সাহস করে নাই ! কি মহতী সহিষ্ণুতা ! জলের পরিবর্ত্তে চা চাহিল। শীতল জলের পিপাসায় গরম চা ! চা তখনই প্রস্তুত হইয়া আসিল। যে ব্যক্তি চা পান করাইতেছিল, যে চা'র

---

* মুর্শিদাবাদে

পেয়ালার কড়া ধরিতে পারিতেছিল না,—পেয়ালা এত তপ্ত ছিল। আর সেই পিপাসী সে পেয়ালাটী দুই হস্তে (যেন কত আদরের সহিত) জড়াইয়া ধরিয়া চা পান করিতে লাগিল! আহা! না জানি সে কেমন পিপাসা! অনলরচিত পিপাসা কিম্বা গরলরচিত পিপাসা!! ... আক্ষেপ এই যে জল কেন দিলাম না? রোগ সারিবার আশায় জল দিতাম না—রোগ যদি না সারিল, তবে জল কেন দিলাম না? এইজন্যই ত রাত্রিদিন শুনি 'পিপাসা, পিপাসা!', এই জন্যই ত এ নরক যন্ত্রণা ভোগ করি। আর সেই গরম চা'র পেয়ালা চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়, হৃদয়ে আঘাত করে, প্রাণ দগ্ধ করে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে দেখি,—অন্ধকারে জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে লেখা—'পিপাসা, পিপাসা!'—ব্যথিত মর্ম্মের উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া এ পিপাসা যে শতগুণে বাড়িয়া উঠে!—বাষ্প-আবেগে নয়নের সমক্ষে এ চিত্রের দৃশ্য রুদ্ধ হইয়া যায়, অন্তর না জানি কোন্ নিদারুণ পিপাসায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে!

বুঝি জননীর জাতি বলিয়াই তিনি এ পিপাসার এমন দৃশ্য এমনি করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন;—এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাঁদাইয়াছেন!

যে লেখনী হইতে এ 'পিপাসা' সৃষ্ট হইয়াছে, সে লেখনী ধন্য। যে আকুল হৃদয় হইতে এ পিপাসার আর্ত্তনাদ উৎসারিত হইয়াছে, সে হৃদয়ের তুলনা নাই। কিন্তু অতি আশ্চর্য্য সেই লেখিকার লেখনীর শক্তি; যিনি দারুণ সন্তানশোক হৃদয়ে লুকাইয়া চোখের জল শুকাইতে না শুকাইতে অনাবিল রহস্যের সঙ্গে গুরুতর সমস্যা লইয়া হিতাকাঙ্ক্ষার প্রশ্নে সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারেন। কর্ত্তব্য-কঠোর সংসারে কুসুমকোমল প্রাণ এমনই করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বজ্র কঠিন হয়। হয়, কর্ত্তব্যের পরীক্ষায়, নয় হৃদয়ের আবেগে। এখানে ভাণ নাই; ইহাই সংসারের খাঁটি সত্য। 'নিরীহ বাঙ্গালী' রস ও রহস্যের আবরণে কি তীব্র ধিক্কার, কি মর্ম্মন্তুদ চিত্র! এ চিত্রে লোকরহস্যাদি বহু গ্রন্থের সুবর্ণসম্মার্জ্জনী তাহাদের চৈতন্যসঞ্চারে উদ্যত,—আজ যদি চেতনা হয়। অন্তঃপুরের এ মিষ্ট টিটকারী রুগ্ন সমাজে হয়ত মহৌষধিরূপ হইতে পারে! আজ ভারতললনা স্বয়ং জাগিয়া উঠিয়া সম্মার্জ্জনী ধরিয়াছেন, এখনও যদি জঞ্জাল-আবর্জনা দূরীভূত হইবার আভাস না পাওয়া যায়, তবে বাঙ্গালীর ঘুম আর ভাঙ্গিবে না।—এ নিদ্রা নহে, মৃত্যু।

অবশিষ্ট পঞ্চ প্রবন্ধে, গ্রন্থকর্ত্রী বর্তমান মৃত সমাজ সম্বন্ধেই অনেকগুলি কথা কহিয়াছেন। যে সকল গুরুতর সমস্যা লইয়া আন্দোলন, সংক্ষেপেও তাহার সকলগুলির মীমাংসা করা সহজ নহে। সকল প্রবন্ধের বিষয়গুলির সামঞ্জস্য করিতে গেলে বহুবার প্রয়াস করিতে হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা তাহাতেও তাঁহার সকল কথার সামঞ্জস্য হয় না। অতএব এই এক প্রবন্ধে সে সমস্তের সম্পূর্ণ সমালোচনা করা অসম্ভব হইলেও এ গ্রন্থে তাঁহার যে ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহার কথা সাধারণ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। সত্য, তিনি 'স্বকীয় মত মাত্র' ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায় লেখিকার মতের মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু কিছু বলিতে হইবে।

সমস্যা বা অভিমতি সকলের সংখ্যা বহু। তন্মধ্যে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা একান্ত প্রধান কয়েকটি বিষয় লইয়াই মীমাংসার চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান সমাজের ক্ষত সম্বন্ধে তিনি অনেক চিত্র দেখাইয়াছেন। চিত্রের দৃশ্য বস্তুতঃই ভীষণ মর্ম্মপীড়ক। এ সকলের সংস্কার যে অত্যাবশ্যক তাহা কে অস্বীকার করিবেন? শুধু এ সকলের নহে, সমগ্র সমাজেরই সংস্কার আবশ্যক। 'বর্ত্তমান মৃত সমাজ' উল্লেখেই আমরা ইহার আভাস দিয়াছি। সংস্কার আবশ্যক ; কিন্তু সংস্কার এক কথা আর সমাজের প্রাকৃতিক বিধি আর-এক বিষয়।

উপযুক্ত সংস্কারে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না,—কিন্তু মূল সমাজবিধির পরিবর্ত্তন কি সম্ভবপর না স্বভাবসম্মত? যাহা একান্ত কৃত্রিম, তাহার পরিবর্ত্তন চলে ; পরন্তু প্রকৃতির সহিত যাহার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তাহার পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক ও অমঙ্গলকর হয়। যেমন, ক্ষত জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন ; এজন্য রোগীর কোন অঙ্গ বিশেষ ছেদন করিতে হইলেও করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া হাত কাটিয়া মাথার স্থানে, মাথা পায়ের স্থানে এবং পা হাতের স্থানে সবাইয়া দিয়া রোগীকে কোন উপায়ে আরোগ্য করিয়া তুলিলে বিশেষ লাভ দেখা যায় না।

হৃদয়ের জ্বালাময় আবেগে গ্রন্থকর্ত্রী এ শেষ পঞ্চ প্রবন্ধে অনেক রকমের কথাই কহিয়াছেন। স্থূল বক্তব্য যাহা, তিনি আমাদিগকে ইহা অপেক্ষা অনেক সহজে বুঝাইতে পারিতেন। এক্ষেত্রে যেন হৃদয়ের আবেগেই তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন—সকল বস্তু বাছিয়া লইবার অবসর পান নাই। 'পিপাসা' ও 'নিরীহ বাঙ্গালী'-তে তাঁহার যে প্রতিভা নির্ম্মলোজ্জ্বল-জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এ কয় প্রবন্ধে তাহা সর্ব্বগ্রাসিনীরূপে সদসৎ সমস্ত গ্রাস করিয়া বসিয়াছে! এই জন্য অধিক আবেগে—অত্যধিক ব্যগ্রতায় প্রবন্ধগুলি কূটতর্ক এবং নানারূপ সমস্যায় একান্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

২

তিনি বলিয়াছেন—'আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি ; তাহাদের ধর্ম্মবন্ধন বা সমাজ বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না। ...আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। ... মহারাণী ভিক্টোরিয়া যেমন সুদূর ইংলন্ডে থাকিয়া ভারত সাম্রাজ্য শাসন করিতেন, সেইরূপ অন্তঃপুরে থাকিয়া ললনাকুলও ইচ্ছা করিলে অনেক মহৎকার্য্য করিতে পারেন।' এ ত বেশ কথা। সমাজবন্ধন ঠিক রাখিয়া স্ত্রীজাতির পক্ষে যেরূপ উন্নতি উপযুক্ত, তাহাতে তাঁহাদের ন্যায্য দাবী আছে। সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকিলে সেরূপ সমাজের সংস্কার অবশ্যই করণীয় ; কিন্তু গ্রন্থের সকল স্থলে ত ঠিক এরূপ ভাব বুঝা যায় না। 'পুরুষের স্বামীত্ব স্বীকার না করিলেই ত সমকক্ষতা হয়', 'কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও,—নিজের অন্ন বস্ত্র উপার্জ্জন করুক',—এরূপ কথায় কি সমাজবন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখিবার ভাব বুঝায়? যাহা বুঝায়, তাহাতে এই বুঝি যে, গ্রন্থকর্ত্রীর মূলমন্ত্র স্ত্রী-স্বাধীনতা।

স্ত্রী-স্বাধীনতা ; কিন্তু এ স্বাধীনতার একটা প্রকার আছে। স্ত্রী এবং পুরুষ জন্ম সময়ে কেহ কাহারও অধীন হইয়া আইসে নাই ; তবে কেন মানব-সমাজে স্ত্রীজাতি সর্ব্ববিষয়ে

পুরুষের অধীন হইয়া রহিয়াছে? আর তাহারা পুরুষের অধীন হইয়া থাকিবেন না! "অতএব জাগ, জাগ লো ভগিনী!" এইবার তাঁহারা জাগিবেন! ইহাই এ স্বাধীনতার প্রকার; কিন্তু এ প্রকার সাম্য, এ প্রকার স্বাধীনজাগরণ যে অস্বাভাবিক, আমরা নিম্নে তাহাই বুঝাইতেছি।—

স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম এই দ্বিবিধভাবে প্রশ্নগুলির মীমাংসা চেষ্টা করিতে হইবে। স্বভাবতঃ দেখা যায়, স্ত্রী এবং পুরুষ জন্মকালে কতক সমান হইলেও পরিপূর্ণতার পথে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, শারীরিক বলে স্ত্রী ততই পুরুষাপেক্ষা হীনাবস্থায় দাঁড়ায়। যদি বলা যায়, সমাজবিধি বলচচ্চার অভাবে স্ত্রী পুরুষাপেক্ষা হীনবল হয়; কিন্তু প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া যে সকল জীবন গঠিত হয়, তাহাদেরও স্ত্রী পুরুষ-তুলনায় দুর্ব্বলা হয়। গো, অশ্ব, হস্তী, মেষ প্রভৃতি পশু এবং গারো, কুকী, সাঁওতাল প্রভৃতি মনুষ্যশ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হয়। বেহার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যে সকল হীন শ্রেণীস্থ মনুষ্যেরা স্ত্রী-পুরুষে সমভাবে কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে; তাহাদেরও পুরুষ স্ত্রী-অপেক্ষা অধিক বলবান্। য়ুরোপ ও আমেরিকার আদর্শে অনেকে স্ত্রী স্বাধীনতা চাহেন। আচ্ছা, তত্তদ্দেশের স্ত্রী কি পুরুষের সমান শক্তিসম্পন্না? সুতরাং দেখা যায়, পুরুষ-অপেক্ষা স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই দুর্ব্বলা। অতএব শারীরিক শক্তি বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে সমতা কল্পনা করিলেও সত্যতায় ইহা অসম্ভব, স্ত্রীর প্রকৃতিই যে এ সাম্য-বিষয়ে তাঁহার প্রধান প্রতিকূল।

যদি স্ত্রী ও পুরুষে শারীরিক শক্তি-বিষয়ে বিষমতা থাকিল, তাহা হইলে উভয়ের কার্য্যও ঠিক সমান হইতে পারে না।

তবে জ্ঞানের কথা। সাধারণতঃ স্ত্রী পুরুষে এ বিষয়ে কোন পার্থক্য দেখা যায় না; কিন্তু সময় পুরুষের যতটা আয়ত্ত, নানা কারণে স্ত্রীর ততটা নহে। কাজেই আদিকাল হইতে উভয়ে সমানভাবে জ্ঞানালোচনায় রত হইয়া থাকিলেও সময়ের ব্যতিক্রমে স্ত্রী স্বভাবতঃই পশ্চাতে পড়িবেন। অতএব এ পথেও স্ত্রী একমাত্র স্বভাবের নিয়মেই পুরুষের মুখাপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আর একটা প্রশ্ন আছে, পুরুষের সমান শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়াই স্ত্রীর জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। ভাল, শিক্ষা কি? যাহার যে কর্ম্ম, সে সেইরূপ কর্ম্মে যাহাতে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, এবম্বিধ জ্ঞান-বিধানের নামই ত শিক্ষা? স্ত্রী এবং পুরুষের কর্ম্ম যদি সমান না হইল, তবে শিক্ষার সাম্য কিরূপে সম্ভব?

বিশেষতঃ জ্ঞানের দুইটা আকৃতি রহিয়াছে—জ্ঞান এবং বিশ্বাস। জ্ঞান অতি পরিশ্রম সাপেক্ষ, বিশ্বাস সহজে অবলম্বনীয়। কারণ জ্ঞান নিয়ত পরীক্ষার বিষয়ীভূত, বিশ্বাস তাহা নহে। এই জন্যই প্রধানতঃ পুরুষ জ্ঞান অর্জন করেন, স্ত্রী তাহাতে বিশ্বাস করেন। কতকে জ্ঞান অর্জ্জন করিবে, কতকে তাহা বিশ্বাস করিবে,—ইহাই রীতি এবং স্বভাব। নতুবা প্রত্যেক মানুষকে পরীক্ষা করিয়া জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে সংসার অচল হইত। পুরুষ জাতিগতভাবে কঠিন জ্ঞানার্জ্জনে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন এবং স্ত্রী সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে নানা-দিক দিয়া সমাজ সুশৃঙ্খল হইয়াছে।

প্রকৃতির বৈষম্য স্বাভাবিক ; স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্যও স্বভাবজ। অধিকন্তু স্ত্রী জ্ঞান-বলে সর্ব্বকালে পুরুষাপেক্ষা স্বভাবতঃই যেমন ভিন্ন-শক্তি, তেমনই হীন-শক্তি। গ্রন্থরচয়িত্রী বলেন, স্ত্রীজাতি হীন-শক্তি হইয়াছেন 'আলস্যের দোষে'।[১] ভাল, সমগ্র সংসারের স্ত্রীজাতি কি একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া আলস্যাভিভূতা হইয়া বসিয়াছিলেন? নতুবা সেই অতি-আদিযুগে স্ত্রী-পুরুষ যদি সমান শক্তি লইয়া, সম-অবস্থাতেই সৃষ্টি হইয়াছিল, তবে স্ত্রী পুরুষের অধীনা না হইয়া, পুরুষ স্ত্রীর অধীন হইল না কেন? আর যদি তাহাই না হইয়াছে, এত যুগের সামাজিক শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম কি সম্ভবপর?—না একদিনে সমগ্র সংসারের রমণী জাগিয়া উঠিয়া এ বিধি-শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত করিয়া স্বাধীন হইলে সে স্বাধীনতা দুই দিনের অধিক স্থায়ী হইবে? 'আলস্য' ঘুচাইলেও স্বাভাবিক নিয়মেই স্ত্রীকে আবার পুরুষেরই অধীন হইতে হইবে।

তবে 'পুরুষ স্ত্রীর 'স্বামী' আর স্ত্রী পুরুষের 'দাসী' হইল কেন' এবং 'পুরুষ 'প্রেমদাস' না হইয়া 'স্বামী' হইল কেন' এই যে প্রশ্ন করিয়াছেন, সে স্বতন্ত্র কথা। স্বভাব ইহার প্রথম কারণ হইলেও কৃত্রিমতা ইহার প্রধান কারণ। সভ্যতা,—যাহার জন্য সমগ্র সংসার লালায়িত, তাহা কৃত্রিম। স্বাভাবিক অসভ্যাবস্থা হইতে কৃত্রিম উপায়ে সমাজ-নিয়মের সৃষ্টি করিয়া মানবজাতি সভ্য এবং শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। স্বভাবের নিয়মে স্ত্রী যে বয়সে গর্ভধারণের ক্ষমতা পান, পুরুষ কিঞ্চিন্ন্যূন প্রায় তাহার দ্বিগুণ বয়সে সন্তানোৎপাদনক্ষম হইয়া থাকেন। এই হেতু সভ্য সমাজ কৃত্রিম বিধানদ্বারা বিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে বয়ঃকনীয়সী স্ত্রী এবং গরীয়ান্ পুরুষে বিবাহনুষ্ঠান বিহিত করিয়াছেন।[২] এই বয়সাধিক্য—সুতরাং জ্ঞান-মান-বলাধিক্য হেতু পুরুষ স্ত্রীর নিকট স্বামীরূপ সম্মান্য অভিধান পাইয়া থাকেন। ইহাতে স্ত্রীর ক্ষুণ্ণ হইবার কোনই কারণই নাই ;--বরং এজন্য সমুচিত বিনয়ে তাঁহার চরিত্র সমধিক সুভূষিতই হয়।

একে অন্যের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা স্বীকার না করিলে সমাজ থাকে না। যমজ ভ্রাতৃযুগলে কে কাহার অধীন? কিন্তু তাহাদের মধ্যেও একে অপরকে জ্যেষ্ঠ স্বীকার না করিলে গৃহবিশৃঙ্খলার উদ্ভব।—তখন বয়ঃজ্যেষ্ঠ স্বামীর নিকট কনিষ্ঠা স্ত্রী একটু মাত্র ন্যূনতায় সম্মতা না হইলে গৃহ এবং সমাজ রক্ষা পায় কৈ? শুধু সভ্য নহে, অসভ্য সমাজেও স্ত্রীর এ ন্যূনতার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃতি ও সমাজসিদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত বিধি।

লেখিকা বলেন,—'একজন ব্যারিষ্টার ডাক্তারের সাহায্য প্রার্থী, আবার ডাক্তারও ব্যারিষ্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারিকে ব্যারিষ্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিষ্টার ডাক্তারের

---

১. বাস্তবিক আলস্যের দোষে নহে। এক শারীরিক দুর্ব্বলতা, দ্বিতীয়তঃ অন্তরের বিশিষ্টতায় এরূপ হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—'আমাদের কি হাত নাই, পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই?' থাকিবে না কেন? সবই আছে। স্নেহ, দয়া, হ্রী, ধৈর্য্য ও প্রণয়াদি কতকগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি পুরুষাপেক্ষা অনেক বেশী গুণে আপনাদের আছে। এই সকলের আধিক্যদোষেই ত স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অধীন করিয়াছে। ঐ সকল বৃত্তির প্রত্যেকটিই যে মানুষকে আত্মহিতে উদাসীন এবং পরের অধীন করিয়া দেয়। (লেখক)

২ সমাজে ইহার যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, সংখ্যানুপাতে তাহা নিতান্তই সামান্য। আর তাহা কি কৃতবিজ্ঞানসম্মত? (লেখক।)

স্বামী?' 'স্বামী' কথাটা কি? পরিণয়াবদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ।[৩] তন্মধ্যে 'স্বামী' পুরুষের এবং 'পত্নী' রমণীর বিশেষ সংজ্ঞা। বিশেষ সংজ্ঞা বলিয়াই ব্যারিষ্টার ও ডাক্তার পরস্পরের সাহায্যকারী হইলেও কেহ কাহারও (সামাজিক অপর সংজ্ঞা 'বন্ধু' ভিন্ন) স্ত্রী বা স্বামী হন না; অথবা বিবাহ না হইলে পরস্পর সহায়তা করিলেও স্ত্রী-পুরুষ কেহ কাহারও স্ত্রী বা স্বামী হয় না।

আর 'স্ত্রী দাসী' সত্য সত্যই 'দাসী' নহেন। তিনি স্নেহে জননী, সংসার নির্ব্বাহে সঙ্গিনী এবং সেবায়[৪] দাসী স্বরূপিনী হইবেন। আবার, স্বামী যেমন 'স্বামী' তেমনি 'প্রেমদাস'ও বটেন।—তিনি প্রেমদাস নহিলেন কিসে? কিন্তু স্ত্রী যেমন সর্ব্বত্রই 'দাসী নহেন, স্বামীও সর্ব্বত্রই 'প্রেমদাস' নহেন। সর্ব্বত্র 'দাসী' এবং 'প্রেমদাস' হইয়া থাকিলে আবার সমাজ টিকিত না। তবে গ্রন্থকর্ত্রী চিত্রিত 'দাসী' যে বর্ত্তমান মৃত সমাজের দোষে এবং এরূপ সমাজের যে আবশ্যক, তহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তারপর অলঙ্কার। 'অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন' ইহা নতুন কথা। সমাজবন্ধন যাহাদের মধ্যে নিতান্ত শিথিল; সেই প্রকৃতি-ক্রোড়লালিত অসভ্যজাতীয়া রমণীগণ মধ্যে পুষ্পাভরণ এবং ধাতব অলঙ্কারের ব্যবহার কি দাসত্বের নিদর্শন, না সৌন্দর্য্যের বেশভূষা?[৫] তবে একথা সত্য, সৌন্দর্য্যবোধ বৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই অলঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছিল, ধাতব পদার্থের মহিমায় তাহা ক্রমে মানুষের সম্পত্তি এবং সৌন্দর্য্যের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়।[৬] লেখিকা করুণ মধুর ভাষায় লিখিয়াছেন,—পরিমিত ব্যয় করা গৃহিণীর একটা প্রধান গুণ। হতভাগ্য পুরুষেরা টাকা উপার্জ্জন করিতে কিরূপ শ্রম ও যত্ন করেন, কতখানি মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া এক-একটি পয়সার মূল্য (পারিশ্রমিক) দিয়া থাকেন, অনেক গৃহিণী তাহা একটু চিন্তা করিয়াও দেখেন না। উপার্জ্জন না করিলে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিবেন, যথাসাধ্য কটু

---

৩ এ অর্দ্ধাঙ্গ কিরূপ তাহা পরে উল্লেখ করিব।

৪. স্ত্রী পুরুষের সেবা করিবেন কেন, সে কিরূপ সেবা, তাহাও পরে বলিব। (লেখক।)

৫ এখানে প্রশ্ন হইতে পারে তবে, পুরুষ কেন অলঙ্কার পরে না? পরে বৈ কি?—কিন্তু সে অলঙ্কার অন্যরূপ। তাহাদের সাধারণ বেশভূষার মধ্যে যে একটু পারিপাট্য, তাহাই তাহাদের পক্ষে প্রচুর অলঙ্কার। কেননা যে সমস্ত [...] পরিশ্রম সাধ্য কার্য্য পুরুষকে করিতে হয়, তাহাতে স্ত্রীজন-সুলভ অলঙ্কার পরিয়া পুরুষের পক্ষে কার্য্য করা বিড়ম্বনীয় হইয়া পড়ে। উত্তর-পশ্চিমাদি অঞ্চলের স্ত্রী-অলঙ্কারের সহিত বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের গহনার তুলনা করিলে এ তথ্য বুঝা যাইবে। আরও বৈচিত্র্য দেখুন,—পুরুষের গুমফাদি দুই একটি স্বভাবদত্ত অলঙ্কার রহিয়াছে। সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি স্পৃহায় যে কেশ বৃদ্ধি করিবার এবং নানাভাবে রচনা করিবার জন্য স্ত্রীলোকের শত যত্ন, পুরুষ তাহাকে অপেক্ষাকৃত খাট করিয়া ছাটিয়া রাখেন; কিন্তু তাহাতেই তাঁহার সৌন্দর্য্য স্পৃহার তৃপ্তি হয়। এইখানেই সৌন্দর্য্য লিপ্সার এবং অলঙ্কারের বৈষম্য বেশ বুঝা যায়। স্ত্রীলোকের সুদীর্ঘ কুন্তলদামকেও কি গ্রন্থকর্ত্রী দাসত্বের নিদর্শন মনে করেন? আর এক প্রশ্ন উঠিয়াছে,—'স্ত্রী-অলঙ্কার ব্যবহার পুরুষের পক্ষে হীনতাসূচক কেন?' কঠোরকর্ম্মা সাহসী পুরুষে স্ত্রী-অলঙ্কার বা স্ত্রীবেশ ব্যবহারে স্ত্রী সুলভ কোমলতা আসিতে পারে, এই জন্য ইহা নিষেধ, স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী জাতীয় বেশ ব্যবহার করাই কর্ম্মোদ্ধার-কল্পে কর্ত্তব্য; তাহার বৈপরীত্যে সমাজকর্ম্মের ক্ষতি হয়। তবে পুরুষের কর্ম্ম কঠোর কেন হইল, স্ত্রীর কেন হইল না, তাহার আভাস আমরা পূর্ব্বে একটু দিয়াছি, পরেও দিব। (লেখক)

৬. সধবার 'লৌহবলয়' ব্যবহার একটা আচারগত প্রথা। (লেখক।)

কাটব্য বলিবেন, কিন্তু সহানুভূতি করেন কে? ঐ শ্রমার্জ্জিত টাকাগুলি কন্যার বিবাহে বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে কেবল সাধ (আমোদ) আহ্লাদ ব্যয় করিবেন, অথবা অলঙ্কার গড়াইতে ঐ টাকা দ্বারা স্বর্ণকারের উদরপূর্ত্তি করিবেন। স্বামী বেচারা একসময়ে চাকরীর আশায় সার্টিফিকেট কুড়াইয়ার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বহু আয়াসে সামান্য বেতনের চাকরীপ্রাপ্ত হইয়া প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া যে টাকা কয়টি পত্নীর হাতে আনিয়া দেন, তাহার অধিকাংশ মল ও নূপুরের বেশে তাঁহার কন্যাদের চরণ বেড়িয়া রুণু রুণু রবে কাঁদিতে থাকে"[৭]—যদি গহনা 'দাসত্বের নিদর্শন' হইত এবং স্ত্রী সর্ব্বদা 'দাসী' হইতেন, তবে এমন কটুভাষিণী, সহানুভূতিহীনা একটা 'দাসী'র মন রাখিবার জন্য হতভাগ্য স্বামীবেচারার প্রাণপণ পরিশ্রমলব্ধ শোণিততুল্য অর্থরাশির এত সহজে এমন শোচনীয় ব্যবস্থা হইত না।

অলঙ্কার যে 'দাসত্বের নিদর্শন' নহে, তাহার আর এক প্রমাণ 'উল্কী'। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে ইহার ব্যবহার পূর্ব্বে প্রচুর ছিল,—অসভ্য জাতির মধ্যে এখনও প্রচুর।— সভ্যতাভিমানী য়ুরোপীয় পুরুষেরা পর্য্যন্ত 'চাইনিজ-ইঙ্ক' দ্বারা সর্পবেষ্টিত নোঙ্গর, ক্রুশ ইত্যাদি অঙ্কিত করিয়া ভুজসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। ইহা দাসত্বের, না সৌন্দর্য্যের নিদর্শন?

গহনা 'সধবার নিদর্শন' হইয়াই যে 'দাসত্বের নির্দশন' হইয়াছে, ইহা কিসে বুঝা যায়? স্বামী বিয়োগ হইলে শোকের প্রবলতায় বিধবার সৌন্দর্য্য লিপ্সা থাকে না। বিশেষতঃ যখন গ্রন্থকর্ত্রী স্বীকার করিতেছেন যে, সমাজ-বিধিতে আছে—'বিশ্বাসী স্ত্রীলোকদিগকে বল, তাহারা যেন দৃষ্টি সতত নীচের দিকে রাখে (অর্থাৎ চঞ্চল নয়নে ইতস্ততঃ না দেখে!) এবং তাহারা যেন আভরণ (বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত) অন্য লোককে না দেখায়', তখন স্বামী-বিয়োগের পর হৃদয়ে শোকশল্য লইয়া বিশ্বাসী স্ত্রীলোকের পক্ষে সৌন্দর্য্যসজ্জার ইচ্ছা হওয়া একান্তই অসম্ভব। স্বামী এবং স্ত্রীর বেশভূষাপারিপাট্য মুখ্যতঃ পরস্পরের মনোরঞ্জনার্থ। সুতরাং একের অভাবে অপরের বেশভূষা সম্পাদন শুধু অনাবশ্যক নহে, সামাজিক হিসাবে গর্হিতও বটে।[৮] দৃষ্টান্ত,—সন্ন্যাসী এবং চিরকুমারী অথবা বালবিধবা। যিনি চিরকুমারী, তাঁহার বেশভূষার পারিপাট্য সভ্যসমাজে অনর্থকর, দৃষ্টিকটু এবং অসঙ্গত। যে বালবিধবা,—স্বামী কি, ভাল বুঝে নাই, পিতা মাতা এবং আত্মীয়স্বজনেরা তাহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কার প্রাণ ধরিয়া খুলিয়া লইতে পারেন না। যত দিন বালিকা সবিশেষ বুদ্ধিমতী হইয়া আপনি অলঙ্কার ত্যাগ না করে, ততদিন তাহার অলঙ্কার ব্যবহারে কেহই বাধা দেন না। কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্না এবং বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াও (পুনর্ব্বিবাহিত না হইলে) সে বিধবা যদি অলঙ্কার ত্যাগ না করেন, তখন সমাজ হইতে—সেই আত্মীয়স্বজন হইতেই—সহস্র আপত্তি উঠিয়া থাকে। সেইরূপ স্ত্রীগ্রহণবিমুখ সন্ন্যাসী যদি পরিপাটি বেশে সাজিয়া সমাজ মধ্যে বিচরণ করে, তাহা হইলে সে সন্ন্যাসীতে কে সহসা বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহস হইবে?—না সে সন্ন্যাসীর সমাজমধ্যে আদর-অভ্যর্থনা হইবে? ইহা হইতেই অলঙ্কার ব্যবহারের মর্ম্ম মূলতঃ বুঝা যায়।

---

৭ 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধ।

৮. পুরুষও পত্নীবিয়োগে বেশভূষার পারিপাট্যে অল্পাধিক উদাসীন হয়েন। তবে কঠোরকর্ম্মা কঠিনহৃদয় পুরুষ বহিঃসংসারের কঠোর কর্ত্তব্যে পড়িয়া অধিক অধীর হন না এই মাত্র। (লেখক।)

অতঃপর সতীর কথা। 'নারীকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুলোকে সীতাদেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন।... দেখিলে, ভগিনীগণ! ভারতবর্ষ এইরূপে নারীজাতির পূজা করে! তোমরা যদি সতীকে আদর্শ ভাবিয়া আপন আপন চরিত্র গঠন করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমরা কি হইতে পার? কেবল অসাধারণ প্রেমময়ী এবং পাষাণতুল্যা ধৈর্য্যময়ী।' বেশ ত। সতীর আদর্শ লিখিবার জন্যই ত সীতার চিত্র। এই জন্যই ত সীতার তুলনা সীতা। সংসারের সকল বিষয়েই যে এক সীতাকে আদর্শ ধরিতে হইবে ভারতবর্ষ কি তাহাই বলে? সীতার প্রতি রামের ব্যবহার সঙ্গত কি অসঙ্গত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বিচার করা এ প্রবন্ধে অসম্ভব। তবে স্থূলতঃ ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বিপুল প্রকৃতিপুঞ্জের স্বার্থের জন্য রাজাকে ব্যক্তিগত সকল স্বার্থই বিসর্জ্জন দিতে হয়। রাম তাহা করিয়া রামের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের কাছে ইহা ভিন্ন আর পথ ছিল না।

৩

এখন অর্দ্ধাঙ্গ-সম্পর্ক এবং স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতি লইয়া (কঠোরতা-কোমলতা এবং শাসন ও সেবা সম্বন্ধে) আলোচনা করা যাউক।

স্ত্রী পুরুষের অধীন না হইলে স্ত্রীকে পুরুষের সমান কাজ করিতে হইত ; কিন্তু তাহাতে অনেক বিপদের সম্ভাবনা ছিল। তাই নানা কারণে স্ত্রীর অপটুতায়, স্বভাব ও সমাজ উভয়ে মিলিয়া সংসারের সমধিক পরিশ্রম-সাধ্য কঠিন কার্য্যগুলি পুরুষের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিলেন। সেই হইতে পুরুষ এতকাল কঠোরতার মধ্যে গঠিত হইয়া আসিয়াছে। প্রকৃতির দুইটি মূর্ত্তি—কঠোর ও কোমল। স্ত্রী তাই সমাজের কোমলভাগে পরিণত হইয়াছেন। এই কোমল-কঠোর বৈষম্য না থাকিলে সমাজ-সংসার টিকিত না। লেখিকা যে 'Sweet home'-এর কথা বলিয়াছেন, সে Home-এ কি হয়?—

> 'Here man, creation's tyrant casts aside
> His sword and sceptre, pageantry and pride,
> While in his softened looks benignly bend
> The sire, the son, the husband, brother, friend.'

> হেথায় মানব,—সংসারশাসক আসি,'
> ত্যজি সুখে হাসি'
> ভীম অসি, রাজদণ্ড, সমারোহ আর,
> দণ্ড যত তা'র,
> আনত নয়ন প্রেমে অভিভূত হিয়া,
> প্রেমে শিহরিয়া
> পিতা, পুত্র, পতি, ভ্রাতা, প্রিয়বন্ধু-সম
> রাজে অনুপম!

আর এ গৃহে—

'Here woman reigns ; the mother, daughter, wife,
Strew with fresh flowers the narrow way of life!'

ললনার লীলাভূমি এ মর্ত্ত্য-ত্রিদিবে
জায়া, মাতা সবে
কঠোর জীবন পথ দেয় বিছাইয়া
প্রেমপুষ্প দিয়া !

এ মর্ত্ত্য-ত্রিদিবের ললনারাজ্ঞীর কেমন মূর্ত্তি?

'In the clear heaven of her delightful eye,
An angel-guard of loves and graces lie.'

নির্ম্মল উজল তাঁর গগন-তুলন
প্রশান্ত নয়ন,
রাজে তাহে প্রেম দয়া, স্নেহ মূর্ত্তিমান,
মমতা কল্যাণ !

আর কিরূপ তথাকার কর্ম্মের চিত্র ?—

'Arround her kness domestic duties meet,
and fireside pleasures gamble at her feet.'
লক্ষ্য গৃহকার্য্য হয় সম্পাদিত দ্রুত
সে শক্তি সম্ভূত
করুণায়। প্রেমনৃত্যে খেলে শিশু হর্ষে
তারি পদপার্শ্বে।

পাশ্চাত্য দেশেও সুগৃহের ইহাই প্রকৃত আদর্শ চিত্র। বাস্তবিক অন্তঃপুর মধ্যে মমতা কল্যাণ ঢালিয়া দিয়া, শান্তির অনন্ত বিমল আনন্দের প্রবাহ বহাইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদনই স্ত্রীর সেবাব্রত। রাজা যদি প্রকৃতপক্ষে দেশের সেবক, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী, ললনা-রাজ্ঞী তবে গার্হস্থ্য ব্যাপারে সেবিকা দাসী না হইবেন কেন? সংসারে প্রলয় এবং বহিঃসংঘর্ষ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই সমাজে এই শান্তির বিধি হইয়াছে। শান্তিপূত অন্তঃপুরের শান্তিময়ী এই কোমলা মূর্ত্তি-রমণী ; আর কঠোর বহিঃসংসারের কঠিন ছবি—পুরুষ। পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ হইলেও কোমলতা ও কাঠিন্যানুযায়ী রমণী ও পুরুষের কর্ত্তব্য বিভিন্ন প্রকার। স্ত্রী পুরুষের অঙ্গবিভাগ দিবা-রাত্রির ন্যায়। পুরুষ তপ্ত দিবাভাগ,—রমণী জ্যোৎস্নাময়ী ও স্নেহশান্তিরূপিনী যামিনী। অথবা পুরুষ কুঠারের লৌহফলক, স্ত্রী তাহার কাষ্ঠদণ্ড। উভয়ের সহায়তা ভিন্ন সংসারবৃক্ষ

ছেদন করা চলে না। কিন্তু উভয়ের কর্ম্ম পাশাপাশি,—অথচ বিভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী'-তে এ তথ্য সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। পুরুষ-ভাবে গঠিত হইলেও প্রফুল্লকে পরিণামে পতি ব্রজেশ্বরের স্বামীত্ব স্বীকার করিয়া সেবাগত গৃহিণীধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। স্বামীত্ব স্বীকার করিলেই 'গোলাম' হইতে হয় না,—অভিভাবক স্বীকার করা হয় মাত্র। এরূপ না করিলে সভ্যতার গৌরব করা যায় না ; সমাজও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়।

'পুরুষের গৃহই স্ত্রীর গৃহ, স্ত্রীর স্বতন্ত্র গৃহ নাই।' ইহাতে স্ত্রীর ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। যেমন বীজগত বংশ এবং ক্ষেত্রের নামকরণ হয়, তেমনই পিতৃগত কুল এবং গৃহের নামকরণ হয়। ইহা কৃত্রিম সভ্য-সমাজের বিশৃঙ্খলা দূরীকরণোদ্দেশ্যে কৃত্রিম বিধি। স্ত্রী এবং পুরুষের স্বতন্ত্র গৃহ হইলে সমাজ-বন্ধনে শিথিলতা আসিত। পাশ্চাত্যদেশে অনেকেরই গৃহ নাই ; পিতা আসিয়া পুত্রের আবাসে ভোজন করিয়া গেলে 'বিল' পরিশোধ করিতে হয়। সে দেশেও স্বামী-স্ত্রীর আবাস স্বতন্ত্র নহে। সেরূপ স্ব-স্ব প্রধান হইতে গেলে সমাজ থাকে না,—গৃহ থাকে না। প্রাচ্যের আদর্শ সেরূপ নহে। প্রাচ্যের সুদৃঢ় সমাজবন্ধনে হিন্দু-মুসলমান কেহই উক্তরূপ দৃশ্য কখনও দেখিতে চাহিবেন না।

'গৃহ বলিতে আমাদেরই একটি পর্ণকুটির নাই। প্রাণীজগতে কোন জন্তুই আমাদের মত নিরাশ্রয়া নহে। সকলেরই গৃহ আছে, নাই কেবল আমাদের।

'এত বড় সংসারে আমরা 'নিরাশ্রয়া' বলিয়া আমি ভুল করি নাই। এ কথার প্রতিবর্ণ সত্য। আমরা যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, অভিভাবকের বাটীতে থাকি। প্রভুদের বাটী যে আমাদিগকে সর্ব্বদাই রৌদ্র, বৃষ্টি হইতে রক্ষা করে, তাহা নহে। তবু যখন আমাদের চালের উপর খড় না থাকে, দরিদ্রের জীর্ণতম কুটীরের শেষ চালখানা ঝঞ্ঝানিলে উড়িয়া যায়,--টুপ্‌টাপ বৃষ্টিধারায় আমরা সমস্ত রাত্রি ভিজিতে থাকি, চপলাচমকে নয়নে ধাঁধা লাগে,—বজ্রনাদে মেদিনী কাঁপে এবং আমাদের বুক কাঁপে,—প্রতিমুহূর্তে ভাবি, বুঝি বজ্রপাতে মারা যাই,—তখনও আমরা অভিভাবকের বাটীতেই থাকি !... অথবা গেরস্তের বৌ-ঝি রূপে প্রকাণ্ড আটচালায় বাস করিলেও প্রভুর আলয়ে থাকি। আর যখন চৈত্র মাসে ঘোর অমানিশীথে প্রভুর বাটীতে দুষ্টলোক কর্ত্তৃক লঙ্কাকাণ্ডের অভিনয় হয়,—সব জিনিসপত্র সহ ঘরগুলি দাউদাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে,—আমরা একবসনে প্রাণটি হাতে করিয়া কোনমতে দৌড়াইয়া গিয়া দূরস্থিত একটা কুলগাছতলে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকি,—তখনও অভিভাবকের বাটীতে থাকি ! ! (জানি না, কবরের ভিতরেও অভিভাবকের বাটীতে থাকা হয় কিনা ! !),

গ্রন্থকর্ত্রী ভুল বুঝিয়াছেন। কন্যাকে পিতামাতার, বধূকে শ্বশুর-শাশুড়ীর অভিভাবকত্ব স্বীকার করিতে হইবে না—এ কেমন কথা? তবে পুত্রও ত পিতার অভিভাবকত্ব স্বীকার না করিলে পারে ! এই সকল কথায় কি সমাজ-বন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখিবার ভাব বুঝা যায়? স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য সমাজ-সম্মত হইতে পারে না। এ যে মানবের সমাজবন্ধন, ইহা প্রধানতঃ স্ত্রীজাতিকে আশ্রয় দিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল। পুরুষ বরং আশ্রয়হীন হইয়া থাকিতে পারে, স্ত্রী সর্ব্বত্র তাহা পারেন না। সুতরাং স্ত্রীর অভিভাবক প্রয়োজন। যে কারণে অন্তঃপুরের সৃষ্টি, যে কারণে বোরকা ব্যবহারের প্রয়োজন, সেই সকল কারণেই স্ত্রী এবং পুরুষের

কর্ত্তব্য—সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্র—এক বা সমান নহে ; এবং স্ত্রীর অভিভাবক প্রয়োজন। অভিভাবক বিধি বিধান করিয়া সমাজ স্ত্রী-জাতিকে আশ্রয় দিয়াছে,—নানা বিপদ হইতে রক্ষার উপায় করিয়াছে। সমাজের এই উৎকৃষ্ট বিধি তাঁহাদের প্রতিকূল নহে,—এই বিধি স্ত্রীজাতিকে কখনও নিরাশ্রয় করিয়া দেয় নাই। 'ইংরাজীতে Home বলিলে যাহা বুঝা যায়, 'গৃহ' শব্দ দ্বারা আমি তাহাই বুঝাইতে চাই।

লেখিকা তাহা বুঝাইতে পারেন নাই। স্ত্রী-পুরুষের গৃহ স্বতন্ত্র হইলে,—গৃহ অভিভাবকহীন হইলেই কি ঐ 'Home' হইত? ওরূপ হইলে বস্তুতঃ সে Home 'Sweet Home' হইত না, Bitter Home হইত। সম্মিলিত পরিবারের 'গৃহ' যে শান্তি, যে সমবেদনা-সহানুভূতি,—পরস্পরের সহায়তায়, আনন্দের উচ্ছ্বাসে, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতায়—সুখনিকেতন হয়, হর্ষমধুর মুক্ত কলহাস্যে মুখরিত হয়,—স্বতন্ত্র গৃহ সেরূপ হইত না। ঠাঁই-ঠাঁই হইলে শক্তি কমিত, স্ত্রী-পুরুষের 'পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ' আখ্যা অনর্থক হইত।

স্ত্রী যখন বৃষ্টিধারায় ভিজিতে থাকে, তখন কি পুরুষ-অভিভাবকের দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে? যখন দুষ্টলোক-কর্ত্তৃক লঙ্কাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন স্ত্রীদিগকে রক্ষা করাই পুরুষের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই?

তবে, এমন পুরুষ অভিভাবক যদি কেহ থাকেন, যিনি স্ত্রীর বিপত্তি কালে নিদ্রা যান, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহা মৃত সমাজের ব্যক্তিগত বিকৃত চিত্র। তাহার সংস্কার অবশ্যই আবশ্যক।

সংস্কার অবশ্যই আবশ্যক ; কিন্তু সে সংস্কার দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী হওয়া উচিত। শীতপ্রধান প্রতীচ্যে যে সকল সমাজবিধি সঙ্গত, উষ্ণ প্রাচ্যে সে সমস্তই ঠিক উপযুক্ত নহে। কিন্তু সমগ্র ভূমণ্ডলে স্ত্রী এবং পুরুষ এই দ্বিবিধ শ্রেণীকে স্ব স্ব উপযোগীভাবে—কোমল এবং কঠোর এই দ্বিবিধভাবে গঠন করাই সঙ্গত।

অতএব তাঁহাদের শিক্ষাও পুরুষের মত না হইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্যোপযোগী হওয়া উচিত। প্রকৃত সুগৃহিণী যাহাতে হইতে পারেন, তাঁহাদের সেইরূপ শিক্ষারই প্রয়োজন। গ্রন্থরচয়িত্রী 'জেনানা স্কুল-কলেজ' চাহিয়াছেন, 'পাশ করিয়া বিদ্যা' যদি 'শিক্ষা না' হইল, তবে জেনানা স্কুল-কলেজের কি প্রয়োজন?[৯] আর সেখানে শিক্ষাই বা হইবে কিরূপ? যত্ন করিলে মহিলারা গৃহেও যে স্বচ্ছন্দে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, গ্রন্থকর্ত্রীই স্বয়ং তাহা

---

৯. পূর্ব্বতন কালে হিন্দু মুসলমান মধ্যে যে সকল স্ত্রী পুরুষোচিত বিদুষী হইয়াছিলেন, পুরুষের অনুপাতে তাঁহাদের সংখ্যাই বা কত—আর তাঁহারা কয়জনে স্কুল কলেজের শিক্ষা পাইয়াছিলেন? স্ত্রীর পুরুষোচিত বিদ্যা, আর পুরুষের স্ত্রী-উচিত বিদ্যাচর্চ্চায় প্রশংসা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা করা বেশীর ভাগ মাত্র। কোন কোন পুরুষ যে পাকপ্রণালী বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাহা না করিলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যাইত কি? এ বিষয়ে বরং স্ত্রী-লেখিকার কাছেই সমাজ আশা করিয়া থাকেন। পুরুষের লেখা বেশীর ভাগ মাত্র। পুরুষের সকল কার্য্য স্ত্রী এবং স্ত্রীর সকল কার্য্য পুরুষে পরিবর্ত্ত-গ্রহণ করিলে যেমন অঘটন হইত, জাতিগত ও প্রকৃতিগত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া যার যার ইচ্ছামত কার্য্য লইলেও সমাজে সেইরূপ একটা অদ্ভুত বিশৃঙ্খলা ঘটিত। কোন ব্যবসায়ই উৎকর্ষ লাভ করিত না।

আমাদিগকে বুঝিতে দিয়াছেন। সমাজ উদার হইলে শিক্ষা লাভে স্ত্রীজাতির কোনই বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা নাই।

তুলনায় স্ত্রীজাতির শক্তিহীনতা, কর্ত্তব্যের ও শিক্ষার বিভিন্নতা ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা স্ত্রী-পুরুষের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে। জননী-সন্তান সম্পর্কে জননীরূপ রমণীই সংসারে সর্ব্বপ্রধানা। এখানে পুরুষ নগণ্য,—জননীই সব। সন্তানের কাছে সংসার জননীর মহীয়সী শক্তির অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র—জননীর অব্যক্ত অবর্ণনীয় অনন্ত প্রেমমধুর শান্তি মূর্ত্তিময় আনন্দভবন।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই—জন্মিয়াই মাকে দেখে ;—কাঁদে মা বলিয়া, জানে কেবল মাকেই। মার স্তন্য-অমিয়-মর্য্যাদা সংসারের সকলের উপর।—বিশ্বের সকল বিষয়ে মার মহিমা দেখিবার জন্য অন্তর এত ব্যাকুল। মা নামে প্রাণে প্রেম উথলে, শরীরে পুলক দেয়, আবেশে নয়ন গলে—এই জন্য। শোকে সন্তপ্ত, যাতনায় জর-জর—নিরুপায়—নিঃসহায়ে এই জন্যই শান্তির আশায় মা, মা বলিয়া ছুটে! মা এইজন্যই মা! মার তুলনা নাই,—মার বড় নাই। মাতৃরূপে জননীজাতি নিখিল ভুবনে অতুলনীয়, মা নিখিল নম্যা। মাতৃরূপিণী জননীজাতির চরণধূলি রেণুতে এমন কোটি কোটি পুত্র—কোটি কোটি বিশ্ব যুগ-যুগ হইতে প্রেমবিভোরে লুটাইয়া ঘুমাইতেছে।[১০]

বলিয়াছি পাশ্চাত্য আদর্শ প্রাচ্যের উপযোগী নহে। গ্রন্থরচয়িত্রীর নামের পূর্ব্বে, 'মিসেস্' সংযোগ দেখিয়া পাশ্চাত্যে যে তাঁহার অনুরাগ আছে, তাহা বুঝিলাম। ইহা বুঝিতে আমাদের কষ্ট হয়। প্রাচ্যের কি কিছুই নাই,—না ছিল না? আমরা জানি, প্রাচ্যের সংস্পর্শেই পাশ্চাত্য আজ এত উন্নত। কাচ, টিন, মাটির দুইটা বিলাস-সামগ্রী, তামসিক উন্নতিসূচক ঐশ্বর্য্যসম্ভার লইয়া নবাভ্যুত্থিত প্রতীচ্য উপস্থিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানভাব-বৃদ্ধ প্রাচ্য কি সর্ব্বদা তাহার অনুকরণ করিবে? আমরা এমন কথা বলি না যে, পাশ্চাত্যের কাছে বর্ত্তমানে আমাদের কিছুই শিখিবার নাই; কিন্তু প্রকৃত সভ্যতা এবং সমাজাদি সম্বন্ধেও কি প্রাচ্য পাশ্চাত্যের নিকট শিখিতে যাইবে? আমাদের বহির্ব্বাটী যে কারণেই হউক, পাশ্চাত্যের ভাবসাগরের তরঙ্গ মধ্যে ডুবু-ডুবু। আমাদের অন্তঃপুরও যদি ঐ ভাবে ডুবিতে যায়, তবে বড় আশঙ্কার কথা। আমরা তাহা আশা করি না। অন্তঃপুরে প্রাচ্যভাব আছে বলিয়াই আজও প্রাচ্যের চিহ্ন সংসারে টিকিয়া আছে। আমরা কামনা করি, প্রাচ্য-ললনা প্রাচ্যভাবে জাগিবেন।

ভারত ললনা না জাগিলে দেশ জাগিবে না সত্য, কিন্তু জেনানা-কলেজ করিয়া পুরুষের পূর্ণদাসত্ব শিক্ষার দিনে স্ত্রীরাও দাসত্বোপযোগী শিক্ষা শিখিলে এবং সেই ভাব সন্তানাদিতে বর্ত্তাইলেই কি দেশ জাগিবার উপায় হইবে? এ শিক্ষা ত শিক্ষা নহে। বরং দেশ জাগাইতে হইলে পুরুষেরও বর্ত্তমান শিক্ষার পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। ভারতললনা প্রকৃত ভারতললনার

১০. মার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াও পুরুষ-শিশুতে পৌরুষভাব ফুটে, কন্যা কোমল হয়—স্বভাবের নিয়মে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম—ইহার ব্যতিক্রম অসম্ভব। (লেখক)

উপযুক্ত সুগৃহিণী এবং সুজননী যাহাতে হইতে পারেন সেইরূপ শিক্ষা পাইলেই দেশ জাগিবে,—অন্যরূপ শিক্ষায় নহে।

অতএব সন্তানকে সুসন্তান করিতে হইলে সুজননী গঠন কর্ত্তব্য। এইজন্য আমরা অন্তঃপুরে জননীজাতির পূর্ণ স্বাধীনতা দেখিতে চাই। অন্তঃপুরে মুক্ত বায়ুর, মুক্ত আলোর প্রবেশ দেখিতে চাই। উপযোগী স্ত্রীশিক্ষায় সমাজের উদারতার আকাঙ্ক্ষা করি। ব্যায়াম,—সুগৃহিণীরা তাঁহাদের গৃহকার্য্যগুলি যত্নে সুলক্ষ্যে সম্পাদন করিলেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা এইরূপ সংস্কারই কামনা করি। ইহাতে তাঁহাদের ভীরুতা ঘুচিবে, অথচ কোমলতার ব্যাঘাত ঘটিবে না। প্রাচ্যের উন্নতি পাশ্চাত্য ভাবে নহে ; প্রাচ্য ভাবেই হইবে।

এখন এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যখন 'নবনূরে' স্বতন্ত্র ভাবে প্রবন্ধগুলি পড়িয়াছিলাম, তখন ঐ সকলের কতক কথায় সহানুভূতি ছিল, কতকে ছিল না। সাময়িক দুই একটা প্রতিবাদও হইয়াছিল মনে পড়ে। তখন জানিতাম না, লেখিকা পূর্ব্বাকারেই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থনিবদ্ধ করিবেন। এ কয় প্রবন্ধে 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য প্রবন্ধে সংস্কার আবশ্যক ছিল। তথাপি তাঁহার 'মতিচূরে'র দ্বিতীয় ভাগ দেখিবার আশায় সকল সাহিত্যহিতৈষীই উদ্‌গ্রীব রহিয়াছে ; আমরাও রহিলাম। ভরসা করি দ্বিতীয় ভাগে আমরা মনোমত বস্তু পাইব। 'পিপাসা' আমাদিগকে যেরূপ পিপাসিত করিয়াছে, আমরা অচিরে তদুপযুক্ত সুশীতল জল পাইবার কামনা করি।

ভগবানের কাছে আমরা রচয়িত্রীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি আর কামনা করি,—সমাজের মঙ্গল-উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল প্রকৃত ক্ষত চিত্র দেখাইয়া সমাজ সংস্কারে সকলকে আহ্বান্ করিয়াছেন, সে সমস্তের উপযুক্ত সংস্কার হউক। তাঁহার মঙ্গল-উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'ক,—তাঁহার পরিশ্রম সার্থকতা লাভ করুক।

যাঁহার সহায়তায় তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, শিক্ষা-প্রসূত এ অমূল্য রত্নখণ্ড তিনি তাঁহার সেই হৃদয়বান ভ্রাতার নামেই উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহাতে শুধু লেখিকার নহে, পাঠকেরও আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সেই সহৃদয় ভ্রাতার প্রতি স্বতঃই উৎসারিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে, গ্রন্থরচয়িত্রী তাঁহার কর্ত্তব্য ভাল বুঝিয়াছিলেন ; পাঠকেরাও কর্ত্তব্য ভুলিবে না।

গ্রন্থকর্ত্রীর সাধনা সফল হউক। গ্রন্থের কোন-কোন বিষয়ের সহিত আমাদের মতদ্বৈধ থাকিলেও আমরা তাঁহার লেখনীর ক্রমোন্নতি ও সাফল্য বাঞ্ছা করি।

'নবনূর' পত্রিকায় ১৩১২ সনের ভাদ্র সংখ্যায় 'মতিচূরে'র একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার বার্ষিক সূচিপত্রে গ্রন্থসমালোচকের নাম আছে মৌলভী আবদুল করিম ও সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী। কাজেই এই সমালোচনাটি এই দুজনেরই কোনো-একজনের লেখা।—

বাইবেলে আছে, দূর হইতে একজন লোককে কিম্ভুতকিমাকার বলিয়া বোধ হইয়াছিল, যখন সে কিছু নিকটে আসিল তখন দেখা গেল যে সে মানুষ, পরিশেষে সে দর্শকের সম্মুখে আসিয়া পড়িলে দেখা গেল যে সে ব্যক্তি তাহারই ভাই। আমরা 'মতিচূরে'র সম্বন্ধেও সেই

কথা বলিতে পারি। মতিচূরের প্রবন্ধগুলি যখন প্রথমে 'নবনূরে' প্রকাশিত হয়, তখন তাহা পাঠে আমাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ টুটিয়া গিয়াছিল। সে অবস্থায় তাহাতে যে কিছু ভাল আছে আমরা এমন একটি কল্পনাই মনে স্থান দিতে পারি নাই। এই উত্তেজনার ভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পর গ্রন্থখানি পুনরায় পাঠ এবং সেই সময় মতিচূর সম্বন্ধে হৃদয়ে একটু অনুকূল ধারণা জন্মে। তৎপর সংযতভাবে আর একবার বিষয়গুলির আলোচনা করিতে যাইয়া দেখি, লেখিকার সকল কথা না হইলেও অনেক কথাই নিরেট সত্য এবং মতিচূর প্রকৃত মতিচূরই বটে। উপযুক্ত পাকে ফেলিয়াই লেখিকা এই মতিচূর প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই, সকলই মনোজ্ঞ হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং রচনা-ভঙ্গি (style) অতি মনোরম। কোন পুরুষ লেখকের পক্ষেও এইরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা শ্লাঘার বিষয়। লেখিকা তাঁহার বক্তব্য ভাল করিয়াই বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। তাঁহার সকল মতের সহিত আমাদের ঐক্য না থাকিলেও আমরা কর্ত্তব্যানুরোধে এইরূপ আলোচনার জন্য তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

মতিচূর-রচয়িত্রীর একটি দোষের কথা এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গ্রন্থ মাদ্রাজের Christian Tract Society-র প্রকাশিত Indian Reform সম্বন্ধে পুস্তিকাসমূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়াই আমাদের ধারণা। খৃস্টধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া আমাদের সম্বন্ধে পাদরী সাহেবগণ যা বলেন বা বলিয়াছেন, লেখিকার নিকট তা অভ্রান্ত সত্য রূপেই পরিগণিত হইয়াছে। তাঁহার মতে আমাদের সবই কু, আর ইউরোপ-আমেরিকার সবই সু। এইরূপ বলিবার পূর্বে তাঁহার ভাবা উচিত ছিল যে এই পর-পদদলিত এসিয়াই ইউরোপের শিক্ষাগুরু, এবং এসিয়ায় যখন ধর্ম ও জ্ঞান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে তাহার বহু পরেও ইউরোপের বর্বরতার অবসান হয় নাই। আজ এসিয়া নিদ্রিত বলিয়া চিরদিনই সে এরূপ নিদ্রিত থাকিবে না। নৈসর্গিক উপায়ে যখন সে জাগরিত হইবে, তখন সে তাহার নিজের ত্রুটি নিজেই দূর করিতে চেষ্টা করিবে এবং তাহার সে চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হইবে।

সমাজ-সংস্কার করা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা। চাবুকের চোটে সমাজ-দেহে ক্ষত হইতে পারে, কিন্তু তদ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি বা অভাব পূরণ হয় না। মতিচূর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন, ইহাতে যে কোন সুফল ফলিবে—আমরা এমত আশা করিতে পারি না। তিনি যদি সংযতভাবে বিদ্বেষহীন ভাষায় নারীজাতির দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিতে পারেন তাহা হইলে সমাজে রক্ষণশীলত্বের বন্ধন আপনাআপনি শিথিল হইয়া আসিবে নতুবা যদৃচ্ছা right and left চাবকাইয়া তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না ইহা নিঃসংশয়ে ও নিরুদ্বেগে বলা যায়।

মতিচূরের 'পিপাসা' ও 'গৃহ' এই দুটি নিবন্ধই আমাদের সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে অর্থ এই যে আমরা ইহা পড়িয়া হৃদয়ে কিছু সত্য, কিছু ধ্রুব বিষয়ের ধারণা করিতে পারিয়াছি। 'গৃহে' যে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে মিথ্যার বার্ণিশ বিন্দু পরিমাণও নাই। আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যেসব দৃশ্য অভিনীত হইতে দেখিতেছি, লেখিকা

এক্ষেত্রে তাহারই জীবন্ত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। 'সুগৃহিণী' সম্বন্ধে আমাদের যকিঞ্চিৎ কর্তব্য আছে। আমরা 'সুগৃহিণী' চাই সত্য, কিন্তু আমরা এমন গৃহিণী চাই না যাঁহারা কেবল সারাদিন Horticulture, Chemistry বা Physics নিয়া ব্যস্ত থাকিবেন। তাহা হইলে আমাদের ন্যায় মধ্যবিত্তর অবস্থার লোকদিগকে উপবাস করিয়াই থাকিতে হইবে। গৃহিণীদের যে বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান থাকিলে কোন আপত্তির কারণ নাই, কিন্তু তাঁহারা সকলেই যদি বিজ্ঞানের গভীর গবেষণায় মনোনিবেশ করেন তবে আমাদের গৃহ নিশ্চয়ই শ্মশান হইবে এবং আমরা 'গৃহহীন' হইব। আর পাকশালে গিয়া কেহ যে theory of Heat এর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভাল পাক করিতে পারিবেন এমত ভরসাও আমরা করি না। সেরূপ অবস্থায় তাঁহারা চালে-ডালে এক না করিলেই রক্ষা। এই সমুদয় লিখিবার কালে লেখিকার ভাবা উচিত ছিল যে, তাঁহার পক্ষে যাহা সম্ভব আমাদের দেশের নারীজাতির সকলের পক্ষেই তাহা সম্ভবপর নহে। সুযোগ ও সুবিধা সকলের সমান থাকে না। 'অর্দ্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের উপসংহার ভাগের সহিত আমাদের দ্বন্দ্ব করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের অর্দ্ধাঙ্গীরা যদি 'স্বামীর' পরিবর্তে 'অর্দ্ধাঙ্গ' শব্দ ব্যবহার করিলে তুষ্ট হন, তবে আমরা আবহমানকাল প্রচলিত জীর্ণ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া নূতন উপাধি গ্রহণের জন্য আহ্লাদের সহিত প্রস্তুত আছি। লেখিকা যদি সমগ্র সমাজের মত গ্রহণ করিয়া এ বিষয়ের একটি সুমীমাংসা করিতে পারেন আমরা (স্বামীবর্গ) তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। 'আমাদের অবনতি' সম্বন্ধে আমাদের নূতন কিছু বলিবার নাই। পূর্বে দু একজন এ বিষয়ে সোরগোল করিতে গিয়া এখনও খোঁচা খাইতেছেন দেখিয়া আমরা পূর্বাহ্নেই সাবধান হইয়াছি।

'দি মুসলমান' পত্রিকার ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল রোকেয়ার 'মতিচূর' গ্রন্থের এই আলোচনা।—

Matichur.—We have received a copy of the 2nd edition of Mrs. R.S.Hossain's "Motichur" and are glad to note certain changes which have made the view expressed therein acceptable of people of different shades to opinion. The book deals principally with the position of woman in our society and the learned authoress impresses upon the necessity of raising the status of her as may enable her to be man's help-mate in life, instead of being a cumbrous burden the weight of which impedes the onward march of man and thus of the entire human race at large. The advanced view of the talented authoress as expressed in the book, her study of human and human weakness, her knowledge of men and things manifasted there in extort admiration of her. Her courage of education is remarkable. In reviewing her book we have been rather unconsciously reviewing herself, but we thing we are doing nothing wrong. The book is written in chaste Bengali and the article on 'Sugrihini' or good housewife ought to be read not only by literate women but also by those men who have not bestowed any serious

thought on the duties of women. From her delineation of ideal sister, ideal wife and ideal mother, it seems the authoress herself is the embodiment of that ideal. She has said much about the existing Purdah system, but it would be a sheer mistake if there be any presumption in anybody's mind that she wants to do away with the system altogether. Her ideas about nation and nationality as expressed in the book have not been approached even by a minute fraction of the male members of the community and we congratulate the learned authoress on her happy production.

মতিচূর : দ্বিতীয় খণ্ড

মিসিস আর এস হোসেন প্রণীত মতিচূর (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৮ সালে। 'কলিকাতা ৮৬–এ সার্কিউলার রোড' থেকে প্রকাশিত। মুদ্রক : জে. সি. ঘোষ, কটন প্রেস, ৫৭ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। 'Published by the Authoress, 86 A Lower Circular Road, Calcutta'. পৃষ্ঠা ১২ + ২৩২।

'মতিচূর' দ্বিতীয় খণ্ডের 'ভূমিকা' হিসেবে অনুকূলচন্দ্র রায় বি.এ.–র এই রচনাটি মুদ্রিত হয়েছিল।—

প্রায় পনর বৎসর আগে 'মতিচূরের' প্রথম খণ্ড বাহির হয়। নানা কারণে এতদিন পরে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইল। আমাদের আশা, এ খণ্ডও আগের খণ্ডের মত সমাদর লাভ করিবে।

নারীর কথা ও নারীর ব্যথা এই মহিলার লেখনীতে যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা প্রায় সব সময় দেখা যায় না। বাংলাদেশের এক মুসলমান লেখিকার পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়। লেখিকা নিজে নানা অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও লেখাপড়া শিখিয়াছেন ; তাঁহার শিক্ষা যে সার্থক ও সফল হইয়াছে তাহার পরিচয় এই দুইখানা পুস্তকেই পাওয়া যায়। শিক্ষার গুণে আমাদের মন ও আত্মা উন্নত ও প্রসারিত হয়, আর আমরা অজ্ঞান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন হইয়া উঠি। এই মহিলা আমাদের নারীসমাজকে, এবং বিশেষ করিয়া মুসলমান নারীদিগকে এইরূপ শিক্ষার জন্য উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে বিদ্রূপ ও উপহাস সহিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি যেরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজ ও সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, তাহা অনেকের পক্ষে শিখিবার বিষয়।

লেখিকা শুধু ভাব লইয়া খেলা করেন নাই, প্রায় সকল স্থানেই তিনি যুক্তি দেখাইয়াছেন। অনেক সময় তাঁহার মতের সঙ্গে হয়ত অন্যের মত মিলিতে না পারে, কিন্তু তাঁহার রচনায় যে অনেক ভাবিবার বিষয় আছে তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। শুধু তাই নয়, অনেক সময় লেখিকা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে যেসব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মূল্য কথা–কাটাকাটি অপেক্ষা বেশি। আজকাল অনেক মহিলা নারী–সমাজের কথা লইয়া নানারূপ আলোচনা করিতেছেন, কিন্তু এই লেখিকা বহুদিন হইতেই নারীদের কল্যাণে চিন্তা করিতেছেন।

'মতিচূরের' প্রথম খণ্ড কতকগুলি সন্দর্ভের সমবায়। ইহার এই দ্বিতীয় খণ্ডে দুইটি সন্দর্ভ ছাড়া আর সবগুলিই একটু নতুন ধরনের গল্প। প্রথম সন্দর্ভটি অ্যানি বেশান্তের ইসলাম সম্বন্ধীয় বক্তৃতার অনুবাদ। ইহা দ্বারা আমরা ইসলামের প্রকৃত মহত্ত্ব ও পয়গম্বরের বাণী সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞানলাভ করি। দ্বিতীয় সন্দর্ভটি "শিশুপালন' বিষয়ে লিখিত। ইহাতে অতি ঝর্‌ঝরে চলিত ভাষায় অনেক কাজের কথার আলোচনা আছে। এই দুটি ছাড়া এই পুস্তকে 'সৌরজগৎ', 'সুলতানার স্বপ্ন', 'ডেলিশিয়া হত্যা', 'জ্ঞান-ফল', 'নারী-সৃষ্টি', 'নার্স নেলী' ও 'মুক্তি-ফল' নামে কয়েকটি গল্প ও রূপক বাহির হইল। এগুলির মধ্যে 'সুলতানার স্বপ্ন' একটু হাস্য-রসাত্মক রচনা। এই গল্পে লেখিকা বর্তমান 'জেনানার' পরিবর্তে যে 'মর্দ্দানার' ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বেশ উপভোগের বিষয় হইয়াছে। 'ডেলিশিয়া হত্যা' প্রসিদ্ধ লেখিকা মেরী করেলির 'Murder of Delicia' নামক উপন্যাস হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে নারী-সমাজের একটি করুণ কাহিনী ফুটিয়া উঠিয়াছে। সভ্যদেশেও স্বাধীনতা পাইয়াও যে নারীর দুর্দ্দশার সীমা নাই, পুরুষ-শাসিত সমাজ ও পুরুষ গঠিত আইন যে নারীকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া অপমান করিতে ত্রুটী করে না, তাহা এই গল্পে দেখান হইয়াছে। 'নার্স নেলী' গল্পটি নারী-জীবনের আর এক দিক দেখাইয়া নারীদিগকে বাহিরের মোহ হইতে সাবধান হইতে এবং গৃহের শান্তি ও পবিত্রতার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতে উপদেশ দিতেছে। অন্য গল্পগুলিতে নারীর মর্যাদা ঘোষণা করিয়া নারীর অন্তরের বল জাগাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

আজকাল আমাদের দৃষ্টি দেশের দিকে ফিরিতেছে। দেশের নানা কাজের মধ্যে নারীদের উন্নতি একটি প্রধান ব্যাপার। এই কাজে বহুদিন হেলা করিয়া আমরা যে অপরাধ করিয়াছি তাহার ফল আমাদিগকে ভুগিতে হইতেছে। নারী যতদিন নিজ গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত না হইবেন, ততদিন সমাজের মঙ্গল নাই। হিন্দু বা মুসলমান যে কোন সমাজে নারীর অনেক কাজ করিবার রহিয়াছে। কেবল এদেশে নহে, সকল দেশেই নারী-সমস্যা অতি বিষম হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমাদের সমাধান হইবে, কারণ এদেশ কখনও প্রকৃত উন্নতিকে বাধা দেয় নাই। যদি এই সমস্যা সমাধানে বর্তমানে লেখিকার রচনাগুলি নারীকে জাগাইতে এবং পুরুষকে ভাবাইতে পারে তবে তাঁহার লেখনী ধন্য হইবে।

অগ্রন্থিত প্রবন্ধ

রোকেয়ার জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থের বাইরে যেসব প্রবন্ধ পাওয়া গেছে সেগুলি 'অগ্রন্থিত প্রবন্ধ' শিরোনামে সংকলিত হলো। এখানে প্রবন্ধগুলির স্থান ও কাল নির্দেশ করা গেলো। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলিও চয়ন করা হলো।—

কূপমণ্ডূকের হিমালয় দর্শন। 'মহিলা', কার্তিক ১৩১১।

রসনা-পূজা। 'নবনূর', অগ্রহায়ণ ১৩১১।

ঈদ-সম্মিলন। 'নবনূর', পৌষ ১৩১২।

নারী-পূজা। 'মহিলা', পৌষ ১৩১২; মাঘ ১৩১২; ফাল্গুন ১৩১২।

আশা-জ্যোতিঃ। 'নবনূর', জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩।

মোসলমান কন্যার পুস্তক সমালোচনা। 'মহিলা', ভাদ্র ১৩১৩।

দজ্জাল। 'মহিলা', ভাদ্র ১৩১৪।

সিসেম ফাঁক। 'সওগাত', অগ্রহায়ণ ১৩২৫।

চাষার দুক্ষু। 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা', বৈশাখ ১৩২৮।

এণ্ডি শিল্প। 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', কার্তিক ১৩২৮।

কাটা মুণ্ডু কথা কয়। 'বঙ্গলক্ষ্মী', মাঘ ১৩৩২।

রাঙ্ ও সোনা। 'সওগাত', আশ্বিন ১৩৩৩।

বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতি (সভানেত্রীর অভিভাষণ]। 'সওগাত', চৈত্র ১৩৩৩। এই অভিভাষণটি 'Bengal Women's Educational Conference-এ (বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে) পঠিত হয়।

লুকানো রতন। 'সওগাত', আষাঢ় ১৩৩৪।

রানী ভিখারিনী। 'মাসিক মোহাম্মদী', পৌষ ১৩৩৫।

বেগম তরজীর সহিত সাক্ষাৎ। 'সওগাত', ভাদ্র ১৩৩৩।

সুবেহ্ সাদেক। 'মোয়াজ্জিন', আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩৭।

৭০০ স্কুলের দেশে। 'সওগাত', কার্তিক ১৩৩৭।

ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম। 'মাসিক মোহাম্মদী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

পত্রিকায় মুদ্রিত নোট :

গত ৮ই মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় 'সাখাওয়াত মিমোরিয়াল গার্লস স্কুলের' ম্যানেজিং কমিটির অধিবেশনে উপরোক্ত লেখাটি সেক্রেটারী সাহেব কর্তৃক পঠিত হয়। সভার প্রেসিডেন্ট সাহেবও উপস্থিত ছিলেন।

লেখাটি সম্পর্কে সম্পাদকীয় নোট :

পরম ভক্তিভাজন বেগম ছাখাওয়াত হোছেন সাহেবার এই প্রবন্ধটি আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত পত্রস্থ করিলাম। প্রকৃত কাজের কদর যে-সমাজে নাই, তাহাতে কাজের লোকের সৃষ্টি খুব কমই হইয়া থাকে ; এবং কৃচিৎ কদাচিৎ হইলেও সমাজের উপেক্ষা ও অবহেলার আঘাতে অনেক সময়ে মানুষের প্রাণ অবসাদে-অভিমানে মুসড়িয়া পড়ে। লেখিকার ন্যায় আদর্শ-মহিলা সম্বন্ধে এরূপ আশঙ্কা করার যে বিশেষ কোন কারণ নাই, তাহা অবগত আছি। কিন্তু তত্রাচ বলিতে হইতেছে, তাঁহার এই লেখার ছত্রে ছত্রে, বাহিরের হাসি-কৌতুকের অন্তরালে ক্ষোভের একটা মর্ম্মান্তিক জ্বালা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছি। সমাজের চরম দুর্ভাগ্য না হইলে, আমাদিগকে আজ এ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইত না।

এই প্রবন্ধে লেখিকা এক স্থানে বলিয়াছেন,—'আমার কোন বংশধর নাই।' আমরা তাঁহার এই ধারণার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি। আল্লাহ্-তাআলার মঙ্গলময়ত্বের কোমল-কঠোর আঘাতে যে মাতৃহৃদয়ের বিগলিত করুণা-ধারা 'পিপাসার' নামে কারবালার মরু-প্রান্তরেও স্বর্গের ছল-ছবিল প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, একের বাঁধ ভাঙ্গিয়াই ত সে আজ সহস্রমুখী হইতে পারিয়াছে। তাই ত আজ তিনি একটিকে বিসর্জ্জন দিয়া শত-সহস্র কন্যার মাতৃ-কর্তব্যের গৌরবময় জ্বালা বুক পাতিয়া লওয়ার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন।

'হজ্বের ময়দানে' ('মাসিক মোহাম্মদী', বৈশাখ ১৩৩৯) প্রবন্ধটির ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ইহ্রাম সম্পর্কে সম্পাদকের নোট :

'ইহ্রাম' নরনারী নির্বিশেষে সকলকে বাঁধিতে হয়। তবে স্ত্রী ও পুরুষের জন্য ইহার প্রকারভেদের ব্যবস্থা আছে। মুখ আবৃত করিয়া রাখাই নারীদের ইহ্রামের প্রধান অঙ্গ।

—সম্পাদক, 'মাসিক মোহাম্মদী'

বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল [সফল স্বপ্ন]। 'মোয়াজ্জিন', অগ্রহায়ণ ১৩৩৯।

গুলিস্তাঁ। 'গুলিস্তাঁ', পৌষ ১৩৩৯।

কৌতুক-কণা। 'গুলিস্তাঁ', মাঘ ১৩৩৯।

নারীর অধিকার। ('মাহে-নও' মাঘ ১৩৬৪) পত্রিকায় প্রকাশিত 'নারীর অধিকার' প্রবন্ধের সংগ্রাহিকার নোট :

১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর, বাংলার মুসলিম মেয়েদের জাগরণের অগ্রদূতী বেগম রোকেয়া বিদায় নিয়েছেন এই মাটির পৃথিবী থেকে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চিন্তা করেছেন এদেশের অভাগিনী মুসলিম নারী জাতির কথা। ৯ই ডিসেম্বর ভোর রাত্রে তিনি ইন্তেকাল করেন। সে রাতেই তিনি ১১টা পর্যন্ত তাঁর টেবিলে বসে কাজ করেছিলেন। যে টেবিলে শেষ লেখাপড়ার কাজ ক'রে তিনি গিয়েছিলেন, সেখানে পরদিন এই অসমাপ্ত লেখাটি পেপার ওয়েটের নীচে দেখা গিয়েছিল।

তিনি ছিলেন তাঁর আত্মীয়-স্বজন, তাঁর পরিবারের সকলের গৌরবের পাত্রী। তাই, তাঁর মৃত্যুর পরে আমার জন্ম হ'লেও আমার অক্ষর পরিচয়ের আগেই হয়েছিল বেগম রোকেয়ার অপূর্ব্ব জীবন-ইতিহাসের সাথে পরিচয়। তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তের সাথীর একজনের কাছ থেকে কিছু দিন আগে পেয়েছি তাঁর শেষ চিন্তাধারার দিশা—যে লেখা আরম্ভ ক'রে শেষ করবার অবকাশ আর তিনি পেলেন না মহাকালের ডাকে।

বেগম রোকেয়ার মৃত্যুকালে তাঁর চাচাতো বোন মরিয়ম রশীদ সাহেবা সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে তাঁর কাছেই ছিলেন। তিনি এই লেখাটি বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর পর তাঁর টেবিল থেকে নিয়ে পরম যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন। বছর দুই আগে বেগম মরিয়ম রশীদ পরলোকগমন করেছেন। তার কিছুদিন আগে তিনি লেখাটি বেগম রোকেয়ার প্রিয় শিষ্যা ও সহকর্মিনী বেগম শামসুননাহার মাহ্মুদের হাতে দেন।

বর্তমানে পুরুষের একাধিক বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। বিবাহ ও পারিবারিক আইন, এ–সবের আলোচনা চলছে। কিন্তু সে–যুগেও বেগম রোকেয়ার নেতৃত্বে বিবাহ–বিচ্ছেদ ও নারীর অধিকার নিয়ে আন্দোলন চলেছিল। এতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেগম সখিনা ফাররুখ, সুলতানা মুয়ায়িদজাদা, বেগম শামসুননাহার মাহমুদ ও আরও বহু মহিলা।

পুরুষদের তালাক দেবার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিবাহ করা সম্বন্ধে উত্তর–বঙ্গের কিছু আভাস এই লেখাটিতে বেগম রোকেয়া দিয়ে গিয়েছেন। বেগম রোকেয়া আজ সশরীরে আমাদের মাঝে নেই ; কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে। তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার আমাদের তুলে নিতে হবে। তাঁর আরব্ধ মহৎ কাজ সম্পন্ন ক'রেই তাঁর স্মৃতির প্রতি প্রকৃত সম্মান আমরা প্রদর্শন করতে পারি। জীবনের শেষ মুহূর্তেও তাঁর লেখনী দিয়ে গেছে আমাদের কাজের দিশা। তিনি যে দিশারী।

—মোশফেকা মাহমুদ ('নারীর অধিকার' প্রবন্ধটির সংগ্রাহিকতা)

পদ্মরাগ

মিসিস আর এস হোসেন প্রণীত 'পদ্মরাগ' উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩১ সালে। 'কলিকাতা, ৮৬ এ লোয়ার সারকুলার রোড হইতে গ্রন্থ–রচয়িত্রী কর্তৃক প্রকাশিত'। মূল্য : দেড় টাকা মাত্র। মুদ্রক : লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, এইচ. ডি. দত্ত, ৪৪ মদন বড়াল লেন, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণে লেখা ছিল : সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। পৃষ্ঠা ১০ + ১৮৮ + ১৪।

'পদ্মরাগ' গ্রন্থের 'ভূমিকা' হিসেবে কলকাতার ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক বিনয়ভূষণ সরকারের এই রচনাটি প্রকাশিত হয়।—

পূর্ব্বে কোন গ্রন্থের ভূমিকা কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির দ্বারাই লিখিত হইত। এই পুস্তকের মাননীয় লেখিকা আমার ন্যায় সাহিত্য–জগতে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির হস্তে কেন এ ভার অর্পণ করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বর্তমান চারিদিকের হাওয়া—অবজ্ঞাত ও নগণ্যদিগকে তুলিয়া ধরার দিকেই প্রবাহিত—আমাকে ভূমিকা–লেখক পদে তুলিয়া ধরা বোধ হয় সেই বাতাসেরই একটী তরঙ্গ। যুগধর্ম্মের শাসন আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলাম।

ভূমিকা লেখায় আমাকে বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। মুরুব্বিয়ানা ও সর্দ্দারির দিন চলিয়া গিয়াছে। আমি সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দিব, রায় প্রচার করিব, আর তুমি আমার চোখ দিয়া সৌন্দর্য্য দেখিবে ও আমার রায় মানিয়া লইবে—এমন নির্ব্বিচার বাধ্যতার দিন আর নাই। ঝাল নিজের মুখেই খাইতে হয়, পরের মুখ খাওয়া চলে না।

পুস্তকখানির গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে পুস্তকখানি পড়িতে হইবে। আমি শুধু এই বলিতে পারি—এ গ্রন্থ পাঠ করিলে কাহারও সময়ের অপব্যবহার হইবে না। খুব আশা করি, অনেকের মনেই শুভ ভাব ও শুভ সঙ্কল্প জাগ্রত হইবে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান্—সকল সমাজেরই অনেক ক্ষতস্থান দেখিয়া মর্মে ব্যথা অনুভব করিতে হইবে। গ্রন্থকর্ত্রী শুধু ক্ষতস্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াই আপনার কর্তব্য শেষ করেন নাই—"তারিণী-ভবনের" পরিকল্পনায় তিনি ব্যাধির সমাধানেরও ইঙ্গিত করিয়াছেন। এজন্য তাঁকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। উদার হৃদয়, আন্তরিক প্রেম ও প্রকৃত সহিষ্ণুতা—সকল সমস্যা পূরণের এই তিনটী মূলমন্ত্র। পাঠক 'তারিণী-ভবনে' এই তিনেরই সমাবেশ দেখিতে পাইবেন।

উপন্যাসের চরিত্রগুলির সম্বন্ধে কোন রায় প্রকাশ করিব না—পাঠকগণ নিজের নিজের হৃদয়ের কষ্টিপাথরে তাহাদের যাচাই করিয়া লইবেন। একই চন্দ্র যোগীর হৃদয়ে, কবির হৃদয়ে, বৈজ্ঞানিকের হৃদয়ে ও প্রেমিকের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাব উদ্বোধিত করিয়া তুলে। আলো ছায়ার ভিত্তির বিভিন্নতায় ছবির পার্থক্য হইয়া দাঁড়ায়। অনেক সময় গ্রন্থকারের নিজের ভাবও সুযোগ্য পাঠকের মধুর প্রাণের রঙে বিচিত্র শোভায় উজ্জ্বলতররূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। ইহাই বাঞ্ছনীয়—এক্ষেত্রে অনুশাসন সুফলপ্রসূ নহে। সেই জন্য আমি শুধু বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া আমার এই অদ্ভুত ভূমিকার উপসংহার করিলাম। এই অনুরোধ করাই এই ভূমিকার একমাত্র উদ্দেশ্য।

নিজের পক্ষ হইতে গ্রন্থকর্ত্রীকে হৃদয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি জানিয়া সুখী হইবেন যে, তাঁহার গ্রন্থপাঠে এই পাষাণ হৃদয়েও কিছু কিছু দাগ পড়িয়াছে।

'পদ্মরাগ' উপন্যাসের পরিশিষ্টে স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর আবদুল করিমের মন্তব্য গৃহীত হয়। এখানে বইয়ের পরিশিষ্টাংশ অবিকল উদ্ধৃত হলো।—

13/1, Wellesley Square,
CALCUTTA
The 3rd January, 1924

DEAR MRS. HOSSEIN,

Please accept my most hearty congratulations on the completion of your 'Padmarag'. It was with very great interest and pleasure that I went through its manuscript. I have no doubt the book will prove most interesting and instructive to those who read Bengali books. The book seems one of the best of its kind (perhaps the best) in Bengali. Of the new novels I have read one is East Lynne by Mrs. Henry Wood : your book will be in Bengali what East Lynne is in English. I am sure the book will have a large sale.

Yours sincerely,
ABDUL KARIM.

[THE HON'BLE MAULVI ABDUL KARIM, M.A.,
Member of the Council of State,
Retired Inspector of Schools,
Honorary Fellow of the Calcutta University]

'মোহাম্মদী' পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩৩৭ সংখ্যায় কবি শাহাদাৎ হোসেন 'পদ্মরাগে'র একটি সমালোচনা লেখেন। সমালোচনাটি নিম্নরূপ—

'পদ্মরাগ' একখানি উপন্যাস। তবে আজকাল উপন্যাস বলিতে আমরা সাধারণভাবে যাহা বুঝি, ইহা সে শ্রেণীর উপন্যাস নহে। লেখিকা নিজের ব্যক্তিগত জীবনে যে জিনিসটাকে সবচেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছেন, পদ্মরাগের ভিতর দিয়া তাহাই তিনি সুন্দর করিয়া ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার এ-রচনা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক দিয়া সার্থক হইয়া ফুটে নাই বটে, কিন্তু যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা সুন্দর ও সার্থক বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

এই উপন্যাসের কেন্দ্র 'তারিণী-ভবন' অনাথাশ্রম (অনাথাশ্রম বা বিদ্যাশ্রম যাহাই বলুন)। এবং ইহাকেই অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসের ঘটনা ও নায়ক-নায়িকার চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। তারিণী-ভবনের প্রতিষ্ঠাত্রী, বিধবা ব্রাহ্ম মহিলা দীন-তারিণীর ত্যাগ সাধনা ও সেবাব্রতের দৃষ্টান্ত মহান ও মহিমাময়। গ্রন্থকর্ত্রী, তাঁহাকে 'পরশপাথর' রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সে-ই 'সোনা' হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর তাঁহার 'তারিণী-ভবন' যেন একটা মণিমণ্ডল এবং তিনি নিজেই সে মণিমণ্ডলের মধ্যমণি। এই মণিমণ্ডলে হিন্দু-মুসলমান-ব্রাহ্মণ-খৃস্টান সকল জাতির সকল শ্রেণীরই সমান প্রবেশাধিকার।

'তারিণী-ভবন' লেখিকার নিছক কল্পনার সৃষ্টি নহে। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শও এই 'তারিণী-ভবন' এবং সেই জন্যই ইহার আদর্শ, শিক্ষা ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এমন নিখুঁত ও সুন্দর হইতে পারিয়াছে।

গ্রন্থের নায়িকা সিদ্দিকা (পদ্মরাগ) এইখানেই মানুষ হইয়াছিল এবং যে সাম্য ও একপ্রাণতা এখানকার প্রাণ, তাহারই আদর্শে তাহার জীবন গঠিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা সিদ্দিকার মধ্যে যে চরিত্রবল, দৃঢ়তা ও সংযম দেখিতে পাই, তাহা এইখানকারই অনাবিল মুক্ত আবহাওয়ার ফল।

সেবা-ই যে নারীর চরম এবং পরম ধর্ম, সিদ্দিকা-চরিত্রে আমরা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই। সিদ্দিকা নারী-যুবতী। সৌন্দর্যে, শিক্ষায়, জ্ঞানে আদর্শস্থানীয়া। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিবার পথে—তাহার কোন অন্তরায়ই ছিল না, বরং যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধাই ছিল। নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য আপনা হইতেই তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ধরা দিয়াছিল, তাহার জাগ্রত নারীত্বের সম্মুখে প্রবল প্রলোভন ধরিয়াছিল, কিন্তু অতি সহজে একান্ত নির্ব্বিকারভাবেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া মানুষের সেবাতেই সে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। এই যে ত্যাগ, এই যে বিসর্জ্জন ইহা একমাত্র তারিণী-ভবনেরই শিক্ষা ও সাধনার ফল। লেখিকা বাংলার পাঠক সাধারণের সম্মুখে এই মহৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের ধন্যবাদভাগিনী হইয়াছেন।

এই উপন্যাস-প্লাবিত বাংলায় মনস্তত্ত্বের 'ডাল-খিচুড়ী'র ভূরিভোজনের যুগে গ্রন্থকর্ত্রীর এই ত্যাগ-পবিত্র উজ্জ্বল আদর্শ কয়জনের অন্তরে শ্রদ্ধা উদ্রেক করিবে জানি না, তবে একথা নিশ্চয় যে, একটা সুন্দর মনোজ্ঞ ও মহৎ কিছু মানব-জীবনের আদর্শ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাহাদের নিকট এ-গ্রন্থ সম্যকরূপে আদর লাভ করিবে।

গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষা সুপরিচিত, সুতরাং সে-সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। পুস্তকের ছাপা বা বাঁধাইও মনোজ্ঞ।

অবরোধ-বাসিনী

প্রকাশ : ১৯৩১। প্রকাশক : মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ২৯ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা। উৎসর্গলিপি : এই গ্রন্থখানি/আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদা জননী/মোছাম্মৎ রাহাতন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী মরহুমার/স্মৃতির চরণে/ভক্তির সহিত সমর্পিত হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৫৩। প্রকাশক : মোহাম্মদী বুক হাউস, ৩৩ পাটুয়াটুলি, ঢাকা, পাকিস্তান। প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রচ্ছদশিল্পী : ইসমাইল শহীদুল্লা। মুদ্রক : দি সিটি প্রেস, ১৬/৩ কোর্ট হাউস স্ট্রীট, ঢাকা। দাম : এক টাকা আট আনা। পৃষ্ঠা : ৮ + ৭০।

'অবরোধ-বাসিনী'-র 'ভূমিকা' হিসেবে আবদুল করিম বি.এ., এম.এল.বি-র এই রচনাটি মুদ্রিত হয়।—

'অবরোধ-বাসিনী' লিখিয়া লেখিকা আমাদের সমাজের চিন্তা-ধারার আর একটা দিক খুলিয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেক প্রকার ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন ; কিন্তু পাক-ভারতের অবরোধ-বাসিনীদের লাঞ্ছনার ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে আর কেহ লিখেন নাই।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বারম্বার এই কথাই মনে পড়ে—আমরা কোথা হইতে আসিয়া কোথায় গিয়া পড়িয়াছি! যে মুসলিম সমাজ এককালে সমস্ত জগতের আদর্শ ছিল, সেই সমাজের এক বিরাট অংশ এখন প্রায় সমস্ত জগতের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একথা বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না।

কোথায় বীর-বালা খাওলা ও রাজিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক পুরুষ যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, আর কোথায় বঙ্গীয় মুসলিম নারী চোরের হস্তে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 'অবরোধ-বাসিনী' পাঠে ঘুমন্ত জাতির চিন্তা-চক্ষু উন্মীলিত হইবে।

সর্ব্বশেষে লেখিকার এই সৎসাহসের জন্য ধন্যবাদ জানাই। 'অবরোধ-বাসিনী'র প্রতি পাঠক-পাঠিকাগণের সহৃদয়-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ছোটগল্প ও রসরচনা

এই বিভাগে প্রকাশিত গল্প ও রসরচনার প্রথম প্রকাশের স্থানকাল এখানে উল্লিখিত হলো।—

ভ্রাতা–ভগ্নী। 'নবনূর', জ্যৈষ্ঠ ১৩১২।

প্রেম–রহস্য। 'ভারত–মহিলা', শ্রাবণ ১৩১৩।

তিন কুঁড়ে। 'সওগাত' ১৩৩৩।

পরীবিবি। 'সওগাত', কার্তিক ১৩৩৩।

বলিগর্ত্ত। 'নওরোজ', আশ্বিন ১৩৩৪। 'মাসিক মোহাম্মদী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫।

পঁয়ত্রিশ মণ খানা। 'মাসিক মোহাম্মদী', চৈত্র ১৩৩৫।

বিয়ে-পাগলা বুড়ো। 'মাসিক মোহাম্মদী', পৌষ ১৩৩৭।

অগ্রন্থিত কবিতা

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের কোনো কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ কালক্রমিক সজ্জিত হল। প্রথম প্রকাশের স্থান–কাল এখানে চিহ্নিত হল।—

বাসীফুল। 'নবনূর', ফাল্গুন ১৩১০।

শশধর। 'নবনূর', চৈত্র ১৩১০।

প্রভাতের শশী। 'মহিলা', বৈশাখ ১৩১১।

পরিতৃপ্তি। 'মহিলা', জ্যৈষ্ঠ ১৩১১।

নলিনী ও কুমুদ। 'নবনূর', আষাঢ় ১৩১১।

স্বার্থপরতা। 'মহিলা', আষাঢ় ১৩১১।

কাঞ্চনজঙ্ঘা। 'নবনূর', পৌষ ১৩১১।

কাঞ্চনজঙ্ঘা। 'মহিলা', পৌষ ১৩১১।

প্রবাসী রবিন ও তাহার জন্মভূমি। 'মহিলা', মাঘ ১৩১১।

সওগাত। 'সওগাত', অগ্রহায়ণ ১৩২৫।

আপীল। 'সাধনা', ফাল্গুন ১৩২৮।

নিরুপম বীর। 'ধূমকেতু', আশ্বিন ১৩২৯।

Sultana's Dream

প্রকাশক : এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৪ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য : চারি আনা। প্রকাশকাল : ১৯০৮। উৎসর্গ : আপ্পাজান [করিমুন্নেসা]।

'Sultana's Dream' বই-এর একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'দি মুসলমান' পত্রিকার ৪ ডিসেম্বর ১৯০৮ সংখ্যায়। সমালোচনাটি এই।—

Sultana's Dream.—This is a booklet written in English by Mrs R. S. Hossain. Sultana, an imaginary character, is attributed a marvellous dream in which she was transported to an imaginary land ruled by a female sovereign, where peace and happiness reign supreme. The male members in that imaginary land discharge the functions of women in the real world, and the women do those of men. The conception is a very ingenuous hit at the Purdah system prevailing in the Mohamedan world. We have found a genuine pleasure in the perusal of the booklet. It seems to us that Mrs. R.S. Hossain the able authoress is a lady of whom any nation may be proud.

'শিখা' গোষ্ঠীর আবুল হুসেন 'Sultana's Dream'-এর আলোচনা করেছিলেন 'সাধনা' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩২৮ সংখ্যায়। আলোচনাটি হল।—

Sultana's Dream (সুলতানার স্বপ্ন) প্রথম সংস্করণ ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগা আমাদের সমাজ যে, পুস্তকখানি এখনও দ্বিতীয় সংস্করণের মুখ দেখিতে পায় নাই। ইহা ছাড়া দুঃখের বিষয়, এত দিনের মধ্যেও পুস্তকখানি সম্বন্ধে কেহ কোন আলোচনাও করেন নাই। সেদিন ৩৮-পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া বিস্ময়-রসে যেমন আপ্লুত হইয়াছি, তেমনি লেখিকার উদ্দেশ্যে শত সালাম প্রেরণ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। তাঁহার মতো চিন্তাশীলা নারী প্রকৃতই, নারী জাতি কেন, সমগ্র মানব জাতির গৌরবের পাত্রী।

'Sultana's Dream' পড়িলে ডাক্তার গালিভারের লিলিপুট দেশের ঘটনা মনে পড়ে। Sultana একজন অবরুদ্ধা নারী। গৃহের চতুষ্কোণ হইতেছে তাঁহার বিচরণ ও কর্মক্ষেত্র,—সূর্যের আলোক, চাঁদের কিরণ ও প্রকৃতির মুক্ত নির্মল বায়ু তাঁহার পক্ষে হারাম—তাহা ভোগ করিবার জন্য এতটুকু অধিকার তাঁহার ছিল না। বিশ্বের ঐশ্বর্য, ধন-সম্পদ, ও সৌভাগ্য তাঁহার পদতলে ছিল ; কিন্তু সেগুলিকে একান্ত করিয়া ভোগ করিবার স্থান ছিল ঐ অর্গলবদ্ধ অন্তঃপুর। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন : তিনি তাঁহার ভগিনী সারার মতো এক অপরিচিতা নারীর সঙ্গে অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ফুল-বাগান দেখিতে বাহির হইয়াছেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে আসিয়া কত না সঙ্কোচ ও ত্রস্ত ভীতির পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু উক্ত নারী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সে-স্থানকে তাঁহারা Lady land বলেন,—সেখানে পুরুষেরা অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে, আর নারীগণ বাহিরে সংসার-কর্ম নির্বাহ করিয়া চলে। সেই অপরিচিতা নারীকে সুলতানা 'ভগিনী সারা' বলিয়া ডাকিতেছেন। 'ভগিনী সারা' সুলতানাকে নারীগণের স্বরচিত স্বাধীন স্বচ্ছ নির্মল পারিজাত-কানন দেখাইতেছেন। সুলতানা প্রথম প্রথম পুরুষের ভয়ে আনন্দের সহিত সে-সমস্ত ভোগ করিতে পারিতেছেন না। পরে 'সারা' নানা প্রকার নিদর্শন দেখাইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন যে, সেখানে বাহিরের রাস্তায় পুরুষের বাহির হইবার অধিকার নাই। সে-দেশ নারীর—পুরুষ নারীর কথায় ওঠে, নারীর কথায় বসে।

নারীর রচিত আইন পুরুষকে পরিচালিত করিতেছে। নারীগণের অসাধারণ জ্ঞান-প্রতিভার বিকাশ সেই Lady land-এ কিরূপ জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া সুলতানা নিজের আত্মার মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও আত্মপ্রত্যয় অনুভব করিয়া অতিশয় উৎফুল্ল হইতেছেন। পুরুষগণকে কিরূপে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছেন, কিরূপে 'জেনারা'র পরিবর্তে 'মর্দানা'-র প্রবর্তন সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার ইতিহাস শ্রবণ করিয়া সুলতানা অবাক হইতেছেন।

পুরুষের পশুশক্তিকে দমন করিয়া নারীর আভ্যন্তরীণ ঐশী-শক্তিকে প্রখরতর করিতে পারিলে এই দুনিয়াতে যে স্বর্গ-সুষমা রচনা করা যায়, তাহাই এই স্বপ্নের অর্থ বলিয়া আমার বিশ্বাস। ভগিনী সারার Lady land-এ কোনো কুৎসিত আচরণ ও নীতিবিগর্হিত কর্ম কেহ করিতে পারে না। সেখানে পুলিশ নাই। সে একেবারে সত্য ও ভালবাসার রাজ্য। বস্তুতঃ, নারীজাতি সত্য ও ভালোবাসার সাক্ষাৎ প্রতিমা-স্বরূপ হইতে পারেন, যদি তাঁহাদের মন ও মস্তিষ্কের যাবতীয় শক্তিকে সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদানে স্ফূর্তিলাভ করিতে দেওয়া হয়। তাহা হইলে আমাদের নারীজাতি পুরুষের পার্শ্বে নন্দনকানন ও ঐ Lady land-এর পারিজাতে—'বাগ' প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

'Sultana's Dream'-এর মধ্যে পুরুষকে অবরুদ্ধ করিবার একমাত্র হেতু : আমাদের নারীজাতির দাসত্ব, অর্থাৎ পুরুষের উপর একান্ত নির্ভরতা। পুরুষ না হইলে আমাদের নারী একেবারে অকর্মণ্য ও অসহায়, মূর্খ ও অজ্ঞ বলিয়া সে পুরুষের উপর তাহার জীবনের মাত্র অস্তিত্বটুকুর জন্য নির্ভরশীল, একথা কেবল পুরুষের দ্বারাই নিখিল বিশ্বে ঘোষিত হইয়াছে, এবং সেই ঘোষণা দ্বারা নারীও তাহার শক্তি আছে একথা বিশ্বাসই করিতে পারে না। পক্ষান্তরে নারী যে ক্ষমতাসম্পন্ন, সে যে পুরুষের মতো, এমনকি তদপেক্ষা অধিকতর প্রতিভাবতী হইতে পারে—তাহার শক্তিকে জাগ্রত করিলে যে প্রকৃতিকে নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া পুরুষের বিন্দুমাত্র সাহায্য ব্যতিরেকে সে দুনিয়ার বুকে নির্মল সৌন্দর্য, সম্পদ ও কল্যাণের বিরাট ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা ঐ Lady land-এর নারীদের ক্ষমতার দৃষ্টান্ত দ্বারা মিসেস আর. এস. হোসেন অতি অসহায়া বঙ্গীয়া নারী-হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির বীজ বপন করিবার উদ্দেশ্যে বোধ করি এই 'Sultana's Dream' রচনা করিয়াছেন।

পুস্তিকাখানি যেরূপ সুমার্জিত বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় লেখা, সেরূপ ভাষা আয়ত্ত করা আমাদের অনেক ইংরেজি-শিক্ষিত যুবকের পক্ষে কঠিন। আশা করি, 'Sultana's Dream'-এর পাঠকগণ স্ব-স্ব পরিবারের নারীগণকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন।

মিসেস আর.এস. হোসেন এই Sultana's Dream দ্বারা নারীকে তাহার অপরিসীম ক্ষমতায় বিশ্বাস জন্মাইতে পারিয়া, সত্য-সত্যই সমাজের বিপুল কল্যাণের ইঙ্গিত করিতে পারিয়াছেন।

প্রবন্ধ

'God gives Man robs' প্রবন্ধটি 'দি মুসলমান' পত্রিকায় ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'Educational Ideals for the Modern Indian Girls' প্রবন্ধটি 'দি মুসলমান' পত্রিকায় ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

চিঠিপত্র

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের চিঠিপত্রের একটিমাত্র সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে, মোশফেকা মাহমুদের 'পত্রে রোকেয়া পরিচিতি'। ঐ গ্রন্থে রোকেয়ার ১৭টি পত্র সংকলিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রোকেয়ার আরো অনেক চিঠি পাওয়া গেছে। বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা। রোকেয়ার এ পর্যন্ত প্রাপ্ত গ্রন্থিত–অগ্রন্থিত সমস্ত চিঠিপত্র এখন আমরা কালক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করলাম।

প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সমগ্র রচনাবলী এক খণ্ডে প্রকাশের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা আমি উপস্থাপন করলে পর ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ডের কার্যকর সংসদের ৩৭তম সভায় তাঁর গ্রন্থাবলী মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুসারে তাঁর মৃত্যুর ৪০ বৎসর পরে 'রোকেয়া-রচনাবলী প্রকাশিত হলো।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলার অন্তঃপাতী পায়রাবন্দ গ্রামে রোকেয়ার জন্ম হয়। তাঁর পিতা জহীর মোহাম্মদ আবু অলী সাবের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। পায়রাবন্দ গ্রামে 'সাড়ে তিন শত বিঘা লাখেরাজ জমির মাঝখানে' ছিল তাঁর 'সুবৃহৎ' বসতবাটী। সাবের সাহেব 'বিলাসী', 'অপব্যয়ী' ও 'সংরক্ষণশীল' ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র : আবুল আসাদ ইব্রাহীম সাবের ও খলীল সাবের এবং তিন কন্যা : করিমুন্নেসা, রোকেয়া ও হোমেরা। দুই পুত্র কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন,—তাঁদের মনের উপর ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচুর প্রভাব পড়ে। জ্যেষ্ঠ ইব্রাহীম সাবেরের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে করিমুন্নেসা ও রোকেয়া ইংরেজী শিক্ষায় অনেকখানি অগ্রসর হন। রোকেয়া তাঁর উপন্যাস : পদ্মরাগ' এই অগ্রজের নামে উৎসর্গ করতে গিয়ে বলেন : 'দাদা ! আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ।'

করিমুন্নেসার জন্ম ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এবং মৃত্যু ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর। বাল্যকালে বাংলা পুস্তক পাঠের প্রতি করিমুন্নেসার অত্যধিক আসক্তি দেখে তাঁর 'পড়াই বন্ধ' ক'রে দেওয়া হয় এবং তাকে "বলিয়াদীতে মাতামহের প্রাসাদে' পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর 'বিবাহের আয়োজন' হ'তে থাকে। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সেই ময়মনসিংহের দেলদুয়ারে তাঁর 'বিবাহ হয়ে যায়। দুঃখের বিষয়, বিবাহের ৯ বৎসর পরেই তিনি বিধবা হন। তাঁর দুই দেশখ্যাত পুত্র : স্যার আবদুল করিম গজনভী ও স্যার আবদুল হালিম গজনভী তাঁর প্রেরণা ও তত্ত্বাবধানেই উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন। এই মহীয়সী মহিলার নামে রোকেয়া তাঁর 'মতিচূর' দ্বিতীয় খণ্ড উৎসর্গ করেন। তিনি উৎসর্গ-পত্রে উল্লেখ করেন যে, বাল্যে তাঁর বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে আনুকূল্য করেছিলেন একমাত্র করিমুন্নেসা এবং 'চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুরে' ও 'কলিকাতায় ১১ বৎসর উর্দু স্কুল পরিচালনা'-কালে বাংলা ভাষার পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়েও তিনি যে বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন অব্যাহত রাখতে পেরেছেন তা কেবল করিমুন্নেসার প্রেরণায়।

রোকেয়া আনুমানিক ১৬ বৎসর বয়সে বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরের সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। সাখাওয়াত তখন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। তৎপূর্বে তিনি কৃষিশিক্ষার বৃত্তি নিয়ে ইংলন্ডে গিয়েছিলেন এবং 'অনেকগুলি প্রাইজ ও মেডেল' নিয়ে এসেছিলেন। স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সুপারিশক্রমেই তিনি সেই বৃত্তি লাভ করেছিলেন,—ভূদেবের পুত্র শ্রী মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন হুগলী

কলেজে (১৮৭৪–৭৫) ও পাটনা কলেজে (১৮৭৭) সাখাওয়াতের সহাধ্যায়ী ও ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। সাখাওয়াতের প্রথম বিবাহ হয়েছিল তাঁর 'মাতার পছন্দমতো' বিহারের এক আত্মীয়–ঘরে ; সেই স্ত্রী অল্পবয়সেই একটিমাত্র কন্যা রেখে যান। মুকুন্দদেব লিখেছিলেন :

"সখাওয়াৎ সেই কন্যার একটি বি. এ. পাশ–করা ছেলের সহিত বিবাহ দিয়াছিল ; সে কন্যাটিও এখন আর জীবিত নাই। [১৯১৬]

"বিপত্নীক হইয়া সখাওয়াৎ দ্বিতীয়বার রংপুরে সম্ভ্রান্ত ঘরে সুশিক্ষিতা বাঙালী মুসলমান কন্যা বিবাহ করেন। ... দ্বিতীয় বিবাহে কোন সন্তান জীবিত থাকে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় পত্নী ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বিশেষ ব্যুৎপন্না এবং সুগৃহিণী এবং ধীর গম্ভীর সখাওয়াৎ পারিবারিক জীবনে সুখী হইয়াছিল। ...

"মিতব্যয়ী সাখাওয়াতের সত্তর হাজার টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি পত্নীর দ্বারা একটি মুসলমান বালিকা–বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ১০ হাজার টাকা দিবেন ; পত্নীকে দশ হাজার দিবেন এবং বাড়ী এবং অধিকাংশ টাকা কন্যাকে জীবদ্দশায় লিখিয়া দিবেন এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়াছিলেন এবং সেইরূপ অনেকটা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। কলিকাতায় চিকিৎসার্থ গিয়া সখাওয়াতের দেহান্ত হয়। সুশিক্ষিতা মিসেস্ রকেয়া হোসেন এইরূপ ইংরাজী শিখিয়াছিলেন যে, সখাওয়াতের কথামত ইংরাজীতে লিখিয়া তাঁহার সরকারী কার্যের অনেকটাই সাহায্য করিতে পারিতেন এবং বাঙ্গালাতে মহরম সম্বন্ধে একখানি ও মতিচূর নামে আর একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। পত্নীর সাহায্যে তাঁহার পারিবারিক জীবন সুখের হইয়াছিল বলিয়া তিনি মুসলমানদের বহু–বিবাহ, নাচ মুজরা প্রভৃতির প্রকৃত প্রতিষেধক ভাবে 'স্ত্রীশিক্ষার' একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার অসামান্যা এবং পতিব্রতা পত্নী স্বামীর সেই ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য কলিকাতায় বালিকা–বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া পবিত্রাত্মা স্বর্গীয় সখাওয়াতের স্মৃতির পূজা করিতেছেন।"

—[আমার দেখা লোক, ১৩–৩৪ পৃ.]

খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন বি. এ., এম. আর. এ. এস., ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মে লোকান্তরিত হন। তার পাঁচ মাস পরে রোকেয়া মাত্র পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে প্রথম সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের ভিত্তিপত্তন করেন। কিন্তু সেখানে তিনি বেশীদিন থাকতে পারেননি। সাখাওয়াতের প্রথম পক্ষের কন্যা ও জামাতা তাঁর ঘর–বাড়ী ও বিষয়–সম্পত্তির অধিকার নিয়ে এমন অশোভন আচরণ শুরু করেন যে, রোকেয়া অতিষ্ঠ হইয়া অগত্যা ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে চিরদিনের জন্য সাধের স্বামীর ভিটা ত্যাগ ক'রে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মার্চ কলকাতায় অলিউল্লাহ লেনের একটি ছোট বাড়ীতে আটজন ছাত্রী নিয়ে নতুনভাবে স্কুল আরম্ভ করেন। পরে ৮৬/এ, লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে তা স্থানান্তরিত হয়। রোকেয়ার অক্লান্ত সাধনায় স্কুলটি একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়েছে। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর প্রত্যূষে

অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রায় ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁর তিরোধান ঘটে ; তার পূর্ব রাত্রেও প্রায় এগারোটা পর্যন্ত তাঁকে স্কুলের কাগজপত্রের নথির মধ্যে কার্যনিরত দেখা গিয়াছিল।

তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে কলকাতা এল্‌বার্ট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণে সৈয়দ এমদাদ আলী বলেন :

> 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল আজও দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আর নাই। যে-নারী অবলীলায় সকলের আক্রোশ সহ্য করিয়া, সমাজের নানা মলিনতার কথা, নারীর নানা দুঃখের কথা তীব্র ভাষায় প্রকাশ করিবার সাহস রাখিতেন, তিনি আর নাই। ... তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল, কারণ তিনি একটা মহৎ উদ্দেশ্যের প্রেরণা লইয়া কাজ করিতেন ; সে-কাজের ভিতরে আমরা যে সুমঙ্গল নিহিত দেখিতাম তাহার ফলেই তাঁহার দেওয়া আঘাত আমাদের তখনকার ক্ষুদ্র সাহিত্যিক-সঙ্ঘের প্রত্যেকের মনে ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিত। মৃত্যু আজ তাঁহাকে অমর করিয়া দিয়াছে। তাঁহার স্মৃতির উপরে আজ বাংলার মুসলমান সমাজ যে-শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছেন, বাংলার কোন মুসলমান পুরুষের মৃত্যুতে সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। ইহা শুধু যুগ-লক্ষণ নহে, ইহা আমাদের জাগরণের লক্ষণ।'

উক্ত সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণে কাজী আবদুল ওদুদ বলেন :

> 'এ যুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ গৌরবের আসন এই তিন জনের—মিসেস্ আর. এস. হোসেন, কাজী ইমদাদুল হক ও লুতফর রহমান। ... মিসেস্ আর. এস্. হোসেনের প্রতিভা একালের ভগ্নহৃদয় মুসলমানের জন্য যেন এক দৈব আশ্বাস। নিবাত নিষ্কম্প মুসলমান অন্তঃপুরে যদি এহেন বুদ্ধির দীপ্তি, মার্জিত রুচি, আত্মনির্ভরতা ও লিপিকুশলতার জন্ম হয়, তবে আজো ভয় কেন বাংলার মুসলমানের ঘোচে না। তবে আজো কেন নিজেকে পরিবেষ্টনের সন্তান ও জগতের অধিবাসী ব'লে পরিচিত করবার সাহস তার হয় না?'

দুই

বেগম রোকেয়া তাঁর 'বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল' লেখাটিতে বলেছেন যে, ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে Sultana's Dream রচিত হয়। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দেই তাঁর 'মতিচূর' আত্মপ্রকাশ করে। তার 'বিজ্ঞাপন'-এ বলা হয় : 'মতিচূরের প্রবন্ধসমূহ পূর্বে 'নবপ্রভা', 'মহিলা' ও 'নবনূর' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।' তাতে অন্তর্ভুক্ত সাতটি প্রবন্ধের মধ্যে 'স্ত্রীজাতির অবনতি', 'নিরীহ বাঙ্গালী', 'অর্দ্ধাঙ্গী', 'বোরকা' ও 'গৃহ' যথাক্রমে ১৩১১ ভাদ্রে, ১৩১০ মাঘে, ১৩১১ আশ্বিনে, ১৩১১ বৈশাখে ও ১৩১১ আশ্বিনে 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধ : 'পিপাসা' ১৩২৯ সালের ১৬ ভাদ্র তারিখে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদিত ১ম বর্ষের ৭ম

সংখ্যক (বিশেষ 'মোহররম সংখ্যা') অর্ধসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'তে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। ১৩১৩ সনে 'নবনূরে-র কয়েকটি সংখ্যায় 'মতিচূর' গ্রন্থের যে-বিজ্ঞাপন বের হয় তাতে বলা হয় যে, 'লেখিকার প্রথম রচনা 'পিপাসা' (মোহরম)।' গ্রন্থে তার শিরোনাম : 'পিপাসা' এবং উপশিরোনাম : 'মহরম'। মুকুন্দদেব বলেছেন : 'মিসেস্ রোকেয়া হোসেন বাঙ্গালাতে মহরম সম্বন্ধে একখানি ও মতিচূর নামে আর একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন।' কিন্তু বাস্তবিকই 'মহরম' বিষয়ে রোকেয়া কোনো পৃথক পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন কি না, তা সন্ধান করা যেতে পারে।

১৩২৫ অগ্রহায়ণে ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যক 'সওগাত' পত্রিকার 'বর্তমান বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' বিভাগে 'মিসেস্ আর. এস. হোসেন' প্রসঙ্গে বলা হয় :

> "ইনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাগণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রধানা লেখিকা। 'নবনূর', 'নবপ্রভা', 'মহিলা', 'অন্তঃপুর' প্রভৃতি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় এক সময়ে ইহার বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি 'মতিচূর' নামে একখানা বাঙ্গালা এবং 'Sultana's Dream" নামে একখানি ইংরেজী পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য-সাধনায় সফলতা লাভ করিয়াছেন।"

উপরোক্ত 'অন্তঃপুর' পত্রিকায় প্রকাশিত রোকেয়ার লেখা এবং ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠে ৪র্থ বর্ষের ২য় সংখ্যক 'নবনূরে' প্রকাশিত তাঁর 'আশা-জ্যোতিঃ' সংগ্রহ করা আবশ্যক।

'মতিচূর' ১ম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ : 'স্ত্রীজাতির অবনতি' ১৩১১ ভাদ্রের 'নবনূরে' প্রকাশিত হয়েছিল 'আমাদের অবনতি' শিরোনামে। মূল প্রবন্ধের ২৩শ থেকে ২৭শ পর্যন্ত পাঁচটি অনুচ্ছেদ গ্রন্থে পরিবর্তিত হয়ে সে-স্থলে নূতন সাতটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে। পরিত্যক্ত অনুচ্ছেদ-পঞ্চক নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

> 'আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই; তাহার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্ম্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন-রূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। অবশ্য একথা নিশ্চয় বলা যায় না, তবে অনুমানে ঐরূপ মনে হয়। আমরা প্রথমতঃ যাহা সহজে মানি নাই, তাহা পরে ধর্ম্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছি। এখন ত অবস্থা এই যে, ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই শুনিতে পাই : 'প্যাট্! তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাকবি গোলাম!' সুতরাং আমাদের আত্মা পর্যন্ত গোলাম হইয়া যায়!।
>
> 'শিশুকে মাতা বলপূর্ব্বক ঘুম পাড়াইতে বসিলে, ঘুম না পাওয়ায় শিশু যখন মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দেখে, তখনই মাতা বলেন : 'ঘুমা শিগ্‌গীর ঘুমা! ঐ দেখ জুজু।' ঘুম না পাইলেও শিশু অন্ততঃ চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে। সেইরূপ আমরা যখনই উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে : 'ঘুমাও ঘুমাও, ঐ দেখ নরক।' মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্ততঃ আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি।

'আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোন বিশেষ ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় আমার আলোচ্য নহে। ধর্মে যে আইন-কানুন বিধিবদ্ধ আছে, আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব, সুতরাং ধার্ম্মিকগণ নিশ্চিত থাকুন। পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশ জনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিম্বা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং অসভ্য বর্ব্বরদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পয়গম্বরদিগকে (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায় ! !

'তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্ম্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুণিদের বিধানে যে-কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মুণির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সেরূপ যোগ্যতা কই যে, মুণি ঋষি হইতে পারিতেন? যাহা হউক, ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বর-প্রেরিত কি না, তাহা কেহই নিশ্চিত বলিতে পারে না। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী-শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু পর্যন্ত যাইয়া 'রমণী জাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকায় তাঁহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বরদত্ত জলবায়ু ত সকল দেশেই আছে, কেবল দূতগণ সর্ব্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন? যাহা হউক, এখন আমাদের আর ধর্ম্মের নামে নত মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহা উচিত নহে। আরও দেখ, যেখানে ধর্ম্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ—সতীদাহ। (পাদটীকা : 'একজন কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাঁহার শতাধিক পত্নী সহমৃতা হইতেন কি?') যেখানে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন। এস্থলে ধর্ম্ম অর্থে ধর্ম্মের সামাজিক বিধান বুঝিতে হইবে।

'কেহ বলিতে পারেন যে, 'তুমি সামাজিক কথা বলিতে গিয়া ধর্ম্ম লইয়া টানাটানি কর কেন? তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, 'ধর্ম্ম' শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে ; ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। তাই 'ধর্ম্ম' লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য ধার্ম্মিকগণ আমায় ক্ষমা করিতে পারেন।'

— [নবনূর, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২১৬-২১৮ পৃ.]

বেগম রোকেয়ার 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধের প্রতিবাদ ক'রে, ১৩১১ আশ্বিনের 'নবনূরে' এস্. এ. আল-মুসাভী লেখেন 'অবনতি প্রসঙ্গে' ; তাতে বলেন :

'নারী কখনও সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সমান হইতে পারে না—তাহা হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।'

১৩১১ কার্তিকের 'নবনূরে' নওশের আলী খান ইউসফজী লেখেন 'একেই কি বলে অবনতি?' তিনি বলেন :

'পাঠিকাগণ! সত্যই কি আপনারা দাসী? ... অলঙ্কারগুলি কি সত্যই আপনাদের দাসত্বের নিদর্শন? ... পোশাকগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বিবসনা না সাজিলে কি প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে না? ...

'আপনাদিগকে 'অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলে প্রকাশ করিয়াছেন, ... পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভা-বলে দশ জনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন তিনিই আপনাকে দেবতা বা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ... (পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধির সহিত) পয়গাম্বরদিগকে ... বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর (হইতে) দেখা যায়। তবেই দেখিতেছেন এই ধর্ম্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।' এ অনাহুত গর্হিত কথাগুলি বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? এ অবান্তর কথাগুলি না লিখিলে কি আপনাদের অবনতির কারণ অনুসন্ধানে কোন বাধা জন্মিত? ...

'আপনারা স্বাধীন হউন ভাল কথা, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহার না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।'

১৩১২ জ্যৈষ্ঠের 'নবনূরে' বেগম রোকেয়া লেখেন 'ভ্রাতা-ভগ্নী' শীর্ষক 'কথোপকথন'। তার এক স্থানে বলা হয়েছে :

'কৃত্রিম অন্তঃপুর-বন্ধন মোচন হইলে সমাজে অবাধে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইতে পারে। তখন এ শিক্ষার গতিরোধ করা অসম্ভব হইবে।'

এই বাদানুবাদ-প্রসঙ্গে ১৩১২ ভাদ্রের 'কোহিনূরে' বিবি ফাতেমা লেখেন দু'টি কথা।' তাতে তিনি মন্তব্য করেন :

'গত আশ্বিন-কার্তিকের 'নবনূরে' মিঃ আল্-মুসাভী ও ইউসফজী সাহেবের লিখিত প্রবন্ধদ্বয়ের প্রতিবাদ করাই যে ভগিনী হোসেনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা 'ভ্রাতা-ভগ্নী' প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই সহজে অনুমিত হয়। এখন জিজ্ঞাসা করি, উহা দ্বারা আমাদের লাভ হইবে কি? ... ভগিনী হোসেনকে আমরা আমাদের সমাজের মুখপাত্র বলিয়া জানি। এরূপ অবস্থায় তাঁহার নিকট এ-প্রকার বাহুল্য কথা শুনিতে কখনই আমরা আশা করি না।'

১৩১২ সালের নবনূরের বার্ষিক সূচীপত্রে দেখা যায় যে, তাতে 'গ্রন্থ-সমালোচনা' লেখেন মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী। ১৩১২ ভাদ্রে 'গ্রন্থ-সমালোচনা' বিভাগে 'মতিচূর' প্রসঙ্গে বলা হয় :

"মতিচূর,—মিসেস্ আর. এস্. হোসেন প্রণীত। মূল্য বার আনা। ... মতিচূরের প্রবন্ধগুলি যখন প্রথমে নবনূরে প্রকাশিত হয়, তখন তাহা পাঠে আমাদের সহিষ্ণুতার বাধ টুটিয়া গিয়াছিল। এই উত্তেজনার ভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পর গ্রন্থখানি পুনরায়

পাঠ করি এবং সেই সময় মতিচূর সম্বন্ধে হৃদয়ে একটু অনুকূল ধারণা জন্মে। ... লেখিকার সকল কথা না হইলেও অনেক কথাই নিরেট সত্য এবং মতিচূর প্রকৃত মতিচূরই বটে। ... এই গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং রচনাভঙ্গি (style) অতি মনোরম। কোন পুরুষ লেখকের পক্ষেও এইরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা শ্লাঘার বিষয়। লেখিকা তাঁহার বক্তব্য ভালো করিয়াই বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। ...

'মতিচূর-রচয়িত্রীর একটি দোষের কথা এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গ্রন্থে মাদ্রাজের Christian Tract Society-র প্রকাশিত Indian Reform সম্বন্ধীয় পুস্তিকাসমূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়াই আমাদের ধারণা। খৃষ্ট-ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া আমাদের সম্বন্ধে পাদ্রী সাহেবগণ যা বলেন বা বলিয়াছেন, লেখিকার নিকট তাহা অভ্রান্ত সত্যরূপেই পরিগণিত হইয়াছে। তাঁহার মতে আমাদের সবই কু, আর ইউরোপ আমেরিকার সবই সু। ...

'সমাজ-সংস্কার করা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা। চাবুকের চোটে সমাজ-দেহে ক্ষত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি বা অভাব পূরণ হয় না। মতিচূর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন, ইহাতে যে কোন সুফল ফলিবে আমরা এমন আশা করিতে পারি না। ...

মতিচূরের 'পিপাসা' ও 'গৃহ' এই দুইটি নিবন্ধই আমাদের সর্বাপেক্ষা ভালো লাগিয়াছে। ভালো লাগিয়াছে অর্থ এই যে, আমরা ইহা পড়িয়া হৃদয়ে কিছু সত্য, কিছু ধ্রুব বিষয়ের ধারণা করিতে পারিয়াছি। ... 'সুগৃহিণী' সম্বন্ধে আমাদের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা 'সুগৃহিণী' চাই সত্য, কিন্তু আমরা এমন গৃহিণী চাই না, যাঁহারা কেবল সারাদিন Horticulture, Chemistry বা Physics নিয়ে ব্যস্ত থাকিবেন। ... 'আমাদের অবনতি' সম্বন্ধে আমাদের নূতন কিছু বলিবার নাই। পূর্ব্বে দুই-একজন এ-বিষয়ে সোরগোল করিতে গিয়া এখনও খোঁচা খাইতেছেন দেখিয়া আমরা পূর্বাহ্নেই সাবধান হইয়াছি।'

— [নবনূর, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২৩৮-২৪০ পৃ.]

বেগম রোকেয়া সমাজ ও সংসারের সকল ক্ষেত্রে নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে স্বাধীনতা-আন্দোলন প্রবর্তন করেন পাশ্চাত্ত্যে তার পুরোধা (the pioneer of the woman's rights movement) ছিলেন Mary Wollstonecraft (১৭৫৯-৯৯ খ্রীঃ)। এই ক্ষণজন্মা মহিলা তাঁর A Vinfication of the Rights of Woman (১৭৯২ খ্রীঃ) গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে বলেন :

Contending for the rights of woman, my main argument is built on this simple principle, that if she be not prepared by education to become the companion of man, she will stop the progress of knowledge

and virtue ; for truth must be common to all, or it will be inefficacious with respect to its influence on general practice ... They (women) may be convenient slaves, but slavery will have its constant effect, degrading the master and the abject dependent.

নারীর প্রকৃতিগত দৌর্বল্য, নমনীয়তা, কমনীয়তা, প্রেমকলা, রূপচর্চা, feminine delicacy, natural frailty of woman প্রভৃতি বিষয়ে রোকেয়ার পরিচ্ছন্ন চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে উপরোক্ত গ্রন্থের বহু মন্তব্যের মিল দেখে মনে বাস্তবিকই বিস্ময় লাগে। Mary Wollstonecraft ইউরোপে যে প্রবল ভাবান্দোলনের সূচনা করেন, জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ (১৮০৬-৭৩) যুক্তিনিষ্ঠ প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ The Subjection of Woman (১৮৬৯) লিখে তাকে সার্থকভাবে প্রবাহিত করেন প্রশস্ত জন-সমর্থনের পথে। তারই ফলে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে গ্রেট বৃটেনে পুরুষের সমান ভিত্তিতে নারীর ভোটাধিকার লাভ মঞ্জুর হয়েছে—যুক্তরাষ্ট্রে পাশ হয়েছে উনিশতম সংশোধনী। কিন্তু সে তুলনায় রোকেয়ার প্রচেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে, তা সহৃদয় গবেষকেরা নিরূপণ করবেন।

তিন

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে 'মতিচূর' দ্বিতীয় খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে। তাতে ১০টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে 'নূর-ইসলাম' ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের আল্-এসলামে, 'সৌরজগৎ' ১৩১২ ফাল্গুন ও চৈত্রের নবনূরে, 'নারীসৃষ্টি' ১৩২৫ পৌষের ও 'নার্স নেলী' ১৩২৬ অগ্রহায়ণের সওগাতে, 'শিশুপালন' ১৩২৭ কার্তিকের, 'মুক্তিফল' ১৩২৮ শ্রাবণের ও 'সৃষ্টিতত্ত্ব' ১৩২৭ শ্রাবণের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'মতিচূর' ২য় খণ্ড সম্পর্কে ১৩২৮ অগ্রহায়ণের 'মোসলেম ভারতে' বলা হয় :

'পুস্তকখানি পড়িলেই বোঝা যায়, গ্রন্থকর্ত্রী আত্মযশঃলিপ্সায় প্রণোদিত হইয়া লেখনী ধারণ করেন নাই ; পক্ষান্তরে ভূয়োদর্শনের ফলে তাঁহার হৃদয়ে যে বেদনার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই তিনি নানা কথায় নানা ছলে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ...

'জ্ঞানফল' ও 'মুক্তিফল' দুইটি রূপকথা। রূপকথা রচনায় নারীজাতি যে সিদ্ধহস্ত, এ-কথা আদমের যুগ হইতে প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থেও গ্রন্থকর্ত্রী ওয়ারিশক্রমে সে হাত-যশঃ হইতে বঞ্চিত হন নাই। ইহাতে সাময়িক ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ের প্রতিবিম্ব আছে। উভয় প্রবন্ধেই মুখ্য উদ্দেশ্য : নারীজাতিকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সমাজের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহাই পাঠক-পাঠিকার স্মরণ করাইয়া দেওয়া। গৌণ উদ্দেশ্য : নারী-পুরুষ উভয়কে দেশের কল্যাণের জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করা। ...

'ডেলিশিয়া-হত্যা ও 'নার্স নেলী'তে লেখিকার শক্তি আপন স্বাভাবিক গতি পাইয়া অতি মনোহর মূর্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। নারী না হইলে বোধ হয় নারীর কথা এমন সুন্দর করিয়া বলা যায় না। একটিতে পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত নারীর হৃদয়ের মর্মস্পর্শী চিত্র,

আর একটিতে নারীকে অজ্ঞতার অন্ধকারে বন্ধ করিয়া রাখার যে কি অবিমৃষ্যকারিতা তাহাই অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে ...। এই ব্যথার ছবিখানির পশ্চাতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ : 'শিশুপালন'। প্রত্যেক রমণীর এই প্রবন্ধটি পাঠ করা কর্তব্য।

মোটের উপর গ্রন্থের ভাষা অতি সুন্দর ও সরস। রচনার বিশুদ্ধিতা প্রত্যেক সুধী পাঠককে প্রীতিদান করিবে। ... মুসলমান নারী–সমাজ এ গ্রন্থের জন্য যে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিবেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।'

১৩২৯ বৈশাখের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য–পত্রিকায় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বলা হয় :

'... লেখিকা সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও কাল্পনিক সাহিত্যের নানা বিভাগেই লেখনী চালনা করিয়াছেন। ভাব ও ভাষায় তাঁহার লেখা সহজেই পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। নারী জাতির দুঃখ–দৈন্যে ব্যথিত হইয়া লেখিকা যে সরস মধুর ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। 'মুক্তিফল' রূপকথাটি Political carricature হিসেবে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। ...'

১৩২৯ বৈশাখের 'সহচরে'ও গ্রন্থখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। ১৩২৯ ভাদ্রের 'সহচরে' পুনরায় তার প্রসঙ্গে বলা হয়—

'... নারীর ব্যথা–বেদনার প্রতিচ্ছবি। অন্ধ নারী–সমাজের জাগরণ দানের বজ্রবীণা। লেখা অতি সুন্দর, রচনা–ভঙ্গি অতি চমৎকার। ...'

এই গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ : 'সৃষ্টিতত্ত্ব' প্রথমে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য–পত্রিকায় 'পুরুষ–সৃষ্টির অবতারণা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল ; কিন্তু গ্রন্থভুক্তি–কালে তার পাঠ বহুলাংশ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। এ লেখাটিকে 'নারীসৃষ্টি' প্রবন্ধের পরিপূরক বলা যেতে পারে। এ দুটি রসরচনায় রয়েছে যে 'স্যাটায়ার', তার সাক্ষাৎ মহিলাদের লেখায় সচরাচর পাওয়া যায় না।

১৩১৬ বৈশাখের তৃতীয় সপ্তাহে রোকেয়ার স্বামী লোকান্তরিত হন। মনে হয় অতঃপর ৫/৬ বৎসর কাল রোকেয়ার লেখনী প্রায় স্তব্ধ ছিল এবং এক 'সৌরজগৎ' ছাড়া এই গ্রন্থের অবশিষ্ট লেখাগুলি পরবর্তী পর্যায়ে রচিত। এই পর্যায়ে তাঁর রচনায় তীব্রতার হ্রাস হয়ে 'হিউমার' পেয়েছে বৃদ্ধি। একথা ভাবতে আমার স্বতঃই ইচ্ছা করে যে, মার্জিতমনা স্থিতধী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের প্রশ্রয়েই রোকেয়া 'আমাদের অবনতি' ও 'Sultana's Dream' লিখতে প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন এবং সেরূপ প্রসন্ন পরিবেশের অভাবেই তেমন মুক্তভাবদীপ্ত নির্ভীক চাঞ্চল্যকর রচনা তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনী থেকে আর নির্গত হলো না ! !

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে 'Sultana's Dream পুস্তিকা–আকারে বের হয় ; লেখিকাকৃত তারই বঙ্গানুবাদ : 'সুলতানার স্বপ্ন'। Sultana's Dream সম্বন্ধে ১৩২৮ মাঘের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য–পত্রিকায় 'গ্রন্থ পরিচয়' বিভাগে বলা হয় :

> 'এই ছোট গল্পটি ইংরাজীতে লিখিত। 'মতিচূর'-রচয়িত্রীকে আমরা বাংলা সাহিত্যের একজন সুনিপুণ লেখিকা বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু এমন সরল সুন্দর ইংরাজীও লিখিতে পারেন তাহা আমাদের জানা ছিল না। আলোচ্য বইটিতে কোন এক সুলতানার স্বপ্ন-ছলে যে গল্পটি বলা হইয়াছে তাহা খুবই কৌতুকাবহ হইয়াছে। সংসারে নারী যে পুরুষের প্রাধান্য না মানিয়াও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলনে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে, এমনকি বিদেশীর আক্রমণ হইতে স্বদেশের গৌরব রক্ষা করিতে পারে, তাহাই লেখিকা দেখাইয়াছেন। আমরা ভরসা করি, ইংরাজী-শিক্ষিত মুসলমান সমাজে এই পুস্তকের আদর হইবে। ...'

রোকেয়ার Sultana's Dream-এ স্বাধীন স্বনির্ভর নারী-সমাজের যে রম্য fantastic কল্পচ্ছবি ধ্যানদৃষ্টিতে তুলে ধরা হয়েছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে পরবর্তীকালে Anthony M. Ludovici-র লেখা Lysistrata, or Woman's Future and Future Woman পুস্তকের প্রতিপাদ্য ভবিষ্যৎ নারীজীবনের দৃশ্যাবলী। তা থেকেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রোকেয়া ছিলেন সুদূরদৃষ্টির অধিকারিণী। কিন্তু শুধু জ্ঞানের দৃষ্টিতে ভাস্বর নয়, প্রেমের মাধুর্যেও তাঁর অন্তর ছিল সাদাস্নিগ্ধ। পবিত্রতা ও মানবিকতা তাঁর মনোলোকে অনাহত রেখেছিল আনন্দ ও সৌন্দর্যের স্বচ্ছন্দ সঞ্চার,—তারই বলে তাঁর ব্যক্তিত্ব হ'তে পেরেছিল দৃঢ়মূল ও অনমনীয়। শুধু তাঁর রচনাবলীতেই নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল পরিচালনার ব্যাপারেও তাঁর এই প্রবল ব্যক্তিত্ব ও মধুর চরিত্রের উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায়।

চার

বেগম রোকেয়া 'অবরোধ-বাসিনী' শিরোনামে 'অবরোধের' বিষয়ে তাঁর 'ব্যক্তিগত কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার' দেন ১৩৩৫ কার্তিক, ১৩৩৬ ভাদ্র, ১৩৩৭ শ্রাবণ ও ১৩৩৭ ভাদ্রের মাসিক মোহাম্মদীতে। এই রচনাটির 'প্রতিবাদ' ক'রে ১৩৩৮ শ্রাবণের মাসিক মোহাম্মদীতে জনৈক লেখক বলেন :

> 'অবরোধ-প্রথার নিন্দা করিতে যাইয়া মাননীয়া লেখিকা কতকগুলি উপকথার অবতারণা না করিলেই বোধ হয় পাঠকগণ বেশী সুখী হইতেন।'

রোকেয়া অবরোধ-প্রথার উচ্ছেদ চেয়েছিলেন ; কিন্তু নারী পর্দা—অর্থাৎ সুরুচি ও শালীনতা-বিসর্জন দিবে, এটা তিনি কোনোদিনই কাম্য মনে করেননি। অতি-আধুনিক রীতির বেলেল্লাপনা তাঁর কাছে কিরূপ শ্লেষের বিষয় ছিল, তাঁর 'উন্নতির পথে' শীর্ষক রম্যরচনাটিতেও তার অভিব্যক্তি ইঙ্গিতবহ ও তাৎপর্যময়।

পাঁচ

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে Everyman's Library-র ৮২৫ সংখ্যা রূপে মেরী ওল্‌স্‌টোনক্রাফ্‌টের A Vindication of the Rights of woman এবং জন্‌ স্টুয়ার্ট মিলের The Subjection of Woman একত্রে প্রকাশিত হয় ; তার Introduction-এ প্রফেসার George E. G. Catlin প্রতীচ্যে নারীর অধিকার-আন্দোলনের অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবধারাসমূহের বিশদ পর্যালোচনা করে A Vindication of the Rights of Woman বইখানির অপরিমাণ মূল্য ও দুর্নিবার প্রভাব প্রতিপন্ন করেছেন ; অথচ তাঁর মতে বইখানি well-planned, well presented ও well-written নয়—তা লিখতে লেখিকার মাত্র ছয় সপ্তাহ সময় লেগেছিল। নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ন্যায়ানুমোদিত রাজনৈতিক অধিকার আর্থনীতিক স্বনির্ভরতা ও জাতীয় শিক্ষার চিন্তাই রোকেয়ার চিত্তকেও রেখেছিল সদাজাগ্রত ; অথচ তাঁর রচনায় প্রচারধর্মিতার উর্ধ্বে প্রতিভাত তাঁর সাহিত্যগুণ। তাঁর 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের 'সিদ্দিকা' এক চমৎকার সৃষ্টি ; এই চরিত্রে নারীর হৃদয়-রহস্যের অতলতা ও দুর্জয় অভিমান যে শান্তশ্রী ও লিপিকুশলতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে তা আমাদিগকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। গল্প বা কথিকার আকারে তিনি যে-সকল 'স্যাটায়ার' লিখেছেন, সেগুলি মুখ্যতঃ উদ্দেশ্যমূলক ও শিক্ষাত্মক (didactic) হলেও শিল্প-বিচারেও প্রায়শঃ রসোত্তীর্ণ। তাঁর কোন কোন কথায় তীক্ষ্নতা আছে ; কিন্তু তাকেও মহিমান্বিত করেছে একটি মমতাময়ী নারীচিত্ত,—বাঙলা সাহিত্যে দুর্লভ সেই চিত্তের স্পর্শ।

বেগম শামসুন নাহারের 'রোকেয়া-জীবনী'তে রোকেয়ার ৫ খানি ও বেগম মোশফেকা মাহমুদের 'পত্রে রোকেয়া-পরিচিতি'তে তাঁর ১৩ খানি পত্র সঙ্কলিত হয়েছে। একখানি পত্রে রোকেয়া বাংলাদেশে একটি 'নারী-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন' প্রসঙ্গে বলেন :

> 'আমাদের বাংলাদেশ, আহা রে ! আমি যদি কিছু টাকা (ধর, মাত্র দুই লক্ষ) পাইতাম, তবে কিছু করিয়া দেখাইতে পারিতাম।'

এদেশে একদিন হয়ত নারী-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'বে ; কিন্তু আজ এ দেশবাসী 'রোকেয়া নারী-মহাবিদ্যালয়' স্থাপন ক'রে এই দেশবরেণ্যা নারীর অমর স্মৃতির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারেন।

তাঁর Sultana's Dream, মতিচূর, পদ্মরাগ প্রভৃতি অমূল্য পুস্তক বহুদিন থেকেই দুষ্প্রাপ্য। আজ 'রোকেয়া-রচনাবলী' প্রকাশের ফলে তাঁর চিন্তাধারা ও সাহিত্যসাধনার সঙ্গে দেশের যুব-সম্প্রদায় পরিচিতি হ'য়ে যদি জাতিগঠনে প্রবুদ্ধ হন, তা হ'লেই এই উদ্যোগের সার্থকতা হবে সুদূরপ্রসারী।

ঢাকা **আবদুল কাদির**

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭২

বেগম রোকেয়ার সাহিত্য-কীর্তি

আবদুল কাদির

আধুনিককালের গোড়ার দিকের বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনা অনেকখানিই প্রতিক্রিয়ামূলক। মীর মশাররফ হোসেন হইতে আরম্ভ করিয়া মিসেস এম. রহমান পর্যন্ত মুসলমানের সাহিত্য-চর্চা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অসামান্য কিছু নয়; তবে সে-সাহিত্যে প্রতিবাদ ছাড়াও এমন সৃষ্টি কিছু আছে, যাহাকে অনবদ্য না হইলেও সুস্থ ও স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। তবু এ-কথা অসত্য নহে যে, সে-সাহিত্যের মূলে সাহিত্যিক প্রেরণার চাইতেও বড় জিনিস ছিল 'আমরাও আছি' এই মনোভাব। হিন্দু সাধকদের সৃষ্টি-চাঞ্চল্যে সচেতন হইয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টি-মাহাত্ম্য প্রচার-কল্পে একালের প্রথম দিকের মুসলিম সাহিত্যিকরা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মীর মশাররফ হোসেন 'জঙ্গনামা'-র উপর ভিত্তি করিয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' লেখেন; নবীনচন্দ্রের অনুবর্তিতায় কায়কোবাদ এবং হেমচন্দ্রের অনুভাবে শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক কাব্য-সাধনায় অগ্রসর হন। এই সমস্ত রচনায় বাংলা পরিবেষ্টনের প্রভাব—নৈতিক ও সাংসারিক জীবনের বেদনা কোনো রূপলাভ করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। 'বঙ্গবিধবা'-র হাহাকার মোজাম্মেল হকের অন্তরে অপূর্ব বেদনার সৃষ্টি করিয়াছে, অথচ স্বসমাজের অজ্ঞানতা ও অপ্রেমের খবরদারি তাঁহার মধ্যে বিশেষ-কিছু নাই। আসলে হিন্দু মনীষীরা পর্যাপ্তরূপে যাহা পরিবেশন করিতেছিলেন, মুসলমান সাহিত্যিকরা সে-সবকেই সাহিত্য-সাধনার সহজ উপাদান করিয়া লইয়াছিলেন,—আর অত্যন্ত অনায়াসে মুসলিম সাধনার যাহা পাওয়া যায়, তাহাই নিজেদের চিৎপ্রকর্ষের পরিচয় স্বরূপ দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। পরিপার্শ্বের সঙ্গে সম্পর্কবিচ্যুত এই যে সাহিত্য, ইহার একটা সুফল হইল এই যে, এ-দেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাহার রসগ্রহণে ও অভিনন্দনে অগ্রসর হইতে বেশি বেগ পাইল না।

অবশ্য সেই সাহিত্যিকরা যে সমস্যা একেবারে বোঝেন নাই তাহা নহে। কোরবাণী সম্পর্কে কথা বলিতে গিয়া মীর মশাররফ হোসেন তাঁর স্বসম্প্রদায়ের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। সহজ সৌন্দর্য-দৃষ্টিসম্পন্ন কবি কায়কোবাদ হিন্দু ও মুসলমানকে সাম্প্রদায়িক মানুষ-রূপে না দেখিয়া স্বাভাবিক মানুষ-রূপে দেখিবার যে-প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তার ফলে স্বসমাজের নিকট হইতে কম গঞ্জনা লাভ করেন নাই। বিশেষতঃ 'সমাজ ও সংস্কারক'-রচয়িতা পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন ও 'অনল-প্রবাহে'র কবি ইসমাইল হোসেন শিরাজী 'প্যান ইসলাম'-আদর্শের আলোকে নব-উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে গিয়া স্বসমাজের অন্তহীন দুর্গতির দিকেও দৃষ্টি দিয়াছিলেন। অবশ্য এ-কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করা যায় যে, সৈয়দ শিরাজী, মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ সমাজের জন্য কল্যাণায়োজনের চেষ্টায় মৌলানা মনিরুজ্জামানেরই সহযাত্রী। সুদ-সমস্যা, নারী-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, কৃষক-সমস্যা, দেশ-

মুক্তি–সমস্যা, ভাষা–সমস্যা ইত্যাদি নিয়া মৌলানা মনিরুজ্জামান যথেষ্ট চিন্তা–ভাবনা করিয়াছিলেন—সেকালের সমস্যা-সাহিত্যে তার রূপরেখা অভিযোগ অভিমানের আবেগ-বাহুল্য নিয়া ফুলিয়া আছে।

ইহাদের রচিত সাহিত্যে বৃহত্তর দেশের সম্পর্কে দায়িত্বহীনতা, ধ্যানীর ঔদাসীন্যের চাইতে প্রতিবাদের বিক্ষুব্ধতা, এ–সমস্ত দোষ–ত্রুটিই হয়ত ইহার দিকে দেশবাসীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু হিন্দু–মুসলমান নির্বিশেষে সকল মহিলা–সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বেগম রোকেয়া নিজের ব্যক্তিত্ব ও বেদনার রসে সাহিত্য–সৃষ্টিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অবরুদ্ধ মুসলমান অন্তঃপুরে এহেন শাণিতবুদ্ধি প্রেমপরায়ণা রুচিসুন্দর প্রতিভার আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ব্যাপার। হিন্দু ও মুসলমানকে তিনি কবি কায়কোবাদের মতোই সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে পারিয়াছিলেন ; অধিকন্তু তিনি ছিলেন পরিপার্শ্বের সন্ততি। কোনো মত–বিশ্বাসের অন্ধ–উত্তেজনায় তিনি দুর্বলচিত্ততার পরিচয় দেন নাই ; ইসলামকে তিনি মনুষ্যত্ব–সাধনার এক চমৎকার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম অর্থে তিনি আল্লাহ্‌র অনুধ্যানই বুঝিয়াছিলেন। 'পিপাসা' প্রবন্ধে কারবালা–কাহিনী ব্যাখ্যান করিয়া শেষে বলিয়াছেন : 'এ–হৃদয়ের পিপাসা তুচ্ছ বারি–পিপাসা নহে। ইহা অনন্ত প্রেম–পিপাসা। ঈশ্বর একমাত্র বাঞ্ছনীয়, আর সকলে পিপাসী— ঐ বাঞ্ছনীয় প্রেমময়ের প্রেম–পিপাসী।'

তাঁহার চারিপাশের যে–সমাজ—অবরোধবন্দিনী নিগৃহীতা নারী–সমাজ, তাহারই অজ্ঞানতা ও নির্জীবতার বেদনা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। 'আমাদের এ বিশ্বব্যাপী দাসত্বের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি?'—এই প্রশ্নের অন্তরালে যে দাহ, তাহার তীব্রতা তাঁহার সমস্ত রচনায় সঞ্চারিত হইয়া আছে। নারী–বিদ্বেষী শপেনহর বলিয়াছেন : 'One need only look at a woman's shape to discover that she is not intended for either too much mental or much or too much physical work.' কিন্তু বেগম রোকেয়া বলিয়াছেন—'স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে ; তাই বলিয়া পুরুষ প্রভু হইতে পারে না।' 'The soul of a woman has something obscure and mysterious in it' -- এই কথা তিনিও যে জানিতেন, তাহা 'কুসুমের সৌকুমার্য হরিণের কটাক্ষ নিদ্রার মোহ ইত্যাদি তেত্রিশটি উপাদান ললনা নির্মিত হইয়াছে' — উক্তিতেই বুঝা যায় ; কিন্তু নারীর সেই আত্মিক প্রকৃতির বিশ্লেষণে অগ্রসর না হইয়া সামাজিক জীবনের ক্রমভঙ্গতার দিকেই তিনি অধিক দৃষ্টি দিয়াছিলেন। 'বাস্তবিক অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন বই আর কিছু নয়';—নারীর এই আত্মার দাসত্ব স্কলনের জন্য তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন : 'অলঙ্কারের টাকা দ্বারা জেনানা–স্কুলের আয়োজন করা হউক।' স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা যথাযোগ্যরূপে হইলেই নারীর উন্নতি অনিবার্য হইবে ; তার কুসংস্কারপ্রিয়, রক্ষণশীল অথচ ফ্যাশনবিলাসী, আবেগপ্রধান প্রকৃতি প্রকৃতিস্থতা লাভ করিবে ; 'Complete equality with man makes her quarrelsome, a position of supremacy makes her tyrannical',এই দুর্নাম ঘুচিয়া যাইবে ; এই সহজ অথচ সুদৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছিল। 'আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা ও অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায়

পশ্চাতে পড়িয়া আছি।' সুতরাং পুরুষ প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি তাঁর আক্রোশ অশোভন নয়। 'আপনারা মহম্মদীয় আইনে দেখিতে পাইবেন যে, বিধান আছে, পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে ; এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ।' পুরুষ কর্তৃক 'অর্দ্ধাঙ্গী'র দাবী সম্পর্কে এই উপেক্ষা দেখিয়া তিনি দুঃখ-ক্ষোভে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন--'পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয় তাহাই করিব।' অর্থনৈতিক দিক দিয়া নারীর স্বাবলম্বনকেই তিনি মুক্তির অন্যতম উপায় মনে করিয়াছিলেন।

. 'মতিচূর' ১ম ও ২য় খণ্ড, 'Sultana's Dream', 'পদ্মরাগ', 'অবরোধ-বাসিনী' প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থে জীবনের ঐকান্তিক স্বপ্ন অভিনব রূপ লাভ করিয়া আছে। 'মতিচূর' ২য় খণ্ডে সৌরজগৎ, ডেলিশিয়া-হত্যা, জ্ঞান-ফল, নারী-সৃষ্টি, নার্স নেলী মুক্তি-ফল প্রভৃতি গল্প ও রূপকথা আছে। মেরী করেলির 'Murder of Delicia' উপন্যাস হইতে সঙ্কলিত গল্পটিতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, পুরুষ-শাসিত সমাজে সভ্যদেশেও নারীর দুঃখের অবধি নাই আর 'নার্স নেলী'তে গৃহের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি দিতে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন। অন্যান্য গল্পগুলিতে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বলা হইয়াছে। 'জ্ঞান-ফল' রূপকথাটি আদম-হাওয়ার কাহিনী নিয়া রচিত ; আদি-পুরুষ বলিতেছেন : 'কি আপদ ! আমি রমণীকে রাখিতেও চাহি না, ফেলিতেও পারি না।' তদবধি নারী অভিশাপ-রূপে পুরুষের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে—তাঁর এই cynical মন্তব্য দুঃসহ বেদনা হইতেই অদ্ভুত।

তাঁর 'Sultana's Dream' ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা—'নারীস্থানের এক অদ্ভুত পরিকল্পনা। সেখানে নারীর বাহুবলে নয়, মস্তিষ্ক-বলে পুরুষ পরাস্ত, নারী-প্রতিষ্ঠিত সেই স্বপ্ন-সমাজে পুরুষ minor—'মর্দ্দানা'বাসী। নারীর এবম্বিধ বিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন : 'শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কার-রূপ অন্ধকার দূরীভূত হইয়া গেল।'

'মতিচূর' ১ম খণ্ডে 'বোরকা' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন : 'অবরোধের সহিত উন্নতির বেশি বিরোধ নাই। ... এই অবরোধ-প্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি? ... অবরোধ-প্রথা স্বাভাবিক নহে—নৈতিক। ... বোরকা জিনিষটা মোটের উপর মন্দ নহে। ... উন্নতির জন্য অবশ্য উচ্চশিক্ষা চাই। ... পর্দা কিন্তু শিক্ষার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়ায় না। আমাদের শিক্ষয়িত্রীর অভাব।'

তাঁর 'অবরোধ-বাসিনী' গ্রন্থে ৪৭টি অবরোধ-সম্পর্কিত দুর্ঘটনার উপাদেয় কাহিনী আছে—অতুলনীয় শ্লেষ ও লিপিকুশলতার সঙ্গে তিনি সেগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে নারী Humourist বিরল, সেদিক দিয়া 'অবরোধ-বাসিনী' উল্লেখনীয় কিছু নিশ্চয়ই। তিনি পর্দা চাহিয়াছেন, কিন্তু তার বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন নাই ; বলিয়াছেন : 'ঐ সকল কৃত্রিম পর্দা কম করিতে হইবে।' তাঁর মধ্যে বিদ্রোহের উদ্দামতার চাইতে এই যে সংযম ও মমত্ববোধের প্রাচুর্য্য, তার মূলে রহিয়াছে তাঁর নারীপ্রকৃতি। অবশ্য পর্দা বলিতে যে তিনি নারীর সবল ব্যক্তিত্বই বুঝিতেন তার ইঙ্গিত নিম্নোক্ত ছত্রটিতে আছে : 'বর্তমান যুগে ইউরোপীয় ভগ্নিগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন, তাঁহাদের পর্দা নাই কে বলে?'

তাঁর 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকা কিন্তু বলিতেছে : 'আমি আজীবন ... নারীজাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ-প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব। ... আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে ; সংসার-ধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।'—সিদ্দিকা গ্রন্থকর্ত্রীর মানস-সৃষ্টি — এক জ্বলন্ত অগ্নিকণা। এমিয়েল্ বলিয়াছেন : 'A woman places her ideal in the Perfection of love and a man in the perfection of justice.'--- পুরুষের সমাজ যখন বিচারবিমুখ তখন পুরুষের কাছে চিত্তসমর্পণ করিতে নারীর পরাঙ্মুখ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও সিদ্দিকার এই বিদ্রোহ বা আত্মত্যাগ সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই, চিরন্তন নারী-প্রকৃতির বিরুদ্ধে নয়—তার প্রমাণ : স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে তবু তার সাশ্রুনয়নে শোনা :

'স্বরগ মুকতি পুণ্য কিছু নাহি প্রয়োজন,
জনম জনম ধরি' তোমারেই কামনা।'

পদ্মরাগের 'তারিণী-ভবনের' পরিকল্পনা পাশ্চাত্তেরে দাতব্য চিকিৎসালয় বা হিন্দুর আশ্রম হইতে ধার করা নয়, এই পুস্তকের পটভূমিতে রহিয়াছে তাঁর জীবনেরই স্বপ্ন। সাখাওয়াৎ মোমেরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই স্বপ্নের কিছু বাস্তব রূপ দিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 'পদ্মরাগে'-র অনেক ঘটনাই তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। এ সমস্ত রচনায় সহজ সরল অকৃত্রিম বেদনার যে সাবলীল প্রকাশ, তার ভঙ্গীতে রহিয়াছে তাঁর স্বকীয়তা। মেটারলিঙ্ক 'নারী-প্রসঙ্গে' বলিয়াছেন : 'Theirs are still the divine emotions of the first days, and sources of their being lie deeper far than ours, in all that was illimitable.'

মাসিক মোহাম্মদী
মাঘ ১৩৩৯

১। অলঙ্কার না Bagde of Salvery
মহিলা,
৮ম বর্ষ-১০ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১০, পৃ. ২৭৩-২৭৭।
১১শ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, পৃ. ৩১১-৩১৪
১২শ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১০, পৃ. ৩৩৯-৩৪৪।

২। নবনূর, আমাদের অবনতি
২ বর্ষ, ৫ সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩১১

অলঙ্কার না Badge of slavery?*

ভগিনীগণ! তোমরা কি কোনদিন আপনার দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যসমাজে আমরা কি, দাসী!! পৃথিবী হইতে দাস-ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? আমরা যে নরাধীন সেই নরাধীন! দিদীমাদের মুখে শুনি যে, নারী নরের অধীন থাকিবে, ইহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত— তিনি প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তাহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত রমণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু একথার আমার সন্দেহ আছে। কারণ দিদীমাদের এ জ্ঞান পুরুষের নিকট হইতে গৃহীত। তাঁহারা ত বলিবেনই যে, রমণী কেবল পুরুষের সুখ শান্তিদাত্রিরূপে জন্মগ্রহণ করে।

২ আমি আদিম কালের ইতিহাস জানি না বটে, তবু বিশ্বাস করি যে, পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না, তখন আমরা এরূপ দাসী ছিলাম না। মানুষ যেমন ক্রমে সভ্য হইয়াছে— গায়ে রঙ্ মাখা ছাড়িয়া কাপড় পরিতে শিখিয়াছে, তেমনই ক্রমে বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে নারীজাতির উপর আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঈশ্বর এমন পক্ষপাতী নহেন যে, এক জাতিকে অন্য জাতির অধীন করিবেন। যদি তাই হইত তবে সৃষ্টিকর্ত্তা পুরুষের যেমন দুই হস্ত দুই চক্ষু সৃষ্টি করিয়াছেন, রমণীরও সেই প্রকার অবয়ব সৃজন করিলেন কেন? কই দ্বিমস্তক পুরুষ বা নাসাহীনা রমণী কোন্ দেশে আছে? এরূপ ত সৃষ্টিবৈচিত্র্য কোথাও দেখা যায় না। তবে কেমন করিয়া বলিব ঈশ্বর পক্ষপাতী? যে সমাজ রাজা ও প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে, পুলিশ প্রভু ও বড়লাট প্রভুর মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সমাজ নারীকে নরের অধীন করিয়াছে। যে ভূজবলে ও চাতুরী কৌশলে সুচতুর মানুষ বন্য পশুকে করায়ত্ত করিয়াছে— অশ্বের দ্বারা শকট টানাইতেছে, হস্তীকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে, পশুরাজকেশরীকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়াছে, সেই বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে নারীকে তাহারা অধীনতাপাশে বাঁধিয়াছে।

৩ আমরা বহুকাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসীত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ক্রমে পুরুষেরা আমাদের মনকে পর্য্যন্ত enslaved করিয়া ফেলিয়াছে। স্বাধীনতা ও অধীনতার যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থটুকুও আমাদের নাই। কি ভীষণ অধঃপাত। তাঁহারা ভূস্বামী গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে হইতে ক্রমে আমাদের "স্বামী" হইয়া উঠিয়াছেন। আর আমরা ক্রমশঃ তাঁহাদের গৃহপালিত পশু পক্ষীর ন্যায় আদুরে হইয়া পড়িয়াছি! এখন আমরা সমাজের বন্দিনী।

৪ আর এই যে, আমাদের অতি প্রিয় অলঙ্কারগুলি— এগুলি badges of slavery! ঐ দেখ কারাগারে বন্দিগণ লৌনির্ম্মিত বেড়ী পায়ে পরিয়াছে, আমরা (আদরের জিনিষ বলিয়া)

---

* ভাগলপুরস্থ সম্ভ্রান্ত মোসলমান পরিবারের একটী মহিলা হইতে প্রাপ্ত।

স্বর্ণ রৌপ্যের বেড়ী পরিয়া বলি "মল পরিয়াছি !" উহাদের হাতকড়ী লৌহনির্ম্মিত, আমাদের হাতকড়ী স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত "চুড়ি !" বলা বাহুল্য অনেকে এক হাতে লোহার 'বালা'ও পরেন ! কুকুরের গলে যে dogcollar দেখি, উহারই অনুকরণে আমাদের জড়োয়া চিক নির্ম্মিত হইয়াছে। অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণশৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া বলি "হার পরিয়াছি !" গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাকা দড়ী" পরায়, আমাদের স্বামী আমাদের নাকে "নোলক" পরাইয়াছেন ! ! অতএব দেখিলে ভগিনি, আমাদের ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি badges of slavery ব্যতীত আর কিছুই নহে ! আবার মজা দেখ, যাঁহার শরীরে badges of slavery যত অধিক, তিনি সমাজে ততোধিক মান্যা গণ্যা !

৫ এই অলঙ্কারের জন্য আমাদের কত আগ্রহ— যেন জীবনের সুখসমৃদ্ধি উহারই উপর নির্ভর করে ! তাই দরিদ্রা কামিনীগণ স্বর্ণরৌপ্যের হাতকড়ী না পাইয়া কাচের চুড়ি পরিয়া দাসীজীবন সার্থক করে। যে বিধবা চুড়ি পরিতে অধিকারিণী নহে, তাহার মত হতভাগিনী এ জগতে নাই ! ! অভ্যাসের কি অপার মহিমা ! দাসত্বে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া দাসত্বসূচক গহনা ভাল লাগে। অহিফেন তিক্ত হইলেও আফিংচির অতি প্রিয় সামগ্রী। মাদকদ্রব্যে যতই সর্ব্বনাশ হউক না কেন, মাতাল তাহা ছাড়িতে চাহে না। সেই রূপ আমরা অঙ্গে badges of slavery ধারণ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করি— গর্ব্বে স্ফীতা হই ! হায় ! আমাদের অধঃপাতের একশেষ হইয়াছে। হিন্দুমতে সধবা স্ত্রীলোকের কেশকর্ত্তন নিষিদ্ধ কেন? তাহা কি একটু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? সধবানারীর স্বামী ক্রুদ্ধ হইলে স্ত্রীর সুদীর্ঘ কুন্তলদাম হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে সহজে উত্তম মধ্যম দিতে পারিবে ! ভল্লুকের নৃত্য দেখিয়াছ? সময়ে সময়ে ভল্লুকের সহিত "কুস্তি" করিয়া ভল্লুকস্বামী পরাজিত হইলে তাহার "নাকাদড়ী" ধরিয়া টান দেয়। তখন ভল্লুকবীর অসহ্য যাতনায় অধীর হইয়া জোর কম করে ! সেইরূপ সধবা প্রহার তাড়নায় পলায়নতৎপর হইলে স্বামী তাহার কেশপাশ ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করে। প্রত্যেক রমণীরই সুদীর্ঘ অলকগুচ্ছ যে ঐরূপে ব্যবহৃত হয়, আমি তাহা বলিতেছি না। তবে কেশবৃদ্ধি দ্বারা সকল স্বামীর জন্য অন্ততঃ ঐ সুবিধাটা প্রস্তুত রাখা হয় ! ! ধিক্ আমাদিগকে ! আমরা আশৈশব এই চুলের কত যত্ন করি ! কি চমৎকার সৌন্দর্য্যজ্ঞান !

৬ অলঙ্কারসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে কোন কোন ভগ্নী বোধ হয় আমাকে পুরুষপক্ষেরই গুপ্তচর মনে করিবেন। অর্থাৎ ভাবিবেন যে, আমি পুরুষের টাকা স্বর্ণকারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য হয়ত এরূপ কৌশলে ভগ্নীদিগকে অলঙ্কারে বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। না ভগিনি, তাহা নয়। আমি তোমাদেরই এক জন, এবং তোমাদেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। পুরুষের টাকার শ্রাদ্ধ করিবার অনেক উপায় আছে। দুই একটি উপায় বলিয়া দিতেছি।

৭ তোমার ঐ জড়োয়া চিকটা বাড়ীর আদুরে কুকুরটির কণ্ঠে পরাও, এবং যাহাতে চিকটা চুরি না যাইতে পারে, সেজন্য বেশী বেতনে একজন চাকর নিযুক্ত কর, সে ঐ কুকুরের সঙ্গে

সঙ্গে থাকিবে। চিক হারাইলে ঐ চাকর দণ্ডিত হইবে। তুমি যখন শকটারোহণে বেড়াইতে যাও, তখন সেই শকটাবাহী অশ্বের গলে তোমার বহুমূল্য হার পরাইও। তোমার বালা ও চুড়িগুলি drawing room এর curtainring রূপে ব্যবহার করিও। তবেই "স্বামী" নামধারী নরবর বেশ জব্দ হইবেন!! অলঙ্কারের উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য্য দেখান বইত নয়? তবে ঐরূপে ঐশ্বর্য্য দেখাইও। নিজের শরীরে badges of slavery ধারণ করিবে কেন? উক্ত প্রকারে অলঙ্কারের সদ্ব্যবহার করিলে প্রথম প্রথম লোকে তোমায় পাগল বলিবে, কিন্তু গ্রাহ্য করিও না। এ পোড়া সংসারে কোন্ ভাল কাজটা বিনা ক্লেশে সম্পাদিত হইয়াছে? "পৃথিবীর গতি আছে" এই কথা বলাতে মহাত্মা Galileoকে বাতুলাগারে যাইতে হইয়াছিল। কোন্ সাধু লোকটি অনায়াসে নিজ বক্তব্য বলিতে পারিয়াছেন? তাই বলি, সমাজের কথায় কর্ণপাত করিও না। এ জগতে ভাল কথা বা ভাল কাজের বর্ত্তমানে আদর হয় না।

৮ বাস্তবিক অলঙ্কার আমাদের badges of slavery ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুরুষগণ কোন বিষয়ে তর্ক করিতে গেলে বলেন "আমার কথা প্রমাণিত করিতে না পারিলে আমি চুড়ি পরিব!" কবিবর সাদী পুরুষদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছেন, "আয় মর্‌দা, বকুশিদ্ জায়া এ জানা না পুষিদ!" (অর্থাৎ হে বীরগণ! চেষ্টা কর, রমণীর পোষাক পরিও না)। আমাদের পোষাক পরিলে তাঁহাদের অপমান হয়! দেখা যাউক সে পোষাকটা কি? কাপড় ত তাঁহাদের ও আমাদের প্রায়ই একই প্রকার। এক খণ্ড ধুতিতে ও এক খণ্ড সাড়ীতে লম্বাই চৌড়াই এর কিছু তারতম্য আছে কি? একই বস্ত্র খণ্ড তিনি পারিলে ধুতি হয়, আমি পারিলে শাড়ী। যে দেশে পুরুষে পাজামা পরে, সে দেশে নারীও পাজামা পরে" Ladies jacket" শুনা যায়; "gentlemen's jacket" ও শুনিতে পাই! তবে "জামা এ জনা।" বলিলে কাপড় না বুঝাইয়া অলঙ্কারই বুঝায়। পুরুষ অলঙ্কার পরে না, যেহেতু ইহা দাসত্বের নিদর্শন* !

৯ পুরুষগণ বলেন যে, তাঁহারা আমাদিগকে "বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া অন্তঃপুরে রাখিয়াছেন।" এবং আমরা এরূপ সোহাগ সংসারে পাইব না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাই সোহাগে গলিয়া মোমের পুতুল হইয়াছি। তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয়পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞানসূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ক্রমশঃ (inch by inch) মরিতেছি! অতএব এখন মিনতি করিয়া বলিতে চাই—

"অনুগ্রহ করে এই কর, অনুগ্রহ কর না মোদের।" বাস্তবিক অত্যধিক যত্নে অনেক জিনিষ নষ্ট হইয়া যায়। যে কাপড় বহু যত্নে বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা উইয়ের ভোগ্য হয়। পুরুষ কবিই ত বলিয়াছেন—

---

* পুরুষগণ অলঙ্কার না পরিয়া ভিন্ন প্রকারের Badges of slavery ধারণ করেন!

"কেন নিবে গেল বাতি?
অধিক যতনে আমি ঢেকেছিনু তারে
জাগিয়া বাসর রাতি,
তাই নিবে গেল বাতি।

সুতরাং দেখা যায়, তাঁদের অধিক যত্নই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ।

১০ বিপৎসঙ্কুল সংসার হইতে সর্ব্বদা সুরক্ষিতা আছি বলিয়া আমরা সাহস, ভরসা বল একেবারে হারাইয়াছি, আত্মনির্ভর ছাড়িয়া স্বামীদের নিতান্ত "আঁচলধরা" হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য হইতে সামান্যতর বিপদে পড়িলে আমরা গৃহকোণে লুকাইয়া গগনভেদী আর্ত্তনাদ রোদন করিয়া থাকি!! ভ্রাতৃ মহোদয়গণ আবার আমাদের "নাকিকান্নার" কথা তুলিয়া কেমন বিদ্রূপ করেন, তাহা জান না কি? আর সে বিদ্রূপ আমরা নীরবে সহ্য করি। বুক ফাটিলেও মুখ ফোটে না। আমরা কেমন শোচনীয়রূপে ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, তাহা ভাবিলে ঘৃণায় লজ্জায় মৃতপ্রায় হই।

১১ বাঘ ভল্লূক ত দূরে থাকুক, আর্সুলা জলৌকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ দেখিয়া আমরা ভীতি বিহ্বল হই! একটি নয় দশ বৎসরের বালক বোতলে আবদ্ধ একটি জলৌকা লইয়া বাড়ী শুদ্ধ স্ত্রীলোকদের ভীতি উৎপাদন করিয়া আমোদ ভোগ করে। অবলাগণ চিৎকার করিয়া দৌড়িতে থাকেন, আর বালকটি সহাস্যে বোতল হস্তে তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। এমন তামাসা তোমরা দেখ নাই কি? আমরা দেখিয়াছি, আর সে কথা ভাবিয়া ঘৃণায় লজ্জায় মরমে মরিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, সে সময় বরং আমোদ বোধ কয়িছিলাম, কিন্তু এখন সে কথা ভাবিলে শোণিত উত্তপ্ত হয়। আমরা শারীরিক বল মানসিক সাহস সব পুরুষের চরণে উৎসর্গ করিয়াছি আর এই দারুণ শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিবারও আমাদের অবসর নাই।

১২ ভীরুতার চিত্র ত দেখাইলাম, এখন শারীরিক দুর্ব্বলতার চিত্র দেখাইব। আমরা এমন জড় অচেতন পদার্থ হইয়া গিয়াছি যে, তাঁহাদের drawing room এর Ornament বই আর কিছু নহি। ভগিনিগণ! তোমরা কখনও বিহারের কোন ধনী মুসলমান ঘরের বউ ঝী নাম্নী অদ্ভূত জড়পদার্থ দেখিয়াছ কি? আমি দেখিয়াছি। একটী বধূ বেগমের প্রতিকৃতি দেখাই। ইহাকে কোন প্রসিদ্ধ museum এ বসাইয়া রাখিলে রমণী জাতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইত! একটি অন্ধকার কক্ষে দুইটি মাত্র দ্বার আছে, তাহার একটি রুদ্ধ এবং একটি মুক্ত থাকে। সুতরাং সেখানে (পর্দ্দার অনুরোধে) বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যরশ্মির প্রবেশ নিষেধ। ঐ কুঠরীতে পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে যে রক্তবর্ণ বনাত মণ্ডিত তক্তপোষ আছে, তাহার উপর বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা, তাম্বুলরা রঞ্জিতাধরা প্রসন্নোননা যে একটী জড় পুত্তলিকা দেখিতেছ, উহাই বধূ বেগম (অর্থাৎ বেগমের পুত্রবধূ)। ইহার সর্ব্বাঙ্গে ১০২০০ টাকার অলঙ্কার। শরীরের কোন্ অংশে কয় ভরি সোণা বিরাজমান, তাহা সুস্পষ্ট রূপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। মাথার (সিঁথির) অলঙ্কার দেড় পোয়া (৩২ ভরি); কর্ণে কিঞ্চিৎ

অধিক এক পোয়া (২৪ ভরি) ; কণ্ঠে সওয়া সের (১২০ তোলা) সুকোমল বাহুলতায় প্রায় দেড় সের (১৩৬ ভরি) ; এবং চরণযুগলে সার্দ্ধ দুই সের স্বর্ণের বোঝা। আমরা প্রতি ভরি স্বর্ণ ২৫ হিসাবে ধরিয়াছি ; ঐ হিসাবে ১০,২০০ টাকায় পাঁচ সের আট তোলা স্বর্ণ হয়। প্রতি ভরি ২০ ধরিলে সাত সের আটচল্লিশ তোলা হয়। বলিতে ভুলিয়াছি ঐ অলঙ্কারের অধিকাংশ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে। শুনিতে পাই তখন স্বর্ণ সুলভ ছিল। তবে ১৬ ভরি হিসাবে প্রতি সহস্র টাকায় ৬২৫ তোলা স্বর্ণ ক্রীত হইয়াছিল। বেগমের নাকে যে নথ দুলিতেছে, উহার ব্যাস সার্দ্ধ চারি ইঞ্চ !* পরিহিত পা–জামা বেচারা সলমাচুমকির কারুকার্য্য ও বিবিধ প্রকারের জরির (গোটাপাট্টার) ভারে অবনত ! আর পা–জামা ও দোপাট্টার (চাদরের) ভারে বেচারী বধূ ক্লান্ত।

১৩ প্রায় আট সের স্বর্ণের বোঝা লইয়া নড়াচড়া অসম্ভব, সুতরাং হতভাগী বধূ বেগম জড় পদার্থ না হইয়া কি হইবেন? সর্ব্বদাই তাঁহার মাথা ধরে। ইহার কারণ ত্রিবিধ ; (১) সুচিক্কণ পাটী বসাইয়া কসিয়া কেশবিন্যাস, (২) বেণী ও সিঁথির উপর অলঙ্কারের বোঝা, (৩) অর্দ্ধেক মাথায় আটাসংযোগে আরশাঁ (রৌপ্য চূর্ণ) ও চুমকি বসান হইয়াছে ; ভ্রূযুগল চুমকি দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং কপালে রাঙ্গের বিচিত্র বর্ণের চাঁদ ও তারা আটাসংযোগে বসান হইয়াছে। শরীর যেমন জড়পিণ্ড মন ততোধিক জড়।

১৪ এই প্রকার জড়পিণ্ড হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনামাত্র। কারণ কোন রূপ শারীরিক পরিশ্রম না করায় বেগমের স্বাস্থ্য একেবারে মাটী হয়েছে। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে তাঁহার চরণদ্বয় শ্রান্ত ক্লান্ত ও ব্যথিত হয়। বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ কার্য্যাক্ষম। অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য এসব রোগ তাঁহার চির সহচর। এরূপ স্বাস্থ্য লইয়া চির–রোগীর জীবন বহন করা কেমন কষ্টকর, তাহা অনেকে বুঝেন। সুতরাং ইহাদের নন মস্তিষ্ক সকলই চির রোগী। শরীরে স্ফূর্ত্তি না থাকিলে মনেও স্ফূর্ত্তি থাকে না।

১৫ ঐ চিত্র দেখিলে কি মনে হয়? আমি বধূ বেগমের জন্য বড় দুঃখিত হইলাম, ভাবিলাম, “অভাগার ইহলোক পরলোক উভয় লোকই নষ্ট।” যদি ঈশ্বর হিসাব নিকাশ লয়েন যে, তোমার মন, মস্তিষ্ক, চক্ষুঃ প্রভৃতির কি সদ্ব্যবহার করিয়াছ? তাহার উত্তরে বেগম কি বলিবেন? আমরা নিজের ও অপর মানুষের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া যে শিক্ষালাভ করি, ইহাই ধর্ম্মোপদেশ। সময় সময় আমরা পাখী শাখী হইতে যে সদুপদেশ ও জ্ঞানলাভ করি, তাহা পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একটী আতাপতন দর্শনে মহাত্মা নিউটন যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান তৎকালীন কোন পুস্তকে ছিল না। আমি সেই বাড়ীর একটী মেয়েকে বলিলাম, তুমি যে হস্ত পদ দ্বারা কোন পরিশ্রম কর না, এজন্য খোদার নিকট কি জওয়াব দিহি (explanation) দিবে? সে বলিল, “আপ্‌কা কহ্‌না ঠিক হ্যায়।” এবং সে যে সময় নষ্ট করে না, সর্ব্বদা চলাফেরা করে, আমাকে ইহাও জানাইল। আমি পুনরায় বলিলাম, শুধু ঘুর ফির করিলেই ব্যারাম হয় না। তুমি প্রতিদিন অন্ততঃ আধ ঘণ্টা দৌড়া দৌড়ি করিও। দৌড়া

---

* কোন কোন নথের ব্যাস ছয় ইঞ্চ এবং পরিধি ন্যূনাধিক ১৮ ইঞ্চি হয় ! ওজন এক ছটাক ! !

দৌড়ি কথাটার উপরে হাসির একটা গর্‌রা উঠিল। আমি কিন্তু ব্যথিত হইলাম, ভাবিলাম "উল্টা বুঝিলি রাম!" কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার শক্তিটুকুও ইহাদের নাই। আমাদের উন্নতির আশা বহুদূর—ভরসা কেবল পতিতপাবন।

১৬ আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনঃকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের জন্য স্কুল কলেজের দ্বার এক প্রকার রুদ্ধ। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিবেন, কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হইবে না। যদি এক জন উদার পুরুষ দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া অগ্রসর করিতে চাহেন, তাহাতে সহস্র জনে বাধা দেন।

১৭ এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে "কেন ধরা দিলে, কেন দাসী হইলে?" ইহার উত্তরে এই মাত্র বলি, "পুরুষগণ! তোমরা কেন ভারতবর্ষের সিংহাসনে বিদেশীর রাজন্যবর্গকে বসিতে দিলে?" যে কারণে তাঁহারা পরাধীন হইয়াছেন, সেই কারণে আমরাও নরাধীন হইয়াছি।

১৮ এখন ভগিনীগণ, আপন স্বত্ব বুঝিতে চেষ্টা কর। স্বীকার করি যে, বহু বহু শতাব্দী হইতে নারী যে দাসত্বশৃঙ্খল পরিতেছে, তাহা এক দিনে মোচন হইবে না। কিন্তু বহু শ্রমে নির্ম্মিত অট্টালিকা যেমন এক দিনের ভূকম্পনে ভূমিসাৎ হয়, বহুকালে নির্ম্মিত দুর্গ এক দিনে কামানের গোলাবর্ষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। —আশা করি সেই রূপ বলপ্রয়োগে এ বহুশতাব্দী ব্যাপী দাসত্বের সুদৃঢ় দুর্গ অন্ততঃ ত্রিশ বৎসরে ধ্বংস হইবে। আমরা কি এক দিনে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলাম? অবশ্যই না।

১৯ দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই, তাহার প্রধান কারণ এই যে, যখনই কোনো ভগিনী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি ধর্ম্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে! আমরা প্রথমতঃ যাহা সহজে মানি নাই, তাহা পরে ধর্ম্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছি। এখন ত অবস্থা এই যে, ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই শুনিতে পাই, "প্যাট্! তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাক্‌বি গোলাম!" সুতরাং আমাদের আত্মা পর্য্যন্ত গোলাম হইয়াছে।

২০ শিশুকে মাতা বলপূর্ব্বক ঘুম পাড়াইতে বসিলে, ঘুম না পাওয়ায় শিশু যখন মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দেখে, তখনই মাতা বলেন "ঘুমা শিগ্‌গির ঘুমা! ঐ দেখ জুজু!" ঘুম না পাইলেও শিশু অন্ততঃ চোখ বুঝিয়া পড়িয়া থাকে। সেই রূপ আমরা যখনই উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে "ঘুমাও, ঘুমাও, ঐ দেখ নরক!" মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্ততঃ মুখে কিছু না বলিয়া আমরা নীরব থাকি। (ক্রমশঃ)

২১ আমাদিগকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত পুরুষগণ ঐ ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে "ঈশ্বরের আদেশপত্র" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোন বিশেষ ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় আমরা আলোচ্য নহে—ধর্ম্মে যে সামাজিক আইনকানুন বিধিবদ্ধ আছে, আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব, সুতরাং ধার্ম্মিকগণ নিশ্চিন্ত থাকুন। পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত কিংবা

দেবতা বলিয়া প্রকাশ করিয়া অসভ্য বর্ব্বরদিগকে শাসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পয়গম্বরদিগকে (ঈশ্বরপ্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়!

২২ একবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতাটী সংস্কৃত ভাষায় সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিলেন। তাই হিন্দু রমণীকে শিক্ষা দিলেন,—

"স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার যে বিধাতা।
স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনে অন্য জন,
কভু নহে সুখ মোক্ষদাতা॥'
আর হতভাগী মূর্খ নারী তাই মানিয়া লইল।

২৩ ক্রমে জগতের বুদ্ধি বেশী হওয়ায় সুচতুর প্রতিভাশালী পুরুষ দেখিলেন যে, "পয়গম্বর" বলিলে আর লোকে বিশ্বাস করে না। তখন মহাত্মা ঈশা আপনাকে দেবতার অংশবিশেষ (ঈশ্বরপুত্র!) বলিয়া পরিচিত করিয়া ইঞ্জিল গ্রন্থ রচনা করিলেন। তাহাতে লেখা হইল, "নারী পুরুষের সম্পূর্ণ অধীনা—নারীর সম্পত্তিতে স্বামী সম্পূর্ণ অধিকারা।" আর বুদ্ধি-বিবেকহীনা নারী তাই মানিয়া লইল।

২৪ তারপর মহাত্মা মহম্মদ আইন প্রস্তুত করিলেন যে, "রমণী সর্ব্বদাই নরের অধীনা থাকিবে, বিবাহের পূর্ব্বে পিতা কিংবা ভ্রাতার অধীনা, বিবাহের পর স্বামীর অধীনা, স্বামী অভাবে পুত্রের অধীনা থাকিবে।" আর মূর্খ নারী নত মস্তকে ঐ বিধান মানিয়া লইল।

২৫ ভগিনি, তোমরা দেখিতেছ এই ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি পুরুষরচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পাও, কোন স্ত্রী মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতে। ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বরপ্রেরিত বা ঈশ্বরাদিষ্ট নহে। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণীশাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত কেবল এসিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত যাইয়া "রমণীজাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে" ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এসিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকার কি তাঁহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বরদত্ত জল বায়ু ত সকল দেশেই আছে—কেবল দূতগণ সর্ব্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন? যে কথা পুরাকালে অসভ্য বর্ব্বরগণ বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান কালের সুসভ্যগণ যদি বিশ্বাস করেন, তবে সভ্যতায় ও অসভ্যতায় প্রভেদ কি? যাহা হউক এখন আমরা আর ধর্ম্মের নামে নতমস্তকে নরের প্রভুত্ব সহিব না। আরও দেখ যেখানে ধর্ম্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ—সতীদাহ। যেখানে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনা অর্থাৎ পুরুষের সমতুল্যা। এস্থলে ধর্ম্ম অর্থে ধর্ম্মের সামাজিক বিধান বুঝাইতেছে।

কেহ বলিতে পারেন যে, "তুমি সামাজিক কথা বলিতে গিয়া ধর্ম্ম লইয়া টানাটানি কর কেন?" তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, "ধর্ম্ম"ই আমাদের দাসত্ববন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর

করিয়াছে; "ধর্ম্মের" দোহাই দিয়া পুরুষ রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। তাই "ধর্ম্ম" লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য ধার্ম্মিকগণ আমায় ক্ষমা করিতে পারেন!

২৬ আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করি, সংসারে আপন সম্ভাব্য পথ খুঁজিয়া লই। একস্থানে আমি বলিয়াছি, "ভরসা কেবল পতিতপাবন।" কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, উর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। "God helps those that help themselves." তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে, আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

২৭ অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জ্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া রমণী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা কতক পরিমাণে ঠিক। ব্রহ্মদেশে স্ত্রীলোক উপার্জ্জন করে, সেখানে তাহারা পুরুষের ষোল আনা দাসী নহে। কিন্তু যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া পতি ও সন্তান পালন করে, সেখানে ও ত ঐ অকর্ম্মণ্য পুরুষেরাই "স্বামী" থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জ্জন না করিয়া প্রভুত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে (heiress) বিবাহ করেন, তিনিও তন্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন, এবং লেডীডাক্তার প্রমুখ সমাজের মান্যাগণ্যা কামিনীগণ স্বয়ং জীবিকা উপার্জ্জন করিয়াও "স্বামী" নামক ব্যক্তির বশ্যতা স্বীকার করেন। স্বামীটি যাহা ইচ্ছা তাই করিবেন; স্ত্রী তাঁহার বিনা অনুমতিতে কোথাও যাইবেন না কেন? ইহার কারণ এই যে, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে। এখন আমাদের স্বাধীনতার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় না! আমরা একেবারে গোল্লায় গিয়াছি! তাই বলি—

"অতএব জাগ জাগগো ভগিনি!"

প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহাগোলমাল বাধাইবে, জানি; মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল" (অর্থাৎ প্রাণদণ্ড) এর বিধান দিবেন, এবং হিন্দু চিতানল বা তূষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি! কিন্তু জাগিতে হইবেই! বলিয়াছি ত কোন ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও Galileu বলিয়াছিলেন, "but nevertheless it (Erth) does move"!! আমাদিগকে ঐরূপ বিবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। এ স্থলে পার্সী নারীদের একটী উদাহরণ দিতেছি। নিম্নলিখিত প্যারাটী এক খণ্ড উর্দ্দু সংবাদপত্র হইতে অনুবাদিত হইল :—

এই পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে পার্সীলেডীদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিলাতী সভ্যতা যাহা, তাঁহারা এখন লাভ করিয়াছেন, পূর্ব্বে ইহার নামমাত্র জানিতেন না। মুসলমানদের ন্যায় তাঁহারাও পর্দ্দায় অর্থাৎ অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা থাকিতেন। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ছত্র ব্যবহারে অধীকারিণী ছিলেন না। প্রখর রবির উত্তাপ সহিতে না পারিলে জুতাই ছত্ররূপে ব্যবহার করিতেন!! গাড়ীর ভিতর বসিলেও তাহাতে পর্দ্দা থাকিত। অন্যের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পাইতেন না। কিন্তু আজি কালি পার্সী লেডীগণ পর্দ্দা ছাড়িয়াছেন; খোলাগাড়ীতে বেড়াইয়া থাকেন; অন্যান্য পুরুষের সহিত আলাপ করেন। নিজেরা ব্যবসায় (দোকানদারী) করেন। প্রথমে যখন কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাদের স্ত্রীকে

(পর্দ্দার) বাহির করিয়াছিলেন, তখন চারি দিকে ভীষণ কলরব উঠিয়াছিল। ধবলকেশ বুদ্ধিমানেরা বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর ধ্বংসকাল উপস্থিত হইল !"

কই, পৃথিবীরত ধ্বংস হয় নাই। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও— সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের Equality বুঝিতে হইবে।

২৮ এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কি করিলে আমরা পুরুষের সমকক্ষা হইতে পারি? প্রথমতঃ পুরুষের সমতুল্যা হইতে ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সঙ্কল্প আবশ্যক, সুশিক্ষা বিস্তার করা আবশ্যক, এবং আমরা যে "গোলাম নই" এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। তাহা হইলে ক্রমে দুর্গম পথ সুগম হইবে।

২৯ পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই কবির, যদি স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাই করিব— আমরা লেডীকেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীমাজিষ্ট্রেট, লেডীব্যারিষ্টার, লেডীজজ— সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী viceroy দেখিয়া পুরুষের চক্ষে ধাঁ ধাঁ লাগিবে। উপার্জ্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা (কলুর বলদের মত !) "স্বামীর" গৃহকার্য্যে ব্যয় করি,— (যাহার কোন মূল্য নাই, বেতন নাই) সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?

৩০ আমরা যদি রাজকীয় কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্ল্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও— নিজের অন্ন বস্ত্র উপার্জ্জন করুক। হিন্দু কন্যার বিবাহ না হইলে জাতি যায়, একথাও পুরুষের কথিত। আবার পক্ষপাতিতা দেখ, কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশি, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ করিলে মাসে ২্ বেতন পায়, ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোকে ১্ পায়। চাকরের খোরাকী মাসিক ৩্ আর চাকরাণীর খোরাকি ২্।

যদি বল, আমরা দুর্ব্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজা হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিব। এখন একবার জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া দেখি তো এ dull head সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।

৩১ বাস্তবিক আমাদের দুঃখের কথা বলিলে ফুরায় না। এত বড় সংসারে আমরা নিরাশ্রয়া। এই পৃথিবী ঈশ্বরের, ইহাতে বাস করিবার অধিকার সকল প্রাণীরই সমান। বুদ্ধিমান মানব ধরাখানা আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। উনি কাবুলেশ্বর— তিনি সে দেশের স্বামী— যেন ধরিত্রী তাঁহাদের বাবার সম্পত্তি ! কিন্তু মানুষে ভূগোলখানা ভাগ করিয়া লইয়াছেন বলিয়া ইহার অন্যান্য অধিবাসিগণ (বন্য পশুপক্ষী) আপন আপন স্বত্ব ত্যাগ করে নাই। পশুরাজ সিংহ হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত সকলেই ইহাতে বাস করিতেছে। পৃথিবীর উপর দাবী ছাড়িয়াছি কেবল আমরা ! আমাদেরই "আপন" বলিতে একটি পর্ণকুটীর নাই। "আমাদের বাড়ী" বলিলে পিত্রালয়, স্বামিগৃহ বা পুত্রের ভবন বুঝায়। পিতৃভবন কিংবা

স্বামিগৃহ ত্যাগ করিলে এ বিশাল ধরণীতে আমাদের দাঁড়াইবার একটু স্থান থাকে না। পিতা কুপুত্রকে তাড়াইয়া দিলে, পুত্র কোন প্রকারে নিজের জন্য সংসারে স্থান করিয়া লয়, কিন্তু কন্যা অভিভাবক কর্ত্তৃক গৃহবহিস্কৃতা হইলে সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিবসেও দশদিক্ অন্ধকার দেখে। ভাবে, "বসুধা বিদীর্ণ হউক, তাহাতে প্রবেশ করি।" কেন? বসুমতীর পৃষ্ঠের উপর কি স্থান নাই? এই রূপে পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াও যে বাঁচিয়া আছি, ইহাই আশ্চর্য্য।

৩২ পুরুষদিগকেও বলি,—ভ্রাতৃগণ! আমরা স্বাধীন না হইলে তোমরাও স্বাধীন হইবে না। নিশ্চয় জানিও, আমরা যত দিন নরাধীনা থাকিব তোমরাও তত দিন পরাধীন থাকিবে। তোমরা আমাদের উপর প্রভুত্ব কর বলিয়া তোমাদের উপর আর এক জাতি আধিপত্য করিতেছে। কারণ ঈশ্বর ন্যায়বিচারক। তোমরা যে ঈশ্বরের দোহাই দিয়া ধর্ম্মগ্রন্থে রমণী শাসনের ব্যবস্থা লিখিয়াছ, সেই ঈশ্বর ঈদৃশ পক্ষপাতী নহেন যে, আমাদের উপর তোমাদের প্রভুত্ব সহিবেন। যাহা আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে সহিতেছি, তাহা তিনি সহেন নাই! তাঁহার করুণা সকলের প্রতি সমান। তোমরা তাঁহার নাম লইয়া জগতে অত্যাচার করিতেছ; আমরা তাঁহার নামে জগতে প্রেম বিতরণ করিতেছি। তোমরা তপস্যা বলে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছ সত্য, কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁহাকে অপ্রসন্ন করিতে পার নাই। তোমরা যে ঈশ্বরের সম্পত্তি, আমরাও সেই পরমেশ্বরের সম্পত্তি। অতএব বৃথা অহঙ্কার ত্যাগ কর; আমাদের স্বত্ব আমাদিগকে ফিরাইয়া দাও। আমরা তোমাদের নিকট জায়গীর কিম্বা লা-খেরাজ (নিষ্কর) ভূমি চাহি না। কেবল তোমাদের equal হইতে চাই। যদি বল, তোমরা নারী জাতিকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাক—যথা সীতাপ্রমুখ দেবীদের পূজা কর, পয়গম্বর তনয়া হজরতা ফাতেমাকে অসামান্যা নারী জ্ঞানে ভক্তি কর, এবং পয়গম্বর ঈসার মাতা মরিয়মকেও আদর কর; কিন্তু তাহাতে আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না, কারণ তোমরা যে, "পুরুষ" একথাটী তোমরা ভুলিয়া যাও না। ঐ "পুরুষ" শব্দেই অহঙ্কার ঝরে! গৌরাঙ্গ যে ভাবে "নেটীভ" ভদ্র লোকের সম্মান করেন, তোমরাও সেইভাবে আমাদের সম্মান করিয়া থাক!! আমরা কি এতই বোকা যে তোমাদের tone বুঝি না? তোমরা পদে পদে আমাদের নরকের ভয় প্রদর্শন কর, সেই অনুকরণে আমরাও বালকদিগকে জুজুর ভয় দেখাইয়া ভীরু কাপুরুষ করিয়া তুলিতেছি! তাই তোমরা পরাধীনতার বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে পারিতেছ না। বেশ! যেমন কর্ম্ম তেমন ফল!

৩৩ আমাদিগকে নখদন্ত ভাঙ্গা পোষা বাঘটির মত জীবিত না রাখিয়া যদি নরগণ প্রাণদণ্ডের সাহায্যে সেই (কল্পিত) নরকে প্রেরণ করেন, তাও সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি! তাহা হইলে এ enslaved প্রাণের বোঝা বহন করিতে হইবে না। আশা করি, ধর্ম্ম গ্রন্থসমূহে বিধান আছে যে, "পুরুষের বশ্যতা স্বীকার না করিলে নারীকে দণ্ড ভোগের নিমিত্ত নরকে প্রেরণ কর।"

ভরসা করি, আমার সুযোগ্যা বিদূষী ভগ্নীগণ এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন, আন্দোলনের ভূমিকম্পে দাসত্বের সুকঠিন দুর্গ ভূমিসাৎ করিবেন। আন্দোলন না করিলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

ইতি।
(MRS.) R. S. Hossein

ভূমিকা

গ্রন্থকার মহোদয় আমার ন্যায় লোককে "নারী-তীর্থের" ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কোন নরবর ইহার ভূমিকা লিখিলেই সুশোভন হইত। কারণ "নারী-তীর্থ" আমাদের ভাল লাগিবে, ইহা ত স্বাভাবিক ; সুতরাং অপর একজন পুরুষে কি বলে, তাহাই শুনিবার মত হইত।

নারীর ব্যথা এই পুস্তকে যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন আর কোন পুরুষের লেখায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সমস্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া মনে হয় লেখক একজন আদর্শ মুসলমান। তিনি মাতৃজাতিকে ঠিক বুঝিয়াছেন—

"তুমি আপনি তপ্ত আতসে পুড়িয়া স্বশীতল ছায়া ঢালে। তুমি মোমের প্রদীপ আপনি জ্বলিয়া অন্দর কর আলো॥" তাই তিনি ভক্তিভরে মাতৃ প্রাণে নমস্কার করিতে পারিয়াছেন।

১৮টী কবিতা লইয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। আমার মুস্কিল হইয়াছে এই যে, কোনটী ছাড়িয়া কোন কবিতার উল্লেখ করিব? "বাল-বিধবা" "অভিশাপ" ও "অবিচার" পাঠ করিয়া সমাজের বিবিধ ক্ষত অঙ্গের কথা মনে পড়িল। "অভিশাপ" কবিতাটা আমারই শৈশবকালীন লাঞ্ছনার কথা মনে করাইয়া দিল ; তবে ঘরের বাহির হইয়া পাঠশালা গমনের সৌভাগ্য এ জীবনে কখনও হয় নাই। "মেয়ে-মানুষ শিখছে সে কি আংরেজী আর বাংলা 'জবান'?" এরূপ কথার বিরুদ্ধে কিছু বলার জন্য "পিকভরা পাকা দাড়ী"ওয়ালা পীর সাহেবেরা লেখককে কাফেরের ফতোয়া দিয়া সশরীরে 'হাবিয়া'য় পাঠাইবার যোগাড় করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, ইসলামের জয় অনিবার্য্য।

আমি ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে সব কথা বলার জন্য (অর্থাৎ "মতিচূর" লেখার জন্য), মুসলিম-বিদ্বেষী (কিন্তু মুসলিম নামে পরিচিত) পুরুষদের নিকট হইতে জঘন্য গালাগালি লাভ করিয়াছি, এখন সেই কথা স্বয়ং পুরুষেরা অম্লান বদনে বলিতেছেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া আমি অনেকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। এখন পুরুষজাতিই মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছেন,

"—নারীরে শৃঙ্খলি,
জাতির মৃত্যুর পথ খুঁড়িছ কেবলি"

সুতরাং আমাকে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না, যেহেতু এখন আমার মতের অনুসরণকারী নরবরেরাই আমার বক্তব্য শতকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন।

"নারী-তীর্থ" ঘরে ঘরে নর নারী উভয়ের জন্য কল্যাণ বিতরণ করিবে। আমি গ্রন্থকারকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আল্লাহ্ তাঁহার লেখনী সফল করুন, ইহা প্রার্থনা।

আর, এস, হোসেন,
"পদ্মরাগ" রচয়িত্রী—

'মতিচূর'-এর
বিভাগীয় গ্রন্থ সমালোচনা (অস্বাক্ষরিত)

বাইবেলে আছে, দূর হইতে একজন লোককে কিম্ভুতকিমাকার বলিয়া বোধ হইয়াছিল, যখন সে কিছু নিকটে আসিল তখন দেখা গেল যে সে মানুষ, পরিশেষে সে দর্শকের সম্মুখে আসিয়া পড়িলে দেখা গেল যে সে ব্যক্তি তাহারই ভাই। আমরা 'মতিচূরে'র সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে পারি। মতিচূরের প্রবন্ধগুলি যখন প্রথমে 'নবনূরে' প্রকাশিত হয়, তখন তাহা পাঠে আমাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ টুটিয়া গিয়াছিল। সে অবস্থায় তাহাতে যে কিছু ভাল আছে আমরা এমন একটি কল্পনাই মনে স্থান দিতে পারি নাই। এই উত্তেজনার ভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পর গ্রন্থখানি পুনরায় পাঠ এবং সেই সময় মতিচূর সম্বন্ধে হৃদয়ে একটু অনুকূল ধারণা জন্মে। তৎপর সংযতভাবে আর একবার বিষয়গুলির আলোচনা করিতে যাইয়া দেখি, লেখিকার সকল কথা না হইলেও অনেক কথাই নিরেট সত্য এবং মতিচূর প্রকৃত মতিচূরই বটে। উপযুক্ত পাকে ফেলিয়াই লেখিকা এবং মতিচূর প্রস্তুত করিয়াছেন ইহার ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই, সকলই মনোজ্ঞ হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং রচনা-ভঙ্গি (style) অতি মনোরম। কোন পুরুষ লেখকের পক্ষেও এইরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা শ্লাঘার বিষয়। লেখিকা তাঁহার বক্তব্য ভাল করিয়াই বলিতে পরিয়াছেন তাঁহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। তাঁহার সকল মতের সহিত আমাদের ঐক্য না থাকিলেও আমরা কর্ত্তব্যানুসারে এইরূপ আলোচনার জন্য তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

মতিচূর-রচয়িত্রীর একটি দোষের কথা এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গ্রন্থ মাদ্রাজের Christian Tract Society-র প্রকাশিত Indian Reform সম্বন্ধে পুস্তিকাসমূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়াই আমাদের ধারণা। খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া আমাদের সম্বন্ধে পাদরী সাহেবগণ যা বলেন বা বলিয়াছেন, লেখিকার নিকট তা অভ্রান্ত সত্য রূপেই পরিগণিত হইয়াছে। তাঁহার মতে আমাদের সবই কু, আর ইউরোপ-আমেরিকার সবই সু। এইরূপ বলিবার পূর্বে তাঁহার ভাবা উচিত ছিল যে এই পর-পদদলিত এসিয়াই ইউরোপের শিক্ষাগুরু, এবং এসিয়ায় যখন ধর্ম ও জ্ঞান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে তাহার বহু পরেও ইউরোপের বর্বরতার অবসান হয় নাই। আজ এসিয়া নিদ্রিত বলিয়া চিরদিনই সে এরূপ নিদ্রিত থাকিবে না। নৈসর্গিক উপায়ে যখন সে জাগরিত হইবে, তখন সে তাহার নিজের ত্রুটি নিজেই দূর করিতে চেষ্টা করিবে এবং তাহার সে চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হইবে।

সমাজ-সংস্কার করা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা। চাবুকের চোটে সমাজ-দেহে ক্ষত হইতে পারে, কিন্তু তদ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি বা অভাব পূরণ হয় না। মতিচূর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন, ইহাতে যে কোন সুফল ফলিবে, আমরা এমত আশা করিতে পারি না। তিনি যদি সংযতভাবে বিদ্বেষহীন ভাষায় নারীজাতির দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিতে পারেন তাহা হইলে সমাজে রক্ষণশীলত্বের বন্ধন আপনাআপনি শিথিল হইয়া আসিবে নতুবা যদৃচ্ছা Right and left চাবকাইয়া তিনি কিছুই করিতে পরিবেন না ইহা নিঃসংশয়ে ও নিরুদ্বেগে বলা যায়।

মতিচূরের 'পিপাসা' ও 'গৃহ' এই দুটি নিবন্ধই আমাদের সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে অর্থ এই যে আমরা ইহা পড়িয়া হৃদয়ে কিছু সত্য, কিছু ধ্রুব বিষয়ের ধারণা করিতে পারিয়াছি। 'গৃহে' যে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে মিথ্যার বার্ণিশ বিন্দু পরিমাণও নাই। আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যেসব দৃশ্য অভিনীত হইতে দেখিতেছি, লেখিকা এক্ষেত্রে তাহারই জীবন্ত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। 'সুগৃহিনী' সম্বন্ধে আমাদের যৎকিঞ্চিৎ কর্তব্য আছে। আমরা 'সুগৃহিনী' চাই সত্য, কিন্তু আমরা এমন গৃহিণী চাই না যাঁহারা কেবল সারাদিন Horticulture, Chemistry বা Physics নিয়া ব্যস্ত থাকিবেন। তাহা হইলে আমাদের ন্যায় মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকদিগকে উপবাস করিয়াই থাকিতে হইবে। গৃহিণীদের যে বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান থাকিলে কোন আপত্তির কারণ নাই, কিন্তু তাঁহারা সকলেই যদি বিজ্ঞানের গভীর গবেষণায় মনোনিবেশ করেন তবে আমাদের গৃহ নিশ্চয়ই শ্মশান হইবে এবং আমরা 'গৃহহীন' হইব। আর পাকশালে গিয়া কেহ যে theory of Heat-এর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভাল পাক করিতে পারিবেন এমত ভরসাও আমরা করি না। সেরূপ অবস্থায় তাঁহারা চালে-ডালে এক না করিলেই রক্ষা। এই সমুদয় লিখিবার কালে লেখিকার ভাবা উচিত ছিল যে, তাঁহার পক্ষে যাহা সম্ভব আমাদের দেশের নারীজাতির সকলের পক্ষেই তাহা সম্ভবপর নহে। সুযোগ ও সুবিধা সকলের সমান থাকে না। 'অর্দ্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের উপসংহার ভাগের সহিত আমাদের দ্বন্দ্ব করিবার কোন কারণে নাই। আমাদের অর্দ্ধাঙ্গীরা যদি 'স্বামী'র পরিবর্তে 'অর্দ্ধাঙ্গ' শব্দ ব্যবহার করিলে তুষ্ট হন, তবে আমরা আবহমানকাল প্রচলিত জীর্ণ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া নূতন উপাধি গ্রহণের জন্য আহ্লাদের সহিত প্রস্তুত আছি। লেখিকা যদি সমগ্র নারী সমাজের মত গ্রহণ করিয়া এ বিষয়ের একটি সুমীমাংসা করিতে পারেন আমরা (স্বামীবর্গ) তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। 'আমাদের অবনতি' সম্বন্ধে আমাদের নূতন কিছু বলিবার নাই। পূর্বে দু একজন এ বিষয়ে সোরগোল করিতে গিয়া এখনও খোঁচা খাইতেছেন দেখিয়া আমরা পূর্বাহ্নেই সাবধান হইয়াছি।

[নবনূর, ভাদ্র ১৩২২-তে প্রকাশিত ; সূচীপত্রে গ্রন্থসমালোচকের নাম আছে সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী ও মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ !]

মতিচূর (১ম খণ্ড)

পুস্তক পরিচয়

আবুল হুসেন

আমাদের দুর্গতির আরম্ভ যে কোথায়, তাহাই লেখিকা তাঁহার প্রাঞ্জল, সুরুচিসদ্ভাবপূর্ণ, দৃষ্টান্ত-বহুল সরল অকপট মাধুর্যময় রচনা দ্বারা দেখাইতে যাইয়া স্বকীয় বেদনার অনুভূতিকে প্রতি ছত্রে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। লেখিকা বঙ্গীয় মোসলেম নারী-সমাজের আদর্শ। তাঁহার অবরুদ্ধা অবলা ভগিনীগণের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান, শিক্ষা, নীতি, কর্ম ও স্বাধীনতায় প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তিনি এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। পুরুষের নিদারুণ

স্বার্থপরতা, শাসন–নীতি ও কঠোর পশুশক্তির ফলে নারীকে যে কিরূপ জঘন্য জীবন–যাপন করিতে হইতেছে, আর তাহাতে যে সমাজ ও দেশের কত অকল্যাণ ও অনর্থ ঘটিতেছে, তাহাই অতি সংযত ভাষা ও কোমল শ্রদ্ধার সহিত লেখিকা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পুরুষ প্রকৃত সৌভাগ্য–সম্পদ সুখ চাহিলে, তাহার মন–মস্তিষ্ক ও জ্ঞানকে মঙ্গলের পথে চালিত করিতে হইলে, নারীকেও সমভাবে জ্ঞান শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অর্জন করিতে হইবে। লেখিকা নারী–সুলভ সঙ্কোচের সহিত পুরুষের দোষ দেখাইয়াছেন।

পুস্তকে তিনি পুরুষের বিরুদ্ধে এমন কিছু বলেন নাই, যাহাতে পুরুষেরা আপত্তি করিতে পারে। আমার মনে হয়, পুরুষের অপরাধের তুলনায় তাহাদিগকে তদপেক্ষা আরও অধিক কষাঘাত করা উচিত ছিল। কিন্তু লেখিকার মাহাত্ম্য ঐ স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে বেশী ; তিনি ভগিনীগণের ত্রুটিই বেশি করিয়া দেখাইয়াছেন,–পুরুষকে কেবল অঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন মাত্র।

আজ ভারতের নারী–সমাজ এত অবনতির অতল তলে পড়িয়া গিয়াছে কেন? তাহার একমাত্র কারণ পুরুষ ; পুরুষ নিজের সুখ–স্বার্থের যোল আনা পুরা মাত্রায় আদায় করিয়া লইয়া, নারীর ঘর শূন্য করিয়া দিয়াছে। ইহা পশুশক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন। নারীকে অজ্ঞ, মূর্খ ও প্রিয়বস্তুটি করিতে পুরুষ কে কি বিষম ফল লাভ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা আজও তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

নারী মাতৃরূপিণী। এক জননী একশত শিক্ষকের অপেক্ষা অনেক বড়। জননী গৃহের সর্বময় কর্ত্রী। তিনি গৃহের রাণী। আর গৃহই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম শিক্ষাক্ষেত্র। এই গৃহে শিশু যে আদর্শ–শিক্ষা, সংস্কার, ধারণা ও কল্পনা প্রাপ্ত হয়, তাহা যাবজ্জীবন তাহার চরিত্র, মন ও কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। ইহাতে আর দ্বিমত হইতে পারে না। এমত অবস্থায় গৃহ–জননী জ্ঞানেগুণে বিভূষিতা না হইলে শিশু তথা ভবিষ্যৎ মানুষকে কে গঠন করিবে? উত্তম স্বাস্থ্য, শরীর ও মন প্রাপ্ত হইতে হইলে সু–নারী অবশ্যক। এই সরল কথাটি যে আজও কেহ বুঝিতে চাহিতেছেন না কেন, মাননীয়া মিসেস্ হোসেন সেই চিন্তায় আকুল হইয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তিনি নারীর সুখ–স্বার্থ ফিরাইতে চাহিয়া যে পুরুষের উন্নতির পথ কত উন্মুক্ত করিতে যাইতেছেন, সেজন্য তাঁহার নিকট ভবিষ্যতে পুরুষ–সমাজ, বিশেষতঃ বঙ্গীয় মোসলেম পুরুষ সমাজ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে। পুস্তকখানি নারীকে তাহার ক্ষতস্থান চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে, তাহার আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিবে, শৃঙ্খল ও জ্ঞানের মর্যাদা বুঝাইয়া দিবে, স্বামীকে প্রভু বলিতে ভুলাইবে, স্বাধীনতা দ্বারা দাম্পত্য জীবনের মাধুরী ও আনন্দ যে কত গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা অজ্ঞ নারীকে বুঝাইয়া দিবে ; এবং অষ্টম বর্ষ বয়স হইতে নারী যে সংস্কার–জ্ঞান পুতুল–ঘরের মধ্য হইতে বহন করিয়া আনে–স্বামীকে দেবতা–জ্ঞানে অন্ধ পূজার উপহার দিতে শিখে, তাহা ভূলাইয়া দিয়া, মার্জিত জ্ঞান–বুদ্ধি–বিবেক ও আত্মার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্নেহ–মমতা, ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা শিখাইয়া দিবে। মিসেস্ হোসেন 'সুগৃহিনী', 'গৃহ', 'অর্ধাঙ্গী' ও 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে নারীর সুজ্ঞান কিরূপে জন্মিতে পারে, তাহা দেখাইতে গিয়া চমৎকার সফলতা লাভ করিয়াছেন।

অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'বোরকা' ও 'নিরীহ বাঙালী' পড়িতে বেশ আমোদ পাওয়া যায়। 'বোরকা'র নূতন অর্থ বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়া, লেখিকা আমাদের অনেক

কৌতূহলের তুষ্টিসাধন করিয়াছেন। হয়ত আমি তাঁহার সকল কথায় সায় দিতে পারি না ; তবে তাঁহার নূতন অর্থ বেশ লাগিয়াছে. 'পিপাসা' প্রবন্ধে ব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণু চরাচর জীবাণু-জীবের মধ্যে খোদাপ্রাপ্তির পিপাসা বিদ্যমান দেখিতে পাইয়া লেখিকা অসীমের জন্য স্বীয় তৃষ্ণার পরিচয় দিয়াছেন। সে অত্যন্ত আধ্যাত্মিক কথা।

আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

[বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক ১৩২৮]

অলঙ্কার না Badge of Slavery এবং অর্দ্ধাঙ্গী

[সম্পাদকীয়]

গিরিশচন্দ্র সেন

প্রবন্ধ রচয়িত্রীর প্রতি আমাদের আন্তরিক সম্মান ও শ্রদ্ধা আছে। তিনি মোসলমান সম্ভ্রান্ত লোকের পত্নী।... তিনি বেশ বুদ্ধিমতী। চিন্তাশীল মনস্বিনী কন্যা। বঙ্গীয় মোসলমান কুলে অসামান্যা নারী বলিয়া আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা, আদর ও সম্মান করি। মোসলমান পরিবারের বধূদিগকে ও কন্যাদিগকে নানা কারণে পুরুষগণ কর্তৃক অনেক প্রকার নিপীড়ন ও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তিনি ব্যথিত হৃদয়ে সেই ভগিনীদের কল্যাণোদ্দেশ্যে উপরিউক্ত প্রবন্ধ ও 'অর্দ্ধাঙ্গী' প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এজন্য পুরুষদিগের প্রতি তাঁহার আক্রমণ কিছু সীমা অতিক্রম করিয়াছে, স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়েও তাঁহার কিছু ভ্রান্ত মত প্রকাশ পাইয়াছে।

সকল পুরুষ সমান নহে। সকলেই স্ত্রী জাতির প্রতি অত্যাচারী বলিয়া অনুযোগভাজন ও নিন্দার্হ হইতে পারেন না। অবরোধমুক্ত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারিলেই নারীগণ স্বাধীন হন না ; তাহাতে অনেক স্থলে যথেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি ও বিপদ বিড়ম্বনার সম্ভাবনা। ইউরোপীয় মহিলাগণ রাজজাতীয় কন্যা বলিয়া সকলে তাঁহাদিগকে ভয় ও সম্মান করে। তাঁহারা যথা তথা নিঃশঙ্কভাবে বিচরণ করিতে পারেন। তাঁহাদিগকে কেহ অপমান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সমুচিৎ শাসন হয়। বঙ্গললনাগণের অবস্থা সেরূপ নিরাপদ নহে।

'অলঙ্কার' প্রবন্ধের রচয়িত্রী স্ত্রীর নাকে দড়ির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তদ্বিপরীত আমরা দেখিয়াছি যে, মূর্খ পত্নীও নাকে দড়ি লাগাইয়া সুবক্তা ও সুবিদ্বান পতিকেও পশুর ন্যায় অপনার ইচ্ছানুসারে টানিয়া লইয়া যায়, তাহার ধর্ম, কর্ম, গুরুত্ব ও মনুষ্যত্বের বিলোপ সাধন করে।

দম্পতির পরস্পর অধীনতা ও বাধ্যতা সুখ শান্তির কারণ। স্বামী স্ত্রী পশুভাব অন্তরে পোষণ করিয়া কখনও পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে পারে না ; উভয়ে উভয়ের দেবত্ব দর্শন করিলে স্বভাবতঃ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঞ্চার হয়।

[সম্পাদকীয়, মহিলা, ভাদ্র ১৩১০]

মতিচূর (২য় খণ্ড)

[পুস্তক পরিচয়]

আনসারী

বইখানি কাব্য কি উপন্যাস কি ডিটেক্‌টিভ গল্প, নাম শুনিয়া তাহা অনুমান করিবার কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু বইখানি যে 'খাস' করিয়া ইহার একটীও নহে, তাহা বুঝিবার জন্য পাঠককে সূচীর দিকে একবার দৃষ্টি করিতেই হইবে। ইহাতে নানা ধা'তের দশটী প্রবন্ধ বা নিবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি প্রবন্ধও যে না আছে এমন নহে, গ্রন্থকর্ত্রী মিসিস্ আর. এস. হোসেন বাঙ্গলা সাহিত্যে সুপরিচিতা। তাঁহার একনিষ্ঠ সাধন ও চিন্তাশীলতা এ পুস্তকখানির প্রতি ছত্রকে গৌরব দান করিয়াছে। পুস্তকখানি, পড়িলেই বুঝা যায়, গ্রন্থকর্ত্রী আত্মযশ-লিপ্সায় প্রণোদিত হইয়া লেখনী ধারণ করেন নাই ; পক্ষান্তরে ভূয়োদর্শনের ফলে তাঁহার হৃদয়ে যে বেদনার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে তাহাকেই তিনি নানা কথায় নানা ছলে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে গ্রন্থকর্ত্রী হাস্যরসাদির অবতারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু চিন্তায় স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য তাঁহার অধিকাংশ চেষ্টাকেই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। যেখানে অনুভূতির গভীরতা বেশী ও চিন্তা-প্রবাহের বিপুলতা সমধিক সেখানে লঘুভাব ভাল খেলিতে পারে না, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। পক্ষান্তরে যেখানে গ্রন্থকর্ত্রী কোনও ব্যথার সুর বাজাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেখানই তাঁহার হাত খেলিয়াছে ভাল। গ্রন্থোক্ত "নার্স নেলী" বা "ডেলিশিয়ার হত্যা" কাহিনী ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

দশটী রচনার মধ্যে "নূর-ইসলাম" ও "ডেলিশিয়ার হত্যা" ইংরাজী হইতে অনূদিত। "সুলতানার স্বপ্ন" ও ইংরাজীর অনুবাদ, কিন্তু সে ইংরাজীর লেখিকাও গ্রন্থকর্ত্রী নিজেই। এগুলির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে বিষয় নির্বাচন ও রচনা ভঙ্গীতে লেখিকার যথেষ্ট বাহাদুরী আছে। সুলতানার স্বপ্নে গ্রন্থকর্ত্রী একটী কৌতুকাবহ অভিনব চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা আবহমানকাল স্ত্রীলোককে পুরুষের মুখাপেক্ষীভাবে দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রী কল্পনা-প্রভাবে নারীকে পুরুষের আওতা হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহাদের পক্ষেও রাজকার্য্য নির্ব্বাহ বা সমাজ-পরিচালনা অসম্ভব ব্যাপার নহে। সেই সঙ্গে গ্রন্থকর্ত্রী আরও দেখাইয়াছেন পুরুষ তাহার পশুবলের অহঙ্কারে সমাজের কতখানি অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী নারীর প্রতি পুরুষের অবিচার দেখাইবার জন্য আরও নানা স্থানে এই সুরের অবতারণা করিয়াছেন। "জ্ঞানফল" ও "মুক্তিফল' দুইটী রূপ-কথা। রূপ-কথা রচনায় নারীজাতি যে সিদ্ধহস্ত একথা আদমের যুগ হইতে প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থেও গ্রহকর্ত্রী ওয়ারিস ক্রমে সে হাত-যশ হইতে বঞ্চিত হন নাই। ইহাতে সাময়িক ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ের প্রতিবিম্ব আছে। উভয় প্রবন্ধেরই মুখ্য উদ্দেশ্য নারীজাতিকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সমাজের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহাই পাঠক-পাঠিকাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া। গৌণ উদ্দেশ্য নারী পুরুষ উভয়কে দেশের কল্যাণের জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করা। "নারী সৃষ্টি" ও "সৃষ্টি-তত্ত্ব" (ওরফে পুরুষ সৃষ্টি) পৌরাণিক কথার রূপান্তর।

প্রথমটী একান্ত উপভোগ্য : দ্বিতীয়টী কষ্টকল্পিত,—বোধ হয় অনুরোধে রচিত। "সৌরজগৎ" গল্পটীতে গ্রন্থকর্ত্রীর বক্তৃতা-লিপ্সা গল্পাংশের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে— গল্পোল্লিখিত ব্যক্তিগণের কথোপকথনের ভাষা ও ভঙ্গী না সুষ্ঠু বাঙ্গলা না কথা আলাপ হইয়াছে। গল্পের ভিতর লেখিকা যে উদ্দেশ্যটী নিহিত রাখিয়াছেন তাহা নিহিত না থাকিয়া দৈত্যের মত উদ্ধত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু "ডেলিশিয়ার হত্যা" ও "নার্স নেলী"তে লেখিকার শক্তি আপন স্বাভাবিক গতি পাইয়া অতি মনোহর মূর্ত্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। নারী না হইলে বোধ হয় নারীর কথা এমন সুন্দর করিয়া বলা যায় না। একটী পুরুষ কর্ত্তৃক নারীর নির্য্যাতিত হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী চিত্র ; আর একটীতে নারীকে অজ্ঞতার অন্ধকারে অন্ধ করিয়া রাখার যে কি অবিমৃষ্যকারিতা তাহাই অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে। প্রথমটির মূল রচয়িতা একজন ইংরাজ মহিলা, দ্বিতীয়টা সম্পূর্ণই মিসিস্ হোসেনের চিত্রশিল্প। শিল্প-হিসাবে এই চিত্রটীর স্থান তেমন উর্দ্ধে না হইলেও ভাবের দিক দিয়া ইহা ফুটিয়াছে সুন্দর। স্থানে স্থানে একটু কান্নার আধিক্য লক্ষিত হইবে, কেন না রমণীদের ভাবপ্রকাশের পক্ষে কান্না একটি অতি সহজ পন্থা ; এ পন্থা পাইলে ভাব-প্রকাশের জন্য আর অন্য পন্থার তেমন প্রয়োজন তাঁহারা বোধ করেন না। এই ব্যথার ছবিখানির পশ্চাতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে একটী খাঁটী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ "শিশুপালন"— প্রত্যেক রমণীর এই প্রবন্ধটি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

মোটের উপর গ্রন্থের ভাষা অতি সুন্দর ও সরস। রচনার বিশুদ্ধিতা প্রত্যেক সুধী পাঠককে প্রীতিদান করিবে। স্থানে স্থানে উহা বালক-বালিকাদের সম্মুখে আদর্শরূপে ধরিবার যোগ্য হইয়াছে। তবে মুদ্রাকরের হস্তস্পর্শ—দুই এক জায়গায় শনির দৃষ্টির মত শব্দের গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে। সে সকল স্থানে পাঠোদ্ধার একটু দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, মুসলমান নারীসমাজ এ গ্রন্থের জন্য যে আপনাদিগকে গৌরবান্বিতা বোধ করিবেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

[মোসলেম ভারত, অগ্রহায়ণ ১৩২৮]

অলঙ্কার না Badge of Slavery
(জনৈক পাঠিকার লেখা)

তিনি যেরূপভাবে যথেচ্ছাচারিণী রমণী মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন ও পুরুষ জাতিকে আক্রমণ করিয়াছেন তাহা একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় রমণীয় পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়াছে।

আমি পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য গৃহে। স্বামী সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কি করিয়া কোর্টে Plead করিব, তাহা না ভাবিয়া কি করিয়া সন্তানগণকে প্রকৃত মানুষ করিব, কি করিয়া স্বামীর সহধর্ম্মিণী, আরাম দায়িনী গৃহলক্ষ্মী হইব, তাহার চিন্তা করা উচিত।

[মহিলা, ভাদ্র ১৩১০-এ প্রকাশিত সমালোচনা-প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত]

দুটি কথা

ফাতেমা

ভগিনী হোসেন 'নবনূরে'র একজন উল্লেখযোগ্য লেখিকা। অনেক দিন হইতেই তাঁহার প্রবন্ধগুলি মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছি। তাঁহার আন্তরিক উদ্দেশ্য মহৎ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তদীয় লেখনী প্রসূত প্রবন্ধগুলি পাঠে তাঁহার নিরপেক্ষতা ও উদ্দেশ্যের প্রতি ঘোর সন্দেহের হয়। বোধ হয় যেন তিনি 'ভ্রতৃনির্যাতন' মূলমন্ত্র লইয়াই লেখিকার আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

[কোহিনূর, ভাদ্র ১৩১২-তে প্রকাশিত সমালোচনা-প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত।]

অবনতি প্রসঙ্গে

এস. এ. আল মুসাভী

ভগ্নী মিসেস আর. এস. হোসেন নবনূরের একজন সুযোগ্য লেখিকা। লেখিকাকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে হয়। নারী কখনও সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সমতুল্য হইতে পারে না—তাহা হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।

[নবনূর, আশ্বিন ১৩১১-তে প্রকাশিত সমালোচনা-প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত।]

একেই কি বলে অবনতি

নওশের আলি খান ইউসফজী

মিসেস্ আর. এস. হোসেন সাহেবার লিখিত 'আমাদের অবনতি' পড়িয়া সুখী হইলাম, কিন্তু সকল বিষয়ে একমত হইতে পারিলাম না।...

অলঙ্কারগুলি যেন ছিঁড়িয়া ফেলিবেন, কিন্তু (মেয়েলী) পোষাকগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বিবসনা না সাজিলে কি প্রকৃত উন্নত হইতে পারিবেন না?....

স্বর্গোদ্যানে আপনারাই আমাদের পতনের পথ প্রদর্শক ছিলেন, ট্রয়-সমরের আপনারাই নায়িকা ছিলেন, লঙ্কাকাণ্ড আপনাদেরই পদানুসারে ঘটিয়াছিল, কারবালার সে ভীষণ কাণ্ডেও আপনারই অভিনেত্রী ছিলেন। তাই ভয়, হয় আপনারার আবার জাগিলে না জানি কি কাণ্ড সংঘটিত হয়। আপনারা স্বাধীন হউন ভাল কথা, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহার না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

[নবনূর, কার্তিক ১৩১১-তে প্রকাশিত সমালোচনা-প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত।]

পদ্মরাগ

[গ্রন্থ সমালোচনা]

শাহাদাৎ হোসেন

'পদ্মরাগ' একখানি উপন্যাস। তবে আজকাল উপন্যাস বলিতে আমরা সাধারণভাবে যাহা বুঝি, ইহা সে শ্রেণীর উপন্যাস নহে। লেখিকা নিজের ব্যক্তিগত জীবনে যে জিনিসটাকে সবচেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছেন, পদ্মরাগের ভিতর দিয়া তাহাই তিনি সুন্দর করিয়া ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার এ–রচনা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক দিয়া সার্থক হইয়া ফুটে নাই বটে, কিন্তু তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা সুন্দর ও সার্থক বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

এই উপন্যাসের কেন্দ্র 'তারিণী–ভবন' অনাথাশ্রম (অনাথাশ্রম বা বিদ্যাশ্রম যাহাই বলুন)। এবং ইহাকেই অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসের ঘটনা ও নায়ক–নায়িকার চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। তারিণী–ভবনের প্রতিষ্ঠাত্রী, বিধবা ব্রাহ্ম মহিলা দীন–তারিণীর ত্যা সাধনা ও সেবাব্রতের দৃষ্টান্ত মহান ও মহিমময়। গ্রন্থকর্ত্রী, তাঁহাকে 'পরশপাথর' রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সে–ই 'সোনা' হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর তাঁহার 'তারিণী–ভবন' যেন একটা মণিমণ্ডল এবং তিনি নিজেই সেই মণিমণ্ডলের মধ্যমণি। এই মণিমণ্ডলে হিন্দু–মুসলমান–ব্রাহ্মণ–খৃষ্টান সকল জাতির সকল শ্রেণীরই সমান প্রবেশাধিকার।

'তারিণী–ভবন' লেখিকার নিছক কল্পনার সৃষ্টি নহে। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শও এই 'তারিণী–ভবন' এবং সেই জন্যই ইহার আদর্শ, শিক্ষা ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এমন নিখুঁত ও সুন্দর হইতে পারিয়াছে।

গ্রন্থের নায়িকা সিদ্দিকা (পদ্মরাগ) এইখানেই মানুষ হইয়াছিল এবং যে সাম্য ও একপ্রাণতা এখানকার প্রাণ, তাহারই আদর্শে তাহার জীবন গঠিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা সিদ্দিকার মধ্যে যে চরিত্রবল, দৃঢ়তা ও সংযম দেখিতে পাই তাহা এইখানকারই অনাবিল মুক্ত আবহাওয়ার ফল।

সেবা–ই যে নারীর চরম এবং পরম ধর্ম, সিদ্দিকা–চরিত্রে আমরা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই। সিদ্দিকা নারী–যুবতী। সৌন্দর্য, শিক্ষায়, জ্ঞানে আদর্শস্থানীয়া। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিবার পথে–তাহার কোন অন্তরায়ই ছিল না, বরং যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধাই ছিল। নারী–জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য আপনা হইতেই তাহার আয়ত্তের মধ্যে ধরা দিয়াছিল, তাহার জাগ্রত নারীত্বের সম্মুখে প্রবল প্রলোভন ধরিয়াছিল, কিন্তু অতি সহজে একান্ত নির্ব্বিকারভাবেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া মানুষের সেবাতেই সে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। এই যে ত্যাগ, এই যে বিসর্জ্জন ইহা একমাত্র তারিণী–ভবনেরই শিক্ষা ও সাধনার ফল। লেখিকা বাংলার পাঠক সাধারণের সম্মুখে এই মহৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের ধন্যবাদভাগিনী হইয়াছেন।

এই উপন্যাস-প্লাবিত বাংলায় মনস্তত্ত্বের 'ডাল-খিচুড়ী'র ভূরিভোজনের যুগে গ্রন্থকর্ত্রীর এই ত্যাগ-পবিত্র উজ্জ্বল আদর্শ কয়জনের অন্তরে শ্রদ্ধা উদ্রেক করিবে জানি না, তবে একথা নিশ্চয় যে, একটা সুন্দর মনোজ্ঞ ও মহৎ কিছু মানব-জীবনের আদর্শ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাহাদের নিকট সে-সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। পুস্তকের ছাপা বা বাঁধাই ও মনোজ্ঞ।

[মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৩৭-এ প্রকাশিত।]

মতিচূর (২য় খণ্ড)

[গ্রন্থ আলোচনা]

মতিচূরের গ্রন্থকর্ত্রী বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিতা। ইতিপূর্ব্বে মতিচূর প্রথম খণ্ড ও Sultama's dream প্রকাশ করিয়া তিনি যে যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গ্রন্থখানির দ্বারা তাহা অক্ষুণ্ণ রহিবে বলিয়া আমরা আশা করি। মতিচূর দ্বিতীয় খণ্ড কতকগুলি প্রবন্ধ ও গল্পের সমষ্টি হইলেও তাহাতে ভাবিবার ও বুঝিবার অনেক কিছু আছে। নার্স নেলী, ডেলিশিয়া হত্যা, সুলতানার স্বপ্ন, মুক্তিফল, নারীসৃষ্টি প্রভৃতি কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ চমৎকার হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী যে শুধু গল্পের খাতিরে এগুলি লিখিয়াছেন, তাহা নহে। লেখার আরও একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে। পুস্তকখানি পড়িলেই অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমরা প্রত্যেক সাহিত্যরসিক সুধীকে বইখানি একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

[সৈয়দ নওশের আলী সম্পাদিত সহচর, বৈশাখ ১৩২৯-এ প্রকাশিত এটি নতুন সংগৃহীত হয়েছে।]

পুস্তক পরিচয়

নারীর ব্যথা বেদনার প্রতিচ্ছবি। অন্ধ নারী সমাজকে জাগরণ দিবার বজ্র-বীণা। লেখা অতি সুন্দর, রচনা ভঙ্গি অতি চমৎকার। হতভাগিনীরা তো গহনা, পরনিন্দা আর হাঁসের লেজ লইয়া ব্যস্ত আছে,—তাঁহারা কি এসব পড়িবে? পুরুষেরা, বিশেষ করিয়া যাহারা বাঙ্গালা ভাষাকে দয়া করিয়া মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করেন, দায় করিয়া তাহারা যদি লেখিকাকে কৃতার্থ করিতে অগ্রসর হন!! ব্যারীষ্টারী—ঘুম ভাঙ্গিতে এখনও অনেক দেরী,—কাক, ডাকুক, সূর্য্য উঠুক, সারা আকাশ রৌদ্রকিরণে পুলক-মুখর হইয়া উঠুক, তাহার পর যাদুরা উঠিয়া খাইতে বসিবেন!!

[সহচর, ভাদ্র ১৩২৯]

মতিচূর

(সমালোচনা)

মিসেস এম. রহমান

বল 'মতিচূর'। তুমি জানিলে কেমনে
নারীর প্রাণের জ্বালা? কোন শক্তি বলে
প্রবেশ করেছ তুমি বঙ্গ-ললনার
হৃদয়ের মাঝে, যেথা শুধুই বেদনা,—
দগ্ধক্ষত চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়া
দেখালে জগৎজনে আঁখিজল দিয়ে?
বেদনায় অত্যাচারে রক্ত-রাঙ্গা প্রাণ,
তার কি সান্ত্বনা ওরে শুধুই রোদন?
জাগ্রত হইতে হ'বে সকল নারীর
আপনারে করিবারে সফল সার্থক;
বিদ্রোহের শিখা দিয়ে পুড়াইতে হ'বে
মানুষের অবিচার, সকলের পাপ;
গঠন করিতে হ'বে নূতন ভারত—
মুক্ত হ'য়ে নারী আজি বাঁচাবে জগৎ।

আনিয়াছে 'মতিচূর' বসন্ত-উষায়
নব-জীবনের গান, নূতন আলোক।
অবরোধে নারী হেথা চির-গৃহহীনা,—
দাঁড়াবার নাই ঠাঁই এতটুকু তার।
কুমারীর বলিদান দেখিবে কি, হায়!
এস তবে আজি ওগো এই বাঙ্গালায়;
নির্মম সমাজ-রূপ অত্যাচারীর-হাতে
নারীর এখানে হয় জীবন্ত সমাধি!
শ্মশানের ছবি তুমি, ওগো 'মতিচূর!'
আহত প্রাণের গীত বেদনা-বিধুর।"

[সহচর, আষাঢ়, ১৩২৯]

Sultana's Dream

[গ্রন্থ আলোচনা]

আবুল হুসেন

Sultana's Dream (সুলতানার স্বপ্ন) প্রথম সংস্করণ ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগা আমাদের সমাজ যে, পুস্তকখানি এখনও দ্বিতীয় সংস্করণের মুখ দেখিতে পায় নাই। ইহা ছাড়া দুঃখের বিষয়, এত দিনের মধ্যেও পুস্তকখানি সম্বন্ধে কেহ কোন আলোচনাও করেন নাই। সেদিন ৩৮–পৃষ্ঠায় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া বিস্ময়-রসে যেমন আপ্লুত হইয়াছি, তেমনি লেখিকার উদ্দেশ্যে শত সালাম প্রেরণ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। তাঁহার মতো চিন্তাশীলা নারী প্রকৃতই, নারী জাতি কেন, সমগ্র মানব জাতির গৌরবের পাত্রী।

'Sultana's Dream' পড়িলে ডাক্তার গালিভারের লিলিপুট দেশের ঘটনা মনে পড়ে। Sultana একজন অবরুদ্ধা নারী। গৃহের চতুষ্কোণ হইতেছে তাঁহার বিচরণ ও কর্মক্ষেত্র,—সূর্যের আলোক, চাঁদের কিরণ ও প্রকৃতির মুক্ত নির্মল বায়ু তাঁহার পক্ষে হারাম—তাহা ভোগ করিবার জন্য এতটুকু অধিকার তাঁহার ছিল না। বিশ্বের ঐশ্বর্য্য, ধন-সম্পদ ও সৌভাগ্য তাঁহার পদতলে ছিল; কিন্তু সেগুলিকে একান্ত করিয়া ভোগ করিবার স্থান ছিল ঐ অর্গলবদ্ধ অন্তঃপুর। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন : তিনি তাঁহার ভগিনী সারার মতো এক অপরিচিতা নারীর সঙ্গে অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ফুল-বাগান দেখিতে বাহির হইয়াছেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে আসিয়া কত না সঙ্কোচ ও ত্রস্ত ভীতির পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু উক্ত নারী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সে-স্থানকে তাঁহারা Lady Land বলেন,— সেখানে পুরুষেরা অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে, আর নারীগণ বাহিরে সংসার-কর্ম নির্বাহ করিয়া চলে। সেই অপরিচিতা নারীকে সুলতানা 'ভগিনী সারা' বলিয়া ডাকিতেছেন। 'ভগিনী সারা' সুলতানাকে নারীগণের স্বরচিত স্বাধীন স্বচ্ছ নির্মল পারিজাত-কানন দেখাইতেছেন। সুলতানা প্রথম প্রথম পুরুষের ভয়ে আনন্দের সহিত সে-সমস্ত ভোগ করিতে পারিতেছেন না। পরে 'সারা' নানা প্রকার নিদর্শন দেখাইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন যে, সেখানে বাহিরের রাস্তায় পুরুষের বাহির হইবার অধিকার নাই। সে-দেশ নারীর-পুরুষ নারীর কথায় ওঠে, নারীর কথায় বসে। নারীর রচিত আইন পুরুষকে পরিচালিত করিতেছে। নারীগণের অসাধারণ জ্ঞান-প্রতিভার বিকাশ সেই Lady land -এ কিরূপ জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া সুলতানা নিজের আত্মার মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও আত্মপ্রত্যয় অনুভব করিয়া অতিশয় উৎফুল্ল হইতেছেন। পুরুষগণকে কিরূপে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছেন, কিরূপে 'জেনানা'র পরিবর্তে 'মর্দানা'-র প্রবর্তন সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার ইতিহাস শ্রবণ করিয়া সুলতানা অবাক হইতেছেন।

পুরুষের পশুশক্তিকে দমন করিয়া নারীর আভ্যন্তরীণ ঐশী-শক্তিকে প্রখরতর করিতে পারিলে এই দুনিয়াতে যে স্বর্গ-সুষমা রচনা করা যায়, তাহাই এই স্বপ্নের অর্থ বলিয়া আমার বিশ্বাস। ভগিনী সারার Lady land-এ কোনো কুৎসিত আচরণ ও নীতিবিগর্হিত কর্ম কেহ করিতে পারে না। সেখানে পুলিশ নাই। সে একবারে সত্য ও ভালবাসার রাজ্য। বস্তুতঃ,

নারীজাতি সত্য ও ভালোবাসার সাক্ষাৎ প্রতিমা–স্বরূপ হইতে পারেন, যদি তাঁহাদের মন ও মস্তিষ্কের যাবতীয় শক্তিকে সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদানে স্ফূর্তিলাভ করিতে দেওয়া হয়। তাহা হইলে আমাদের নারীজাতি পুরুষের পার্শ্বে নন্দনকানন ও ঐ Lady land–এর পারিজাতে 'বাগ' প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

'Sultana's Dream'–এর মধ্যে পুরুষকে অবরুদ্ধ করিবার একমাত্র হেতু ; আমাদের নারীজাতির দাসত্ব, অর্থাৎ পুরুষের উপর একান্ত নির্ভরতা। পুরুষ না হইলে আমাদের নারী একেবারে অকর্মণ্য ও অসহায়, মূর্খ ও অজ্ঞ বলিয়া সে পুরুষের উপর তাহার জীবনের মাত্র অস্তিত্বটুকুর জন্য নির্ভরশীল, এ–কথা কেবল পুরুষের দ্বারাই নিখিল বিশ্বে ঘোষিত হইয়াছে, এবং সেই ঘোষণা দ্বারা নারীও তাহার শক্তি আছে—এ-কথা বিশ্বাসই করিতে পারে না। পক্ষান্তরে নারী যে ক্ষমতাসম্পন্ন, সে যে পুরুষের মতো, এমনকি তদপেক্ষা অধিকতর প্রতিভাবতী হইতে পারে—তাহার শক্তিকে জাগ্রত করিলে যে প্রকৃতিকে নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া পুরুষের বিন্দুমাত্র সাহায্য ব্যতিরেকে সে দুনিয়ার বুকে নির্মল সৌন্দর্য, সম্পদ ও কল্যাণের বিরাট ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা ঐ Lady land–এর নারীদের ক্ষমতার দৃষ্টান্ত দ্বারা মিসেস আর. এস. হোসেন অতি অসহায়া বঙ্গীয়া নারী–হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির বীজ বপন করিবার উদ্দেশ্যে বোধ করি এই 'Sultana's Dream' রচনা করিয়াছেন।

পুস্তিকাখানি যেরূপ সুমার্জিত বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় লেখা, সেরূপ ভাষা আয়ত্ত করা আমাদের অনেক ইংরেজি–শিক্ষিত যুবকের পক্ষে কঠিন। আশা করি, 'Sultana's Dream' –এর পাঠকগণ স্ব–স্ব পরিবারের নারীগণকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন।

মিসেস আর. এস. হোসেন এই Sultana's Dream দ্বারা নারীকে তাহার অপরিসীম ক্ষমতায় বিশ্বাস জন্মাইতে পারিয়া, সত্য–সত্যই সমাজের বিপুল কল্যাণের ইঙ্গিত করিতে পারিয়াছেন।

[সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩২৮]

Motichur

[গ্রন্থ আলোচনা]

We have received a copy of the 2nd edition of Mrs. R. S. Hossin's "Motichur" and are glad to note certain changes which have made the view expressed there in acceptable of people of different shades to opinion. The book deals principally with the position of women in our society and the learned authoress impresses upon the necessity of raising the status of her as may enable her to be man's help-mate in life, instead of being a cumbrous burden the weight of which impedes the onward march of man and thus of the entire human race at large. The advanced view of the talented aethoress as

expressed in the book, her study of human and human weakness, her knowledge of men and things manifested there in extort admiration of her. Her courage of education is remarkable! In reviewing her book we have been rather unconsciously reviewing herself, but we think we are doing nothing wrong. The book is written in chaste Bengali and the article on 'Sugrihini' or good housewife ought to be read not only by literate women but also by those men who have not bestowed any serious thought on the duties of women. From her delineation of ideal sister, ideal wife and ideal mother, it seems the authoress herself is the embodiment of the ideal. She has said much about the existing Purdah system, but it would be a sheer mistake if there by any presumption in any body's mind that she wants to do away with the system altogether. Her ideas about nation and nationality as expressed in the book have not been approached even by a minute fraction of the male members of the community and we congratulate the learned authors on her happy production.

[**The Mussalman**, December 4, 1908]

Sultana's Dream

গ্রন্থ সমালোচনা

This is a booklet written in English by Mrs. R.S. Hossain,. Sultana, an imaginary character, is attributed a marvellous dream in which she was transported to an imaginary land ruled by a female sovereign, where peace and happiness reign supreme. The male members in that imaginary land discharge the functions of women in the real world, and the women do those of men. The conception is a very ingenuous hit at the Purdah system prevailing in the Mohamedan world. We have found a genuine pleasure in the perusal of the booklet. It seems to us that Mrs. R. S. Hossain the able authoress is a lady of whom any nation may be proud.

[**The Mussalman**, December 4, 1908.]

প্রথম সংস্করণের

উৎসর্গ পত্র।

বালিকা বিদ্যালয় বা স্কুল কলেজ গৃহের অভ্যন্তরে আমি কখনও প্রবেশ করি নাই। কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছি। অপর আত্মীয় স্বজনেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহ দান করিবেন, দূরে থাকুক, বরং নানা প্রকার বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন,--কিন্তু তথাপি ঈশ্বর-প্রসাদে আমি পশ্চাৎপদ হই নাই এবং ভ্রাতাও কাহারও বিদ্রূপে ভগ্নোৎসাহ হইয়া আমাকে ইংরাজী পড়াইতে ক্ষান্ত হন নাই। স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থখানি আমার সেই জ্যেষ্ঠ সহোদর--যাঁহার অসাধারণ কৃপায় আমি এই যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, যাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আমাকে স্বাধীন চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াছে,—তাঁহারই করকমলে সমর্পিত হইল।

বিয়ের পর স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বেগম রোকেয়া

রোকেয়ার পিতা জহীরউদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের

রোকেয়ার মাতা রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানি

রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসা খানম

ছোট বোন হোমায়রা তোফাজ্জল হোসেন

বড় ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহিম আবুল আসাদ সাবের

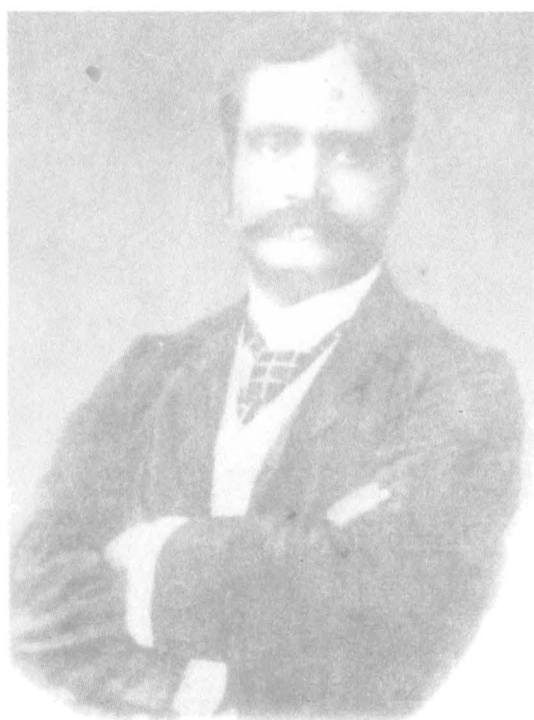

সেজ ভাই খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাবের

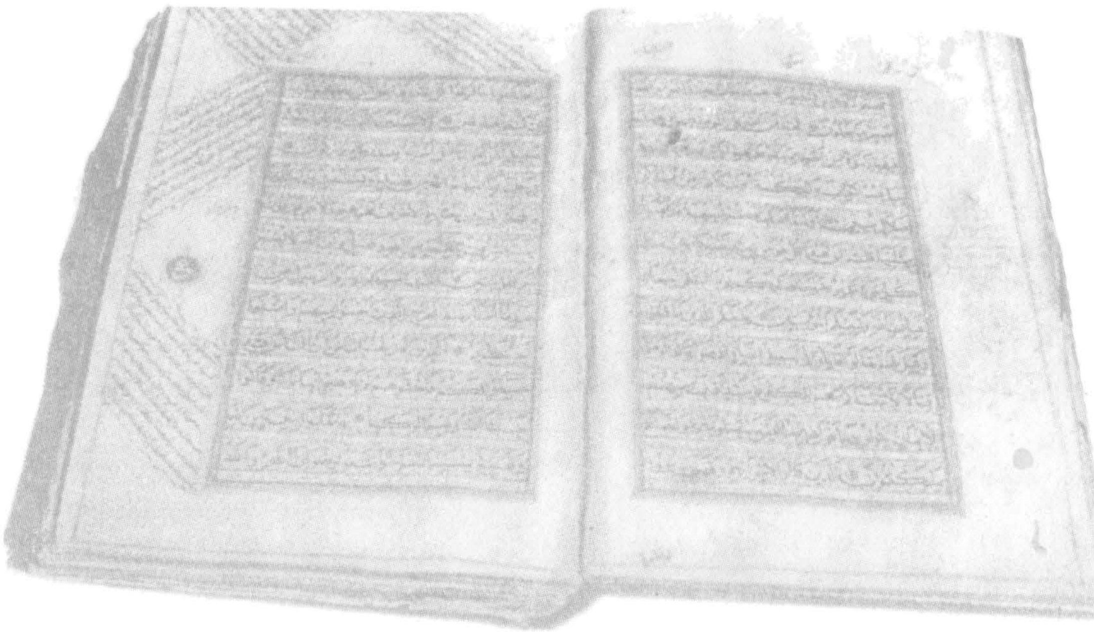

রোকেয়ার পিতা জহীরউদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবেরে হস্তলিখিত কোরআন শরীফ

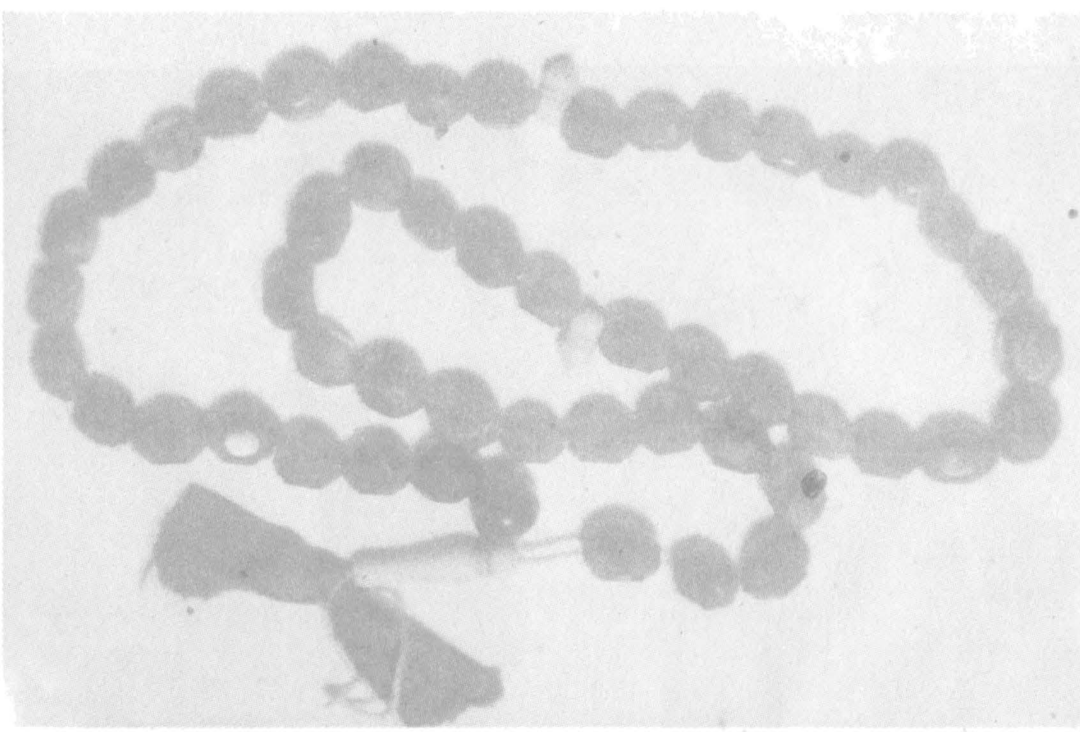

রোকেয়ার ব্যবহৃত আকিক পাথরের তসবিহ (পঞ্চাশ দানা)

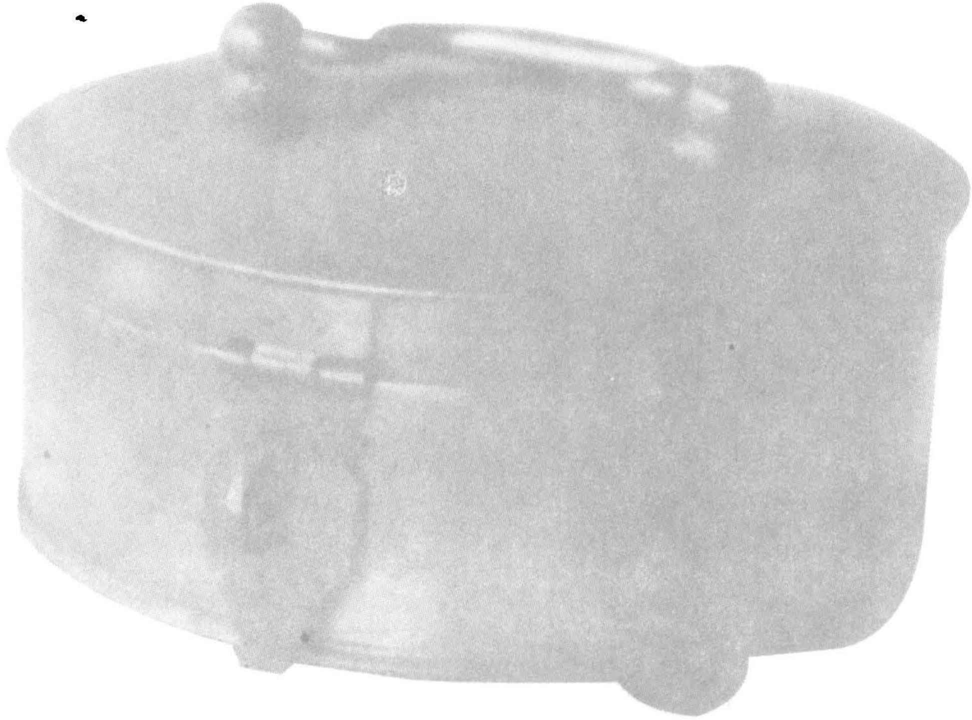

রোকেয়ার ব্যবহৃত পানের বাটা

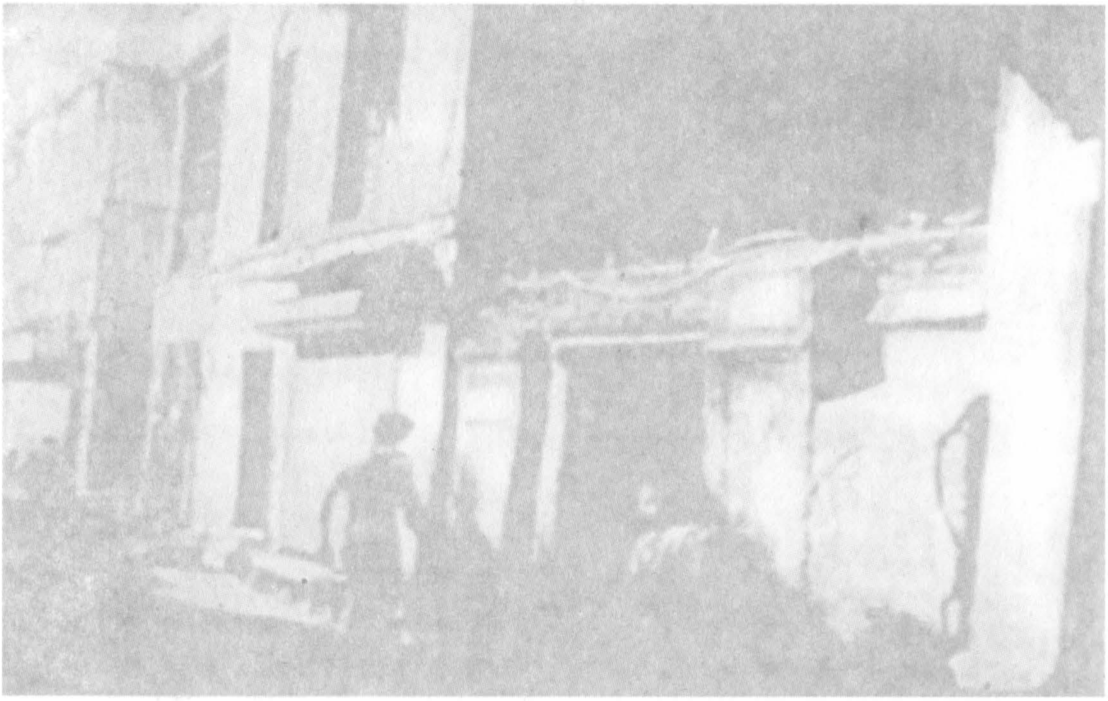

১৯১৩ সালের ৯ই মে ১৩ ইউরোপীয় অ্যাসাইলাম লেনের (বর্তমান কমরেড আবদুল হালিম লেন)
এই বাড়িতে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয়

কলকাতার ১৩নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের এই ভাড়া বাড়িতে রোকেয়া
১১ই মার্চ ১৯২১ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাস চালু করেন

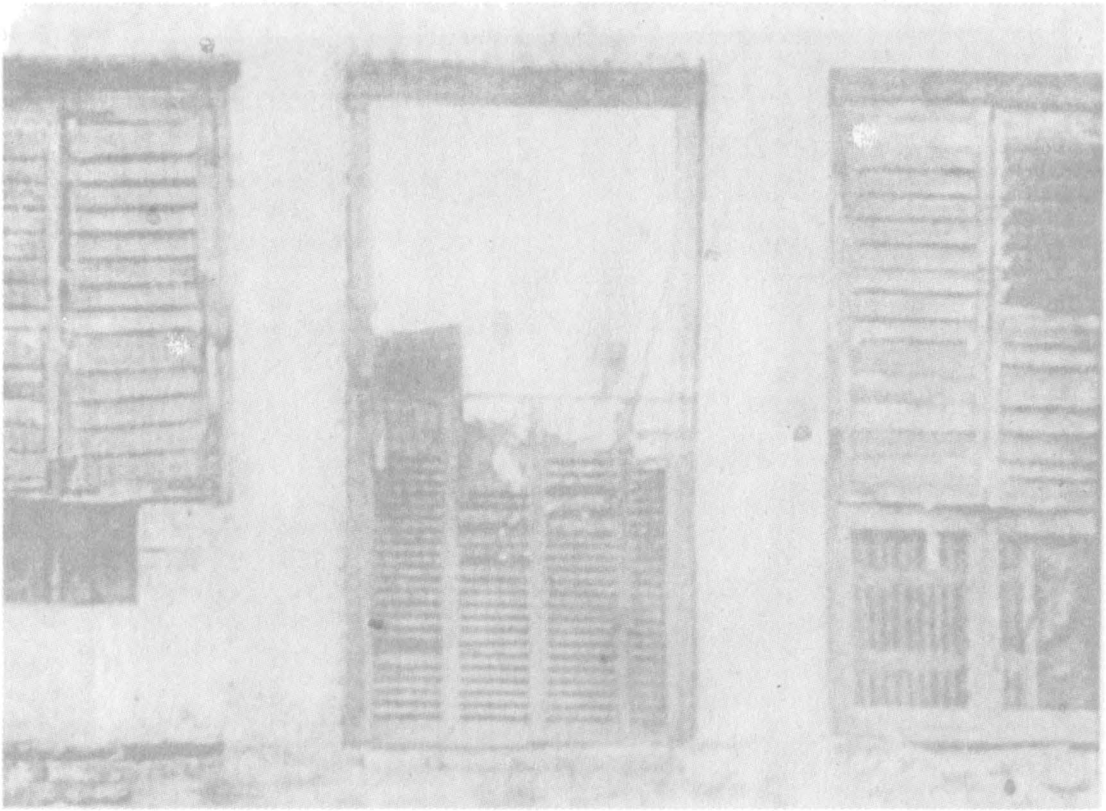

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার ৮৬/এ লোয়ার সার্কুলার রোডের এই দোতলা বাড়িতে
সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয়

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়, ১৭ লর্ড সিনহা রোড, কলকাতা

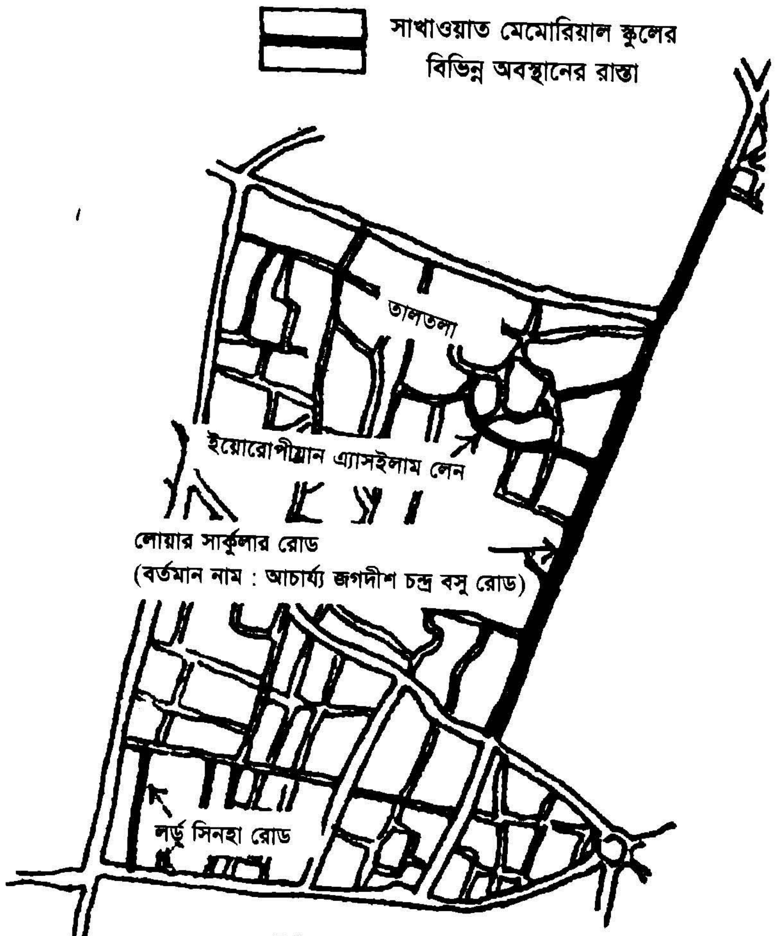

স্কুলের বিভিন্ন অবস্থানের রাস্তা

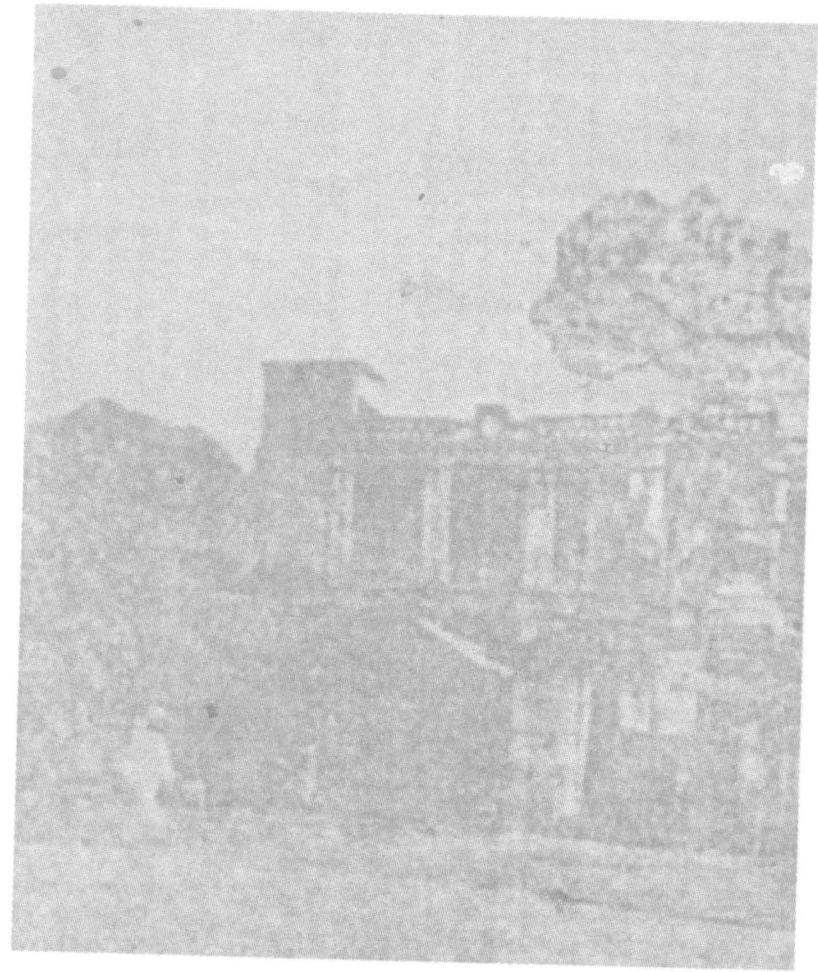

রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গালর্স স্কুল, ১৬২ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা
(ছবি জনাব এম নাসির আলীর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

Sakhawat Memorial Girls' School.
162, Lower Circular Road.
Calcutta the ...... 193?

স্নেহাস্পদা মরিয়ম

আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমার ও দুলা মিয়াঁর পত্র যথা সময় পেয়েছি। তুমি ত জান, কোন non-purdah স্কুল ও বোর্ডিং এ ব্যাটাছেলেকে রাখেনা; সুতরাং শ্রীমান সেলিমকে আমরা কি করে রাখতে পারি। দুটির একটি তোমায় করতে হবে—(১) হয়, তুমি মেয়েদের নিয়ে আমাদের সাথে থাক, সেলিম কোন একটা, mess এ থাকুক; নয়, তোমরা একটা বাসায় আলাদা থাক—রোজ সেখান থেকে মেয়েরা পড়তে আসবে।

মাশা আল্লাহ্ সেলিম সহ পৃথক বাসায় থাকতে পারবে না কেন? আমি ত একাই ২২ বছর ধরে

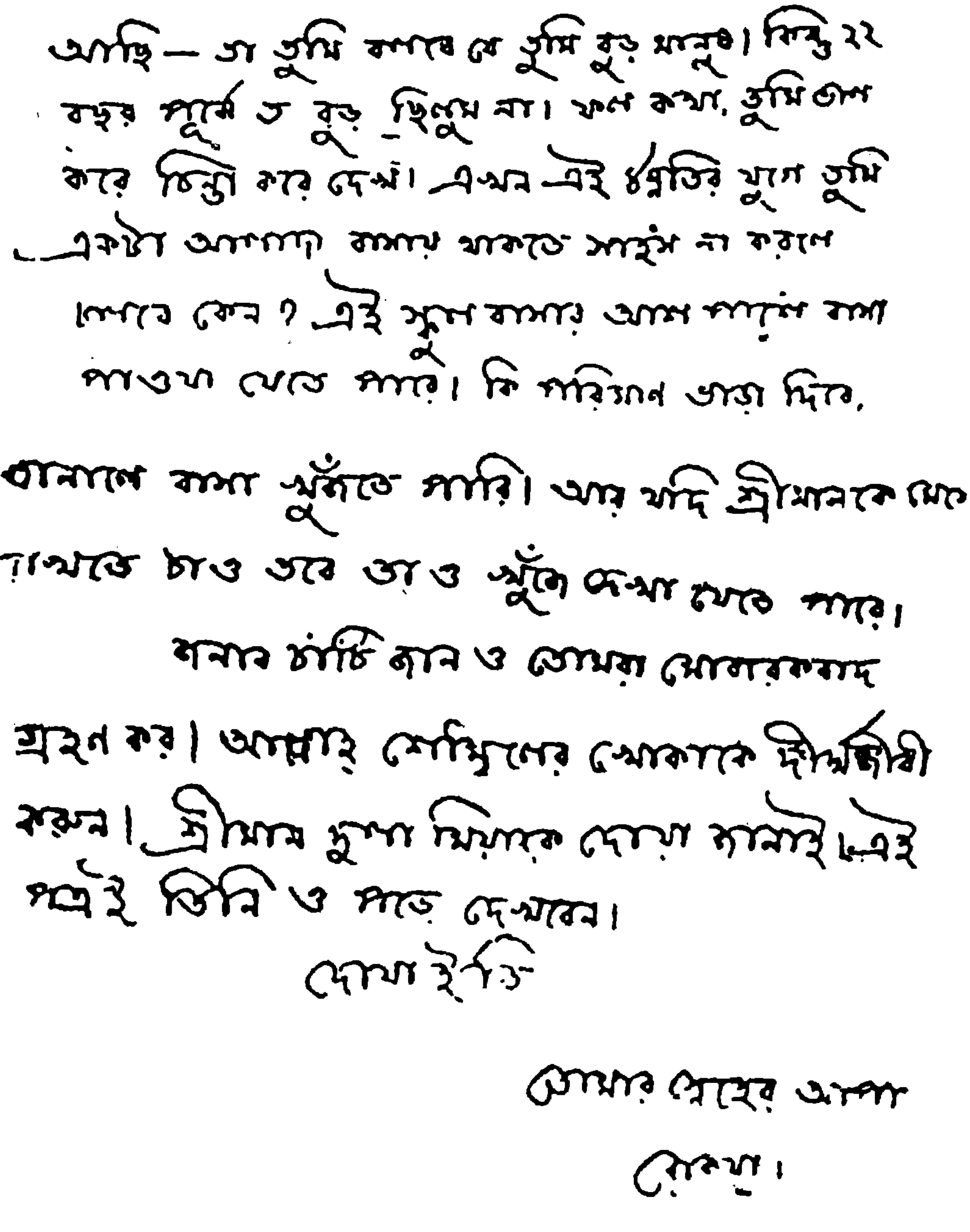

আছি— তা তুমি বলবে যে তুমি বুড় মানুষ। কিন্তু ২২
বছর পূর্ব্বে ত বুড় ছিলুম না। ফল কথা, তুমি ভাল
করে চিন্তা করে দেখ। এখন এই প্রগতির যুগে তুমি
একটা আলাদা বাসায় থাকতে সাহস না করলে
লোকে কেন? এই স্কুল বাসার আশ পাশে বাসা
পাওয়া যেতে পারে। কি পরিমান ভাড়া দিবে,
জানালে বাসা খুঁজতে পারি। আর যদি স্ত্রীমানকে মেও
রাখতে চাও তবে তাও খুঁজে দেখা যেতে পারে।
সবার চাঁচি জান ও তোমরা মোবারকবাদ
গ্রহণ কর। আল্লাহ্ শোভানের খোকাকে দীর্ঘজীবী
করুন। স্ত্রীমান দুলা মিয়াকে দোয়া জানাই। এই
পত্রই তিনি ও পড়ে দেখবেন।
দোয়া ইতি

তোমার স্নেহের আপা
রোকেয়া।

রোকেয়ার বাংলা হস্তলিপি

SAKHAWAT MEMORIAL GIRLS' SCHOOL

86-A, LOWER CIRCULAR ROAD,

Calcutta, the 9 - 8 - 1931

Dear Khan Bahadur,

I owe you a thousand apologies for not replying to your kind letter so long. I had another attack of fever & am very very week I have not finished with the Injection doctors & dentist yet

The meeting could not be held before the 26th July

Yes, Mr. Waliul Islam is working as Secretary since 5th inst.

We expect the new Hd. Mistress from the 17th inst. next, of course D.V.

Sir G. told me about your visit when I 'phoned him. Allow me to wish you every success in life. May Allah grant you long + prosperous life. Amen.

রোকেয়ার ইংরেজি হস্তলিপি

Price : Taka 250.00 Only
ISBN 984-07-5483-1